ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ্ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (প্রথম খণ্ড)
সম্পাদক : বাদশাহ আবুল মুজাফ্‌ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৬১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৬১/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0532-1

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৭
আষাঢ় ১৪১৪
জমাদিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য: ৫৪০.০০ টাকা

FATAWA-E-ALAMGIREE (1st Vol.) (A Commentary on the Islamic Laws) Edited by Badshah Abul Muzaffar Muhammad Muhiuddin Aurangzeb Alamgeer (Rh.) in Arabic, translated and edited by Islamic Foundation Bangladesh and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

June 2007

E-mail : islamicfoundation bd@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

সূচীপত্র

শিরোনাম — পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ তাহারাত ৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ উযূর বিবরণ — ৪১
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ উযূর ফরযসমূহ — ৪১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উযূর সুন্নাতসমূহ — ৪৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উযূর মুস্তাহাবসমূহ — ৫০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ উযূর মাকরূহসমূহ — ৫৪
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ উযূ ভংগের কারণসমূহ — ৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গোসল সম্বন্ধে — ৬৩
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের ফরযসমূহের বিবরণ — ৬৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সুন্নাতসমূহের বিবরণ — ৬৪
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গোসল ফরয হয় তিন কারণে তার বিবরণ — ৬৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পানির বিবরণ — ৭১
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে সব পানি দ্বারা উযূ করা জাইয তা তিন প্রকার — ৭১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত জিনিস দ্বারা উযূ করা জাইয নেই — ৮০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম সম্বন্ধে — ৮৯
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের আবশ্যকীয় বিষয়াদি — ৮৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম ভংগের কারণসমূহ — ৯৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসাইল — ৯৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মোযার উপর মাসেহ্ করা সম্বন্ধে — ১০৩
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মোযার উপর মাসেহ্ করা — ১০৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মাসেহ্ ভংগ হওয়ার কারণসমূহ — ১০৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের (খাস) রক্তসমূহের বিবরণ — ১১২
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের বিবরণ — ১১২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসের বিবরণ — ১১৪
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযার বিবরণ — ১১৫
হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযার আহকাম — ১১৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ নাজাসাত ও তার আহকাম	১২৩
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকী হতে পবিত্রকরণ সম্বন্ধে	১২৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক বস্তু সম্বন্ধে	১৩১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিনজার বিবরণ	১৩৫

অধ্যায় ঃ সালাত ১৪১

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াক্ত ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসাইল	১৪৪
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ	১৪৪
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্তের ফযীলতের বিবরণ	১৪৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিষিদ্ধ ও মাকরূহ্ ওয়াক্তের বিবরণ	১৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আযানের মাসাইল	১৪৯
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পদ্ধতি ও মুআযযিনের গুণাবলী	১৪৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ এবং তার অবস্থার বিবরণ	১৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের শর্তাবলীর বিবরণ	১৫৯
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ও সতর ঢাকার মাসাইল	১৫৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সতর ও শরীর ঢাকার কাপড়ের পবিত্রতার বিবরণ	১৬৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়ার মাসাইল	১৬৮
কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা	১৭৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ নিয়্যাতের মাসাইল	১৭৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের সিফাত এবং অবস্থা সম্বন্ধে	১৮২
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ফরযসমূহের বিবরণ	১৮২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াজিবসমূহের বিবরণ	১৮৮
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সুন্নাত, আদব এবং সালাতের নিয়মনীতির বিবরণ	১৯২
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ কিরাআতের বিবরণ	২০১
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ কারীর ত্রুটিসমূহের বিবরণ	২০৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ইমামতের বিবরণ	২১৩
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত সম্বন্ধে	২১৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইমামতের অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে ?	২১৪
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ব্যক্তি ইমামতের যোগ্য এবং কোন্ ব্যক্তি ইমামতের অযোগ্য	২১৬
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ স্থানে ইকতেদা করা শুদ্ধ এবং কোন্ স্থানে ইকতেদা করা অশুদ্ধ	২২৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্তাদির জায়গার বিবরণ	২২৬
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কাজে ইমামের অনুসরণ করা জরুরী এবং কোন্ কাজে ইমামের অনুসরণ করা জরুরী নয়	২২৯
সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ মাসবূক ও লাহিকের মাসাইল	২৩১
ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত প্রাসংগিক মাসাইল	২৩৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে উযূ ভংগ হওয়ার বিবরণ	২৩৭
খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত হওয়ার মাসাইল	২৪২
এ প্রসংগের আরো কতিপয় মাসাইল	২৪৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যে কারণে সালাত ফাসিদ হয় এবং যে কারণে মাকরূহ্ হয়	২৪৭
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে সব কারণে সালাত ফাসিদ হয়	২৪৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কি কি কাজ সালাতের মধ্যে মাকরূহ্ এবং কি কি কাজ মাকরূহ্ নয় ২৬৩	
সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মাসাইল	২৭০
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ সালাতুল বিত্‌রের বিবরণ	২৭৫
নবম পরিচ্ছেদ ঃ নফল সালাতের বিবরণ	২৭৮
আনুষংগিক আরো কতিপয় মাসাইল	২৮৫
সালাতুত্ তারাবীহ্ এর মাসাইল	২৮৬
দশম পরিচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযে শরীক হওয়ার বিবরণ	২৯৪
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ কাযা সালাতের বিবরণ	২৯৮
আনুষংগিক আরো কতিপয় মাসাইল	৩০৫
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাহু সিজদার বিবরণ	৩০৯
সালাতের মধ্যে সন্দেহ হওয়ার বিবরণ	৩২০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ	৩২৪
সিজদার শুক্র–এর মাসাইল	৩৩৩
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর সালাতের বিবরণ	৩৩৫
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সালাতের বিবরণ	৩৪০
সওয়ারী এবং নৌকায় নামায পড়ার বিবরণ	৩৪৯
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ জুমুআর সালাতের বিবরণ	৩৫৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের সালাতের বিবরণ	৩৬৫
আইয়ামে তাশরীকের তাকবীরের মাসাইল	৩৬৯
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ নামাযের বিবরণ	৩৭০
চন্দ্রগ্রহণ নামাযের বিবরণ	৩৭২

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
উনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিসকার নামাযের বিবরণ	
বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ভয়কালীন নামাযের বিবরণ	৩৭৩
একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ জানাযা নামাযের বিবরণ	৩৭৫
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তি সম্পর্কীয় মাসাইল	৩৮১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের মাসাইল	৩৮১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফনের মাসাইল	৩৮৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা বহন করার মাসাইল	৩৮৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের মাসাইল	৩৯২
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ কবর, দাফন এবং মৃত ব্যক্তির লাশ একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার মাসাইল	৩৯৩
আনুষঙ্গিক আরো কতিপয় মাসাইল	৪০১
সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ শহীদ-এর বিবরণ	৪০৪
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ সিজদা সম্পর্কিত মাসাইলের বিবরণ	৪০৫
	৪০৯
অধ্যায় ঃ যাকাত ৪১৩	
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ যাকাতের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, হুকুম এবং এর শর্তাবলীর বিবরণ	৪১৫
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী	৪১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমা পশুর যাকাতের বিবরণ	৪৩০
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা	৪৩০
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাতের বিবরণ	৪৩১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাতের বিবরণ	৪৩২
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাতের বিবরণ	৪৩৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ যে যে পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না এর বিবরণ	৪৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ-রৌপ্য ও আসবাবপত্রের যাকাতের বিবরণ	৪৩৫
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের বিবরণ	৪৩৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের বিবরণ	৪৩৭
বিবিধ মাসাইল	৪৩৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'আশির তথা 'উশর আদায়কারী ব্যক্তির নিকট দিয়ে যারা পথ অতিক্রম করে, তাদের বিবরণ	৪৪৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ খনিজ পদার্থের যাকাতের বিবরণ	৪৫০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শস্য এবং ফল-ফলাদির যাকাত	৪৫২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ব্যয়ের খাত	৪৫৭
বায়তুল মাল সম্পর্কিত মাসাইল	৪৬৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ সাদাকায়ে ফিত্‌র-এর বিবরণ	৪৬৬
অধ্যায় ঃ রোযা ৪৭৩	
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রোযার সংজ্ঞা, প্রকার, কারণ, সময় ও শর্তের বিবরণ	৪৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখার বিবরণ	৪৮২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রোযাদারের জন্য যা মাকরূহ্ এবং যা মাকরূহ্ নয়	৪৮৬
মুস্তাহাব রোযা অনেক প্রকার	৪৯১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ রোযা ফাসিদ হওয়ার এবং না হওয়ার করণসমূহ	৪৯১
সংশ্লিষ্ট মাসাইল	৪৯৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ যে সব ওযরের কারণে রোযা ভংগ করা জাইয	৫০০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মানতের বিবরণ	৫০৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ইতিকাফের বিবরণ	৫১০
ইতিকাফের আদবসমূহ	৫১২
ইতিকাফের সৌন্দর্যাবলী	৫১২
ইতিকাফের ভংগ হওয়ার কারণসমূহ	৫১২
ইতিকাফের নিষিদ্ধ কার্যাবলী	৫১৪
প্রাসঙ্গিক কতিপয় মাসাইল	৫১৫
বিবিধ মাসাইল	৫১৭
অধ্যায় ঃ হজ্জ ৫২৩	
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের সংজ্ঞা, আনুষঙ্গিক বিষয়াদি	৫২৫
আনুষংগিক আরো কতিপয় মাসাইল	৫৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মীকাতের বিবরণ	৫৩৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের বিবরণ	৫৩৬
আরো কতিপয় মাসাইল	৫৩৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিমের করণীয় কাজসমূহ	৫৪০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ আদায় করার নিয়মাবলী	৫৪২
রমীর মাসাইল	৫৫৭
বিবিধ মাসাইল	৫৬৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ উমরার বিবরণ	৫৬৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ কিরান এবং তামাত্তুর বিবরণ	৫৬৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ জিনায়াতের বিবরণ	৫৭৩
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সুগন্ধি ও তৈল ব্যবহার করা	৫৭৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পোশাকের বিবরণ	৫৭৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুণ্ডন ও নখ কাটার বিবরণ	৫৭৮
আরো কতিপয় মাসাইল	৫৮০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী–সহবাসের বিবরণ	৫৮১
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ, সাঈ, রমল বেং রমীর বিবরণ	৫৮৩
নবম পরিচ্ছেদ ঃ শিকার করার বিবরণ	৫৮৮
দশম পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা	৬০২
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ এক ইহ্রামের সাথে আরেক ইহ্রাম যোগ করা	৬০৫
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্সাবের বিবরণ	৬০৭
ইহ্সারের হুকুম	৬০৮
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফওত হয়ে যাওয়ার বিবরণ	৬১১
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ বদলী হজ্জের বিবরণ	৬১২
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের জন্য ওসিয়ত করার মাসাইল	৬১৭
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ হাদী–র বিবরণ	৬২৩
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের মানত সম্বন্ধে বর্ণনা	৬২৭
আরো কতিপয় মাসাইল	৬২৯
পরিশিষ্ট ঃ রওজা শরীফের যিয়ারত	৬৩৩

মহাপরিচালকের কথা

মোগল সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রত্যেক মানুষ কুরআন মজীদের সবগুলো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে না এবং প্রত্যেক মানুষ হাদীস সংক্রান্ত বিদ্যায় এতোটা পারদর্শী নয় যাতে নিজেরা শরীয়তের বিধান বুঝে নিতে পারে। তাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রদানের জন্য বাদশাহ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। তিনি ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান এবং মানব জীবনের উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সমাধান সম্বলিত একটি সহজবোধ্য ফিকাহ্ গ্রন্থ সংকলনের জন্য এই কমিটিকে অনুরোধ করেন। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশবরেণ্য বহু উলামায়ে কিরাম ছয় খণ্ডে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বাংলাভাষী মুসলিম জনগণকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রবর্তিত চিরশান্তি ও কল্যাণের ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিদেশী ভাষায় রচিত প্রখ্যাত ইসলামী গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদের ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের কাজ হাতে নেয়া হয় এবং এর প্রথম খণ্ড অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এই মূল্যবান গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সঠিকভাবে ইসলাম বোঝার ও অনুশীলন করার তওফিক দিন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কথা

কুরআন ও হাদীসের বিধান সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞ আলিমগণ সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্য আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থসমূহকে 'ফিকাহ্' বলা হয়। 'ফিকাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি, অনুধাবন, আইন-কানুন ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় মানুষের চলমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি স্তরে যে সমস্ত ইসলামী বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে, তার সমষ্টির নামই ফিকাহ্ শাস্ত্র। এক কথায়, এটাকে ইসলামী আইনশাস্ত্রও বলা যায়। এই শাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং অনুধাবন করা সকল মুসলিমের জন্য জরুরী।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বছরের পর বছর মেহনত করে, চিন্তা-গবেষণা করে ফিকাহ্ শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। দুনিয়ার মুসলমান তাদের সে কল্যাণকর কাজের প্রতিদান কখনো দিতে পারবে না। তাদের মেহনতের ফলে আজ কোটি কোটি মানুষ কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার না করে শরীয়তের আনুগত্য করে যাচ্ছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান উপলব্ধি করতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

জাতিকে নৈতিক অবক্ষয়ের ধ্বংসাত্মক পরিণতি হতে রক্ষা করে একটি শান্তি ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য; ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে এবং মানুষ যাতে ইসলামী অনুশাসনগুলো সহজভাবে মেনে চলতে পারে সেজন্য মোগল সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে সাতশত দেশবরেণ্য আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফিকাহ্ শাস্ত্র বিশারদকে সম্পৃক্ত করে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি ফিকাহ গ্রন্থ সংকলনের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থই 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' নামে খ্যাত। ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর এ যাবতকালে রচিত ও সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী অন্যতম। এটা হানাফী মাযহাবের একটি জগৎবিখ্যাত সুবৃহৎ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ।

যে মহতী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাদশাহ আলমগীর ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী সংকলন করেছিলেন সেই একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই গ্রন্থখানির অনুবাদ কাজ শুরু করে। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'র প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ১৯৯৯ সালে সম্পন্ন হয় এবং প্রকাশিত হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টায় আমাদের কোনো ত্রুটি হয়নি। তবুও কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরূপ কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মুদ্রণ প্রমাদ সুধীজনের নজরে পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করবো ইনশা আল্লাহ্।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকদ্বয়

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
২. মাওলানা মুহাম্মদ ফয়সাল আহমদ জালালী

সম্পাদকদ্বয়

১. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্
২. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য যিনি শরীআতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়, যিনি হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী তথা বিধানাবলী সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান সত্তা এবং যিনি উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে দিরায়েত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান বিষয়াদির ক্ষেত্রে তারা লোকদেরকে পদস্খলনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার আলোকরশ্মিতে রিওয়ায়াতের চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন।

সালাত ও সালাম ঐ নবী পাকের প্রতি, যিনি রিসালতের ময়দানে সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সকলের উর্ধ্বে, যিনি হিদায়াতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করেছেন এবং যিনি উন্মোচিত করেছেন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাকে। অর্থাৎ তাঁকে উসিলা করে আম্বিয়ায়ে কিরামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার ধারা সূচনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই মাধ্যমে নবূওয়াত ও রিসালতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটায়েছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান নবী (সা)-এর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি। বস্তুত ফিকাহ্ হচ্ছে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য-রেখা এবং আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উদ্ভূত সমস্যাসমূহের গতিময়তা কখনো স্থির থাকে না এবং এর পর্বতশৃঙ্গ এত উর্ধ্বে যা চোখের দৃষ্টিতে ধরা যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যত গ্রন্থ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না এবং হচ্ছে না পরিতৃপ্ত এতে পিপাসার্ত মন। কারণ কোন কোন গ্রন্থে পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবল বিশেষ কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রমাণ তালাশকারী ব্যক্তি এমনভাবে বিতর্কে জড়িয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন তারকাবিহীন অন্ধকার রজনীতে পানিহীন মরু বিয়াবানে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির তালাশে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনুরূপ যারা ইসলামী বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে বে-পরোয়া, তারা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী বিষয়াদির গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সংকীর্ণমনা, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাতের আঁধারে নিজের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সামান হারিয়ে এর তালাশে হন্যে হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এমনি করে তাদের অধিকাংশই সুন্নাহ্‌র আলো ছেড়ে রাতকানা হয়ে খাহিশাতের অগ্নির দিকে ছুটে চলে এবং ধাবমান হয় বিদ'আত ও বাতুলতার অকল্যাণকর পথের দিকে। ফলে পার্থক্য করতে পারে না তারা সত্য-মিথ্যা এবং হক ও না হকের মাঝে। আরো ধেয়ে চলে তারা এক ময়দানে তীহের পর আরেক ময়দানে তীহের দিকে। ফলে খুঁজে পায় না তারা গন্তব্য পথের কোন সঠিক পথ- প্রদর্শক। পায় কেবল এক নির্বোধের পর আরেক নির্বোধকে।

এহেন নাজুক অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাজিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতংক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, খোদাভীতি, পরহিযগারী ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক, আমীরুল মু'মিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদীন মহান রাষ্ট্রনায়ক আবূ মুজাফ্‌ফর মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ আওরংগযেব আলমগীর গাযীর মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন। তাঁর অনুগ্রহকে সকল সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক করে দেন এবং হিসাবের দিন তিনি তাকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা তাদের স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে; আর সংরক্ষণ করেন আল্লাহ্ তাকে ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা পশ্চাৎ দিকে ফিরে যাবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ 'আলমগীর (র)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা হবে না যা হবে বিরক্তিকর। বরং এতে থাকবে সহীহ্ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা। আর এতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে দুর্বল ও সঠিক অভিমতসমূহ, যাতে লাজীন (কর্তিত পাতা) ও লুজায়ন (রৌপ্য) এবং হিজান (দ্রুতগামী উট) ও হুজায়ন (কমীনা)-এর মধ্যে কোনরূপ সংশয় না থাকে। বস্তুত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে-সে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এতো কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং যার নিকট হিদায়াত ও গুমরাহীর পথ স্পষ্ট।

এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ আলমগীর (র) এই বিষয়ের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ। তারপর তিনি তাঁদেরকে এ সব কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ সংকলন করার প্রতি ইংগিত করেন এবং বলেন এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করতে যাতে থাকবে যাহিরী রিওয়ায়াতসমূহ-যে সব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত এবং যার ভিত্তিতে ফকীহ্‌গণ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। আর তিনি তাদেরকে এমন নাদির-দুর্লভ বর্ণনাসমূহও জমা করার আদেশ করেন-যা আলিমগণ বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন-যাতে আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও পরহিযগারী হাতছাড়া না হয় এবং যাতে এ ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাদশাহের নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকাহ্ শাস্ত্রের খাযানা থেকে মণি-মুক্তা ও মোতিসমূহ কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলাসমূহ সংকলন করলেন যে, কোন্ কাজটি শুদ্ধ ও কোন্‌টি অশুদ্ধ, কোন্‌টি সওয়াবের কাজ

ও কোন্‌টি পাপের কাজ, তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং সুন্দর ও সুসজ্জিত ভাবে গ্রথিত করলেন ফিকাহ্-এর ছড়ানো-ছিটানো মাসআলাগুলোকে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে তারা হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতার অনুসরণ করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় মাসআলাসমূহের বিবরণ পেশ করতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিতাবে যে পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে, তা তারা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ- সূত্রিতার। উল্লেখ্য যে, সংকলনকারী ফকীহ্‌গণ মাসআলা বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়ায়াতের[1] মাসআলাসমূহই উল্লেখ করেছেন। নাদির[2] রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রতি তারা বেশী মনোনিবেশ করেননি। তবে কোথাও যাহিরী রিওয়ায়াতে মাসআলার সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলে অথবা নাদির রিওয়ায়াতের সাথে "এর উপর ফাতওয়া" বা এ জাতীয় কথা সংযুক্ত থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে নাদির রিওয়ায়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাবে সংকলকবৃন্দ প্রতিটি মাসআলা মূল কিতাবের ইবারাত বরাতসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোথাও মূল কিতাবের ইবারতে কোনরূপ রদবদল করা হয়নি। তবে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে هكذا আর যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে كذا শব্দ ব্যবহার করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক সমাধান থাকলে এবং এর প্রত্যেকটির সাথে "এর উপর ফাতওয়া" বা এ জাতীয় কথা উল্লেখ থাকলে বা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণিত থাকলে কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ কোন মাসআলার সাথেই উল্লেখ না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে সংকলকবৃন্দ উভয় মতকেই এ কিতাবে হুবহু রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথ-প্রদর্শক।

والله الموفق للصواب

---

১. ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক সংকলিত (১) মাবসূত (২) যিয়াদাত (৩) সিয়ারে সগীর (৪) সিয়ারে কবীর (৫) জামে সগীর (৬) জামে কবীর- এই ছয় কিতাবকে একত্রে যাহিরী রিওয়ায়াত (ظاهر الرواية) বলা হয়।

২. উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য ফিকাহ্ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহকে নাদির রিওয়ায়াত বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিকহ্ এর পরিচিতি

মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য যে আইন-কানূন ও বিধি-বিধান রয়েছে, তা ইসলামে ফিকহ্ শাস্ত্র নামে পরিচিত। এ সব বিধি-বিধানের উপর যে কিতাবাদি রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবটি হচ্ছে অন্যতম। কিতাব সম্বন্ধে কিছু কথা বলার আগে ফিকহ্ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করছি।

বস্তুত ফিকহ্ শব্দটি হচ্ছে আরবী। এর অর্থ জ্ঞাত হওয়া, অবহিত হওয়া, ফকীহ্ হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় এর একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। মিফতাহুস সাআদা গ্রন্থের লেখক ফিকহ্-এর সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

هو علم باحث عن الاحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الادلة التفصيلية

যে ইলমে শরীআতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এই হিসাবে যে, তা উদ্ভাবন করা হয় বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে, এ ধরনের ইল্‌মকে ইলমে ফিকহ্ বলা হয়। কারো কারো মতে শরীআতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরীআতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ইল্‌মে ফিকহ্ বলা হয়।[১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ঃ

معرفة النفس مالها وما عليها

আত্মার জন্য যে সব কাজ কল্যাণকর এবং যে সব কাজ কল্যাণকর নয়, তা যথাযথ অবহিত হওয়াকে ইল্‌মে ফিকহ্ বলে।[২] এ সংজ্ঞার মধ্যে اعتقادات তথা আকীদা-বিশ্বাস, وجدانيات তথা বাতিনী আখলাক এবং عمليات তথা সালাত, সওম, হজ্জ, বেচা-কেনা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন 'উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, তখন 'আকায়িদ সম্পর্কিত জ্ঞানের নাম হয় 'ইল্‌মুল কালাম', আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নাম হয় 'ইল্‌মে তাসাওউফ' এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় 'ইল্‌মে ফিকহ্'।

সূফী-সাধকদের মতে ইল্‌ম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিকহ্। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

১. কুররাতুল উয়ূন ফী তাযকিরাতিল ফুনূন, পৃ: ৭৮
২. ঐ পৃ: ৭৯

الفقية الزاهد فى الدنيا الراغب فى الاخرة البصير بدينة المداوم على عبادة ربه -

পরকালমুখী, ইহকালবিমুখ, স্বীয় দীনের প্রতি সতর্ক দ্রষ্টা এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত ব্যক্তিকে ফকীহ্ বলা হয়[১]।

ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ইসলামে ফিকহ্-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন-সুন্নাহ্-এর পরই ফিকহ্-এর স্থান। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) বলেন, কুরআন বুঝা হাদীছ বুঝার উপর নির্ভরশীল এবং হাদীছ বুঝা ফিকহ্ বুঝার উপর নির্ভরশীল। তাই কুরআন নাযিলের কালেই আল-কুরআনে ফিকহ্ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

অর্থাৎ তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিকহ্ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (৯ ঃ ১২২)।

এ ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো উনিশ স্থানে এ فقه (ফিকহ্) ধাতু হতে নিষ্পন্ন বিভিন্ন রূপান্তরের[২] সাথে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাধিক হাদীছে ফিকহ্-এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন,

من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين -

আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে তিনি দীন সম্বন্ধে ফিকহ্ (জ্ঞান) দান করেন[৩]।

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد

'একজন ফকীহ্ শয়তানের উপর হাজার 'আবিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা অধিক কঠোর[৪]।'

এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় ফিকহ্ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ বিদ্যমান ছিল না। এমনিভাবে ইসলামী আহকামের প্রকারভেদ তথা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের তর্ক-বিতর্কও তখন উপস্থিত হত না। বরং তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্

১. কাওয়ায়িদুল ফিকহ্ পৃ: ৪১৬
২. অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত
৩. মিশকাত (বুখারী-মুসলিম) পৃ: ৩২
৪. মিশকাত (তিরমিযী, ইবন মাজা) পৃ: ৩৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

(সা)–কে অনুসরণ করেই আমল করতেন। কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবী করীম (সা) তা সমাধান করে দিতেন বা কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণের জীবনে সুসংহত অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ্ শাস্ত্র প্রণীত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর ইন্তিকালের পর ইসলাম যখন দিগ–দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন ধর্মের ও সংস্কৃতিক মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্য–নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এ সব সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন ও হাদীছের উপর নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নমুনা হিসাবে কিছু সমস্যার কথা নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এতে নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নামাযে যদি কারো ভুল হয় অথবা কোন আমল ছুটে যায়, তবে একথা বলার কোন উপায় ছিল না যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কি, নামায সহীহ্ হয়েছে কি হয়নি, না হয়ে থাকলে তার প্রতিকারের উপায় কি? এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে নেই। অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধানও অত্যাবশ্যক।

২. কুরআন মজীদের কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্যত বিপরীতমুখী দুই ধরনের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে যে,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا –

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে (২ ঃ ২৩৪)

আবার সূরা তালাকে বিবৃত হয়েছে,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ –

আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (৬৫ ঃ ৪)

উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দতকাল হল চারমাস দশ দিন। চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ফলে আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট ফায়সালা পাওয়া যায় না। অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা একান্ত জরুরী।

৩. কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের হুকুমে বাহ্যিক অসংগতি পরিলক্ষিত হওয়া। যেমন কুরআন মজীদ উল্লেখ রয়েছে

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ –

'কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।' (৭৩ ঃ ২০)

কিরাআত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন,

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

'সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার সালাত হয় না[১]।'

আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নামাযে ফাতিহা পড়া জরুরী নয়, যে কোন স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই তা সহীহ্ হয়ে যাবে। অথচ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামাযই হবে না। এই দুই আয়াত ও হাদীছের মধ্যে বাহ্যিক অমিল দেখা যায়।

৪. বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হওয়া। যেমন এক হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন,

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

'সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার সালাত হয় না[২]।'

অপর হাদীছে আছে,

من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

'সালাতে যার ইমাম রয়েছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে সালাত আদায় করছে) ইমামের কিরাআতই তার জন্য কিরাআত' অর্থাৎ পৃথকভাবে তাকে আর কিরাআত পাঠ করতে হবে না[৩]।

অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে আছে,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন (জোরে কিরাআতের সময় যেমন ফজর, মাগরিব ও ঈশার নামাযে) এবং চুপ থাকো (শুনতে পাও আর না পাও)।

অথচ প্রথমোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার সালাত আদায় হবে না। ইমাম হোক, মুক্তাদী হোক অথবা একা নামায পড়ুক। এরূপ আপাত বিরোধী হাদীছ ও কুরআনের হুকুমে আমাদের মত সাধারণ মানুষ কী ভাবে আমল করবে?

৫. কুরআন মজীদে এবং হাদীছ শরীফে কোন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন হায়েয পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে।' (২ ঃ ২২৮)

আভিধানিকভাবে "কুরূ" শব্দটি হায়েয এবং পাক অবস্থা এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ

---

১. মিশকাত (বুখারী–মুসলিম), পৃ. ৭৮

২. মিশকাত (বুখারী–মুসলিম), পৃ. ৭৮

৩. ইবন মাজা, পৃ. ৬১, মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ, পৃ. ৯৮ (বুখারীর সমপর্যায়ের সনদে বর্ণিত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এখানে এ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? অনুরূপভাবে হাদীছে বর্ণিত আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন[১]। জমি বর্গা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন্ পদ্ধতি নিষিদ্ধ এখানে এর কোন উল্লেখ নেই। অথচ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৬. স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়া।

৭. আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান না থাকা। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে সরাসরি মাসআলা বের করে তদনুসারে আমল করতে হলে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও হাদীছের শানে নুযূল ও শানে উরূদ (যে প্রেক্ষিতে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে) জানতে হবে। জানতে হবে কোন্‌টি খাস, কোন্‌টি আম, কোন্‌টি মুজমাল, কোন্‌টি মুফাস্‌সাল, কোন্‌টি মুহকাম, কোন্‌টি মুতাশাবিহ, কোন্‌টি নাসিখ এবং কোন্‌টি মানসূখ ইত্যাকার বিষয়াদি। অন্যথায় মাসআলা উদ্ভাবন করা আদৌ কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

মোদ্দাকথা, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত, দুই হাদীছ কিংবা এক আয়াত ও হাদীছের মধ্যে পরিলক্ষিত অসংগতি নিরসনকল্পে ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এবং সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য ইসলামী আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্ পর্যালোচনা করে প্রণয়ন করা হয় ইসলামী শাস্ত্রের এক মহা মূল্যবান ভাণ্ডার, যা আজ ইলমে ফিকহ্ নামে পরিচিত। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ইলমে ফিকহ্ কুরআন সুন্নাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়। বরং এ হল কুরআন-হাদীছের সার নির্যাস। ইসলামী যিন্দেগী যাপনের জন্য ফিকহ্ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ্‌র ফকীহ্‌গণ এ বিষয়ে একমত যে, দৈনন্দিন জীবনের আমলের জন্য প্রয়োজনীয় ফিকহ্ শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং ইলমে ফিকহ্ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা হল ফরযে কিফায়া[২]।

ফিকহ্ শাস্ত্রের সংকলন ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

আমি পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় ফিকহ্ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ বিদ্যমান ছিল না। সে সময় মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপার রাসূলে পাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিস্থিতির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাতাওয়া, কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজে সম্পাদন করতেন। এ কারণেই সে সময় স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ্ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। সে সময় ইসলামী ফিকহের দু'টি উৎস ছিল ঃ (ক) কুরআন মজীদ (খ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছ। খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগে মুসলিম বিশ্বে নানা প্রকার নতুন নতুন সমস্যা

---

১. হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৯

২. ফাতাওয়া ও মাসাইল, পৃ. ৬-১০

দেখা দিতে থাকে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে তাদের সময় আরো দু'টি উপায় অবলম্বিত হয়। (ক) সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ তৎকালে উদ্ভূত যে সব সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীছে পাওয়া যেত না, সেগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কিরাম পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একে ইজমায়ে সাহাবা বলা হয়। এটাই ইজমার মূল ভিত্তি। পরবর্তীকালে ইজমা ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

(খ) বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের ব্যক্তিগত অভিমত। অর্থাৎ যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীছে সরাসরি পাওয়া যেত না এবং যেগুলোর সমাধানে সাহাবায়ে কিরাম সম্মিলিত ভাবেও কোন সিদ্ধান্ত নেননি, সে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীছের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত দিয়েছেন। এটাই কিয়াসের মূল ভিত্তি। পরবর্তীকালে এই কিয়াসই ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

তারপর হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনকাল তথা একচল্লিশ হিজরী থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরীআতের হুকুম-আহকাম সুবিন্যস্ত করার তথা ফিকহ্ শাস্ত্র সুবিন্যস্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন কারণে তীব্র ভাবে দেখা দেয়। যেমন ঃ

১. এ সময় যে সকল সাহাবায়ে কিরাম জীবিত ছিলেন, তারা ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে এককভাবে কোন সাহাবীর পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল হাদীছ জানা থাকাও সম্ভবপর ছিল না। তাই নব নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তারা নিজ নিজ রায় মুতাবিক দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরামের রায়ও বিভিন্ন ধরনের হতে থাকে।

২. রাজনৈতিক কারণে ঐ সময় যে সব চরমপন্থী ও বিপথগামী ফিরকা যথা, শী'আ, খারিজী ইত্যাদি ফিরকার উদ্ভব ঘটে, ঐ সমস্ত ফিরকার লোকেরা নিজ নিজ আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার ফলেও মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের হিফাযতের লক্ষ্যে শরীআতের হুকুম -আহকাম সুবিন্যস্ত করা এবং এর নীতি নির্ধারণ করা তথা ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্ প্রণয়ন ও সংকলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই সময়ে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাতওয়া দানের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) মদীনা মুনওয়ারা, (২) মক্কা মু'আযযমা, (৩) কূফা, (৪) বসরা, (৫) শাম, (৬) মিসর, (৭) ইয়ামান ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশকে ফিকহ্-এর সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। এ সময় ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর সহযোগী, সহকর্মী ও শিষ্য-শাগরিদগণের সহায়তায় ফিকহের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এগুলোর সম্পাদনাও পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণ নিয়মিতভাবে ইলমে ফিকহ্ গ্রন্থাকারে রচনা ও প্রকাশ করেন। কাযী (বিচারক)গণ ঐ ফিকহের অনুসরণে মুকাদ্দমার ফয়সালা দিতে থাকেন। মুসলিম জনতা ইমামগণের প্রদত্ত ফাতওয়ার অনুসরণ করতে থাকেন। অবশ্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়াও নিজ গতিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

চলমান ছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণের শিষ্যবৃন্দ তাঁদের উস্তাদগণের সম্পাদিত ফিকহের প্রচার প্রসারে ব্রতী হন। তাঁদের অভিমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং তাদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে নতুন নতুন মাসআলার জওয়াব দিতে থাকেন। উসূলে ফিকহ্ও এ যুগে বিধিবদ্ধ হতে থাকে। মোটকথা, হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুতেই ফিকহ্ সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় শতকের শেষে ও তৃতীয় শতকের দিকে এসে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জীবনব্যাপী সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের উপর ইসলামী শরীআতের সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ আইন-কানূন ও বিধি-বিধান পেশ করেন। তাঁদের এ অবদান অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় এবং তাদের মাযহাব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও অনুসরণীয়১। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক, বলখ, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা, ভারত ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের প্রচার করেন। এ ছাড়া ইমাম যুফার (র)-এর মাধ্যমে বসরায় হানাফী মাযহাবের প্রসার ঘটে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকায় হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। স্পেনে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগ থেকেই হানাফী মাযহাব প্রচলিত ছিল। ইয়ামান এবং সান'আতেও হানাফী মাযহাব ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। সিরিয়ার প্রত্যেক শহর ও গ্রামে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বিদ্যমান ছিল। অনুরূপ উপমহাদেশ তথা পাক-ভারত ও বাংলাদেশের অধিকাংশ বাদশাহ ও মুসলিম জনগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন২। সেই হিসাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ব্যক্তিত্ব ও অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ঃ ব্যক্তি ও অবদান

হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী-এই চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) হলেন প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নাম নু'মান এবং উপনাম আবূ হানীফা। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছাবিত।

ইমাম আযম আবূ হানীফা জ্ঞানের বিখ্যাত কেন্দ্র-নগরী কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ মতে উমায়্যা খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের শাসন আমলে ৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী (র)-এর মতে ৭০ হিজরী সনে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জন্ম এবং বিভিন্ন উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন৩।

ইমাম আবূ হানীফা (র) অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি ইলমে কালাম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এ বিষয়ে এত গভীর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর

১. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ইফা বাংলাদেশ।
২. ঐ।
৩. আস্ সুন্নাহ্ অ মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী, ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবা'ঈ, পৃ: ৪০১।

প্রতি ইশারা করে বলত, তিনি হলেন ইলমে কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। সে সময়ের যিন্দীক, নাস্তিক ও বাতিল আকীদাপন্থীদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করে তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নিজের বক্তব্য, "শুধুমাত্র মুনাযারা ও বাহাছের উদ্দেশ্যে আমাকে বিশ বার বসরায় গমন করতে হয়েছে। কোন কোন সময় পূর্ণ এক বছর আবার কোন সময় এক বছরের কম বসরায় অবস্থান করতে হয়েছে। এ সময় ইলমে কালামই ছিল আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। একেই দীন ও শরীআতের মৌলিক জ্ঞান বলে আমি মনে করতাম। এরপর আমি ভেবে-চিন্তে দেখলাম যে, সাহাবায়ে কিরাম আমাদের তুলনায় দীন ও শরীআতের ব্যাপারে অধিক ইল্‌ম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। তথাপি তারা তর্ক -বিতর্ক এবং বাহাছ-মুবাহাছায় লিপ্ত হননি। বরং দীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ককে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তাঁরা তো শরীআতের ফিকহী মাসআলা-মাসাইল ও আহকামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ছিলেন। আর এ জন্য তাঁরা ইলমের মজলিস কায়েম করেছিলেন। তখন আমি ইলমে কালামসহ ফিকহ্ ও হাদীছ শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করলাম১।"

এরপর তিনি সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্ হাম্মাদ (র)-এর ইলমী হালকায় শরীক হয়ে ইলমে হাদীছ ও ইলমে ফিকহ্ অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম হাম্মাদ (র)-এর দরসের এ মজলিস হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, হাম্মাদ (র) ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে, তিনি আলকামা (র) থেকে, আর আলকামা (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে ইলমে হাদীছ ও ইলমে ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি আঠার বছর পর্যন্ত হযরত হাম্মাদ (র)-এর নিকট লেখাপড়া করেন। উস্তাদ হাম্মাদের ইনতিকালের পর ছাত্রগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কূফায় অবস্থিত এ মাদরাসাটির দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ হিসাবে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন২।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় শুধুমাত্র ইলমে কালাম শিক্ষায় রত ছিলেন তা নয়। বরং এর সাথে সাথে তিনি ইলমে হাদীছও শিক্ষা করেছেন। তবে ঐ সময় তিনি ইলমে হাদীছ শিক্ষার তুলনায় ইলমে কালামকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য ২২ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি কেবলমাত্র ইলমে হাদীছ ও ইলমে ফিকহ্ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাম্মাদ (র)-এর সাহচর্যে থাকাকালে দরসের অবশিষ্ট সময়ে তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিছের খিদমতে হাযির হয়ে হাদীছ শিক্ষা লাভ করতেন। তাছাড়া সেকালের ইলমী মারকায বসরা, মক্কা মুআয্যমা ও মদীনা মুনাওয়ারার শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও ইমামগণের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁদের সাথে বিভিন্ন ইলমী বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। এ সব আলোচনার মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র) যেমনিভাবে তাঁদের থেকে ইলমী ফায়দা হাসিল করেন,

১. আইম্মায়ে আরবাআ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, পৃ: ৪০
২. আস্ সুন্নাহ্ অ মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী, পৃ: ৪০১

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপভাবে তাঁরাও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন। এর ফলে গোটা বিশ্বে তাঁর ইল্‌ম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) যে আসাতিযায়ে কিরামের নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন, তাদের সংখ্যা চার হাজারের মত। তাঁদের মধ্যে হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মান, আমির ইব্‌ন শুরাহবীল কূফী, আলকামা ইব্‌ন মারসাদ কূফী, সালামা ইব্‌ন কুহায়ল কূফী, আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ্ মক্কী, আদী ইব্‌ন ছাবিত আনসারী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী, নাফি মাওলা ইব্‌ন উমর মাদানী, আমর ইব্‌ন দীনার মক্কী, আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয আল আরাজ মাদানী, মুহারিব ইব্‌ন দিছার, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির, সিমাক ইব্‌ন হারব কূফী, ইয়াযীদ ইব্‌ন সুহায়ব কূফী, আবূ যুবায়র মুহাম্মদ মুসলিম মক্কী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর যুগের সেরা ফকীহ্ এবং সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তৎকালীন ইমাম, ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিছগণও এ কথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন।

ইমাম বুখারী (র)-এর প্রথম শ্রেণীর উস্তাদ মক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্বন্ধে বলেন,

كان اعلم اهل زمانه

'তিনি তাঁর যুগের সর্বাধিক বড় আলিম ছিলেন[১]।' উল্লেখ্য যে, সেকালে আলিম বলে মুহাদ্দিছ এবং ইল্‌ম দ্বারা ইলমে হাদীছকে বুঝানো হত। এ হিসাবে এ কথার মর্ম এই হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) সে যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন।

প্রখ্যাত হাফিযে হাদীছ ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র), যাঁর থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন, আলী ইব্‌ন মাদীনী ও ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াহ্ প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, বলেন,

ادركت الف رجل وكتبت عن اكثر هم مارأيت فيهم افقه ولااورع ولا اعلم من خمسة اولهم ابو حنيفة رح

অর্থাৎ আমি এক হাজার মুহাদ্দিছীনে কিরাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং তাদের অধিকাংশ থেকেই আমি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। তন্মধ্যে পাঁচজনকে সবচেয়ে বড় ফকীহ্, আলিম এবং মুত্তাকী হিসাবে পেয়েছি। তাদের মধ্যে প্রথম ও সেরা ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র)।

বিখ্যাত সূফী ও তাপস শাকীক বলখী (র) বলেন,

كان الامام ابو حنيفة من اورع الناس و اعلم الناس واعبد الناس

'ইমাম আবূ হানীফা (র) তৎকালীন যুগের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরহিযগার, সবচেয়ে বড় আলিম এবং সর্বাধিক ইবাদতগুযার ব্যক্তি ছিলেন[২]।'

বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও ফকীহ সুফ্‌য়ান ছাওরী (র)-এর মতে

كان الامام ابو حنيفة افقه من اهل الارض

১. তাহযীবুত তাহযীব, অল্লামা ইব্‌ন হাজর আসকালানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৫

২. তাহযীবুত তাহযীব : অল্লামা ইব্‌ন হাজর আসকালানী ১১তম খণ্ড, পৃ:৩৬৬-৩৬৯

'ইমাম আবূ হানীফা (র) পৃথিবীবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিক্‌হবিদ ছিলেন[১]।'

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) যাঁকে সকল মুহাদ্দিছ আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীছ বলে উল্লেখ করেছেন এবং যিনি হাদীছ বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহ)-এর উস্তাদগণের উস্তাদ এবং বুখারী শরীফের বহু হাদীছের সনদে তাঁর নামের উল্লেখ করা হয়েছে, বলেন :

افقه الناس ابو حنيفة مارأيت فى الفقه مثله

"ইমাম আবূ হানীফা (র) সমকালীন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ্ ছিলেন। ফিক্‌হ্-এর মধ্যে তাঁর সমতুল্য আমি কাউকে দেখিনি[২]।"

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

الناس عيال فى الفقه على ابى حنيفة

'ইলমে ফিক্‌হে দুনিয়ার তামাম মানুষ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পরিবারভুক্ত[৩]।'

এভাবে বহু ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিছ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইল্‌ম, ফিক্‌হ্ ও পরহিযগারীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হাফিয ইরাকী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম তাবারী, আল্লামা সুয়ূতী, খতীবে বাগদাদী, হাফিয ইবনুল জাওযী, আল্লামা নববী, আল্লামা কাসতালানী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী প্রমুখ ইমামুল হাদীছ উলামা ও মাশায়িখে কিরামের মতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ছিলেন একজন তাবিঈ। তিনি হযরত আনাস (রা)-কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনাও করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) তাবয়ীযুস্ সহীফা (تبييض الصحيفة) গ্রন্থে দলীলের ভিত্তিতে একথা প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) হযরত আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স, ওয়াসিলা ইব্‌ন আসকা, আইশা বিন্‌ত আজরাদ (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আল্লামা আবূ মা'শার আবদুল করীম (র) বলেন, ইমাম আযম (র) হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং হযরত মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেছেন। কাজেই ইমাম আবূ হানীফা (র) একজন তাবিঈ এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য[৪]।

তাকওয়া-পরহিযগারী, ইবাদত-বন্দেগী এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একদা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) খলীফা হারূনুর রশীদের সামনে ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) অত্যন্ত পরহিযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। তাঁর নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তা জানা থাকলে তিনি তার উত্তর

১. ইলাউস সুনান মুকদ্দমা, পৃ. ৩০৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

৪. ইলাউস্ সুনান : অল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানী, মুকদ্দমা পৃ: ২০৮-২০৭; দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯২-৯৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু। জাগতিক শান-শওকত ও জাঁকজমক তিনি মোটেও পসন্দ করতেন না। অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হতে তিনি সব সময় বিরত থাকতেন। পরোপকার, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, মায়ের খিদমত ও উস্তাদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি বহু গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রধানতম উস্তাদ হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (র)-এর ইনতিকালের পর ইমাম আযম (র)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করার পর প্রথমত তিনি স্বীয় উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে হালকায়ে দরস কায়েম করতে ইতস্তত করছিলেন। পরে তিনি একদা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর খনন করছেন। এতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর বসরা গমন করে এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন[১] (র)-এর নিকট এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, স্বপ্নদ্রষ্টা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীছ ভাণ্ডার বিকশিত করবেন।

এরপর থেকে ইমাম সাহেব প্রসন্ন মনে ফিকহ্ ও ফাতাওয়ার দরস দিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর দরস-তাদ্‌রীসের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আলিমগণ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মক্কা, মদীনা, দামেশক, বসরা, মুসিল, মিসর, ইয়ামান, বাহ্‌রাইন, কূফা, বাগদাদ, জাযীরা এবং রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে হাদীছ ও ফিকহ্ এর শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু সংখ্যক ফকীহ্, মুহাদ্দিছ ও কাযী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে কাযী আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান শায়বানী, যুফার ইব্‌ন হুযায়ল আম্বরী, হাসান ইব্‌ন যিয়াদ, হাকাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলখী, মুগীরা ইব্‌ন মিকসাম, যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দা, মিসআর ইব্‌ন কুদাম, সুফ্‌য়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল, ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক, হাসান ইব্‌ন সালিহ্, আবূ বকর ইব্‌ন আয়্যাশ, 'ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, আলী ইব্‌ন মুসহির, হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস, আবূ আসিম নাবীল, জারীর ইব্‌ন আবদুল হামীদ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক, ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ্, আবূ ইসহাক ফাযারী, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, মক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম, আবদুর রহমান মুকরী, ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান, হামযাহ্ ইব্‌ন হাবীব আয-যায়্যাত, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়ামান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ইলমে হাদীছেও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। চল্লিশ হাজার হাদীছ থেকে নির্বাচন করে তিনি কিতাবুল আছার (كتَابُ الاثَار) ফিকহী তারতীব অনুসারে বিন্যস্ত করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র)-এর মতে এটিই এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম কিতাব। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আবদুল 'আযীয দারাওয়ার্দী (র) বলেন,

كان مالك ينظر فى كتب الى حنيفة وينتفع بها

ইমাম মালিক (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক প্রণীত কিতাবসমূহ দেখতেন এবং এর দ্বারা

১. তাবেঈগণের মধ্যে বরং সমগ্র মুসলিম জাহানে ইনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছও ছিলেন।

তিনি উপকৃত হতেন। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক প্রণীত এ কিতাব মুআত্তায়ে মালিক-এর পূর্বে সংকলিত হয়েছে।

ইমাম আযম (র) যদিও ইলমে কালাম, ইলমে হাদীছ এবং ইলমে ফিকহ্ ইত্যাদি সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনকে ফিকহ্-এর খিদমতেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ জন্যই তাঁকে আহলুর রায় বলা হত। আহ্লুর রায় মানে ফিকহ্ শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তি। ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর মূলনীতি কি ছিল এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি ফিকহী বিষয়ে প্রথমত কিতাবুল্লাহ্ তথা কুরআন থেকে হুকুম গ্রহণ করি। যদি কিতাবুল্লাহ্‌র মধ্যে সে সম্পর্কে হুকুম না পাই, তবে সুন্নাত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীছ থেকে হুকুম গ্রহণ করি। আর যদি কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্‌তে সে হুকুম না পাই, তবে সাহাবীগণের মধ্যে যার কথা গ্রহণযোগ্য মনে করি তাঁর কথা গ্রহণ করি। তাদের মতামত বর্তমান থাকতে তা প্রত্যাখ্যান করে অন্য কারো মতামত গ্রহণ করি না। যখন সাহাবীদেরও কোন অভিমত না পাওয়া যায় এবং মাসআলার সিদ্ধান্ত ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, ইব্‌ন সীরীন, হাসান, আতা, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব প্রমুখ ফকীহ্‌গণের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন আমিও ইজতিহাদ করি, যেমন তারা ইজতিহাদ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইজতিহাদের পদ্ধতি এই ছিল, যে সব বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবাগণের কোন অভিমত পাওয়া যেত না, সে সব বিষয়ে তিনি কিয়াস করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলতেন, আমার প্রকাশিত মতের খেলাফ কোন সহীহ্ হাদীছ পাওয়া গেলে হাদীছকে গ্রহণ করবে এবং জেনে রাখবে যে, এটাই আমার মত। ইমাম আযম (র) শরঈ দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল বিষয়ের সমাধানকল্পে প্রখ্যাত চল্লিশ জন ফকীহ্-এর সমন্বয়ে ইলমে ফিকহের একটি মজলিস (আল-মাজমাউল ফিকহী) গঠন করেছিলেন। এঁরা সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত নিতেন, তা লিপিবদ্ধ করা হত। কোন বিষয়ে তাঁদের একজনও যদি ভিন্নমত পোষণ করতেন, তবে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা করা হত। এরপর ঐকমত্যে পৌঁছতে পারলে তা লিপিবদ্ধ করা হত। কথিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এসব মজলিস থেকে ৬০ হাজার, কারো মতে ৮৩ হাজার আইন সংক্রান্ত সমস্যার শরঈ ফায়সালা প্রদান করা হয়েছে। আর এগুলো তাঁর জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন শিরোনামে সংগৃহীত হয়েছিল।[১/২]

১. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ইফা. বাংলাদেশ

২. আইন সংক্রান্ত সমস্যার শরঈ ফায়সালা উদ্ভাবনের পদ্ধতি এরূপ ছিল-কুরআন মজীদ, হাদীছে নববী এবং সাহাবাগণের সুস্পষ্ট অভিমত না পাওয়া গেলে এক একটি উদ্ভূত বা পরে উদ্ভূত হবার সম্ভাবনাময় বিষয় মজলিসে উত্থাপন করা হত। প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞানালোকে কুরআন মজীদের আয়াত বা হাদীছে নববী হতে যা উপলব্ধি করতেন, তা পেশ করতেন। এর পর আলোচনা-পর্যালোচনা করে আয়াত অথবা গ্রহণযোগ্য হাদীছ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত মতটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হত। সাধারণ দৃষ্টিতে এর বিপরীত হাদীছের এমন ব্যাখ্যা দান করা হত, যাতে এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ্ হাদীছসমূহের মধ্যে বিরোধ না থাকে। এটা সম্ভবপর না হলে সনদ ও অর্থের দিক হতে অধিক গ্রহণযোগ্য হাদীছের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। উদাহরণ স্বরূপ সমপর্যায়ের সনদে বর্ণিত দু'টি হাদীছ, একটি কওলী তথা নীতিমালা সূচক, অপরটি ফে'লী বা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত সম্বলিত, সে ক্ষেত্রে নীতিমালাসূচক হাদীছ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। আর ঘটনার পরিপেক্ষিত সম্বলিত হাদীছের এমন ব্যাখ্যা করা হত, যাতে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তিনি তৎকালীন শাসকবর্গ কর্তৃক অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হন। উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসন আমলে দুইবার তাঁকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। ফলে তাঁকে দুইবার জেলখানায় অন্তরীণ জীবন যাপন করতে হয়। তারপরও তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করায় কারাগারেই তাঁকে বিষপান করানো হয়। এর ফলে তিনি ১৫০ হিজরী সনে কারাগারেই ইনতিকাল করেন। বাগদাদের খিযরান নামক কবরস্তানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাকলীদের অপরিহার্যতা

ইসলামী শরীআতের মূল উৎস হল, কুরআন ও হাদীছ। পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সম্পূরক আরো দু'টি উৎস তথা ইজমা ও কিয়াসের সংযোজন ঘটে। এই দলীল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামী শরীআতকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুরআন-হাদীছ এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর ফলে বহু মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী সময়ে সে সবের মধ্যে চারটির উপরে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চারটি মাযহাব হল- (১) হানাফী (২) মালিকী (৩) শাফিঈ ও (৪) হাম্বলী।

এই চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করলেই কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ ও তাকলীদ করা হবে।

বস্তুত তাকলীদ (تقليد) শব্দটি আরবী। এর অর্থ গলায় মালা বা হার পরিয়ে দেওয়া। ফিকহ্ শাস্ত্রের নীতিমালা বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতে তাকলীদের সংজ্ঞা হল,

العمل بقول امام الجتهد من غير مطالبة دليل ,

অর্থাৎ প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাকলীদ বলা হয়।[১]

"প্রমাণ অন্বেষণ করা ব্যতীত" এ কথার মানে হল, মুকাল্লিদ তার ইমামের প্রতি এরূপ আস্থা পোষণ করবে যে, অনুসরণীয় বিষয়ে আমার ইমামের নিকট প্রমাণ তো অবশ্যই আছে এবং তা সত্যও বটে। কাজেই প্রমাণ পেলে অনুসরণ করবো, অন্যথায় করবো না, এরূপ দুঃশ্চিন্তার আমি শিকার হবো না। অবশ্য কোন ইমামের তাকলীদ করার পর প্রমাণ জানতে সচেষ্ট হওয়া তাকলীদের পরিপন্থী কাজ নয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীছের মর্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. যে সব মর্ম অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তা উদ্ধারে কোন অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়া এবং চুরি, যিনা,

১. কাওয়ায়িদুল ফিকহ্ ঃ মুফতী আমীমুল ইহ্সান (র)

মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়া। এ সবের হুকুম-আহকাম কুরআন ও হাদীছ হতে সবাই উদ্ধার করতে সক্ষম। কাজেই এই শ্রেণীর আয়াত ও হাদীছের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদের কোন প্রয়োজন নেই। (২) এমন সব আয়াত ও হাদীছ, যার মধ্যে কোন না কোন অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান আছে। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ

তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন কুরূ (قروء) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে (২ঃ ২২৮)। এ আয়াতে উল্লিখিত কুরূ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর এক অর্থ হায়েয এবং অন্য অর্থ তুহ্‌র (পবিত্রাবস্থা)। এখানে কোন্ অর্থটি উদ্দেশ্য হবে তাতে দ্বিধা বিদ্যমান। তাই আয়াতের যুক্তিযুক্ত অর্থ নিরূপণে ইজতিহাদ-এর প্রয়োজন, যা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন,

من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

'কোন ব্যক্তি যদি মুখাবারা (বর্গাচাষ) পরিত্যাগ না করে, তাহলে সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়[১]।'

এখানে অস্পষ্টতা এই যে, মুখাবারা (ভূমিচাষ ব্যবস্থা) বহু প্রকারের হতে পারে। যথা টাকার বিনিময়ে, ফসলের অংশের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানের ফসলের বিনিময়ে ইত্যাদি। এ হাদীছে কোন্ প্রকারের মুখাবারা উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, উক্ত আয়াত ও হাদীছে যে অস্পষ্টতা রয়েছে, তা নিরসনে প্রত্যেক ব্যক্তি হয়তো নিজ নিজ বিবেক ও বিবেচনা অনুযায়ী আমল করবে অথবা কোন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, এরূপ বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজের বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশংকা থাকে। অপরদিকে কুরআন ও হাদীছ বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণে সে আশংকা নেই। এই প্রেক্ষিতেই ইমাম চতুষ্টয়ের কোন একজনের তাকলীদ ও অনুসরণ করাকে সর্বসম্মত রায় অনুসারে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইমামের অনুসরণ করার মানে কুরআন ও হাদীছকে বাদ দেওয়া নয়। বরং কুরআন ও হাদীছের উপর আমল করার জন্যই কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাদের অনুসরণ করা। কেননা, তাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও হাদীছের উপর আমল করা সম্ভব নয়। বরং সেটা হবে নফ্‌সপরস্তী বা আত্মপূজা।[২]

১. আবূ দাউদ, বাবুল মুখাবারা, কিতাবুল বুয়ূ', পৃঃ ৪৮৩

২. তাকলীদের অর্থ মোদ্দা কথায় এরূপ- যে কোন জটিল বিষয়ে আমরা যেরূপ উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হই, কোন একটি কথা বুঝে না আসলে যেমন উস্তাদের নিকট হতে বুঝে নেই, তদ্রূপ কুরআন-হাদীছের সঠিক মর্ম উদ্ধার ও তদনুযায়ী আমল করার জন্য পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার উপর আস্থাভাজন ইমামের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তদনুযায়ী আমল করা। যে সব লোক তাকলীদের বিরুদ্ধে প্রলাপোক্তি করে, তারাও প্রকৃতপক্ষে তাকলীদ করে। যেমন এ হাদীছটি সহীহ্ বা যঈফ বা মুনকার, একথা আমি-আপনি কীভাবে বলতে পারি? সারা জীবন যারা এ বিষয়ে সাধনা করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, আমরা তো তাদের মতানুযায়ী এরূপ বলি, বুখারী শরীফে আছে, কাজেই সহীহ্। এ বিশ্বাস করলে আমরা কি ইমাম বুখারী (র)-এর অনুসরণ করছি না? হাদীছটির সহীহ্ হবার ব্যাপারে আমাদের তো সামান্যতম জ্ঞান নেই। বিশেষজ্ঞদের অভিমতই আমরা গ্রহণ করছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বস্তুত তাকলীদ দুই প্রকার ঃ (১) তাকলীদে মুতলাক, (২) তাকলীদে শাখসী। (১) তাকলীদে মুতলাক অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতের অনুসরণ করা। (২) তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ শরীআতের সামগ্রিক বিষয়ে নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ করা। স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর জীবদ্দশায় তাকলীদের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তখন সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেই সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর ওহীর মাধ্যমে নতুন বিষয়ে সমাধান লাভ করার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদের সূচনা হয়। তবে সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ তাকলীদে শাখসীর অনুসারী হলেও তাকলীদে মুতলাকই তখন অধিক প্রচলিত ছিল। এই তাকলীদে মুতলাকের ধারা ক্রমান্বয়ে তাকলীদে শাখসীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। হিজরী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী মাসাইলের প্রসারের ফলে বহু মাযহাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী- এই চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ (তাকলীদে শাখসী)-এর উপর মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা সংঘটিত হয়। বর্তমানে তাকলীদ বলতে তাকলীদে শাখসীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার উপর কুরআন এবং হাদীছেও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু এ দাবীটি যুক্তিসম্মতও বটে। কেননা, কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের সঠিক মর্ম উদ্ধার করে আমল করা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়[১]। তাই শরীআত মুতাবিক আমল করার জন্য কোন না কোন ইমামের অনুসরণ অবশ্যই অপরিহার্য।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'তোমরা যদি না জান, তবে আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।' (১৬ ঃ ৪৩)

এ আয়াতে যারা জানে না, তাদেরকে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকলীদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে হাদীছে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন,

انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدرا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر رضـ

'আমি জানি না, কতদিন তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে এই দুই জনের অনুসরণ (তাকলীদ) করবে। এই বলে তিনি হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর প্রতি ইংগিত করলেন[২]।

১. যে ব্যক্তি বা সত্ত্বা যত বড়, তার কলাম বা বাণীর অর্থও তত গভীর। "কুরআন মজীদকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে"- এর অর্থ উক্ত আয়াতেই উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ উপদেশগ্রহণ ও সতর্ক হবার জন্য। কেননা, পূর্ববর্তী কোন জাতি বা সম্প্রদায় নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায়, আল্লাহ্কে অস্বীকার করায়, তাঁর নাফরমানী করায়, তাদের পরিণাম এরূপ হয়েছে। যে কেউ উক্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করবে, তার পরিণামও এরূপ হবে, এতো স্বতঃসিদ্ধ কথা, সহজবোধ্য কথা।।

২. মিশকাত (তিরমিযী), পৃ. ৫৬০

এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরবর্তীতে দুই জন খলীফার প্রতি ইংগিত রয়েছে এবং তাঁদের খিলাফতকালে তাঁদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশও এই হাদীছে রয়েছে। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, এক সময় একজনই মাত্র খলীফা হয়ে থাকেন। দুইজন নয়। সুতরাং যিনি যখন খলীফা থাকবেন, তখন শুধুমাত্র তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, নির্দিষ্ট কোন একজনের কথা মান্য করাকেই তাকলীদে শাখসী বলে। উপরোক্ত হাদীছ থেকে তাকলীদ শাখসীর অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবেও প্রমাণিত। কেননা, পূর্ববর্তী মুসলমানদের সময়-কাল, নবী করীম (সা)-এর যুগের কাছাকাছি হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছিল না বললেই চলে। তারা সুবিধা লাভের নিমিত্তে "তাকলীদে মুতলাক" করতেন না। বরং যখন যে বিষয়ে যার ফায়সালা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন, তখন তারা তার ফায়সালা গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা লাভের নিমিত্তে নিজ নিজ চাহিদা মত বিভিন্ন মুজতাহিদের ফায়সালা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠে। এহেন অবস্থায় তাকলীদে মুতলাক অনুযায়ী যে কোন ইমামের অনুসরণের দ্বার অবারিত থাকলে শরঈ বিধি-বিধান খেল-তামাশায় পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়[১]। যেমন ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে তাতে উযূ ভঙ্গ হয় না, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উযূ ভঙ্গ হয়। অনুরূপ ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মহিলাদের শরীর স্পর্শ করলে তাতে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এতে উযূ ভঙ্গ হয় না। কোন ব্যক্তি যদি এই মত-পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় ইমাম শাফিঈ (র)-এর এবং মহিলাদের শরীর স্পর্শ করার অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসরণ করার দাবী করে, তবে তা বৈধ হবে না। কারণ, এরূপ করা সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক, এহেন সুবিধাবাদের দ্বারা শরীআতের মাসআলা-মাসাইল হালকা হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। এই জন্যই মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন এক ইমামের নির্দিষ্টভাবে তাকলীদ করা অপরিহার্য। উল্লিখিত কারণে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর উলামায়ে কিরামের যুগে তাকলীদে মুতলাকের অনুমতি রহিত হয়ে তাকলীদে শাখসী তথা চার ইমামের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই চার মাযহাবের অনুসারিগণ সকলেই আহলে হক এবং আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত।

১. এরূপ ক্ষেত্রে চার মাযহাব তো সামান্য কথা, চারশত, চার হাজার, চার লাখ মাযহাবের সৃষ্টি হবে। ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি ইসলামের অস্তিত্বই থাকবে না। পক্ষান্তরে মৌলিক বিষয়ে চার মাযহাবে ঐকমত্য রয়েছে। ছোট-খাটো বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। একে আমরা ঐক্যের মাঝে বৈচিত্র্য বলে আখ্যায়িত করতে পারি। যদি ফুলের রাজা গোলাপ, দ্বারা বাগানকে সাজানো হয়, তাহলে যেরূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তদপেক্ষা বাগান যদি গোলাপ, চামেলী চাপা ও পারুল বিচিত্র রং ও গন্ধের ফুল গাছ দ্বারা সাজানো হয়, তাহলে বাগানের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। সকল নবীর ধর্ম এক ও অভিন্ন বলে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য আয়াতে প্রত্যেকের পথ ও বিধি স্বতন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ ধর্মের মৌলিক বিষয় তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের উপর ঈমান আনয়ন, সত্য-সুন্দর, মিথ্যা পরিত্যাজ্য, চুরি অন্যায়, দান প্রশংসনীয় ও স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ, ব্যভিচার মহাপাপ, সালাত, যাকাত, সওম সকল নবীর ধর্মে বিদ্যমান ছিল। পালনের পদ্ধতিও সময় (অ: পৃ.: ২৮ দ্র:)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

ইলমে ফিকহ্-এর উপর আজ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করা হয়েছে এর মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী হচ্ছে অন্যতম। এটি হানাফী মাযহাবের একটি বিশ্ব-বিখ্যাত, সুবৃহৎ নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের জগদ্বিখ্যাত মোগল সম্রাট সুলতান মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব ওরফে বাদশাহ আলমগীর (র) এই বিশ্ব-বিখ্যাত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থখানা সংকলন ও সম্পাদনার ব্যবস্থা করেন। বস্তুত মোঘল সম্রাট বাদশাহ আকবরের "দীনে ইলাহী"-এর কারণে মুসলিম সমাজে কুফর -শিরক এবং অনৈসলামী কার্যকলাপের যে তুফান সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্তি দেওয়ার এক মহান চিন্তা বাদশাহ্ আলমগীর (র)-কে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছিল। তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, কেমন করে মুসলমানদেরকে অবক্ষয়ের এ অধঃপতন থেকে উদ্ধার করা যায়। বহু চিন্তা-ভাবনা করে এই সংস্কার কর্মের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি একটি ব্যাপক ফিকহ্ গ্রন্থ সংকলনের সিদ্ধান্ত করেন। তারপর অবিভক্ত ভারতের একুশটি প্রদেশের স্বামধন্য ফকীহ্, মুহাদ্দিছ ও উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে একটি ফিকাহ্ বোর্ড গঠন করে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এক সরকারী অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী সংকলন করার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

যিন্দাপীর বাদশাহ আলমগীর (র) কর্তৃক গঠিত এ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল সাত শত। শায়খ নিযাম উদ্দীন বুরহানপুরী (র) ছিলেন এই বোর্ডের প্রধান পরিচালক। বোর্ডে যে সব ফকীহ্ এবং উলামায়ে কিরাম ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা ওয়াজীহুদ্দীন, মাওলানা হামিদ জৌনপুরী, কাযী মুহাম্মদ হুসাইন জৌনপুরী, মাওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ জৌনপুরী, সায়্যিদ নিযামুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ জামিল সিদ্দীকী, মাওলানা মুহাম্মদ শফী সেরেহিন্দী, মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আবূ খায়ের, মাওলানা আল-ওয়ায়েয হরগামী, মাওলানা ওয়াজীহুর রব, মাওলানা যিয়াউদ্দীন, মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ কুনূজী, মাওলানা শায়খ রযীউদ্দীন ভাগলপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম লাহরী, মাওলানা মুহাম্মদ ফায়িক, কাযী আলী আকবর সা'দ উল্লাহ্ খানী, মাওলানা সায়্যিদ ইনায়েত উল্লাহ মুঙ্গেরী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ লাহরী, মাওলানা ফসীহ উদ্দীন, শায়খ আহমদ খতীব, মাওলানা মুহাম্মদ গাওছ, মাওলানা আমীর মীরা আল্লামা আল-ফারাহ্, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)-এর সাহেবযাদা শায়খ মা'সূম এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর পিতা মাওলানা শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (র) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

এ ফিকাহ্ কমিটির মধ্যে আবার বহু উপকমিটিও ছিল। তাদেরকে বিভিন্ন অধ্যায় সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কথিত আছে যে, সম্পাদনা বোর্ড পাণ্ডুলিপির কপি দেখে

(পূর্বে অঃ দ্রঃ) পদ্ধতিও সময় ইত্যাদিতে পার্থক্য ছিল। অনুরূপ চার মাযহাবেই ধর্মের মৌলিক বিষয়ে ঐক্য ও অভিন্নতা রয়েছে। ছোট-ছোট ব্যাপারে পার্থক্য, নামাযে সকল মাযহাবেই রুকূ করা ফরয। কিন্তু রুকূতে যাবার আগে ও পরে দু'হাত উঠানো উত্তম কি না উঠানো উত্তম এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনার পার্থক্যে মতের পার্থক্য হয়েছে। এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (মানব প্রকৃতির পার্থক্যের কারণে) অভিপ্রায় ছিল। একেই আমরা ঐক্যের মাঝে বৈচিত্র্য রূপে অভিহিত করেছি। জ্ঞানী লোকের জন্য এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যই যথেষ্ট।

দেওয়ার পর চূড়ান্তভাবে দেখে দিতেন বাদশাহ আলমগীর (র)। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তাঁর পিতার সূত্রে "আনফাসুন আরিফীন'-এর মধ্যে এ কথা উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ আট বছর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে তারা ছয় জিলদে এ কিতাবটি সমাপ্ত করেন। মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকেই এ অভিমত পোষণ করেন যে, বাদশাহ আলমগীর যদি দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন নাও হতেন, তথাপি তিনি এই মহা মূল্যবান ফাতাওয়া গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনার কারণেই মুসলিম জাহানে অমর হয়ে থাকতেন। এই কিতাবটির বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১. এই কিতাবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রত্যেকটি মাসআলা ও ফাতাওয়া হাওয়ালাসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এতে তাহারাত (পবিত্রতা) হতে আরম্ভ করে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুআমালাত-লেনদেন, মুআশারা- আচার-আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি তথা মানব জীবনের যাবতীয় বিধি-বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩. কাযী বা বিচারকের জন্য যেমন এতে সুবিচারের যাবতীয় বিধি-বিধান রয়েছে, অনুরূপভাবে একজন মুফতীর জন্যও রয়েছে এতে নিখুঁতভাবে ফাতওয়া প্রদানের বিশুদ্ধ মাসআলা-মাসাইল।

৪. মাসআলা-মাসাইলের জন্য এটি একটি বিশ্বকোষ। এ কারণেই আরব-আজম সকলের কাছে এটি সমভাবে সমাদৃত। আরবের লোকদের নিকট এটি "আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা" নামে পরিচিত।

৫. এই কিতাব থেকে সাধারণ মুসলমান, আলিম, ফকীহ্, কাযী, রাষ্ট্রপ্রধান সকলেই উপকৃত হতে পারেন[১]।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
মুহতামিম
দারুল কুরআন শামসুল উলূম মাদ্রাসা
চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৭।

১. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, উর্দু, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা। দুরূদ ও সালাম আমাদের ও রাসূলগণের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবার প্রতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় ঃ তাহারাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ তাহারাত

[এই অধ্যায়ে রয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ এবং পাঁচটি অনুচ্ছেদ ঃ]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ উযূর বিবরণ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ উযূর ফরযসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে (৫ ঃ ৬)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উযূর ফরয চারটি।

প্রথম ফরয ঃ মুখমণ্ডল ধৌত করা

১. মাসআলা ঃ সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। ধৌত করা অর্থ পানি বাইয়ে দেয়া। আর মাসেহ অর্থ সিক্ত হস্তের স্পর্শ। (ভেজা হাত দ্বারা শরীর মুছে নেয়া –হিদায়া)। শরহুত তাহাবী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে উযূর মধ্যে পানি বাইয়ে দেয়া শর্ত। সুতরাং উযূর অঙ্গ হতে পানি গড়িয়ে পড়া ব্যতিরেকে উযূ সহীহ্ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে পানি গড়িয়ে পড়া শর্ত নয়। বরফের দ্বারা উযূ করলে দুই বা ততোধিক ফোঁটা গড়িয়ে পড়লে সর্বসম্মতিক্রমে উযূ সহীহ্ হয়ে যাবে। এরূপ না হলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং মুহাম্মদ (র)-এর মতে উযূ জাইয হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উযূ জাইয হবে (যখীরা গ্রন্থ দ্রঃ)। পূর্বোক্ত ইমামদ্বয়ের মতই বিশুদ্ধ (মুযমারাত)। যাহিরী রিওয়ায়েতের মধ্যে মুখমণ্ডলের সীমা

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লেখ করা হয়নি (বাদাইউস সানাই গ্রন্থ দ্রঃ)। আল-মুগনী গ্রন্থে মুখমণ্ডলের সীমা নিরূপণ করে বলা হয়েছে যে, মাথার চুল উদগত হবার স্থান থেকে দাড়ি ও চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের গোড়া থেকে অন্য কানের গোড়া পর্যন্ত পূর্ণ মুখমণ্ডল (আয়নীর শরহে হিদায়া গ্রন্থ)। টাক বা এ ধরনের কোন কারণবশত যদি মাথার অগ্রভাগের চুল উঠে যায়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ স্থানে পানি পৌঁছনো ওয়াজিব নয় (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত। (যাহিদী গ্রন্থ দ্র.) চেহারাতে নেমে আসা চুলের এ অংশ যা মাথার সাধারণ সীমা হতে নীচে নেমে আসে তা ধৌত করা ওয়াজিব (আয়নী ঃ শরহে হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ চোখের ভেতরে, অংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়, সুন্নাতও নয়। চোখের কোণে এবং এর চতুষ্পার্শ্বে পানি পৌঁছানোর জন্য কষ্ট করে চক্ষু বন্ধ করা ও খোলার প্রয়োজন নেই (যহীরিয়া)। ফকীহ্ আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)-এর মতে মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় কেউ যদি তার চোখ শক্তভাবে বন্ধ রাখে, তবে তার উযূ সহীহ্ হবে না (মুহীত)। চোখের কোণে পানি পৌঁছনো ওয়াজিব (খুলাসা)। পীড়ার কারণে চোখে যদি পিচুট জমে যায় এবং অবস্থা এমন হয় যে, চোখ বন্ধ করলে পিচুট চোখের বাইরে বেরিয়ে থাকে, তবে পিচুটির নীচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এরূপ না হলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয় (যাহিদী)।

৩. মাসআলা ঃ ওষ্ঠদ্বয় মিলিয়ে রাখলে যে অংশটুকু প্রকাশমান থাকে তা মুখমণ্ডলের মধ্যে শামিল, আর মুখ বন্ধ রাখার সময় যে অংশটুকু অপ্রকাশমান থাকে তা মুখের ভেতরের অংশের মধ্যে শামিল। এটাই বিশুদ্ধ মত। (খুলাসা)। কান বরাবর গণ্ডদেশে উদ্‌গত চুল এবং কানের লতিকার মধ্যস্থিত শুভ্রস্থান উযূর সময় ধৌত করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভী (র) তৎপ্রণীত গ্রন্থে এ মতটি উল্লেখ করে বলেছেন, এটাই বিশুদ্ধ মত। আমাদের অধিকাংশ মাশায়িখ এ মতই ব্যক্ত করেছেন (যখীরা)।

৪. মাসাআলা ঃ গোঁফ, চোখের ভ্রূ এবং চিবুকের উপরের দাড়ি ধৌত করতে হবে। অবশ্য দাড়ির চুল উদ্‌গত হওয়ার স্থানে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। তবে দাড়ি পাতলা হলে এবং দাড়ির ফাঁক দিয়ে দাড়ি উদ্‌গত হওয়ার স্থান দেখা গেলে এই স্থানেও পানি পৌঁছানো জরুরী (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "নিসাব" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উযূকারীর গোঁফ লম্বা হলে এবং উযূ করার সময় এর নীচে পানি না পৌঁছলে উযূ শুদ্ধ হবে। এটাই গৃহীত মত। কিন্তু এরূপ অবস্থায় গোসল শুদ্ধ হবে না। (মুযমারাত গ্রন্থ)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দাড়ির চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা ফরয (শরহে বেকায়া)। অপর বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে দাড়ির উপর পানি বাইয়ে দেয়া ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন গ্রন্থ)। এ মতটিই শুদ্ধ (যাহিদী গ্রন্থ)। থুতনির নীচে উত্থিত ঝুলন্ত দাড়ি ধৌত করা ওয়াজিব নয়। (মুহীত কিতাবদ্বয়)। থুতনির উপর উত্থিত দাড়িতে পানি প্রবাহিত করার পর তা মুণ্ডিয়ে ফেললে পুনরায় থুতনি ধৌত করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে ভ্রূ, গোঁফ বা মাথা মাসেহ্ করার পর এ স্থানসমূহ মুড়িয়ে চেছে ফেললে অথবা উযূ করার পর নখ কাটলে এ স্থানগুলো পুনরায় ধৌত করার প্রয়োজন নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

দ্বিতীয় ফরয ঃ উভয় হাত ধৌত করা

৫. মাসআলা ঃ হানাফী মাযহাবের তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হাত ধোয়ার মধ্যে কনুইও শামিল (মুহীত)। যদি কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে অতিরিক্ত কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তাও ধৌত করা ওয়াজিব। যেমন অতিরিক্ত অঙ্গুলি বা অতিরিক্ত হাতুলী (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কারো কাঁধে দু'টি হাত থাকে, তবে যে হাতটি পূর্ণাঙ্গ মূল হাত সাব্যস্ত হবে তা ধৌত করা ওয়াজিব হবে। আর অপূর্ণাঙ্গ হাতটি অতিরিক্তি বলে বিবেচিত হবে। এর যে অংশটুকু (উযূর) ফরয অঙ্গের সমান সমান থাকবে ঐ অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজিব। আর বাকী অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজিব নয় (ফাত্হুল কাদীর)। বস্তুত এ অংশটুকু ধৌত করা মুস্তাহাব (বাহ্‌রুর রাইক)।

৬. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে মা ওয়ারাউন্ নাহ্‌রে বর্ণিত আছে যে, উযূর স্থানের কোন জায়গা যদি সূচ্যগ্র পরিমাণ শুকনা থাকে অথবা নখের গোড়ায় শুক্‌না বা ভিজা মাটি লেগে থাকে, তবে উযূ সহীহ্ হবে না। হাতে যদি আটার খামীর অথবা মেহেদী লেগে থাকে, তবে উযূ শুদ্ধ হবে। আল্লামা দাবূসী (র)-কে প্রশ্ন করা হল, কোন ব্যক্তি আটার খামীর তৈরী করার পর তার হাতে যদি আটার খামীর লেগে তা শুকিয়ে যায় অতঃপর সে উযূ করে তাতে তার উযূ শুদ্ধ হবে কি? উত্তরে তিনি বললেন, আটার পরিমাণ যদি কম হয়, তবে শুদ্ধ হবে (যাহিদী)। নখের নীচের অংশ উযূতে ধৌত করতে হবে। নখের নীচে যদি আটা লেগে থাকে, তবু নখের নীচে পানি পৌঁছাতে হবে (খুলাসা এবং নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্ গ্রন্থ)। শায়খ ইমাম যাহিদ আবূ নাস্‌র আস্‌সাফ্‌ফার (র) তৎপ্রণীত ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নখ যদি এমন লম্বা হয় যে, এতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ঢেকে যায় তবে নখের নীচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। নখ ছোট হলে নখের নীচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। নখ লম্বা হয়ে যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগ ছাড়িয়ে যায়, তবে নখের নীচে পানি পৌঁছাতে হবে (ফত্হুল কাদীর)। জামে সগীরে বর্ণিত আছে, একদা ফকীহ্ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কারো নখ লম্বা থাকে এবং নখের নীচে ময়লা থাকে বা কেউ যদি মাটির কাজ করে অথবা কোন মহিলা যদি তার অঙ্গুলিতে মেহেদী ব্যবহার করে থাকে অথবা কেউ যদি চামড়া পাকা করার কাজ করে বা রং-এর কাজ করে, তবে তাদের উযূ শুদ্ধ হবে কি? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের সকলের উযূই শুদ্ধ হবে। কেননা, এ সব কর্মকাণ্ড হতে বেঁচে থাকা খুবই দুষ্কর। "তাদের সকলের উযূই শুদ্ধ হবে" এ কথার উপরই ফাতওয়া। এ ক্ষেত্রে শহরে ও গ্রাম্য মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি (যখীরা)। বড় নখ বিশিষ্ট রুটি বিক্রেতার হুকুমও তাই। (যখীরা ঃ আল জামিউল আসগার)। খিযাব শুকিয়ে জমে গেলে উযূ-গোসল কিছুই শুদ্ধ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ঃ ওয়াজীয এর সূত্রে)।

৭. মাসআলা ঃ আংটি ঢিলা থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে উযূ করা সুন্নাত। আর আংটি সংকীর্ণ বা আঙ্গুলের সাথে লাগানো থাকলে এবং এ অবস্থায় আংটির নীচে পানি না পৌঁছলে, আংটি নাড়াচাড়া দিয়ে এর নীচে পানি পৌঁছানো ফরয (খুলাসা)। যাহিরী রিওয়ায়াতেও এ কথা বর্ণিত আছে (মুহীত)।

pdf By Syed Mostofa Sakib

তৃতীয় ফরয ঃ উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা

৮. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) তথা আমাদের উপরোক্ত ইমামত্রয়ের মতে উভয় টাখনু পা ধৌত করার মধ্যে শামিল। পায়ের পাতা এবং নালার মধ্যস্থিত বেড়ে উঠা উঁচু হাড্ডিটিকে "কা'ব" অর্থাৎ টাখনু বলা হয় (মুহীত)। যদি কারো হাত কনুইসহ এবং পা টাখনু সহ কেটে যায়, তবে এ আর ধৌত করার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যদি কিছু অংশ বাকী থাকে, তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব (আল্ বাহ্রুর রাইক)। অনুরূপভাবে যে অঙ্গ হতে কিছু অংশ কেটে যায় তাও ধৌত করা ওয়াজিব (মুহীত)। "ইয়াতীমা" নামক ফিক্হ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আল্লামা খাজনাদী (র)-কে একদা প্রশ্ন করা হল যে, কারো পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার ফলে তা যদি এমনভাবে কেটে ফেলা হয় যে, তা এখন আর বুঝাই যাচ্ছে না তবু কি উভয় পা ধৌত করা তার উপর ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ অবস্থায়ও ওয়াজিব (তাতার খানিয়্যা)। কোন ব্যক্তি যদি উভয় পায়ে তৈল মালিশ করে উযূ করে এবং উভয় পায়ের উপর পানি বাইয়ে দেয়, এমতাবস্থায় চর্বির কারণে পানি যদি চর্ম স্পর্শ না করে, তবু উযূ শুদ্ধ হবে। "মাজমূউন্ নাওয়াযিল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পা কেটে যাওয়ার পর এতে চর্বি লাগিয়ে কেউ যদি উযূ করে এবং পানি যদি চর্বির নীচ পর্যন্ত না পৌছে তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, চর্বির নীচে পানি পৌছানো ক্ষতিকর কিনা? যদি ক্ষতিকর হয়, তবে উযূ হবে। আর যদি ক্ষতিকর না হয়, তবে উযূ শুদ্ধ হবে না (মুহীত)। চর্বির উপর সেলাই থাকলে সর্বাবস্থায়ই উযূ শুদ্ধ হবে (খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, শরীরের ঘা বা কাটা অংশ ধৌত করা অসম্ভব হলে তা ধৌত করা ফরয নয়। বরং এর উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে দিবে। যদি পানি গড়িয়ে দেয়াও অসম্ভব হয়, তবে এরূপ অবস্থায় মাসেহ্ করাই যথেষ্ট হবে, মাসেহ্ করাও যদি অসম্ভব হয় তবে মাসেহ্ করবে না। বরং এ স্থানটি বাদ দিয়ে এর চতুষ্পার্শ ধৌত করে নিবে (যখীরা)। কারো উযূর স্থানে ফোঁড়া ছিল। অতঃপর তা শুকিয়ে যদি এক কোণ ব্যতীত পূর্ণ চামড়া উঠে যায় এবং ঐ কোণ হতে পুঁজ নির্গত হয় এমতাবস্থায় উযূতে চামড়া ধৌত করার পর পানি যদি চামড়ার নীচে না পৌছে, তবু তার উযূ সহীহ হবে। কেননা, চামড়ার নীচের অংশ এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাই চামড়ার নীচের স্থানটি ধৌত করা ফরয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি উযূর অঙ্গে কোন স্থানে ফোড়া থাকে এবং এর উপর যদি শুকনো খোসার ন্যায় থাকে এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি উযূ করে এবং চামড়ার উপর পানি বাইয়ে দিয়ে খোসাটি তুলে ফেলে, তাহলে খোসার নীচের অংশ পুনরায় ধৌত করতে হবে কি? এরূপ প্রশ্ন করা হলে এর উত্তরে বলা হবে যে, এ অবস্থায় লক্ষ্য করতে হবে যে, যদি পূর্ণ আরোগ্যের পর চামড়া এমনভাবে উঠিয়ে ফেলা হয় যে, এতে তার কোন কষ্ট হয়নি, তবে এ স্থানটি পুনরায় ধৌত করা জরুরী। আর যদি পূর্ণ আরোগ্য লাভের পূর্বে চামড়া টেনে উঠিয়ে ফেলা হয় এবং এতে তার কষ্ট হয় এবং এ ফোড়া থেকে যদি কোন কিছু বের হয়ে গড়িয়ে পড়ে, তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি কোন কিছু বের না হয়, তবে এ স্থান পুনরায় ধৌত করতে হবে না। বর্ণিত উভয় অবস্থায় উক্ত স্থানটি ধৌত করা জরুরী নয়। এটাই যথার্থ বক্তব্য।

১০. মাসআলা ঃ ইমাম রুকনুল ইসলাম (র) কর্তৃক প্রণীত ফাওয়াইদুল কাযীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কারো উযূর অঙ্গে মশা-মাছির মল লেগে থাকে এমতাবস্থায় উযূ করার পর উযূর পানি যদি এ সবের নীচে না পৌছে, তবু উযূ শুদ্ধ হবে। কেননা, এর থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। আর কারো উযূর অঙ্গে যদি মাছের আইস বা চিবানো রুটি লেগে শুকিয়ে যায় এমতাবস্থায় উযূ করার পর উযূর পানি যদি এর নীচে না পৌছে, তবে উযূ শুদ্ধ হবে না। কেননা, এর থেকে বেঁচে থাকা সহজ (মুহীত)। উযূর অঙ্গের কোন অংশ যদি শুকনা থেকে যায়, এতে পানি না পৌছে, তবে অন্য অংশের পানি এসে যদি তা ভিজিয়ে দেয়, তবে এ উযূ শুদ্ধ হয়ে যাবে (খুলাসা)। উযূর কোন অঙ্গ শুকনা থাকার পর অন্য অঙ্গের পানি দ্বারা যদি তাকে ভিজিয়ে দেয়া না হয়, তবে উযূ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকলে গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে (যাহীরিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি বৃষ্টির পানিতে ভিজে যায় অথবা কেউ যদি প্রবাহিত নহর বা খালে পতিত হয়, তবে তার উযূ হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় যদি পানি সমস্ত শরীরে পৌছে যায়, তবে (ফরয) গোসলও শুদ্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া তার জন্য আবশ্যক (সিরাজিয়্যা)।

চতুর্থ ফরয ঃ মাথা মাসেহ করা

১২. মাসআলা ঃ মাথার অগ্রভাগ পরিমাণ মাসেহ্ করা ফরয (হিদায়া)।'মাথার অগ্রভাগ' পরিমাণ অঙ্গ মাথার চার ভাগের এক ভাগ (আলইখতিয়ার শরহিল মুখতার)। বিশুদ্ধতম মতানুসারে হাতের তিন অঙ্গুলি পরিমাণ মাসেহ্ করা ফরয (কিফায়া)। যদি কোন ব্যক্তি এক বা দুই আঙ্গুল দিয়ে মাথা মাসেহ্ করে তবে উযূ জাইয হবে না (যাহিরুর রিওয়ায়েত)। "শরহুত্ তাহাবী" কিতাবেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি খোলা অবস্থায় রেখে উভয় আঙ্গুলের মধ্যস্থিত হাতের তালুসহ যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মাথা মাসেহ্ করে তবে তার উযূ সহীহ্ হবে। কেননা, উভয় আঙ্গুলের মধ্যস্থিত হাতের তালু এক আঙ্গুলের মত। এ হিসাবে তিন আঙ্গুল হয়ে যায় (মুহীত ও কাযীখান)। পানি ফোঁটা ফোঁটা পতিত হওয়া অবস্থায় কেউ যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে মাথা মাসেহ্ করে, তবে মাসেহ্ জাইয হবে। অন্যথায় জাইয হবে না (যখীরা)। কারো মাথায় যদি লম্বা চুল থাকে এবং সে তিন আঙ্গুল দ্বারা তা মাসেহ্ করে, তবে মাথার উপরস্থ চুলের উপর মাসেহ্ করলে তার মাসেহ্ শুদ্ধ হবে। আর যদি সে কপাল বা ঘাড়ের উপরস্থ চুলের উপর মাসেহ্ করে, তবে তার মাসেহ্ সহীহ্ হবে না। যদি মাথার উভয় পার্শ্বে বেণী বাঁধা থাকে, যেমন মেয়েলোকদের থাকে, এমতাবস্থায় বেণীর অগ্রভাগ মাসেহ্ করলে, বেণী যদি লটকানো না থাকে, তবে কোন কোন আলিমের মতে উযূ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সে মাথার উপরস্থ চুলের উপর মাসেহ্ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে বেণী লটকানো থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই উযূ শুদ্ধ হবে না (মুহীত)। উভয় কান মাসেহ্ করার দ্বারা মাথা মাসেহ্ আদায় হবে না (সিরাজিয়্যা)। হাতের তালু যদি ভিজা থাকে এবং এর দ্বারা যদি মাথা মাসেহ্ করা হয়, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে। চাই পানি পাত্র হতে গ্রহণ করা হোক বা হস্ত ধৌত করার পর হাতের আর্দ্রতা থেকে গ্রহণ করা

pdf By Syed Mostofa Sakib

হোক, উভয় অবস্থাতেই উযূ দুরুস্ত হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু মোযার উপর মাসেহ্ করার পর হাত যদি ভিজা থাকে, তবে এর দ্বারা মাথা মাসেহ্ করা দুরুস্ত হবে না। অনুরূপভাবে মাথা মাসেহ্ করার পর হাত যদি ভিজা থাকে, তবে এর দ্বারা মোযার উপর মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না (খুলাসা)। কোন ভিজা অঙ্গ হতে হাত ভিজিয়ে মাথা মাসেহ্ করলে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না। চাই সে অঙ্গটি উযূতে ধৌত করা হয় এমন অঙ্গ হোক বা উযূতে মাসেহ্ করা হয় এমন অঙ্গ হোক (যখীরা)। কেউ যদি বরফ দ্বারা মাথা মাসেহ্ করে, তবে মাসেহ্ সহীহ হবে। চাই তা বিগলিত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ুক বা না পড়ুক (আল্ ফাতাওয়াল বুরহানিয়্যা)। যদি কেউ মুখমণ্ডলের সাথে মাথা ধুয়ে নেয়, তবে মাসেহ্ হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। কেননা, এরূপ করা শরীআতের বিধানের পরিপন্থী (মুহীত)। যদি কারো মাথার কিছু অংশ মুণ্ডনো থাকে এমতাবস্থায় সে যদি যে অংশটি মুণ্ডানো নয় এর উপর মাসেহ্ করে, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। হুজ্জাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ্ না করে যদি কোন ব্যক্তি মাথার পেছনের অংশ অথবা ডান বা বাঁ দিকে কিংবা মাথার মধ্যাংশে মাসেহ্ করে, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে (তাতারখানিয়্যা)। টুপি ও পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য মাথার ওড়নার উপর মাসেহ্ করাও জায়েয নেই। হ্যাঁ পানি যদি ফোটা ফোটা করে এমনভাবে গড়িয়ে পড়ে যে, এতে মাথার চুল ভিজে যায় তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে (খুলাসা)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পানি রঙ্গীন না হয় (যহীরিয়া)। ওড়নার নীচে মাসেহ্ করাই মহিলাদের জন্য উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন মহিলার মাথায় যদি খেযাব থাকে এবং সে যদি এর উপর মাসেহ্ করে, তবে তার হাতের আর্দ্রতা খেযাবের সাথে মিশে যদি সাধারণ পানির হুকুম থেকে বেরিয়ে যায়, তবে এ মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না (খুলাসা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উযূর সুন্নাতসমূহ

[মূল গ্রন্থসমূহের বর্ণনায় উযূর সুন্নাত তেরটি]

এক ঃ বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।

১.মাসআলা ঃ বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা উযূর মধ্যে সর্বাবস্থায় সুন্নাত। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তির সাথে এ হুকুম খাস নয়। উযূ আরম্ভ করার সময়ই বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নাত। যদি কোন ব্যক্তি উযূর শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ বলা ভুলে যায়, অতঃপর কয়েক অঙ্গ ধৌত করার পর স্মরণ হয় এবং বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করে নেয়, তবে এতে সুন্নাত আদায় হবে না। কিন্তু খানা খাওয়ার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম (তাবঈন গ্রন্থ)। কোন ব্যক্তি যদি উযূর প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ্ বলা ভুলে যায়, তবে উযূ শেষ করার পূর্বে স্মরণ হওয়া মাত্রই বিস্মিল্লাহ্ পড়ে নিবে। যেন উযূ বিস্মিল্লাহ্ পাঠের এ সুন্নাত থেকে খালি না হয়ে যায় (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ইস্তিন্জা করার পূর্বে ও পরে বিস্মিল্লাহ্ পড়ে নিবে। এটাই বিশুদ্ধ মত (হিদায়া)। সতর খোলা অবস্থায় এবং নাপাকীর স্থানে বিস্মিল্লাহ্ পড়বে না। (ফাত্হুল কাদীর)। ইমাম তাহাবী ও আল্লামা ফখরুদ্দীন আল্-মাতামরাগী

(র) বলেন, পূর্বসূরী আলিমদের থেকে উযূর শুরুতে بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ দু'আটি পাঠ করা বর্ণিত আছে। খাব্বাযিয়্যার বর্ণনা মতে, এরূপ নিয়মে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে (মি'রাজুদ দিরায়া)। যদি কোন ব্যক্তি উযূর শুরুতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বা اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পড়ে, তবে বিস্মিল্লাহ্ পাঠের সুন্নাত আদায় হয়ে যবে (কিনায়া)।

দুই ঃ উযূর প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

২. মাসআলা ঃ কারো কারো মতে হাত ধৌত করা ফরয। তবে প্রথমে ধৌত করা সুন্নাত। ইমাম ফাতহুল কাদীর, মি'রাজুদ্দিরায়া এবং খাব্বাযিয়াতে এ মতটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক প্রণীত (ফিকহের ছয় কিতাব)-এ এ কথার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে (আল বাহরুর রাইক)। হাত ধৌত করার সুন্নাত তরীকা এই যে, পানির পাত্র যদি ছোট হয়, তবে বাম হাতে তা ধরে ডান হাতের উপর তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর ডান হাত দ্বারা পাত্র ধরে বাম হাতের উপরও অনুরূপভাবে তিনবার পানি ঢালবে। যদি পানির পাত্র বড় হয় এবং এর সাথে পানি তোলার যদি ছোট পাত্র থাকে, তবে পূর্বের ন্যায় করবে। আর যদি বড় পাত্রের সাথে পানি তোলার ছোট পাত্র না থাকে, তবে বাম হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করে পাত্রের ভেতর ঢুকিয়ে হাতে পানি নিয়ে ডান হাতের উপর ঢালবে এবং এক আঙ্গুল দ্বারা অন্য আঙ্গুল মলে পরিষ্কার ও পবিত্র করে নিবে। এরপর ডান হাত পাত্রে ঢুকিয়ে পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করে নিবে (মুযমারাত)। এ হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যদি হাতে কোন নাপাকী না থাকে। হাতে যদি নাপাকী থাকে, তবে তা অন্য উপায়ে পাক করে নিতে হবে (খুলাসা)। হাত ইস্তিনজা করার পূর্বে ধৌত করা হবে, না পরে ধৌত করা হবে, এ বিষয়ে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে হাত দুইবার ধৌত করা হবে। একবার ইস্তিনজা করার পূর্বে এবং একবার ইস্তিনজা করার পর (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

তিন ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

৩. মাসআলা ঃ সুন্নাত হল, প্রথমে তিনবার কুলি করা ও তিনবার নাকে পানি দেয়া এবং উভয় কাজের জন্য নতুন পানি ব্যবহার করা (মুহীত ঃ ইমাম সূরুখসী (র))। কুলি করার নিয়ম হল, মুখ ভরে পানি নিয়ে কুলি করা। নাকে পানি দেয়ার নিয়ম হল, নাকের নরম গোশত পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে দেয়া (খুলাসা)। উযূতে কেউ যদি কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া বর্জন করে, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে সে গুনাহ্গার হবে। কেননা, উপরোক্ত আমল দুটো উযূতে সুন্নাতে মুআক্কাদা। সুতরাং এ কাজ বর্জন করা বে-আদবীর শামিল। অবশ্য সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। এ কাজ বর্জন করাতে বে-আদবী হবে না (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন ব্যক্তি যদি একবার হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করে, তবে জাইয আছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি একবার হাতে পানি নিয়ে তিনবার নাকে পানি দেয়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, নাকে পানি দেয়ার সময় ব্যবহৃত পানি পুনরায় হাতে ফিরে আসে। কিন্তু কুলি করার সময় এমনটি হয় না

pdf By Syed Mostafa Sakib

(মুহীত)। কোন ব্যক্তি যদি হাতে পানি নিয়ে কিছু পানি দ্বারা কুলি করে এবং কিছু পানি নাকে দেয়, তবে জাইয আছে। কিন্তু এর বিপরীত করা জাইয নেই (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

চার ঃ মিসওয়াক করা

৪. মাসআলা ঃ তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক তৈরী করা ভাল। কেননা, তিক্ত বস্তু দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁত মযবূত হয় এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। মিসওয়াকের ডাল তাজা হওয়া ভাল এবং তা লম্বায় এক বিঘত ও পরিধিতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। সাধারণ অবস্থায় মিসওয়াকের ক্ষেত্রে অঙ্গুলি ডালের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। কিন্তু ডাল না পাওয়া অবস্থায় ডান হাতের অঙ্গুলি ডালের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে (মুহীত ও যহীরিয়া)। মহিলাদের ক্ষেত্রে লাসাযুক্ত দ্রব্য মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে (আল বাহরুর রাইক)। মিস্ওয়াক করার মুস্তাহাব তরীকা হচ্ছে ডান হাত দিয়ে মিসওয়াক এমনভাবে ধরবে যেন, কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি মিসওয়াকের অগ্রভাগের নীচে এবং অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো মিসওয়াকের উপরে থাকে (আন্-নাহরুল ফাইক)। কুলি করার সময়ই মিসওয়াক করার সময় (নিহায়া)। দাঁতের উপরের পাটিতে মিসওয়াক করবে এবং নীচের পাটিতেও। ডানদিক থেকে প্রস্থ হতে মিসওয়াক করতে হবে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যদি কারো মিসওয়াক করার কারণে বমি হওয়ার আশংকা থাকে, তবে সে মিসওয়াক করা বর্জন করবে। কাত হয়ে শুয়ে মিসওয়াক করা মাকরূহ্ (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

পাঁচ ঃ দাড়ি খিলাল করা

৫. মাসআলা ঃ জামিউস্ সগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ফকীহ্ কাযীখান উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করার পর দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত। এ মতটিই গ্রহণযোগ্য (যাহিদী)। "মাবসূত" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত (মি'রাজুদ্ দিরায়া)। দাড়ি খিলাল করার নিয়ম হল, দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে নীচের দিক থেকে উপরের দিক নিয়ে যাওয়া। শামসুল আইম্মা কুরদুরী (র) থেকে এ কথাটি বর্ণিত আছে (মুযমারাত)।

ছয় ঃ অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করা

৬. মাসআলা ঃ অঙ্গুলি খিলাল করার নিয়ম হল, এক হাতের ভিজা অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মাঝে ঢুকিয়ে খিলাল করা। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ একমত যে, অঙ্গুলি খিলাল করা সুন্নাতে মুআক্কাদা (আন্ নাহ্রুল ফাইক)। যদি অঙ্গুলির ফাঁকে পানি পৌঁছে যায়, তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর পানি যদি অঙ্গুলির ফাঁকে না পৌঁছে বরং অঙ্গুলি যদি মিলিত অবস্থায় থাকে, তবে অঙ্গুলিসমূহের ভেতরে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব (তাবয়ীন)। অঙ্গুলি পানির ভেতর ডুবিয়ে উযূ করা অবস্থায় অঙ্গুলি খিলাল করার প্রয়োজন নেই। যদিও এ পানি প্রবহমান না হয়। হাতের অঙ্গুলি খিলাল করার উত্তম তরীকা হল, এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া। এবং পায়ের অঙ্গুলি খিলাল করার ক্ষেত্রে উত্তম নিয়ম হল, বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ডান

পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হতে খিলাল আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গিয়ে শেষ করা (আন্-নাহ্-রুল ফাইক)। হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলের নীচের দিক থেকে ঢুকিয়ে খিলাল করবে (মুযমারাত)।

সাত ঃ উযূর মধ্যে যেসব অঙ্গ ধৌত করা ফরয যেমন হাত, মুখমণ্ডল এবং উভয় পা এগুলো তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাত (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ প্রথমবার পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা ফরয (যহীরিয়া)। বিশুদ্ধ মতানুসারে পরের দুইবার হল সুন্নাতে মুআক্কাদা (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করার মানে হল, উযূর অঙ্গে এমনভাবে পানি পৌঁছানো যেন পানি পৌঁছে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে (খুলাসা)। "ফাতাওয়ায়ে হুজ্জাত" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উযূর অঙ্গসমূহ প্রত্যেকবার এমনভাবে ধৌত করা উচিত যেন যে অঙ্গ যতটুকু ধৌত করা ফরয, ততটুকু পরিমাণ অংশে যেন যথাযথভাবে পানি পৌঁছে যায়। যদি প্রথমবার ধৌত করার পর কিছু অংশ শুকনা থেকে যায়,এরপর আবার ধৌত করা হয় এবং এবারও যদি কিছু অংশ শুকনা থাকে, এরপর আবারো ধৌত করা হয়, তবে এতে তিনবার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হবে না (মুযমারাত)। পানি কম থাকার কারণে অথবা ঠাণ্ডার কারণে বা অন্য কোন প্রয়োজনে কেউ যদি এক এক বার করে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করে, তবে মাকরূহ হবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহ্গারও হবে না। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত একবার করে অঙ্গসমূহ ধৌত করে উযূ করলে উযূকারী ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে (মিরাজুদ দিরায়া)। সন্দেহের অবস্থায় মনের প্রশান্তি লাভের জন্য বা দ্বিতীয় বার উযূ করার নিমিত্তে তিনবারের অধিক ধৌত করা জাইয আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই (নিহায়া ও আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

আট ঃ সমস্ত মাথা একবার মাসেহ্ করা (মূল গ্রন্থসমূহ)

৮. মাসআলা ঃ মাসেহ্ করার নিয়ম হল, উভয় হাতের তালু এবং অঙ্গুলিসমূহ মাথার সম্মুখভাগে রেখে এমনভাবে পেছনের দিকে টেনে নিবে যেন সমস্ত মাথা মাসেহ্ হয়ে যায়। এরপর দুই আঙ্গুল দ্বারা উভয় কান মাসেহ্ করবে। এতে পানি 'ব্যবহৃত পানি' হিসাবে গণ্য হবে না (তাবয়ীন)। যদি কোন ব্যক্তি ওযর ব্যতীত সর্বদা পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা বর্জন করে, তবে সে গুনাহ্গার হবে (কিনয়া)।

নয় ঃ উভয় কান মাসেহ্ করা

৯. মাসআলা ঃ উভয় কানের সম্মুখভাগ এবং পেছনের ভাগ মাথা মাসেহের পানি দ্বারা মাসেহ্ করা (শরহুত তাহাবী)। মাথা মাসেহের পানি নিঃশেষ না হওয়া অবস্থায় কেউ যদি কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়, তবে এটা ভাল (আল বাহ্রুর রাইক)। কোন ব্যক্তি যদি মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় কানের সম্মুখ ভাগ মাসেহ্ করে এবং মাথা মাসেহ্ করার সময় পেছনের ভাগ মাসেহ্ করে, তবে জাইয আছে। কিন্তু প্রথমটি উত্তম (শরহুত তাহাবী)।

কানের উপরিভাগ বৃদ্ধাঙ্গুলির ভেতরের অংশ দ্বারা এবং ভেতরের অংশ তর্জনীর ভেতরের অংশ দ্বারা মাসেহ্ করবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশ ঃ নিয়্যাত করা

১০. মাসআলা ঃ উযূর পূর্বে এমন কোন ইবাদতের নিয়্যাত করা যা তাহারাত ব্যতীত সহীহ্ হয় না অথবা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য উযূ করবে (তাবয়ীন)। নিয়্যাত করার সময় বলবে, نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى অথবা نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ বা نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ কিংবা نَوَيْتُ اِسْتِبَاحَةَ الصَّلٰوةِ বলবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সালাত আদায়ের নিমিত্তে উযূ করছি অথবা নাপাকী দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বা পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে বা সালাত আদায় জাইয হওয়ার লক্ষ্যে আমি উযূ করছি (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মুখমণ্ডল ধৌত করার সময়ই নিয়্যাত করার মূল সময়। এর স্থান হল হৃদয়। অবশ্য মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)।

এগার ঃ তারতীব এবং ক্রমধারা মুতাবিক উযূ করা

১১. মাসআলা ঃ আল-কুরআনে যে অঙ্গের উল্লেখ পূর্বক আয়াত আরম্ভ করা হয়েছে এর দ্বারা উযূ শুরু করা (তাবয়ীন)। কুদরী গ্রন্থ প্রণেতা নিয়্যাত, তারতীব এবং উযূর অঙ্গসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়াকে উযূর মুস্তাহাব কাজসমূহের মধ্যে শামিল করেছেন। তবে হিদায়া, মুহীত, তুহ্ফা, ইযাহ্, ওয়াফী ইত্যাদি গ্রন্থে উপরোক্ত কাজসমূহকে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মি'রাজুদ দিরায়া)।

বার ঃ মুওয়ালাত বা উযূর অঙ্গসমূহকে পরপর ধৌত করা

১২. মাসআলা ঃ মুওয়ালাত মানে হল, এক অঙ্গ ধৌত করার পর স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে এ অঙ্গ শুকানোর পূর্বে পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা। এ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রৌদ্র, প্রবল বাতাস এবং প্রচণ্ড শৈত্য লক্ষণীয় নয়। লক্ষণীয় হল উযূকারী ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। বিনা কারণে উযূতে বিলম্ব করা মাকরূহ্। অবশ্য বিলম্ব করার পেছনে যদি কোন কারণ থাকে যেমন উযূর পানি শেষ হয়ে গেল, এ ধরনের ওযরের কারণে বিলম্ব হলে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে গোসল ও তায়াম্মুমের মধ্যে এরূপ বিলম্ব করা মাকরূহ্ (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

তের ঃ ইতিপূর্বে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা এই দু'টি কাজকে একটি সুন্নাহ হিসাব করা হয়েছে।আসলে কুলি করা একটি সুন্নাত এবং নাকে পানি দেয়া আর একটি সুন্নাত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উযূর মুস্তাহাবসমূহ

[অপর বর্ণনামতে উযূর মুস্তাহাব দু'টি]

এক ঃ ডান দিক থেকে উযূ শুরু করা

১. মাসআলা ঃ ডান দিক হতে উযূ আরম্ভ করা। অর্থাৎ বাম হাত ধৌত করার পূর্বে ডান হাত ধৌত করা এবং বাম পা ধৌত করার পূর্বে ডান পা ধৌত করা। সহীহ্ বর্ণনা মতে এতে বহু ফযীলত রয়েছে। উযূর অঙ্গসমূহের মাঝে দুই কান ব্যতীত প্রতিটি জোড়া অঙ্গের ক্ষেত্রে বামটির পূর্বে ডানটি ধৌত করা মুস্তাহাব। কোন ব্যক্তির যদি একটি মাত্র হাত অথবা দুই হাতের এক হাতে

যদি কোন ওযর থাকে এবং উভয় কান যদি এক সাথে মাসেহ্ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রথমে ডান কান মাসেহ্ করবে এবং পরে বাম কান মাসেহ্ করবে।

দুই ঃ ঘাড় মাসেহ্ করা

২. মাসআলা ঃ উভয় হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা ঘাড় মাসেহ্ করবে। গলা মাসেহ্ করা বিদআত (আলবাহ্রুর রাইক)। মাশাইখের বর্ণনা মতে এখানে আরো কতিপয় সুন্নাত ও আদাব রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

পা ধোয়ার মাসনূন তরীকা হল, ডান হাতে পাত্র ধরে ডান পায়ের অগ্রভাগে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে তা মলবে। এ নিয়মে তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর বাম পায়ের অগ্রভাবে পানি ঢালবে এবং তা মলবে (মুহীত)। মাথা মাসেহ্ করার সময় মাথার অগ্রভাগ হতে মাসেহ্ আরম্ভ করা সুন্নাত (যাহিদী)। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রমধারা ঠিক রাখা আমাদের নিকট সুন্নাত (খুলাসা)। উপরোক্ত উভয় আমলের ক্ষেত্রে مبالغة তথা যথাযথভাবে আমল দুটো সম্পাদন করাও সুন্নাত (কাফী ও শরহুত তাহাবী)। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে مبالغة করবে না। বরং রোযাদার ব্যক্তি কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে (তাতার খানিয়া)। কুলির মধ্যে مبالغة হল, গড়গড়া সহকারে কুলি করা (কাফী)। নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে مبالغة হল, নাকের নরম স্থানে পানি পৌঁছিয়ে তা টেনে নাকের শক্ত জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া (মুহীত)।

মাসআলা ঃ উযূর মধ্যে পানির অপব্যয় না করা এবং পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্পণ্য না করা মুস্তাহাব (খুলাসা)। পানি যদি নহরের পানি হয় অথবা মালিকানাভুক্ত পানি হয়, তবে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি এ পানি উযূকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারী লোকদের জন্য ওয়াকফকৃত হয়, তবে অধিক পানি ব্যয় করা এবং অপব্যয় করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম (আলবাহ্রুর রাইক)। উযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময়—

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল) বলা মুস্তাহাব। মানুষের সাথে গল্প করার মত কথা না বলাও উযূর মধ্যে মুস্তাহাব (মুহীত)। কখনো যদি কথা বলার এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যে, এখন যদি কথা না বলা হয়, তাহলে এ সুযোগ আর থাকবে না, তবে কথা বলা আদবের পরিপন্থী নয় (আল বাহ্রুর রাইক)। উযূর কাজ নিজের হাতে করাই উত্তম (মুহীত)। উযূ শেষে নিম্নের দুআটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র। সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট তওবা করছি। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৩. মাসআলা ঃ যে কাপড় দ্বারা ইসতিনজার স্থান মাসেহ্ করা হয়, সে কাপড় দ্বারা উযূর অঙ্গসমূহ মুছবে না। ইসতিনজা হতে ফারিগ হবার পর উযূ করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসবে। উযূর মাঝে বা উযূ শেষে পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং যারা পবিত্র থাকে আমাকে তাদের দলভুক্ত করুন।

উযূ শেষে দু' রাকআত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। উযূর পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য পুনরায় পাত্রে পানি ভরে রাখা মুস্তাহাব (মুহীত)। উযূ শেষে অবশিষ্ট পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। উযূর ব্যবহৃত পানি যাতে কাপড়ে না লাগে এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে (যাহিদী)। উযূর পর ভিজা হাত ঝাড়া দিবে না (আসসিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ কুলি করবে ডান হাতে এবং ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। (খাযানাতুল ফিক্হ ঃ ফকীহ্ আবুল লায়স (র))। খালাফ ইব্ন আয়্যূব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শীতকালে উযূকারী পানি মিশ্রিত তৈল শরীরে মালিশ করে উযূর অঙ্গসমূহের উপর পানি বাইয়ে দিবে। কেননা, শীতের মওসুমে পানি শরীরের সাথে মিলতে চায় না (বাদা'ঈ)। উযূর অঙ্গসমূহ পানি দ্বারা মর্দন করা, বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের ছিদ্রের ভেতর ঢুকিয়ে কান মাসেহ্ করা, ওয়াক্ত আসার পূর্বে উযূ করা, চড় মারা ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে মুখমণ্ডলে পানি পৌছিয়ে দেয়া এবং উঁচু স্থানে বসে উযূ করা মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। উযূর পূর্বে পাত্রের হাতল তিনবার ধৌত করে নিবে, উযূর অঙ্গসমূহ স্বাভাবিকভাবে সহজভাবে ধৌত করবে, উযূর মধ্যে তাড়াহুড়া করবে না এবং ধৌত কার্য, খিলাল ও মর্দন ভালভাবে করবে। মুখমণ্ডল, হাত এবং পায়ের সীমার বাইরেও পানি পৌছিয়ে দিবে যেন শেষ সীমানা পর্যন্ত উপরোক্ত অঙ্গসমূহ নিশ্চিতভাবে ধৌত হয়ে যায় (মি'রাজুদ দিরায়া)। উপরের দিক থেকে মুখমণ্ডল ধৌত করা আরম্ভ করবে (আন্নাহ্রুল ফাইক)।

৫. মাসআলা ঃ পবিত্র স্থানে বসে উযূ করবে। কেননা, উযূর পানি সম্মানযোগ্য পানি (মুযমারাত গ্রন্থের সূত্রে আন্নাহরুল ফাইক)। উযূর পাত্র যদি ছোট হয়, তবে পাত্রটি বামদিকে রাখবে এবং পাত্রটি যদি এমন বড় হয় যে অঞ্জলিভরে পানি উঠিয়ে উযূ করতে হয়, তবে পাত্রটি ডান পার্শ্বে রাখবে।

৬. মাসআলা ঃ মনে মনে নিয়্যাত করার সাথে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা ভাল। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। কুলি করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ –

হে আল্লাহ্ ! কুরআন তিলাওয়াত, তোমার যিকির, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তোমার ইবাদত উত্তমরূপে পালন করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর। নাকে পানি দেয়ার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ –

হে আল্লাহ্! জান্নাতের সুঘ্রাণ আমাকে দান করুন এবং জাহান্নামের দুর্গন্ধ হতে আমাকে রক্ষা করুন। মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ –

হে আল্লাহ্! যেদিন কতেক চেহারা উজ্জ্বল ও কতেক চেহারা মলিন হবে, সেদিন আমার চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিন। ডান হাত ধৌত করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا –

হে আল্লাহ্! আমলনামা আমাকে ডান হাতে প্রদান করুন এবং সহজভাবে আমার হিসাবের ব্যবস্থা করুন। বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ –

হে আল্লাহ্! বাম হাতে আমার আমালনামা দিও না এবং পশ্চাৎ দিক থেকেও নয়। মাথা মাসেহ্ করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ –

হে আল্লাহ্! যেদিন আপনার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আমাকে আপনার আরশের নীচে ছায়া দিন। উভয় কান মাসেহ্ করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ –

হে আল্লাহ্! যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং এর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ঘাড় মাসেহ্ করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ –

হে আল্লাহ্! জাহান্নাম হতে আমাকে মুক্তি দিন। ডান পা ধৌত করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ –

হে আল্লাহ্! যেদিন মানুষের পা পিছলিয়ে যাবে, সেদিন আপনি আমার পা অবিচল রাখুন। বাম পা ধৌত করার সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ –

pdf By Syed Mostofa Sakib

হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন আমার প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আমাকে এমন ব্যবসা দান করুন যার ক্ষয় নেই। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার পর রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করবে। উযূতে এক মুদের কম পানি ব্যবহার করবে না।

উযূ তিন প্রকার

এক. ফরয উযূ। যেমন ফরয নামায আদায়ের জন্য মুহ্‌দিছ (যার উযূ নেই এমন) ব্যক্তির উযূ করা।

দুই. ওয়াজিব উযূ। যেমন তাওয়াফের জন্য উযূ করা। যদি কোন ব্যক্তি উযূ ব্যতীত তাওয়াফ করে, তবে জাইয আছে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি ওয়াজিব বর্জনকারী গুনাহ্‌গার বলে গণ্য হবে।

তিন. মুস্তাহাব উযূ। এর সংখ্যা অনেক। যেমন ঘুমানোর পূর্বে উযূ করা। সর্বদা উযূর অবস্থায় থাকা অর্থাৎ সর্বদা উযূর অবস্থায় থাকার নিমিত্তে উযূ ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে উযূ করে নেয়া, পরনিন্দার পর উযূ করা, কবিতা আবৃত্তির পর উযূ করা, উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করা, অট্টহাসি দেয়ার পর পুনরায় উযূ করা এবং মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর উযূ করা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ উযূর মাকরূহ্‌সমূহ

১. মাসআলা ঃ মাকরূহ্‌সমূহের মধ্যে কতিপয় মাকরূহ্ হচ্ছে, মুখমণ্ডলে খুব জোরে পানি মারা, বিনা ওযরে বাম হাত দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এবং ডান হাত দিয়ে নাক ঝাড়া (ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) কর্তৃক প্রণীত খাযানা)। নতুন পানির দ্বারা তিনবার মাথা মাসেহ্ করা। উযূর পর উযূর অঙ্গসমূহ রুমাল দ্বারা মুছে নেয়াতে কোন দোষ নেই (তাবয়ীন)। নিজে উযূ করার জন্য কোন পাত্র নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং অন্য কাউকে এর দ্বারা উযূ করতে না দেয়া মাকরূহ্ যেমনিভাবে মসজিদে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে নিজের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ্ (ওয়াজীয)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

১. মাসাআলা ঃ পায়খানা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়া। যেমন পেশাব, ওদী, মযী, মনী, পোকা ও প্রস্তরকণা বের হওয়া এবং পায়খানার রাস্তা দিয়ে পায়খানা বের হওয়া, বায়ু নির্গত হওয়া ও পোকা কীট বের হওয়া। পায়খানা কম হোক বা বেশী হোক এতে উযূ ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে পেশাব এবং মলদ্বার দিয়ে নির্গত বায়ুর হুকুমও তাই (মুহীত)। বিশুদ্ধতম মতে পুরুষ ও মহিলার লিঙ্গ হতে বায়ু নির্গত হলে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না। তবে যদি কোন মহিলার বাহ্যদ্বার তার জননেন্দ্রিয়ের সাথে মিলে যায়, তবে তার জন্য উযূ করে নেয়া মুস্তাহাব (জাওহারুন নায়্যারা)। পাকস্থলীর যখম হতে বায়ু নির্গত হলে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না, যেমনিভাবে দুর্গন্ধযুক্ত ঢেঁকুরের কারণে উযূ ভঙ্গ হয় না (কিনয়া)। প্রস্রাব নালীর ভেতরে প্রস্রাব আসলে এতে উযূ ভঙ্গ হবে

না। অবশ্য খাতনার সময় যে চামড়া কেটে ফেলা হয় এ পর্যন্ত এসে গেলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (বাহরুর রাইক)। স্ত্রীলোকের অন্তরলিঙ্গ হতে বহির্লিঙ্গে প্রস্রাব চলে আসলে এতে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। লিঙ্গকর্তিত পুরুষের প্রস্রাব নালী হতে প্রস্রাবের মত কিছু বের হলে দেখতে হবে যে, সে তা বন্ধ করে রাখতে সক্ষম কিনা? যদি সে তা আটকিয়ে রাখতে বা ছেড়ে দিতে সক্ষম হয়, তবে মনে করতে হবে যে, তা প্রস্রাব। এতে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে তা আটকিয়ে রাখতে সক্ষম না হয়, তবে প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এর দ্বারা উযূ ভঙ্গ হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ফাতাওয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, নপুংসক যেহেতু পুরুষ বলে গণ্য হয়েছে, তাই তার লিঙ্গ যখম বলে ধরে নিতে হবে। এর থেকে কোন কিছু নির্গত হলে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ না তা প্রবাহিত হয় (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, যখীরা, মুহীত এবং ফাতাওয়ার নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ কিতাবসমূহে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্‌দের মতে লিঙ্গ হতে কিছু বের হতেই নপুংসকের উপর উযূ করা ওয়াজিব (তাবয়ীন)। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনার উপর নির্ভর করাই সমীচীন (আন নাহরুল ফাইক)। যদি কোন পুরুষের লিঙ্গে যখম হয়ে এমনভাবে দু'টি ছিদ্র হয়ে যায় যে, একটি ছিদ্র দিয়ে পানি বের হয়ে প্রস্রাব নালী দিয়ে তা বের হয়ে যায়, আর অপর ছিদ্র দিয়ে পানি বের হয়ে তা প্রস্রাবনালী দিয়ে নির্গত হয় না, এমতাবস্থায় প্রথম ছিদ্রটিকে লিঙ্গের ছিদ্র ধরে নিতে হবে। যখন এর মুখে প্রস্রাব পাওয়া যাবে, তখনই উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদিও তা প্রবাহিত না হয়। আর দ্বিতীয় ছিদ্র দিয়ে কোন কিছু বের হলে যতক্ষণ না তা প্রবাহিত হবে তাতে উযূ ভঙ্গ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি পেশাব বেরিয়ে যাওয়ার আশংকায় প্রস্রাব নালীর ছিদ্রে তুলা দিয়ে রাখে, কারণ তুলা দিয়ে না রাখলে প্রস্রাব বেরিয়ে যাবে, তবে এতে কোন উযূর ক্ষতি হবে না এবং তুলার উপর প্রস্রাব প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার উযূ ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২. মাসআলা ঃ যদি কারো মলদ্বার দিয়ে কিছু বের হয়ে যায় এবং সে তা নিজের হাত বা কাপড়ের নেকড়া দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, তবে এতে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এতে তার হাতে কিছু না কিছু নাপাকী লেগেই যাবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, মলদ্বার হতে কিছু বের হতেই উযূ ভেঙ্গে যাবে (যখীরা)। মযী বের হলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে ওদী বের হলেও উযূ ভেঙ্গে যাবে। কামভাব ব্যতিরেকে যদি কারো বীর্য নির্গত হয়, যেমন কোন ভারী জিনিস বহন করার কারণে অথবা কোন উচু স্থান হতে পতিত হওয়ার কারণে বীর্যপাত হয়ে গেল, তবে এ অবস্থায় উযূ করা তার উপর ওয়াজিব (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ পুরুষের বীর্য ঘন এবং সাদা, গন্ধে ফুলের কলির ন্যায় গন্ধময়, কিছুটা আঠাযুক্ত এবং তা নির্গত হবার পর পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়। আর মহিলার মনী পাতলা ও হলদে হয়ে থাকে। মযী পাতলা ও কিছুটা সাদা হয়ে থাকে। কামোদ্দীপনার সহিত নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া- কৌতুক করার সময় তা নির্গত হয়। আর এ সময় মহিলার জননেন্দ্রিয় হতে যা নির্গত হয়, তাকে আরবীতে "কাযী" বলা হয়। ওদী গাঢ় পেশাব। কারো কারো মতে, সহবাসের গোসলের পর এবং পেশাবের পর যে পানি বের হয় তাকে ওদী বলে (তাবয়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ মলদ্বার দিয়ে যদি কৃমি বের হয়, তবে এতে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী বা পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে যদি কোন পোকা বের হয়, তাতেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে পাথরকণা বের হলেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

যদি কোন পুরুষ তার প্রস্রাব নালীর ছিদ্রে ফোঁটা ফোঁটা কিছু ঢুকায় অতঃপর তা বেরিয়ে আসে তাহলে যেমনিভাবে এর দ্বারা সওম বিনষ্ট হয় না, অনুরূপভাবে এতে উযূও ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ যদি তৈল দিয়ে পিচকিরি করা হয় এবং পরে ঐ তৈল বেরিয়ে চলে আসে, তবে পুনরায় উযূ করা জরুরী (মুহীত)। যে বস্তু প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরে পুনরায় বের হয়ে চলে আসে এতে উযূ ভেঙ্গে যাবে। কারণ ঐ বস্তু ভেতর থেকে কিছু আর্দ্রতা অবশ্যই নিয়ে আসবে, যদিও তা পূর্ণাঙ্গভাবে ভেতরে ঢুকেনি। যেমন বস্তুটির একটি অংশ কোন ব্যক্তির হাতে ছিল (ওয়াজীয)।

৬. মাসআলা ঃ পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া এবং তা শরীরের প্রকাশমান অঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আসা। যেমন অসুখের কারণে রক্ত, বমি, পুঁজ বা পানি শরীর হতে নির্গত হওয়া। প্রবাহিত হওয়া (سيلان) এর সীমা হল, (রক্ত, পুঁজ বা পানি) ক্ষতস্থানের উপরাংশে এসে ক্ষতের মাথা হতে তা গড়িয়ে পড়া (মুহীত)। উপরোক্ত মতামতটি বিশুদ্ধতম (আননাহরুল ফাইক)।

৭. মাসআলা ঃ রক্ত যদি ক্ষতস্থানের মাথা পর্যন্ত চলে আসে এবং রক্ত যদি ক্ষতস্থানের অধিকাংশ মাথাও পরিব্যাপ্ত করে এতেও উযূ ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

ফাতাওয়া হচ্ছে এই কথার উপর যে, এ ধরনের অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। রক্ত, বমি, পুঁজ এবং ক্ষত ও ফোঁড়ার পানি, অনুরূপভাবে অসুস্থতার কারণে নাভি, স্তন, চক্ষু ও কান হতে নির্গত পানি একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এতে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম রায় (যাহিদী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কানে তৈল দেয়ার পর তা মস্তিষ্কে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকে, অতঃপর কান বা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে তবে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তা যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তবে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, পাকস্থলীতে পৌঁছার পরই এ তৈল মুখ দিয়ে নির্গত হয়েছে। আর পাকস্থলী হল নাপাকীর স্থান। তাই এর হুকুম বমির হুকুমের মতই (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের নাকে ঔষধ দেয়, অতঃপর তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং তা মুখ ভরা পরিমাণ হয়, তবে এতে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি উভয় কান দিয়ে বের হয়, তবে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি গোসলের সময় কারো কানে পানি প্রবেশ করে, অতঃপর তা কিছুক্ষণ কানে থেকে পরে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে তাহলে এতে তার উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। "নিসাব গ্রন্থে" এটাকেই বিশুদ্ধতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে

(তাতারখানিয়্যা)। অবশ্য এ পানি যদি পুঁজ হয়ে যায়, তবে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুযমারাত)। যদি কারো কান থেকে পুঁজ বের হয় তবে তা যদি ব্যথা ব্যতিরেকে নির্গত হয়, তবে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না। আর যদি ব্যথার কারণে নির্গত হয়, তাহলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, ব্যথার কারণে নির্গত পুঁজ সাধারণত ক্ষতস্থান হতেই নির্গত হয়ে থাকে, তাই এতে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) কর্তৃক প্রদত্ত ফাতাওয়াতে অনুরূপ বর্ণিত আছে (মুহীত, যখীরা, তাবয়ীন এবং আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজেও অনুরূপ বিদ্যমান)

১০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) তৎপ্রণীত মূল গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন যখম হতে সামান্য পরিমাণ রক্ত বের হয় এবং তা মুছে ফেলার পর পুনরায় বের হয় অতঃপর আবার মুছে ফেলা হয়, তবে মুছে ফেলা রক্ত না মুছলে গড়িয়ে যাওয়া পরিমাণ হলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। আর গড়িয়ে যাওয়া পরিমাণ না হলে উযূ ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যখম হতে বের হওয়া রক্তের উপর যদি ছাই বা বালি দেয়া হয় এবং এরপরও যদি রক্ত বের হয় আর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এর আর্দ্রতা প্রকাশমান হয়, তবে এমতাবস্থায়ও এগুলোকে একত্রিত করা হবে। প্রবাহিত পরিমাণ হলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় উযূ ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। যখমের মাথা হতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যদি এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছে, যা পাক করা আবশ্যক যেমন নাক ও কান, তাহলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। নাকের যে অংশটি পাক করা আবশ্যক, তা হল নাকের নরম গোশতের জায়গা; এর অধিক নয় (মুলতাকিত)।

১১. মাসআলা ঃ যদি মুখ দিয়ে থুথুর সাথে রক্তও বের হয়, তবে দেখতে হবে যে, রক্তের অংশ বেশী, না থুথুর অংশ বেশী? যদি উভয় সমান সমান হয়, তবে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। সমান সমান ও প্রাধান্যের বিষয়টি এখানে রং-এর দ্বারা প্রতীয়মান হবে। যদি লাল হয়, তবে উযূ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি হলদে হয়, তবে উযূ ভঙ্গ হবে না (তাবয়ীন)। উযূকারী ব্যক্তি কোন কিছুতে কামড় দেয়ার পর যদি এর মধ্যে রক্তের নিদর্শন দেখা যায় অথবা মিসওয়াক করার পর যদি এতে রক্তের নমুনা দেখা যায়, তাহলে "রক্ত প্রবাহিত হয়েছে" একথা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উযূ ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কারো চোখে ফোড়া বা যখম থাকে এবং এর থেকে রক্ত বের হয়ে চোখের অন্য কোণে পৌঁছে যায়, তবে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা, এ রক্ত এমন স্থানে পৌঁছেনি, যা পাক করা ওয়াজিব (কিফায়াহ)।

আঘাতের চাপের কারণে যদি রক্ত বের হয়; (অবশ্য চাপ না দিলে রক্ত বের হতো না) এ অবস্থায়ও উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাই উত্তম, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত মত (ওয়াজীয, কিনয়া এবং শরহে মুনিয়্যা)। ফোড়া গলে যদি এর থেকে পানি বা পুঁজ জাতীয় কিছু বের হয় এবং তা যদি যখমের মাথা থেকে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়ে যায়, তাহলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি প্রবাহিত না হয়, তবে উযূ ভঙ্গ হবে না। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি ফোড়া গলে এর থেকে নিজে নিজে পানি বা পুঁজ প্রবাহিত হয়। আর যদি চাপ দেয়ার কারণে ফোড়া থেকে কিছু বের হয়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা, নির্গতি পানি বা পুঁজকে مخرج (বহিষ্কৃত) বলা যাবে কিছু خارج (স্বেচ্ছায় বের হয়েছে এমন বস্তু) বলা যাবে না (হিদায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ নাক ঝাড়া দেয়ার পর যদি কারো নাক থেকে মুসুরির ডালের মত রক্ত খণ্ড বেরিয়ে আসে, তবে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

চীচরী (এক প্রকার পোকা যা গরু, বকরী ও কুকুরের শরীরে লেগে থেকে রক্ত চুষে খায়) যদি কোন মানুষের শরীরের রক্ত চুষে এবং এতে যদি এর পেট ভরে যায়, তবে উযূ ভঙ্গ হবে না যেমন মশা-মাছি রক্ত চুষলে উযূ ভঙ্গ হয় না। আর যদি বড় হয়, তবে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে জোঁক যদি কোন মানুষের শরীর থেকে রক্ত চুষে স্বীয় উদর ভর্তি করে নেয়, তবে এতেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ চোখের শিরা হতে যদি অশ্রু প্রবাহিত হয়, তা যখমের অনুরূপই; এর থেকে যখনই পানি গড়িয়ে পড়বে উযূ ভেঙ্গে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কারো চোখে যদি ব্যথা বা অন্য কোন রোগ দেখা দেয় আর এতে যদি চোখ হতে সর্বদা অশ্রু প্রবাহিত হয়, প্রত্যেক ওয়াক্তে উযূ করে নেয়ার জন্য তাকে হুকুম দেয়া হবে। কেননা, এ পানি পুঁজ হবার প্রবল আশংকা রয়েছে (তাবয়ীন)। যখমের মাথা বা অগ্রভাগ হতে পোকা বের হলে এতে উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

আল্ ইরকুল মাদানী যাকে ফার্সীতে রিশ্‌তা (এক প্রকার রোগ যা পায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়) বলা হয়, তাও পোকার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এর কারণে যদি ক্ষতস্থান হতে পানি গড়িয়ে পড়ে, তবে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ বমি হওয়া ঃ যদি কোন ব্যক্তি মুখ ভরে বমি করে, চাই তা পিত্ত হোক, খাদ্য হোক বা পানি হোক, এতে উযূ ভেঙ্গে যাবে (মুহীত)। 'মুখ ভরে বমি হওয়ার সহীহ্ পরিমাপ হচ্ছে এই যে, চেপে রাখা ব্যতিরেকে তা মুখে আটকিয়ে রাখা যায় না (মুহীত)।

পানি পান করার পর যদি ঐরূপ পরিষ্কার পানিই বমি হয়, তবে এতেও উযূ ভেঙ্গে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ও ফাতাওয়া), যদি মুখ ভরে শুধু কফ বমি হয়, তবে তা যদি মাথা থেকে এসে থাকে, তাহলে উযূ ভঙ্গ হবে না। আর যদি পাকস্থলী হয়ে উপরের দিকে উঠে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে উযূ ভঙ্গ হবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। উপরোক্ত বিধান শুধু কফের বমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি বমিতে কফের সাথে খাদ্য বা অন্য কিছু মিলিত থাকে, তবে খাদ্য যদি মুখ ভরা পরিমাণ হয়, তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

যদি বমিতে তরল রক্ত বের হয় এবং তা যদি মাথার দিক থেকে বের হয়, তবে সকলের মতেই উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি জমাট রক্ত হয়, তবে কারো মতেই উযূ ভঙ্গ হবে না। যদি তা পাকস্থলীর দিক হতে এসে মুখ দিয়ে নির্গত হয় এবং জমাট রক্ত হয়, তবে কারো মতেই উযূ ভঙ্গ হবে না। হাঁ, এ যদি আবার মুখ ভরে হয়, তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে, আর যদি তরল হয়, তবে

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে মুখ ভরে না হওয়া সত্ত্বেও উযূ ভেঙ্গে যাবে (শরহুল মুনিয়্যা)। এটাই পসন্দনীয় মত (তাবয়ীন)। অধিকাংশ মাশাইখ এটাকে বিশুদ্ধ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন (বাদাই)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অল্প অল্প এমনভাবে বমি করে যে, যদি এগুলোকে একত্রিত করা হয়, তবে মুখ ভরা পরিমাণ হয়ে যাবে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি এ বারবার বমি একই কারণে হয়ে থাকে, তবে এগুলোকে একত্রিত ধরা হবে এবং এতে উযূ ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় একত্রিত হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুযমারাত)। প্রথমবার বমি হওয়ার পর এর বেগ প্রশমিত হবার পূর্বেই যদি দ্বিতীয় দফা বমি হয়, তবে একই কারণ বলে পরিগণিত হবে। আর যদি প্রথম বমির বেগ প্রশমিত হবার পর দ্বিতীয় দফা বমি হয়, তবে এতদুভয় বমির কারণ ভিন্ন বলে পরিগণিত হবে (কাফী)। মানুষের শরীর হতে নির্গত বস্তু যদি হাদাছ (উযূ ভঙ্গের কারণ) না হয়, তবে নাপাকীও হবে না। যেমন অল্প বমি এবং এমন স্বল্প পরিমাণ রক্ত যা প্রবাহিত হয়নি (তাবয়ীন)। এটাই সহীহ্ (কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ নিদ্রা যাওয়া, সালাতে বা সালাতের বাইরে কাত হয়ে নিদ্রা যাওয়ার দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এতে ফকীহ্‌দের কারো কোন মতবিরোধ নেই। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র নিতম্বের উপর ঘুমালে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি তাঁর এক নিতম্বের উপর ঘুমালো (বাদাই')। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি পিঠের উপর হেলান দিয়ে চিৎ হয়ে ঘুমায়, তবে এতেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাহ্‌রুর রাইক)। যদি কোন ব্যক্তি বসে বসে পায়ের গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে সব সমান্তরাল করে নিদ্রা যায়, তবে তার উপর উযূ ওয়াজিব হবে না, এটাই সহীহ্ (মুহীত)। যদি কেউ কোন বস্তুর সাথে এমনভাবে হেলান দিয়ে ঘুম যায় যে, ঐ বস্তুটি সরিয়ে নিলে সে পড়ে যাবে, তবে দেখতে হবে যে, যদি নিতম্ব ভূমি হতে সরে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উযূ ভেঙ্গে যাবে, আর যদি ভূমি হতে নিতম্ব না সরে, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে উযূ ভঙ্গ হবে না (তাবয়ীন)। দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট ব্যক্তির ঘুমের কারণে উযূ ভঙ্গ হয় না। যদিও সে গদি বা হাওদার উপর থাকুক।

১৮. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের সময় রুকূ-সিজদার অবস্থায় ঘুমালে কারো মতেই উযূ ভঙ্গ হবে না। সালাতের বাইরেও এভাবে ঘুমানোর হুকুম এ-ই। তবে সিজদার ব্যাপারে একটু পার্থক্য রয়েছে। তা হল এই যে, সিজদার অবস্থার ঘুম উযূ ভঙ্গের কারণ হবে না, যদি তা মাসনূন তরীকা মত হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় পেট উরু থেকে উপরে থাকবে এবং বাহু পার্শ্ব থেকে পৃথক থাকবে। সিজদার অবস্থায় ঘুমানোর সময় যদি কারো মধ্যে সিজদার মাসনূন তরীকা বিদ্যমান না থাকে, তবে তাঁর উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (আল্-বাহ্‌রুর রাইক)। যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে উপরোক্ত অবস্থায় ঘুম প্রবল হওয়া এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘুম যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুম যাওয়ার অবস্থায় উযূ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য যাহিরুর রিওয়ায়েতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ (মুহীত)। অসুস্থ ব্যক্তি যদি কাত হয়ে সালাত আদায় করে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, তবে তার উযূ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহ্গণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে উযূ ভেঙ্গে যাবে (মুহীত, তাবয়ীন ও আল্-বাহ্রুর রাইক)। এর উপরই ফাতাওয়া (আন্নাহ্রুল ফাইক)। যদি কোন ব্যক্তি বসে বসে ঘুমায় ও বারে বারে ঝুঁকে পড়ে এবং কখনো তার নিতম্ব ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে শামসুল আইম্মা হাল্ওয়ানী (র) বলেন, যাহিরুল মাযহাব অনুসারে তার উযূ ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি বসে ঘুম যায় এবং ঘুমের ঘোরে কখনো সম্মুখ দিকে আবার কখনো কাত হয়ে এদিক-ওদিক পড়ে যায়, তবে এমতাবস্থায় সে যদি পড়ার পূর্বেই জাগ্রত হয়ে যায় বা পড়ার অবস্থায় জাগ্রত হয়ে যায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে গিয়ে সাথে সাথে জাগ্রত হয়ে যায়, তাহলে উযূ ভঙ্গ হবে না। আর যদি কেউ পড়ে গিয়ে ঘুমায় অতঃপর জাগ্রত হয়, তবে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি যদি চার জানু হয়ে বসে ঘুমায়, তবে উযূ ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি নিতম্বের উপর ঘুমায় যেমন কেউ উভয় পা একদিক দিয়ে বের করে নিতম্ব মাটিতে রেখে ঘুমাল, তাহলে উযূ ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় ঘুমায় এবং সওয়ারী যদি মুক্ত থাকে, তাহলে উপরের দিকে উঠা এবং সমতল ভূমিতে চলাচল অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হবে না। অবশ্য নীচের দিকে অবতরণ কালে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি সওয়ারীর উপর বস্তা বোঝাই করার গদিতে ঘুমায়, তবে তার উযূ ভঙ্গ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি উনানের উপর দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে বসে বসে ঘুমায়, তবে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কাত হয়ে শুয়ে যদি কোন ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তবে দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবে অথবা হালকা ভাবে ঘুমাবে। যদি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, তবে উযূ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি হালকাভাবে ঘুমায় তবে উযূ ভঙ্গ হবে না। গভীর ঘুম ও হালকা ঘুমের মাঝে পার্থক্য হল এই যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির পার্শ্বে যদি কথাবার্তা হয় এবং সে এ কথাবার্তা শুনতে পায়, তবে এটা হবে হালকা ঘুম। আর যদি কথিত আলোচনার অধিকাংশই তার থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে এটাকে গভীর ঘুম মনে করা হবে (মুহীত)। শামসুল আইম্মা (র)-এর ফাতওয়া অনুরূপ বিবৃত আছে (যখীরা)।

২১. মাসআলা ঃ বেহুশ, পাগল, অচেতন ও মাতাল হওয়া ঃ বেহুশ হলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। চাই তা কম হোক বা বেশী। অনুরূপভাবে পাগল এবং উন্মাদনার কারণেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। উন্মাদ ও মাতাল হওয়ার আলামত চিহ্নিত করে কোন কোন ফকীহ্ বলেন, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে চিনতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে মাতাল ধরে নেয়া হবে। সদরুশ্ শহীদ (র) এ মতটি পসন্দ করেছেন। শামসুল আইম্মা (র) কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ মতামত হল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি হেলে-দুলে চলে, তবে তাকে মাতাল মনে করা হবে (যখীরা)।

২২. মাসআলা ঃ অট্টহাসি দেয়া ঃ অট্টহাসির কারণেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। অট্টহাসি (القهقهة) বলে, যে হাসির শব্দ নিজে শুনে এবং নিজের পার্শ্ববর্তী লোকেরাও শুনতে পায়। খিলখিল করে হাসা (الضحك) ঐ হাসিকে বলে যে হাসির শব্দ নিকটস্থ ব্যক্তি শুনে না কিন্তু

নিজে শুনতে পায়। মুচকি হাসি (التبسم) ঐ হাসিকে বলে, যে হাসির শব্দ নিজে এবং পার্শ্ববর্তী লোক কেউই শুনতে পায় না (যখীরা)। রুকূ-সিজদা বিশিষ্ট সালাতে অট্টহাসি দিলে সালাত ও উযূ উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যায় (মুহীত)। চাই এ হাসি ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা ভুলক্রমে হোক (খুলাসা)। সালাতের বাইরে অট্টহাসি দিলে উযূ ভঙ্গ হয় না। সালাতে খিলখিল করে হাসলে সালাত নষ্ট হয় কিন্তু উযূ ভঙ্গ হয় না। মুচকি হাসির কারণে সালাত ও উযূ কিছুই নষ্ট হয় না। তিলাওয়াতের সিজদা আদায় কালে এবং জানাযার সালাতে হাসলে সংশ্লিষ্ট আমল বাতিল হয়ে যাবে, তবে উযূ ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সালাত আদায়ের অবস্থায় কোন বালক যদি অট্টহাসি দেয়, তবে উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। সালাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অট্টহাসি দিলে উযূ ও সালাত কিছুই বাতিল হবে না (তাবয়ীন)। হাকিম আবূ মুহাম্মদ কূফী (র) বলেন, এতে সালাত ও উযূ উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তীকালের অধিকাংশ ফকীহ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি صلاة مظنونة তথা সন্দেহযুক্ত সালাতের মধ্যে অট্টহাসি দেয়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। যদি কোন উযরের কারণে ইশারায় সালাত আদায়ের মধ্যে অথবা ওযরের কারণে আরোহী অবস্থায় ইশারায় ফরয বা নফল সালাত আদায় কালে অট্টহাসি দেয়, তবে উযূ ভেঙ্গে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

২৩. মাসআলা ঃ অট্টহাসি যেরূপ উযূ ভঙ্গ করে অনুরূপভাবে তায়াম্মুমও ভঙ্গ করে দেয়। তবে গোসলের পবিত্রতা নষ্ট করে না। কেউ কেউ বলেন, অঙ্গ চতুষ্টয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট করে দেয়। গোসলকারী ব্যক্তি যদি সালাতে অট্টহাসি দেয়, তবে তার সালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং নতুন উযূ করা ব্যতিরেকে এরপর তার জন্য সালাত আদায় করা দুরুস্ত হবে না (মুহীত)। এটাই সহীহ্ কথা (তাতারখানিয়া)।

২৪. মাসআলা ঃ মুবাশারাতে ফাহিশা ঃ যদি কোন পুরুষ কামভাবসহ উলঙ্গ অবস্থায় স্বীয় জননেন্দ্রিয় স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ের সাথে মিলায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে قياس خفى (সূক্ষ্মদৃষ্টিতে) এর চাহিদা অনুসারে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, قياس جلى বাহ্যদৃষ্টিতে এর দাবী অনুসারে উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। "নিসাব" নামক কিতাবে এটাকেই সহীহ্ বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এর উপরই ফাতওয়া (আল্ ইয়ানাবি, তাতারখানিয়া (الملامسة الفاحشة অধ্যায়)।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের জননেন্দ্রিয় মিলিত হবার পর মহিলার উযূ ভঙ্গের জন্য পুরুষের জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই (কিনয়া)। স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করলে এবং স্ত্রী স্বামীকে স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। নিজের লিঙ্গ বা অন্যের লিঙ্গ স্পর্শ করলে আমাদের মাযহাবে উযূ ভঙ্গ হয় না (যাদ)। উলঙ্গ অবস্থায় দুইজন মহিলার লিঙ্গ পরস্পর স্পর্শ করানো হলে অথবা একজন পুরুষ ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক বালকের মধ্যে লিঙ্গদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করানো হলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (কিনয়া)। এরূপ অবস্থা যদি দুই পুরুষের মধ্যেও হয়, তবু উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (মি'রাজুদ দিরায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সন্দেহজনিত কতিপয় মাসাইল ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আসলের" মধ্যে উল্লেখ আছে যে, উযূর মধ্যে যদি কারো সন্দেহ হয় এবং এ সন্দেহ যদি তার জীবনে প্রথম বারের মত হয়, তাহলে সন্দেহযুক্ত স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতে হবে। আর এরূপ সন্দেহ করা যদি কারো অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহলে এরূপ সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। উপরোক্ত বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য যদি উযূরত থাকা অবস্থায় এ সন্দেহ পয়দা হয়। আর যদি উযূ করার পর কারো সন্দেহ হয়, তবে এদিকে কোনই লক্ষ্য করা হবে না। এক ব্যক্তির উযূ ছিল, পরে সন্দেহ হয়েছে যে, উযূ আছে কি না? তবে তার উযূ বাকী থাকবে। কোন ব্যক্তি প্রথমে উযূ অবস্থায় ছিল না, পরে পবিত্রতা সম্বন্ধে তার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, এমতাবস্থায় তাকে উযূহীন ধরে নেয়া হবে। এক্ষেত্রে তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করা) গ্রহণযোগ্য নয় (খুলাসা)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গোসল সম্বন্ধে

[এই পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের ফরযসমূহের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ গোসলের ফরয তিনটি, এক ঃ কুলি করা, দুই ঃ নাকে পানি দেয়া। তিন ঃ সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার পরিমাণ ও বিধান সম্পর্কে উযূ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে (খুলাসা)।

জুনবী (গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি) যদি পানি পান করে এবং তা না ফেলে, তবে কোন অসুবিধা নেই এবং এ পানিই তার কুলির কাজ করবে, যদি তা তার সমস্ত মুখে পৌঁছে থাকে (যহীরিয়্যা)। যদি গোসলকারী ব্যক্তির দাঁতের মাঝে কিছু অংশ খালি থাকে এবং সেখানে কোন বস্তু থাকে অথবা দুই দাঁতের ফাঁকে যদি খাদ্য জাতীয় কোন বস্তু বা তার নাকের ভেতর যদি তরল ময়লা থাকে, তবে শুদ্ধ মতে তার গোসল দুরুস্ত হয়ে যাবে (যাহিদী)। তবে সতর্কতা এবং উত্তম হল ফাঁকের খাদ্য বের করে নেয়া এবং এ সব স্থানে পানি পৌঁছিয়ে দেয়া (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ নাকে শুষ্ক ময়লা থাকলে গোসল পূর্ণাঙ্গ হবে না (যাহিদী)। খামীরাকৃত আটা যদি নখে লেগে থাকে, তাহলে গোসল দুরুস্ত হবে না। শরীরে ময়লা লেগে থাকলে গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। গোসলের ক্ষেত্রে গ্রাম্য ও শহরে মানুষ সকলেই সমান। নখে মাটি ও কাদা লেগে থাকলে গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। নখে যদি চামড়ার তৈরী কিছু লেগে থাকে অথবা নখ পালিশ লাগানো থাকে, তবে গোসল দুরুস্ত হবে না। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে প্রয়োজন ও ঠেকাবশত এসব অবস্থায়ও গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, প্রয়োজনীয় বিষয়াশয় শরঈ বিধানের আওতামুক্ত থাকে (যহীরিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ শরীরের যাহিরী অংশে যদি মাছের চামড়া বা চিবানো রুটি লেগে শুষ্ক হয়ে যায় এবং গোসলের পর যদি এর নীচে পানি না পৌঁছে, তবে গোসল সহীহ্ হবে না। অবশ্য যদি মশা-মাছি ও এ জাতীয় পোকার পায়খানা লেগে থাকে, তাহলে গোসল দুরুস্ত হয়ে যাবে (মুহীত)। শরীরে যদি বসন্তের গোটা থাকে এবং এর খোসা উঠে যায়, তবে এখনো এগুলোর কিনারা চামড়া থেকে পৃথক হয়নি এমতাবস্থায় গোসল করার সময় যদি এগুলোর নীচে পানি না পৌঁছে, তবে কোন ক্ষতি নেই। পরে যদি খোসা উঠেও যায়, তবু পুনরায় গোসল করার প্রয়োজন নেই (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ চোখের ভেতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয় (মুহীত)। মহিলাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে গেলে বেণী এবং চুলের গুচ্ছ খোলার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে সম্মুখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাগের কেশগুচ্ছ ভিজানোরও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এটাই সহীহ্ (হিদায়া)। মহিলাদের চুল যদি খোলা থাকে, তবে চুলের মধ্যে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। পুরুষ লোকের দাড়ির মাঝে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। যেমনিভাবে দাড়ির গোড়ায় এবং চুলের মাঝে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব, যদিও চুল বেণী বাঁধা থাকে (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা নিজের মাথায় খুব গাঢ় সুগন্ধি ব্যবহার করে যার ফলে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে না, তাহলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোর লক্ষ্যে ঐ সুগন্ধি উঠিয়ে ফেলা তার উপর ওয়াজিব (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। কানের অলংকার এবং হাতের আংটি যদি সংকীর্ণ হয় ঢিলা না হয়, তাহলে তা নাড়াচাড়া দেয়া ওয়াজিব। কানে যদি অলংকার না থাকে এবং কানের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করার সময়ই যদি ছিদ্রে পানি পৌঁছে যায়, তবে গোসল দুরুস্ত হয়ে যাবে। অন্যথায় কানের ছিদ্রে পানি পৌঁছাতে হবে। তবে কাঠ বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে ভেতরে পানি পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করবে না (বাহ্‌রুর রাইক)। নাভির ছিদ্রে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। নাভির ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌঁছানোর লক্ষ্যে নাভির ভেতর অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়া উত্তম। (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির খাতনা হয় নাই সে যদি জানাবাতের গোসল করে এবং চামড়ার ভেতর পানি না পৌঁছায়, তবে তার গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে (মুহীত)। "ওয়াকিআতে নাতিকী"-এর বর্ণনা মতে এ কথাই উত্তম। (তাতারখানিয়্যা) খাতনা হয় নাই এমন লোকদের জন্য গোসলের সময় চামড়ার ভেতর পানি পৌঁছানো মুস্তাহাব (ফাতহুল কাদীর)। মহিলাদের জন্য জানাবাতের গোসল এবং হায়েয-নিফাসের গোসলের সময় লিঙ্গের বহিঃরাংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব এবং উযূর সময় সুন্নাত (মুহীত)। মহিলাগণ গোসলের সময় তাদের লিঙ্গের ভেতর অঙ্গুলি ঢুকাবে না (আল-ফাতাওয়াল গিয়াছিয়্যা)। এটাই উত্তম মত (তাতারখানিয়্যা)। শরীরে তৈল মালিশ করার পর যদি পানি প্রবাহিত করা হয় এবং পানি যথাযথভাবে শরীরে না লাগে তবু গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে (শরহে বেকায়া)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সুন্নাতসমূহের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ প্রথমে উভয় হাত কবজা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা, লজ্জাস্থান ধৌত করা এবং শরীরে নাপাকী থাকলে তা পরিষ্কার করা। অতঃপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করা। অবশ্য পা পরে ধৌত করবে (আল-মুলতাকাত)। গোসলের মধ্যে প্রথমে লজ্জাস্থান ধৌত করা সুন্নাত, চাই এতে নাপাকী থাকুক বা না থাকুক যেমন সমস্ত শরীর ধৌত করার পূর্বে উযূ করা সুন্নাত, চাই উযূ থাকুক বা না থাকুক (শামানী)। হাসান (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী উযূতে মাথা মাসেহ্ করবে না। তবে সহীহ্ মতানুসারে উযূতে মাথাও মাসেহ্ করতে হবে (যাহিদী)। ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে" অনুরূপ বর্ণিত আছে। অতঃপর নিজ মাথায় ও সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালবে (যাহিদী)।

২. মাসআলা ঃ সহীহ্ বর্ণনা মতে প্রথমবার পানি ঢালা ফরয এবং বাকী দুইবার পানি ঢালা সুন্নাত (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। পানি ঢালার মাসনূন তরীকা হল, প্রথমে ডান কাঁধের উপর

তিনবার পানি ঢালা, অতঃপর বাম কাঁধের উপর তিনবার অতঃপর মাথা ও সমস্ত শরীরের উপর তিনবার পানি ঢালা (মি'রাজুদ দিরায়া)। এটাই সহীহ্ (যাহিদী)। অতঃপর গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধৌত করবে (মুহীত)। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি পানি জমা হওয়ার স্থানে গোসল করা হয়। যদি গোসলকারী ব্যক্তি কাঠ বা পাথরের উপর গোসল করে, তবে পা পরে ধৌত করবে না, বরং উযূর সময়েই ধুয়ে নেবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)।

কোন কোন ফকীহ্ এর মতে গোসলের ব্যাপারে আরো কতিপয় সুন্নাত এবং আদব রয়েছে। তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

৩. মাসআলা ঃ সুন্নাত হল, গোসলের শুরুতে মনে মনে নিয়্যাত করা এবং মুখে উচ্চারণ করা ঃ

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ اَوْ لِلْجَنَابَةِ –

অর্থাৎ ঃ "আমি জানাবাত দূর করার নিমিত্তে গোসলের নিয়্যাত করছি।" অতঃপর উভয় হাত ধৌত করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া। এরপর ইস্তিনজা করা (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। গোসলের মধ্যে পানি বেশী খরচ না করা ও কম খরচ না করা সুন্নাত। গোসলের সময় কিবলামুখী না হওয়া। প্রথম বারেই সমস্ত শরীর মর্দন করে নেয়া। এমন নির্জন স্থানে গোসল করা যেন কেউ না দেখে। গোসলের অবস্থায় কোন প্রকার কথা না বলা মুস্তাহাব। গোসলের পর সমস্ত শরীর রুমাল বা গামছা দিয়ে মুছে ফেলা (মুনিয়াতুল মুসাল্লী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গোসল ফরয হয় তিন কারণে তার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ প্রথম জানাবাত দুই কারণে জানাবাত হয়ে থাকে। এক. পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর লিঙ্গে ঢুকানো ব্যতিরেকে স্পর্শ-করণে অথবা দেখার কারণে কিংবা স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে বা হস্তমৈথুনের কারণে ও কামোত্তেজিত হওয়ার ফলে বীর্য নির্গত হওয়া (মুহীত)। পুরুষ থেকে নির্গত হোক বা মহিলা থেকে, ঘুমন্ত অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক (হিদায়া)। বীর্যাধার হতে পৃথক হওয়ার সময় কামভাব এবং উত্তেজনা পাওয়া জরুরী। লিঙ্গের মাথা থেকে বের হওয়ার সময় উত্তেজনা পাওয়া গেলে তা ধর্তব্য নয় (তাবয়ীন)।

কারো স্বপ্নদোষ হল অথবা কোন মহিলার প্রতি তাকানোর পর উত্তেজনার সাথে বীর্য তার নিজ স্থান হতে পৃথক হয়ে গেল অতঃপর দৃঢ়ভাবে লিঙ্গ ধারণ করার পর উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল এরপর বীর্য নির্গত হল, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে এ ধরনের ব্যক্তির উপর গোসল করা ফরয। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এর উপর গোসল করা ফরয নয় (খুলাসা)।

যদি কোন ব্যক্তি জুনবী হওয়ার পর পেশাব না করে বা ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে সালাত আদায় করে অতঃপর অবশিষ্ট বীর্য বেরিয়ে আসে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তার উপর গোসল করা ফরয। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে ইমামগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না (যখীরা)। যদি প্রস্রাব করা, নিদ্রা যাওয়া বা কিছু হাঁটা-চলা করার পর (গোসল করে সালাত আদায় করা হয় এবং এরপর) বীর্যপাত ঘটে, তবে ইমামগণের ঐকমত্যে তার উপর গোসল ফরয হবে না (তাবয়ীন)। কারো স্বপ্নদোষ হবার পর বীর্য যদি নিজ স্থান হতে পৃথক হয়ে যায় কিন্তু এখনো লিঙ্গের মাথা হতে বের হয়নি এমতাবস্থায় গোসল ওয়াজিব হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি যদি প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাবের সাথে বীর্য বের হয়ে আসে, তবে লিঙ্গ যদি উত্তেজিত থাকে তাহলে গোসল করা ওয়াজিব। আর লিঙ্গ যদি নিস্তেজ থাকে তবে উযূ করা ওয়াজিব (খুলাসা)। কোন মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস করার পর সে যদি গোসল করে, অতঃপর তার লিঙ্গ হতে যদি স্বামীর বীর্য বেরিয়ে আসে, তাহলে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব। গোসল করা ওয়াজিব নয়।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানায় অথবা উরুর উপর আর্দ্রতা দেখতে পায় এবং স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে এবং দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা মনি অথবা মযী অথবা সন্দেহ হয় যে, তা মনি অথবা মযী, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা ওদী, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

যদি সে জাগ্রত হওয়ার পর আর্দ্রতা দেখতে পায়, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা ওদী তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা মনী, তবে গোসল ওয়াজিব হবে। যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা মযী, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। আর যদি সন্দেহ হয় যে, তা মনী কিংবা মযী তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নদোষের ইয়াকীন না হবে গোসল ওয়াজিব হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে। শায়খুল ইসলাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কাযী আবূ আলী নাসাফী (র) থেকে বর্ণিত, হিশাম (র) তৎপ্রণীত কিতাব 'নাওয়াদির'-এ ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি তার লিঙ্গের অগ্রভাগে আর্দ্রতা দেখতে পায় কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে দেখতে হবে যে, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তার লিঙ্গ উত্তেজিত ছিল কিনা, যদি উত্তেজিত থাকে, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না। হাঁ যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা মনী, তবে গোসল ওয়াজিব হবে। আর যদি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে লিঙ্গ নিস্তেজ থাকে, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এ ধরনের মাসাইল বহুল সংগঠিত এবং এ সম্পর্কে মানুষ হল উদাসীন তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যদি স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে এবং বীর্যপাত ঘটার মজা আস্বাদন করে কিন্তু আর্দ্রতা দেখতে না পায়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে এ ব্যাপারে মহিলাদের বিধানও অনুরূপ। কেননা, স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরয হওয়ার শর্ত হল, মনী তাদের বহিঃযোনীতে বেরিয়ে আসা। এর উপরই ফাতওয়া (মিরাজুদ দিরায়া)।

যদি কোন ব্যক্তি বসা অবস্থায়, দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা চলা অবস্থায় নিদ্রা যায় অতঃপর জাগ্রত হওয়ার পর আদ্রতা দেখতে পায়, তাহলে এর হুকুম এবং কাত হয়ে শুয়ে নিদ্রা যাওয়ার হুকুম একই (মুহীত)। বিছানায় যদি মনী পাওয়া যায় কিন্তু তা কার থেকে নির্গত হয়েছে তা বুঝা যায় না, পুরুষ বলে মহিলার, মহিলা বলে পুরুষের, এমতাবস্থায় সহীহ্ মতানুসারে সতর্কতাবশত উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি যদি বেহুশ হয়ে যায় এবং হুশ আসার পর নিজের উরুতে বা কাপড়ে মযী দেখতে পায়, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়। উন্মাদ এবং নিশাপানকারী ব্যক্তির জন্য অনুরূপ হুকুমই প্রযোজ্য। তবে এদের হুকুম নিদ্রিত ব্যক্তিদের ন্যায় হবে না (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যদি কারো স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে কিন্তু আর্দ্রতা দেখতে না পায় এমতাবস্থায় কিছুক্ষণ পর তার যদি মযী নির্গত হয়, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ব্যক্তির রাত্রে স্বপ্নদোষ হয় অতঃপর জাগ্রত হয়ে আর্দ্রতার কোন নমুনা সে দেখল না, তাই উযূ করে ফজরের সালাত আদায় করল। এরপর মনী নির্গত হল, এমতাবস্থায় তার উপর গোসল করা ওয়াজিব (যখীরা)। অবশ্য পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। অনুরূপভাবে যদি কারো সালাত আদায়ের অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয় এবং বীর্যপাত না হয় কিন্তু সালাতান্তে বীর্যপাত ঘটে, তবে গোসল করা ওয়াজিব কিন্তু পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় লিঙ্গ প্রবেশ করানো। পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তাদ্বয়ের কোন এক রাস্তায় লিঙ্গ প্রবেশ করানো। যদি লিঙ্গের অগ্রভাগ (হাশফা) প্রবেশ হয়ে যায়, তবে সংশ্লিষ্ট উভয় ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। এটাই আমাদের মাযহাবের ফকীহ্‌দের মত (মুহীত)। উপরোক্ত মতটি বিশুদ্ধ (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কারো লিঙ্গের অগ্রভাগ কাটা থাকে, তবে অগ্রভাগ (হাশফা) পরিমাণ লিঙ্গ প্রবেশ করলেই গোসল ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ চতুষ্পদ জন্তুর সাথে, মৃত মানুষের সাথে এবং সহবাসের উপযোগী নয় এরূপ বালিকার সাথে মনী নির্গত হওয়া ব্যতিরেকে সহবাস করাতে গোসল ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, বালিকার সঙ্গমস্থলে যদি লিঙ্গ প্রবেশ করানো যায় এবং এ যদি তার শরীরে প্রবল আঘাত না হানে, তবে এ ধরনের বালিকাকেও সহবাসযোগ্য মনে করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কোন মহিলার সাথে তার বহিঃযোনীতে সঙ্গম করা হয় এবং মনী তার বাচ্চা-দানীতে পৌঁছে যায়, তবে এ মহিলা বাকেরা হোক বা ছায়্যিবা এর উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। কেননা, গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ এখানে পাওয়া যায়নি। আর তা হল, বীর্যপাত হওয়া বা লিঙ্গের অগ্রভাগ ঢুকে যাওয়া। কিন্তু উক্ত মহিলা যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে বীর্যপাত পাওয়া যাওয়ার কারণে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উক্ত মহিলা গর্ভবতী হলে সহবাসের সময় হতে তার উপর গোসল ফরয ছিল ধরতে হবে। ফলে ঐ সময় হতে পিছনের পূর্ণ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (আল-মুলতাকিত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা বলে যে, আমার নিকট জিন আসে এবং তার থেকে আমি ঐরূপ স্বাদ পাই যেরূপ স্বাদ আস্বাদন করি আমি আমার স্বামীর সহবাসের সময়, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। যদি দশ বছরের বালক কোন বালিগা মহিলার সাথে সহবাস করে, তবে মহিলার উপর গোসল করা ওয়াজিব কিন্তু বালকের গোসল করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য অভ্যস্ত বানানোর জন্য বালককে গোসলের হুকুম দেয়া হবে, যেমনিভাবে অভ্যস্ত বানানোর লক্ষ্যে তাদেরকে সালাত আদায়ের হুকুম দেয়া হয়। পুরুষ যদি বালিগ হয় এবং বালিকা না-বালিগা হয় কিন্তু সহবাসের উপযোগী, এমতাবস্থায় পুরুষের উপর গোসল করা ফরয। কিন্তু বালিকার উপর গোসল করা ফরয নয়। খাসী (অণ্ডকোষ কর্তিত) ব্যক্তির সহবাসে পুরুষ-মহিলা উভয়ের উপর গোসলকে ফরয করে দেয় (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ লিঙ্গে কাপড় জড়িয়ে যদি তা ঢুকানো হয় এবং বীর্যপাত না ঘটে কেউ কেউ বলেন, গোসল ফরয হবে। আর কেউ কেউ বলেন, গোসল ফরয হবে না। এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ রায় হল, কাপড় যদি এমন পাতলা হয় যে, এ অবস্থায়ও স্ত্রীর লিঙ্গের গরমী এবং স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে গোসল ফরয হবে। অন্যথায় গোসল ফরয হবে না। তবে সতর্কতা এবং উত্তম হল, উভয় অবস্থাতেই গোসল ফরয হওয়া।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন নপুংসক ব্যক্তি তার লিঙ্গ নিজ স্ত্রীর লিঙ্গের ভেতর প্রবেশ করায় বা তার পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করায়, তবে কারো উপরই গোসল ফরয হবে না। অনুরূপভাবে অন্য কোন হিজড়ার লিঙ্গে যদি প্রবেশ করায়, তবে কারো উপরই গোসল ফরয হবে না। কোন পুরুষ যদি নিজের লিঙ্গ কোন নপুংসকের লিঙ্গে প্রবেশ করায়, তবে পুরুষ ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হবে না। বীর্যপাত না ঘটলে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বীর্যপাত ঘটলে বীর্যপাত ঘটার কারণে গোসল ফরয হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঃ হায়েয ও নিফাস

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলার হায়েয বা নিফাসের রক্ত নিজ স্থান হতে বের হয়ে বহিঃ যোনিতে এসে যায়, তবে তার উপর গোসল ফরয হবে। বহিঃ যোনীতে না পৌঁছলে তাকে "বের হয়েছে" বলা যাবে না এবং হায়েয হিসাবেও গণ্য হবে না (তাবয়ীন)। কোন মহিলা যদি সন্তান প্রসব করার পর রক্ত নির্গত হতে না দেখে, তবে তার উপর গোসল ফরয হবে কি? সহীহ্ মতে ফরয হবে (যহীরিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ গোসল নয় প্রকার ঃ তিন প্রকার ফরয ।যেমন, জানাবাতের গোসল এবং হায়েয ও নিফাসের গোসল। **এক প্রকার ওয়াজিব** ।যেমন মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়া (মুহীত)। কাফির বক্তি যদি জুনুবী হয়, অতঃপর মুসলমান হয়, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে তার গোসল করা ওয়াজিব। কাফির মহিলা যদি তার রক্ত বন্ধ হওয়ার পর মুসলমান হয়, তবে তাকে গোসল করতে হবে না।

কোন বালিকা যদি হায়েযের মাধ্যমে বালিগা হয়, তবে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর তার উপর গোসল করা ফরয। বালক যদি স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বালিগ হয়, তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার

উপর গোসল করা ফরয (যাহিদী)। সতর্কতা এবং উত্তম হল, উপরোক্ত অবস্থাসমূহের সবকটিতেই গোসল ফরয হওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ চার প্রকারের গোসল সুন্নাত ।যথা জুমুআর দিন গোসল করা, দুই ঈদের দিন গোসল করা, আরাফাতের দিন গোসল করা এবং ইহ্রাম বাঁধার সময় গোসল করা। এক প্রকার গোসল মুস্তাহাব ।তা হল, জুনুবী ছিল না এমন কাফির ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার পর গোসল করা (মুহীত)। জুমুআর দিন জুমুআর সালাতের জন্য গোসল করা সুন্নাত। এটাই সহীহ্ কথা (হিদায়া)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সালাতে ফজরের পর গোসল করে এরপর উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় অতঃপর উযূ করে জুমুআর সালাত আদায় করে অথবা জুমুআর পর গোসল করে তাহলে সুন্নাত আদায় হবে না। যদি জুমুআ ও ঈদের একই দিন হয় এবং এ দিনে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর গোসল করে, তবে একই গোসলে তিন গোসলের কাজ সমাধা হবে (যাহিদী)।

"কাফী" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ফজরের পূর্বে গোসল করে এবং এ গোসলে জুমুআর সালাত আদায় করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে গোসলের ফযীলত লাভ করবে। কিন্তু ইমাম আবুল হাসান (র)-এর মতে গোসলের ফযীলত পাবে না (ফাতহুল কাদীর)। কোন কোন মাশাইখের বর্ণনা মতে, মক্কা প্রবেশ করার জন্য গোসল করা, মুযদালিফায় অবস্থান করার জন্য গোসল করা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শহর পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করা, পাগল সুস্থ হওয়ার পর গোসল করা এবং বালক বালিগ হওয়ার বয়সে পদার্পণ করার পর গোসল করা মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসাইল নিম্নে উল্লেখ করা হল।

জুনুবী ব্যক্তি যদি সালাতের ওয়াক্ত পর্যন্ত গোসল করাকে বিলম্বিত করে, তবে সে গুনাহ্গার হবে না (মুহীত)। শায়খ সিরাজুদ্দীন ছিন্দী (র) এ ব্যাপারে ফকীহ্দের ঐকমত্য (اجماع) উল্লেখ করেছেন যে, সালাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে অথবা যে কাজ তাহারাত ব্যতিরেকে আদায় করা যায় না এমন কাজের ইরাদা করার পূর্বে মুহ্দিছ (উযূহীন) ব্যক্তির উপর উযূ করা ওয়াজিব নয় এবং জুনুবী এ হায়েয-নিফাসওয়ালী মহিলার উপর গোসল করাও ওয়াজিব নয় (বাহ্রুর রাইক)। যে আমলসমূহ তাহারাত ব্যতীত আদায় করা যায় না, তা হল, সালাত, তিলাওয়াতের সিজদা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ইত্যাদি (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ যাহিরুর রিওয়ায়েতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, গোসলের ন্যূনতম পরিমাণ পানি হল এক সা' (সাড়ে তিন সের) এবং উযূর ন্যূনতম পরিমাণ পানি হল এক মুদ (এক সা' -এর চার ভাগের এক ভাগ)। কোন কোন ফকীহ্ উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি উযূ না করে তবে শুধু গোসলের জন্য এক সা' পরিমাণ পানি যথেষ্ট। আর যদি উযূ-গোসল উভয় কর্ম এক সাথে করা হয় তাহলে সা' -এর বাইরে এক মুদ দ্বারা উযূ করবে পরে এক সা' দ্বারা গোসল করবে। অধিকাংশ ফকীহ্র মত, এক সা' পরিমাণ পানিই উযূ-গোসল উভয়ের জন্য যথেষ্ট। এটাই বিশুদ্ধ মত। ফকীহ্গণ বলেন, উপরোক্ত পরিমাণ হল ঃ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিমাণ এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশ্য পালনীয় নয়। বরং এর চেয়ে কম পানিও যদি কারো জন্য যথেষ্ট হয় তবে সে এর চেয়ে কম ব্যবহার করবে। আর যদি এ পরিমাণ পানি কারো যথেষ্ট না হয়, তাহলে সে এর চেয়ে অধিক পানি ব্যবহার করতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অপব্যয় না হয় এবং কৃপণতাও না হয় (মুহীত)। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি এক মুদ হতে কম পরিমাণ পানির দ্বারা উযূ করে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে উযূ করে, তবে জাইয আছে (শরহুত তাহাবী)। উযূতে যে এক মুদের কথা বলা হয়েছে, তা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ইসতিনজার প্রয়োজন নেই। যদি কারো ইসতিনজার প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে সে এক রাতল (চল্লিশ তোলার মান সম্পন্ন ওজন) দ্বারা ইসতিনজা করবে এবং পরে এক মুদ দ্বারা উযূ করবে।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি (চামড়ার) মোযা পরিহিত অবস্থায় থাকে এবং তার ইস্তিনজা করার প্রয়োজন না থাকে, তবে এক রাতল পরিমাণ পানিই তার জন্য যথেষ্ট। উপরোক্ত পরিমাণ কোনটাই বাধ্যতামূলক নয়। কেননা, মানুষের অভ্যাস বিভিন্ন রকমের (শরহুল মাবসূত)। পুরুষ-মহিলা একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই (মুহীত)। জুনুবী ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়ার পর উযূ করা ব্যতিরেকে যদি পুনঃ স্ত্রী সহবাস করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে উযূ করে নেয়াই উত্তম। জুনুবী ব্যক্তি যদি পানাহার করতে চায়, তবে তার জন্য সমীচীন হল, কুলি করে উভয় হস্ত ধৌত করে নেয়া (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পানির বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ঃ]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে সব পানি দ্বারা উযূ করা জাইয তা তিন প্রকার

এক ঃ প্রবাহিত পানি

১. মাসআলা ঃ প্রবাহিত পানি ঐ পানিকে বলে, যা খড়-কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় (কানয ও খুলাসা)। প্রবাহিত পানির উপরোক্ত এ সংজ্ঞাটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা নেই (শরহে বেকায়া)। কারো কারো মতে, লোকে যাকে প্রবাহিত পানি বলে, তাই প্রবাহিত পানি। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন)। "নিসাব" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রবাহিত পানির ব্যাপারে ফাতাওয়া হচ্ছে এই যে, নাপাকীর কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত পানির রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণ পরিবর্তিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানি নাপাক হবে না (মুযমারাত)। প্রবাহিত পানির মধ্যে যদি কোন নাপাক বস্তু ফেলা হয় যেমন মৃত জানোয়ার ও শরাব, তাহলে পানির রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানি নাপাক হবে না (মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী)।

যদি ছোট খালে স্রোতের মুখে কুকুর শুয়ে থাকে এবং এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে আসে, তাহলে কুকুরের গায়ে লাগা প্রবাহিত পানি যদি কুকুরের গায়ে না লাগা পানির তুলনায় কম হয়, তবে তার নীচের দিক বসে উযূ করা দুরুস্ত হবে। অন্যথায় দুরুস্ত হবে না। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, আমি আমার শায়খদেরকে এ মতের উপরই পেয়েছি (শরহে বেকায়া ও মুহীত)। হিদায়া গ্রন্থকার "তাজনীস" কিতাবে এ মতকেই বিশুদ্ধতম বলে উল্লেখ করেছেন (বাহ্রুর রাইক)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ তিনটি গুণের কোন একটিও যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে এর দ্বারা উযূ করাতে কোন অসুবিধা নেই (শরহে বেকায়া)। "নিসাবে" বর্ণিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। পানি স্বচ্ছ হওয়ার কারণে নয় বরং পানি কম হওয়ার কারণে যদি পানির নীচের মৃত জানোয়ার দেখা যায় এবং তার কারণে যদি ছোট নহরের প্রস্থের দিকটি বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার গায়ে লেগে যে পানি প্রবাহিত হবে তার পরিমাণ অধিক বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি পানির নীচের জানোয়ার দেখা না যায় অথবা তা যদি ছোট নহরের প্রস্থের দিকে অর্ধেকের চেয়ে কম স্থান জুড়ে থাকে এমতাবস্থায় তার গায়ে লেগে আসা পানিকে অধিক পানি গণ্য করা হবে না (মুহীত)। ঘরের ছাদের উপর যদি নাপাকী থাকে এবং এর উপর বৃষ্টির পানি পতিত হলে তা যদি পয়-প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং নাপাকী যদি নর্দমার নিকটে থাকে, তবে সম্পূর্ণ পানি বা বেশীর ভাগ পানি বা অর্ধেক পানি যদি ঐ নাপাকী স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়, তাহলে সম্পূর্ণ পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ নাপাকী যদি ছাদের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এবং তা যদি নর্দমার মাথায় না থাকে, তবে পানি নাপাক হবে না। বরং ঐ পানির হুকুম প্রবাহিত পানির হুকুমের অনুরূপ (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। কোন কোন ফাতাওয়াতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের ইমামগণ বলেন, যতক্ষণ বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততক্ষণ ঐ পানির হুকুম প্রবাহিত পানির হুকুমের অনুরূপ হবে। সুতরাং ছাদে যদি নাপাকী লাগে অতঃপর বর্ষণ অবস্থায় নাপাকী মিশ্রিত পানির ফোঁটা যদি কাপড়ে লাগে, তাহলে কাপড় নাপাক হবে না। হ্যাঁ, গুণগত দিক থেকে যদি পানির মধ্যে পরিবর্তন আসে, তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। বৃষ্টির পানি যদি ছাদে পতিত হয় এবং ছাদে যদি নাপাকী থাকে আর ঐ নাপাকী মিশ্রিত পানির ফোঁটা যদি কাপড়ে লাগে, তাহলে ছাদ থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার পর বৃষ্টি যদি বন্ধ না হয়ে থাকে, তবে তা পাক (মুহীত)। "আতাবিয়্যাতে" বর্ণিত আছে যে, গুণগত দিক থেকে যদি পানির মধ্যে পরিবর্তন না আসে, তাহলে তা পাক (তাতারখানিয়্যা)। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি ছাদ থেকে কোন কিছু প্রবাহিত হয়, তবে তা নাপাক (মুহীত)। "নাওয়াযিলে" বর্ণিত আছে যে, আমাদের মাযহাবের পরবর্তীকালের ফকীহ্‌গণ বলেন, এটাই পসন্দনীয় মত (তাতারখানিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন খালে বা নহরে নাপাকী পড়ে এবং কোন মানুষ ঐ নাপাকীর নিকট থেকে আঁজলা ভরে পানি উঠিয়ে নেয়, তবে তা জাইয এবং এ পানি পাক বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণে কোন পরিবর্তন আসবে। খালের পানি উপরের দিক থেকে বন্ধ হয়ে গেলে তা "প্রবাহিত পানি" এ হুকুমের মাঝে কোন পরিবর্তন আসবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন মুসাফির ব্যক্তির নিকট একটি প্রশস্ত নর্দমা আছে এবং পাত্র ভরা এক পাত্র পানিও তার নিকট আছে, তবে এ পানি তার খুবই প্রয়োজনীয়, এদিকে পানি পাওয়ার ব্যাপারে সে আশাবাদী কিন্তু নিশ্চিত জানা নেই এমতাবস্থায় সে কি করবে? এ সম্বন্ধে শায়খ আবুল হাসান (র) বলেন, সে তার কোন সাথীকে নির্দেশ দিবে যেন সে নর্দমার এক প্রান্তে পানি ঢালে। অতঃপর সে ঐ নর্দমাতে উযূ করবে এবং নর্দমার অপর প্রান্তে একটি পাক পাত্র রেখে দিবে। এতে পানি গিয়ে জমা হবে। জমা হওয়া এ পানি নিজেও পাক এবং অন্যকে পাক করতেও সক্ষম। এটাই বিশুদ্ধ মত (যখীরা)। একটি ছোট হাউয থেকে যদি কোন ব্যক্তি খাল খনন করে তাতে প্রবাহিত করায় এবং ঐ প্রবাহিত পানি দ্বারা নিজে উযূ করে, অতঃপর এ পানি অন্যত্র গিয়ে জমা হয় এবং সে স্থান থেকে অপর এক ব্যক্তি খাল খনন করে তাতে ঐ পানি প্রবাহিত করায় এবং ঐ পানি দ্বারা উযূ করে, তবে সকলের উযূই দুরুস্ত হবে। যদি উভয়ের স্থানের মাঝে কিছু দূরত্ব থাকে। যদিও দূরত্ব কম হয় না কেন। অনুরূপভাবে দু'টি গর্তের একটি থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে যদি অপরটিতে যায় এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্যস্থলে বসে উযূ করে, তবে তার উযূ সহীহ্ হবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ খালের পাড়ে সারিবদ্ধ বসে যদি লোকেরা উযূ করে, তবে উযূ দুরুস্ত হবে। এটাই সহীহ্ মত (মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী)। হাউয যদি এমন ছোট হয় যে, তার এক পার্শ্ব দিয়ে পানি এসে অন্য পার্শ্ব দিয়ে পানি বেরিয়ে যায়, তবে এ ধরনের হাউযের যে কোন পার্শ্বে বসে উযূ করা

জাইয। এর উপরই ফাত্ওয়া। এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই যে, চতুষ্পার্শ্বে চার হাত হলে উযূ জাইয হবে এবং কম হলে জাইয হবে না (শরহে বেকায়া, যাহিদী ও মি'রাজুদ্দিরায়া)। একটি ছোট হাউয যার পানি নাপাক ছিল, অতঃপর এর একদিক হতে পাক পানি এসে অপরদিক দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল, এ ধরনের হাউয সম্পর্কে ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, যখন হতে এর পানি অপরদিক দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন হতে ঐ হাউযের পানি পাক বলে বিবেচিত হবে। সদ্‌রুশ শহীদ (র) এ মতটিকে পসন্দ করেছেন। (মুহীত)। "নাওয়াযিলে" বর্ণিত আছে যে, আমরা এ মতের উপরই আমল করি (তাতারখানিয়্যা)। এক দিক দিয়ে পানি প্রবেশ করে এখনো অন্য দিক দিয়ে বের হয়নি, কিন্তু লোকেরা অঞ্জলি ভরে যদি তার পানি ফেলে দেয়, তবু এর পানি পাক হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। (الغرف المتدارك) এর মানে হল, দুই অঞ্জলির মাঝে স্বল্প পরিমাণ পানিও বিদ্যমান না থাকা (যাহিদী)।

৫. মাসআলা ঃ আমাদের ইমামদের মতে গোসলখানার হাউযের পানি পাক, যতক্ষণ না এর মধ্যে নাপাকী পতিত হয়েছে বলে জানা যায়। যদি কারো হাতে নাপাকী থাকে এবং তা সে হাউযের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, তবে এর পানি যদি স্থির পানি হয় অর্থাৎ পাইপ দিয়ে এর মধ্যে কোন পানি প্রবেশও করছে না এবং পাত্র দিয়ে কেউ পানি উঠিয়েও নেয়নি, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদি ঐ হাউযের পানি লোকেরা পাত্র দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু পাইপ দ্বারা এর মধ্যে কোন পানি না ঢুকে অথবা পাইপ দিয়ে এর মধ্যে পানি আসে কিন্তু পাত্র দ্বারা কেউ পানি উঠিয়ে নেয় না, তাহলে অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে পানি নাপাক হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ফাত্ওয়া এ কথার উপরই (মুহীত)। প্রবাহিত পানির তিনটি গুণের কোন একটি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পর এবং তার উপর নাপাকীর হুকুম দেয়ার পর উপরোক্ত বিবর্তন দূরীভূত হওয়ার পূর্বে পুনরায় এর পবিত্রতার হুকুম দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, পরিবর্তন বিদূরিত হলে অর্থাৎ এতে যদি পাক পানি নিপতিত হয় এবং এতে যদি এর বিবর্তন বিদূরিত হয়, তাহলে পানি পাক বলে বিবেচিত হবে (মুহীত)।

দুই ঃ স্থির পানি

৬. মাসআলা ঃ স্থির পানি যদি অধিক পরিমাণ হয়, তবে তা প্রবাহিত পানির হুকুমের অনুরূপ। এর কোন এক প্রান্তে নাপাকী পতিত হওয়ার কারণে এর সমস্ত পানি নাপাক হবে না। কিন্তু যদি এর রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত। অধিকাংশ মাশাইখ এ মতটি গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। যে স্থানে নাপাকী পতিত হয়েছে তা নাপাক হবে কি না এ সম্পর্কে ফকীহ্‌গণ বলেন, নাপাকী যদি দৃশ্যমান হয়, তবে সকলের মতানুসারেই ঐ স্থান নাপাক হয়ে যাবে এবং ঐ স্থান হতে ছোট হাউযের এক হাউয পরিমাণ দূরে সরে উযূ করতে হবে। নাপাকী যদি দৃশ্যমান না হয়, তাহলে ইরাকের মাশাইখদের মতে এর হুকুমও অনুরূপই। কিন্তু বুখারার মাশাইখদের মতে নাপাকী পতিত স্থান হতে উযূ করাও দুরুস্ত আছে (খুলাসা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৭. মাসআলা ঃ ছোট হাউযের পরিমাণ হল, চার হাত লম্ব ও চার হাত চওড়া (কিফায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বড় হাউয প্রবাহিত পানির হুকুমের ন্যায়। গুণাগুণের দিক থেকে এর মাঝে পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত তা নাপাক হবে না। এ ব্যাপারে কোন তারতম্য নেই (ফাতহুল কাদীর)। অধিক পানি এবং কম পানির পরিচয় হল এই যে, হাউযের এক প্রান্তে নাপাকী পতিত হলে এর ক্রিয়া যদি অন্য প্রান্তে প্রকাশ পায় অর্থাৎ যে প্রান্তের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রান্তের নাপাকী যদি অন্য প্রান্তে পৌছে যায়, তাহলে তাকে "কম পানি" বলা হবে। আর যদি এক প্রান্তের নাপাকী অন্য প্রান্তে না পৌছে, তবে তাকে "বেশী পানি" বলা হবে। আবূ সুলায়মান জুরজানী (র) বলেন, হাউয যদি দশ হাত লম্বা এবং দশ হাত চওড়া হয়, তবে এক প্রান্তের নাপাকীর ক্রিয়া অপর প্রান্তে পৌছতে পারে না। অধিকাংশ মাশাইখ এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। গভীরতার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কথা হল এই যে, হাউয এমন হতে হবে যে, হাত দিয়ে পানি উঠাতে গিয়ে মাটি প্রকাশিত না হয়ে যায়। এটাই সহীহ্ (হিদায়া)। পরিমাপের ক্ষেত্রে কিরবাসী হাত গ্রহণযোগ্য (যহীরিয়্যা)। এ কথার উপরই ফাতওয়া (হিদায়া)। সাধারণত ছয় মুষ্ঠি বা চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হাত হয় (তাবয়ীন)। হাউয যদি গোলাকার হয়, তবে তা আটচল্লিশ হাত হতে হবে (খুলাসা)। এতে সাবধানতা নিহিত আছে (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ দুর্গন্ধময় বড় হাউযের নাপাকী সম্পর্কে যদি জানা না থাকে, তাহলে এর পানি দ্বারা উযূ করা জাইয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "ফাতাওয়াতে" উল্লেখ আছে যে, একটি বড় পুকুর যদি এমন হয় যে, গরমের দিন তাতে পানি থাকে না, মানুষ এবং পশু এতে পায়খানা করে। কিন্তু বর্ষার দিনে পানি এসে উহা ভরে যায় এবং বরফও জমে যায়। তাহলে দেখতে হবে যে, প্রবেশকারী পানি নাপাক স্থান দিয়ে প্রবেশ করে কিনা। যদি নাপাক স্থান দিয়ে প্রবেশ করে, তবে পানি ও বরফ উভয়ই নাপাক হয়ে যাবে। যদিও পানির পরিমাণ অধিক হয়। পানি যদি কোন পাক স্থান দিয়ে প্রবেশ করে এবং ঐ স্থানে স্থির থেকে দশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া হয়ে পরে নাপাক স্থানে গিয়ে পৌছে, তবে পানি ও বরফ উভয়ই পাক বলে বিবেচিত হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৯. মাসআলা ঃ বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় অথবা ঘন পরস্পর মিলিত শস্য বিশিষ্ট ক্ষেতে যদি দশ হাত-দশ হাত পরিমাণ পানি থাকে এবং সে পানি দিয়ে কেউ উযূ করে, তবে উযূ দুরুস্ত হবে। বাঁশ পরস্পর মিলিত থাকায় পানি মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি এমন হাউযের পানি দ্বারা উযূ করে যার সমস্ত পানি তলানিতে ভরে গেছে বা যার পানির উপর সবুজ বর্ণের আবরণের ন্যায় পড়ে গেছে, যাকে ফারসী ভাষায় جغزباره বলা হয়, তাহলে এ সমস্ত তলানি যদি নাড়ার সাথে পানির সঙ্গে মিশে যায়, তবে উযূ দুরুস্ত হবে (খুলাসা)। যদি কোন হাউযের পানি জমে যায় এবং তা এমন পাতলা হয় যে, পানি নাড়া দিলে তা বিগলিত হয়ে যায়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ করা জাইয। আর যদি পানির উপর বরফ খণ্ড পৃথক পৃথকভাবে এমন বেশী পরিমাণ হয় যে, পানি নাড়া দিলেও তা নড়ে না, তবে এ পানি দ্বারা উযূ জাইয হবে না। যদি বরফ এরূপ স্বল্প পরিমাণ হয় যে, পানিতে নাড়া দিলে তা নড়ে তবে এ পানি দ্বারা উযূ করা জাইয (মুহীত)। বড় হাউযের পানি বরফ হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ তা ছিদ্র করে দেয় এবং

এতে কেউ উযূ করে ও ছিদ্র গর্তের নিকটে বসে উযূ করে, তবে উযূ দুরুস্ত হবে না। অন্যথায় জাইয হবে (ফাতহুল কাদীর)। যদি বরফের ছিদ্র হতে পানি বের হয়ে বরফের উপর এমনভাবে জমা হয় যে, যদি আঁজলা ভরে পানি উঠানো হয়, তবে নীচের বরফ প্রকাশিত হয় না, তাহলে ঐ পানিতে উযূ করা জাইয। অন্যথায় জাইয নয়। যদি বরফের ছিদ্রের উপর জমা হওয়া পানি তশ্‌তরীর পানির ন্যায় হয়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ জাইয হবে না। হ্যাঁ, ছিদ্র যদি দশ হাত দশ হাত পরিমাণ হয়, তাহলে উযূ জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সমুদ্র তীরে বসবাসকারী লোকদের ঘাটলাও হাউযের অনুরূপ। যদি এর পানি বরফ হয়ে যায় এবং পানি যদি ঘাটের কাঠ থেকে পৃথক হয়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ জাইয। আর যদি মিলিত হয়, তবে উযূ জাইয হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ হাউয যদি উপরের দিক দিয়ে দশ-দশ হাতের কম হয় এবং নীচের দিক দিয়ে দশ হাত পরিমাণ বা এর থেকে বেশী হয় এমতাবস্থায় এ হাউযে নাপাকী পতিত হওয়ার ফলে এর উপরিভাগ "নাপাক হয়ে যাওয়ার হুকুম" দেয়ার পর এর পানি যদি কমে দশ হাতের মধ্যে এসে যায় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে এ পানির দ্বারা উযূ-গোসল দুরুস্ত হবে (মুহীত)। কোন হাউয যদি দশ হাত হতে কম হয় কিন্তু গভীর হয় এমতাবস্থায় এতে যদি নাপাকী পতিত হয় এবং পরে তা যদি সম্প্রসারিত হয়ে দশ হাতে পরিণত হয়, তবে ঐ হাউয নাপাকই থাকবে। যদি কোন হাউয একশত বর্গ হাত থাকা অবস্থায় তাতে নাপাকী পতিত হয় এবং পরে তা সঙ্কুচিত হয়ে দশ দশ হাত হতে কম হয়ে যায়, তাহলে তা পাক হিসাবেই গণ্য হবে (খুলাসা)। কোন পুকুরের পানির উপর নাপাকীর হুকুম দেয়ার পর তার পানি যদি শুকিয়ে যায় এবং এর নিম্নভাগও শুকিয়ে যায়, তাহলে তা পাক বলে হুকুম দেয়া হবে। এ হাউযে যদি পুনরায় পানি আসে, তবে এর পানি পাক ও নাপাক হওয়া সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান আছে। তবে সুস্পষ্ট মত হল এ পানি পুনরায় নাপাক হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

তিন কূপের পানি ঃ

১১. মাসআলা ঃ যে সব বস্তু কূপে পতিত হওয়ার কারণে তার পানি ফেলে দেয়া হয়, তা দুই প্রকার।

এক ঃ যে সব বস্তু কূপে পতিত হওয়ার কারণে তার পানি ফেলে দেয়া ওয়াজিব।

কূপে যদি নাপাকী পতিত হয়, তবে (নাপাক বস্তু উঠিয়ে তারপর) এর পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। পানি উঠিয়ে ফেলাতেই কূপ পবিত্র হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ সকলেই একমত (হিদায়া)। উট ও বকরীর লাদি যদি কূপে পতিত হয়, তবে তা বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত কূপ নাপাক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, লোকে যাকে অধিক মনে করে তা অধিক এবং যাকে কম মনে করবে তা কম বিবেচিত হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য কথা (তাবয়ীন)। কূপে বালতি ফেলার পর কোন বালতি যদি লাদি থেকে খালি না থাকে, তবে তাকেই "অধিক লাদি" গণ্য করা হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (শরহুল মাবসূত ও নিহায়া)। আল্ জামিউস্ সগীরে বর্ণিত আছে যে, অক্ষত, টুকরা টুকরা এবং শুষ্ক ও ভিজা লাদির

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাঝে কোন তারতম্য নেই (খুলাসা)। অনুরূপভাবে ঘোড়ার লাদি, গোবর এবং উটের লাদির মাঝেও কোন পার্থক্য নেই (হিদায়া)। এমনিভাবে শহর এবং গ্রামের কূপের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই (তাবয়ীন)। এটাই সহীহ্ মত। কেননা, গ্রামে ও গোসলখানায় যেমন কূপের প্রয়োজনীয়তা আছে, অনুরূপভাবে শহরেও কূপের প্রয়োজনীয়তা আছে (মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন কূপের মধ্যে বকরী কিংবা কুকুর বা মানুষ পড়ে মারা যায় অথবা কোন জানোয়ার পড়ে মরে ফুলে যায় অথবা ফেটে যায়, জানোয়ার বড় হোক বা ছোট হোক, কূপের সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে (হিদায়া)। অনুরূপভাবে কূপে পড়ে যদি কোন জানোয়ারের পশম উঠে যায়, তাহলে তা ফেটে যাওয়ার মতই (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি বকরীর ন্যায় কোন জানোয়ার কূপে পতিত হয় এবং জীবিত অবস্থায়ই তুলে ফেলা হয়, তাহলে সহীহ্ মতানুসারে তা যদি নাপাক জানোয়ার না হয় এবং শরীরেও কোন নাপাকী না থাকে আর মুখও পানিতে ডুবেনি, তবে পানি নাপাক হবে না। আর মুখ যদি পানিতে ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে এর ঝুটার প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। ঝুটা পাক হলে পানিও পাক এবং ঝুটা নাপাক হলে পানিও নাপাক এবং সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে। যদি ঝুটা মাশকুক (সন্দেহযুক্ত) হয়, তবে পানিও মাশকুক হবে এবং সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে। যদি ঝুটা মাকরূহ্ হয়, তবে পানিও মাকরূহ্ হবে, এমতাবস্থায় সমস্ত পানি ফেলে দেয়া মুস্তাহাব। যদি উক্ত জানোয়ার নাপাক হয়, যেমন শূকর, তাহলে সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও এর মুখ পানিতে ডুবে না থাকে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কুকুর নাপাক জানোয়ার নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর মুখ পানিতে না ঢুকবে পানি নাপাক হবে না (তাবয়ীন)।

যে সমস্ত হিংস্র জানোয়ার এবং পাখীর গোশ্‌ত খাওয়া দুরুস্ত নয় এগুলোর হুকুমও অনুরূপই। কূপে পতিত হওয়ার পর যদি জীবিত বের করা হয় এবং এগুলোর মুখ পানিতে ডুবেওনি, তাহলে পানি নাপাক হবে না (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কাফিরের মৃতদেহ গোসলের আগে ও পরে উভয় অবস্থাতেই নাপাক (যহীরিয়্যা)। মুসলমানের মৃতদেহ যদি পানিতে পতিত হয়, তবে গোসলের পূর্বে পতিত হলে পানি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু গোসলের পর পতিত হলে পানি নাপাক হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত (তাতারখানিয়্যা)। অকাল গর্ভপাতের মাধ্যমে প্রসূত অসম্পূর্ণ ভ্রূণ যদি জন্মের পর আওয়াজ করে, তবে এর হুকুম বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের অনুরূপই। যদি সে গোসলের পর পানিতে পতিত হয়, তবে পানি নাপাক হবে না। আর যদি গর্ভপাতের পর আওয়াজ না দিয়ে থাকে, তাহলে বহুবার গোসল দেয়ার পর পতিত হলেও পানি নাপাক হয়ে যাবে। শহীদ ব্যক্তি স্বল্প পানিতে পতিত হলেও পানি নষ্ট হবে না। কিন্তু তার থেকে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি কোন কূপের সমস্ত পানি ফেলে দেয়া ওয়াজিব হয় কিন্তু তাতে স্রোত আসার কারণে যদি সমস্ত পানি ফেলে দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে দুইশত বালতি পানি ফেলে দিতে হবে (তাবয়ীন)। এটাই সহজ পন্থা। এটাই শরহুল মুখতারের পসন্দনীয় মত। তবে বিশুদ্ধতম মত

হল, যাদের পানি সম্বন্ধে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি আছে এ ধরনের দুই জন ব্যক্তির রায় গ্রহণ করা হবে। "কূপে যে পরিমাণ পানি ছিল" তারা বলবেন,. সে পরিমাণ পানি ফেলে দিতে হবে। ফিক্‌হের বা প্রজ্ঞার সাথে এ মতটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (কাফী, শরহুল মাবসূত ও তাবয়ীন)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন কূপে মোরগ, বিড়াল অথবা কবুতর অথবা এ ধরনের অন্য কোন প্রাণী পড়ে মারা যায় কিন্তু ফুলেনি এবং ফাটেওনি, তাহলে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে (মুহীত)। এটাই পরিষ্কার কথা (হিদায়া)। যদি কূপের মধ্যে ইঁদুর বা চড়ুই পড়ে মারা যায় এবং মরার সাথে সাথে যদি ফুলার পূর্বে তাকে বের করে ফেলা হয়, তাহলে কুড়ি বালতি থেকে ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে (মুহীত)। ইঁদুর বের করার পূর্বে যে পানি ফেলা হয়, তা ধর্তব্য নয় (তাবয়ীন)। জীবিত ইঁদুর কূপে পড়ে মারা যাওয়া এবং মরে কূপে পড়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অন্যান্য জানোয়ারের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য (আল বাহ্‌রুর রাইক)। ইঁদুরের লেজ কেটে তা নিক্ষেপ করা হলে সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে। যদি কাটা স্থানে মোম লাগিয়ে দেয়া হয় তবে ঐ পরিমাণ পানিই ফেলতে হবে যে পরিমাণ পানি ফেলার নির্দেশ রয়েছে গোটা ইঁদুরের বেলায় (আল্ জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি হালামা (কীট) কূপে পড়ে মরে যায়, তবে এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী কুড়ি বালতি অথবা ত্রিশ বালতি পানি ফেলতে হবে। যদি ওই সাপ কূপে পড়ে মারা যায়, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ বালতি ফেলতে হবে। ছোট চড়ুই এর হুকুম ইঁদুরের হুকুমের অনুরূপ এবং ঘুঘু পাখীর হুকুম বিড়ালের হুকুমের অনুরূপ। সুতরাং এ ধরনের পাখী যদি কূপে পড়ে, তবে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যে সমস্ত প্রাণী ইঁদুর ও মোরগের মাঝামাঝি ধরনের হবে এগুলোর হুকুম ইঁদুরের হুকুমের অনুরূপ হবে। আর যে সমস্ত প্রাণী মোরগ ও বকরীর মাঝামাঝি ধরনের হবে, তা মোরগের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ হল যাহিরুর রিওয়ায়েতের কথা (তাতারখানিয়্যা)। দুই প্রাণীর মাঝামাঝি ধরনের প্রাণীর হুকুম সর্বদা ছোটটির হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে (আল্ জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

১৮. মাসআলা ঃ কূপ পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে বালতি, রশি, চরখা, কূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গা এবং হাতও পবিত্র হয়ে যাবে (মুহীত)। যদি কূপের মধ্যে নাপাক কাঠ বা নাপাক কাপড়ের টুকরা পতিত হয় এবং তা কূপ হতে বের করা অসম্ভব হয় এবং তা অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে কূপ পাক হওয়ার সাথে সাথে কাঠ এবং কাপড়ও পাক হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। যে কূপ হতে বিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব ছিল ঐ কূপ হতে যদি এক বালতি পানি উঠিয়ে অন্য এক পাক কূপে ফেলা হয়, তবে ঐ কূপ হতেও বিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। এখানে প্রকৃত নিয়ম হল এই যে, দ্বিতীয় কূপে নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে বালতি প্রথমে কূপে ফেলার অবস্থায় প্রথম কূপটি যত বালতি পানি উঠানোর দ্বারা পাক হবে দ্বিতীয় কূপটিও তত বালতি পানি উঠানোর দ্বারা পাক হবে। দ্বিতীয় কূপে যদি দ্বিতীয় বালতির পানি ফেলা হয়, তাহলে তা থেকে উনিশ বালতি পানি ফেলতে হবে। আর যদি দশম বালতির পানি দ্বিতীয় কূপে ফেলা হয়, তাহলে ফকীহ্ আবূ হাফ্‌স (র)-এর বর্ণনা অনুসারে তা থেকে এগার বালতি পানি ফেলে দিতে হবে। এটাই শুদ্ধ মত (আল্ বাদাই')।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি কূপ হতে ইঁদুর বের করে অন্য কূপে ফেলা হয় এবং প্রথম কূপ হতে বিশ বালতি পানি উঠিয়ে দ্বিতীয় কূপে ঢালা হয়, তবে দ্বিতীয় কূপ হতে ঐ ইঁদুর বের করে প্রথম কূপের ন্যায় তা থেকেও বিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২০. মাসআলা ঃ দু'টি কূপ যদি এমন হয় যে, তাদের প্রত্যেকটি থেকে বিশ বালতি করে পানি ফেলে দেয়া ওয়াজিব ছিল। অতঃপর একটি থেকে যদি বিশ বালতি পানি উঠিয়ে অপরটিতে ঢালা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি থেকে বিশ বালতি পানি উঠালেই যথেষ্ট হবে। যদি দু'টি কূপের একটি থেকে বিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব হয় আর অপরটি থেকে চল্লিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব হয়, এমতাবস্থায় যদি প্রথমটি হতে বিশ বালতি উঠিয়ে দ্বিতীয়টিতে ফেলা হয়, তাহলে দ্বিতীয় কূপ হতে চল্লিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। এ ব্যাপারে আসল নিয়ম হল এই যে, আমাদেরকে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে, যে কূপ হতে পানি উঠানো হয়েছে এবং যে কূপে ফেলা হয়েছে এগুলো হতে কী পরিমাণ পানি উঠানো ওয়াজিব ছিল। যদি উভয়টি হতে সমপরিমাণ পানি উঠানো ওয়াজিব হয়, তাহলে একটি অন্যটির মধ্যে (تداخل) (অনুপ্রবিষ্ট) হয়ে যাবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি থেকে বিশ বালতি করে পানি উঠিয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। যদি একটির পরিমাণ বেশী হয়, তাহলে কম অধিকের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কূপ যদি তিনটি থাকে এবং প্রত্যেকটি থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় যদি দু'টি কূপ হতে ওয়াজিব পরিমাণ পানি উঠিয়ে তৃতীয় কূপে ফেলা হয় তাহলে তৃতীয় কূপ হতে চল্লিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে (আল্‌বাদাই')। আর যদি তৃতীয় কূপের মধ্যে এক কূপ হতে বিশ বালতি এবং অপর কূপ হতে বিশ বালতি পানি ফেলা হয়, তবে তৃতীয় কূপ হতে ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে (মুহীত)। দু'টি কূপের একটি থেকে যদি বিশ বালতি এবং অপরটি থেকে যদি চল্লিশ বালতি পানি ফেলে দেয়া ওয়াজিব হয় এমতাবস্থায় যদি উভয় কূপ হতে ওয়াজিব পরিমাণ পানি উঠিয়ে অন্য একটি পাক কূপে ফেলা হয়, তবে ঐ কূপ হতে চল্লিশ বালতি পানি ফেলে দিলেই ঐ কূপ পাক হয়ে যাবে। পূর্বোল্লিখিত নিয়মের দাবী এটাই। যে কূপ হতে চল্লিশ বালতি পানি উঠানো ওয়াজিব ছিল তা থেকে যদি এক বালতি উঠিয়ে এমন কূপে ফেলা হয় যে কূপের বিশ বালতি পানি ফেলে দেয়া ওয়াজিব ছিল, তাহলে এ কূপ হতে চল্লিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে (আল-বাদাই')।

২১. মাসআলা ঃ "নাওয়াদিরে" বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মটকিতে ইঁদুর পড়ে মারা যায়, অতঃপর ঐ মটকির পানি কোন একটি কূপের মধ্যে ঢালা হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কূপ হতে ঐ পরিমাণ পানি ফেলে দিবে যা ঢালা পানির তুলনায় বেশী হবে এবং বিশ বালতির চেয়েও অধিক হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত)। ফাতাওয়াতে বর্ণিত আছে যে, যদি এ ধরনের মটকির এক ফোঁটা পানিও কোন কূপে পতিত হয়, তাহলে ঐ কূপ হতে বিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আর যদি মটকিতে ইঁদুর পড়ে ফেটে যায় এবং এর এক ফোঁটা পানিও কোন কূপে ফেলা হয়, তাহলে কূপের সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

২২. মাসআলা ঃ পবিত্র পানির কূপ যদি নাপাক পানির কূপের নিকটে হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত পানির রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণে পরিবর্তন না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পাক থাকবে (যহীরিয়্যা)। এতদুভয় কূপের মাঝে কতটুকু দূরত্ব থাকতে হবে, তার নির্ধারিত কোন সীমা নেই। তাই উভয় কূপের মাঝে দশ হাত দূরত্ব থাকা অবস্থায়ও যদি নাপাক কূপের ক্রিয়া পাক কূপের পানিতে অনুভূত হয়, তবে কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি উভয় কূপের মাঝে এক হাত দূরত্ব থাকে কিন্তু নাপাক কূপের কোন ক্রিয়া পাক কূপের পানিতে অনুভূত না হয়, তাহলে কূপের পানি পবিত্রই থাকবে (মহীত)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত)। কূপের মধ্যে ইঁদুর বা এ জাতীয় কোন প্রাণী যদি পাওয়া যায় এবং জানা না থাকে যে, কখন পতিত হয়েছে এবং তা যদি না ফুলে থাকে, তবে এ পানি দিয়ে যারা উযূ করেছে তাদেরকে একদিন ও এক রাতের সালাত পুনরায় আদায় করে নিতে হবে এবং যে সব আসবাব এ পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে তা পাক পানি দ্বারা পুনরায় ধৌত করে নিতে হবে। আর তা যদি ফুলে বা ফেটে গিয়ে থাকে, তাহলে তিন দিন তিন রাত্রের সালাত পুনঃ আদায় করে নিতে হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, "কখন পতিত হয়েছে" একথা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত কোন সালাতই পুনঃ আদায় করতে হবে না (হিদায়া)। যদি পতিত হওয়ার সময় জানা যায় তা হলে ঐ সময় হতে উযূ-সালাত সব কিছুই পুনরায় আদায় করতে হবে। যদি ঐ পানি দিয়ে আটার খামীরা তৈরী করা হয়ে থাকে, তবে ইস্‌তিহ্‌সানের তাকাযা (সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে) অনুসারে ঐ প্রাণী যদি ফেটে গিয়ে থাকে, তাহলে তিন দিন হতে উক্ত পানি দ্বারা তৈরী আটার রুটি খাওয়া যাবে না। আর যদি ফেটে না থাকে, তবে এক দিন হতে যে আটা মাখা হয়েছে, তা খাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত এটাই (মুহীত)।

দুই ঃ যে সব বস্তু কূপে পতিত হওয়ার কারণে কূপের পানি ফেলে দেয়া মুস্তাহাব

২৩. মাসআলা ঃ যদি কোন কূপে ইঁদুর পতিত হয়, তাহলে বিশ বালতি পানি ফেলে দেয়া মুস্তাহাব। বিড়াল এবং ছাড়া মোরগ কূপে পতিত হলে চল্লিশ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলা মুস্তাহাব। কেননা, এ সব প্রাণীর ঝুটা মাকরূহ। প্রায়ই এ সব প্রাণী পানিতে পতিত হলে এদের মুখ পানিতে ডুবে যায়। তাই এদের কূপে পতিত হওয়ার কারণে বিশ বালতি এবং চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এদের মুখ পানিতে ডুবেনি, তাহলে পানি উঠানোর কোনই প্রয়োজন নেই। মোরগ যদি ছাড়া না থাকে, তাহলে পানি উঠাতে হবে না। এসব কথা যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা। "যত জায়গায় পানি উঠিয়ে ফেলা মুস্তাহাব" বলা হয়েছে, তা বিশ বালতি থেকে কমানো যাবে না। ইবরাহীম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) নাওয়াদিরে এর দিকেই ইংগিত করেছেন (মুহীত)। মাকরূহ পানি দশ বালতি পরিমাণ ফেলে দেয়া মুস্তাহাব (খুলাসা, নিহায়া ও ফাতহুল কাদীর)। ফাতাওয়ার উদ্ধৃতিতে বাদাই' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কূপে বকরী পতিত হবার পর যদি জীবিত বেরিয়ে আসে, তবে পবিত্রতার উদ্দেশ্যে নয় বরং মনের প্রশান্তির লক্ষ্যে দশ বালতি পানি ফেলে দেয়া হবে। সুতরাং পানি ফেলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যতিরেকেই যদি কোন ব্যক্তি উক্ত পানি দ্বারা উযূ করে, তবে উযূ শুদ্ধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত জিনিস দ্বারা উযূ জাইয নেই

১. মাসআলা ঃ তরমুজ, শসা, কাঁকরোল, খিরা, বাঙ্গির পানি দ্বারা উযূ জাইয নেই। গোলাপের পানি দ্বারা উযূ জাইয নেই। শরাবের দ্বারা উযূ জাইয নেই। অনুরূপভাবে সিরকা জাতীয় তরল বস্তু দ্বারাও উযূ জাইয নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। লবণের পানি দ্বারা উযূ জাইয নেই (খুলাসা)। সাবান মিশ্রিত পানি এবং উশনানের পানির তরলতা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা উযূ দুরুস্ত হবে না। কিন্তু যদি এগুলোর তরলতা বাকী থাকে, তবে উযূ জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আঙ্গুর নিংড়ানো রস দ্বারাও উযূ জাইয নেই (কাফী, মুহীত ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত (আল্‌বাহ্‌রুর রাইক ও আননাহ্‌রুল ফাইক)। এতেই সাবধানতা নিহিত আছে (ইবরাহীম হালবী প্রণীত শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী)।

২. মাসআলা ঃ শীতের মওসুমে পানিতে গাছের পাতা পতিত হওয়ার কারণে যদি পানির রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের অধিকাংশ ইমামের মতে এ পানির দ্বারা উযূ জাইয হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। জাফরান, গোলাপ ও হলুদে রং মিশ্রিত পানি যদি পাতলা থাকে এবং পানি যদি পরিমাণে বেশী হয়, তবে এ পানির দ্বারা উযূ করা জাইয হবে। আর যদি পানি গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা উযূ করা জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পানিতে যদি ফিটকিরি বা ঔষধ ফেলা হয় এবং এ পানি দিয়ে লিখলে যদি লেখা না দেখা যায়, তবে এর দ্বারা উযূ দুরুস্ত হবে। যদি লেখা দেখা যায়, তবে উযূ জাইয হবে না '(তানজীস)।' এর হাওয়ালায় বাহ্‌রুর রাইক)। কাদা মাটি, চুনা বা সুরকি পানিতে পতিত হওয়ার কারণে অথবা দীর্ঘ অবস্থানের কারণে পানি যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলেও এ পানির দ্বারা উযূ জাইয হবে (আল্‌বাদাই')।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বৃষ্টির পানি দ্বারা উযূ করে, তবে উযূ দুরুস্ত হবে। যদিও এ পানির সাথে মাটি মিশ্রিত থাকে। তবে শর্ত হল, পানির পরিমাণ বেশী হতে হবে এবং পানি পাতলা থাকতে হবে। চাই এ পানি সুপেয় হোক বা লবণাক্ত হোক। পানি যদি কাদার ন্যায় গাঢ় হয়ে যায়, তাহলে এ পানির দ্বারা উযূ জাইয হবে না। অনুরূপভাবে যে পানিতে চানা-বুট বা সবজি ভেজানো হয়েছে এবং এতে পানির রং ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু তরলতা নিঃশেষ হয়নি এ পানি দ্বারাও উযূ জাইয। পানিতে যদি চানা-বুট বা সবজি পাকানো হয় এবং পানিতে সবজির ঘ্রাণ অনুভূত হয়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ যে সব বস্তু দ্বারা অধিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করা হয় এ ধরনের কোন বস্তু যদি পানিতে পাকানো হয়, যেমন উশনান ও সাবান, তবে ফকীহ্‌দের ঐকমত্যে এ ধরনের পানি দ্বারা উযূ দুরুস্ত আছে। কিন্তু পানি যদি গাঢ় হয়ে যায়, তবে উযূ দুরুস্ত হবে না (মুহীত)। পানিতে যদি রুটি ভিজানো হয় এবং এবতাবস্থায় পানির তরলতা যদি বাকী থাকে, তবে এ পানি দ্বারা উযূ জাইয হবে। পানি যদি গাঢ় হয়ে যায়, তবে উযূ দুরুস্ত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)।

৫. মাসআলা ঃ মুত্লাক (সাধারণ) পানির সাথে যদি কোন পাক তরল পদার্থ মিলিত হয় যেমন সিরকা, দুধ ও কিশ্‌মিশ্ ভেজানো পানি এবং এ কারণে যদি "পানির নাম" নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে এ পানির দ্বারা উযূ জাইয হবে না। অতঃপর লক্ষ্য করতে হবে যে, পানির সাথে মিশ্রিত বস্তুর রং পানির রং এর বিপরীত কি না? যদি বিপরীত রং-এর হয় যেমন দুধ, হলদে রং বা জাফরানী রং মিশ্রিত পানি, তাহলে রং-এর ভিত্তিতে আধিক্য বিবেচিত হবে। যদি বিপরীত রং-এর না হয় এবং স্বাদের দিক থেকে ভিন্ন রকমের হয় যেমন আঙ্গুর নিংড়ানো সাদা রস ও এর সিরকা, তাহলে স্বাদের ভিত্তিতে আধিক্য প্রমাণিত হবে। আর যদি রং বা স্বাদের মধ্যে ভিন্ন রকমের না হয়, তাহলে পরিমাণের দিক থেকে আধিক্য প্রমাণিত হবে। যদি পরিমাণের দিক থেকে সমপরিমাণ হয়, তবে এ সম্বন্ধে যাহিরুর রিওয়ায়েতে কোন কথা উল্লেখ নেই। তবে ফকীহ্‌গণ বলেন, এ ধরনের পানির হুকুম সাবধানতা হেতু الماء المغلوب। (মিশ্রিত পানির মধ্যে তুলনামূলক পানির পরিমাণ কম হওয়া) এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে (আল বাদাই')।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে نبيذ تمر তথা শুকনা খেজুর ভেজানো পানি দ্বারা উযূ করবে। এ অবস্থায় তায়াম্মুম করবে না। (জামিউস সগীর, শরহুত্ তাহাবী) এবং অধিকাংশ "মতন" (মূল ইবারত)-এর মধ্যেও অনুরূপ কথাই বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) "সালাত অধ্যায়ে" এও উল্লেখ করেছেন যে, নবীযে তামার (খেজুর ভেজানো পানি) দ্বারা উযূ করবে। এর সাথে যদি কেউ তায়াম্মুমও করে, তবে তা খুবই ভাল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তায়াম্মুম করবে কিন্তু উযূ করবে না কখনো। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সাবধানতার লক্ষ্যে উযূ ও তায়াম্মুম উভয়ই করবে। দু'টির কোনটিই বর্জন করা জাইয নেই। তবে এতদুভয়ের মাঝে অগ্র-পশ্চাত করা জাইয আছে (শরহুত্ তাহাবী)। আসাদ ইব্‌ন নাজ্‌ম, নূহ ইব্‌ন আবী মারয়াম এবং হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের দিকে রুজূ করেছেন। বিশুদ্ধ কথা হল, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সর্বশেষ বক্তব্য এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কথা হুবহু একই (শরহুল্ জামিউস্ সগীর ঃ ফকীহ্ কাযীখান কর্তৃক প্রণীত)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আয়নী ঃ কানযের ব্যাখ্যা)। নবীযে তামারের ব্যাপারে উপরোক্ত বিধান ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য, যখন খেজুর ভেজানো পানি মিষ্টিযুক্ত বা অম্ল জাতীয় স্বাদ সম্পন্ন হয়। খেজুর ভেজানো পানি যদি স্ফুটিত ও গাঢ় এবং ফেনাযুক্ত হয়, তবে কারো মতেই এ পানি দ্বারা উযূ জাইয হবে না। কেননা, এ পানি নেশাযুক্ত হয়ে গিয়েছে। উপরোক্ত বিধান ঐ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত যদি আঙ্গুরের রস কাঁচা থাকে (শরহুত তাহাবী)। আঙ্গুরের রস সামান্য পাকানো হলে তা দ্বারা উযূ করা জাইয আছে। চাই তা মিষ্টি হোক বা তিক্ত হোক বা নেশাযুক্ত হোক। এটাই সহীহ্। (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ ঃ মুফীদ ও মাযীদ কিতাবের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত)। ফকীহ্ আবূ তাহির দিবাস (র) বলেন, এ পানি দ্বারা উযূ জাইয নেই। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত) এবং সহীহ্ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তিনি "আলমুফীদ ওয়াল মাযীদ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, পানিতে শুকনা খেজুর ফেলার পর পানি যদি মিষ্টি হয় কিন্তু "পানির নাম" অক্ষুণ্ন থাকে এবং পানির তরলতা বাকী থাকে, তাহলে আমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমামদের ঐকমত্যে এ পানি দ্বারা উযূ দুরুস্ত হবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী ঃ ইবন আমীরুল হাজ্জ কর্তৃক প্রণীত)। এতদভিন্ন অন্য কোন নবীয দ্বারা উযূ জাইয নেই (হিদায়া)। নবীয যদি কোন বস্তুর পাকানো শীরার মত গাঢ় হয় তাহলে এর দ্বারা উযূ দুরুস্ত হবে না (আল্‌কাফী)। নবীয দ্বারা গোসল করা জাইয কিনা, এ নিয়ে আমাদের ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশুদ্ধতম মত হল, এর দ্বারা গোসল জাইয হবে (শরহুল মাবসূত ও আলকাফী)। আলফাজওয়াল আতাবিয়্যাহতে বর্ণিত আছে যে, এটাই সহীহ্ (তাতারখানিয়্যা)। আল্ মুফীদের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, বিশুদ্ধতম মতানুসারে এর দ্বারা গোসল দুরুস্ত হবে না। কেননা, দুই প্রকার নাপাকীর মধ্যে জানাবাতই হল কঠিন এবং বিধানের ব্যাপারে তুলনামূলক তীব্র ও কঠোর। উযূর প্রয়োজনের তুলনায় জানাবাতের গুরুত্ব অতীব তীব্র। তাই উযূর উপর গোসলকে কিয়াস করা যাবে না (তাবয়ীন)। "আল্ জামি'উস্ সগীর আল-হুসামী" তে উল্লেখ আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম (তাতার খানিয়্যা)। নবীযে তামার দ্বারা উযূ-গোসল করার ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের মত এতেও নিয়্যাত আবশ্যকীয় এবং শর্ত (যহীরিয়্যা)। সাধারণ পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নবীযে তামার দ্বারা উযূ করা দুরুস্ত হবে না। নবীযে তামার দ্বারা উযূ করার পর যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ পানি পেয়ে যায় তবে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী ঃ ইবন আমীরুল হাজ্জ কর্তৃক প্রণীত)। যদি ব্যক্তি মাকরূহ্ পানি পায় তাহলে সে মাকরূহ্ পানি দ্বারা উযূ করবে। কিন্তু নবীযে তামার দ্বারা উযূ করবে না। যদি কোন ব্যক্তি মাশকূক (সন্দেহযুক্ত) পানি, নবীযে তামার এবং পাক মাটি পায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে নবীযে তামার দ্বারা উযূ করবে। অন্য কিছু করবে না। ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে মাশকুক পানি দ্বারা উযূ করবে এবং তায়াম্মুম করবে। কিন্তু নবীযে তামার দ্বারা উযূ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মাশকুক পানি ও নবীযে তামার দ্বারা উযূ করবে এবং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এ তিনের কোনটাই বর্জন করতে পারবে না। তবে আগে-পরে করা সবই সমান (যহীরিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ আমাদের ইমামগণ সকলেই একমত যে, ব্যবহৃত পানি অন্যকে পাক করতে পারবে না। তাই এর দ্বারা উযূ করাও দুরুস্ত হবে না। অবশ্য ব্যবহৃত পানি নিজে পাক কিনা এনিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তা পাক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরই একটি রিওয়ায়েত। ফাত্ওয়া এর উপরই (মুহীত)। নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য ব্যবহৃত পানি অথবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি বিশুদ্ধ মতানুসারে শরীরের অঙ্গ হতে পৃথক হওয়া মাত্রই তা "ব্যবহৃত পানিতে" পরিণত হয়ে যাবে (হিদায়া)। নাপাকী চাই হাদাছে আকবর (বড় নাপাকী) হোক বা হাদাছে আসগর (ছোট নাপাকী)। কান্‌যের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আয়নী) সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তাঁর বাহু ধৌত করে এমতাবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি যদি বাহুর নীচ দিয়ে তার হাত ধরে রাখে এবং সে ঐ পানি দ্বারাই তার হাত ধুয়ে নেয়, তাহলে এ উযূ শুদ্ধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উযূহীন কোন ব্যক্তি অথবা জুনুবী ব্যক্তি অথবা হায়েয হতে সদ্য পাক হয়েছে এমন কোন মহিলা যদি পানি উঠাবার জন্য পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তবে জরুরতবশত এতে পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে না (তাবয়ীন)। অনুরূপভাবে পানপাত্র

যদি জালার ভেতর পড়ে যায়, অতঃপর কোন ব্যক্তি যদি জালা থেকে তা উঠানোর জন্য স্বীয় হস্ত কনুই পর্যন্ত জালার ভেতর ঢুকায় তাহলে এতে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে না। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি হাত-পা ঠাণ্ডা করার জন্য জালার ভিতর ঢুকায়, তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে যাবে। প্রয়োজন না থাকার কারণে (খুলাসা)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হওয়ার জন্য এক অঙ্গ পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করানো শর্ত (মুহীত)। তাই এক বা দুই অঙ্গুলি পানিতে প্রবেশ কালে এতে পানি "ব্যবহৃত" বলে গণ্য হয় না। অবশ্য কবজা পর্যন্ত হাত ঢুকালে পানি "ব্যবহৃত পানিতে" পরিণত হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ জুনুবী ব্যক্তি যদি বালতি তালাশের উদ্দেশ্যে কূপের ভেতর ডুব দেয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে লোকটি নাপাকই থাকবে এবং পানিও পাক থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে লোকটি পবিত্র হয়ে যাবে এবং পানিও পাক থাকবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে লোকটিও নাপাক থাকবে এবং পানিও নাপাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর থেকে এও বর্ণিত আছে যে, লোকটি পাক হয়ে যাবে। কেননা, পানি শরীর থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত এর উপর "ব্যবহৃত" হওয়ার হুকুম দেয়া যায় না। রিওয়ায়েতসমূহের মধ্যে এটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (হিদায়া ও তাবয়ীন)। সালাতের উদ্দেশ্যে গোসল করার নিমিত্ত যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের পানিতে ডুব দেয়, তবে সকলের মতে পানি নাপাক হয়ে যাবে (হিদায়া)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ঋতুবতী মহিলা স্রাব বন্ধ হওয়ার পর কূপে পতিত হয় এবং শরীরে যদি নাপাকী না থাকে, তবে তার হুকুম জুনুবী ব্যক্তির হুকুমের ন্যায় হবে। যদি স্রাব বন্ধ হওয়ার পূর্বে কূপে পতিত হয়, তবে তার হুকুম পাক ব্যক্তির হুকুমের ন্যায় হবে। কেননা, সে পতিত হওয়ার কারণে তার হায়েয বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না (খুলাসা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন ব্যক্তি উযূর অঙ্গসমূহ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ ধৌত করে যেমন নিজের উরু বা পার্শ্ব ধৌত করল, তবে এতে পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে না। তবে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করলে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে যাবে (খুলাসা)। যদি কোন উযূ সম্পন্ন ব্যক্তি চুল কামানোর উদ্দেশ্যে পানি দ্বারা নিজের মাথা ভিজায় তবে পানি ব্যবহারকৃত পানিরূপে গণ্য হবে না (যহীরিয়্যা)। যদি কোন পাক-পবিত্র ব্যক্তি মাটি, আটা বা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য উযূ করে অথবা পাক ব্যক্তি যদি শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য গোসল করে, তবে এতে পানি "ব্যবহারকৃত পানি" হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উযূহীন ব্যক্তি যদি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য অথবা অন্যকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে উযূ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে "ব্যবহৃত পানি" হবে না (খুলাসা)। আল্-জামিউস্ সগীর আল্-হুসামীতে বর্ণিত আছে যে, বালক উযূ করলে পানি ব্যবহারকৃত হবে কিনা ? এ সম্পর্কে উত্তম মত হল, বালক যদি জ্ঞানবান হয়, তবে তার উযূতে পানি "ব্যবহৃত" হয়ে যাবে। অন্যথায় হবে না (মুযমারাত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ খানা খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা খানা খাওয়ার পর হাত ধৌত করলে পানি "ব্যবহৃত পানি" হয়ে যাবে (মুহীত)। কোন মহিলার চুলের সাথে যদি অন্য মহিলার চুল মিশে যায় এবং সে যদি ঐ চুল ধৌত করে, তবে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হবে না। কিন্তু নিজের চুল ধৌত করলে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ ও যহীরিয়্যা)। হত্যাকৃত মানুষের মাথা যা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা যদি কেউ ধৌত করে, তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি হয়ে যাবে (মুহীত)। জুনুবী ব্যক্তির গোসল করার সময় যদি পানির ফোঁটা পানির পাত্রে পতিত হয়, তবে পানি নাপাক হবে না। কিন্তু যদি শরীরে প্রবাহিত পানি পাত্রে পতিত হয়, তাহলে পানি দূষিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে গোসলখানার হাউযের পানি নাপাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যবহারকৃত পানির পরিমাণ অধিক হবে। অর্থাৎ ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অধিক না হওয়া পর্যন্ত হাউযের পানির পবিত্রকরণ ক্ষমতা রহিত হবে না (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া পানি নাপাক। ইমাম মুহাম্মদ (র.) "আসলের" মধ্যে এ কথাটি (مطلقا) ব্যাপক অর্থে উল্লেখ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, মৃত ব্যক্তির শরীরে যদি নাপাকী না থাকে, তবে পানি ব্যবহৃত পানিতে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মাসআলাটি ব্যাপক অর্থে এ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির শরীরে সাধারণত নাপাকী থাকে (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি যদি সিরকা বা গোলাপের পানি দ্বারা উযূ করে, তবে কারো মতেই তা "ব্যবহৃত পানি" হবে না (তাতার খানিয়্যা)। "ব্যবহৃত পানি" যদি কূপে পতিত হয়, তাহলে কূপের পানি নাপাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ পানি কূপের পানির উপর প্রবল না হবে। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত)।

উপরোক্ত মাসাইলের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মাসাইল নিম্নে সংযোজিত হল।

১২. মাসআলা ঃ প্রত্যেক প্রাণীর ঘর্মের হুকুম তার ঝুটার হুকুমের অনুরূপ হবে (হিদায়া)। গাধা ও খচ্চরের সামান্য ঘর্ম অথবা লালা যদি স্বল্প পানিতে পতিত হয়, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে (মুহীত)। কাপড়ে লাগলে পরিমাণে বেশী হলেও সালাত আদায়ে কোনরূপ অসুবিধা হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। মানুষের ঝুটা পাক। জুনুবী, ঋতুবতী মহিলা, নিফাসওয়ালী মহিলা এবং কাফির ব্যক্তি এ হুকুমের মধ্যে শামিল। কিন্তু মদ্যপানকারী ব্যক্তি এবং মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত ব্যক্তি যদি মদ্যপান এবং রক্ত বের হবার সাথে সাথে পানি পান করে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত ব্যক্তি যদি বারবার নিজের থুথু গিলে ফেলে তবে সহীহ্ মতে তার মুখ পবিত্র হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। মদ্যপানকারী ব্যক্তির গোঁফ যদি লম্বা হয়, তাহলে পান করতেই পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও সে এক ঘন্টা পর পানি পান করে থাকে (হুজ্জাতের সূত্রে তাতারখানিয়্যা)। মহিলার ঝুটা অপরিচিত পুরুষের জন্য মাকরূহ্ যেমন পুরুষের ঝুটা অপরিচিত মহিলার জন্য মাকরূহ্। এ হুকুম অপবিত্রতার কারণে নয় বরং স্বাদ ও মজা অনুভূত হওয়ার কারণে (আন্ নাহ্‌রুল ফাইক)। ঘোড়ার ঝুটা সকলের নিকটই পবিত্র। এটাই সহীহ্ মত (যাহিদী)। অনুরূপভাবে যে সমস্ত জানোয়ার এবং পাখীর গোশ্‌ত হালাল এগুলোর ঝুটা পাক। কিন্তু ছাড়া মোরগ, উট এবং নাপাক বস্তু ভক্ষণকারী গরুর ঝুটা মাকরূহ্। সুতরাং মোরগ যদি এমনভাবে

আবদ্ধ থাকে যে, এর ঠোঁট পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছে না, তাহলে এর ঝুটা মাকরূহ্ হবে না। আর যদি পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে এ মোরগ ছাড়া মোরগ বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ যে সমস্ত প্রাণীর ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত নেই যা পানিতে বা অন্য কোথাও বসবাস করে এদের ঝুটা পাক (তাবয়ীন)। যে সমস্ত কীট-পতঙ্গ ঘরে বসবাস করে যেমন সাপ, ইঁদুর বা বিড়াল এদের ঝুটা মাক্‌রূহ তানযীহী। এটাই সহীহ্ মত (খুলাসা)। যদি কারো হাতে বিড়াল চাটে এবং হাত ধৌত করা ব্যতিরেকেই যদি সে সালাত আদায় করে অথবা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করে, তবে মাকরূহ্ হবে (তাবয়ীন)। এ হুকুম ধনীদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা, তারা এ বস্তু পরিবর্তন করে নিতে সক্ষম। গরীব লোকদের জন্য জরুরতবশত মাকরূহ্ নয় (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। বিড়াল ইঁদুর খাওয়ার পরই যদি পানি পান করে, তবে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদি দুই-এক ঘন্টা পর পান করে তবে মাকরূহ্ হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত (যহীরিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ হিংস্র পাখির ঝুটা মাকরূহ্ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পাখি যদি এমনভাবে আবদ্ধ থাকে যে, মালিক নিশ্চিতভাবে জানে যে, এর ঠোঁটে কোন নাপাক বস্তু নেই, তবে মাকরূহ্ হবে না। মাশাইখগণ এ বর্ণনাটিকে পসন্দ করেছেন (হিদায়া)। এমনিভাবে যেসব পাখির গোশত খাওয়া জাইয নয়, এর ঝুটা পাক তবে মাকরূহ্। এটা হল استحسان (সূক্ষ্মতম চিন্তা-এর দাবী (শরহুল মাবসূত)। সাধারণ পাক পানি পাওয়া অবস্থায় যদি কেউ মাকরূহ্ পানি দ্বারা উযূ করে, তবে মাকরূহ্ হবে। পাক পানি না থাকা অবস্থায় মাকরূহ্ হবে না (শরহুল মুখতারের এটাই পসন্দনীয় রায়)।

১৫. মাসআলা ঃ কুকুর, শূকর এবং হিংস্র চতুষ্পদ প্রাণীর ঝুটা নাপাক (কানয)। মটকির পানি ফোঁটা ফোঁটা পতিত হওয়া অবস্থায় কুকুর এসে মটকিতে চাটলে পানি নাপাক হবে না (খুলাসা)। পাত্র কুকুর মুখ দিলে তাহা তিনবার ধৌত করতে হবে (হিদায়া)। খচ্চর ও গাধার ঝুটা মাশকূক (সন্দেহযুক্ত)। বিশুদ্ধ মতে তা পাক। তবে এর পবিত্রকরণ সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জমহুর ফকীহ্‌দের মত এটাই (আল্‌কাফী)। খচ্চর ও গাধার পান করা পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি না পাওয়া গেলে এর দ্বারা উযূ করবে এবং তায়াম্মুমও করবে। এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনটি অগ্রে করা জাইয (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। কিন্তু শুধু একটির উপর আমল করা জাইয নেই (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। আমাদের মাযহাবে মাশকূফ পানি দ্বারা অগ্রে উযূ গোসল করা উত্তম (বাহ্‌রুর রাইক)।

১৬. মাসআলা ঃ গাধার পানি দ্বারা উযূ করার ক্ষেত্রে নিয়্যাতের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে নিয়্যাত করাই উত্তম (ফতহুল কাদীর)। যদি পাক পানিতে গাধার ঝুটা পতিত হয়, তবে এর দ্বারা উযূ করা জাইয যতক্ষণ না পাক পানির তুলনায় তা অধিক হবে (যেমন পূর্বে বর্ণিত ব্যবহৃত পানি) (মুহীত)। চামচিকার পেশাব এবং পায়খানার দ্বারা পানি এবং কাপড় নাপাক হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ যে সমস্ত প্রাণীর ধমনীতে প্রবহমান রক্ত নেই, তা পানিতে মরলে পানি নাপাক হবে না। যেমন মশা, মাছি, ভ্রমর ও বিচ্ছু ইত্যাদি। যে সমস্ত প্রাণী পানিতে বাস করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরা পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হবে না। যেমন মাছ, ব্যাং ও কাঁকড় ইত্যাদি। যেসব প্রাণীর জন্ম পানিতে নয় কিন্তু বাস করে পানিতে এরা পানিতে মারা গেলে কারো কারো মতে মাছ ব্যতীত অন্যরা পানি বিনষ্ট করে দিবে। কারো কারো মতে পানি দূষিত হবে না। এটাই সহীহ্ মত। পানি ও স্থলের ব্যাঙ উভয়ই সমান (হিদায়া)। আবুল কাসিম আস সাফ্ফার (র) বলেন, আমরা এর উপরই আমল করি (মুযমারাত)। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী পানি মারা যাক বা অন্যত্র মারা যাওয়ার পর পানিতে ফেলা হোক উভয়ই সমান, কোন পার্থক্য নেই (তাবয়ীন)। ফেটে যাওয়া এবং না ফাটা উভয়ই বরাবর। তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, ফেটে গেলে ঐ পানি পান করা মাকরূহ। কেননা, ফেটে যাওয়া অবস্থায় তা পানির সাথে মিলে যায়, অথচ এগুলো হালাল বস্তু নয় (মুহীত)। "যে সব প্রাণীর জীবন পানিতে" এর মানে হল, যে সব প্রাণীর জন্ম এবং বাস পানিতে পক্ষান্তরে যে সব প্রাণীর বাস পানিতে কিন্তু জন্ম নয় এগুলো পানিতে মরলে পানি নাপাক হয়ে যাবে (হিদায়া)। নাপাকী মিশ্রিত ধুলা পানিতে পতিত হলে তা ধর্তব্য নয়। মাটি হল ধর্তব্য বিষয় (আল্ কিনয়া)।

১৮. মাসআলা ঃ নাপাকী বা গোবর লাগা কাঠ আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পর স্বল্প পানিতে পতিত হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুসারে পানি নাপাক হবে না। এর উপর ফাতওয়া (আল্ মুযমারাত)। মৃতের পশম ও হাড় পাক। অনুরূপভাবে ধমনী, খুর, উট পাখির খুর, ফাটা খুর, শিং, উট ও খরগোশের পশম, পাখা, দাঁত, ঠোঁট এবং শিকারী পাখির নখর পাক। অনুরূপভাবে মানুষের চুল এবং হাড়ও পাক। এটাই বিশুদ্ধ মত (শরহুল মুখতার)। কামানো বা কর্তিত চুলের এ হুকুম। কিন্তু উৎপাটিত চুল নাপাক (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৯. মাসআলা ঃ মৃত জানোয়ারের পেটা, মৃত জন্তুর দুধ, ডিমের খোসা এবং গর্ভপাতে মায়ের পেট হতে পতিত বকরীর বাচ্চা যা এখনো ভেজা, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পবিত্র (মুহীত)। হরিণের পেটের যে থলিতে মৃগনাভি থাকে, তা যদি এমন হয় যে, পানি স্পর্শ হলে নষ্ট হয় না, তবে তা পাক। বিশুদ্ধ মতে তা সব সময়ই পাক। যবেহ্কৃত পশুর উল্লিখিত সব বস্তুই পাক। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ সকলেই একমত (তাবয়ীন)।

২০. মাসআলা ঃ শূকর ও শূকরের সমস্ত অংশ নাপাক (শরহুল মুখতার)। মৃতের গোশ্ত বিশিষ্ট হাড় বা চর্বি বিশিষ্ট হাড় যদি কূপে পতিত হয়, তবে কূপ নাপাক হয়ে যাবে। গোশ্ত বা চর্বি না থাকলে নাপাক হবে না (মিরাজুদ্ দিরায়া)। মানুষের চামড়া বা ছাল যদি পানিতে পতিত হয় এবং তা যদি পায়ের ফাটা হতে পতিত চামড়ার ন্যায় সামান্য পরিমাণ হয়, তবে পানি নাপাক হবে না। যদি নখের ন্যায় অধিক পরিমাণ হয়, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু নখ পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হয় না (খুলাসা)। ঔষধের মাধ্যমে পাকানো চামড়া বা মাটি দ্বারা কিংবা রৌদ্রের তাপ দ্বারা অথবা বাতাসের দ্বারা পাকানো চামড়া পাক। তাতে সালাত আদায় করা জাইয এবং এর দ্বারা মশক বানিয়ে পানি রেখে উযূ করাও জাইয। কিন্তু মানুষের চামড়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ এবং শূকরের চামড়া দাবাগাত করলেও পাক হয় না (যাহিদী)। প্রকৃতভাবে পাকানো চামড়ায় পানি লাগলে তা পুনরায় নাপাক হয় না। অনুরূপভাবে ঔষধ ব্যতীত অন্য প্রক্রিয়ায় পাকানো চামড়াতে পানি লাগলে তাও পুনরায় নাপাক হবে না (মুযমারাত)। যে সমস্ত প্রাণীর চামড়া পাকানোর দ্বারা পাক হয়ে যায় যবেহের দ্বারাও তা পাক হয়ে যাবে। এমনিভাবে রক্ত ব্যতীত অন্য অংশগুলোও যবেহ-এর মাধ্যমে পাক হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধ মাযহাব (মুহীত)। মটকি হতে পানি উঠানোর জন্য যে পাত্র ঘরের কোণে রেখে দেয়া হয়, তা দ্বারা পানি পান করা এবং উযূ করা জাইয, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, তাতে নাপাকী লেগে আছে।

২১. মাসআলা ঃ বিড়ালের তাড়া খেয়ে ইঁদুর যদি পেয়ালার উপর দিয়ে পালিয়ে যায়, তবে শামসুল আইম্মা হালওয়াই (র)-এর মতে বিড়াল যদি তাকে ক্ষত করে দিয়ে থাকে, তবে পিয়ালা নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না। শরহুত তাহাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পিয়ালা সর্বাবস্থায় নাপাক হয়ে যাবে। কেননা, ইঁদুর বিড়ালের ভয়ে প্রায়ই প্রস্রাব করে দেয় (মুহীত)। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। ঐ হাউযের পানি দ্বারা উযূ করা জাইয, যার মধ্যে নাপাকী পড়ার আশংকা আছে। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জানা নেই। উযূকারী ব্যক্তির উপর এ সম্বন্ধে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক নয় এবং চিহ্ন বা আলামত দ্বারা নাপাকী সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত উযূ বর্জন করাও জরুরী নয় (মুহীত)। কোন কূপের পানি নাপাক ধারণা করে তা দ্বারা উযূ করার পর যদি এ কথা প্রকাশ হয় যে, কূপের পানি পাক, তবে উযূ দুরুস্ত হয়ে যাবে (খুলাসা)।

২২. মাসআলা ঃ পানি বিশিষ্ট কূপের উপর দিয়ে কোন হিংস্র প্রাণী অতিবাহিত হবার পর যদি মনে প্রবলভাবে এ ধারণা হয় যে, তা পানি পান করেছে, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না (বাহ্রুর রাইক ঃ মুবতাগীর সূত্রে)। "আল্ ফাতাওয়াল আতাবিয়্যাতে" বর্ণিত আছে যে, যদি মরু প্রান্তরে সামান্য পানি পাওয়া যায়, তবে এ পানি নিয়ে উযূ করা জাইয। হাতে যদি নাপাকী থাকে এবং পানি উঠাবার মত কোন পাত্র না থাকে, তবে নিজের রুমাল পানিতে ফেলে তা দ্বারা পানি উত্তোলন করে রুমালের পানি হাতে ঢেলে হাত পবিত্র করে নিবে। যদি পানির কিনারায় কুকুর প্রবেশের চিহ্ন দেখা যায় এবং তা পানির এত নিকটে যে, এ অবস্থায় কুকুর ঐ পানি পান করতে সক্ষম, এমতাবস্থায় এ পানি দ্বারা উযূ করবে না। আর যদি এমন না হয়, তাহলে উযূ করা জাইয (তাতারখানিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ শিশু ও গ্রাম্য লোকেরা যদি বালতি ও রশি স্পর্শ করে, তবে বালতি ও রশি পাক থাকবে (যহিরিয়্যা)। যদি তাতে নাপাকীর কোন চিহ্ন না দেখা যায় (ফাতহুল কাদীর)। যদি কোন শিশু পানির পাত্রে হাত বা পা ঢুকিয়ে দেয় এমতাবস্থায় যদি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, তার হাত পাক, তবে এ পানি দ্বারা উযূ করা জাইয। আর যদি জানা না থাকে যে, তার হাত পাক, না নাপাক, তবে অন্য পানি দ্বারা উযূ করা মুস্তাহাব। এতদসত্ত্বেও এ পানি দ্বারা উযূ করলে উযূ শুদ্ধ হবে (মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ উভয় পা ধৌত করার পর যদি কোন ব্যক্তি গোসলখানার সামনে ফেলে রাখা পানির মধ্যে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসে, এমতাবস্থায় " গোসলখানায় কোন জুনুবী আছে" এ কথা যদি তার জানা না থাকে, তবে পুনরায় উভয় পা ধৌত না করলেও যথেষ্ট হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি জানা থাকে যে, এর মধ্যে জুনুবী ব্যক্তি আছে, সে গোসল করেছে, তাহলেও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বর্ণনা মতে তার উপর উভয় পা ধৌত করা জরুরী নয়। এটাই যাহিরী কথা (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি রুমাল দ্বারা নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ মুছে এবং এতে রুমাল ভিজে যায় এবং খুব ভিজে যায় অথবা শরীরের অঙ্গ হতে কোন কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পতিত হয়ে যদি কাপড় খুব বেশী ভিজে যায়, তবে এ কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা জাইয। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ব্যবহৃত পানি পাক। এটাই উত্তম কথা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা নাপাক হলেও অপারগতাবশত এর থেকে নাপাকীর হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। তাই এখন আর তা নাপাক নয় (বাদাই')।

২৬. মাসআলা ঃ ব্যবহৃত পানি পান করা মাকরূহ্ (খুলাসা)। জামেউল জাওয়ামি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সামান্য পানিতে নাপাকী পতিত হওয়ার কারণে তা নাপাক হওয়ার পর যদি এর গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে এ পানি কোন কাজে আদৌ ব্যবহার করা যাবে না। এ পানি প্রস্রাবের ন্যায় হয়ে যায়। আর যদি এমন না হয়, তবে পশুদেরকে পান করান এবং কর্দমাক্ত করা জাইয। অবশ্য এ কাদা দ্বারা মাটি লেপন করতে পারবে না (তাতারখানিয়া)।

২৭. মাসআলা ঃ প্রবাহিত পানিতে প্রস্রাব করা মাকরূহ্ (খুলাসা)। আবদ্ধ পানিতেও প্রস্রাব করা মাকরূহ্। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (তাতারখানিয়া)।

২৮. মাসআলা ঃ শরবতের হাউযে পেশাব পতিত হলে দেখতে হবে তা যদি ১০x১০= একশত বর্গ হাত হয়, তবে তা নাপাক হবে না। আর যদি এর থেকে কম হয়, তবে আবদ্ধ পানির ন্যায় তাও নাপাক হয়ে যাবে (খুলাসা)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম সম্বন্ধে

[এই পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে ঃ]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের আবশ্যকীয় বিষয়াদি

প্রথম ফরয নিয়্যাত করা

১. মাসআলা ঃ তায়াম্মুমের প্রথম ফরয হল, নিয়্যাত করা অর্থাৎ এমন عبادة مقصودة (মৌল ইবাদত)-এর নিয়্যাত করা যা পবিত্রতা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত অথবা সালাত মুবাহ হওয়ার নিয়্যাত ارادة صلوة তথা সালাত আদায়ের নিয়্যাতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। উযূর জন্য তায়াম্মুম এবং জানাবাত দূর করার জন্য তায়াম্মুমের মধ্যে পার্থক্য করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কোন জুনুবী ব্যক্তি যদি উযূর উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে, তবে দুরুস্ত আছে (তাবয়ীন)।

নিসাব নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (তাতারখানিয়া)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি সালাতে জানাযা বা তিলাওয়াতের সিজদা আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করে, তবে এর দ্বারা ফরয সালাত আদায় করাও জাইয আছে। এতে কারো মতবিরোধ নেই (মুহীত)।

যদি কোন ব্যক্তি মুখস্থ কুরআন শরীফ পাঠ করার জন্য অথবা কুরআন শরীফ দেখে পড়ার জন্য অথবা কবর যিয়ারত করার জন্য অথবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য অথবা আযান বা ইকামতের জন্য অথবা মসজিদে প্রবেশ করা বা বের হওয়ার জন্য অথবা কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করে এবং এ তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে তার সালাত সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

যদি কোন ব্যক্তি সিজদায়ে শুক্র আদায় করার জন্য তায়াম্মুম করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এর দ্বারা সে ফরয সালাত আদায় করতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ তায়াম্মুম দ্বারা সে ফরয সালাতও আদায় করতে পারবে। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সিজদাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ইবাদত নয় (যখীরা)। যদি কোন ব্যক্তি সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়ার জন্য তায়াম্মুম করে, তবে এর দ্বারা সালাত আদায় করা সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ অন্যকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এর দ্বারা সালাত আদায় সহীহ্ হবে না (খুলাসা)। এটাই যাহিরী রিওয়ায়েত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এ তায়াম্মুম দ্বারা সালাত আদায় করা ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দুরুস্ত হবে না (খুলাসা)। রোগীকে যদি অন্য কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করিয়ে দেয় তবে রোগীকেই তায়াম্মুমের নিয়্যাত করতে হবে। অন্যকে নয় (কিনয়া)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফরয দুইবার মাটিতে হাত মারা

৪. মাসআলা ঃ দুইবার মাটিতে হাত মারা। একবার হাত মাটিতে মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ্ করা এবং দ্বিতীয়বার হাত মাটিতে মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করা (হিদায়া)।ঐ উভয় কনুই মাসেহ্ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ঐ হিলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুখমণ্ডলের খোলা স্থানসমূহ চুলসহ মাসেহ্ করতে হবে। এটাই সহীহ্ কথা (মি'রাজুদ্ দিরায়া ও ফাতহুল কাদীর) ঐ মুখমণ্ডলের উপর কানের বরাবর উত্থিত পশমসমূহও আমাদের ইমামদের মতে মাসেহ্ করা শর্ত। অথচ মানুষ এ সম্পর্কে উদাসীন (যাহিদী)। হাতের তালু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হাতের তালু মাসেহ্ করার প্রয়োজন নেই। বরং মাটিতে হাত মারাই যথেষ্ট (মুযমারাত)। যদি কোন ব্যক্তি মাটিতে একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসেহ্ করে, তবে এতে তায়াম্মুম সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি যদি এক হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ্ করে এবং অপর হাত দ্বারা এক হাত মাসেহ্ করে, তবে মুখমণ্ডল এবং এক হাতের মাসেহ্ সহীহ্ হয়ে যাবে। তবে অন্য হাতের জন্য দ্বিতীয়বার হাত মাটিতে মারতে হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৫. মাসআলা ঃ তায়াম্মুমের ইচ্ছায় যদি কোন ব্যক্তি মাটিতে গড়াগড়ি করে এবং সমস্ত শরীর মাটিতে মর্দন করে, তবে দেখতে হবে যে, মাটি যদি মুখমণ্ডল, উভয় হাত এবং হাতের তালুতে লেগে যায়, তবে তায়াম্মুম সহীহ্ হবে। আর যদি উপরোক্ত স্থানসমূহে মাটি না পৌঁছে, তবে তায়াম্মুম সহীহ্ হবে না (খুলাসা)। যে ব্যক্তির উভয় হাত কবজি পর্যন্ত কাটা, সে উভয় বাহু মাসেহ্ করবে। যার উভয় বাহু কাটা, সে কাটা স্থান মাসেহ্ করবে। যদি কনুইর উপর দিয়ে কর্তন করা হয়ে থাকে, তবে মাসেহ্ করা তার উপর ওয়াজিব নয় (মুহীত ঃ আল্লামা সুরুখসী)। যদি উভয় হাত অবশ হয়ে যায়, তবে হাত মাটির উপর মর্দন করবে এবং মুখমণ্ডল দেয়ালের সাথে লাগাবে। এ ধরনের মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট। সে সালাত বর্জন করতে পারবে না (যখীরা ঃ তায়াম্মুম অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী পঞ্চম অনুচ্ছেদ)। মাটিতে হাত মারার পর মাসেহ্ করার পূর্বে যদি কারো উযূ ভঙ্গের কারণ সংঘটিত হয়, তবে এ (ضربة) (হাত মারা)-এর দ্বারা তায়াম্মুম সহীহ্ হবে না। যেমনিভাবে উযূতে কিছু অঙ্গ ধৌত করার পর উযূ ভঙ্গের কারণ সংঘটিত হলে পুনরায় উযূ করতে হয়। সায়্যিদ আবূ শুজা (র)-এর মতামত এই। কিন্তু কাযী ইসবী জাবী (র) বলেন, উপরোক্ত (ضربة) এর দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে। যেমনিভাবে হাতের অঞ্জলি ভরে পানি নেয়ার পর উযূ ভঙ্গের কারণ সংঘটিত হলে এ পানি দ্বারা উযূ করা জাইয। খুলাসা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বিশুদ্ধতম মতানুসারে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি এ মাটি ব্যবহার করবে না। শামসুল আইম্মা (র) এ মতটিকে পসন্দ করেছেন (ফতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ পরিপূর্ণভাবে মাসেহ্ করা আবশ্যক। যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা মতে তায়াম্মুমের মধ্যে অঙ্গ দুটো পরিপূর্ণভাবে মাসেহ্ করা ওয়াজিব (মুহীত ঃ সুরুখসী (র))। এটাই পসন্দনীয় মত (মুযমারাত)। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি ভ্রূর নীচে এবং চোখের উপরে মাসেহ্ না করে, তবে তার তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী (র))। তায়াম্মুমের মধ্যে আংটি এবং কংকণ খুলে নেয়া জরুরী (খুলাসা)। এমনকি নাকের দু' ছিদ্রের মধ্যবর্তী পর্দার উপরও মাসেহ্ করতে হবে। আঙ্গুলসমূহের ফাঁকে যদি ধুলা না ঢুকে, তবে খিলাল করা ওয়াজিব (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ তায়াম্মুমের মাটি পাক হওয়া আবশ্যক। মাটি জাতীয় পাক বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে (তাবয়ীন)। যে সমস্ত বস্তু আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যায় যেমন কাঠ, ঘাস এবং এগুলোর ন্যায় আরো অন্যান্য বস্তু কিংবা যে সমস্ত বস্তু গলে নরম হয়ে যায় যেমন লোহা, কাঁসা, তামা, কাঁচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বস্তুসমূহ মাটি জাতীয় বস্তু নয়।

আর যে সমস্ত বস্তু এ জাতীয় নয় এগুলো মাটি জাতীয় বস্তু বলে গণ্য হবে (বাদাই')। মাটি, বালি, লোনা মাটি (লোনা পানি নয়), চুনা, দাহ্য পদার্থ, সুরমা, হরতাল, গেরুয়া রং, গন্ধক, ফিরোজ, আকীক, বালখাশ নামক পদার্থ, যমরাদ ও যরজাদ দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (আল-বাহ্রুর রাইক)। অনুরূপভাবে ইয়াকুত ও মারজান দ্বারাও তায়াম্মুম করা জাইয (তাবয়ীন)। পাকা ইটের উপরও তায়াম্মুম করা জাইয (বাহ্রুর রাইক)। এটাই যাহিরুর রিওয়ায়েতের কথা (তাবয়ীন)। মাটির পাকা পাত্রের উপর তায়াম্মুম করা জাইয। তবে এর উপর যদি এমন কোন রং থাকে, যা মাটি জাতীয় নয়, তাহলে এর উপর তায়াম্মুম করা জাইয নয় (খাযানাতুল ফাতওয়া)। পাথরের উপর তায়াম্মুম করা জাইয। এর উপর ধুলাবালি থাকুক বা না থাকুক। যেমন পাথরটি ধৌত বা চকচকে। অথবা তা ভাংগা হোক বা না হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। লাল মাটি, কাল মাটি এবং সাদা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (বাদাই)। ধূসর বর্ণের মাটি দ্বারাও তায়াম্মুম করা জাইয (খুলাসা)। সবুজ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (তাতারখানিয়া)। ভিজা ও কাদা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (বাদাই')। খনিজ শীশার দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয, যা অন্য বস্তু থেকে বানান নয় (মুহীত ঃ সুরুখসী (র))। লবণ যদি তরল হয়, তবে সকল ইমামদের মতে এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয নেই। অবশ্য পাহাড়ী লবণের ব্যাপারে দু'ধরনের রিওয়ায়েত আছে। প্রত্যেকটিই সহীহ্। তবে ফাতাওয়া হল এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (আল-বাহ্রুর রাইক)। পোড়া মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা সহীহ মতানুসারে জাইয (যহীরিয়া)। মোতি চূর্ণ হোক বা না হোক এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয নেই। স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি বিগলিত করে ছাঁচে ঢালা হয়ে থাকে, তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয নেই। যদি ছাঁচে ঢালা না হয়, মাটি মিশ্রিত হয় এবং মাটির পরিমাণ বেশী হয়, তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (মুহীত ঃ সুরুখসী (র))।

১০. মাসআলা ঃ ছাই, আম্বর, কাফুর এবং মেশ্কের দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয নেই (যহীরিয়া)। বরফের দ্বারা তায়াম্মুম করাও জাইয নেই (তাবয়ীন)। মাটি পাওয়া সত্ত্বেও ধূলা দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয। এটাই সহীহ্ (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ধূলার দ্বারা তায়াম্মুম করার পদ্ধতি হল

pdf By Syed Mostofa Sakib

এই যে, কাপড়, বা পশমী বিছানা কিংবা বালিশ অথবা এ জাতীয় পাক বস্তু যার উপর ধূলাবালি আছে, এ ধূলা যখন হাতে ভালভাবে লাগবে, তখন তায়াম্মুম করবে। অথবা নিজের কাপড় ঝেড়ে ধূলা উড়াবে অতঃপর স্বীয় হাত বায়ুতে খুলে ধরবে। ধুলা যখন হাতে লাগবে তখন তায়াম্মুম করবে (মুহীত)। ধুলা যদি কারো মুখমণ্ডল এবং হাতে লাগে অতঃপর তায়াম্মুমের নিয়্যাতে সে যদি হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ্ করে, তবে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। কিন্তু মাসেহ্ না করলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না (যহীরিয়া)। কোন ব্যক্তি যদি গম, যব ইত্যাদি শস্যের মধ্যে হাত দেয় এবং হাতে ধুলা-বালি লাগে, তবে হাতে যদি ধুলাবালির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এর দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে (আসসিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আর যদি ধুলাবালির চিহ্ন প্রকাশিত না হয়, তবে তায়াম্মুম করা জাইয হবে না (আল্-বাহ্রুর রাইক)। যদি মাটির সাথে মাটি জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু মিশ্রিত হয়ে যায়, তবে পরিমাণে যা বেশী হবে তাই ধর্তব্য হবে (যহীরিয়া)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি এমন কাদা মাটির স্থানে অবস্থান করে যথায় পানি-মাটি কিছুই নেই এবং কাপড়-গদীতেও কোন ধুলাবালি নেই এমতাবস্থায় নিজের কাপড় বা শরীরের অন্য কোন স্থানে কাদা মাটি মাখবে। অতঃপর যখন তা শুকিয়ে যাবে, তখন তায়াম্মুম করবে। প্রকাশ থাকে যে, যতক্ষণ সালাতের সময় চলে যাওয়ার আশংকা না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তায়াম্মুম না করা ভাল। কেননা, এতে বিনা প্রয়োজনে নিজের মুখমণ্ডল কাদা মিশ্রিত করা হয়ে যায় এবং এ ধরনের পরিবর্তন সুরত-বিকৃতির শামিল। আর যদি তায়াম্মুম করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে তায়াম্মুম জাইয হবে। কেননা, কাদা মাটি মাটিরই অংশ। এতে যে পরিমাণ পানি আছে, তা পরিশেষে শুকিয়ে যাবে (বাদাই')। পানির পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

১৩. মাসআলা ঃ নাপাক কাপড়ের ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয নেই। তবে কাপড় শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি এতে ধুলা লাগে, তবে এ ধুলার দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয (নিহায়া)। মাটির উপর নাজাসাত লাগার পর তা যদি শুকিয়ে যায় এবং নাপাকীর চিহ্ন বিদ্যমান না থাকে, তবু এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জাইয নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ তায়াম্মুম তিন আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ্ করা আবশ্যক। তিনের চেয়ে কম আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ্ করলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। যেমন মাথা ও মোজার উপর মাসেহ্ করার সময় তিন আঙ্গুল ব্যবহার করা জরুরী (তাবয়ীন)।

১৫. মাসআলা ঃ তায়াম্মুম সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হল পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হওয়া। যে ব্যক্তি পানি থেকে ১.৮৩ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত, (এটাই পসন্দনীয় মত) সে শহরের ভেতরে হোক বা বাইরে (এটাই সহীহ্ মত) এবং সে মুসাফির হোক বা মুকীম তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয (তাবয়ীন)। শহরের লোকদের জন্য পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করা জাইয নেই। অনুরূপভাবে যে গ্রামের সমস্ত মানুষ অথবা অধিকাংশ মানুষ দিনের বেলা গ্রাম থেকে পৃথক হয় না ঐ গ্রামের লোকদের জন্যও পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা জাইয নেই। ফকীহ্ সুলামী (র) বলেন, উপরোক্ত লোকদের জন্য তায়াম্মুম করা জাইয। তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাদের

জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। বস্তুত পানি তালাশ করার পর ফকীহ্দের এ মতবিরোধ প্রযোজ্য হবে। পানি তালাশ করার পূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে উপরোক্ত লোকদের জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৬. মাসআলা ঃ (ميل) মাইল এর পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম মত হল এই যে, এক "মাইল" এক ফরসখের তিন ভাগের এক ভাগ। লম্বার দিক থেকে চার হাজার হাত। অর্থাৎ এক মাইল ১.৮৩ কিলোমিটার। এক হাত = ২৪ আঙ্গুল। আঙ্গুলের প্রস্ত ছয় যব পরিমাণ। সমান্তরালভাবে বিছিয়ে এগুলোর দ্বারা আঙ্গুলের প্রস্তের দিকটি নির্ণয় করতে হবে (তাবয়ীন)। দূরত্বের বিষয়টি লক্ষণীয়। সময় শেষ হয়ে যাবার বিষয়টি লক্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য নয় (হিদায়া)। হিংস্র প্রাণী এবং শত্রুর ভয়ে তায়াম্মুম করা জাইয। এ ভয় নিজের জানের ব্যাপারে হোক বা মালের ব্যাপারে হোক ('ইনায়া)। সাপ এবং আগুনের ভয়েও তায়াম্মুম করা জাইয (তাবয়ীন)। অনুরূপভাবে পানির নিকট যদি কোন চোর বা অত্যাচারী লোক থাকে, যে তাকে কষ্ট দিতে পারে এ ধরনের আশংকাযুক্ত মানুষের জন্যও তায়াম্মুম করা জাইয (কিনয়া)। "নতফ" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আমানতের মাল ধ্বংসের ভয়ে অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যদি ঋণ আদায়ের ক্ষমতা না থাকে এমতাবস্থায় ঋণদাতার ভয়ে তায়াম্মুম করা জাইয (যাহিদী এবং কিফায়া)। অনুরূপভাবে কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের ব্যাপারে আশংকা করে এ কারণে যে, পানি ফাসিক লোকের নিকট আছে, তবে ঐ মহিলার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয (আল্-বাহ্রুর রাইক এবং আন্নাহরুল ফাইক)। যদি নিজের পিপাসার ভয় থাকে অথবা নিজের সাথীদের পিপাসার ভয় থাকে অথবা কাফেলার মধ্যে অন্য কারো পিপাসার ভয় থাকে কিংবা নিজের সওয়ারীর পিপাসার ভয় থাকে অথবা নিজের পশু পাহারাদারীর কুকুর বা শিকারী কুকুরের পিপাসার ভয় থাকে অথবা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে পিপাসার ভয় থাকে তবে তায়াম্মুম করা জাইয। এমনিভাবে আটা খামীরা করার জন্য যদি পানির প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে এ অবস্থায়ও তায়াম্মুম করা জাইয। তবে সুরবা পাকানোর প্রয়োজনীয়তার কারণে তায়াম্মুম করা জাইয নেই।

১৭. মাসআলা ঃ জুনুবী ব্যক্তি যদি এরূপ আশংকা করে যে, গোসল করলে ঠাণ্ডায় মরে যাবে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, তবে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জাইয আছে। শহরের বাইরের লোকদের জন্য ফকীহ্দের সর্বসম্মতিক্রমে এ হুকুম প্রযোজ্য। শহরের অধিবাসীদের জন্যও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ মতবিরোধ ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার হাম্মাম (গোসল) খানায় প্রবেশ করার ক্ষমতা নেই। যদি কারো হাম্মামখানায় প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকে, তবে কোন ফকীহ্র মতেই তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। অনুরূপভাবে এ মতবিরোধ ঐ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য, যার গরম পানি সংগ্রহ করার ক্ষমতা নেই। যদি কারো গরম পানি সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকে, তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। উযূহীন ব্যক্তি যদি এ আশংকা করে যে, উযূ করলে সে মরে যাবে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয (কাফী এবং আসরার নামক

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিতাবেও এ মতটিকে পসন্দনীয় বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে)। অবশ্য বিশুদ্ধতম মতে ফকীহদের সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। (আন্নাহ্রুল ফাইক)। সহীহ্ মতে এরূপ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করার অনুমতি নেই (খুলাসা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি পানি পায় কিন্তু নিজে অসুস্থ, আশংকা আছে যদি পানি ব্যবহার করে, তবে রোগ বেড়ে যাবে অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হয়ে যাবে, তবে সে তায়াম্মুম করবে। নড়াচড়ার কারণে রোগ বৃদ্ধি পাওয়া (যেমন 'ইরকুল মাদানী' রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা পেটের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি) অথবা মাটি ব্যবহারের কারণে রোগ বৃদ্ধি পাওয়া (যেমন বসন্ত রোগী ইত্যাদি)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রোগী যদি এমন হয় যে, সে নিজে উযূ করতে পারে না এবং উযূ করিয়ে দেয়ার মতও অন্য কাউকে পায় না, তবে সেও তায়াম্মুম করতে পারবে। রোগী যদি কোন খাদিম পায় অথবা মজদুর নিয়োগ করার মত পারিশ্রমিক তার নিকট থাকে অথবা কোন সাহায্যকারী মানুষ পায়, তবে যাহিরী মাযহাব অনুসারে সে তায়াম্মুম করতে পারবে না। কেননা, সে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম (ফাতহুল কাদীর)। রোগ বৃদ্ধির এ আশংকা আলামত বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে غلبة ظن (প্রবল ধারণা) দ্বারা অথবা এমন মুসলিম চিকিৎসক যার ফিস্ক প্রকাশ্য নয় এর দ্বারা নির্ণয় করতে হবে (ইবরাহীম হালবী (র) কর্তৃক প্রণীত ঃ শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

১৯. মাসআলা ঃ কারো শরীরে যদি বসন্ত হয় অথবা যখম থাকে, তাহলে অধিকাংশ অংশের অবস্থা দেখে বিচার করতে হবে। রোগী উযূহীন হোক বা জুনুবী হোক। জানাবাতের অবস্থায় অধিকাংশ শরীরের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। আর উযূহীন অবস্থায় উযূর অঙ্গসমূহের মাঝে অধিকাংশের প্রতি নজর করতে হবে। যদি শরীরের বেশীর ভাগ অংশ ভাল থাকে এবং কম অংশ যখম থাকে, তবে ভাল অংশ ধৌত করবে এবং যখমের স্থান সম্ভব হলে মাসেহ্ করবে। যখমের স্থানে মাসেহ্ করা সম্ভব না হলে পট্টি বা ব্যাণ্ডিজের উপর মাসেহ্ করবে। ধৌত ও তায়াম্মুম উভয় কাজ একত্রে করবে না। যদি অর্ধেক শরীর ভাল হয় এবং অর্ধেক ক্ষত হয়, তবে ফকীহ্দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে সে তায়াম্মুম করবে। কিন্তু পানি ব্যবহার করবে না (খুলাসা ও মুহীত)। "জমউল উলূম" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ছারপোকা, বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড গরমের ভয়ের কারণে তায়াম্মুম করা জাইয (যাহিদী ও কিফায়া)।

২০. মাসআলা ঃ মুসাফির ব্যক্তি কূপের নিকট পৌঁছার পর যদি দেখে যে, তার নিকট বালতি নেই, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয। এমনিভাবে যদি তার নিকট বালতি থাকে কিন্তু রশি না থাকে, তবু তায়াম্মুম করা জাইয। ফকীহ্গণ বলেন ঃ উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি এ পথিকের নিকট রুমাল জাতীয় কোন কাপড় না থাকে। যদি তার নিকট রুমাল জাতীয় কোন কাপড় থাকে, তবে তায়াম্মুম করা সহীহ্ হবে না। যদি উপরোক্ত মুসাফির ব্যক্তির নিজস্ব বালতি তার কোন বন্ধুর নিকট থাকে এবং তার বন্ধু তাকে বলে আপনি অপেক্ষা করুন আমি পানি এনে আপনাকে দিচ্ছি, তবে তার জন্য অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। যদি অপেক্ষা না করে তায়াম্মুম করে নেয়, তবে জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা ঃ কোন খালের পানি যদি জমাট বেঁধে যায় এবং এর নীচ দিয়ে যদি পানি প্রবহমান থাকে এমতাবস্থায় কারো নিকট যদি এ জমাট পানিকে কাটার যন্ত্র থাকে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। কারো কারো মতে তায়াম্মুম করা জাইয। যদি কারো নিকট শুধু জমাট পানি বা বরফ থাকে এবং তার নিকট বরফ গলানোর যন্ত্রও থাকে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। কারো কারো মতে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয আছে। তবে প্রথম মতটি অধিকতর সুস্পষ্ট যা কারো নিকটই অস্পষ্ট নয় (আল্ বাহ্রুর রাইক)।

২২. মাসআলা ঃ দারুল হরব (অমুসলিম অধ্যুষিত যুদ্ধরত দেশ)-এ বন্দী মুসলিম ব্যক্তিকে যদি কাফির লোকেরা উযূ ও সালাত আদায়ে বাধা দান করে, তবে সে তায়াম্মুম করে ইশারা করে সালাত আদায় করবে অতঃপর কারামুক্তির পর পুনরায় সালাত আদায় করে নিবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি যদি উযূ কর, তবে আমি তোমাকে বন্দী করে রাখব বা হত্যা করে ফেলব, তবে সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে, পরে পুনরায় আদায় করে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কারাগারে বন্দী ব্যক্তি তায়াম্মুম[১] করে সালাত আদায় করবে এবং উযূ করে পরে পুনরায় আদায় করে নিবে। কেননা, এখানে অক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে মানুষের কর্মের দ্বারা। আর মানুষের কর্মের কারণে আল্লাহ্র হক বাতিল হতে পারে না। তাই পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি সফরের অবস্থায় বন্দী হয়ে যায়, তবে সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। কিন্তু পুনরায় সালাত আদায় করার আর প্রয়োজন হবে না। কেননা, এখানে প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সফরের ওযরও সংযোজিত হয়েছে। আর সফরের অবস্থায় প্রায়ই পানি পাওয়া যায় না। অতএব সর্বদিক থেকেই অক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে, তাই পুনরায় সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই (মুহীত ঃ ইমাম সরুখসী (র)। মূল কথা হল, নিজের জান-মালের ক্ষতি-সাধন ব্যতিরেকে যদি কারো পক্ষে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তবে তার জন্য পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। যদি পানির মূল্য সাধারণ মূল্যের চেয়ে বেশী হয়, তবে এও ক্ষতির মধ্যে শামিল। সুতরাং এ অবস্থায় উযূ করা জরুরী নয়। তবে পানি স্বাভাবিক মূল্যে বিক্রি হলে তার জন্য উযূ করা আবশ্যক (আল-বাহ্রুর রাইক)।

২৩. মাসআলা ঃ (তায়াম্মুম সহীহ্ হওয়ার জন্য) পানি তালাশ করা আবশ্যক। মুসাফির ব্যক্তি যদি নিশ্চিতভাবে ধারণা করে যে, পানি তার নিকটেই আছে, তাহলে এক (غلوة) (তীর যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে ততটুকু দূরত্ব) পর্যন্ত পানি তালাশ করা তার জন্য আবশ্যক। আর যদি পানি নিকটে থাকার ধারণা না থাকে অথবা পানি সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার মত কোন ব্যক্তি না থাকে, তবে তালাশ করা তার জন্য ওয়াজিব নয় (কাফী)। নিকটে পানি পাওয়ার ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয়, তবে পানি তালাশ করা মুস্তাহাব। আর যদি পানি নিকটে আছে বলে সন্দেহও না থাকে, তবে তায়াম্মুম করে নিবে। এতে সে উত্তমকে বর্জনকারীও হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৪. মাসআলা ঃ চারশত হাতে এক (غلوة) (যহীরিয়া)। কোন ব্যক্তি যদি পানির সন্ধানে অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠায়, তবে তার নিজের তালাশ করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। পানি

১. যদি কারাগারে পানির ব্যবস্থা না থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তালাশ করা ব্যতিরেকে যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়, অতঃপর তালাশ করে পানি না পায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে পুনরায় সালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। পানি কারো নিকটে আছে কিন্তু তার জানা নেই এবং জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোকও তার কাছে নেই, এমতাবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয। নিকটে লোকজন ছিল, তাদের নিকট পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যেত, এমতাবস্থায় কেউ যদি জিজ্ঞাসা না করে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়, অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তাকে এ মর্মে সংবাদ দেয়া হয় যে, পানি নিকটেই আছে, তবে এ অবস্থায় তার সালাত সহীহ্ হবে না। যেমনিভাবে লোকালয়ে গিয়ে পানি তালাশ না করে তায়াম্মুম কারলে তায়াম্মুম সহীহ্ হয় না। যদি নিকটস্থ ব্যক্তির কাছে পানির কথা জিজ্ঞাসা করার পর সে পানি সম্পর্কে সংবাদ না দেয়ার পর কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়, অতঃপর পানি নিকটে আছে বলে সংবাদ দেয়, তবে তার সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। কেননা, সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কারো সফর সঙ্গীর নিকট পানি থাকে এবং ধারণাও আছে যে, চাইলে সে দিবে, তবে চাওয়া ব্যতিরেকে তায়াম্মুম করা জাইয হবে না। আর যদি মনে এ ধারণা থাকে যে, চাইলে সে দিবে না, তবে তায়াম্মুম করা জাইয হবে। যদি দেয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয় অতঃপর সাথীর নিকট পানি চায় এবং সে তাকে পানি প্রদান করে, তবে আদায়কৃত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (শরহুয্ যিয়াদাত ঃ আল্লামা আতাবী (র) কর্তৃক প্রণীত)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি সালাত আরম্ভ করার পূর্বে পানি দিতে অস্বীকার করে এবং সালাত শেষ করার পর পানি প্রদান করে, তবে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। যার নিকট পানি আছে এ ব্যক্তি যদি যথাযথ মূল্য ব্যতীত পানি দিতে অস্বীকার করে অথচ তার নিকট পানি ক্রয় করার মূল্য নেই, তাহলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। যদি মূল্য থাকে, তবে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হবে না। পানিওয়ালা ব্যক্তি যদি কয়েক গুণ মূল্য ব্যতীত পানি না বিক্রি করে অথচ এ তো একেবারেই মূল্যহীন বস্তু, তবে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে (কাফী)। যে স্থানে পানির মূল্য বেশী তার নিকটবর্তী স্থানে পানির যে দাম মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ দামই হল গ্রহণযোগ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা ঃ তায়াম্মুম করে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি তার সাথীর নিকট পানি দেখে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে তাকে পানি দিবে, তাহলে সালাত ছেড়ে দিবে। যদি সন্দেহ হয়, তবে সালাত সমাপ্ত করবে। অতঃপর তার নিকট পানি চাইবে। যদি দেয়, তাহলে উযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করবে। যদি না দেয়, তবে সালাত পূর্ণ হয়েছে ধরে নিবে। প্রথম অস্বীকার করে পরে যদি পানি প্রদান করে, তবে আদায়কৃত সালাত ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ

১. মাসআলা ঃ যে সব কারণে উযূ ভঙ্গ হয়, ঐ সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায় (আল্-হিদায়া)। প্রয়োজনাতিরিক্ত পর্যাপ্ত পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়াতেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায় (বাহ্রুর রাইক)। জুনুবী ব্যক্তির গোসল করার পর যদি শরীরের সামান্য অংশ শুকনা থেকে যায় এবং পানিও শেষ হয়ে যায়, তবে নাপাকী যেহেতু বাকী রয়ে গেছে তাই তাকে তায়াম্মুম করতে হবে। অতঃপর যদি উযূ ভেঙ্গে যায়, তবে হাদাছ দূরীভূত করার লক্ষ্যে তায়াম্মুম করে নিবে। এরপর যদি এ পরিমাণ পানি পাওয়া যায় যার দ্বারা উযূ-গোসল উভয়ই সমাধা করা যায়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ-গোসল উভয় কাজ সেরে নিবে। যদি পানি দ্বারা এতদুভয়ের যে কোন একটি নির্ধারিতভাবে সমাধা করা যায়, তাহলে যেটা পূর্ণভাবে সমাধা করা যায় তা সমাধা করবে। আর অবশিষ্টটির জন্য তায়াম্মুম করবে। যদি প্রাপ্ত পানি অনির্ধারিতভাবে কোন একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে উক্ত পানি দ্বারা শুকনা অংশটি ধৌত করবে এবং হাদাছ দূরীভূত করার জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করে নিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে না। যদি প্রাপ্ত পানি দ্বারা উযূ করে, তবে দুরুস্ত আছে। অবশ্য সমস্ত ইমামের মতানুসারে জানাবাত থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করতে হবে। যদি উক্ত পানি পাওয়ার পূর্বে উযূ ভঙ্গের কারণে তায়াম্মুম না করে শুকনা অংশটি ধৌত করার পূর্বে তায়াম্মুম করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে জাইয হবে না। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে। এতদুভয় মতের প্রথমটি বিশুদ্ধতম। যদি প্রাপ্ত পানি উযূ-গোসল কোনটির জন্যই যথেষ্ট না হয় তবে উভয়টির তায়াম্মুমই বাকী থাকবে। কোন জুনুবী ব্যক্তির শরীরের কিছু অংশ শুকনা ছিল, এর জন্য তায়াম্মুম করার পূর্বেই যদি তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে জানাবাত ও হাদাছ উভয় থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে একবার তায়াম্মুম করবে। উভয়টি থেকে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে তায়াম্মুম করার পর যদি এ পরিমাণ পানি পাওয়া যায় যা অনির্ধারিতভাবে কোন একটির জন্য যথেষ্ট, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে শুকনা অংশটি ধৌত করে উযূর জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে (কাফী)। যদি প্রাপ্ত পানি নির্ধারিত কোন একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে প্রাপ্ত পানি একটির জন্য ব্যবহার করবে। আর অপরটির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম যথাযথ বাকী থাকবে (শরহে বেকায়া)।

২. মাসআলা ঃ গোসলের সময় যদি কারো পিঠের কিছু অংশ শুকনা থেকে যায় এবং উযূর সময়ও যদি সে কিছু অঙ্গ ধৌত করার কথা ভুলে যায়, এমতাবস্থায় প্রাপ্ত পানি যদি এমন হয় যে, এর দ্বারা দুয়ের যে কোন একটি সমাধা হতে পারে, তবে যে কোন একটি সমাধা করবে। তবে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করা উত্তম (আল্লামা আতাবী (র) কর্তৃক প্রণীত মরহুম যিয়াদাত)। উযূহীন মুসাফির ব্যক্তি যার কাপড় নাপাক এ ধরনের লোকের নিকট যদি এ পরিমাণ পানি থাকে যে, এর দ্বারা যে কোন একটি কাজ পূর্ণ করা যায়, তবে সে এ পানি দ্বারা নাপাক কাপড় পাক করবে এবং হাদাছ দূরীভূত করার জন্য তায়াম্মুম করবে। যদি প্রথমে তায়াম্মুম করে এবং পরে নাপাকী ধৌত করে, তবে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। কেননা, পানি ব্যবহারে সক্ষম অবস্থায় সে তায়াম্মুম

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছে (মুহীত ইমাম সুরুখসী (র))। উপরোক্ত ব্যক্তি যদি পানি দ্বারা উযূ করে নাপাক কাপড় নিয়ে সালাত আদায় করে, তবে সালাত শুদ্ধ হবে। কিন্তু সে এ কাজের জন্য গুনাহ্গার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ যে রোগের কারণে তায়াম্মুম সহীহ্ হয়েছিল, তা দূর হয়ে যাওয়ার পর তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। কোন মুসাফির ব্যক্তি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার পর সে যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার ফলে তায়াম্মুম করা তার জন্য মুবাহ হয়ে যায়, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি পরে মুকীম হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় পূর্বকৃত তায়াম্মুম দ্বারা সালাত আদায় করা তার জন্য জাইয নেই। কেননা, তায়াম্মুম জাইয হওয়ার কারণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় একটির কারণ অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সর্বোপরি উপরোক্ত কারণ দুটোর প্রথমটি না হওয়ার মত হয়ে গিয়েছে (আল্ ফুসূলুল ইমাদিয়্যা ফী আহকামিল মাব্‌য়া ঃ তাহ্‌রাত অধ্যায়)। যদি কোন ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় চলে যায়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সমস্ত ইমামের মতে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না (যাহিদী)। যদি কোন ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে যানবাহন যোগে চলে যায় এবং ভয়ে বা হিংস্রপ্রাণীর ভয়ে যানবাহন থেকে অবতরণ করার সুযোগ না পায়, তবে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি কূপের নিকট যায় এবং তার নিকট কোন বালতি বা রশি না থাকে অথবা যদি পানি পাওয়া সত্ত্বেও নিজের ব্যাপারে পিপাসার আশংকা থাকে, তবে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল এই যে, যে সব কারণে তায়াম্মুম জাইয হয় না, ঐ সমস্ত কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। এবং যে সমস্ত কারণ তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয় এ সমস্ত কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় না (বাদাই')। তায়াম্মুম অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি পানির উপর দিয়ে চলে যায় এবং তায়াম্মুমের কথা মনে না থাকে, তবে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফ্‌তিয়্যীন)।

৪. মাসআলা ঃ অনেক মানুষ তায়াম্মুম অবস্থায় ছিল, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাদেরকে বলল, এ পানি দ্বারা তোমাদের যে কেউ উযূ করে নিতে পারে, অথচ পানির পরিমাণ এমন যে, এর দ্বারা কেবল একজন উযূ করতে পারবে, তবে উপস্থিত সকলের তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি একথা বলে যে, এ পানি তোমাদের সকলের জন্য, অতঃপর তারা সকলে উক্ত সামান্য পানি নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়–এমতাবস্থায় তাদের কারো তায়াম্মুমই ভঙ্গ হবে না (কাফী)। যদি উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পানি এক ব্যক্তিকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতানুসারে তার তায়াম্মুম বাতিল হবে না। তবে সহীহ্ মতে সমস্ত ফকীহ্‌র রায় অনুসারে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি মাঠের মধ্যে মটকি বা অন্য কিছুতে রক্ষিত পানির নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না এবং ঐ পানি দ্বারা উযূ করাও তার জন্য জাইয নয়। কিন্তু পানি যদি অধিক হয় এবং আধিক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পানি পানাহার এবং উযূ করার জন্য রাখা হয়েছে, তবে এর দ্বারা উযূ করাও জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ তায়াম্মুম অবস্থায় মুসাফির যদি এ পরিমাণ পানি পায় যা অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু সুন্নাত মুতাবিক উযূ করলে এপানি যথেষ্ট হবে না, তবে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়, তবে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। সুতরাং সে যদি পুনরায় মুসলমান হয় এবং এ তায়াম্মুম দ্বারা সালাত আদায় করে, তবে আমাদের ফকীহদের মতে তার আদায়কৃত সালাত দুরুস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসাইল

১. মাসআলা ঃ তায়াম্মুমের সুন্নাত সাতটি। মাটিতে হাত মেরে প্রথমে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে টেনে আনা, তারপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে টেনে আনা, উভয় হাত ঝাড়া, অঙ্গুলিসমূহ প্রশস্ত রাখা, তায়াম্মুমের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলা, তারতীব ও ক্রমানুসারে তায়াম্মুম করা এবং তায়াম্মুমের কর্মসমূহ পরপর না থেমে সমাধা করা (আল্–বাহ্‌রুর রাইক ও আন্–নাহ্‌রুল ফাইক)।

২. মাসআলা ঃ তায়াম্মুম করার পদ্ধতি হল, প্রথমে উভয় হাত মাটির উপর মারবে। অতঃপর উভয় হাত সামনের থেকে পেছনের দিকে এবং পেছনের থেকে সামনের দিকে টেনে আনবে। এরপর উভয় হস্ত মাটি থেকে উত্তোলন করে ঝাড়বে (তাবয়ীন)। এমনভাবে ঝাড়বে যেন মাটি পড়ে যায় (হিদায়া)। তারপর উভয় হাত দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল এমনভাবে মাসেহ্ করবে যেন কোন অংশ বাকী না থাকে। এরপর আরেকবার অনুরূপভাবে উভয় হাত মাটিতে মারবে এবং এর দ্বারা উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করবে (তাবয়ীন)। আমাদের মাশাইখে কিরাম বলেছেন ঃ বাম হাতের চার আঙ্গুল দ্বারা ডান হাতের উপরিভাগ আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করবে। অতঃপর বাম হাতের তালুর দ্বারা ডান হাতের নীচের অংশ কবজি পর্যন্ত মাসেহ্ করবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ভেতরের অংশ দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের অংশ মাসেহ্ করবে। বাম হাতও অনুরূপ নিয়মে মাসেহ্ করবে। এতেই সতর্কতা নিহিত রয়েছে (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখসী (র.) কর্তৃক প্রণীত বাদাই')।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম করে, তবে আমাদের মতে জাইয আছে (খুলাসা)। একবারের তায়াম্মুম দ্বারা ফরয–নফল যত নামায ইচ্ছা আদায় করতে পারবে (আল্ ইখতিয়ার ফী শরহিল মুখতার)। যদি কারো নিশ্চিত ধারণা থাকে যে, শেষ ওয়াক্তে সে পানি পাবে এবং তার স্থান হতে পানির স্থানের দূরত্ব ১.৮৩ কিলোমিটার এ ধরনের ব্যক্তির জন্য আখিরী ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব (মি'রাজুদ দিরায়া)। ফকীহ্ খাজনাদী (র) বলেন ঃ জাইয ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অন্যান্য ইমাম বলেন ঃ মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এটাই সহীহ্ মত (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি পানি পাওয়ার আশা না থাকে, তবে বিলম্ব করবে না। বরং তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করবে (বাদাই)। অনুরূপ বর্ণিত আছে, শরহুত তাহাবী এবং কাফী নামক কিতাবদ্বয়ে সফরের অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক ব্যক্তি হল জুনুবী, আরেকজন ঋতুস্রাব হতে সদ্য পবিত্রতা অর্জনকারী মহিলা এবং আরেকটি হল মৃতদেহ সর্বমোট তিন ব্যক্তি, এদের নিকট যদি এ পরিমাণ পানি থাকে, যার দ্বারা এক জনের কাজ সমাধা করা যায় এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, এ পানিতে তাদের কারো মালিকানা আছে কিনা? যদি থাকে, তবে সেই এ পানি ব্যবহার করার হকদার। আর যদি সকলেই এ পানির যৌথ মালিক হয়, তবে কারো জন্যই এ পানি ব্যবহার করা জাইয নেই। বরং সকলেই তায়াম্মুম করবে। আর যদি এ পানি মুবাহ পানি হয়, তাহলে জুনুবী ব্যক্তিই এ পানি ব্যবহারের অধিক হকদার (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। এটা সহীহ্ মত (যহীরিয়্যা)। অনুরূপভাবে ঋতুবতী মহিলার স্থলে যদি উযূহীন ব্যক্তি হয়, তবে ঐ পানি জুনুবী ব্যক্তি খরচ করবে (খুলাসা)। উপরোক্ত অবস্থায় পানি যদি পিতা-পুত্রের মালিকানাধীন হয়, তবে এ পানি খরচ করার ব্যাপারে পিতা পুত্রের তুলনায় অধিক হকদার (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জুনুবীর নিকট যদি এ পরিমাণ পানি থাকে, যার দ্বারা উযূ করা যায়, তবে সে তায়াম্মুম করবে। এ পানি দ্বারা উযূ করা তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু জানাবাতের সাথে যদি এমন হাদাছও হয় যার কারণে উযূ করা ওয়াজিব, তাহলে উক্ত পানি দ্বারা উযূ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে যদি কোন উযূহীন ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ পানি থাকে যার দ্বারা উযূর অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন কোন অঙ্গ ধৌত করা সম্ভব, তবে সে কিছু অঙ্গ ধৌত না করে তায়াম্মুম করে নিবে (শরহে বেকায়া)।

৪. মাসআলা ঃ হাওদার ভেতর পানি ছিল কিন্তু জানা ছিল না বা ভুলে গিয়েছে এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে, তবে তার আদায়কৃত সালাত দুরুস্ত হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখসী (র.))। এ মতানৈক্য ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যদি তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি নিজে হাউদার মধ্যে পানি রাখে অথবা তার নির্দেশে অন্য কেউ পানি রাখে অথবা তার নির্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কেউ পানি রাখে কিন্তু তার জানা ছিল। তায়াম্মুমকারীর নির্দেশ ব্যতিরেকে যদি অন্য কেউ পানি রাখে এবং তার জানাও না থাকে, তবে কোন ইমামের মতেই তার সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না (তাবয়ীন)। পানির কথা ওয়াক্তের মধ্যে স্মরণ হওয়া এবং ওয়াক্তের পরে স্মরণ হওয়া একই কথা (হিদায়া)। যদি কোন ব্যক্তি এমন কূপের পার্শ্বে নিজের তাঁবু স্থাপন করে যায় মুখ ঢাকা এবং যার মধ্যে পানি আছে অথচ তার জানা নেই অথবা কোন ব্যক্তি যদি খালের পার্শ্বে তাঁবু স্থাপন করে কিন্তু এর মধ্যে পানি আছে বলে তার জানা নেই এমতাবস্থায় সে যদি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার সালাত সহীহ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কারো সন্দেহ থাকে অথবা প্রবল ধারণা থাকে যে, পানি শেষ হয়ে গিয়েছে এ অবস্থায় সে যদি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে, অতঃপর পানি পায়, তবে সমস্ত ইমামের সর্বসম্মতি রায় অনুসারে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। কারো পিঠের উপর পানি ছিল অথবা পানি গলায় ঝুলানো ছিল অথবা পানি তার সামনে রক্ষিত ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে

সে পানির কথা ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে, তবে ইমামদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার তায়াম্মুম দুরুস্ত হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ পানি যদি বস্তা বোঝাই করার গদির মধ্যে ঝুলানো থাকে এবং সে যদি সওয়ার থাকে আর পানি থাকে আসবাবপত্রের পেছনে, তাহলে এরূপ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জাইয আছে। যদি পানি গদির সামনে থাকে, তবে তায়াম্মুম জাইয হবে না। আর যদি সে সওয়ারী হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এমতাবস্থায় পানি যদি আসবাবপত্রের পেছনে থাকে, তবে তায়াম্মুম জাইয হবে না। যদি সামনে থাকে, তবে তায়াম্মুম জাইয হবে। আর যদি সে সামনে বসে চালায়, তবে প্রত্যেক অবস্থায়ই তায়াম্মুম করা জাইয (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখসী (র.))।

৭. মাসআলা ঃ রোগী যদি উযূ ও তায়াম্মুম করার ক্ষমতা না রাখে এবং তার নিকট যদি উযূ এবং তায়াম্মুম করিয়ে দেয়ার মত কোন লোকও না থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে সালাত আদায় করবে না। শায়খ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র) বলেন, আমি ইমাম কারখী (র)-এর কিতাব জামে' সগীরে দেখেছি যে, যার উভয় হাত এবং উভয় পা কাটা এবং মুখমণ্ডলেও যখম আছে সে পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকেই সালাত আদায় করবে। তায়াম্মুমও করবে না এবং আদায়কৃত সালাত পুনরায় আদায়ও করতে হবে না। এটাই সহীহ (যহীরিয়্যা)। কয়েদী ব্যক্তি যদি পানি না পায় এবং পাক মাটিও না পায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে সালাত আদায় করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যদি উক্ত ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা মাটি বা দেয়াল খুঁড়তে সক্ষম না হয়। যদি সক্ষম হয়, তবে মাটি বের করে তায়াম্মুম করবে (খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ ঈযাহ্ নামক কিতাবে আছে, যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, উযূ করলেই তার পেশাব ঝরতে থাকে এবং তায়াম্মুম করলে পেশাব ঝরে না, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মাঠে অবস্থানকারী ব্যক্তির নিকট যদি যমযমের পানি শিশিতে রাং দ্বারা মুখ বন্ধ অবস্থায় থাকে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয হবে না (খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ যদি জানাযা উপস্থিত হয় এবং ওয়ালী অন্য ব্যক্তি হয়, তবে সালাতে জানাযা ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা জাইয। কিন্তু ওয়ালীর জন্য জাইয নেই। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। ওয়ালী যাকে উযূ করার হুকুম দেয়, তার জন্যও তায়াম্মুম করা জাইয নেই (খুলাসা)। যে ব্যক্তি সালাতে জানাযার ইমামতের ব্যাপারে ওয়ালীর চেয়েও অধিক হকদার, তার উপস্থিতিতে ওয়ালীর জন্যও সমস্ত ইমামের মতে তায়াম্মুম করা জাইয। কেননা, তারও সালাতে জানাযা ছুটে যাওয়ার আশংকা আছে। অনুরূপভাবে ওয়ালী যদি অন্য কাউকে ইমামতের জন্য অনুমতি দেয় তবে এ অবস্থায়ও ওয়ালীর জন্য তায়াম্মুম করা জাইয (আল্ বাহ্রুর রাইক)। এক ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাতে জানাযা আদায় করার পর যদি আরেকটি জানাযা তার সামনে উপস্থিত হয়, তবে দেখতে হবে যে, যদি দ্বিতীয় ও প্রথম জানাযার মধ্যে এতটুকু পরিমাণ সময় পাওয়া যায়, যার মধ্যে সে উযূ করে ফিরে এসে সালাত আদায় করতে পারে, তবে সে পুনরায় তায়াম্মুম করে নিবে। আর যদি এ পরিমাণ সময় না পায়, তবে এ তায়াম্মুম দিয়েই সালাত আদায় করবে। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ ঈদের সালাত আরম্ভ করার পূর্বে যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তবে ইমামের জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। আর যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে তায়াম্মুম করা জাইয আছে (আল্ বাহ্রুর রাইক)। উযূ করতে গেলে যদি সালাতে ঈদ ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তবে মুক্তাদীর জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। আর যদি সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে তায়াম্মুম করা জাইয হবে। মুক্তাদী বা ইমাম তায়াম্মুম করে সালাতে ঈদ আরম্ভ করার পর যদি তাদের কারো হাদাছ হয়, তবে সে পুনরায় তায়াম্মুম করে সালাত যতটুকু পড়েছে এরপর হতে শুরু করবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে উযূ করে সালাত আরম্ভ করার পর যদি উযূ ছুটে যায়, তবে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে ইমামদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তায়াম্মুম করে বাকী সালাত আদায় করবে। যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়া আশংকা না থাকে এবং যদি সালাত শেষ করার পূর্বে ইমামকে সালাতের অবস্থায় পাওয়ার আশা থাকে, তবে সমস্ত ইমামের মতে তার জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নেই। আর যদি সালাত থেকে ফারিগ হবার পূর্বে ইমামকে পাওয়ার আশা না থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে তায়াম্মুম করবে এবং বাকী সালাত আদায় করবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন (নিহায়া)। এ সম্পর্কে মূলনীতি এই যে, যে ক্ষেত্রে আদায় ফওত হয়ে গেলে এর পরিবর্তে অন্য কোন আমল না থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা জাইয। আর যেখানে আদায়ের পরিবর্তে অন্য আমল আছে, সেখানে তায়াম্মুম করা জাইয নেই। যেমন জুমুআর সালাত (আল্ জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

১১. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি একই স্থান থেকে তায়াম্মুম করে, তবে তায়াম্মুম জাইয আছে (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))। যদি কোন ব্যক্তি একই স্থান থেকে কয়েকবার তায়াম্মুম করে, তবু জাইয আছে (তাতারখানিয়্যা)। জুনুবী ব্যক্তি যদি সালাতে জানাযা এবং ঈদের সালাতের জন্য তায়াম্মুম করে তবে জাইয আছে। (যহীরিয়্যা) যদি কারো নিজের তায়াম্মুমের ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা থাকে, তবে "তার তায়াম্মুম আছে" ধরে নিতে হবে, যতক্ষণ না হাদাছের ব্যাপারে তার ইয়াকীন হয়.আর যার নিজের হাদাছের ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা আছে, তাকে উযূহীন ধরে নিতে হবে, যতক্ষণ না তায়াম্মুমের ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস হবে (খুলাসা)। তায়াম্মুমের উপর তায়াম্মুম করা ইবাদত নয় (কিনয়া)। মুসাফিরের জন্য নিজের বাঁদীর সাথে সহবাস করা জাইয। যদিও সে জানে যে, পানি পাওয়া যাবে না (খুলাসা)। তায়াম্মুম করে কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে, এমতাবস্থায় যদি কোন খৃষ্টান ব্যক্তি তাকে বলে, "পানি নাও", তবে সে সালাত ছাড়বে না বরং সালাত আদায় করতে থাকবে। কেননা, খৃষ্টান লোকেরা মুসলমানদের সাথে অনেক সময় ঠাট্টাও করে থাকে। সুতরাং অনিশ্চয়তার কারণে সালাত ঠিক ছাড়া নয়। সালাত আদায় শেষে মুসলমান তার নিকট পানি চাইবে, যদি পানি দেয়, তবে পুনরায় সালাত আদায় করবে। আর যদি না দেয়, তবে পুনরায় আদায় করতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মোযার উপর মাসেহ্ করা সম্বন্ধে

[এই পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথমে অনুচ্ছেদ ঃ মোযার উপর মাসেহ্ করা

১. মাসআলা ঃ মোযার উপর মাসেহ্ করা রুখসত (জাইয), কোন ব্যক্তি যদি মোযার উপর মাসেহ করাকে জাইয মনে করে আযীমতের উপর আমল করে, তবে খুবই ভাল (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ মাসেহ্ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হল ঃ মোযা এমন হতে হবে, যেন তা পরিধান করে (জুতা ছাড়াই মোযা পরা অবস্থায় পদব্রজে) সফর করা যায়, অবিরত পথ চলা যায় এবং উভয় টাখ্নু আবৃত থাকে। টাখ্নুর উপরিভাগ ঢাকা শর্ত নয় (মুহীত)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এমন মোযা পরিধান করে তা পায়ের নলা ঢাকে না কিন্তু টাখনু ঢেকে রাখে, তবে এর উপর মাসেহ্ করা জাইয।

৩. মাসআলা ঃ "জাওরাবে মুজাল্লাদ"-এর উপর মাসেহ্ করা জাইয। "জাওরাবে মুজাল্লাদ" ঐ মোযা যা মোযার হিফাজতের জন্য মোযার উপর পরিধান করা হয়, যার উপর-নীচ উভয় অংশেই চামড়া (কাফী)। "জাওরাবে মুনা'আ্যালের উপরও মাসেহ্ করা জাইয। জাওরাবে মুনা'আ্যাল হল ঐ মোযা যা জুতার ন্যায় যার নীচে ও শুধু চামড়া আছে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যে মোযার উপর নীচ তথা কোন অংশেই চামড়া নেই এবং নীচের অংশেও চামড়া নেই, এ মোযা যদি খুব মোটা হয় আর তা যদি বাঁধন ব্যতিরেকে পায়ের নলায় আটকে থাকে এবং মোযার উপর থেকে ভেতরের অংশ না দেখা যায়, তবে এ মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয। (এ কথার উপরই ফাতওয়া) (আন্ নাহ্রুল ফাইক)। টাখুন পর্যন্ত মোযা পরিহিত যার ফলে টাখ্নু এবং পায়ের কোন অংশ দেখা যায় না। কেবল দুই-এক আঙ্গুল পরিমাণ দেখা যায়, তবে এর উপর মাসেহ্ জাইয হবে। এ মোযা ঐ মোযার হুকুমে যার উপরের অংশ নেই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন ব্যক্তি শুধু কেবল জুরমূক পরিধান করে এবং তা যদি শণ কিংবা পাট অথবা সুতার তৈরী হয়, তবে এর উপর মাসেহ্ করা জাইয নয়। আর যদি চামড়া বা এ জাতীয় অন্য কিছুর হয়, তবে এর উপর মাসেহ্ করা জাইয। কোন ব্যক্তি যদি চামড়ার মোযার উপর জুরমূক পরিধান করে এবং এ যদি সুতা বা এ জাতীয় কিছুর তৈরী হয়, তবে এর উপর মাসেহ্ করা জাইয নয়। হ্যাঁ, জুরমূক যদি এমন পাতলা হয় যে, মাসেহ্করণের আর্দ্রতা ভেতরে যেয়ে পৌঁছে, তবে মাসেহ্ জাইয হবে। যদি কোন ব্যক্তি উযূ ভঙ্গের পর মোযার উপর মাসেহ্ করার আগে অথবা উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর এবং মোযার উপর মাসেহ্ করার পর যদি কোন ব্যক্তি জুরমূক পরিধান করে এবং জুরমূক যদি চামড়া বা এ জাতীয় কোন কিছুর হয়, তবে এ জুরমূকের উপর মাসেহ্ করা জাইয হবে না। আর যদি উযূ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে জুরমূক পরিধান করে, তবে আমাদের ইমামদের মতে এর উপর মাসেহ করা জাইয আছে (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি উভয় পায়ে মোযা পরিধান করার পর কোন এক পায়ে জুরমূক পরিধান করে, তবে তার জন্য জাইয আছে জুরমূকবিহীন মোযার উপর মাসেহ্ করা এবং জুরমূকের উপরও মাসেহ্ করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মোযার উপর মোযা পরিধান করা জুরমূকের হুকুমের মধ্যেই শামিল (খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি দুই ভাঁজ বিশিষ্ট মোযা পরিধান করে, তবে তার জন্য মাসেহ্ করা জাইয (কাফী)। সহীহ্ মাযহাব মতে তুর্কী পদ্ধতিতে তৈরী করা মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয আছে। কেননা তা পরিধান করে সফরে অবিরত হাঁটা যায় (শরহুল মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র.))। জারূক পরিধান করলে যদি পূর্ণ পা ঢেকে যায় এবং টাখ্নু ও পায়ের উপরিভাগ থেকে কেবল দুই-এক আঙ্গুল পরিমাণ প্রকাশিত হয়, তবে এর উপর মাসেহ্ করা জাইয। যদি এমন না হয়, তবে চামড়া দ্বারা বেঁধে রাখার ফলে পা আবৃত হয়ে থাকে এবং যদি জারূকের সাথে পুথি মিলিত থাকে, তবে এর উপরও মাসেহ্ করা জাইয। যদি অন্য কোন বস্তু দ্বারা তাকে বেঁধে রাখা হয়, তবে মাসেহ্ করা জাইয নেই (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ লোহা, কাঁচ ও কাঠ দ্বারা তৈরী করা মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই (আল্ জাওহারাতুন ন্যায়্যারা)।

৬. মাসআলা ঃ মোযা মাসেহ্ করার সময় উপরের দিক দিয়ে হাতের তিন অঙ্গুলি দিয়ে মাসেহ্ করা আবশ্যক। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র.)। হাতের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ হলেই যথেষ্ট হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মোযার নীচের অংশে, পেছনে, নলায়, চতুষ্পার্শে এবং টাখনুর উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি যদি এক পায়ের উপর দুই আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ্ করে এবং অন্য পায়ের উপর পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ্ করে, তবে এ মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা ঃ মোযার অগ্রভাগের যে স্থান পা থেকে খালি ঐ স্থানের মাসেহ্ গ্রহণযোগ্য নয়। যদি খালি স্থানের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং মাসেহ করে, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে। মাসেহ্ করার পর পুনরায় যদি পা ঐ স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়, তবে পুনরায় মাসেহ্ করতে হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কারো এক পায়ে যখম থাকে এবং সে তা ধৌত করতে এবং মাসেহ্ করতে সক্ষম না হয়, তবে অপর পায়ের উপর মাসেহ্ করা তার জন্য জাইয আছে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তির টাখনুর উপর দিয়ে পা কাটা থাকে, তবে অপর পায়ের উপর মাসেহ্ করা তার জন্য জাইয আছে। আর যদি টাখনুর নীচ দিয়ে পা কাটা থাকে এবং তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ্ করার স্থান বাকী থাকে, তবে উভয় পায়ের উপর মাসেহ্ দুরুস্ত হবে। অন্যথায় দুরুস্ত হবে না (মুহীত)। জুরমূক যদি চওড়া হয় এবং এর ভেতর হাত ঢুকিয়ে যদি কোন ব্যক্তি মোযার উপর মাসেহ্ করে, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না (কিনয়া)।

৮. মাসআলা ঃ তিন আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ্ করা আবশ্যক। এটাই সহীহ্ (কাফী)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি নতুন পানি লওয়া ব্যতিরেকে এক আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ্ করে, তবে জাইয হবে

না। যদি এক আঙ্গুল দ্বারা তিন বার তিন স্থানে মাসেহ্ করে এবং প্রত্যেক বার নতুন পানি লয় তবে মাসেহ্ জাইয হবে (তাবয়ীন)। যদি কোন ব্যক্তি বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ্ করে এবং উভয় আঙ্গুল খোলা অবস্থায় থাকে, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন ব্যক্তি এমনভাবে মাসেহ্ করে যে, তিন আঙ্গুল পায়ের উপর রাখল, কিন্তু টানল না, তবু মাসেহ্ জাইয হবে। কিন্তু সুন্নাতের বরখেলাফ হবে (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে যদি কেউ মোযার উপর মাসেহ করে এবং আঙ্গুল হতে যদি পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝড়ে পড়ে, তবে মাসেহ্ জাইয হবে। যদি এমন না হয়, তবে জাইয হবে না (যখীরা)। যদি মাসেহ্ করার স্থান পানি বা বৃষ্টি তিন আঙ্গুল পরিমাণ লাগে অথবা কোন ব্যক্তি যদি বৃষ্টির পানিতে ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে চলে, তবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। সহীহ্ মতে শিশির ও বৃষ্টির পানির মত (তাবয়ীন)। ধৌত করার পর যে আর্দ্রতা বাকী থাকে, তার দ্বারাও মাসেহ্ করা জাইয। পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ুক বা না পড়ুক। মাসেহ্ করার পর হাতের তালুতে যে আর্দ্রতা বাকী থাকে এর দ্বারা মাসেহ্ করা জাইয নেই (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ মাসেহ্ করার পদ্ধতি এই যে, প্রথমে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহ ডান মোযার অগ্রভাগের উপর রাখবে এবং বাম হাতের অঙ্গুলিসমূহ বাম মোযার অগ্রভাগের উপর রাখবে। অতঃপর উভয় হাত টাখনুর উপর পায়ের নালার দিকে টেনে আনবে। এ সময় আঙ্গুলগুলোকে খোলা রাখবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এতো হল মাসেহ্ করার সুন্নাত তরীকা। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি পায়ের নালার দিক থেকে আঙ্গুলের দিকে টেনে আনে অথবা উভয় মোযার উপর আড়াআড়িভাবে মাসেহ্ করে, তবু জাইয আছে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। কোন ব্যক্তি যদি পায়ের উপর হাতের তালু রেখে উপরের দিকে টেনে আনে অথবা আঙ্গুল রেখে তা উপরের দিকে টেনে আনে, তবে এও ভাল। তবে উত্তম হল, পূর্ণ হাত দ্বারা মাসেহ্ করা। কেউ যদি হাতের তালুর উপরের দিক দ্বারা মাসেহ্ করে, তবে জাইয আছে। মুস্তাহাব হল, হাতের তালু দ্বারা মাসেহ্ করা (খুলাসা)। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে মাসেহের মধ্যে রেখা প্রকাশ পাওয়া শর্ত নয় (যাহিদী ও শরহুত তাহাবী)। তবে রেখা প্রকাশ হওয়া মুস্তাহাব (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। একাধিক বার মাসেহ্ করা সুন্নাত নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ মোযার উপর মাসেহ্ করার জন্য নিয়্যাত শর্ত নয়। এটাই সহীহ্ (ফাতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি যদি উযূর সময় পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে নয়, বরং শিক্ষা দেয়ার নিয়্যাতে মোযার উপর মাসেহ্ করে তাহলেও মাসেহ্ দুরুস্ত হবে (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ মাসেহ সহীহ্ হওয়ার শর্ত হল, পা ধৌত করে মোযা পরিধান করার পর পূর্ণ তাহারাত অবস্থায় হাদাছ (উযূ ভঙ্গের কারণ) হওয়া। পূর্ণ তাহারাত চাই মোযা পরিধান করার পূর্বে হাসিল করা হোক বা পরে হাসিল করা হোক এতে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি উভয় পা ধৌত করে মোযা পরে অতঃপর দ্বিতীয় পা ধৌত করে তাতে মোযা পরে এমনি করে হাদাছের পূর্বে তাহারাত পূর্ণ করে, তবে মোযার উপর মাসেহ্ করা দুরুস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি যদি উভয় পা ধৌত করে মোযা পরিধান করে অতঃপর তাহারাত পূর্ণ করার পূর্বেই যদি তার হাদাছ হয়, তবে এ মোযার উপর মাসেহ্ জাইয হবে না (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি উযূহীন অবস্থায় মোযা পরিধান করে, অতঃপর পানিতে প্রবেশ করে এবং মোযার ভেতর পানি ঢুকে, আর উভয় পা ভিজে যায় এরপর সে অন্য অঙ্গগুলো ধুয়ে নেয়, তারপর উযূ ভঙ্গ হয়, তাহলে এ মোযার উপর তার মাসেহ্ করা দুরুস্ত হবে (তাবয়ীন)। যদি কোন ব্যক্তি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করে এবং তায়াম্মুম করে মোযা পরিধান করে, অতঃপর হাদাছ হয়, পরে সে পুনরায় গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করে এবং তায়াম্মুমও করে, তবে এ অবস্থায় মোযার উপর মাসেহ্ করা তার জন্য জাইয হবে। যদি গাধার ঝুটা পানির পরিবর্তে নবী যে তামার (খুরমা ভেজা পানি) হয় এবং উপরোক্ত অবস্থা সামনে আসে, তবে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না (কাফী)।

১৩. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করে অতঃপর তায়াম্মুম করা ব্যতিরেকে মোযা পরিধান করে, পরে হাদাছ হয়, তবে সে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা পুনরায় উযূ করবে, মোযার উপর মাসেহ্ করবে এবং তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ এবং মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্‌সী (র)। উযূহীন তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির জন্য মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। মোযা পরিধান করার পরে বা পূর্বে যার উপর জানাবাতের গোসল ফরয হয়, তার জন্য মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই। কিন্তু যদি সে জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করে এবং উযূ ভঙ্গের কারণে উযূ করে এরপর উভয় পা ধৌত করে মোযা পরিধান করে, তবে যখন সে উযূ করবে, তখন হতে মুদ্দতের মধ্যে তার মাসেহ্ করা জাইয হবে। পরে মনী দেখার কারণে জানাবাত ফিরে এলে তার সম্পর্কে এ হুকুম দেয়া হবে যে, এখন সে জুনুবী হয়েছে (মুযমারাত)। জুনুবী ব্যক্তি যদি গোসল করার পর তার শরীরের কোন অংশ শুকনা থেকে যায় এবং এ অবস্থায় সে যদি মোযা পরিধান করে অতঃপর শুকনা অংশ ধুয়ে নেয় পরে তার হাদাছ হয়, তবে সে মোযার উপর মাসেহ্ করতে পারবে (খুলাসা)। উযূ করার সময় উযূর অঙ্গসমূহ থেকে কোন অঙ্গ যদি শুকনা থেকে যায়, পানি না পৌঁছে এমতাবস্থায় ঐ অঙ্গটি ধৌত করার পূর্বে যদি কারো হাদাছ হয়, তবে সে মাসেহ্ করবে না (তাবয়ীন)।

১৪. মাসআলা ঃ মুদ্দতের মধ্যে মাসেহ্ করা আবশ্যক। মোযার উপর মাসেহ্ করার মুদ্দত মুকীমের জন্য একদিন একরাত্র এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্র (মুহীত)। এ সফর নেক কাজের উদ্দেশ্যে হোক বা অসৎ উদ্দেশ্যে হোক (সিরাজিয়্যা)। মোযা পরিধান করার পর উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর হতে মাসেহের মুদ্দত আরম্ভ হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ফজরের ওয়াক্তে উযূ করে মোযা পরিধান করে অতঃপর আসরের ওয়াক্তে তার উযূ ভঙ্গ হয়, তবে সে উযূ করবে এবং মোযার উপর মাসেহ করবে। এ ব্যক্তি যদি মুকীম হয়, তবে তার মাসেহের সময় দ্বিতীয় দিন ঐ সময় পর্যন্ত বাকী থাকবে প্রথম দিন যে সময় তার উযূ ভঙ্গ হয়েছিল (মুহীত)। মুসাফির হলে চতুর্থ দিনের ঐ সময় পর্যন্ত বাকী থাকবে (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্‌সী (র.)। মুকীম ব্যক্তি যদি ইকামতের সময় সীমার ভেতর সফর আরম্ভ করে, তবে সে সফরের মুদ্দত পূরা করবে (খুলাসা)। মুকীম ব্যক্তি যদি ইকামতের মুদ্দত পূর্ণ করে সফর আরম্ভ করে, তবে সে মোযা খুলে ফেলবে এবং উভয় পা ধৌত করবে (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ মুসাফির ব্যক্তি যদি ইকামতের মুদ্দত পূরা করে মুকীম হয়ে যায়, তবে সে মোযা খুলে উভয় পা ধৌত করবে। আর যদি মুসাফির ব্যক্তি ইকামতের মুদ্দত পূর্ণ করার পূর্বে মুকীম হয়ে যায়, তবে সে ইকামতের মুদ্দত পূর্ণ করবে (খুলাসা)। মাযূরের যদি উযূর সময় এবং মোযা পরিধান করার সময় ওযর না থাকে, তবে সুস্থ মানুষের মত তার জন্যও নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত মাসেহ্ করা জাইয। কিন্তু যদি উযূ করা এবং কোন একটি মোযা পরিধান করার সময় ওযর পাওয়া যায়, তবে ওয়াক্তের মধ্যে মাসেহ্ জাইয হবে। কিন্তু ওয়াক্তের বাইরে মাসেহ্ জাইয হবে না (আল্ বাহ্রুর রাইক)।

১৬. মাসআলা ঃ মোযা বেশী পরিমাণ তথা পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ ফাটা না হওয়া। এটাই সহীহ্ (হিদায়া)। পরিপূর্ণভাবে তিন আঙ্গুল পরিমাণ প্রকাশ হওয়া শর্ত। এটাই বিশুদ্ধতম মত। চাই এ ফাটা মোযার নীচের দিকে হোক বা উপরের দিকে হোক বা পেছনের দিকে হোক। এ ধরনের মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই (মুহীত)। গোড়ালির দিক দিয়ে যদি মোযা ফাটা থাকে, তবে মাসেহ্ না জাইয হবে না (খুলাসা)। অঙ্গুলির স্থান ব্যতীত অন্য জায়গা দিয়ে যদি মোযা খুলে যায়, তবে এখানে ছোট অঙ্গুলির পরিমাণ ধর্তব্য হবে। আর আঙ্গুলই যদি খুলে যায়, তবে যে কোন তিন আঙ্গুল পরিমাণ খুলতেই মাসেহ্ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বৃদ্ধ আঙ্গুলির নিকটবর্তী আঙ্গুলসহ যদি দুই আঙ্গুল খুলে যায় এবং এ দুই আঙ্গুল পরিমাণের দিক থেকে ছোট তিন আঙ্গুলের সমান, তাহলেও এ ধরনের মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয হবে। যদি বৃদ্ধ আঙ্গুলিসহ এর সাথের আরো দুই আঙ্গুল খুলে যায়, তবে এরূপ মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয হবে না। যে ব্যক্তির পায়ের আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে ফাটা, তার মোযার ছেড়ায় পরিমাণ অন্যের আঙ্গুল দিয়ে নিরূপণ করতে হবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা ও তাবয়ীন)।

১৭. মাসআলা ঃ মোযার মধ্যে যদি কয়েক জায়গা দিয়ে ছেঁড়া থাকে তবে এগুলোকে একত্রিত করা হবে। কিন্তু দুই মোযার মধ্যে যদি কয়েক জায়গা দিয়ে ছেঁড়া থাকে, তবে এগুলোকে একত্রিত করা হবে না। সুতরাং এক মোযায় যদি এক আঙ্গুল পরিমাণ ছেঁড়া থাকে এবং অপর মোযায় যদি দুই আঙ্গুল পরিমাণ ছেঁড়া থাকে, তবে এ ধরনের মোযার উপর মাসেহ্ জাইয হবে। যদি এক মোযার সম্মুখভাগে এক আঙ্গুল পরিমাণ ছেড়া থাকে, পেছনে অনুরূপ ছেঁড়া থাকে এবং পার্শ্বের দিকে যদি অনুরূপ ছেঁড়া থাকে, তবে এর উপর মাসেহ্ জাইয হবে না (মুহীত)। মোযার যে পরিমাণ ছেঁড়াকে একত্রিত করা হবে এর নিম্নতম অংশ হল, ভোমর ঢুকতে পারে এতটুকু পরিমাণ। ছেঁড়ার পরিমাণ এর থেকে কম হলে তা একত্রিত করা হবে না। যেমন মুতির স্থানে সামান্য ফাঁকা থাকে এবং এ পরিমাণকে ধরা হয় না। যে ছিদ্রের দ্বারা নীচের শরীর দেখা যায় অথবা মোযার ছিদ্র যদি মিলানো থাকে কিন্তু চলার সময় খুলে যায় এবং পা দেখা যায় তবে এরূপ মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই। যদি মোযার ভেতরের শরীর প্রকাশিত না হয়, তবে মাসেহ্ জাইয হবে যদিও ফাটল দীর্ঘ হয়। যদি মোযা উপরের দিক দিয়ে ছিঁড়ে যায় এবং ভিতরে চামড়ার আস্তর থাকে অথবা কাপড়ের আস্তর মোযার সাথে সেলাই করা থাকে, তবে এ ধরনের মোযার উপর মাসেহ্ নিষিদ্ধ হবে না (তাবয়ীন)। মোযা, জাওরাব এবং জারূক যা পায়ের উপরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিক দিয়ে ফাঁকা অবশ্য বোতাম এবং ফিতা দ্বারা মোযার ফাঁকা অংশ বন্ধ করে রাখা হয়েছে ফলে পা মোযার দ্বারা আবৃত আছে এ ধরনের মোযা ফাটাহীন মোযার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এর উপর মাসেহ্ করা জাইয আছে। যদি পায়ের পিঠ প্রকাশ হয়ে যায়, তবে এ মোযা ফাঁটা মোযার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এর উপর মাসেহ্ করা জাইয হবে না (যাহিদী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ মাসেহ্ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

১. মাসআলা ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহের সাথে উভয় মোযা খুলে গেলে, অনুরূপভাবে যে কোন একটি খুলে গেলে এবং মাসেহের সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে মাসেহ্ ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যখন পানি পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে মাসেহ্ ভঙ্গ হবে না বরং ঐ মাসেহ্ দ্বারাই সালাত আদায় করা সহীহ্ হবে। সুতরাং যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় কারো মসেহের মুদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে যদি পানি না পায়। তাহলে সে সালাত আদায় করতে থাকবে। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, যাহিদী ও জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। কোন কোন মাশায়েখের মতে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটাই যুক্তিপূর্ণ কথা (তাবয়ীন)। পবিত্র অবস্থায় যদি কেউ মোযা খুলে ফেলে তবে কেবল পা ধৌত করে নেয়াই তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে পবিত্র অবস্থায় যদি কারো মোযার উপর মাসেহ্ করার মুদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তার উপরও কেবল পা ধৌত করাই ওয়াজিব (হিদায়া)। যদি কারো আশংকা হয় যে, মোযা খুললে তার পা শীতে অবশ হয়ে যাবে, তবে তার জন্যও পট্টির উপর মাসেহ্ করার ন্যায় মাসেহ্ করা জাইয। দীর্ঘায়িত হয়ে যায় (তাবয়ীন ও বাহরুর রাইক)। মোযা হতে অধিকাংশ পা বেরিয়ে আসা মোযা খুলে যাওয়ারই নামান্তর। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। মোযা যদি এমন চওড়া হয় যে, পা উপরে উঠালে পায়ের গোড়ালি বেরিয়ে যায় এবং পা মাটিতে রাখলে তাহা যথাস্থানে চলে আসে, তবে এরূপ মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয আছে। কোন ব্যক্তি যদি খোঁড়া হয় এবং পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে চলে এতে পায়ের গোড়ালি যদি মোযার গোড়ালি থেকে উঠে যায়, তবে পূর্ণ পা যদি মোযা হতে বেরিয়ে না আসে তাহলে তার জন্য মাসেহ্ করা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি দুই পাট বিশিষ্ট মোযার উপর মাসেহ্ করার পর এক পাট খুলে ফেলে, তবে অপর পাটের উপর পুনরায় তাকে মাসেহ করতে হবে না। এমনিভাবে পশম বিশিষ্ট মোযার উপর মাসেহ্ করার পর যদি পশম উৎপাটিত করে ফেলা হয়, তবে এর উপরও মাসেহ্ দোহরাইতে হবে না (মুহীত)। এমনিভাবে মোযার উপর মাসেহ্ করে কেউ যদি এর খোসা উঠিয়ে ফেলে, তবে এর উপরও পুনরায় মাসেহ্ করতে হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। জুরমূকের উপর মাসেহ্ করার পর জুরমূক যদি খুলে ফেলা হয়, তবে মোযার উপর পুনরায় মাসেহ্ করতে হবে (মুহীত)। মোযার উপর জুরমূক পরিহিত ব্যক্তির এক পায়ের জুরমূক যদি খুলে যায়, তবে জুরমূকবিহীন পায়ের উপর মাসেহ করবে এবং পরে জুরমূকের উপর পুনরায় মাসেহ্ করবে। এটাই যাহিরুর রিওয়াতের বক্তব্য (বাদাই' এবং ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ পরিপূর্ণ তাহারাত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি মোযা পরিধান করে এবং উভয় মোযার উপর মাসেহ্ করে অতঃপর কোন এক মোযার ভেতর পানি প্রবেশ করে যদি টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এতে যদি সমস্ত পা ভিজে যায়, তাহলে অপর পা ধৌত করা ওয়াজিব নয় (খুলাসা)। অনুরূপভাবে যদি অধিকাংশ পা ভিজে যায় এ অবস্থায়ও দ্বিতীয় পা ধৌত করা ওয়াজিব নয়। এটাই বিশুদ্ধতম মত (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি উযূ করে এবং হাড়ভাঙ্গা স্থানের উপর পট্টি বেঁধে এর উপর মাসেহ্ করে এবং উভয় পা ধৌত করে মোযা পরিধান করে, এমতাবস্থায় উযূ ভঙ্গ হলে উযূ করে পট্টি ও মোযা উভয়ের উপর মাসেহ্ করবে। কিন্তু যে তাহারাতের অবস্থায় মোযা পরিধান করা হয়েছিল তা ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে যদি যখম ভাল হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হয়, তবে পট্টির স্থান ধৌত করবে এবং মোযার উপর মাসেহ্ করবে। আর যদি সে তাহারাত ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর যখম ভাল হয়, তবে মোযা খুলে ফেলা ওয়াজিব (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ ও যহীরিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ পট্টির উপর মাসেহ্ করা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ফরয নয় বরং ওয়াজিব। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত ঃ আস্‌সুরুখসী ও বাহ্‌রুর রাইক)। পট্টির উপর ঐ সময় মাসেহ্ করবে; যখন পট্টির নীচে ধৌত করা বা মাসেহ্ করা সম্ভব না হয় এ কারণে যে, পানি পৌঁছার কারণে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে বা খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে (শরহে বেকায়া)। খুলে যাওয়ার ক্ষতি এই যে, সে এমন ব্যক্তি যে, একবার খুললে নিজে তা পুনরায় বাঁধতে পারবে না অথবা এমন স্থানে আছে যে, বাঁধার মত কোন লোক সেখানে নেই (ফাতহুল কাদীর)। ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার যদি ক্ষতির কারণ হয় এবং গরম পানির ব্যবহার যদি ক্ষতির কারণ না হয়, তবে গরম পানি দ্বারা ধৌত করবে (শরহুল জামিউস সগীর ঃ আল্লামা কাযীখান কর্তৃক প্রণীত)। এটাই যাহিরী মত (বাহ্‌রুর রাইক)। ঠাণ্ডা পানি যদি ক্ষতির কারণ না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা বর্জন করা জাইয আছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয নেই। "আতারিয়্যা" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, পরবর্তীকালে ইমাম আবূ হানীফা (র) উপরোক্ত দুই ইমামের মতামতকে গ্রহণ করেছেন। "উয়ূন ও হাকায়িক" গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতা হেতু ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (শরহে নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)। যদি পট্টি যখমের স্থানের চেয়ে অধিক স্থান পরিব্যাপ্ত হয় এবং পট্টি খোলা ও যখমের উপর মাসেহ্ করা উভয়ই যদি ক্ষতিকর হয়, তবে পট্টির যে পরিমাণ যখমের উপর এবং যে পরিমাণ ভাল স্থানের উপর আছে উভয় স্থানের উপর মাসেহ্ করে নিবে। যদি যখমের উপর মাসেহ্ করা ক্ষতিকর হয় এবং পট্টি খোলা ক্ষতিকর না হয়, তবে যখমের মুখে যে কাপড় আছে এর উপর মাসেহ্ করবে এবং আশপাশের ভাল জায়গাসমূহ ধুয়ে নিবে। যদি যখমের উপর মাসেহ এবং পট্টি খোলা কোনটাই ক্ষতিকর না হয়, তবে যখমের আশপাশের স্থানসমূহ ধুয়ে নিবে এবং যখমের উপর মাসেহ্ করবে। যখম, দাগ এবং হাড় ভেঙ্গে যাওয়া সবই উপরোক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে সমান (ফাতহুল কাদীর)। পট্টির অধিকাংশ স্থানের উপর মাসেহ্ করাই যথেষ্ট (হিদায়া)। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। ফকীহদের সর্বসম্মত মতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্ধেক পট্টি বা এর চেয়ে কম স্থানের উপর মাসেহ্ করলে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ শিংগা লাগানো ব্যক্তির জন্য কাপড়ের উপর মাসেহ্ না করে পট্টির উপর মাসেহ্ করা জাইয আছে। এটা নির্ভরযোগ্য মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুয্‌মারাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বর্তমান কালের ফাতওয়া এর উপরই (শরহ্‌ন্ নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র.))। দুই পট্টির গিরা বাঁধের মাঝে হাতের যে অংশটুকু খালি থাকে এর উপর মাসেহ্ করাই যথেষ্ট। এটাই বিশুদ্ধতম মত (শরহে বেকায়া)। সুগরা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম রায়। এরই উপর ফাতওয়া (তাতারখানিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ যখম ভাল হওয়ার পূর্বে পট্টি যদি খুলে যায়, তবে ক্ষতস্থান ধোয়া আবশ্যক নয় এবং মাসেহ্‌ও বাতিল হবে না। যদি যখম ভাল হওয়ার পর পট্টি খুলে যায়, তবে মাসেহ্ বাতিল হয়ে যাবে এবং বিশেষভাবে ঐস্থানটুকু ধৌত করে নেয়া ওয়াজিব (কাফী ও মুহীত)। কোন ব্যক্তি যদি উযূ করে এবং উযূর সময় ঔষধের উপর পানি প্রবাহিত করে অতঃপর যখম ভাল হয়ে যদি ঔষধ পড়ে যায়, তবে যখমের স্থান ধোয়া কর্তব্য। আর যদি যখম ভাল হওয়ার পর ঔষধ না পড়ে, তবে ক্ষতস্থান ধোয়া ওয়াজিব নয় (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কারো নখ ভেঙ্গে যায় এবং এর উপর সে ঔষধ বা লাশাযুক্ত কোন কিছু লাগায়, তাহলে দেখতে হবে যে, এ ঔষধ বা লাশাযুক্ত বস্তু সরানো যদি তার জন্য কষ্টকর হয়, তবে এর উপর মাসেহ্ করবে। যদি মাসেহ্‌ও কষ্টকর হয়, তবে মাসেহ্‌ও বর্জন করবে। উযূর কোন অঙ্গ যদি কেটে যায়, তবে সম্ভব হলে এর উপর পানি বাইয়ে দিবে। যদি এর উপর পানি প্রবাহিত করা অসম্ভব হয়, তবে সম্ভব হলে মাসেহ্ করবে। যদি মাসেহ্‌ও অসম্ভব হয়, তবে মাসেহ্‌ও বর্জন করবে। এবং আশপাশের অংশ ধুয়ে নিবে (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি পট্টির উপর মাসেহ্ করল, অতঃপর তা পড়ে গেল এবং সে এ স্থানে অপর একটি পট্টি বেঁধে নিল, তবে উত্তম হল, পুনরায় মাসেহ্ দোহ্‌রাইয়া নেয়া (যখীরা)।

৯. মাসআলা ঃ কারো হাতে যদি ফোঁড়া হয় এবং সে যদি এতে পাতা বা মলম লাগায় এবং এ মলম যদি ক্ষতের স্থান অতিক্রম করে চলে যায় এমতাবস্থায় এ লোকটি যদি উযূ করে এবং ফোঁড়ার উপর মাসেহ্ করে, তবে জাইয হবে, যদি পট্টি পরিপূর্ণভাবে মাসেহের দ্বারা বেষ্টন করে নেয়া হয়। শিংগা লাগানো ব্যক্তির হুকুমও তাই। এর উপরই ফাতওয়া। কারো বাহুতে পট্টি ছিল অতঃপর সে ঐ বাহু মাসেহের উদ্দেশ্যে পানিতে ডুবিয়ে নিল এরূপভাবে মাসেহ্ জাইয হবে না। বরং পানি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি হাতের আঙ্গুলে বা হাতের তালুতে এরূপ হয়, তবে পানিতে ডুবানোর পর মাসেহ্‌ও দুরুস্ত হবে এবং পানিও নষ্ট হবে না (খুলাসা)। যখমের পট্টি ও কাপড়ের উপর মাসেহ্ করা যখমের নীচের জায়গা ধৌত করারই শামিল। মাসেহ্ করা ধৌত করার বদল (পরিবর্ত) নয়। সুতরাং যদি এক পায়ে পট্টি থাকে, তবে এর উপর মাসেহ্ করবে এবং অপর পা ধৌত করবে (তাবয়ীন)। পট্টির উপর মাসেহ্ করার কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। এবং পবিত্র ও অপবিত্র অবস্থায় পট্টি বাধার মাঝেও কোন পার্থক্য নেই (খুলাসা)। হাদাছে আসগর (উযূহীনতা) এবং হাদাছে আকবর (গোসল ফরয হওয়া) উভয় অবস্থায়ই পট্টির উপর মাসেহ্ জাইয।

১০. মাসআলা ঃ সমস্ত রিওয়ায়েত অনুসারে পট্টির উপর মাসেহ্ করার ক্ষেত্রে নিয়্যাত শর্ত নয় (বাহ্‌রুর রাইক)। একবার মাসেহ্ করাই যথেষ্ট। এটাই সহীহ্ কথা (মুহীত)। উপরের পট্টি সরে গেলে নীচের পট্টির উপর পুনরায় মাসেহ্ করা ওয়াজিব নয় (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)। পা ধোয়া এবং মোযার উপর মাসেহ্ করা এতদুভয় কাজ একত্রিত করা দুরুস্ত নয় (কাফী)। কোন ব্যক্তির এক পায়ে যদি যখম থাকে এবং এর উপর পট্টি থাকে এমতাবস্থায় সে যদি উযূ করে, পট্টির উপর মাসেহ্ করে এবং অপর পা ধৌত করে মোযা পরিধান করে, তবে শুদ্ধ মতে মোযার উপর মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না। পট্টির উপর মাসেহ্ করে যদি কোন ব্যক্তি মোযা পরিধান করে, তবে তার জন্য মোযার উপর মাসেহ করা জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী (র))।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির পায়ে ফোঁড়া ছিল। এমতাবস্থায় সে উভয় পা ধৌত করে মোযা পরিধান করল, অতঃপর তার উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর উভয় মোযার উপর মাসেহ্ করে অনেক সালাত আদায় করল। এরপর মোযা খুলে দেখল, ফোঁড়া ফেটে এর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, অথচ তার জানা নেই যে, তা কখন ফেটেছে এমতাবস্থায় শায়খ ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি যখমের মুখ শুকিয়ে গিয়ে থাকে এবং সে ফজর উদয়ের সময় মোযা পরিধান করে থাকে এবং ঈশার সালাত আদায়ের পর খুলে থাকে, তবে ফজরের সালাত দোহ্‌রাইতে হবে না। বাকী সালাতগুলো দোহ্‌রাইতে হবে। আর যদি যখমের মুখ রক্তে ভেজা থাকে, তাহলে কোন সালাতই দোহ্‌রাইতে হবে না (মুহীত)। কারো শরীরে যদি যখম থাকে এবং সে যদি তা বেঁধে নেয়। অতঃপর বাঁধন যদি ভিজে যায় এবং এ আর্দ্রতা যদি বাইরে প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। এরূপ না হলে উযূ ভঙ্গ হবে না। বাঁধন যদি দুই পা বিশিষ্ট হয় এবং কোন পাটে আর্দ্রতা আসে আর অন্য পাটে না আসে, তাহলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (তাতারখানিয়্যা ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহের বিবরণ)।

১২. মাসআলা ঃ হাত মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয নেই (কাফী)। কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে মোযার উপর মাসেহ্ করিয়ে দেয়ার হুকুম দেয়, তবে এ মাসেহ্ দুরুস্ত হবে (খুলাসা)। মোযার উপর মাসেহ্ করার ক্ষেত্রে পুরুষ–মহিলা উভয়ের একই হুকুম। কেননা, যে সব কারণ মোযার উপর মাসেহ্ করা জাইয এসব ক্ষেত্রে পুরুষ–মহিলা সকলেই সমান (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের (খাস) রক্তসমূহের বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

মহিলাদের খাস রক্ত তিন প্রকার ঃ যথা, হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযা

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সন্তান প্রসব ব্যতিরেকে মহিলাদের জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকে হায়েয বলে (ফাতহুল কাদীর)। পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত রক্ত হায়েয নয়। হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব (খুলাসা)। হায়েযের রক্ত নিরূপণের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

২. মাসআলা ঃ ১ম শর্ত হল, বয়স হওয়া। তা নয় বছর হতে আরম্ভ হয় এবং সন্তান হওয়ার বয়স পার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাকী থাকে (বাদাই')। পঞ্চাশ বছর বয়স হলে মহিলাদের সন্তান হওয়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। উপরোক্ত মতটিই ন্যায়নিষ্ঠ মত (মুহীত)। এটাই নির্ভরযোগ্য কথা (নিহায়া ও আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ফাতওয়া এর উপরই (মিরাজুদ্‌দিরায়া)। উপরোক্ত বয়স অতিক্রান্ত হবার পর যদি রক্ত দেখা যায়, তবে তা হায়েয হবে না। এটাই যাহিরী মাযহাব। অবশ্য পসন্দনীয় কথা হল, এ বয়সে নির্গত রক্ত যদি প্রবল হয়, তবে তা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে (শরহুল মাজমা ঃ ইবনুল মালিক (র) কর্তৃক প্রণীত)।

৩. মাসআলা ঃ হায়েয প্রমাণ হওয়ার জন্য রক্ত فرج خارج তথা যোনীর বাইরের অংশে বেরিয়ে আসা আবশ্যক। যদিও তা কুরসুফ (নেকড়া) পড়ে গিয়ে প্রতীয়মান হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নেকড়া রক্ত এবং যোনীর বাইরের অংশের মাঝে অন্তরায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ রক্ত হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না (মুহীত)। পাক মহিলা যদি কাপড়ের নেকড়ায় রক্তের নিদর্শন দেখে, তবে যখন সে নেকড়া উঠাবে, তখন হতে তাকে ঋতুবতী বলে হুকুম দেয়া হবে। ঋতুবতী মহিলা নেকড়া উঠানোর পর যদি তাতে রক্তের কোন নিদর্শন দেখতে না পায়, তবে তার রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে (শরহে বেকায়া)। হায়েযের অবস্থায় রক্ত প্রবাহিত হওয়া শর্ত নয় (খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ হায়েযের রক্ত ছয় রং-এর কোন এক রং বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। যেমন, কাল, লাল, হলুদ, মাটির বর্ণ, সবুজ এবং ধূসর বর্ণ (নিহায়া)। কাপড়ের নেকড়া উঠানোর সময় ভেজা অবস্থায় যে রং পরিলক্ষিত হয়, তাই গ্রহণযোগ্য। শুকানোর পর যে রং পরিলক্ষিত হয় তা ধর্তব্য নয় (মুহীত)। কোন মহিলা যদি নেকড়া ভিজা অবস্থায় এর উপর সাদা রং দেখে, কিন্তু শুকানোর পর তা হলদে রং হয়ে যায়, তবে এ রং সাদা রং-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা লাল বা হলদে রং দেখে পরে শুকিয়ে তা সাদা হয়ে যায়, তবে প্রথমে যে রং দেখেছে তাই গ্রহণীয় হবে, পরিবর্তিত রং ধর্তব্য নয় (তাজ্‌নীস)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ কোন রক্ত হায়েযের রক্ত হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত নিসাব তথা সময়সীমার ভেতরে হওয়া আবশ্যক। যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে হায়েযের নিম্নতম সময় হল, তিন দিন তিনরাত্র (তাবয়ীন)। আর সর্বোচ্চ সময় হল, দশ দিন দশ রাত্র (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ হায়েযের পূর্বে طُهر তথা পবিত্রতার পূর্ণ মুদ্দত অতিবাহিত হওয়া এবং জরায়ু হামল (গর্ভধারণ) হতে খালি থাকা আবশ্যক (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ) দুই রক্ত প্রবাহের মধ্যবর্তী পবিত্রতা এবং হায়েযের মুদ্দতের ভেতর যে রক্ত পরিলক্ষিত হয়, তা হায়েয বলে গণ্য হবে। দুই সময়ের প্রবাহিত রক্তের কোন এক রক্ত যদি হায়েযের মুদ্দতের বাইরে চলে যায়, যেমন কোন মহিলা একদিন রক্ত দেখল এবং নয় দিন পবিত্র থাকল অতঃপর পুনরায় একদিন রক্ত দেখল, তবে এ রক্ত হায়েযের রক্ত হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা, শেষের রক্ত হায়েযের সময়ের ভেতর আসেনি। এ বর্ণনা অনুসারে তুহ্‌র তথা পবিত্রতার দ্বারা হায়েয আরম্ভ হয় না এবং শেষও হয় না। এ বর্ণনাটি ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দুইবার প্রবাহিত রক্তের মাঝে যে পবিত্রতা আসে, তা যদি পনর দিন থেকে কম হয়, তবে তা خاصلة তথা হায়েয হবে না। পরবর্তীকালে অধিকাংশ ফকীহ্ এ বর্ণনা অনুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন। কেননা, এটাই ফাতওয়া জিজ্ঞাসাকারী এবং ফাতওয়া দাতা উভয়ের জন্য সহজ। (তাবয়ীন ও যাহিদী)। এ মতটি গ্রহণ করা সকলের জন্য সহজ (হিদায়া)। সদরুশ্ শহীদ হুসামুদ্দীন (র)-এর রায় এর উপরই স্থির করেছেন। এভাবেই তিনি ফাতওয়া দিতেন (মুহীত)। তুহ্‌র অর্থাৎ পবিত্রতা যদি দশ দিন অতিক্রম না করে, তবে তুহ্‌র (পবিত্রতা) এবং রক্ত আসার দিনগুলো সবই হায়েযরূপে গণ্য হবে। চাই এ মহিলা مبتدأة প্রথমবার ঋতুবর্তী হোক বা معتادة হায়েযের ব্যাপারে পূর্ব হতে তার কোন অভ্যাস থাকুক। তুহ্‌র (পবিত্রতা) যদি দশ দিন ছাড়িয়ে যায় যদি স্ত্রীলোকটির এ প্রথমবার হায়েয এসে থাকে, তবে দশদিন তার হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি মহিলার নির্ধারিত কোন অভ্যাস থাকে, তবে হায়েয ও তুহ্‌রের ক্ষেত্রে তার পূর্ব আদতের দিনগুলো হায়েয হবে এবং আদতের দিনগুলো তুহ্‌র হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। হায়েযের প্রারম্ভ তুহ্‌র দ্বারা হতে পারে যদি এর পূর্বে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং তুহ্‌র দ্বারা হায়েয খতমও হতে পারে যদি এর পরেও রক্ত প্রবাহিত হয় (তাবয়ীন)। তুহ্‌র যদি পনর দিন বা এর চেয়েও অধিক সময় হয়, তবে তা فاصل হিসাবে গণ্য হবে অর্থাৎ হায়েয হবে না। সুতরাং ঐ দুই সময়ের প্রবাহিত রক্তের প্রত্যেকটা অথবা কোন একটাকে হায়েয ধরে নিতে হবে। যেভাবে সম্ভব হয় (মুহীত)। তুহ্‌র তথা পবিত্রতার নিম্নতম সময় পনর দিন এবং বেশীর কোন সীমা নেই কিন্তু যদি অভ্যাস নির্ধারণ করার আবশ্যক হয়, যেমন কোন মহিলা এমনভাবে বালেগা হয়েছে যে, তার সব সময় ঋতুস্রাব হচ্ছে, তবে প্রত্যেক মাসের দশ দিন তার হায়েয হিসাবে নির্ধারিত হবে আর বাকী দিনগুলো তুহ্‌র বলে গণ্য হবে (হিদায়া)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত নির্গত হয়, তাকে নিফাস বলে (ফিকাহ্র কিতাবসমূহের মূল পাঠ)। কোন মহিলা সন্তান প্রসবের পর যদি রক্ত নির্গত হতে না দেখে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে গোসল করা তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকেও এরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। "মুফীদ" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটাই সহীহ্। কিন্তু সন্তান প্রসবের সাথে যে নাজাসাত বের হয় এ কারণে উযূ করা ওয়াজিব (তাবয়ীন)। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। অধিকাংশ মাশাইখ উপরোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন। সদ্রুশ্ শহীদ (র) এ অনুসারেই ফাতওয়া প্রদান করতেন (মুহীত)। ফকীহ্ আবূ আলী দাক্কাক (র) বলেন, এ মতকেই আমরা গ্রহণ করেছি (মুযমারাত)। ফাতাওয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এ কথাই সহীহ্ (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২. মাসআলা ঃ যদি সন্তানের অধিকাংশ অঙ্গ বের হয়ে আসে, তবে প্রসবকারিণী মহিলা নিফাসওয়ালী বলে সাব্যস্ত হবে। মাতৃগর্ভে সন্তান যদি টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং এর অধিকাংশ বেরিয়ে আসে, তবেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অকাল গর্ভপাতের মাধ্যমে প্রসূত অসম্পূর্ণ ভ্রূণের শরীরে যদি কোন অঙ্গ প্রকাশ পায় যেমন, আঙ্গুল, নখ অথবা চুল, তবে তা সন্তান বলে গণ্য হবে। এ অকাল গর্ভপাতের পর মহিলা নিফাসওয়ালী বলে গণ্য হবে (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ যদি অকাল গর্ভপাতের মাধ্যমে প্রসূত ভ্রূণের শরীরে কোন অঙ্গ সৃষ্টি না হয়, তবে এ ধরনের গর্ভপাতের পর মহিলা নিফাসওয়ালী হবে না। যদি দেখা যাওয়া রক্তকে হায়েয গণ্য করা যায়, তবে হায়েয হবে। অন্যথায় তা ইস্তিহাযা হবে। কোন মহিলা যদি অকাল গর্ভপাতের পূর্বে এবং পরে রক্ত দেখে এবং সন্তানের কোন অঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে গর্ভপাতের পূর্বে দেখা যাওয়া রক্ত হায়েযের রক্ত হিসাবে গণ্য হবে না। অবশ্য পরে আসা রক্তের কারণে ঐ মহিলা নিফাসওয়ালী বলে গণ্য হবে। আর যদি তার শরীরে কোন অঙ্গ প্রকাশ না পায়, তবে গর্ভপাতের পূর্বে যে রক্ত দেখা যাবে সম্ভব হলে তাকে হায়েযের রক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে (নিহায়া)।

৪. মাসআলা ঃ সন্তান যদি নাভির দিক দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, এভাবে যে, মায়ের পেটে যখম ছিল, অতঃপর তা ফেটে যায় এবং এ দিক দিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হলে যে হুকুম হয় এ মহিলারও ঐ হুকুমই হবে। এভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলা নিফাসওয়ালী বলে সাব্যস্ত হবে না (যহীরিয়্যা ও তাবয়ীন)। কিন্তু নাভি দিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি স্ত্রীলিঙ্গের থেকেও রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠের পর উক্ত মহিলা নিফাসওয়ালী মহিলা হিসেবে গণ্য হবে (তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ যদি যমজ সন্তান হয়, তবে প্রথম সন্তানের পর হতেই নিফাস ধর্তব্য হবে (কাফী)। যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে শর্ত হল যে, উভয় সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাঝে ছয় মাসের কম সময় হওয়া আবশ্যক। যদি দুই যমজ সন্তান ছয় মাস বা এর চেয়ে অধিক সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে মনে করতে হবে যে, এ দুই সন্তান দুই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং নিফাসও দু'টি হবে। যদি তিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের মাঝে ছয় মাসের কম ব্যবধান,

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তানের মাঝেও ছয় মাসের কম ব্যবধান। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় সন্তানের মাঝে ছয় মাসের চেয়েও অধিক ব্যবধান, তবে এ সন্তান তিনটি একই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে বলে মনে করতে হবে (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ নিফাসের সর্বনিম্ন সময় ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত আসে। যদিও তা এক ঘন্টা হোক না কেন। এর উপরই ফাতওয়া এবং সর্বাধিক সময় হল চল্লিশ দিন (আস্ সিরাজিয়্যা)। রক্ত যদি চল্লিশ দিনের চেয়েও অধিক সময় পর্যন্ত প্রবাহিত হয়, তবে [illegible] তথা প্রথম অবস্থার মহিলার জন্য চল্লিশ দিন এবং নির্ধারিত অভ্যাস সম্পন্ন মহিলার তার অভ্যাসের নির্ধারিত দিনগুলো নিফাস হিসাবে ধর্তব্য হবে (মুহীত)। চল্লিশ দিনের ভেতর দুই সময় রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মধ্যবর্তী যতদিন পবিত্র থাকবে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে এ দিনগুলোও নিফাসের মধ্যে গণ্য হবে। যদিও তা পনর দিন বা এর চেয়ে বেশী হয়। এর উপরই ফাতওয়া। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে অভ্যাসের বিপরীত একবার রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দ্বারাও নিফাসের আদত ও অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে যায় (খুলাসা)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ হায়েয ও নিফাসের সর্বাধিক সময়ের পর তুহর (পবিত্রতা)–এর সর্বনিম্ন সময়ের মাঝে যে রক্ত প্রকাশ পায়, তা যেহেতু প্রথম অবস্থার মহিলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সময়ের পর এবং আদত সম্পন্ন মহিলার ক্ষেত্রে আদত অতিক্রান্ত হবার পর পরিলক্ষিত হল, তাই তা ইস্তিহাযা হবে। অনুরূপভাবে হায়েযের সর্বনিম্ন সময়ের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হল, তাও ইস্তিহাযা। এমনিভাবে একেবারে বৃদ্ধা এবং অত্যন্ত কমবয়স্কা মেয়েদের থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাও ইস্তিহাযা (মুহীত)। এইভাবে গর্ভবতী স্ত্রীলোক গর্ভের প্রথম অবস্থায় যে রক্ত দেখে অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বাচ্চা বের হওয়ার পূর্বে মহিলা যে রক্ত দেখতে পায়, তাও ইস্তিহাযা (হিদায়া)।

হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযার আহকাম

১. মাসআলা ঃ রক্ত বের হওয়া এবং প্রকাশ হওয়ার দ্বারাই হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযা প্রমাণিত হয়। এটাই আমাদের ইমামদের যাহিরী মাযহাব। অধিকাংশ মাশাইখ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং ফাতওয়া এর উপরই (মুহীত)। হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় আটটি বিশেষ হুকুম রয়েছে।

২. মাসআলা ঃ হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য সালাত আদায় করা জাইয নেই এবং এর কাযাও নেই (কিফায়া)। মহিলা প্রথম যখনই রক্ত দেখবে, তখনই সালাত আদায় করা ছেড়ে দিবে। ফকীহ্ (র) বলেন, আমরা এ মতটিকেই গ্রহণ করি (তাতারখানিয়্যা ঃ নাওয়াযিল থেকে বর্ণিত)। এটাই সহীহ্ (তাবয়ীন)। যে ওয়াক্তের মধ্যে কোন মহিলা হায়েয ও নিফাসওয়ালী হয় ঐ ওয়াক্তের সালাত তার থেকে রহিত হয়ে যায়। চাই সালাত আদায় করার উপযুক্ত সময় থাকুক বা

pdf By Syed Mostofa Sakib

না থাকুক (যখীরা)। কোন মহিলা যদি শেষ ওয়াক্তে সালাত আরম্ভ করে এবং এ সময় হায়েযা হয়ে যায়, তবে এ সালাতের কাযা তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু নফল সালাত হলে এর কাযা করতে হবে (খুলাসা)। হায়েযা মহিলার জন্য মুস্তাহাব হলো, সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পর উযূ করে নিজ গৃহে সালাত আদায়ের স্থানে বসে পবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয় ঐ পরিমাণ সময় সুবহানাল্লাহ্, আল্‌হামদু লিল্লাহ্ পাঠ করা (আস্‌সিরাজিয়্যা ও আস্ সুগরা)। হায়েযা মহিলা যদি সিজদার আয়াত শুনে, তবে সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব নয় (তাতারখানিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য সিয়াম সাধনাও নিষিদ্ধ। অবশ্য পরে কাযা করা জরুরী (কিফায়া)। নফল সিয়াম পালন আরম্ভ করে কোন মহিলা যদি হায়েযা হয়ে যায়, তবে সতর্কতাবশত এর কাযা করা ওয়াজিব (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। চাই এ প্রবেশ বসার উদ্দেশ্যে হোক বা পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে হোক (মুনিয়্যাতু মসল্লী)। "তাহযীব" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ঋতুবতী মহিলা জামাআত হয় এমন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। "হুজ্জত" কিতাবে আছে যে, হায়েযা মহিলা ঐ সময় মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে যদি মসজিদের ভেতর পানি থাকে এবং এ পানি ছাড়া অন্য কোথাও পানি না পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে জুনুবী বা ঋতুবতী মহিলার যদি হিংস্রপ্রাণী, চোর বা ঠাণ্ডা লাগার আশংকা থাকে, তবে মসজিদে অবস্থান করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তায়াম্মুম করে মসজিদে প্রবেশ করা উত্তম (তাতারখানিয়্যা)। মসজিদের ছাদ ও মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)। যে স্থান জানাযা ও ঈদের সালাত আদায় করার জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে, তা মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় (বাহ্‌রুর রাইক)। হায়েযা ও জুনুবী ব্যক্তির জন্য কবর যিয়ারত কোন অসুবিধা নেই (আস্ সিরাজিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা হারাম। যদিও মসজিদের বাইর থেকে সে তাওয়াফের কাজ সমাধা করে (কিফায়া)। অনুরূপভাবে জুনুবী ব্যক্তির জন্যও বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা হারাম (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ কুরআন শরীফ পাঠ করাও হারাম। হায়েযা, নিফাসওয়ালী মহিলা এবং জুনুবীর জন্য কুরআন শরীফের কোন আয়াত পাঠ করা জাইয নেই। বিশুদ্ধতম মত অনুসারে পূর্ণ আয়াত এবং আয়াতাংশ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। কিন্তু আয়াতাংশের দ্বারা যদি কিরাআতের ইচ্ছা না করা হয়, যেমন কেউ শুকরিয়া আদায়ের ইচ্ছায় আল্‌হামদুলিল্লাহ্ পড়ল, অথবা খানা খাওয়া বা অন্য কাজ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ল, তবে এতে কোন অসুবিধা নেই (আল্ জাওরাতুন নায়্যারা)। একেবারে ছোট আয়াত যা সচরাচর কথাবার্তার সময় মুখে এসে যায় এ ধরনের ছোট আয়াত পাঠ করাতেও কোন অসুবিধা নেই, যেমন কেউ ثُمَّ نَظَرَ পড়ল وَلَمْ يُوْلَدْ অথবা পড়ল (খুলাসা)। জুনুবী ব্যক্তি যদি কুরআন পাঠের উদ্দেশ্যে মুখ ধোয়, তবে কুরআন পড়া তার জন্য জাইয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী (র))। এটাই সহীহ্ কথা (আস্

সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। ঋতুবতী মহিলা এবং জুনুবীর জন্য তাওরাত, ইনজীল ও যাবূর কিতাব পাঠ করা মাকরূহ (তাবয়ীন)। কোন শিক্ষয়িত্রী মহিলা যদি ঋতুবতী হয়ে যায় তবে সে বালক-বালিকাদেরকে এক এক শব্দ করে শিক্ষা দিবে এবং দুই শব্দের মাঝখানে থামবে। কুরআনের বানান করা তার জন্য মাক্‌রূহ নয় (মুহীত)। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে দু'আই কুনূত পাঠ করা মাক্‌রূহ নয় (তাবয়ীন)। এর উপরই ফাতওয়া (তাজ্‌নীস ও যহীরিয়্যা)।

জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলার জন্য দুআ পড়া এবং আযানের জবাব দেয়া ইত্যাদি জাইয (আস্ সিরাজিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ জুনুবী এবং হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য কুরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম। উযূহীন ব্যক্তির জন্যও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা না জায়েয। কিন্তু কুরআন যদি এমন গিলাফে থাকে যা কুরআন থেকে পৃথক যেমন, থলে এবং এমন চামড়া যা মিলানো নয়, তবে জাইয আছে। যদি গিলাফ মিলান থাকে, তবে সুন্নী মতে স্পর্শ করা জাইয নেই (হিদায়া)। এর উপরই ফাতওয়া (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। সহীহ্ মত অনুযায়ী আল কুরআনের হাশিয়া এবং সাদা স্থান–যেখানে লিখা নেই–স্পর্শ করা জাইয নেই (তাবয়ীন)। উযূতে যে অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয়, তা ব্যতীত অন্য অঙ্গ দ্বারা এবং উযূ পূর্ণ করার পূর্বে যে অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয়েছে এর দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করার ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। অবশ্য বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী স্পর্শ করা নিষেধ (যাহিদী)। পরিধানের কাপড় দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও তাদের জন্য জাইয নেই। উপরোক্ত লোকদের জন্য তাফসীর, ফিকাহ্ এবং হাদীছের কিতাবসমূহ স্পর্শ করা মাক্‌রূহ্। তবে আস্তিন দ্বারা স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই (তাবয়ীন)। কাষ্ঠ, দিরহাম ইত্যাদিতে যদি পূর্ণ আয়াত লিখা থাকে, তবে তা স্পর্শ করাও জাইয নেই (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। কুরআন যদি ফারসী ভাষায় লিখা থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে তা স্পর্শ করাও মাকরূহ্। সহীহ্ বর্ণনা মতে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন (খুলাসা)। কুরআন ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র–আযকার যে বস্তুতে লিখা আছে অধিকাংশ মাশায়িখের মতে তা স্পর্শ করাও না জাইয (নিয়াহা)। জুনুবী এবং হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য কুরআন শরীফ দেখা নাজাইয নয় (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলার জন্য এমন লেখা লিখন মাক্‌রূহ্ যার কোন কোন লাইনে কুরআনের আয়াত রয়েছে। যদিও তারা কুরআন পাঠ করে না। জুনুবী ব্যক্তির জন্য কুরআন শরীফ দেখে কোন কিছু লিখা জাইয নেই, যদিও কুরআন শরীফ মাটির উপর থাকে এবং সে তাতে হাত না লাগায় এবং যদিও এক আয়াত থেকে কম হয় না কেন; ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, না লিখাই আমার নিকট পসন্দনীয়। বুখারার মাশাইখে কিরাম এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (যখীরা)। বাচ্চাদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যদিও তারা উযূহীন অবস্থায় হয় না কেন। এটাই সহীহ্ (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলার সাথে সহবাস করা হারাম (নিহায়া ও কিফায়া)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে এ ধরনের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিলাদেরকে চুম্বন করা, এদের সাথে এক বিছানায় শোয়া এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জায়গা ব্যতিরেকে অন্যান্য অঙ্গসমূহের দ্বারা ফায়দা হাসিল করা স্বামীর জন্য জাইয আছে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। উপরোক্ত মহিলাদের সাথে সহবাস করা হারাম এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি এদের সাথে এ অবস্থায় সহবাস করে, তবে তওবা ও ইস্তিগফার ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নেই। তবে এক দীনার বা অর্ধ দীনার পরিমাণ সাদাকা করে দেয়া মুস্তাহাব (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্‌সী (র))।

৯. মাসআলা ঃ হায়েয ও নিফাস বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা ওয়াজিব (কিফায়া)। হায়েযের সর্বাধিক সময় তথা দশ দিন পর রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল করা ব্যতিরেকেই সহবাস করা জাইয। চাই সে মহিলা مبتدأة হোক বা معتادة হোক। অবশ্য গোসলের পূর্বে সহবাস না করাই মুস্তাহাব (মুহীত)। দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল করা ব্যতিরেকে অথবা সালাতের আখিরী ওয়াক্ত যার মধ্যে গোসল ও তাহ্‌রীমা বাঁধা সম্ভব হত এমন সময় অতিবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে সহবাস করা জাইয নেই। কেননা, সালাতের আখিরী ওয়াক্তের এতটুকু সময় পেলেই একজনের উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব হয় (যাহিদী)। সালাতের পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়া, যেমন প্রথম ওয়াক্তের মধ্যে কারো রক্ত আসা বন্ধ হয়েছে এবং এ অবস্থায় পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়েছে, এরূপ সময় পাওয়া সালাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নয় (নিহায়া)।

১০. মাসআলা ঃ আদত (অভ্যাস) শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কোন মহিলার রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে আদত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা মাকরূহ্‌। যদিও সে গোসল করে নেয়। তবে সতর্কতার উদ্দেশ্যে তার জন্য সালাত আদায় এবং সওম পালন করা জরুরী (তাবয়ীন)। দশ দিন থেকে কম সময়ের মধ্যে যদি কোন মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং পানি না পেয়ে সে তায়াম্মুম করে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জাইয নেই। এরপর যদি সে পানি পায়, তবে আমাদের মাযহাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা তার জন্য হারাম কিন্তু তার সাথে সহবাস হারাম নয় (যাহিদী)। ইমাম খাজ্‌নাদী (র) বলেন, এটা বিশুদ্ধতম মত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। প্রথম বার যে মহিলার ঋতুস্রাব হয়েছে এ যদি দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে হায়েয থেকে পাক হয়ে যায় এবং ঋতুস্রাবের ব্যাপারে যার নির্ধারিত আদত ছিল এ ধরনের মহিলা যদি আদতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বে পাক হয়ে যায়, তবে উযূ ও গোসল আখিরী ওয়াক্ত পর্যন্ত এমনভাবে বিলম্ব করবে যেন সালাত মাকরূহ্‌ ওয়াক্তে আদায় করতে না হয় (যাহিদী)।

১১. মাসআলা ঃ যে সমস্ত আহ্‌কাম কেবল হায়েযের সাথেই সম্পর্কিত, তা পাঁচটি। ১. ইদ্দত পালন করা, ২. রেহেম বা জরায়ু পাক করা, ৩. হায়েযের মাধ্যমে বালেগ সাব্যস্ত হওয়া, ৪. হায়েযের মাধ্যমে তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্যকরণ (কিফায়া)। ৫. বিরামহীনভাবে সওম পালন সম্ভব না হওয়া (তাবয়ীন এবং মুযমারাত ঃ যিহারের কাফ্‌ফারা অনুচ্ছেদ)।

১২. মাসআলা ঃ ইস্তিহাযার রক্ত নাক হতে সর্বদা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার হুকুমের ন্যায়। ইস্তিহাযার অবস্থায় সালাত, সওম এবং সহবাস নিষিদ্ধ হয় না (হিদায়া)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এক বারের দ্বারাও আদত পরিবর্তন হয়ে যায়। এর উপরই ফাতওয়া (কাফী)। কোন মহিলা যদি পরিপূর্ণ দুই তুহর (পবিত্রতা)-এর মাঝে রক্ত দেখে কিন্তু তা যদি আদত মুতাবিক না হয় বরং আদতের চেয়ে বেশী আসে, কম আসে, আগে আসে, পরে আসে অথবা উভয় রকমের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করতে হবে যে আদত ايام دم এর দিকে ফিরে আসবে। চাই এ রক্ত হাকীকী হোক বা হুকমী হোক। উপরোক্ত হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি রক্ত দশ দিনের অধিক অতিক্রান্ত না হয়। কিন্তু রক্ত যদি দশ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত প্রবাহিত হয়, তবে তার অভ্যাসের দিনগুলো হায়েয হবে। আর বাকী দিনগুলো ইস্তিহাযা হবে। এ ক্ষেত্রে অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে এ কথা মনে করা হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

১৩. মাসআলা ঃ নিফাসের হুকুমও অনুরূপই। নিফাস যদি অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় এবং তা যদি চল্লিশ দিন অতিক্রম না করে, তবে মনে করতে হবে যে, অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে (মুহীত)। নিফাসের মধ্যে যদি কোন মহিলার নির্ধারিত অভ্যাস থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি চল্লিশ দিনের অধিক রক্ত দেখে, তবে আদতের দিনগুলো তার নিফাস হবে। চাই তার অভ্যাস রক্তের মাধ্যমে খতম হওয়া হোক বা পবিত্রতার মাধ্যমে খতম হওয়া হোক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ মতটি ব্যক্ত করেছেন (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যে মহিলার অভ্যাস নির্ধারিত আছে, এরূপ মহিলার রক্ত যদি অনবরত প্রবাহিত হতে থাকে এতে হায়েযের দিন এবং মাসের দিনসমূহের মধ্যে যদি তার সন্দেহ হয়ে যায়, তবে সে তাহাররী করবে–চিন্তা করবে এবং প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। কোন দিকেই যদি তার দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি না হয়, তবে নির্ধারিতভাবে হায়েয ও পবিত্রতা কোনটারই হুকুম দেয়া যাবে না। বরং সে সতর্কতার উপর আমল করবে। হায়েযা মহিলা যে সমস্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকে, সেও তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে (তাবয়ীন)। এর দ্বারা সে কেবল ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত আদায় করবে। নফল পড়বে না। এবং সহীহ্‌ মতে কুরআন শুধু ফরয এবং ওয়াজিব পরিমাণ পাঠ করবে। সহীহ্‌ মতে ফরয সালাতের আখিরী দুই রাকআতে কিরাআত পাঠ করবে (বাহ্‌রুর রাইক)। যদি কারো কোন একটার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, যেমন কোন মহিলার সন্দেহ হল, তুহ্‌র (পবিত্রতা) এবং হায়েয আরম্ভ হওয়ার মধ্যে, তবে সে প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে উযূ করে সালাত আদায় করবে। যদি কোন মহিলার তুহ্‌র (পবিত্রতা) এবং হায়েয হতে বের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে قياس خفى এর দাবী অনুসারে সে প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে গোসল করে সালাত আদায় করবে। ফকীহ্‌ নাজমুদ্দীন নাসাফী (র) বলেন, সহীহ্‌ মতে এ ধরনের মহিলা প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে (মুহীত)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (শরহুল মাবসূতঃ ইমাম সুরুখ্‌সী (র))। এটা বিশুদ্ধতম মত (বাহ্‌রুর রাইক)।

১৪. মাসআলা ঃ এরূপ মহিলা রমযানের সিয়াম সাধনা বর্জন করবে না। তবে মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হায়েযের উপরোক্ত দিনগুলোর রোযা কাযা করবে। যদি তার জানা থাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, তার হায়েয রাত্রে আরম্ভ হয়েছে, তবে সে বিশ দিনের কাযা করবে। যদি জানা থাকে যে, তার হায়েয দিনে আরম্ভ হয়েছে, তবে সতর্কতার লক্ষ্যে বাইশ দিনের কাযা করবে। হায়েয রাত্রে আরম্ভ হয়েছে, না দিনে এ বিষয়ে যদি কোন কিছুই মনে না থাকে, তবে অধিকাংশ মাশায়িখে কিরাম বলেন, সে বিশ দিনের সওম কাযা করবে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, সতর্কতাবশত এরূপ মহিলা বাইশ দিনের কাযা করবে। ইচ্ছা করলে রমযানের সাথে সাথেই কাযা করবে আর ইচ্ছা করলে পরে কাযা করবে। উপরোক্ত হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা জানে যে, প্রতি মাসে তার একবারই হায়েয হয়। একথা যদি জানা না থাকে বরং শুধু এতটুকু জানা থাকে যে, তার হায়েয রাত্রে আরম্ভ হয়েছে, তবে সতর্কতাবশত সে পঁচিশ দিন কাযা করবে। চাই তা রযমানের সাথে সাথেই কাযা করুক বা পরে কাযা করুক। যদি এ কথা জানা থাকে যে, তার হায়েয দিনে আরম্ভ হয়েছে, তবে যদি রমযানের সাথে সাথে কাযা করে, তাহলে বত্রিশ দিন কাযা করবে। আর যদি পরে কাযা করে, সতর্কতা হেতু আটত্রিশ দিন কাযা করবে। উপরোক্ত হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যদি রমযান ত্রিশ দিন হয়। আর যদি কম হয়, তাহলে সাইত্রিশ দিন কাযা করবে (মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))।

১৫. মাসআলা ঃ আদতওয়ালী তথা অভ্যাস সম্পন্ন মহিলা যদি সন্তান প্রসবের পর রক্ত দেখে এবং আদতের কথা ভুলে যায়, তবে দেখতে হবে যে, তার রক্ত যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হয় বরং চল্লিশ দিন পরই যদি সে পবিত্র হয়ে যায়, তবে যে সালাত সে ছেড়েছে এর কিছুই তার পুনরায় কাযা করতে হবে না। রক্ত যদি চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় বা চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়নি কিন্তু চল্লিশ দিনের পর তুহরের মুদ্দত পনর দিনের কম ছিল, তবে তার উচিত চিন্তা-ভাবনা করা। যদি নিফাসের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আদতের ব্যাপারে তার নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টি হয় তবে সেমতে আমল করবে। যদি নির্ধারিত আদতের ব্যাপারে নিশ্চিত কোন ধারণা সৃষ্টি না হয়, তবে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং পূর্ণ চল্লিশ দিনের সালাত কাযা করবে। যদি রক্ত অনবরত প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে দশ দিন অপেক্ষা করে অতীত পূর্ণ চল্লিশ দিনের সালাত কাযা করে নিবে (মুহীত)। যোনি দ্বার দিয়ে কোন মহিলার গর্ভপাতের পর তার সন্দেহ হল যে, সন্তানের কোন অঙ্গ পয়দা হয়েছে কিনা এমতাবস্থায় যদি অনবরত তার রক্তপাত হতে থাকে, তবে দেখতে হবে যে, তার হায়েযের অভ্যাস অনুযায়ী "হায়েযের মুদ্দতের" প্রথম দিকে যদি গর্ভপাত ঘটে থাকে, তাহলে সে অভ্যাস পরিমাণের দিনগুলোর সালাত বাদ দিবে। কেননা, এখন হয়তো তার হায়েয বা নিফাসের অবস্থা। অতঃপর গোসল করে পবিত্রতার অভ্যাস পরিমাণ সালাত সন্দেহের সাথে আদায় করবে। কেননা, এ সে নিফাসওয়ালী বা পবিত্র। এরপর যে কয়দিন তার হায়েযের অভ্যাস আছে, সে পরিমাণ দিনের সালাত ছেড়ে দিবে। কেননা, এ সময় সে হয়তো হায়েযওয়ালী বা নিফাসওয়ালী। অতঃপর গর্ভপাত হতে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে গোসল করে যতদিন পবিত্র থাকার অভ্যাস আছে এ পরিমাণ দিনগুলোর সালাত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আদায় করবে। যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ না হয়, তবে যে পরিমাণ চল্লিশ দিনের মধ্যে আছে এ দিনগুলোর সালাত সন্দেহের সাথে আদায় করবে। আর বাকী দিনগুলোর সালাত নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে আদায় করবে। অতঃপর এ নিয়মেই আমল করবে। যদি হায়েযের আদত অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভপাত ঘটে, তবে তখন হতে যতদিন

পবিত্র থাকার অভ্যাস আছে ঐ পরিমাণ সময়ের সালাত সন্দেহের সাথে আদায় করবে। অতঃপর যতদিন হায়েয আসার অভ্যাস আছে ঐ পরিমাণ সময়ের সালাত নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বাদ দিবে। মূল কথা হল, সন্দেহের জন্য কোন হুকুম নেই। সর্ব কাজে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব (ফাতহুল কাদীর)।

১৬. মাসআলা ঃ মা'যুরের আহকামও উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমত ওযর প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্ত হল, এক নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত ওযর অব্যাহত থাকতে হবে। এটাই সুস্পষ্ট কথা। যেমনিভাবে ওযরহীনতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্ত হল, এক সালাতের পূর্ণ ওয়াক্ত ওযরহীনভাবে থাকতে হবে। সুতরাং ওয়াক্তের কোন অংশের মধ্যে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় এবং পূর্ণ ওয়াক্ত ভাল থাকে এ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি উযূ করে সালাত আদায় করে, অতঃপর যদি এ ওয়াক্ত চলে যায় এবং অন্য ওয়াক্ত আসে এবং রক্তও বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঐ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, ওযর পূর্ণ ওয়াক্ত ছিল না। দ্বিতীয় ওয়াক্তের মধ্যে যদি রক্ত বন্ধ না হয় এবং এ ওয়াক্তও অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আদায়কৃত সালাত পুনরায় পড়তে হবে না। কেননা, পূর্ণ ওয়াক্ত তার ওযর বিদ্যমান ছিল। ওযর বাকী থাকার শর্ত হল, ফরয সালাতের কোন ওয়াক্ত এমনভাবে অতিবাহিত না হওয়া যার মধ্যে উক্ত ওযর বিদ্যমান ছিল না (তাবয়ীন)।

১৭. মাসআলা ঃ ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলা এবং যার পেশাব ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ার রোগ আছে অথবা যার সর্বদা দাস্ত হয় কিংবা যার সর্বদা বায়ু নির্গত হয় অথবা যার নাক দিয়ে সর্বদা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা যার শরীরে এমন যখম আছে যার রক্ত প্রবাহ কখনো বন্ধ হয় না এই ধরনের লোকেরা প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে উযূ করবে এবং এর দ্বারা ওয়াক্তের ভেতর ফরয-নফল যা ইচ্ছা যত ইচ্ছা আদায় করবে (বাহ্রুর রাইক)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রক্ত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় উযূ করে আর রক্ত বন্ধ হওয়া অবস্থায় সালাত আদায় করে এবং পরবর্তী ওয়াক্তেও রক্ত পরিপূর্ণভাবে বন্ধ থাকে, তাহলে পূর্বের আদায়কৃত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইবরাহীম হালবী (র))। অনুরূপভাবে সালাত আদায়রত অবস্থায় যদি রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী পূর্ণ ওয়াক্তও বন্ধ থাকে, তাহলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (মুযমারাত)।

১৯. মাসআলা ঃ মা'যূর লোকের উযূ ফরয সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে গেলে পূর্বের হাদাছের কারণে ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহের বিবরণ)। সুতরাং কোন মা'যূর ব্যক্তি যদি ঈদের সালাতের জন্য উযূ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ উযূ দ্বারা সে যুহরের সালাত আদায় করতে পারবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেননা, ঈদের সালাত চাশ্তের সালাতের ন্যায়ই। কোন ব্যক্তি যদি যুহরে সালাত আদায় করার জন্য যুহরের ওয়াক্তে একবার উযূ করে, অতঃপর পুনরায় যুহরের ওয়াক্তে আসরের জন্য উযূ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ উযূ দ্বারা আসরের সালাত আদায় করা তার জন্য জাইয নেই (হিদায়া)। এটাই সহীহ্ কথা (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। রক্ত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় যদি কোন মহিলা উযূ করে অথবা উযূর পর যদি ওয়াক্তের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু উযূর পর যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

রক্ত বন্ধ থাকে এবং এ অবস্থায় ঐ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার উযূ বাকী যতক্ষণ পুনরায় রক্ত প্রবাহিত না হয় বা অন্য কোন কারণে উযূ ভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ পর্য দ্বারা সে সালাত আদায় করতে পারবে (তাবয়ীন)। মা'যূর ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের মধ্যে বিনা জনে উযূ করে, অতঃপর রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে সে পুনরায় উযূ করে সালাত আদায় অনুরূপভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণে উযূ করার পর প্রবাহিত হয়, তাহলেও উযূ করে সালাত আদায় করতে হবে (কাফী)।

২০. মাসআলা ঃ কারো শরীরে যদি বসন্ত থাকে এবং এর থেকে রক্ত প্রবাহিত হ মনে হয়, এমতাবস্থায় সে যদি উযূ করে, অতঃপর এযাবত যা প্রবাহিত হচ্ছিল তা যদি হতে আরম্ভ করে, তবে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। নাকের এক ছি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি উযূ করে, অতঃপর অপর ছিদ্র হতে রক্ত প্রবাহি তবে পুনরায় তাকে উযূ করতে হবে (আল-বাহ্রুর রাইক)।

২১. মাসআলা ঃ ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলা যদি উযূ করে নফল সালাত আরম্ভ করে অবস্থায় এক রাকাআত আদায় করার পর যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবে তার সালাত ভ যাবে এবং সতর্কতাবশত এ সালাত কাযা করা তার জন্য অপরিহার্য (যহীরিয়্যা)।

২২. মাসআলা ঃ মাযূর ব্যক্তি যদি বাঁধন দ্বারা বা তুলা দ্বারা রক্তের প্রবাহ বন্ধ সক্ষম হয় অথবা সে বসে থাকলে যদি রক্ত প্রবাহিত না হয় কিন্তু দাঁড়ালে রক্ত প্রবাহিত হয় রক্তের প্রবাহকে বন্ধ রাখা তার জন্য আবশ্যক। রক্তের প্রবাহকে বন্ধকরণের ফলে মা'যূ মা'যূর থাকবে না। কিন্তু ঋতুবতী মহিলা রক্তের প্রবাহকে বন্ধ করে দেয়ার পরও সে ঋতু থেকে যাবে (বাহ্রুর রাইক)। নিফাস ও ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলা যদি স্বীয় যোনিতে তুলা রাখে, তবু সে নিফাস ও ইস্তিহাযার অবস্থায়ই বাকী থাকবে। এর থেকে খারিজ হবে না নীস)।

২৩. মাসআলা ঃ চোখে রোগ থাকার কারণে যদি কারো চোখ থেকে সর্বদা পানি প্র হতে থাকে, তবে প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে তাকে নতুন উযূ করার হুকুম দেয়া হবে। তা পুঁজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে (তাবয়ীন)। যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এমন যখম যদি শরীরে থাকে এবং নেকড়া দ্বারা সে তা বেঁধে রাখে, এতদসত্ত্বেও যদি এ নেকড়ার উপর দিরহামের চেয়ে বেশী পরিমাণ রক্ত লেগে যায় অথবা তার পরিধানের কাপড়ের উপর যদি লেগে যায়, তবে দেখতে হবে রক্ত যদি এমন হয় যে, রক্তমাখা নেকড়া বা কাপড় ধৌত ক সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পূর্বে পুনরায় তা নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে ধোয়া ব্যতিরেকেই জন্য সালাত আদায় করা জাইয। আর যদি এমন না হয়, তবে ধোয়া ব্যতিরেকে সালাত করা জাইয হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত (মুযমারাত)। কারো নাক থেকে যদি রক্ত প্রবাহি অথবা যখম থেকে যদি রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে সে আখিরী ওয়াক্তের অপেক্ষা করবে। র প্রবাহ যদি বন্ধ না হয়, তবে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পূর্বে ধৌত করা ব্যতিরেকেই উযূ করে সা আদায় করবে (যখীরা)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ নাজাসাত ও তার আহকাম

[এই পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকী হতে পবিত্রকরণ সম্বন্ধে

১. মাসআলা ঃ নাপাকীকে পাক করার দশটি নিয়ম আছে।এক—ধৌত করা, পানি এবং পাক তরল বস্তু—যার দ্বারা নাপাকী দূর করা যায়। এ ধরনের জিনিস দ্বারা নাপাকীকে পাক করা জাইয। যেমন সিরকা, গোলাপ জল এবং এ জাতীয় এমন সব জিনিস, যা নিংড়াতে চাইলে নিংড়ানো যায় (হিদায়া)। আর যে সমস্ত জিনিস নিংড়াতে চাইলে নিংড়ানো যায় না, যেমন তৈল, এর দ্বারা নাপাকী দূর করা জাইয নয় (কাফী)। শীরা, দুধ এবং আঙ্গুরের রসের হুকুমও অনুরূপ (তাবয়ীন)। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ব্যবহৃত পানি তরল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এর উপরই ফাতওয়া (যাহিদী)। নাপাকী যদি দেখা যায়, তবে তা বিদূরিত করার মাধ্যমে নাপাকী বিদূরিত হবে। নাপাকী যদি এমন হয় যে, এর চিহ্ন বিদূরিত করা যায়, তবে এর চিহ্ন বিদূরিত করার মাধ্যমেই নাপাকী বিদূরিত হবে। নাপাকী হতে পবিত্রতা লাভের ক্ষেত্রে ধোয়ার মধ্যে নির্ধারিত সংখ্যা ধর্তব্য নয় (মুহীত)। একবার ধৌত করার দ্বারা মূল নাপাকী যদি বিদূরিত হয়ে যায়, তবে তাই যথেষ্ট। আর তিন বার ধৌত করার দ্বারাও নাপাকী যদি বিদূরিত না হয়, তবে নাপাকী বিদূরিত হওয়া পর্যন্ত ধৌত করতে হবে (আস্‌সিরাজিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ নাপাকী যদি এমন হয় যে, এর চিহ্ন সহজে দূর করা যায় না অর্থাৎ যে নাপাকী দূর করতে পানি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় যেমন সাবান ইত্যাদি, তাহলে কষ্ট করে তা দূর করার প্রয়োজন নেই (তাবয়ীন)। অনুরূপভাবে অগ্নিতে গরমকৃত পানির দ্বারাও তা দূর করার জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, যদি কারো কাপড় বা হাত নাপাক রং বা মেহেদী দ্বারা রঙ্গীন করা হয়, তাহলে পরিষ্কার পানি বের হওয়া পর্যন্ত তা ধৌত করতে থাকতে হবে। পরিষ্কার পানি বের হলে রং বাকী থাকা সত্ত্বেও ঐ কাপড় বা হাত পাক হয়ে যাবে (ফতহুল্ কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার হাত নাপাক ঘিয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় অথবা নাপাক ঘি যদি কারো কাপড়ে লেগে যায় এবং সে যদি হাত বা কাপড় উশনান ব্যতীত পানি দ্বারা ধৌত করে এবং হাতের উপর ঘিয়ের কিছু চিহ্ন বাকী থেকে যায়, তাহলেও পাক হয়ে যাবে। ফকীহ্ আবুল্ লায়ছ (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এটাই বিশুদ্ধতম মত (যখীরা)। নাপাকী যদি দৃষ্ট না হয়, তবে তা তিনবার ধৌত করতে হবে (মুহীত)। যে সব বস্তু নিংড়ানো সম্ভব এগুলো

pdf By Syed Mostofa Sakib

পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বারই নিংড়ানো শর্ত। তবে তৃতীয়বারে খুব ভালভাবে নিংড়াতে হবে। যাতে পুনঃ নিংড়ালে এর থেকে কোন পানি বের না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শক্তি অনুসারে এ কর্ম সম্পাদন করবে। "উসূল"-এর বর্ণনা ব্যতিরেকে অপর এক বর্ণনা মতে, একবার নিংড়ালেই যথেষ্ট হবে। এটাই সহজ ব্যবস্থা (কাফী)। নাওয়াফিল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (তাতারখানিয়্যা)। তবে প্রথম বর্ণনাটি সতর্কতাপূর্ণ (মুহীত)। যদি প্রত্যেক বার নিংড়ানো হয় কিন্তু নিজের শক্তি অনুসারে নিংগড়ানো না হয়, বরং কাপড়ের হিফাজতের জন্য আস্তে আস্তে নিংড়ানো হয়, তবে জাইয হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। তিনবার ধৌত করে প্রত্যেকবার নিংড়ানোর পর যদি পুনরায় এক ফোঁটা পানি কোন কিছুতে গড়িয়ে পড়ে, তবে দেখতে হবে যে, তা যদি তৃতীয়বার এমন যথাযথভাবে নিংড়ানো হয়ে থাকে যে, এর থেকে কোন পানি বের হচ্ছিল না, তবে হাত, কাপড় এবং টপকিয়ে পড়া পানি সবই পাক। আর অনুরূপভাবে নিংড়ানো না হয়ে থাকলে সবই নাপাক বলে গণ্য হবে (মুহীত)। যে সমস্ত জিনিস নিংড়ানো যায় না তা তিনবার ধৌত করা ও প্রত্যেক বার শুকানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যাবে। কেননা শুকানোর মধ্যে নাপাকী দূরীভূত হওয়ার ক্রিয়া বিদ্যমান আছে। শুকানোর পরিমাণ হল এই যে, কোন বস্তু ধৌত করে তা এমনভাবে রেখে দেয়া যাতে পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়। একেবারে শুকিয়ে যাওয়া শর্ত নয় (তাবয়ীন)। উপরোক্ত হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যদি কাপড় প্রচুর পরিমাণে নাপাকী চুষে থাকে কাপড় যদি নাপাকী না চুষে বা অল্প পরিমাণ চুষে, তবে তিনবার ধৌত করার দ্বারাই কাপড় পাক হয়ে যাবে (মুহীত ঃ আস্‌সুরুখ্‌সী)।

৪. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি গম অথবা গোশ্‌ত তরল শরাব দ্বারা পাকায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা পুনরায় তিনবার পানি দ্বারা পাকাতে হবে এবং প্রত্যেক বার শুকিয়ে নিতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এভাবে পাকানো খাদ্য কখনো পাক হবে না। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত ঃ নিসাব ও কুবরা গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত)। যে সমস্ত বস্তু নিংড়ানো যায় না, তা যদি নাপাক হয়ে যায়, যেমন নাপাকী লাগা বস্তুতে নাপাকী ঢুকে গেল এভাবে যে, একটি ছুরি নাপাক রং এর দ্বারা রঙ্গীন করা হয়েছে অথবা মাটির পাত্র এবং ইট যা নতুন তৈরী করা হয়েছে। এতে যদি শরাব পতিত হয় অথবা গমের উপর শরাব পতিত হবার পর গম তা চুষে নিয়ে যদি ফুলে উঠে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ছুরি পাক পানি দ্বারা তিনবার ধৌত করতে হবে এবং প্রত্যেক বারই এগুলো শুকিয়ে নিতে হবে। এ নিয়মে ধৌত করলে এগুলো পাক হয়ে যাবে। নাপাক গম পানিতে ভিজিয়ে রাখবে যেন ভেতরে পানি চুষে নেয়, যেমনিভাবে শরাব চুষে নিয়েছিল। এ নিয়মে তিনবার ভিজিয়ে তিনবার শুকালে গম পাক হয়ে যাবে। শরাব পড়ে গম যদি ফুলে না উঠে, তবে তিনবার ধৌত করে শুকিয়ে নিলেই গম পাক হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, গমের মধ্যে যেন শরাবের স্বাদ ও গন্ধ বাকী না থাকে (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ ইট যদি পুরাতন হয়, তবে এক সাথে তিনবার ধৌত করার দ্বারাই তা পাক হয়ে যাবে (খুলাসা)। মধু নাপাক হয়ে গেলে তা কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে তাতে পানি ঢালবে। অতঃপর তা আগুনে জ্বালাতে থাকবে মূল পরিমাণ বাকী থাকা পর্যন্ত। এরূপ তিনবার করলে মধু

পাক হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ বলেন, আঙ্গুরের রসও অনুরূপভাবে পাক করা যায়। নাপাক তৈল এভাবে তিনবার ধৌত করতে হবে যে, তা কোন পাত্রে ঢেলে তার উপর অনুরূপভাবে পানি ঢালবে। অতঃপর তা লটকিয়ে রেখে দিবে এবং তৈল উপরে চলে আসলে তৈল উঠিয়ে নিবে অথবা পাত্রের নীচের দিক দিয়ে ছিদ্র করে দিবে যেন পানি বেরিয়ে যায়। এভাবে তিনবার করবে, তাহলেই তা পাক হয়ে যাবে (যাহিদী)। নাপাক কাপড় তিন পাত্রে তিনবার ধৌত করবে অথবা একপাত্রে তিনবার ধৌত করবে এবং প্রত্যেক বার নিংড়াবে, তবেই উক্ত কাপড় পাক হয়ে যাবে। কেননা, ধোয়ার ব্যাপারে মানুষের অভ্যাস এভাবেই চালু আছে। এভাবে ধোয়ার পর যদি কাপড় পাক হয়েছে বলে ধরে না নেয়া হয়, তবে ধোয়ার বিষয়টি মানুষের জন্য জটিল হয়ে যাবে। কয়েক পাত্রে শরীরের কোন নাপাক অঙ্গ ধৌত করা এবং যে জুনুবী ব্যক্তি এখনো ইস্‌তিন্‌জা করেনি, তার কয়েক কূপের মধ্যে গোসল করা কাপড় ধৌত করার মতই। এ অবস্থায় পানি নাপাক হবে এবং পাত্রও নাপাক হবে। তবে চতুর্থ পাত্রের পানিতে কাপড় পাক হয়ে যাবে কিন্তু শরীরের অঙ্গ পাক হবে না। কেননা, এ পানি কুরবত তথা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে (কাফী)। পূর্বের ব্যবহৃত তিন পাত্রের পানি নাপাক। তবে এ নাপাকীর মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম পাত্রের পানি যদি কোন কিছুতে লাগে, তবে তিন বার ধৌত করার দ্বারা তা পাক হবে। দ্বিতীয় পাত্রের পানি যদি কোন কিছুতে লাগে, তবে দুইবার ধৌত করার দ্বারা তা পবিত্র হবে। আর তৃতীয় পাত্রের পানি যদি কোন কিছুতে লাগে, তবে একবার ধৌত করার দ্বারা তা পবিত্র হবে (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্‌সী (র))। এটাই সহীহ্ মত (তানবীর)। ঐ পানি যদি অপর কোন কাপড়ে লাগে, তবে ঐ হুকুম হবে যা প্রথম কাপড়ের বেলায় হয়েছে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। তৃতীয়বার ধৌত করার সাথে সাথে তৃতীয় পাত্রও পাক হয়ে যাবে। লোটা বা পিয়ালার হাতল এবং শরাবের মটকি যার মধ্যে সিরকা তৈরী করা হয়েছে, এগুলোর পবিত্র হওয়ার ন্যায় (যাহিদী)। যদি কারো মোযার আস্তর সুতির হয় এবং এর ফাটা অংশ দিয়ে ভেতরে নাপাক পানি প্রবেশ করে, অতঃপর সে যদি তা ধৌত করে এবং হাত দ্বারা মর্দন করে, তারপর মোযার ভেতর তিনবার পানি ভরে এবং ফেলে দেয় কিন্তু ভেতরের আস্তর নিংড়াতে না পারে, তবে মোযা পাক হয়ে যাবে (মুহীত)। "নাওয়াফিল" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, পসন্দনীয় মত হচ্ছে, প্রত্যেক বার এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে যেন পানি ফোটা ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায় (তাতারখানিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ খুরাসানী মোযা যার চামড়া সুতা দ্বারা এমনভাবে বসানো যে, মোযার উপরিভাগ পুরাটাই সুতায় জড়ানো। এ ধরনের মোযার নীচে যদি নাপাকী লেগে যায়, তাহলে তা তিনবার ধৌত করবে এবং প্রত্যেকবার শুকিয়ে নিবে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, একবার ধুয়ে রেখে দিবে। পানির ফোটা পড়া বন্ধ হলে আবার ধৌত করবে। এরূপে তিনবার ধৌত করবে। এটা বিশুদ্ধতম মত। তবে প্রথমটি সতর্কতাপূর্ণ (খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ মাটি বা গাছে নাপাকী লাগার পর যদি বৃষ্টিপাত হয় এবং নাপাকীর কোন চিহ্ন যদি এতে বাকী না থাকে তবে তা পাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কাঠের উপর যদি নাপাকী লাগে এবং এর উপর বৃষ্টি হয়, তবে একে ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত মনে করা হবে। প্রস্রাবের

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণে মাটি নাপাক হওয়ার পর তা যদি ধৌত করা আবশ্যক হয়, তবে মাটি নরম হলে তার উপর তিনবার পানি প্রবাহিত করলে তা পাক হয়ে যাবে। আর মাটি যদি শক্ত হয়, তবে তার উপর পানি ঢেলে হাত দ্বারা ঘষে কাপড় বা নেকড়া দ্বারা মুছে নিবে। এভাবে তিনবার করলে উক্ত মাটি পাক হয়ে যাবে। যদি এর উপর বেশী পানি ঢালা হয় এবং এতে যদি নাপাকী ছড়িয়ে পড়ে এবং নাপাকীর কোন গন্ধ ও রং বাকী না থাকে, এ অবস্থায় রেখে দেয়ার পর তা যদি শুকিয়ে যায়, তাহলেও উক্ত জমি পাক হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ কোন চাটাইয়ের উপর যদি নাপাকী লাগে এবং তা শুক্নো হয়, তবে ঘষে ফেলে দিবে। আর নাপাকী যদি তরল হয় এবং চাটাই বাঁশ বা এ জাতীয় কোন বস্তুর হয়, তাহলে ধৌত করলেই তা পাক হয়ে যাবে। পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে অন্য কিছুর প্রয়োজন হবে না (মুহীত)। চাটাই এভাবেই পাক হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। কেননা, নাপাকী চাটাইয়ের মধ্যে চুষে যায়নি (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ উন্নত মানের খেজুর বা এ জাতীয় কোন বস্তুতে যদি নাপাকী লাগে, তবে ধৌত করে প্রত্যেক বার শুকিয়ে নিলে তা পাক হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। এর উপরই ফাতাওয়া (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইবরাহীম হালবী (র))। উন্নতমানের খেজুর যদি প্রথম বারের মত নাপাক পানিতে ভেজানো হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী এগুলো তিনবার ধৌত করতে হবে এবং প্রত্যেক বারই নিংড়াতে হবে অথবা শুকিয়ে নিতে হবে। তাহলেই তা পাক হয়ে যাবে। মাশায়িখে কিরামের মত এটা-ই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ গোসলখানা অনুচ্ছেদ ও খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ নাপাক বিছানা যদি কোন নহরের মধ্যে এক রাত্র ফেলে রাখা হয় এবং এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, তবে তা পাক হয়ে যাবে (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্রাহীম হালবী (র))। পানির পাত্রের মধ্যে যদি শরাব থাকে, তাহলে কিছুক্ষণ পরপর এতে তিনবার পানি ঢাললে তা পাক হয়ে যাবে। উপরোক্ত হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি পানপাত্র নতুন হয়। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (খুলাসা)। শরাবের মটকি যদি তিনবার ধৌত করা হয় এবং তা পুরাতন ও ব্যবহৃত হয়, তবে পাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মটকিতে শরাবের গন্ধ বাকী না থাকে (তাতারখানিয়্যা)। "কুবরা"-এর সূত্রে বর্ণিত)।

১১. মাসআলা ঃ দাবাগাতকৃত পাকা চামড়াতে যদি নাপাকী লাগে, তবে চামড়া যদি এমন শক্ত হয় যে, নাপাকী এতে চুষে যায় না, তাহলে সমস্ত ইমামের মতে ধুইলেই তা পাক হয়ে যাবে। আর যদি নাপাকী চুষে ভেতরে যায়, তাহলে নিংড়ানো সম্ভব হলে তিন বার ধৌত করে প্রত্যেক বার নিংড়ালে তা পাক হয়ে যাবে। যদি নিংড়ানো সম্ভব না হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তিনবার ধৌত করে প্রত্যেক বার শুকালে তা পাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ কাপড়ের কোন এক কোণ নাপাক হয়ে যাওয়ার পর ব্যবহারকারী ব্যক্তি

যদি তা ভুলে যায় এবং চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে কোন এক কোণ ধুয়ে নেয়, তাহলে ঐ কাপড় পবিত্র বলে হুকুম দেয়া হবে। এটাই পসন্দনীয় মত। যদি ঐ কাপড় পরিধান করে সে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করে নেয় অতঃপর ধৌত করা কোণ ছাড়া অপর কোণে নাপাকী প্রকাশিত হয়, তবে উক্ত কাপড় পরিহিত অবস্থায় সে যত নামায পড়েছে সমস্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে (খুলাসা)। তবে সতর্কতা এবং উত্তম হল গোটা কাপড় ধুয়ে নেয়া। অনুরূপভাবে যদি কেউ জানে যে, তার কোন এক আস্তিনে নাপাকী লেগেছে, কিন্তু এ কথা মনে নেই যে, কোন্ আস্তিনে লেগেছে, তাহলে উভয় আস্তিন ধৌত করে নিতে হবে (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))। কাপড়ে নাপাকীর কারণে তা তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি তা একদিন একবার ধৌত করে এবং অপর দিন দুইবার ধৌত করে, তাহলে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা, এতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ কুপে কোন কিছু পতিত হওয়া অনুচ্ছেদ)।

১৩. মাসআলা ঃ দুই—মাসেহ্ করার দ্বারাও কোন কোন বস্তু পাক হয়। বুক ভাঙ্গা নয় এবং ধারালো, এ ধরনের লৌহজাত বস্তুতে যদি নাপাকী পতিত হয় এবং তা কালাই করা না হয় যেমন তরবারি, ছুরি, আয়না ইত্যাদি, তবে এ জাতীয় বস্তু যেরূপ ধৌত করলে পাক হয়, অনুরূপভাবে কোন পাক নেকড়া দ্বারা মাসেহ করলেও পাক হয়ে যায় (মুহীত)। নাপাকী শুকনা, ভেজা দৃশ্যমান হওয়া ও না হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই (তাবয়ীন)। ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই পসন্দনীয় (ইনায়া)। যে তরবারি বা ছুরি সমান্তরাল নয় বরং আঁকাবাঁকা বা নকশাখচিত, তা মাসেহ্-এর দ্বারা পাক হবে না (তাবয়ীন)। শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্রের মাঝে যদি শিঙ্গার স্থানটি তিনটি পাক ভেজা নেকড়া দ্বারা তিনবার মাসেহ্ করা হয়, তবে তা পাক হয়ে যাবে এবং ধৌত করার আর প্রয়োজন থাকবে না। কেননা, এতেই ধৌত করার কাজ হয়ে গেছে (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))।

১৪. মাসআলা ঃ তিন—কচলানোর দ্বারাও কোন কোন বস্তু পাক করা যায়। যেমন বীর্য। বীর্য যদি কাপড়ে লাগে এবং তা তরল হয়, তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব। বীর্য যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, তবে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কাপড় পাক করার জন্য কচলানোই যথেষ্ট (ইনায়া)। সহীহ্ মতে পুরুষ ও মহিলার বীর্যের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। কচলানোর পর কাপড়ের উপর যদি বীর্যের চিহ্ন বাকী থেকে যায় এতে কোন অসুবিধা নেই, যেমন অসুবিধা নেই কাপড় ধৌত করার পর বীর্যের চিহ্ন বাকী থাকার মাঝে (যাহিদী)। যদি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ পেশাবের কারণে নাপাক হয়ে যায়, তবে এমতাবস্থায় কচলানোর দ্বারা পাক হবে না (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী)। বীর্য যদি শরীরে লাগে, তবে তা তরল হোক বা শুকনা হোক, ধৌত করেই পাক করতে হবে। এ মত ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে (কাফী ঃ "আসল" গ্রন্থসমূহের সূত্রে বর্ণিত, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান এবং খুলাসা)। আমাদের মাশাইখদের মতে শরীরে বীর্য লাগলে কচলিয়ে তা ফেলে দিলেও পাক হয়ে যাবে। কেননা, এ ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল এবং ব্যাপক। তাই এ ব্যাপারে শরীআতের বিধান কিছুটা লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয় (হিদায়া)। বীর্য যদি কাপড়ের আস্তরের ভেতর ঢুকে যায়, তবু কচলানোর দ্বারা তা পাক হয়ে যাবে। এটাই সহীহ্ মত (আল্ জাওহারাতুন্ নায়্যারা এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবয়ীন)। মোযার উপর যদি বীর্য লাগে এবং তা শুকিয়ে যায়, তবে কচলানো দ্বারা তা পাক ক জাইয আছে (কাফী)। কাপড়ে লাগা বীর্য কচলানোর পর যদি কাপড় হতে এর চিহ্ন খতম হ যায়, অতঃপর এতে পানি লাগে, তবে এ সম্পর্কে দু ধরনের বর্ণনা রয়েছে। পসন্দনীয় এবং উ মত হল, তা পুনরায় নাপাক হবে না (খুলাসা)।

১৫ মাসআলা ঃ চার—ঘর্ষণ ও দলনের দ্বারাও নাপাক বস্তুকে পাক করা যায়। মোযা উপর যদি নাপাকী লাগে এবং তা পদার্থ ও দেহ বিশিষ্ট হয়, যেমন, পায়খানা, গোবর ও বীর্য এ এগুলো যদি শুকনা হয়, তাহলে ঘর্ষণ ও দলনের দ্বারা তা পাক হয়ে যাবে। আর যদি তরল হ তবে যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা মতে ধৌত করেই তাকে পাক করতে হবে। কিন্তু ইমাম আ ইউসুফ (র) বলেন, চামড়ার মোযা যদি ভালভাবে মাসেহ্ করা হয় যাতে নাপাকীর কোন চি বাকী না থাকে, তাহলেও তা পাক হয়ে যাবে। এ বিষয়টি যেহেতু ব্যাপক ও আম, তাই ইমা আবূ ইউসুফ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

নাপাকী যদি দেহ বিশিষ্ট না হয়, যেমন শরাব ও প্রস্রাব এবং এর সাথে যদি মাটি জাতীয় কি মিশে যায় বা মাটি ঢালা হয়, অতঃপর তা মুছে ফেলে দেয়া হয়, তবে তা পাক হয়ে যাবে। এটা সহীহ্ (তাবয়ীন)। প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে এর উপরই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে (মি'রাজু দিরায়া)। ফাতাওয়ায়ে হুজ্জাতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, চামড়ার পোশাকের উপর যদি দেহ বিশি নাপাকী লাগে এবং তা শুকিয়ে যায়, তবে মোযার মত তা রগড়ানোর দ্বারা পাক হয়ে যাবে (মুযমারাত)।

১৬. মাসআলা ঃ পাঁচ—শুকিয়ে যাওয়া এবং চিহ্ন বিদূরিত হওয়ার দ্বারাও কোন বস্তু পাক হয়ে যায়। মাটিতে নাপাকী লাগার পর তা যদি শুকিয়ে যায় এবং নাপাকীর চিহ্ন বিদূরিত হয়ে যায়, তবে মাটি পাক হয়ে যাবে। এ স্থানে সালাত আদায় করা জাইয। তবে তায়াম্মুম করা জাইয নেই (কাফী)। সূর্যের তাপের দ্বারা, আগুনের দ্বারা, বাতাসের দ্বারা এবং ছায়ার মাধ্যমে শুকানোর ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই (আল্বাহ্রুর রাইক)। যে সমস্ত বস্তু মাটির উপর খাড়া আছে, তাও মাটির হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন প্রাচীর, বৃক্ষ, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি যতক্ষণ এগুলো মাটির উপর খাড়া থাকবে। যদি ঘাস, কাঠ এবং বাঁশ ইত্যাদি কেটে ফেলার পর এগুলোতে নাপাকী লাগে, তবে ধৌত করা ব্যতিরেকে এগুলো পাক হবে না (আল্ জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। ইট যদি মাটিতে বিছানো থাকে, তবে এর হুকুম মাটির হুকুমের মতই। শুকালেই তা পাক হয়ে যাবে। আর যদি মাটির উপর এমনভাবে রাখা থাকে যে, তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ধৌত করে তা পাক করতে হবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ পাথর এবং কাঁচা ইটের হুকুম অনুরূপই (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। পাথর, ইট ইত্যাদি যদি তাদের নিজ নিজ স্থান হতে উৎপাটিত করে ফেলা হয়, তবে তা নাপাক হয়ে যাবে কিনা এ বিষয়ে দু' ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। প্রস্তরকণা যদি মাটিতে বিছানো থাকে তবে এর হুকুমও মাটির হুকুমের মতই। প্রস্তরকণা যদি মাটির উপর পড়ে থাকে, তবে তা পাক হবে না (মুহীত ও মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। শুকানোর মাধ্যমে মাটি পাক হওয়ার পর

এতে যদি পানি পতিত হয়, তবে সহীহ্ মতে তা পুনরায় নাপাক হবে না। এরূপ স্থানের উপর যদি পানি ছিটিয়ে বসা হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ ছয়—দহন ও জ্বলনের মাধ্যমেও কোন কোন বস্তু পাক হয়। গোবর যদি জ্বলে ছাই হয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা পাক হয়ে যাবে। এর উপরই ফাতওয়া (খুলাসা)। অনুরূপভাবে মানুষের মলও জ্বলার পর পাক হয়ে যায় (বাহ্রুর্ রাইক)। রক্ত মিশ্রিত বকরীর মাথা যদি আগুনে জ্বলে যায় এবং রক্তের নিদর্শন খতম হয়ে যায়, তবে তা পবিত্র বলে হুকুম দেয়া হবে। নাপাক মাটি দ্বারা যদি লোটা-পিয়ালা তৈরী করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে তা পাকা করা হয়, তবে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে (মুহীত)। অনুরূপভাবে যে ইট নাপাক পানি দ্বারা তৈরী করে পরে পুড়িয়ে পাকা করা হয়েছে, তাও পবিত্র বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়াল গারাইব)। কোন মহিলা যদি উনান প্রজ্বলিত করার পর তা নাপাক পানিতে ভেজানো নেকড়া দ্বারা মাসেহ্ করে এরপর এতে রুটি পাকায়, তবে চুলায় রুটি দেয়ার পূর্বে আগুন যদি পানির আর্দ্রতা জ্বালিয়ে দেয়, তাহলে রুটি নাপাক হবে না (মুহীত)। গোবর বা লাদি দ্বারা প্রজ্বলিত চুলাতে রুটি তৈরী করা মাকরূহ্। কিন্তু এর উপর পানি ছিটিয়ে নিলে মাকরূহ্ হবে না (আল্ কিন্য়া)।

১৯. মাসআলা ঃ সাত—মূল অবস্থার পরিবর্তনের কারণেও কোন কোন বস্তু পাক হয়ে যায়। নতুন মটকিতে রক্ষিত শরাব যদি সিরকায় পরিণত হয়, তবে তা সমস্ত ফকীহ্র মতে পাক হয়ে যাবে (আল্ কিন্য়া)। শরাব দ্বারা যে আটা ছানা হয়েছে, তা ধৌত করার দ্বারাও পাক হবে না। কিন্তু এর উপর যদি সিরকা ঢালা হয় এবং শরাবের চিহ্ন খতম হয়ে যায়, তাহলে উক্ত রুটি পাক হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। রুটি যদি শরাবের মধ্যে ঢালা হয়, অতঃপর উক্ত শরাব যদি সিরকায় পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সহীহ্ মতানুসারে এর মধ্যে যদি শরাবের গন্ধ না থাকে, তবে তা পাক বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে পিয়াজ যদি শরাবের মধ্যে ঢালা হয়, এরপর শরাব সিরকায় পরিণত হয়, তবে তা পাক বলে গণ্য হবে। কেননা, পিয়াজের মধ্যে শরাবের যে অংশ ছিল, তা সিরকায় পরিণত হয়ে গিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শরাব যদি পানিতে পতিত হয়, তবে তা পাক বলে গণ্য হবে (খুলাসা)। শরাব যদি ঝোলের মধ্যে পতিত হয় এবং পরে সিরকায় পতিত হয়, তবে ঝোল যদি সিরকার মত চুকা হয়ে যায়, তাহলে তা পাক বলে গণ্য হবে (যহীরিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ শরাবের মধ্যে ইঁদুর পতিত হওয়ার পর ফেটে যাওয়ার পূর্বেই যদি তা বের করে ফেলা হয়, অতঃপর শরাব সিরকায় পরিণত হয়, তাহলে তা পান করতে কোন অসুবিধা নেই। ইঁদুর শরাবের ভেতরে পড়ে ফুলে যাওয়ার পর তা যদি বের করে ফেলা হয়, অতঃপর শরাব যদি সিরকায় পরিণত হয়, তাহলে তা পান করা হালাল হবে না। অনুরূপভাবে কুকুর যদি আঙ্গুরের রসে মুখ দেয়, অতঃপর তা শরাবে পরিণত হয়, এরপর সিরকায় পরিণত হয়, তাহলে তা পান করা হালাল নয়। কেননা, এতে কুকুরের লালা বিদ্যমান আছে এবং তা কখনো সিরকা হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে শরাবের মধ্যে যদি প্রস্রাব পতিত হয়, অতঃপর তা সিরকায় পরিণত হয় তাহলে এ সিরকা পান করাও হালাল নয়। (খুলাসা) নাপাক সিরকা যদি শরাবের মধ্যে ঢালা হয়, অতঃপর তা সিরকায় পরিণত হয়, তাহলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। কেননা, নাপাকী পরিবর্তন হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২১. মাসআলা ঃ গাধা বা শূকর যদি লবণের স্তূপে পতিত হয়ে লবণ হয়ে যায় অথবা হাত-মুখ ধৌত করার কূপে গাধা পতিত হয়ে যদি মাটি হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা পাক বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর বিপরীত মত পোষণ করেন (মুহীত)। মটকির মধ্যে যদি আঙ্গুরের সুরা থাকে এবং এতে যদি জোশ আসে, উথলিয়ে উঠে ও উপরে সর পড়ে ফলে পূর্বের তুলনায় সুরা কমে যায়, অতঃপর তা যদি সিরকায় পরিণত হয় এবং এ সিরকা যদি উক্ত মটকিতে দীর্ঘ দিন থাকে এবং সিরকার বাষ্প যদি মটকির মুখ পর্যন্ত আসে, তাহলে তা পাক বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কাপড়ে শরাব লাগার পর তা যদি সিরকা দ্বারা ধৌত করা হয়, তবে উক্ত কাপড় পাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নাপাক তৈল যদি সাবানের মধ্যে ফেলা হয়, তবে তা পাক বলে ফাতওয়া দেয়া হবে। কেননা, এতে পরিবর্তন পাওয়া যায় (যাহিদী)।

২২. মাসআলা ঃ আট—আরো তিন ভাবে নাপাকী পাক করা যায়। (১) দাবাগাত করে পাকা করা, (২) যবেহ করে পাক করা এবং (৩) এবং কূপের পানি উঠিয়ে ফেলে পাক করা। এভাবেও নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। পূর্বে এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আরো কতিপয় মাসআলা নিম্নে প্রদত্ত হল।

২৩. মাসআলা ঃ শরীরের কোন অঙ্গে যদি নাপাকী লাগে এবং তা যদি জিব্বা দ্বারা চেটে দূর করে দেয়া হয় এবং এতে যদি নাপাকীর চিহ্ন খতম হয়ে যায়, তবে তা পাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ছুরিতে নাপাকী লাগার পর তা যদি চেটে দূর করে দেয়া হয় বা থুথুর দ্বারা মুছে ফেলা হয় তাহলে এ পবিত্র বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নাপাকী লাগা কাপড় জিহ্বার দ্বারা চাটার কারণে যদি কাপড় হতে নাপাকীর চিহ্ন খতম হয়ে যায়, তবে তা পাক বলে গণ্য হবে (মুহীত)। মুখ ভরে বমি করার পর কুল্লি না করে উযূ করে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। কেননা, মুখ থুথু দ্বারা পবিত্র হয়ে গিয়েছে।

২৪. মাসআলা ঃ বাচ্চা যদি মায়ের স্তনের উপর বমি করে, অতঃপর বহুবার সে তা চুষে, তাহলে উক্ত স্তন পাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নাপাক তুলা যদি ধুনা হয়, তবে দেখতে হবে যে, সমস্ত বা অর্ধেক তুলা নাপাক কিনা, যদি এরূপ হয়, তবে তা পাক হবে না। যদি নাপাকীর পরিমাণ এমন সামান্য হয় যে, ধুনার দ্বারা তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তা পাক হয়েছে বলে হুকুম দেয়া হবে। যেমন শস্যের স্তূপ নাপাক হয়ে যাওয়ার পর কৃষক এবং কামলা যখন ভাগ করে নেয়, তখন তা পাক বলে হুকুম দেয়া হয় (খুলাসা)।

২৫. মাসআলা ঃ গাধা দ্বারা গম মাড়াই করা হয়, মাড়াই করার সময় গাধা এতে পেশাব, পায়খানা করে, অমনি তা গমের উপর যেয়ে পড়ে এবং এ গম অন্য গমের সাথে মিশে। এ গম সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেন, এ গম থেকে সামান্য গম বের করে নিয়ে তা ধৌত করে পরে পূর্ণ গমের সাথে মিশিয়ে দিবে। তবে এ গম খাওয়া জাইয হবে। এমনিভাবে এ ধরনের গম হতে যদি সামান্য গম বের করে কাউকে দান করা হয় বা কাউকে সাদাকা করে দেয়া হয়, তখনও তা পাক হয়ে যাবে (যখীরা)। নাপাক রাং গলালে তা পাক হয়ে যায়। কিন্তু মোম পাক হয় না (কিনৃয়া)।

২৬. মাসআলা ঃ ইঁদুর যদি ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মারা যায়, তবে ঘি যদি জমাট থাকে, তাহলে এর চতুষ্পার্শ্বের ঘি ফেলে দিবে। বাকী ঘি পাক হয়ে যাবে এবং তা খাওয়া জাইয হবে। আর ঘি যদি তরল হয়, তাহলে তা খাওয়া জাইয হবে না। তবে খাওয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে। যেমন জ্বালানোর কাজ বা চামড়া দাবাগাত করার কাজ ইত্যাদি (খুলাসা)। এ ধরনের ঘি দ্বারা যদি চামড়া দাবাগাত (পাকা) করা হয়, তবে ঐ চামড়া ধুয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যদি নিঙড়ানো যায়, তাহলে তিনবার ধুয়ে তিনবার নিঙড়াবে। যদি নিঙড়ানো না যায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তিনবার ধৌত করবে এবং তিনবার শুকাবে (বাদাই')। জমাট "ঘি" এর পরিচয় হল এই যে, কোন এক স্থান থেকে কিছু ঘি বের করার পর সাথে সাথে তা পূর্ণ হয়ে যায় না। যদি পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাকে তরল বলা হবে (ফাতাওয়ায়ে গারাইব)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক বস্তু সম্বন্ধে

১. মাসআলা ঃ নাপাক বস্তু দুই প্রকার। (১) নাজাসাতে মুগাল্লাযা অর্থাৎ গুরু নাপাক। এ নাপাকী এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পরিমাণ মাফ। দিরহামের পরিমাণ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মতবিরোধ আছে। তবে সহীহ্ বর্ণনা মতে পদার্থ জাতীয় নাপাকীর ক্ষেত্রে ওজন ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ এ ধরনের নাপাকী বড় এক দিরহাম পরিমাণ মাফ। আর নাপাকী যদি পদার্থ বিশিষ্ট না হয়, তবে তা পরিমাপ হিসাবে ধর্তব্য হবে। আর তা হল, হাতের তালুর সমপরিমাণ স্থান (তাবয়ীন, কাফী এবং অধিকাংশ ফাতাওয়ার কিতাব)। এক মিছকাল বিশ কীরাতের সমপরিমাণ। শামসুল আইম্মা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে তৎকালীন যুগের দিরহামের ওযন গ্রহণযোগ্য হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি সহীহ্ (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ গ্রন্থে নূরুল ঈযাহ্ নামক কিতাবের সূত্রে বর্ণিত)।

২. মাসআলা ঃ মানুষের শরীর হতে যে সব বস্তু বের হওয়ার কারণে উযূ বা গোসল ওয়াজিব হয় তাকে নাজাসাতে গলীযা (গুরু নাপাকী) বলে। যেমন পায়খানা, পেশাব, মনী, মযী, ওদী, পুঁজ, পিত্ত এবং মুখভরা বমি ইত্যাদি (আল বাহরুর রাইক)। অনুরূপভাবে হায়েয, নিফাস এবং ইস্তিহাযার রক্তও নাজাসাতে গলীযার অন্তর্ভুক্ত (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এমনিভাবে পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের প্রস্রাবও গুরু নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত। চাই তারা খানা খাক বা না খাক (এটাই শরহে মুখতারের পসন্দনীয় মত)। শরাব, প্রবাহিত রক্ত, মৃত জানোয়ারের গোশ্ত, যে সব জন্তুর গোশ্ত খাওয়া হালাল নয় এদের পেশাব, পায়খানা, গরুর লেদ ও গোবর, কুকুরের মল, মোরগ, হাঁস এবং জলচর পক্ষী ইত্যাদির পায়খানা নাজাসাতে গলীযার অন্তর্ভুক্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হিংস্র জানোয়ার, বিড়াল এবং ইঁদুরের পায়খানারও এই হুকুম (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বিড়াল ও ইঁদুরের পেশাব যদি কাপড়ে লাগে, তবে কোন কোন ফকীহ্-এর মতে এর পরিমাণ যদি এক দিরহামের চেয়ে অধিক হয়, তবে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। ইটাই যাহিরী রিওয়ায়েত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)। সাপের মল ও পায়খানা নাজাসাতে গলীযা। এমনিভাবে পানি-জোঁকের পায়খানাও নাপাক (তাতারখানিয়া)। হালামা কীট ও গিরগিটের প্রবাহিত রক্ত নাপাক (যহীরিয়া)। এ রক্ত যদি এক দিরহামের অধিক পরিমাণ কাপড়ে লাগে, তবে এ কাপড় পরে সালাত আদায় করা দুরুস্ত হবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ (২) নাজাসাতে খফীফা বা লঘু নাপাকী। এ নাপাকী কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ হলে মাফ (অধিকাংশ মতন (মূল ইবারত)-এর মধ্যে এ কথা বর্ণিত আছে)। এক-চতুর্থাংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কাপড়ের যে দিকে নাপাকী লাগবে, ঐদিকের হিসাব ধর্তব্য হবে। যেমন আঁচল, আস্তিন এবং কল্লি ইত্যাদি। উপরোক্ত হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন নাপাকী কাপড়ে লাগে। যদি নাপাকী শরীরে লাগে, তবে ঐ অঙ্গের চার ভাগের এক ভাগ ধর্তব্য হবে, যে অঙ্গে নাপাকী লেগেছে। যেমন হাত এবং পা ইত্যাদি। এ কথাটিকে তুহ্ফা, মুহীত, বাদাই', মুজ্তবা এবং আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ গ্রন্থ প্রণেতা সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। হাকাইক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (বাহ্রুর রাইক)। ঘোড়া এবং যে সব জানোয়ারের গোশ্ত হালাল এদের পেশাব এবং যে সব প্রাণীর গোশ্ত হালাল নয়, এদের মল নাজাসাতে খফীফা (লঘু নাপাকী) (কানয)।

৪. মাসআলা ঃ নাজাসাতে খফীফার হুকুম কাপড়ের মধ্যে ধর্তব্য হবে, কিন্তু শরীরের মধ্যে ধর্তব্য নয় (কাফী) শহীদের রক্ত যতক্ষণ শরীরের উপরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পাক। যখন শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তা নাপাক হয়ে যায়। প্রত্যেক বস্তুর পিত্ত তার পেশাবের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (যহীরিয়া) সূচের মাথার ন্যায় ঝরে পড়া পেশাবের ফোঁটা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মাফ। যদিও এমনি করে তা সমস্ত কাপড়ে লেগে যায় (তাবয়ীন)। অনুরূপভাবে সূচের বিপরীত দিকের পরিমাণ পেশাব ছিটিয়ে পড়লেও তা মাফ (কাফী ও তাবয়ীন)। পেশাবের ছিটা ধর্তব্য না হওয়ার এ বিধান কাপড় এবং শরীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এরূপভাবে যদি পেশাবের ছিটা পানিতে গিয়ে পড়ে, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে মাফ হবে না। কেননা, শরীর, কাপড় এবং জায়গার পবিত্রতার চেয়ে পানির পবিত্রতার প্রতি অধিক তাকীদ প্রদান করা হয়েছে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বড় সূচের অগ্রভাগের ন্যায় ঝরে পড়া প্রস্রাবের ফোঁটা কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড় পরে সালাত আদায় করা জাইয নয় (আল্ বাহ্রুর রাইক)। উপরোক্ত বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত আরো কতিপয় মাসাইল।

৫. মাসআলা ঃ সাপের চামড়া নাপাক। যদিও তা যবেহকৃত হোক না কেন। কেননা, তা দাবাগাত কবূল করে না (যহীরিয়া)। অবশ্য সাপের আইশ পাক (খুলাসা)। ঘুমন্ত ব্যক্তির লালা পাক, চাই তা মুখ থেকে নির্গত হোক বা পাকস্থলী হতে নির্গত হোক। এটা ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। এর উপরই ফাতওয়া। মৃত ব্যক্তির লালা সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, তা নাপাক (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। রেশমের পোকার পানি, এর চক্ষু এবং এর পায়খানা পাক (কিন্য়া)। যে পাখীর গোশ্ত হালাল আমাদের মাযহাবে এর পায়খানা পাক, যেমন কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি। (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বিশুদ্ধতম মতে গাধার দুধ পাক (তাবয়ীন ও মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (হিদায়া)। তবে পান করা দুরস্ত নয় (নিহায়া ও খুলাসা)। জানোয়ার যবেহ করার পর এর রগে যে রক্ত থেকে যায় এ যদি কাপড়ে লাগে, তবে এতে কাপড় নাপাক হবে না। যদিও তা পরিমাণে অধিক হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে গোশতের মধ্যে যে রক্ত থেকে যায়, তাও নাপাক নয়। কেননা, এ রক্ত প্রবাহিত রক্ত

নয় (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))। প্রবাহিত রক্ত যা গোশতের সাথে লেগে থাকে, তা নাপাক (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। কলিজা ও গুরদার রক্ত নাপাক নয় (খাযানাতুল মুফ্তিয়্যীন)।

৬. মাসআলা ঃ মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত পাক। যদিও তা পরিমাণে অধিক হয় (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মাছ এবং যে সমস্ত প্রাণী পানিতে বাস করে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এদের রক্ত দ্বারা কাপড় নাপাক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইঁদুরের মল যদি গমের স্তূপে পতিত হয় এবং গমের সাথে পিষা হয় অথবা ইঁদুরের মল যদি তৈলের পাত্রে পতিত হয়, তবে আটা এবং তৈলের স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এগুলো নাপাক হবে না। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, আমরা এ মতটিই গ্রহণ করি। আবূ হাফস (র)-এর "মাসাইল"-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, ইঁদুরের মল যদি শীরা বা সিরকার মধ্যে পতিত হয়, তবে এতে এগুলো নাপাক হবে না (মুহীত)। যদি নাপাক তৈল কাপড়ে এক দিরহামের কম পরিমাণ স্থানে লাগে, অতঃপর তা ছড়িয়ে এক দিরহামের বেশী স্থানে লেগে যায়, তবে কারো মতে এ অবস্থায় সালাত জাইয হবে না। অধিকাংশ ফকীহ্ এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। প্রকৃতভাবে এ মতটিই গ্রহণযোগ্য (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি নাপাক কাপড় পাক কাপড়ে মুড়িয়ে নেয়া হয় এবং নাপাকী তরল হয়, ফলে এর আর্দ্রতা পাক কাপড়ে প্রকাশ পায় কিন্তু এতে পাক কাপড়টি এমনভাবে আর্দ্র না হয় যে, নিংড়ালে তা থেকে পানি প্রবাহিত হয় বা ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ে, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে উক্ত কাপড়টি নাপাক হবে না। অনুরূপভাবে পাক কাপড় যদি নাপাক কাপড় বা নাপাক ভিজা যমীনের উপর বিছানো হয় এবং নাপাকী কাপড়ের মধ্যে ক্রিয়া করে কিন্তু এমনভাবে না ভিজে যে, নিংড়ালে তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ে, অবশ্য ভেজা স্থানটি চিনা যায়, তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ কাপড়টিও নাপাক হবে না।

৮. মাসআলা ঃ ভেজা পা যদি নাপাক যমীন বা নাপাক বিছানার উপর রাখা হয়, তবে এতে ঐ পা নাপাক হবে না। শুক্না পা যদি নাপাক ভেজা বিছানায় রাখা হয় এবং পা ভিজে যায়, তবে পা নাপাক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আর্দ্রতা প্রকাশ পাওয়া জরুরী নয়। এটাই পসন্দনীয় মত (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ, ফাতাওয়া গ্রন্থের সূত্রে)।

৯. মাসআলা ঃ গোবর মাটিতে মিশিয়ে যদি এর দ্বারা ঘরের ছাদ লেপা হয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, এরপর এর উপর যদি ভেজা রুমাল রাখা হয়, তবে তা নাপাক হবে না। শুকনা গোবর অথবা নাপাক মাটি যদি বাতাসে উড়ে কাপড়ে লাগে, তবে নাপাকীর চিহ্ন না দেখা যাওয়া পর্যন্ত তা নাপাক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বায়ু যদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভেজা কাপড়ে যেয়ে লাগে, তবে কাপড় হতে নাপাকীর গন্ধ পাওয়া গেলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। নাপাকীর ধোঁয়া কাপড়ে বা শরীরে লাগলে শুদ্ধ মতে শরীর ও কাপড় নাপাক হবে না (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। "ফাতাওয়ার" মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কোন গৃহে যদি মল জ্বালানো হয় এবং এর ধোঁয়া যদি শীশাতে যেয়ে লাগে, অতঃপর তা বিগলিত হয়ে এর পানি যদি কাপড়ে লাগে, তবে নাপাকীর চিহ্ন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তা নাপাক হবে না। এটাই সূক্ষ্ম

pdf By Syed Mostafa Sakib

জ্ঞানের দাবী। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল অনুরূপ ফাতওয়া দিতেন (ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যা)। এমনিভাবে গোশালা যদি প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় এবং এর ভেন্টিলেটারে যদি শীশা থাকে অথবা বেসিনে যদি শীশা থাকে আর তা গলে যায়, তাহলেও قياس خفى এর চাহিদা অনুসারে এর পানি কাপড়ে লাগার পর কাপড়ে নাপাকীর চিহ্ন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কাপড় নাপাক হবে না। অনুরূপভাবে গোসলখানাতে নাপাকী জ্বালানোর পর এর দেয়াল এবং ভেন্টিলেটার হতে যদি ফোঁটা ফোঁটা পানি বেরিয়ে আসে, তবে এরও এই হুকুম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ পানি দিয়ে ইস্তিনজা করে কাপড় দ্বারা না মুছে যদি কেউ বদ বায়ু ছাড়ে, তবে অধিকাংশ ফকীহ্র মতে উপরোক্ত স্থানের আশপাশের জায়গাসমূহ নাপাক হবে না। অনুরূপভাবে কেউ ইস্তিনজা করেনি বরং তার পায়জামা ঘাস বা পানি দ্বারা ভিজে গিয়েছে, এমতাবস্থায় তার থেকে যদি বায়ূ নির্গত হয়, তবু তার মলদ্বারের আশপাশের জায়গা নাপাক হবে না (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি যদি শীতের দিনে ভিজা শরীর নিয়ে বা ভিজা কোন বস্তু নিয়ে ঘোড়াশালায় যায়, যেখানে ঘোড়ার মল জ্বলছিল এবং এর তাপে তার ভিজা শরীর বা বস্তু শুকিয়ে যায়, তবে শরীর বা ঐ বস্তু নাপাক হবে না। কিন্তু এতে যদি নাপাকীর চিহ্ন প্রকাশ পায়, তবে নাপাক হয়ে যাবে। যেমন শুকাবার পর শরীরে বা ঐ বস্তুতে হলুদ বর্ণ দেখা গেল (যখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন বিছানায় ঘুমায় যার উপর বীর্য লেগে শুকিয়ে গিয়েছে, অতঃপর তার শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে বিছানা ভিজে যায়, তবে বিছানার আর্দ্রতার চিহ্ন তার শরীরে প্রকাশ না হলে শরীর নাপাক হবে না। আর যদি ঘাম বেশী হওয়ার কারণে বিছানার আর্দ্রতার চিহ্ন তার শরীরে প্রকাশ পায়, তবে শরীর নাপাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। গাধা যদি পানিতে পেশাব করে এবং এর কিছু ছিটা কোন মানুষের কাপড়ে লাগে, তবে এ কাপড় দিয়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ নয়। যদিও তা পরিমাণে বেশী হয়। কিন্তু যদি দৃঢ় আস্থা হয় যে, এ প্রস্রাবই, তবে ঐ কাপড়ে সালাত সহীহ্ হবে না। এমনিভাবে পানিতে যদি ময়লা নিক্ষেপ করা হয় এবং এর কিছু ছিটা কারো কাপড়ে যেয়ে লাগে, তবে কাপড়ে ময়লার চিহ্ন প্রকাশ হলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। চাই পানি প্রবাহিত হোক বা বদ্ধ হোক। ফকীহ্ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, ঘোড়ার পায়ে যদি নাপাকী থাকে এবং পানিতে চলার সময় নাপাকীর ছিটা যদি আরোহীর কাপড়ে লাগে, তবে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। পানি প্রবাহিত হোক বা বদ্ধ হোক। তবে নিম্নোক্ত বিধানের প্রেক্ষিতে "ইয়াকীন সন্দেহের দ্বারা বিনষ্ট হয় না।" প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধতম (ইবরাহীম হালবী প্রণীত শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

১২. মাসআলা ঃ পায়খানার মাছি যদি কারো কাপড়ে বসে, তবে কাপড় নাপাক হবে না। কিন্তু অধিক হলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কারো পায়ে যদি কাদা লাগে বা কেউ যদি কাদা মাটিতে হাঁটে এবং পা ধৌত না করে সালাত আদায় করে, তবে এতে নাপাকীর কোন চিহ্ন না থাকলে সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। তবে পা ধুয়ে নেয়ার মাঝেই সতর্কতা নিহিত আছে (ফাতাওয়ায়ে কুরাখানী ঃ আল্ ওয়াকিয়াতুল হুস্সামিয়্যার সূত্রে বর্ণিত)। পাক মাটিতে

নাপাক পানি ঢেলে বা নাপাক মাটিতে পাক পানি ঢেলে তাকে যদি কাদা মাটি বানানো হয়, তবে সহীহ্ মতে এ কাদা মাটি নাপাক বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন (খুলাসা)। নাপাক ভুষি যদি কাঁদা মাটিতে ফেলা হয় এবং ভুষি কাদা মাটিতে বিদ্যমান দেখা যায়, তবে ভুষির পরিমাণ অনেক হলে নাপাক হয়ে যাবে। আর অনেক না হলে নাপাক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অবশ্য শুকিয়ে যাওয়ার পর পাক বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ কুকুর যদি কারো অঙ্গ বা কাপড়ে কামড় দেয়, তবে এতে আর্দ্রতার চিহ্ন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত শরীর এবং কাপড় নাপাক হবে না। কুকুর চাই খুশীর অবস্থায় থাকুক বা রাগান্বিত অবস্থায় থাকুক (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। (সায়রাফিয়্যার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এটাই পসন্দনীয় মত এবং ইব্রাহীম হালবী (র) প্রণীত শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। কুকুর যদি মসজিদের চাটাইয়ের উপর ঘুমায় এবং কুকুর যদি শুকনা থাকে, তবে চাটাই নাপাক হবে না। আর যদি শরীরের মধ্যে আর্দ্রতা থাকে এবং নাপাকীর কোন চিহ্ন চাটাইয়ের উপর প্রকাশিত না হয়, তাহলেও চাটাই নাপাক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ হাতীর হাড় পাক। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত)। হাতীর লালা চিতা এবং বাঘের লালার ন্যায় নাপাক। যদি হাতীর শুঁড় দিয়ে লালা নির্গত হয়ে কোন কাপড়ে লাগে, তবে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। প্রত্যেক জানোয়ারের পুনঃচর্বিত বস্তু তার পায়খানার ন্যায় (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। উট ও বকরীর মলের মধ্যে যদি গম পাওয়া যায়, তবে তা ধুয়ে ভক্ষণ করা জাইয আছে। তবে গরুর মলের মধ্যে যদি গম পাওয়া যায়, তাহলে তা খাওয়া জাইয নয়। কেননা, গোবর শক্ত নয় (যহীরিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ রুটির মধ্যে যদি ইঁদুরের লেদি পাওয়া যায়, তবে লেদি শক্ত হলে তা ফেলে দিয়ে রুটি খাওয়া জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। দুগ্ধ দোহন করার সময় যদি দুধের পাত্রে লেদি পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ফেলে দেয়া হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। লেদি যদি দুধের মধ্যে ভেঙ্গে যায়, তবে দুধ নাপাক হয়ে যাবে। তা আর পাক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কুকুরের পশম দিয়ে যদি পাজামার নেয়ার তৈরী করা হয় তবে এতে কোন দোষ নেই (খুলাসা)। বকরীর প্রস্রাব যদি মানুষের পেশাবের সাথে মিশে যায়, তবে নাজাসাতে গলীযা নাজাসাতে খফীফায় পরিণত হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিনজার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ পাক-পবিত্র পাথর জাতীয় বস্তু দ্বারা ইসতিন্জা করা জাইয। যেমন ঢিলা, মাটি, কাঠের টুকরা, নেকড়া, চামড়ার টুকরা এবং এর মত বস্তু দ্বারা ইস্তিন্জা করা জাইয। সহীহ্ বর্ণনা মতে নির্গত বস্তু স্বাভাবিক বস্তু এবং অস্বাভাবিক বস্তু হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে যদি রক্ত, বা পুঁজ বের হয়, তবে তাও পাথর দ্বারা পবিত্র হবে। অনুরূপভাবে মল দ্বারে যদি অন্য স্থান হতে নাপাক এসে লাগে, তবে পাথর জাতীয় বস্তু দ্বারা ইস্তিন্জা করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ পাথর বা মাটির ঢিলার দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করার মাসনূন তরীকা এই যে, বাম পায়ের উপর ভর করে কিবলার দিক হতে এবং বাতাস ও চন্দ্র-সূর্যের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বসবে। সাথে তিনটি পাথর নিয়ে যাবে। প্রথমটি সামনের দিক হতে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে, দ্বিতীয়টি পেছনের দিক হতে সামনের দিকে আনবে এবং তৃতীয়টি পুনরায় সামনের দিক হতে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, গরমের দিনে এরূপ করবে। শীতের দিনে প্রথমটি সামনের দিকে, দ্বিতীয়টি পেছনের দিকে এবং তৃতীয়টি পুনরায় সামনের দিকে টেনে আনবে। পুরুষ লোকেরা শীতের সময় যেরূপ করে মহিলাগণ সর্বদা এরূপ করবে। উলামায়ে মুতাআখ্‌খিরীনের মতে ঢিলা বা পাথর দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করার পর সামান্য নাপাকী যদি থেকে যায়, তবে এর হুকুম ঘামের হুকুমের অনুরূপ হবে। সুতরাং মল দ্বার হতে ঘাম নির্গত হয়ে যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তবে এতে শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না। তবে সে যদি অল্প পানিতে বসে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে (তাবয়ীন)। এটাই সহীহ্ (যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ ইস্‌তিনজার মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত নয় (তাবয়ীন)। তবে যথাযথভাবে পরিষ্কার করা শর্ত। সুতরাং যদি এক ঢিলা দ্বারা পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়, তবে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে এবং তিন ঢিলা দ্বারাও যদি পরিচ্ছন্নতা হাসিল না হয়, তবে সুন্নাত আদায় হবে ন (মুযমারাত)। মুস্তাহাব হল, পাক ঢিলা ডান দিকে রাখা, ইস্‌তিঞ্জায় ব্যবহৃত ঢিলা বাম দিকে রাখা এবং নাপাকীর দিক নীচের দিকে রাখা (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌-হাজ)। সতর খোলা ব্যতিরেকে সম্ভব হলে পানি দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করাই উত্তম। যদি সতর খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে ঢিলা দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করবে, পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তবে উত্তম হল, ঢিলা ও পানি উভয়ই ব্যবহার করা (তাবয়ীন)। কেউ কেউ বলেন, আমাদের যুগে এটাই সুন্নাত। কারো কারো মতে সর্বাবস্থায় হুকুম এই। এটাই সহীহ্ মত। এর উপরই ফাতওয়া (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। ঢিলা বা পাথর দ্বারা ইস্‌তিনজা করা ঐ সময়ই জাইয, যখন নাপাকী শুধু মলদ্বারেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৪. মাসআলা ঃ নাপাকী যদি পায়খানার স্থানচ্যুত হয়ে চতুর্দিকে লেগে যায়, তবে সমস্ত ফকীহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, নাপাকী যদি পায়খানার স্থান হতে এক দিরহামের অধিক পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে, তবে পানি দ্বারা ধৌত করা ফরয। শুধু পাথর বা ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করলে দুরুস্ত হবে না। অনুরূপভাবে প্রস্রাব যদি লিঙ্গের অগ্রভাগের চতুষ্পার্শে এক দিরহামের অধিক পরিমাণ স্থানে লেগে যায়, তাহলে তাও ধৌত করা ফরয। যদি নাপাকী মলদ্বারচ্যুত হয়ে এক দিরহামের কম পরিমাণ স্থানে লাগে বা এক দিরহাম পরিমাণ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, অবশ্য এর সাথে মলদ্বার যোগ করলে এক দিরহামের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তা পানি দ্বারা ধৌত না করে পাথর বা ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করা জাইয। এ পদ্ধতি অবলম্বন করা মাকরূহ্ নয় (যখীরা)। এটাই সহীহ্ (যাদ)।

৫. মাসআলা ঃ নাপাকী যদি পায়খানার স্থানচ্যুত হয়, অতঃপর ঢিলা ব্যবহার করা হয় এবং পানি দ্বারা মলদ্বার ধৌত না করা হয়, তবে শরহে তাহ্‌বীতে উল্লেখ আছে যে, এ সম্পর্কে মতভেদ

আছে। কেউ কেউ বলেন, যদি তিন ঢিলা দ্বারা মলদ্বার মাসেহ্ করে যথাযথভাবে পরিষ্কার করা হয়, তবে দুরুস্ত আছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এ মতই ব্যক্ত করেছেন (মুহীত)। এটাই পসন্দনীয় মত (সিরাজিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ নাপাকী যদি লিঙ্গের কোন এক পার্শ্বে লাগে এবং তা এক দিরহামের কম পরিমাণ হয় আর অনুরূপভাবে অন্য স্থানেও এক দিরহামের কম পরিমাণ স্থানে নাপাকী লাগে, তবে যদি উভয় স্থান একত্র করলে এক দিরহামের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে উভয় স্থানের নাপাকী একত্রিত করা হবে (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (আত্‌তাজ্‌নীস)। যদি কারো মলদ্বার প্রশস্ত হয় এবং এতে নাপাকী এক দিরহামের পরিমাণের চেয়ে বেশী লাগে, কিন্তু মলদ্বার অতিক্রম না করে তবে এ বিষয়ে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। আবূ শুজা এবং ইমাম তাহাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের মানুষের জন্য ঢিলা দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করাই যথেষ্ট। এ মতটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমরা এ মতটিই গ্রহণ করি (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ প্রস্রাবের ইস্‌তিনজা করার তরীকা হল এই যে, লিঙ্গ বাম হাত দিয়ে ধরবে, অতঃপর তা দেয়ালের উপর বা পাথরের উপর বা ঢিলার উপর যা মাটি হতে উঁচু চাপ দিবে। ঢিলা বা পাথর ডান হাতে নিবে না এবং লিঙ্গও ডান হাত দিয়ে ধরবে না। অনুরূপভাবে ঢিলাও বাম হাত দিয়ে ধরবে না। অপারগ হলে ঢিলা উভয় পায়ের মাঝে রেখে লিঙ্গ ডান হাত দ্বারা ধরে ঢিলার উপর রগড়াবে। যদি এরূপ করা অসম্ভব হয়, তবে ঢিলা ডান হাতে ধরবে এবং নাড়াচাড়া করবে না (যাহিদী)। প্রস্রাবের স্থান যথাযথভাবে পবিত্র করা ওয়াজিব যে পর্যন্ত না মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, পেশাব আর বের হবে না (যহীরিয়্যা)। কেউ কেউ বলেন, কয়েক কদম হেঁটে ইস্‌তিন্‌জা করবে। কারো কারো মতে, ইস্‌তিন্‌জার সময় পা মাটির উপর মারবে, গলা খাকার দিবে, ডান পা দ্বারা বাম পায়ের উপর চাপ দিবে এবং উঁচু স্থান হতে নীচু স্থানে অবতরণ করবে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এই যে, মানুষের অভ্যাস বিভিন্ন ধরনের সুতরাং যার মনে যখন নিশ্চিত বিশ্বাস হবে যে, মূত্রনালীতে যে নাপাকী ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে আসছে, তখন সে ইস্‌তিন্‌জা করবে (ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ প্রণীত শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ও মুযমারাত)। এ অবস্থায় শয়তান যদি কারো অন্তরে বারবার কুমন্ত্রণা দেয়, তবে এদিকে লক্ষ্য করবে না। যেমন সালাত আদায়কালে শয়তানের এ ধরনের কুমন্ত্রণার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। প্রস্রাবের স্থানে পানি ছিটিয়ে দিবে। এরপর যদি প্রস্রাবের স্থানের উপর কাপড়ে কোন আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করবে যে, এ আর্দ্রতা ছিটানো পানিরই আর্দ্রতা (যহীরিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ পানি দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করার পদ্ধতি হল এই যে, রোযাদার না হলে গুহ্যদ্বার খুব ঢিলা করে বসবে এবং বাম হাত দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করবে। ইস্‌তিন্‌জার শুরুতে মধ্যমা আঙ্গুলি অন্যান্য আঙ্গুলির তুলনায় কিছুটা উঁচু করে পায়খানার স্থান ধৌত করবে। এরপর অনামিকা আঙ্গুল উঠিয়ে মলদ্বার ধৌত করবে। অতঃপর কনিষ্ঠ অঙ্গুলি এবং পরে তর্জনী আঙ্গুলি উঁচিয়ে মলদ্বার এ পরিমাণ ধৌত করবে যতক্ষণ না মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকীন হয় যে, পবিত্র হয়ে গিয়েছে। ধৌত করার সময় খুব বেশী রগড়াবে। তবে রোযাদার হলে বেশী রগড়াবে না। ধৌত করার ক্ষেত্রে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। তবে কোন ব্যক্তি যদি সন্দেহ-প্রবণ হয়, তবে সে তিনবার ধৌত করবে (তাবয়ীন)। ইসতিন্‌জার মধ্যে এক সাথে তিন অঙ্গুলের অধিক ব্যবহার করবে না। অঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে ইসতিন্‌জা না করে প্রস্থের দিক লাগিয়ে ইসতিন্‌জা করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী (র)। পানি আস্তে আস্তে ঢালবে, জোরে মারবে না (মুযমারাত)। এবং মলদ্বারে আস্তে আস্তে ঢালবে। অধিকাংশ ফকীহ্ বলেছেন, অঙ্গুল না উচিয়ে হাতের তালু দ্বারা ধৌত করাই যথেষ্ট। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে, মহিলাগণ প্রশস্ততার সাথে বসবে এবং হাতের তালুর উপরিভাগ দ্বারা মলদ্বার ধৌত করবে। অঙ্গুলি ভেতরে প্রবেশ করাবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এটাই পসন্দনীয় মত (তাতারখানিয়্যা ঃ সায়রাফিয়্যার সূত্রে বর্ণিত)। মহিলাগণ পুরুষের তুলনায় অধিক ছড়িয়ে প্রশস্ততার সাথে বসবে (মুযমারাত)। "হুজ্জাত" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মহিলাগণ পায়খানার স্থান ধৌত করবে এবং পরে প্রস্রাবদ্বার ধৌত করবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তারা প্রথমে প্রস্রাবদ্বার ধৌত করবে (তাতারখানিয়্যা)। গযনবী (র) তাদের পথই অবলম্বন করেছেন। এ মতটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ কর্তৃক প্রণীত শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। পায়খানার স্থান পাক হওয়ার সাথে সাথে হাতও পাক হয়ে যাবে (সিরাজিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ ইসতিন্‌জার পূর্বে যেমন হাত ধোয়া হয়, অনুরূপভাবে ইসতিন্‌জার পরও হাত ধৌত করে নিবে। এতে খুব ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসতিন্‌জার পর হাত ধৌত করেছেন এবং দেয়ালে হাত রগড়িয়েছেন (তাজ্‌নীস)। গরমের দিনে যেরূপ উত্তমভাবে ইসতিন্‌জা করবে, শীতের দিনে এর চেয়েও উত্তমরূপে ইসতিন্‌জা করবে, তবেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা হাসিল হবে। উপরোক্ত হুকুম ঐ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যদি পানি ঠাণ্ডা হয়। পানি যদি গরম হয় যেমন কেউ শীতের দিনে ব্যবহার করে থাকে, তবে গরম পানি ব্যবহারকারীর ছওয়াব ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারকারীর তুলনায় কম হবে (মুযমারাত)।

১০. মাসআলা ঃ ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলার পেশাব-পায়খানা ছাড়াও প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে ইসতিন্‌জা করা ওয়াজিব (সিরাজিয়্যা)। যদি কারো বাম হাত বাত রোগে অবশ হয়ে যায় এবং সে বাম হাত দ্বারা ইসতিন্‌জা করতে সক্ষম না হয়, তবে পানি ঢেলে দেয়ার মত কোন লোক না পেলে পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা করবে না। যদি প্রবাহিত পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা করতে সক্ষম হয়, তবে সে ডান হাত দ্বারা ইসতিন্‌জা করবে (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ অসুস্থ ব্যক্তির যদি স্ত্রী বা দাসী না থাকে এবং তার পুত্র বা ভাই থাকে এবং সে নিজে উযূ করতে না পারে, তবে তার পুত্র বা ভাই তাকে উযূ করিয়ে দিবে। কিন্তু ইসতিন্‌জা করাবে না। কেননা, তার লিঙ্গ স্পর্শ করা তাদের জন্য জাইয নেই। এমতাবস্থায় ইসতিন্‌জা করার হুকুম তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (মুহীত)। অসুস্থ মহিলার যদি স্বামী না থাকে এবং সে উযূ করতে অপারগ হয় এবং তার মেয়ে বা বোন থাকে, তবে তারা তাকে উযূ করিয়ে দিবে। কিন্তু ইসতিন্‌জা করার হুকুম তার থেকেও রহিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ ইসতিন্‌জা করার সময় কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসা

মাকরূহ্। যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কিবলার দিকে মুখ করে ইসতিন্‌জা করতে বসে, তবে মুস্তাহাব হল, যথা সম্ভব কিবলার দিক হতে সরে বসা (তাবয়ীন)। আমাদের মাযহাবে বন-জঙ্গল এবং তৈরীকৃত পায়খানার মধ্যে এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই (শরহে বেকায়া)। মহিলাদের জন্য নিজ সন্তানদেরকে পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিবলার দিকে মুখ করিয়ে বসানো মাকরূহ্ (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ হাড্ডি, লাদা, গোবর, খাদ্য, গোশ্ত, কাঁচ, মৃতপাত্রের কুচা, গাছের পাতা এবং চুল দ্বারা ইসতিন্‌জা করা মাকরূহ্। অনুরূপভাবে ডান হাতে ইসতিন্‌জা করাও মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। নাপাক বস্তু দ্বারা ইসতিন্‌জা করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে পাথর বা ঢিলা নিজে বা অন্য কেউ ইসতিন্‌জায় একবার ব্যবহার করেছে পুনরায় তা ব্যবহার করা। কিন্তু কোন পাথর বা ঢিলা যদি কয়েক কোণ বিশিষ্ট হয়, তবে এরূপ পাথরের এক এক কোণ দ্বারা এক এক বার ইসতিন্‌জা করা জাইয। এতে মাকরূহ্ হবে না (মুহীত)। কাগজের মধ্যে কোন লিখা না থাকলেও কাগজ দ্বারা ইসতিন্‌জা করবে না (মুযমারাত)। পাকা ইট, কয়লা এবং মূল্যবান বস্তু যেমন রেশমী কাপড়ের নেকড়া ইত্যাদি বস্তু দ্বারা ইসতিন্‌জা করা মাকরূহ্ (যাহিদী)।

১৪. মাসআলা ঃ ইসতিন্‌জা পাঁচ প্রকার। এর মধ্যে দুই প্রকার ওয়াজিব। প্রথম প্রকার জানাবাত এবং হায়েয-নিফাসের গোসলের সময় নাজাসাত নির্গত হওয়ার স্থান ধৌত করা। যেন নাজাসাত গোটা শরীরে ছড়িয়ে না পড়ে। দ্বিতীয় প্রকার নাপাকী যদি মলদ্বার অতিক্রম করে ছড়িয়ে যায়, চাই তা কম হোক বা বেশী হোক, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা ধৌত করা ওয়াজিব। এর মাঝেই সতর্কতা নিহিত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে নাপাকী যদি মলদ্বার হতে এক দিরহামের সমপরিমাণ স্থান অতিক্রম করে, তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব। কেননা, মলদ্বারে যে পরিমাণ নাপাকী থাকে, তা ধর্তব্য নয়। কেননা, এ নাপাকী কোন বস্তু দ্বারা মুছে নেয়া সম্ভব। ধর্তব্য তো ঐ নাপাকী, যা মলদ্বারের বাইরে আছে। তৃতীয় প্রকার ইসতিন্‌জা হল সুন্নাত। তা ঐ সময় যদি নাপাকী মলদ্বার অতিক্রম না করে। চতুর্থ প্রকার ইস-তিন্‌জা হল মুস্তাহাব, তা হল পায়খানা না করে শুধু প্রস্রাব করা অবস্থায় প্রস্রাবের স্থান ধৌত করা। পঞ্চম প্রকার ইসতিন্‌জা হল বিদআত, আর তা হল, বায়ু নির্গত হওয়ার পর ইসতিন্‌জা করা (আল-ইখ্‌তিয়ার ফী শরহিল মুখতার)।

১৫. মাসআলা ঃ পায়খানায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে মুস্তাহাব হল, যে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা হয় ঐ কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় পরে পায়খানায় যাওয়া। অন্যথায় নিজের কাপড় নাপাকী ও ব্যবহৃত পানি থেকে রক্ষা করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করবে। মাথা ঢেকে পায়খানায় যাওয়া।

১৬. মাসআলা ঃ আল্লাহ্‌র নাম বা কুরআন শরীফের আয়াত লিখা আংটি পরিধান করে পায়খানায় প্রবেশ করা মাকরূহ (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। পায়খানায় প্রবেশের সময় اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث (হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও নারী জিনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে দিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রবেশ করবে এবং বের হবার সময় ডান পা অগ্রে দিয়ে বের হবে (তাবয়ীন)। দাঁড়ানো অবস্থায় কাপড় খুলবে না। উভয় পা প্রশস্ত করে বসবে এবং বাম পায়ের উপর একটু ঝুঁকে বসবে। পায়খানার অবস্থায় কোন কথা বলবে না, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে না, হাঁচির জবাব দিবে না, সালামের জবাব দিবে না এবং আযানেরও জবাব দিবে না। নিজে হাঁচি দিলে মনে মনে আলহামদু লিল্লাহ্‌ বলবে। জিহবা নাড়বে না। আবশ্যক ব্যতিরেকে নিজের সতরের প্রতি তাকাবে না, প্রস্রাব-পায়খানার প্রতি নজর করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, গলা খাকার দিবে না, এদিক-ওদিক বেশী তাকাবে না, নিজের শরীরের সাথে খেলা-তামাশা করবে না, আকাশের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলন করবে না এবং প্রস্রাব-পায়খানায় অযথা বেশী দেরী করবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলবে— الحمد لله الذى اخرج عنى مايؤذينى وابقى ما ينفعنى —(সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি কষ্টদায়ক বস্তু আমার থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং উপকারী বস্তুসমূহ আমার মধ্যে বাকী রেখেছেন (তাবয়ীন))।

১৭. মাসআলা ঃ পানি প্রবাহিত হোক অথবা বদ্ধ হোক, পানিতে পেশাব করা মাকরূহ্‌। নহর, কূপ, হাউয ও প্রস্রবণের পার্শ্বে, ফলবান গাছের নীচে, শস্য ক্ষেতে এবং ছায়ার নীচে যেখানে বসে মানুষ আরাম করে এ ধরনের স্থানে পায়খানা করা মাকরূহ্‌। মসজিদ ও ঈদগাহের পাশে, কবরস্তানে, চতুষ্পদ জানোয়ারের মধ্যে এবং মুসলমানদের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ্‌। নীচু জায়গায় বসে উঁচু জায়গার দিকে পেশাব করা মাকরূহ্‌। অনুরূপভাবে ইঁদুর, সাপ এবং পিপীলিকার গর্তে এবং যে কোন গর্তে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ্‌। ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে, শুয়ে এবং উলঙ্গ অবস্থায় পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ্‌। যদি ওযর থাকে, তবে কোন ক্ষতি নেই।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ পেশাব করার ইচ্ছা করে এবং মাটি খুব শক্ত থাকে, তবে পাথর দ্বারা আঘাত করে মাটি নরম করে নিবে অথবা গর্ত খুঁড়ে নিবে যেন পেশাবের ছিটা-ফোঁটা তার শরীরে এসে না লাগে। পেশাব করে একই স্থানেই উযূ-গোসল করা মাকরূহ্‌ (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

كتاب الصلاة

অধ্যায় ঃ সালাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ সালাত

[এই অধ্যায়ে বাইশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

১. মাসআলা ঃ নামায পড়া সুনিশ্চিত ফরয ঃ নামায তরক করার আদৌ কোন অবকাশ নেই। সালাতের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির (খুলাসা)। যে ব্যক্তি সালাতের ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করে না বরং স্বীকার করে, এর পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত তরক করে, তাকে হত্যা করার হুকুম দেয়া যাবে না। বরং তাকে বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে (ইবনুল মালিক প্রণীত শরহে মাজমাইল বাহ্রায়ন)। সালাতের আখিরী ওয়াক্ত ও যে ওয়াক্তের মধ্যে তাহ্‌রীমা বাঁধা যায় এ পরিমাণ সময়ের সাথে সালাতের ফরযিয়্যাতের সম্পর্ক। সুতরাং কাফির মুসলমান হওয়ার পর, নাবালিগ বালিগ হওয়ার পর, পাগল সুস্থ হওয়ার পর এবং ঋতুবতী মহিলা হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর যদি তাহরীমা বাঁধার সমপরিমাণ সময় পায়, তাহলে আমাদের মাযহাবে এ ধরনের লোকদের উপর সালাত আদায় করা ফরয (মুযমারাত)। যদি উপরোক্ত কারণসমূহ সালাতের শেষ মুহূর্তে পাওয়া যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এ সময়ের সালাত আদায় করা আর ফরয হবে না (মুখতারুল ফাতওয়া)।

২. মাসআলা ঃ বাচ্চা প্রসবকারিণী দাই সালাত আদায়ে মশগুল হলে যদি বাচ্চা মরে যাবার আশংকা থাকে, তবে তার জন্য বিলম্বে সালাত আদায় করা জাইয আছে। চোরের ভয় বা এ ধরনের কোন কারণেও সালাত বিলম্বে আদায় করা জাইয (খুলাসা ঃ ওয়াক্ত অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম পরিচ্ছেদ সালাতের ওয়াক্ত ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসাইল

[এই পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ হয়। সুবহে সাদিক হল, ঐ বিস্তৃত শুভ্ররেখা, যা পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। সুবহে কাযিব ধর্তব্য নয়। সুবহে কাযিব ঐ শুভ্রতা, যা (উর্ধ্ব–অধঃ ভাবে) লম্বা হয়ে পূর্বাকাশে প্রকাশিত হয়। পরে আবার অন্ধকার ছেয়ে যায়। সুবহে কাযিব হতে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না এবং সিয়াম পালনকারীর জন্য খানা–পিনাও হারাম হয় না (কাফী)। সুবহে সাদিক উদিত হতেই ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না তা উদিত হওয়ার পর ভালভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়, এ নিয়ে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে (মুহীত)। দ্বিতীয় মতটি ব্যাপক। তাই অধিকাংশ আলিম এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (মুখতারুল ফাতাওয়া)। সওম এবং ঈশার সালাতের ক্ষেত্রে প্রথমটি গ্রহণ করা এবং ফজরের সালাতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করাই উত্তম (শরহে নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)।

২. মাসআলা ঃ যুহরের ওয়াক্ত, ঠিক দ্বিপ্রহরের পর সূর্য সামান্য হেলে যাওয়ার পর হতে আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার (দ্বিপ্রহরের) মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত বাকী থাকে (কাফী)। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী)। زوال তথা সূর্য হেলে যাওয়ার নিদর্শন হল এই যে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পূর্ব দিকে বাড়তে থাকা (কাফী)। সূর্য হেলে যাওয়া এবং فيئ الزوال অর্থাৎ মূল ছায়া নিরূপণের পদ্ধতি হল এই যে, সোজা একটি কাঠি একটি সমতল ভূমিতে গড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া কমতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য কেবল উঠতে থাকবে। যখন ছায়া বাড়তে থাকবে, তখন মনে করতে হবে যে, সূর্য হেলতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এ সময় কাঠির ছায়া যে পরিমাণ থাকবে এর মাথায় একটি রেখা টেনে দিবে। এ রেখা হতে কাঠি পর্যন্ত যে ছায়া হবে তাই হল আসল ছায়া। ছায়া বেড়ে যখন কাঠির মূল ছায়া ব্যতীত এর দ্বিগুণ ছায়ার পরিমাণ হবে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত খতম হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আসল ছায়া নিরূপণের এটাই সহীহ প্রক্রিয়া (যহীরিয়্যা)। হানাফী ফকীহগণ বলেন, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত একগুণ পরিমাণ হওয়ার পূর্বে যুহরের সালাত আদায় করা এবং দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করা উত্তম। তাহলে উভয় সালাতই নিজ নিজ সময়ের ভেতর নিশ্চিতভাবে আদায় হবে।

৩. মাসআলা ঃ মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং তা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী থাকে (শরহুল মাজমা')।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ সূর্যাস্তের পর হতে মাগরিবের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং পশ্চিমাকাশের শুফুক অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তা বাকী থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা প্রকাশিত হয়, তাই শুফুক। এর উপরই ফাতওয়া (শরহে বেকায়া)। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা প্রকাশিত হয় তারপর যে সাদা আভা দেখা যায়, তাই শুফুক (কুদূরী)। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মত সমস্ত মানুষের জন্য সহজবোধ্য। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মত সতর্কতাপূর্ণ। কেননা, সালাতের ক্ষেত্রে মূল বিধান হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে নিশ্চিত ইয়াকীন রয়েছে এর দ্বারাই সালাতের রুকন এবং শর্ত প্রমাণিত হতে পারে (নিহায়া ঃ আসরার এবং শায়খুল ইসলাম (র)–এর মাবসূত–এর সূত্রে বর্ণিত)।

৫. মাসআলা ঃ পশ্চিম আকাশের সাদা আলো বিলীন হওয়ার পর ঈশা ও বিতরের সালাতের ওয়াক্ত হয় এবং তা সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বাকী থাকে (কাফী)। বিতরের সালাত 'ঈশার পূর্বে আদায় করবে না। কেননা, ঈশা ও বিতরের মধ্যে তরতীব ওয়াজিব। সালাতের ওয়াক্ত হয়নি, এ কারণে নয়। যদি কেউ ভুলবশত ঈশার পূর্বে বিতর আদায় করে অথবা ঈশা ও বিতর আদায় করার পর দেখা গেল যে, শুধু ঈশার সালাত সহীহ্ হয়নি, তবে বিতর সহীহ্ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে শুধু বিতর পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, এ ধরনের ওযরের কারণে তরতীব বাতিল হয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি ঈশা ও বিতরের সময় না পায় যেমন সে এমন দেশে বাস করে, যেখানে সাদা আভা অস্ত যাওয়া মাত্রই বা অস্ত যাওয়ার পূর্বেই ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তবে এ ধরনের লোকদের উপর ঈশা ও বিতর ফরয নয় (তাবয়ীন)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্তের ফযীলতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ফজরের সালাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে এত বেশী বিলম্ব করবে না, যেন সূর্যোদয়ের আশংকা হয়। বরং এমন পরিমাণ আলো প্রকাশিত হলে ফজর আদায় করবে, যেন সালাত ফাসিদ হওয়া প্রকাশিত হলে মুস্তাহাব কিরাআতের সাথে তা পুনরায় আদায় করা সম্ভব হয় (তাবয়ীন)। এ হুকুম সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে যিলহাজ্জের দশ তারিখ মুযদালিফায় ফজরের সালাতের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, সেদিন ফজরের সালাত গলস তথা অন্ধকারে আদায় করা উত্তম (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ গরমের দিনে যুহরের সালাত বিলম্বে আদায় করা এবং শীতের দিনে বিলম্ব না করে আদায় করা মুস্তাহাব (কাফী)। সালাত একা আদায় করা হোক বা জামা'আতের সাথে আদায় করা হোক, সময়ের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই (শরহুল মাজমা' ঃ ইবনুল মালিক)। সব সময়ই আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব, যতক্ষণ না সূর্যের রং বিবর্ণ হয়। সূর্যের গোলকের পরিবর্তনই মূলতঃ ধর্তব্য। আলো বিবর্ণ হওয়া ধর্তব্য নয়। যখন সূর্যের গোলক এমন হয়ে যায় যে, এর প্রতি নজর করলে চোখ ধাঁধিয়ে না যায়, তখন মনে করতে হবে যে, সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। এমন না হলে মনে করতে হবে যে, সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন হয়নি

(কাফী)। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। সূর্যের পরিবর্তনের পর্বে কেউ যদি সালাত আরম্ভ করে এবং সালাত দীর্ঘায়িত হয়ে পরিবর্তনের মধ্যে গিয়ে তা পতিত হয়, তবে এতে সালাত মাকরূহ্ হবে না (আল-বাহ্রুর রাইক ঃ গায়াতুল বয়ানের সূত্রে)।

৩. মাসআলা ঃ মাগরিবের সালাত বিলম্ব না করে আদায় করা সব সময়ই মুস্তাহাব (কাফী)। অনুরূপভাবে ঈশার সালাত রাত্রের তিন ভাগের একভাগ পরিমাণ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা মুস্তাহাব। শেষ রাত্রে সজাগ হওয়ার ব্যাপারে যার আস্থা আছে, তার জন্য বিতরের সালাত শেষ রাত্রে বিলম্ব করে আদায় করা মুস্তাহাব। শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে যার আস্থা নেই, সে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই বিতর পড়ে নিবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ বৃষ্টি-বাদলের দিনে ফজরের সালাত আলো প্রকাশ পেলে আদায় করবে, যেমন মেঘ ছাড়া অন্যান্য দিনে আদায় করা হয়। মেঘের দিনে যুহরে সালাত বিলম্বে আদায় করবে যেন সূর্য হেলার পূর্বে সালাত না আদায় হয়। এরূপ দিনে আসরের সালাত বিলম্ব না করে জলদি আদায় করবে যেন মাকরূহ্ ওয়াক্তে সালাত আদায় না হয়ে যায় এবং মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করবে যেন সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় না হয়ে যায়। আর ঈশার সালাত বিলম্ব না করে আদায় করবে যেন বৃষ্টি বা কুয়াশা জামাআত কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায় (মুহীতঃ ইমাম সুরুখ্সী (র)। এ হুকুম সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

৫. মাসআলা ঃ দুই ওয়াক্তের সালাত এক ওয়াক্তের মধ্যে কোন ওযরের কারণেও একত্রে আদায় করা যাবে না। সফরের অবস্থায়ও নয় এবং বাড়ীতে থাকা অবস্থায়ও নয়। তবে আরাফা ও মুযদালিফায় একত্রে আদায় করা যাবে (মুহীত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নিষিদ্ধ ও মাকরূহ্ ওয়াক্তের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ তিন সময় ফরয নামায, জানাযার নামায এবং তিলাওয়াতের সিজ্দা আদায় করা জাইয নেই। ১. সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। ২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হতে সামান্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত। ৩. এবং সূর্য লাল বর্ণ ধারণ করা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। কিন্তু ঐ দিনের আসরের সালাত সূর্যাস্তের সময়ও আদায় করা জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শায়খ ইমাম মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) বলেন, সূর্যের গোলাকৃতির প্রতি নজর করতে যখন মানুষ সক্ষম হবে, তখন উদিত হওয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে (খুলাসা)। এ হুকুম ঐ অবস্থার জন্য, যদি সালাতে জানাযা এবং তিলাওয়াতের সিজদা মুবাহ ওয়াক্তে ওয়াজিব হয় এবং তা এ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়, তবে ঐ সময়ে এগুলো আদায় করা আদৌ জাইয হবে না। যদি এগুলো মাকরূহ্ ওয়াক্তে ওয়াজিব হয় এবং মাকরূহ্ ওয়াক্তেই তা আদায় করা হয়, তাহলে জাইয হবে। কেননা, যেমন ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় তা ওয়াজিব হয়েছে, অনুরূপ ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায়ই তা আদায় করাও হয়েছে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ, কাফী ও তাবয়ীন)। তবে তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে উত্তম হল, বিলম্বে আদায় করা। কিন্তু সালাতে জানাযা বিলম্বে আদায় করা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। উপরোক্ত ওয়াক্তসমূহের মধ্যে ফরয এবং ওয়াজিব সালাতের

কাযা (যেমন বিতর) পড়া জাইয নেই (মুস্তাস্ফা ও কাফী)। এ সমস্ত ওয়াক্তে নফল পড়া জাইয, তবে মাকরূহ্ (কাফী ও শরহুত তাহাবী)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সূর্যোদয়ের সময় বা সূর্যাস্তের সময় নফল পড়তে শুরু করে, অতঃপর অট্টহাসি দেয়, তবে পুনরায় উযূ করা তার উপর ওয়াজিব। এ ওয়াক্তে যদি কোন ব্যক্তি ঐ দিনের আসর ব্যতীত অন্য কোন সালাত আদায় করে, তবে অট্টহাসির দ্বারা উযূ ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ অনুচ্ছেদ)। তবে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে[১]। যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে তার জন্য এ সালাত ছেড়ে দিয়ে মাকরূহ্ ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য ওয়াক্তে এর কাযা পড়ে নেয়া ওয়াজিব। যদি সে সালাত না ছেড়ে পূর্ণ করে নেয়, তবে অতঃপর নফল শুরু করার কারণে তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছিল এর থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে (ফতহুল কাদীর)। অবশ্য এর জন্য সে গুনাহ্গার হবে। অন্য কোন কিছু তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে না (শরহুত তাহাবী)। যদি সে মাকরূহ্ ওয়াক্তে এ সালাতের কাযা পড়ে, তবে জাইয আছে। কিন্তু গুনাহ্গার হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ মাকরূহ্ ওয়াক্তে সালাত আদায় করার জন্য যদি কেউ মানত করে এবং আদায়ও করে, তবে দুরস্ত আছে, কিন্তু সে গুনাহ্গার হবে এবং অন্য সময় পুনরায় এ সালাত আদায় করে নেয়া তার উপর ওয়াজিব (আল বাহ্রুর রাইক)। যদি কোন ব্যক্তি তথা ব্যাপকভাবে মানত করে অথবা এ মর্মে মানত করে যে, মাকরূহ্ ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য সময় সে সালাত আদায় করবে, তবে মাকরূহ্ ওয়াক্তে তার সালাত আদায় করা জাইয নেই। এটাই যুক্তি সম্মত কথা (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইবন আমীরুল হাজ্জ)।

৩. মাসআলা ঃ নয় ওয়াক্ত এমন আছে, যে ওয়াক্তের মধ্যে নফল এবং নফলের মত অন্যান্য নামায পড়া মাকরূহ্। কিন্তু ফরয নামায মাকরূহ্ নয় (নিহায়া ও কিফায়া)। এ সময়ের মধ্যে সালাতুল কাযা, সালাতে জানাযা এবং তিলাওয়াতের সিজদা জাইয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ১. মাকরূহ্ ওয়াক্তের মধ্যে একটি ওয়াক্ত হল, সুবহে সাদিকের পর হতে ফজরের সালাতের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যবর্তী সময় (নিহায়া ও কিফায়া)। এ সময় ফজরের সুন্নাত ব্যতীত সর্বপ্রকার নফল সালাত মাকরূহ্।

৪. মাসআলা ঃ শেষ রাত্রে নফল পড়তে গিয়ে যদি এক রাকআত পড়ার পর সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তবে সালাত শেষ করা উত্তম। কেননা, সুবহে সাদিকের পর তার নফলে লিপ্ত হওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি। তবে এ সালাত ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ও তাবয়ীন)। চার রাক'আত নফলের দুই রাকআত যদি সুবহে সাদিকের পর পড়া হয়, তবে এ দু রাক'আত সালাত ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে (খাযানাতুল ফাতাওয়া)। ২. ফজরের সালাতের পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী সময়, এ সময়ের মধ্যেও নফল পড়া মাকরূহ (নিহায়া ও কিফায়া)।

৫. মাসআলা ঃ ফজরের সুন্নাত ফাসিদ হয়ে যাওয়ার পর ফজরের সালাতান্তে তা কাযা করা

১. যেহেতু নামাযের মধ্যে অট্টহাস্য উযূ ভঙ্গের একটি কারণ, কাজেই সে নামায সহীহ্ হবে। সে নামাযে অট্টহাসিতে উযূ ভেঙ্গে যাবে, আর যে নামায সহীহ্ নয়, তাতে অট্টহাস্যে উযূ ভঙ্গ হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাইয নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))। ৩. মাকরূহ্ সময়সমূহের মধ্যে একটি সময় হল, আসরের সালাতের পর হতে সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় (নিহায়া ও কিফায়া)। কোন ব্যক্তি যদি মুস্তাহাব ওয়াক্তে নফল আরম্ভ করে তা ফাসিদ করে দেয় এবং আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্বে এর কাযা আরম্ভ করে, তবে দুরুস্ত হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))।

৬. মাসআলা ঃ ৪. মাকরূহ্ সময়সমূহের মধ্যে একটি সময় হল, সূর্যাস্তের পর হতে মাগরিবের সালাতের পূর্ব পর্যন্তের সময়। ৫. অনুরূপভাবে জুমু'আর সালাতের ইকামতের সময় এবং জুমুআ, ঈদ, কুসূফ ও ইস্তিস্কার খুতবার সময়ও নফল পড়া মাকরূহ্ (নিহায়া ও কিফায়া)। হজ্জ এবং বিবাহের[১] খুতবার সময়ও নফল নামায মাকরূহ (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লীঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ)। জুমআর দিন ইমাম খুতবার উদ্দেশ্যে বের হলে নফল পড়া মাকরূহ (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

৭. মাসআলা ঃ জুমু'আর দিন খুতবা পাঠের উদ্দেশ্যে ইমামের বের হওয়ার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি চার রাকআত সালাত আরম্ভ করে এমতাবস্থায় ইমাম যদি খুতবা দানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে তবে মুসল্লী চার রাকআত পূর্ণ করবে। এটাই সহীহ্ মত। ইমাম, শহীদ, উস্তায হুসামুদ্দীন (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (যহীরিয়্যা)। সালাতের ইকামত হওয়ার পর নফল পড়া মাকরূহ্। কিন্তু ফজরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। যদি জামাআত সম্পূর্ণভাবে ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তবে ইকামতের পরও ফজরের সুন্নাত পড়া জাইয।

৮. মাসআলা ঃ ঈদের সালাতের পূর্বে সর্বাবস্থায় নফল পড়া মাকরূহ্। অনুরূপভাবে ঈদের সালাতের পর মসজিদে নফল পড়া মাকরূহ্। কিন্তু ঘরে মাকরূহ্ নয়। আরাফা ও মুযদালিফায় যে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা হয় এর মধ্যে নফল পড়া মাকরূহ (আল বাহ্রুর রাইক)। ফরয সালাতের ওয়াক্ত যদি সংকীর্ণ হয় এমতাবস্থায় ঐ ওয়াক্তের ফরয ব্যতীত অন্য যে কোন সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ "হাবী" সূত্রে বর্ণিত)।

৯. মাসআলা ঃ পেশাব-পায়খানার বেগ দমন করে সালাত আদায় করা মাকরূহ্। মন খানার প্রতি আকৃষ্ট এবং খানাও উপস্থিত এমতাবস্থায়ও সালাত আদায় করা মাকরূহ্। যে সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যা সালাতে মনোনিবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে এবং খুশু-খুযু (একাগ্রতা) বিনষ্ট করে এ ধরনের অবস্থার সময় সালাত আদায় করা মাকরূহ্। ঈশার সালাত অর্ধ রাত্রির পর আদায় করা মাকরূহ্ (আল বাহ্রুর রাইক)।

১. বিবাহের খুতবার সময় অন্য লোকের সালাত আদায় করা মাকরূহ্। তার কারণ বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আযানের মাসাইল

[এই পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পদ্ধতি ও মুআযযিনের গুণাবলী

১. মাসআলা ঃ ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য আযান দেয়া সুন্নাত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কারো কারো মতে আযান দেয়া ওয়াজিব। তবে সহীহ্ মতে আযান দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদা (কাফী)। এটাই অধিকাংশ মাশায়েখে কিরামের মত (মুহীত)। ফরয সালাতের জন্য ইকামতও আযানের মত সুন্নাত (আল বাহ্রুর রাইক)। জুমুআ ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ব্যতীত অন্যান্য সালাত যেমন সুন্নাত, বিতর, নফল, তারাবীহ এবং দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান ও ইকামত নেই (মুহীত)। অনুরূপভাবে মানতের সালাত এবং সালাতে জানাযার জন্যও আযান ও ইকামত নেই। এমনিভাবে ইসতিস্কা, চাশ্তের সালাত এবং বিপদকালীন সময়ের সালাতের জন্যও আযান-ইকামত নেই (তাবয়ীন)। কুসূফ ও খুসূফের সালাতের জন্য আযান ইকামত নেই (আয়নী ঃ কানযের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। মহিলাদের জন্যও আযান-ইকামত নেই। মহিলাগণ যদি জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, তবে তারা আযান-ইকামত ব্যতীত সালাত আদায় করবে। যদি আযান-ইকামতের সাথে সালাত আদায় করে, তবে জাইয আছে। কিন্তু গুনাহ্গার হবে (খুলাসা)। মুকীম ও মুসাফির ব্যক্তি ঘরে সালাত আদায় করলে এ অবস্থায়ও তাদের জন্য আযান-ইকামতের সাথে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। ক্রীতদাসের জন্য আযান-ইকামত নেই (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ ফজরের সালাত ব্যতীত অন্যান্য সালাতের মধ্যে ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া কোন ইমামের নিকটই জাইয নেই। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর নিকট ফজরের সালাতেও ওয়াকত হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া জাইয নেই। ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে (শরহে মাজমাউল বাহ্রায়ন ঃ ইনবুল মালিক)। এর উপরই ফাতওয়া (তাতারখানিয়া ঃ হুজ্জতের সূত্রে বর্ণিত)। এ কথার উপর সমস্ত ইমাম একমত যে, ওয়াক্ত আসার পূর্বে ইকামত দেয়া জাইয নেই (মুহীত)। মুআযযিনের ইকামত বলার কিছুক্ষণ পর ইমাম আসলে বা ইকামতের পর ইমাম ফজরের সুন্নাত আদায় করলে পুনরায় ইকামত বলা ওয়াজিব নয় (কিনয়া)।

৩. মাসআলা ঃ আযান দেয়ার জন্য ঐ লোক উপযুক্ত যে কিবলা ও সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে অবগত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুআযযিনের জন্য জ্ঞানবান, নেককার, মুত্তাকী এবং সুন্নাতের আলিম হওয়া আবশ্যক (নিহায়া)। যাকে দেখলে মনে শ্রদ্ধাজনিত ভয় হয়, মুআযযিনের এরূপ হওয়া উচিত। মুআযযিন লোকদের খোঁজ-খবর নিবে এবং জামাআতে অনুপস্থিত লোকদেরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাসন করবে (কিনয়া)। সব সময় আযান দেয় এরূপ লোকের মুআযযিন হওয়া উচিত (বাদাই' ও তাতারখানিয়া)। মুআযযিন ছওয়াবের নিয়্যাতে আযান দিবে (আননাহ্রুল ফাইক)। উত্তম হল, যিনি আযান দিবার উপযুক্ত, তিনি ইমাম হবারও উপযুক্ত (মিরাজুদ দিরায়া)। মুয়াযযিনেরই ইকামত বলা উত্তম (কাফী)। যদি এক ব্যক্তি আযান দেয় এবং অন্য ব্যক্তি ইকামত বলে, তবে আযানদাতা অনুপস্থিত থাকলে কোন আপত্তি নেই। মুআযযিনের উপস্থিতিতে অন্য ব্যক্তি ইকামত বললে সে যদি মনে কষ্ট পায়, তাহলে অন্য ব্যক্তির ইকামত বলা মাকরূহ্। আর যদি অন্যের ইকামত বলার ব্যাপারে মুআযযিন রাযী থাকে, তাহলে আমাদের মাযহাবে মাকরূহ্ হবে না (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধিমান অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের আযান সহীহ্। মাকরূহ্ নয়। তবে প্রাপ্তবয়স্কের আযান দেয়া উত্তম। জ্ঞানবান নয়, এরূপ বালকের আযান দেয়া দুরুস্ত নয়। এ আযান পুনরায় দিতে হবে। পাগলের আযানের হুকুমও তাই (নিহায়া)। উন্মাদ ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ্। এ আযান দোহ্রানো মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। মহিলাদের আযান মাকরূহ্। এমতাবস্থায় পুনরায় দেয়া মুস্তাহাব (কাফী)। ফাসিক ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ্। এমতাবস্থায় পুনরায় আযান দিতে হবে না (যখীরা)। জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তির আযান-ইকামত বলা মাকরূহ্। এ ব্যাপারে সমস্ত বর্ণনা একই। তবে উচিত হল, পুনরায় আযান দেয়া। কিন্তু ইকামত দোহরাতে হবে না। যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে উযূহীন ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ্ নয় (কাফী)। এটাই সহীহ্ মত (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। অবশ্য উযূহীন ব্যক্তির ইকামত বলা মাকরূহ্। কিন্তু তা পুনরায় দোহরাতে হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি আযান দেয়ার পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়, তবে পূর্বের আযান দোহ্রাতে হবে না। যদি দোহ্রানো হয়, তবে ভাল (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন ব্যক্তি যদি আযান দেয়া অবস্থায় মুরতাদ হয়ে যায়, তবে অন্য কোন ব্যক্তির পুনরায় আযান দেয়া উত্তম। যদি অন্য কেউ তৎক্ষণাৎ পুনঃ আযান শুরু না করে এবং সে বাকী আযান সমাপ্ত করে, তবে জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ বসে আযান দেয়া মাকরূহ্। যদি নিজের জন্য বসে বসে আযান দেয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। মুসাফির ব্যক্তি যদি নিজ সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় আযান দেয়, তবে মাকরূহ্ হবে না। তবে ইকামতের জন্য নীচে অবতরণ করা আবশ্যক (ফাতওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)। যদি সে নীচে অবতরণ না করে ইকামত করে, তবে দুরুস্ত হবে (মুহীত)। সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় মুসাফিরের আযান দেয়া জাইয আছে, যদিও তার চেহারা কিবলামুখী না থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ মুকীম থাকা অবস্থায় সওয়ার হয়ে আযান দেয়া মাকরূহ্। এটা যাহিরুর রিওয়ায়েতের কথা (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কিন্তু দেয়া হলে পুনরায় দেয়া জরুরী নয় (খুলাসা)। গোলাম, গ্রামে বসবাসকারী, যাযাবর, হারামযাদা সন্তান, অন্ধ এবং যে কোন সালাতে আযান দেয় এবং কোন সালাতে দেয় না যেমন সে দিনে বাজারে থাকে এবং রাত্রে বাড়ীতে থাকে, এদের

আযান কারাহাত ব্যতীত জাইয। তবে তাদের ব্যতীত অন্য কারো আযান দেয়া উত্তম (মুহীত)। অন্ধ ব্যক্তির সাথে যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে, যে তার সালাতের ওয়াক্তের যথাযথ সংরক্ষণ করে, তবে এ অবস্থায় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উভয়ের আযানই সমান (নিহায়া)।

৮. মাসআলা ঃ আযান ও ইকামত ব্যতীত ফরয সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মহল্লায় আযান হলে শহরে লোকদের জন্য আযান-ইকামত ব্যতীত সালাত আদায় করা জাইয। এক্ষেত্রে একাকী ও জামাআতের সালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (তাবয়ীন)। উত্তম হল আযান ও ইকামতের সাথে সালাত আদায় করা (তামরতাশী)। যদি মহল্লায় আযান না হয়, তাহলে শহরে লোকদের জন্যও আযান-ইকামত তরক করা মাকরূহ্। শুধু আযান তরক করা মাকরূহ্ নয় (মুহীত)। অবশ্য ইকামত তরক করলে মাকরূহ্ হবে (তামরতাশী)। মুসাফিরের জন্য আযান-ইকামত উভয়ই তরক করা মাকরূহ্। একা হলেও মাকরূহ্ (মাবসূত)। শুধু ইকামত তরক করলে সালাত জাইয হবে। তবে মাকরূহ্ হবে (শরহুত তাহাবী)। যদি আযান-ইকামত উভয়ই দেয়া হয়, তবে উত্তম হবে। অনুরূপভাবে যদি আযান দেয়া হয় কিন্তু ইকামত না দেয়া হয়, তবে তাও উত্তম। এমনিভাবে যদি ইকামত দেয়া হয় কিন্তু আযান না দেয়া হয়, তবে তাও ভাল (মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি গ্রামে নিজ গৃহে সালাত আদায় করে, তবে গ্রামের মসজিদে যদি আযান-ইকামত হয়, তাহলে এ ব্যক্তির হুকুমও শহরে গৃহে সালাত আদায়কারীর ন্যায় হবে। যদি ঐ গ্রামে মসজিদ না থাকে, তবে তার হুকুম মুসাফির ব্যক্তির অনুরূপ হবে (শামানী ঃ শরহে বেকায়া)। যদি কোন ব্যক্তি আঙ্গুরের বাগানে বা ক্ষেতে থাকে এবং গ্রাম এখান থেকে নিকটে হয়, তবে গ্রাম বা শহরের আযানই যথেষ্ট হবে। যদি নিকটে না থাকে, তবে যথেষ্ট হবে না। নিকটে হওয়ার মানে হল, যেখান থেকে আযানের আওয়াজ শুনা যাবে ঐ স্থানকে নিকটবর্তী স্থান মনে করা হবে (মুখতারুল ফাতাওয়া)। কিন্তু সকলের আযান দেয়াই উত্তম (খুলাসা)। একদল মানুষ যদি মাঠের মধ্যে আযান না দিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, তাহলে মাকরূহ্ হবে। যদি ইকামত ছেড়ে দেয়, তবু মাকরূহ্ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ যদি মসজিদের লোকেরা আযান দিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে নেয়, তবে পুনরায় আযান দিয়ে সালাতের জামাআত করা মাকরূহ্। যদি মসজিদের কতিপয় মুসল্লী ইকামত দিয়ে জামাআতে সালাত আদায় করার পর মুআযযিন, ইমাম এবং বাকী জামাআতের লোক প্রবেশ করে, তবে ঐ জামাআত মুস্তাহাব হবে। আর প্রথম জামাআত মাকরূহ্ হবে (মুযমারাত)। কোন মসজিদে যদি অন্য এলাকার লোক এসে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, তবে ঐ মসজিদের মুসল্লীদের দ্বিতীয়বার জামাআতে সালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))। একদল মুসল্লী মসজিদে এসে যদি এমন আস্তে আযান দেয়, যে অন্যেরা তা শুনতে পেল না, অতঃপর আরেক দল মুসল্লী আসে, কিন্তু প্রথম দলের আমল সম্পর্কে আদৌ তারা কিছু জানে না। তাই তারা খুব জোরে আযান দেয়। অতঃপর তারা প্রথম দলের আমল সম্পর্কে জানতে পারে, এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় দলের জন্য জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা জাইয। প্রথম দলের জামাআত ধর্তব্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ আযান অনুচ্ছেদ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ কোন মসজিদে যদি ইমাম ও মুআযযিন নির্ধারিত না থাকে বরং লোকেরা দলে দলে এসে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, এমতাবস্থায় উত্তম হল, প্রত্যেক দলের পৃথকভাবে আযান ও ইকামতের সাথে সালাত আদায় করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ মসজিদ অনুচ্ছেদ)। একদল লোক কোন মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার পর ওয়াক্তের ভেতর জানতে পারল যে, তাদের সালাত ফাসিদ হয়ে গেছে, তাহলে তারা ওয়াক্তের ভেতর পুনরায় জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে। কিন্তু আযান ও ইকামত দোহ্‌রাতে হবে না। যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ঐ সালাত এই মসজিদ ছাড়া অন্যত্র আদায় করে, তবে অন্য আযান ও ইকামতসহ সালাত আদায় করবে (যাহিদী)।

১২. মাসআলা ঃ ওয়াক্তের মধ্যে নামায না পড়ে যদি পরে এর কাযা পড়া হয়, তাহলে আযান ও ইকামতসহ এর কাযা পড়বে। একা হোক বা জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা হোক (মুহীত)। যদি কারো কয়েক ওয়াক্তের সালাত কাযা হয়, তবে সে প্রথম ওয়াক্তের সালাতের জন্য আযান ও ইকামত দিবে। অপরাপর সালাতসমূহের আযান ও ইকামত দেয়ার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার। ইচ্ছা হলে আযান-ইকামত উভয়ই বলবে অথবা শুধু ইকামত বলবে (হিদায়া)। কাযা পড়ার সময় প্রত্যেক সালাতের জন্য আযান-ইকামত বলা খুবই ভাল। এতে আদা এবং কাযা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যাচ্ছে (কাফী এবং শরহে মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখসী (র))। কাযা পড়ার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার ঐ সময় থাকবে, যদি সমস্ত সালাতের কাযা একই মজলিসে পড়া হয়। যদি কাযা একই মজলিসে পড়া না হয়, ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে পড়া হয়, তাহলে আযান-ইকামত উভয়ই শর্ত (বাহ্‌রুর রাইক)।

১৩. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবে এ ব্যাপারে নিয়ম হল এই যে, প্রত্যেক ফরয সালাত, ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হোক বা কাযা পড়া হোক, একা পড়া হোক বা জামাআতের সাথে পড়া হোক, এর জন্য আযান-ইকামত উভয়ই জরুরী। কিন্তু শহরে জুমুআর দিন যুহরের নামায আদায়কালে আযান-ইকামত বলা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)।

১৪. মাসআলা ঃ আরাফা এবং মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায়কালে প্রথম সালাতের জন্য আযান-ইকামত উভয়ই বলবে এবং দ্বিতীয় সালাতের জন্য আযান দিবে না, শুধু ইকামত বলবে।

১৫. মাসআলা ঃ আযান অথবা ইকামত দেয়ার সময় মুআযযিন যদি বেহুশ হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তি পুনরায় আযান বা ইকামত বলবে। অনুরূপভাবে আযান বা ইকামত বলার সময় মুআযযিন যদি মারা যায়, তাহলে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আযান বা ইকামতের সময় যদি মুআযযিনের উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে উযূ করার জন্য যায়, তাহলে হয়তো অন্য কোন ব্যক্তি পুনরায় আযান বা ইকামত বলবে অথবা উযূ করে এসে সে নিজেই বলবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের মাযহাবের ফকীহ্‌গণ বলেছেন, এরূপ অবস্থায় উত্তম হল, প্রথমে আযান বা ইকামত পূর্ণ করা। অতঃপর উযূ করতে যাওয়া (মুহীত)। আযান বা ইকামতের মধ্যে মুআযযিন যদি আটকিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে শিখিয়ে দেয়ার মত যদি কেউ না থাকে এমতাবস্থায় পুনরায় প্রথম হতে আযান বা ইকামত বলা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে আযান বা ইকামত দেয়া অবস্থায় মুআযযিন যদি মূক হয়ে যায় এবং শেষ করার শক্তি না থাকে, তবে অন্য কোন ব্যক্তি প্রথম থেকে আযান-ইকামত বলবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুআযযিন যদি আযানের মধ্যে থেমে যায় এবং এ থামার পরিমাণ যদি এমন হয় যে, তাকে (পৃথকীকরণ) বুঝা যায়, তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ একেবারেই সামান্য হয় তাহলে যেমন গলা খাকার দেয়া অথবা কাশি দেয়া, তবে আযান দোহ্‌রাতে হবে না (তাতারখানিয়া ইয়াতীমার সূত্রে বর্ণিত)। ওযর ব্যতীত আযানের মধ্যে গলা খাকার দেয়া মাকরূহ্। ওযরের কারণে গলা খাকার দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আযান- ইকামতের অবস্থায় সালামের জওয়াব দেয়া মাকরূহ্। শুদ্ধ মতে আযান-ইকামতের পরও সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব নয় (যাহিদী)।

১৬. মাসআলা ঃ আযান বা ইকামতের অবস্থায় মুআযযিনের কথাবার্তা বলা এবং হাঁটা-চলা উচিত নয়। যদি সামান্য কথা বলে, তবে পুনরায় আযান-ইকামত বলা জরুরী নয়। ইকামতে "কাদ কামাতিস সালাহ্" বলার পর মুআযযিনের ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে নিজ স্থানে থেকেই ইকামত পূরা করবে আর ইচ্ছা হলে সালাত আদায়ের স্থানে গিয়ে তা পূরা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ এবং তার অবস্থার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবে আযানের শব্দ পনেরটি। শেষ শব্দ হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আযানের শব্দগুলো নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ — اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ — اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ — حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

হায়্যা আলাস্ সালাহ্ হায়্যা আলাস সালাহ্

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ — حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

হায়্যা আলাল ফালাহ্ হায়্যা আলাল ফালাহ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُ اَكْبَرُ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (যাহিদী)।

২. মাসআলা ঃ ইকামতের শব্দ সতেরটি। পনেরটি আযানের শব্দের মতই। আর দু'টি হল "কাদ কামাতিস্ সালাহ্" দুইবার বলা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফজরের আযানে "হায়্যা আলাল ফালাহ্" এরপর দুইবার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ "আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান নাউম" বলা (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ আরবী ব্যতীত ফারসী বা অন্যান্য ভাষায় আযান দেয়া জাইয নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধতম মত (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)। সুন্নাত হল, আযান–ইকামত জোরে উচ্চস্বরে বলা। তবে ইকামতের আওয়ায আযানের চেয়ে কিছুটা নীচু করবে (নিহায়া ও আল বাদাই)। মিনারায় অথবা মসজিদের বাইরে আযান দিবে। কিন্তু মসজিদের ভেতর আযান দিবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আযান দেয়া সুন্নাত। তবেই প্রতিবেশীরা ভালভাবে শুনতে পারবে। তবে আওয়ায করতে গিয়ে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে না (বাহ্‌রুর রাইক)। নিজের শক্তির বাইরে আওয়ায করা মুআযযিনের জন্য মাকরূহ্ (মুযমারাত)। মাটিতে দাঁড়িয়ে ইকামত বলবে (কিনয়া)। মসজিদে ইকামত বলবে (বাহ্‌রুর রাইক)। আযানের মধ্যে তারজী' করবে না। তারজী' হল, আশ্‌হাদু আল্লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ দুইবার নিম্ন স্বরে বলে পুনরায় এ দুটো বাক্য উচ্চস্বরে বলা। এভাবে প্রত্যেক বাক্য চার বার করে হয়ে যাবে। দুইবার আস্তে এবং দুইবার জোরে (কিফায়া)।

৫. মাসআলা ঃ আযান থেমে থেমে বলবে এবং ইকামত জলদি জলদি বলবে। এভাবে আযান–ইকামত বলা মুস্তাহাব (হিদায়া)। যদি কোন ব্যক্তি আযান–ইকামত উভয়ই থেমে থেমে দেয় অথবা উভয়ই জলদি জলদি বলে বা থেমে থেমে ইকামত বলে আর আযান জলদি জলদি বলে তবু জাইয হয়ে যাবে (কাফী)। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এরূপ করা মাকরূহ্। এটাই হক কথা (ফাতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ تَرَسُّل তথা থেমে থেমে বলার মানে হল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার বলে থেমে অতঃপর পুনরায় আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার বলা। অনুরূপভাবে আযানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক দুই বাক্যের মাঝে থামবে। (জলদি বলা)–এর অর্থ হল, মিলিয়ে পড়া এবং দ্রুত পড়া (তাতারখানিয়্যা ঃ ইয়ানাবি'–এর সূত্রে বর্ণিত)। আযান–ইকামত উভয়ের শব্দগুলো সুকূনের উপর ওয়াক্‌ফ হবে। আযানের মধ্যে প্রকৃতভাবে সাকিন করবে আর ইকামতের মধ্যে সাকিনের নিয়্যাত করবে (তাবয়ীন)। তাকবীরের প্রথমে লম্বা করা কুফ্‌রী এবং শেষে লম্বা করা হল বিভ্রান্তি (যাহিদী)।

৭. মাসআলা ঃ যে তারতীব অনুসারে আযান–ইকামত প্রবর্তিত হয়েছে সে তারতীব রক্ষা করা জরুরী (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী (র))। যদি আযান বা ইকামতের শব্দগুলোর মধ্যে অগ্র–পশ্চাৎ করা হয় যেমন কেউ আশহাদু আল্লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পূর্বে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলল। এরূপ অবস্থায় উত্তম হল, যা অগ্রে বলা হয়েছে তা ধর্তব্য নয়। বরং তা পুনরায় যথাস্থানে বলতে হবে। যদি তা না করে, তবে সালাত জাইয হবে (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আযান ও ইকামতের শব্দগুলো অব্যাহতভাবে বলবে। সুতরাং আযান দেয়ার পর যদি মনে হয় যে, সে ইকামত বলেছে, অতঃপর পরিজ্ঞাত হয় যে, না সে আযানই দিয়েছে, তাহলে উত্তম হল পুনরায় আযান দেয়া এবং প্রথম হতে ইকামত দেয়া। যেন ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অনুরূপভাবে ইকামত দেয়ার পর যদি মনে হয় যে, সে আযান দিয়েছে, অতঃপর পরিজ্ঞাত হয় যে, না সে ইকামতই বলেছে, তবে উত্তম হল, নতুনভাবে ইকামত দেয়া (বাদাই' ও আলগায়া ঃ ইমাম সুরুজী)।

৯. মাসআলা ঃ কিবলামুখী হয়ে আযান–ইকামত বলবে। যদি কেউ কিবলামুখী হয়ে আযান–ইকামত না বলে, তবে জাইয আছে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে (হিদায়া)। "হায়্যা আলাস্ সালাহ ও হায়্যা আলাল্ ফালাহ্" বলার সময় মুখ যথাক্রমে ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরাবে। তবে পা একই স্থানে থাকবে। চাই সালাত একা আদায় করা হোক বা জামাআতের সাথে আদায় করা হোক। এটাই সহীহ্ মত। এমনকি নবজাত শিশুর উদ্দেশ্যে আযান দেয়ার সময়ও উপরোক্ত শব্দ দুটো বলাকালে যথাক্রমে ডানে ও বামে মুখ ফিরাবে (মুহীত)। ডানে–বামে মুখ ফিরানোর নিয়ম হল এই যে, হায়্যা আলাস্ সালাহ্ বলার সময় ডান দিকে মুখ ফিরাবে এবং হায়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাবে। কেউ বলেন, হায়্যা আলাস্ সালাহ্ বলার সময় ডানে–বামে উভয় দিকে মুখ ফিরাবে। অনুরূপভাবে হায়্যা আলাল্ ফালাহ্ বলার সময়ও ডানে বামে মুখ ফিরাবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি সহীহ্ (তাবয়ীন)।

১০. মাসআলা ঃ যদি মিনারা প্রশস্ত হয়, তবে মুআযযিনের ঘুরে যাওয়া উত্তম (বাদাই')। মিনারায় আযান দিলে "হায়্যা আলাস্ সালাহ্" ও "হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্" বলার সময় মুআযযিন মুখ ঘুরিয়ে নিবে। "হায়্যা আলাস্ সালাহ্" দুইবার বলার সময় মুআযযিন মুখ ঘুরিয়ে ডান দিকের ভেন্টিলেটার দিয়ে মুখ বের করে দিবে। আর "হায়্যা আলাল্ ফালাহ্" দুইবার বলার সময় বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাম দিকের ভেন্টিলেটার দিয়ে মুখ বের করে দিবে। যদি মুআযযিন নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সালাত সম্পর্কে অবগত করতে সক্ষম না হয়, তখনই এ পদ্ধতি অবলম্বন করবে[১] (শরহে বেকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র.)। মুআযযিন যদি ডানে–বামে মুখ ফিরিয়ে লোকদেরকে সালাত সম্পর্কে অবগত করতে সক্ষম হয়, তবে ডানে–বামে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট। এ অবস্থায় উভয় পা নিজ স্থানে অটল রাখবে (শাহান শাহে হিদায়া)।

১. যেমন বর্তমান যুগে মাইকের প্রচলন হওয়ায় ভেন্টিলেটার দিয়ে মুখ বের করার প্রয়োজন নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ আযানে তালহীন মাকরূহ্। তালহীন হল, আযানের শব্দগুলো এমনভাবে গেয়ে পাঠ করা যার ফলে শব্দের মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয় (শরহুল মাজমা' ঃ ইবনুল মালিক)। সুন্দর স্বরে আযান দেয়া ভাল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন লাহান না হয় (সিরাজিয়া ও শরহে বেকায়া)।

১২. মাসআলা ঃ আযানের সময় শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় কানের ছিদ্রে ঢুকানো ভাল। যদি না ঢুকানো হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এরূপ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়। শুধু ভালভাবে আওয়ায পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। কানের উপর হাত দিয়ে রাখাও জাইয (তাবয়ীন)। আওয়ায দূরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কানের ছিদ্রে আঙ্গুল ঢুকানো আযানের নিয়মের মধ্যে শামিল। কিন্তু ইকামতে এরূপ করতে নেই (কিনয়া)।

১৩. মাসআলা ঃ উলামায়ে মুতাআখ্খিরীনের নিকট মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক সালাতে তাছবীব করা উত্তম (শরহে নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র.)। তাছবীব হল, আযান ও ইকামতের মাঝে মুআয্যিন কর্তৃক পুনরায় সালাতের ইলান করা। প্রত্যেক এলাকা এবং শহরের তাছবীব সেখানকার প্রচলিত তরীকা অনুসারে হবে। গলা খাকার দিয়ে অথবা "সালাত-সালাত" বলে বা 'কামাত-কামাত' বলে তাছবীব করা হবে। কেননা, তাছবীবের উদ্দেশ্য হল, সালাত সম্পর্কে ভালভাবে জানিয়ে দেয়া। যে দেশে যে তরীকা চালু আছে এর দ্বারাই তা হাসিল করা যায় (কাফী)। ফজরের আযানের পর বিশ আয়াত পড়া যায় পরিমাণ সময় বিলম্ব করে তাছবীব করবে। অতঃপর এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করে ইকামত বলবে (তাবয়ীন)। আযান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ ব্যবধান করবে যেন এ সময়ের মধ্যে এমনভাবে দুই বা চার রাকআত সালাত আদায় করা যায়, যার প্রত্যেক রাকআতে প্রায় বিশ আয়াত করে পাঠ করা যায় (যাহিদী)।

১৪. মাসআলা ঃ আযান-ইকামত এক সাথে মিলিয়ে বলা ফকীহদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে মাকরূহ (মিরাজুদ্দিরায়া)। যে সালাতের পূর্বে সুন্নাত বা নফল রয়েছে এ ক্ষেত্রে মুআযযিনের জন্য উত্তম হল, আযান-ইকামতের মাঝে সুন্নাত বা নফল পড়া (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))। সালাত না আদায় করলে বসে থাকবে। মাগরিবের সালাত হলে মুস্তাহাব হল, আযান-ইকামতের মাঝে সামান্য সময় বিলম্ব করা, যে সময়ের মধ্যে ছোট তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা সম্ভব (নিহায়া)। মাগরিবের সালাতেও আযান-ইকামতের মাঝে ব্যবধান জরুরী এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ সকলেই একমত (ইতাবিয়া)। তবে এ ব্যবধানের পরিমাণ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আযান-ইকামতের মাঝে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। অতঃপর ইকামত বলবে। সামান্য সময় এতটুকু সময় যে সময়ের মাঝে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সামান্য সময় হল, দুই খুতবার মাঝে যে পরিমাণ সময় বসা হয় ঐ পরিমাণ সময়। ইমাম হালওয়ানী (র) বলেন, ইমামত্রয়ের এ মতভেদ শুধু উত্তম হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আযানের পর মুআযযিন যদি বসে যায়, তবে জাইয আছে। কিন্তু না বসা উত্তম। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে

মুআযযিন যদি না বসে, তবে জাইয আছে। কিন্তু বসা উত্তম (নিহায়া)। আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ করা মুস্তাহাব (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৫. মাসআলা ঃ মুআয্যিন লোকদের জন্য অপেক্ষা করবে এবং যে ব্যক্তি দুর্বল, তাড়াতাড়ি আসতে পারে না, তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু মহল্লার সরদার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্য অপেক্ষা করবে না (মিরাজুদ দিরায়া)। মুআযযিনের জন্য উচিত হল, আউয়াল ওয়াক্তে আযান দেয়া এবং মধ্য ওয়াক্তে ইকামত দেয়া। তাহলে উযূকারী উযূ করে এবং সালাত আদায়কারী সালাত শেষ করে এবং পায়খানা-প্রস্রাবে লিপ্ত ব্যক্তি পায়খানা-প্রস্রাব থেকে ফারিগ হয়ে জামাআতে শরীক হতে পারবে (তাতারখানিয়া ঃ হুজ্জতের সূত্রে বর্ণিত)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ইকামতের সময় মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরূহ্। বসে যাবে। পরে মুআয্যিনের "হায়্যা আলাল ফালাহ্" বলার সময় দাঁড়াবে (মুযমারাত)। মুআযযিন এবং ইমাম যদি দুই ব্যক্তি হয় এবং মুসল্লীগণ ইমামের সাথে মসজিদে থাকে, তবে আমাদের তিন ইমামের মতানুসারে মুআযযিনের "হায়্যা আলাল ফালাহ" বলার সময় ইমাম এবং মুসল্লীগণ দাঁড়াবে। এটাই সহীহ্ মত। ইমাম যদি মসজিদের বাইরে থাকে এবং মুসল্লীদের কাতারের ভেতর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে তিনি যখন যে কাতার অতিক্রম করবে, সে কাতারের লোকেরা তখন দাঁড়াবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী, ইমাম সুরুখ্সী এবং শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম যদি মুসল্লীদের সম্মুখ দিক দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে ইমামকে দেখা মাত্র সমস্ত মুসল্লী দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম ও মুআযযিন যদি একই ব্যক্তি হয় এবং মসজিদের ভেতর ইকামত বলে, তবে ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুসল্লীগণ দাঁড়াবে না। আর যদি মসজিদের বাইরে ইকামত বলে, তবে আমাদের ইমামগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মুসল্লীগণ দাঁড়াবে না। "কাদ কামাতিস সালাহ" বলার সামান্য পূর্বে ইমাম তাকবীর বলবে। ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র.) বলেন, এটাই সহীহ মত (মুহীত)।

উপরোক্ত বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত আরো কতিপয় মাসাইল। আযানের জওয়াব দেয়া।

১৭. মাসআলা ঃ আযানের জওয়াব দেয়া শ্রোতাদের উপর ওয়াজিব। আযানের জওয়াবে শ্রোতাগণ মুআযযিনের মতই বলবে। কিন্তু "হায়্যা আলাস সালাহ ও হায়্যা আলাল ফালাহ" বলার সময় একটু ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ মুআযযিনের "হায়্যা আলাস সালাহ" বলার সময় শ্রোতাগণ বলবে, লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। এবং "হায়্যা আলাল ফালাহ" বলার সময় শ্রোতাগণ বলবে "মা-শাআল্লাহ কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))। এটাই সহীহ্ মত (ফাতাওয়ায়ে গারাইব)। অনুরূপভাবে মুআযযিনের "আস্সালাতু খায়রুম মিনানা নাউম" বলার সময় শ্রোতাগণ বলবে, "সাদাক্তা ওয়া-বারাকতা" (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তি চলন্ত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে তার জন্য উত্তম হল, দাঁড়িয়ে আযানের জওয়াব দেয়া (কিনয়া)। ইকামতের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব (ফাতহুল কাদীর)। ইকামতে "কাদ কামাতিস সালাহ" বলার সময় শ্রোতাগণ বলবে, "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা মা

pdf By Syed Mostafa Sakib

দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু"। এ ছাড়া বাকী শব্দগুলো শ্রবণের সময় আযানের অনুরূপই জওয়াব দিবে (ফাতাওয়ায়ে গারাইব)। আযান ও ইকামত শ্রবণের সময় শ্রোতাদের কথা বলা উচিত নয়। এমনিভাবে আযানের জওয়াব ব্যতীত এ সময় কুরআন তিলাওয়াতে বা অন্য কোন আমলে লিপ্ত হওয়াও সমীচীন নয়। এ সময় কোন ব্যক্তি তিলাওয়াতে থাকলে তার জন্য উচিত হল, তিলাওয়াত বন্ধ করে আযান-ইকামত শ্রবণ করা এবং এর জওয়াব দেয়া (বাদাই')। ইকামতের সময় দু'আ করাতে কোন ক্ষতি নেই (খুলাসা)। কোন মসজিদে একাধিক মুআযযিন থাকলে এবং তারা ক্রমান্বয়ে আযান দিলে প্রথম মুআযযিনের আযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুসল্লীদের জরুরী (কিফায়া)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের শর্তাবলীর বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

আমাদের মাযহাবে নামাযের শর্ত সাতটি। যথা, (১) উযূ করা, (২) নাপাকী হতে পবিত্রতা লাভ করা, (৩) সতর ঢাকা, (৪) কিবলামুখী হওয়া, (৫) ওয়াক্ত হওয়া, (৬) নিয়্যাত করা ও (৭) তাহ্‌রীমা বাঁধা (যাহিদী)।

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ও সতর ঢাকার মাসাইল

১. মাসআলা ঃ নাপাকী হতে মুসল্লীর শরীর, কাপড় এবং সালাতের জায়গা পাক করা ওয়াজিব (যাহিদীর নাজাসাত অধ্যায়)। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি নাপাকী এ পরিমাণ হয়, যে পরিমাণ নাপাকী নিয়ে সালাত আদায় করা যায় না। তবে তা দূরীকরণেও কোন দুঃসাধ্য পন্থা অবলম্বন করতে হয় না। কিন্তু নাপাকী পরিষ্কার করতে যদি মানুষের সামনে সতর খোলার প্রয়োজন হয়, তবে এ নাপাকী নিয়েই সালাত আদায় করবে। নাপাকী দূর করার জন্য যদি কেউ মানুষের সামনে সতর খুলে, তবে সে ফাসীক হবে বাহরুর রাইক)। যাহিরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর যে নাপাকী থাকবে, তাই ধর্তব্য হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি নাপাক সুরমা চোখে লাগায়, তবে চক্ষু ধৌত করা তার উপর ওয়াজিব নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। নাজাসাতে গলীযা যদি এক দিরহামের অধিক পরিমাণ হয়, তবে তা ধৌত করা ফরয। এ নিয়ে সালাত আদায় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি এক দিরহাম পরিমাণ হয়, তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব এবং এ নাপাকী নিয়ে সালাত আদায় করা জাইয। আর নাপাকী যদি এক দিরহামের চেয়ে কম হয়, তবে তা ধৌত করা সুন্নাত। নাজাসাতে খফীফা অধিক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে সালাত আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই (মুযমারাত)।

২. মাসআলা ঃ সতর ঢাকতে সক্ষম ব্যক্তির সালাত সহীহ্ হওয়ার জন্য সতর ঢাকা শর্ত (মুহীত ঃ সুরুখসী)। পুরুষের সতর হল, নাভির নীচ হতে হাঁটু পর্যন্ত। আমাদের তিন ইমামের নিকট নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের সমস্ত ইমামের মতে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত (মুহীত)। স্বাধীনা স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পা ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরয (মূল কিতাবের মতনসমূহ)। মহিলার মাথার উপরের চুল সতরের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য নীচে লটকানো চুল সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মাঝে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে এও সতরের অন্তর্ভুক্ত (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এর উপরই ফাতওয়া (মিরাজুদ দিরায়া)।

৩. মাসআলা ঃ পুরুষের সতর যতটুকু, বাঁদী-দাসীর সতরও ততটুকু। তবে দাসীদের পেট এবং পিঠও সতরের অন্তর্ভুক্ত। উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বারা ও মুকাতাবা সর্বপ্রকার দাসী এ হুকুমের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যে শামিল (তাবয়ীন)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুস্তাস'আত (দাস মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে কোন গোলামকে কাজে নিয়োজিত করা)-ও মুকাতাবার মতই (যহীরিয়্যা)। নপুংসক যদি ক্রীতদাস হয়, তবে তার সতরের বিষয়টি বাঁদি-দাসীর সতরের অনুরূপই। আর যদি স্বাধীন হয় তবে এর সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ এ ধরনের লোকদের সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে। যদি সে নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে, তবে কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এ অবস্থায় সালাত আদায় করলে এ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, পুনরায় আদায় করতে হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী বালিকা যদি উলঙ্গ অবস্থায় বা উযূহীন অবস্থায় সালাত আদায় করে, তবে এ সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেয়া হবে। যদি উড়নি ব্যতীত সালাত আদায় করে, তবে ইস্‌তিহ্‌সানের আলোকে তার এ সালাত দুরুস্ত হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। সালাতে নিজের শরীর অন্য মানুষ থেকে ঢেকে রাখা ইমামদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে ফরয।

৫. মাসআলা ঃ নিজের অঙ্গ নিজের থেকে ঢেকে রাখা অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে ফরয নয় (শাহান)। কোন ব্যক্তি যদি লুঙ্গি ব্যতীত শুধু জামা পরিধান করে সালাত আদায় করে, তবে জামার ফাড়া দিয়ে নজর করলে যদি সে লজ্জাস্থান দেখতে পায়, তাহলে অধিকাংশ মাশায়িখের মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। এটাই সহীহ। কোন ব্যক্তি যদি অন্ধকার ঘরে উলঙ্গ হয়ে সালাত আদায় করে অথচ ঘরে তার পাক কাপড় আছে, তবে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার সালাত সহীহ্ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এমন পাতলা কাপড় যা দিয়ে শরীর দেখা যায় এ ধরনের কাপড় পরে সালাত আদায় করলে সালাত দুরুস্ত হবে না (তাবয়ীন)। কারো গায়ে যদি জামা ছাড়া অন্য কোন পোশাক না থাকে এবং সিজদায় গেলেও তার লজ্জাস্থান দেখা যায় না, তবে নীচ দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি নজর করে, তবে তার লজ্জাস্থান দেখতে পায়, তবে কোন ক্ষতি নেই। শরীরের সামান্য অংশ খুলে গেলে তা মাফ। কেননা, এরূপ সাধারণত হয়ে থাকে। কিন্তু বেশী পরিমাণ অংশ সাধারণত খুলে না। তাই বেশী খুলে গেলে তা মাফ হবে না। এক-চতুর্থাংশ এবং এর বেশী অধিকের মধ্যে গণ্য। আর এক-চতুর্থাংশের কম কমের মধ্যে গণ্য। এটাই সহীহ (মুহীত)। বিশুদ্ধতম মতানুসারে সতর গলীয হোক বা খফীফ এ হিসাব চতুর্থাংশের মাধ্যমেই করা হবে (খুলাসা)। এক অঙ্গের এক-চতুর্থাংশের কম খুলে গেলে তা মাফ। যদি দুই বা ততোধিক অঙ্গ হতে খুলে যায়, তবে তা একত্রিত করা হবে। সব মিলে যদি ছোট কোন অঙ্গের এক-চতুর্থাংশের সমপরিমাণ হয়, তাহলে এ অবস্থায় সালাত জাইয হবে না (শরহুল মাজমা' ঃ ইবনুল মালিক)।

৬. মাসআলা ঃ যে সব অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয এগুলোর একত্রীকরণে অংশের হিসাব যেমন, ষষ্ঠাংশ বা নবমাংশ ইত্যাদি ধর্তব্য নয়, বরং পরিমাণ হল ধর্তব্য। যদি কোন মহিলার কানের নবমাংশ খুলে এবং পায়ের নালা হতে নবমাংশ খুলে যায়, তবে এ অবস্থায় সালাত সহীহ্ হবে না কেননা, খুলে যাওয়া অংশটুকু কানের এক-চতুর্থাংশের সমান (কিনয়া)। সালাতের অবস্থায় সতর খুলে যাওয়ার পর যদি সঙ্গে সঙ্গে আবার তা ঢেকে নেয়া হয়, তবে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার সালাত জাইয হবে। সতর খুলে যাওয়া অবস্থায় যদি কেউ এক রুক্ন আদায় করে সমস্ত ইমামের মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সতর খোলা অবস্থায় যদি কেউ এক রুক্ন আদায় না করে, তবে এতটুকু সময় পরিমাণ অপেক্ষা করে যে সময়ের মধ্যে সে এক রুক্ন আদায় করতে পারত, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)।

৭. মাসআলা ঃ কোন দাসী যদি উড়নি ব্যতীত সালাত আদায় করে এবং সালাতের অবস্থায় সে আবাদ হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উড়নি দ্বারা মাথা না ঢাকলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি সে হালকা নাড়া-চাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় উড়নি টেনে নেয়, তাহলে তার সালাত জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। العمل القليل তথা সামান্য আমল বা সামান্য নাড়াচাড়া মানে হল, এক হাত দ্বারা ধরা (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ লিঙ্গ একটি পৃথক অঙ্গ। অনুরূপভাবে স্ত্রীলিঙ্গের দুই পার্শ্ব পৃথকভাবে দু'টি অঙ্গ, এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। নিতম্ব দু'টির প্রত্যেকটি পৃথক অঙ্গ। মলদ্বার তৃতীয় আরেকটি অঙ্গ। এটাই সহীহ্ (শরহুল মাজমা ঃ ইবনুল মালিক ও তাবয়ীন)। হাঁটু থেকে নিয়ে উরুর গোড়া পর্যন্ত এক অঙ্গ। সুতরাং কেউ যদি হাঁটু খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করে এবং উরু ঢাকা থাকে, তবে সালাত সহীহ্ হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাজনীস)। অনুরূপভাবে মহিলার টাখনুসহ গোড়ালি এক অঙ্গ। (শরহুল মাজমা ঃ ইবনুল মালিক তাবয়ীন) হাঁটু থেকে নিয়ে উরুর গোড়া পর্যন্ত এক অঙ্গ। সুতরাং কেউ যদি হাঁটু খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করে এবং উরু ঢাকা থাকে তবে সালাত সহীহ্ হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। (তাজনীস) অনুরূপভাবে মহিলার টাখনুসহ গোড়ালি এক অঙ্গ (শরহুল মাজমা ঃ ইবনুল মালিক)। নাভি হতে নীচের পশমের স্থানসহ একটি অঙ্গ। এর এক-চতুর্থাংশ খুলে গেলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। পিঠ পৃথকভাবে একটি অঙ্গ। অনুরূপভাবে পেট পৃথক একটি অঙ্গ। এমনিভাবে বক্ষ একটি অঙ্গ (তাতারখানিয়্যা ঃ ইতাবিয়ার সূত্রে)। পার্শ্বদেশ পেটের সাথে সম্পর্কিত (কিনয়া)। মহিলার স্তন যদি ছোট হয়, উঠন্ত অবস্থায় থাকে, তবে তা বুকের সাথে ধর্তব্য হবে। আর যদি বড় হয়, তাহলে তা পৃথক অঙ্গ হিসাবে ধরা হবে (খুলাসা)। এবং প্রত্যেকটি স্তন একটি অঙ্গ হিসাবে ধরা হবে। এমনিভাবে কানও পৃথক দু'টি অঙ্গ। তাই যদি কানের এক-চতুর্থাংশ খুলে যায়, তাহলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যাহিদী)।

৯. মাসআলা ঃ কারো যদি কাপড় না থাকে এবং কোন ব্যবস্থাও না করতে পারে তবে, সে বসে সালাত আদায় করবে এবং ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে। অথবা দাঁড়িয়ে রুকূ-সিজদার সাথে সালাত আদায় করবে। এতদুভয়ের মাঝে প্রথমটি উত্তম (কাফী)। রাত্রে বা দিনে, ঘরে বা ময়দানে সর্বাবস্থায়ই এ হুকুম প্রযোজ্য। এটাই সহীহ্ মত (বাহ্রুর রাইক)। কাপড় থাকা বা পাওয়ার মানে হল, কাপড় ব্যবহারে সক্ষম হওয়া। যদি কেউ কোন মুসল্লীকে কাপড় দেয়, তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ কাপড় ব্যবহার করা তার জন্য ওয়াজিব (আলজাওহারাতুন নায়্যারা)।

কোন উলঙ্গ ব্যক্তির সামনে যদি এমন ব্যক্তি থাকে যার নিকট কাপড় আছে, তাহলে সে তার নিকট কাপড় চাইবে। যদি না দেয়, তবে উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করবে। সালাত আদায়ের অবস্থায় যদি কাপড় পাওয়া যায়, তবে নতুনভাবে সালাত আদায় করবে (তাতারখানিয়্যা ঃ সিরাজিয়্যার সূত্রে)। যদি কারো কাপড় পাওয়ার আশা থাকে, তবে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাপড় পাওয়ার অপেক্ষা করবে। যেমন সালাত আদায়ের স্থানের ব্যাপারে অপেক্ষা করা হয় (কিনয়া)।

১০. মাসআলা ঃ উলঙ্গ ব্যক্তি লোকজন হতে দূরে পৃথকভাবে সালাত আদায় করবে। উলঙ্গ লোকেরা যদি জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, তবে ইমাম মাঝখানে দাঁড়াবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পা কিবলার দিকে করে রাখবে এবং হাত রানের উপর রেখে ইশারা করে সালাত আদায় করবে। দাঁড়িয়ে ইশারা করে বা বসে রুকূ-সিজদা করে সালাত আদায় করলেও জাইয আছে (যাহিদী)। হুজ্জত নামক কিতাবে আছে যে, উলঙ্গ ব্যক্তি যদি চাটাই বা বিছানা পায়, তবে তা দ্বারা সে সতর ঢাকবে এবং সালাত আদায় করবে। উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করবে না। অনুরূপভাবে উলঙ্গ ব্যক্তি যদি সতর ঢাকার জন্য ঘাস পায়, তবে ঘাস দ্বারা সে সতর ঢাকবে (তাতারখানিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ উলঙ্গ ব্যক্তি যদি মাটি দ্বারা নিজের লজ্জার স্থান প্রলেপ দিতে সক্ষম হয় এবং একথা জানে যে, এ মাটি তার শরীরে বাকী থাকবে, তাহলে মাটি দ্বারাই নিজের সতর ঢাকবে। যেমনিভাবে গাছের পাতা শরীরে জড়াতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য জরুরী হলে গাছের পাতা শরীরে জড়িয়ে সতর ঢাকা (কিনয়া)। কোন ব্যক্তি যদি শরীরের কিয়দংশ ঢাকার মত কোন বস্তু পায়, তাহলে তা ব্যবহার করা তার উপর ওয়াজিব। তবে এ বস্তু দ্বারা পায়খানা ও প্রস্রাবের অঙ্গ দুটো ঢাকবে। এটাই সমস্ত ইমামের মত (মিরাজুদ দিরয়া)। কোন ব্যক্তি যদি এতদুভয়ের কোন একটি ঢাকবার মত কাপড় পায়, তাহলে কারো কারো মতে সে পায়খানার অঙ্গটিই ঢাকবে। কেননা, রুকূ অবস্থায় এ অঙ্গ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে জননেন্দ্রিয় ঢাকবে। কেননা, এ অঙ্গটি কিবলার দিকে আছে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ রেশমী কাপড় পরিধান করে পুরুষের জন্য সালাত আদায় করা জাইয নেই। কিন্তু মহিলাদের জন্য জাইয আছে। পুরুষ লোক যদি রেশমী কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় না পায় তবে এ কাপড় পরেই সালাত আদায় করবে। উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করবে না (ফাতহুল কাদীর)। কোন মহিলা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে যদি তার এ পরিমাণ সতর খুলে যায় যে পরিমাণ খুললে সালাত জাইয হয় না কিন্তু বসে সালাত আদায় করলে সতরের কোন অংশই খোলে না, তাহলে সে বসে সালাত আদায় করবে (তাবয়ীন)। "ইতাবিয়া" নামক কিতাবে আছে যে, সিজদা করলে যদি কোন মহিলার সতরের এক-চতুর্থাংশ খুলে যায়, তাহলে সে সিজদা করবে না (তাতারখানিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল, তিন কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা, যথা জামা, লুঙ্গি ও পাগড়ী। যদি এক কাপড় শরীরে জড়িয়ে কেউ সালাত আদায় করে জাইয হবে। মাকরূহ্ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি শুধু লুঙ্গি পরিধান করে সালাত আদায় করে তবে জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে।

১৪. মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের জন্যও তিন কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। জামা, পায়জামা ও উড়নি। কোন মহিলা যদি দুই কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করে, তবে দুরুস্ত আছে (খুলাসা)। যদি এক কাপড় শরীরে পেঁচিয়ে সালাত আদায় করে, তবে সালাত সহীহ্ হবে না। কিন্তু এক কাপড়ে যদি মাথা এবং সমস্ত শরীর আবৃত হয়, তাহলে জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।[১] দুই ব্যক্তি যদি এক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করে এবং প্রত্যেকেই এর এক এক কোণ দ্বারা সতর ঢেকে নেয়, তবে সালাত সহীহ্ হবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি কাপড়ের এক কোণ দ্বারা সতর ঢাকে এবং অন্য কোণ কোন শায়িত ব্যক্তির উপর ফেলে রাখে, তাহলেও সালাত দুরুস্ত হবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। কোন মহিলার যদি এ পরিমাণ কাপড় থাকে যে, এর দ্বারা সে সমস্ত শরীর এবং মাথার এক- চতুর্থাংশ ঢাকতে পারে, এমতাবস্থায় সে যদি মাথা না ঢেকে সালাত আদায় করে, তবে সহীহ্ হবে না। আর যদি এ পরিমাণ কাপড় থাকে, যার দ্বারা মাথার এক-চতুর্থাংশের কম ঢাকা যায় কিন্তু সে তা ঢাকল না। না ঢেকেই সালাত আদায় করল, তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ঢাকাই উত্তম (তাবয়ীন)।

১৫. মাসআলা ঃ উলঙ্গ ব্যক্তি যদি এমন এক টুকরা কাপড় পায়, যার দ্বারা সে কোন একটি ছোট অঙ্গের সতর ঢাকতে পারে, কিন্তু সে ঢাকল না এমনিই সালাত আদায় করল, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি ঢাকে, তাহলে সালাত ফাসিদ হবে না (কিনয়া)। উলঙ্গ ব্যক্তি যদি পানিতে সালাত আদায় করে তবে পানি ঘোলা থাকলে সালাত শুদ্ধ হবে। আর পানি যদি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে এবং তার সতর দেখা সম্ভব হয়, তাহলে সালাত সহীহ্ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সতর ও শরীর ঢাকার কাপড়ের পবিত্রতার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লী যদি এমন কাপড় পায়, যার এক-চতুর্থাংশ পাক এমতাবস্থায় সে যদি উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে না। যদি এক-চতুর্থাংশের কম পাক হয় অথবা পূরা কাপড় নাপাক হয়, তাহলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় সালাত আদায় করা এবং দাঁড়িয়ে রুকূ-সিজদাসহ সালাত আদায় করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। যেভাবে ইচ্ছা পড়তে পারবে। এটাই উত্তম (কাফী)। কোন বক্তি যদি মৃত জানোয়ারের দাবাগাতবিহীন চামড়াই কেবল সতর ঢাকার জন্য পায়, অন্য কিছু না পায়, তবে এর দ্বারা সতর ঢাকা তার জন্য জাইয নেই এবং এ চামড়া শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করাও তার জন্য জাইয নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ যদি কারো কাছে দু'টি কাপড় থাকে এবং দু'টির প্রত্যেকটির মধ্যেই এক দিরহামের চেয়ে অধিক পরিমাণ নাপাকী থাকে, তাহলে তার ইচ্ছা, সে যে কোন একটি পরিধান করে সালাত আদায় করতে পারবে। কেননা, সালাত না জাইয হওয়ার ব্যাপারে উভয়টিই বরাবর। অবশ্য যদি কোন একটির মধ্যে নাপাকী এক দিরহাম পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে এটা

১. যেমন মোটা সুতার শাড়ী দ্বারা সর্বাঙ্গ ঢেকে নামায পড়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিধান করেই সালাত আদায় করবে (তাবয়ীন)। যে কাপড়ে নাপাকী কম ঐ কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করাই মুস্তাহাব (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ দু'টি কাপড়ের একটিতে যদি কি দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগে, আর অপরটিতে যদি এক দিরহামের কম রক্ত লাগে, তাহলে কম রক্ত লাগা কাপড়টি পরিধান করে সালাত আদায় করবে। এর বিপরীত করা জাইয নেই। দু'টি কাপড়ের প্রত্যেকটিতে যদি এক চতুর্থাংশ পরিমাণ নাপাকী থাকে অথবা একটিতে যদি এর চেয়েও বেশী থাকে কিন্তু নাপাকীর পরিমাণ চার ভাগের তিন ভাগ পরিমাণ নয় আর অপরটিতে নাপাকীর পরিমাণ হল এক-চতুর্থাংশের মত, তাহলে এ দু'টির যে কোন একটি পরিধান করে সালাত আদায় করবে। যে কাপড়ে নাপাকী কম, তা পরে সালাত আদায় করা হল উত্তম।

৪. মাসআলা ঃ দু'টি কাপড়ের একটির যদি এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ পাক হয় আর অপরটির এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ পাক হয়, তাহলে যে কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ পাক তা পরিধান করে সালাত আদায় করবে। এর বিপরীত করা জাইয নেই (তাবয়ীন)। কাপড়ের এক কোণে যদি নাপাকী থাকে এবং এর এ পরিমাণ অংশ যদি পাক থাকে, যা সে লুঙ্গির ন্যায় বাঁধতে পারে, তবে এ অবস্থায় এ কাপড় না বেঁধে সালাত আদায় করা তার জন্য জাইয নেই। কেননা, পাক কাপড় দ্বারা সতর ঢাকা তার জন্য সম্ভব ছিল। এ পর্যায়ে অপর প্রান্তে নাড়াচাড়া লাগুক বা না লাগুক এতে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন কাপড়ের দুই প্রান্তের কোন এক প্রান্ত যদি লুঙ্গির ন্যায় বাঁধা সম্ভব হয়, তাহলে তা বেঁধে সালাত আদায় করতে হবে। চাই অপর প্রান্তে নাড়া পড়ুক বা না পড়ুক, এতে কোন পার্থক্য নেই। এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা জাইয নেই (খুলাসা)। এ ধরনের মাসআলার ক্ষেত্রে বিধান হল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি দুই ধরনের বিপদে পতিত হয় এবং উভয়টি যদি সমান হয়, তাহলে সে যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারবে। যদি দুইটি দুই রকমের হয়, তাহলে সহজটি গ্রহণ করবে (বাহ্‌রুর রাইক)।

৫. মাসআলা ঃ কাপড়ের পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ হয়, তাহলে তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করে সালাত আদায় করবে। যদি কাপড় নাপাক হওয়ার ধারণাটি প্রবল হয় (সিরাজিয়্যা)। চিন্তা-ভাবনা করার পর যদি কোন কাপড় সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয় যে, এ কাপড়টি পাক এবং এ কাপড় পরে যুহরের সালাত আদায় করে, অতঃপর চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটে এবং অপর কাপড় সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয় যে, এ কাপড়টি পাক, ওটি নয়, আর এ কাপড় পরিধান করে আসরের সালাত আদায় করে, এমতাবস্থায় আসরের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

৬. মাসআলা ঃ কারো নিকট যদি দু'টি কাপড় থাকে এবং কোন কাপড়ে নাপাকী আছে এ কথা যদি জানা না থাকে-এমতাবস্থায় কোন এক কাপড় পরিধান করে যদি সে যুহরের সালাত আদায় করে এবং অপরটি পরিধান করে আসরের সালাত আদায় করে। অতঃপর প্রথমটি পরে মাগরিবের সালাত আদায় করে, এরপর দ্বিতীয়টি পরিধান করে ঈশা আদায় করে। এ অবস্থায় সে যদি কোন একটির মধ্যে এক দিরহামের চেয়ে অধিক পরিমাণ নাপাকী দেখতে পায়, কিন্তু কোন্‌টি প্রথম এবং কোন্‌টি দ্বিতীয় এ কথা মনে না থাকে, তাহলে তার যুহর ও মাগরিব সহীহ্ হবে।

আসর ও ঈশা ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে প্রথম কাপড়টি পরিধান করে যুহর আদায় করে এবং দ্বিতীয় কাপড়টি পরিধান করে আসরের সালাত আদায় করে অতঃপর প্রথমটি পরিধান করে মাগরিব এবং দ্বিতীয়টি পরিধান করে ঈশা আদায় করে, তাহলে এ প্রক্রিয়া এবং প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া উভয়টিই সমান। ইমাম সুরুখ্সী (র) এ মতটি ব্যক্ত করেছেন (খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন রুমাল বা কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করে, যার এক প্রান্ত নাপাক। এ নাপাক প্রান্ত যমীনের উপর রাখা আছে। এ অবস্থায় মুসল্লীর নড়াচড়া করার কারণে কাপড়ের এ প্রান্তেও যদি নাড়া লাগে, তাহলে এ কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার সালাত সহীহ্ হবে না। আর যদি এতে কোন নাড়া না পড়ে, তাহলে তার সালাত সহীহ্ হবে। কোন ব্যক্তি যদি এমন কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করে, যা তার ধারণায় নাপাক ছিল। সালাতের পর এ কথা পরিষ্কার হল যে, কাপড়টি পাক এ অবস্থায়ও সালাত দুরুস্ত হবে (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কোন উলঙ্গ ব্যক্তির নিকট যদি রেশমী কাপড় এবং সুতী কাপড় থাকে এবং সুতী কাপড়ের মধ্যে এক দিরহামের চেয়ে অধিক পরিমাণ নাপাকী থাকে, তাহলে রেশমী কাপড় পরিধান করে সে সালাত আদায় করবে (খুলাসা)। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি নিজের কাপড়ে এক দিরহামের চেয়ে কম পরিমাণ স্থানে নাপাকী পায় তবে ওয়াক্তের মধ্যে যদি অবকাশ থাকে তবে উত্তম হল, কাপড় ধৌত করে পুনরায় সালাত আদায় করা। এক স্থানে জামাআত হয়ে যাওয়ার পর অন্যত্র জামাআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি আশংকা হয় যে, কাপড় ধৌত করতে গেলে জামাআত ছুটে যাবে অথবা ওয়াক্ত চলে যাবে, তাহলে এ অবস্থায়ই সালাত পূরা করে নিবে (যখীরা)। এ হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যদি কোন ব্যক্তি সালাতরত থাকে। যদি সালাত আদায়ে লিপ্ত না থাকে বরং সালাতের বাইরে থাকে এবং লোকদের নিকট যেয়ে দেখে যে, তারা সালাত আদায়ে রত আছে, এমতাবস্থায় তার যদি আশংকা হয় যে, কাপড় ধৌত করতে গেলে জামাআত ছুটে যাবে, তাহলে উত্তম হল, কাপড় না ধুয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাওয়া (খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার কাপড়ে এক দিরহামের চেয়ে অধিক পরিমাণ নাজাসাতে গলীযা (গুরু নাপাকী) পায় এবং তা কবে লেগেছে তা যদি জানা না থাকে, তবে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত রায় অনুসারে আদায়কৃত কোন সালাতই তার পুনরায় আদায় করতে হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত ঃ সরুখ্সী ও আল্ জাওহায়াতুন্ নায়্যারা)।

১০. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি ইমামের কাপড়ে এক দিরহামের চেয়ে কম পরিমাণ নাপাকী দেখে এবং তার মাযহাব এ হয় যে, কম নাপাকী কাপড়ে লাগা অবস্থায় সালাত দুরুস্ত আছে, আর ইমামের মাযহাব হল, কম নাপাকী লাগা অবস্থায় সালাত দুরুস্ত নয়, এ অবস্থায় অজ্ঞাতসারে সালাত আদায়ের পর মুক্তাদীর সালাত সহীহ্ হবে কিন্তু ইমামের সালাত দুরুস্ত হবে না। যদি তাদের মাযহাব এর উল্টো হয়, তাহলে সমাধানও উল্টো হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ নাজাসাত অধ্যায়)। ইমাম নাসীর (র.) বলেন ঃ আমরা এ মতটিই গ্রহণ করেছি (যখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ মোযা ও কাপড়ের উপর যদি নাপাকী থাকে এবং প্রত্যেকটির নাপাকী এক

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিরহাম থেকে কম হয় কিন্তু একত্রিত করলে যদি এক দিরহামের চেয়ে অধিক হয় তাহলে উভয়ের নাপাকী একত্রিত করা হবে এবং এ অবস্থায় সালাত আদায় জাইয হবে না। অনুরূপভাবে মুসল্লীর কাপড়ে যদি কয়েক স্থানে নাপাকী থাকে, তাহলেও সালাত সহীহ্ হবে না (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি যদি এক ভাঁজ বিশিষ্ট কাপড়ে সালাত আদায় করে যেমন জামা ইত্যাদি এবং এর উপর যদি এক দিরহামের কম নাপাকী থাকে এবং তা কাপড়ের অপর পার্শ্বেও প্রকাশিত হয়, তবে এ নাপাকী একত্রিত করা হলে যদি এক দিরহামের বেশী হয় এ অবস্থায় ফকীহ্দের মতানুসারে সালাত না জাইয হওয়ার কোন কারণ নেই এবং এর হুকুম এক কাপড়ের কয়েক স্থানে নাপাকী লেগে থাকা কাপড়ের হুকুমের ন্যায়ও নয়।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন দুই কাপড়ে সালাত আদায় করে যার প্রত্যেকটিতেই এক দিরহামের কম নাপাকী আছে। এ অবস্থায় এতদুভয়ের নাপাকী একত্রিত করা হলে যদি এক দিরহামের অধিক হয়, তাহলে উভয় কাপড়ের নাপাকী একত্রিত করা হবে এবং এ অবস্থায় সালাত সহীহ্ হবে না। কেউ যদি দুই ভাঁজ বিশিষ্ট এমন কাপড়ে সালাত আদায় করে যার এক ভাঁজে নাপাকী লেগে অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এর হুকুম এক কাপড়ে নাপাকী লাগার হুকুমের মতই। এ কাপড়ে সালাত না জাইয নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ কাপড়ের উপর সালাত জাইয নয়। অপরাপর এ দুটো মতামতের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতটি হল ব্যাপক এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতটি হল সতর্কতাপূর্ণ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ দিরহামের উভয় পার্শ্বই নাপাক-এরূপ দিরহাম সঙ্গে নিয়ে যদি কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করে, তবে পসন্দনীয় মতানুসারে তার সালাত না জাইয হবে না (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত। কেননা, উভয় পার্শ্ব মিলে একই দিরহাম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ মুসল্লীর নাক রাখার জায়গা যদি নাপাক হয় এবং কপাল রাখবার জায়গা যদি পাক হয়, তবে মতভেদ ছাড়াই তার সালাত সহীহ্ হবে। অনুরূপভাবে যদি কারো নাক রাখার জায়গা পাক হয় এবং কপাল রাখার জায়গা নাপাক হয় এবং নাকের উপর সিজদা করে এ অবস্থায়ও মতভেদ ছাড়াই সালাত দুরুস্ত হয়ে যাবে। যদি কারো নাক ও কপাল রাখার উভয় স্থান নাপাক হয়, তাহলে ফকীহ্ যান্দবেশ্তী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে সে শুধু নাকের উপর সিজদা করবে, কপালের উপর সিজদা করবে না। কপালে কোন 'ওযর না থাকা সত্ত্বেও এভাবে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কপালে ওযর না থাকা অবস্থায় এভাবে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ্ হবে না। অবশ্য ওযর থাকলে সহীহ্ হবে (মুহীত)। উভয় অঙ্গের উপর সিজদা করলে বিশুদ্ধতম মত অনুসারে সালাত আদৌ জাইয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))।

১৫. মাসআলা ঃ মুসল্লীর উভয় পায়ের নীচে যদি নাপাকী থাকে, তাহলে সালাত আদৌ জাইয হবে না (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদূরী)। গোটা পায়ের নীচে নাপাকী থাকুক বা শুধু আঙ্গুলের নীচে নাপাকী থাকুক এতদুভয় অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুই পায়ের কোন এক পায়ের

নীচে যদি নাপাকী থাকে এবং অপর পায়ের নীচে পাক থাক এভাবে পা রেখে সালাত আদায় করার ব্যাপারে ফকীহ্দের মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে এ অবস্থায় সালাত সহীহ্ হবে না। উক্ত মুসল্লী যদি দুই পায়ের কোন এক পা পাক স্থানে রেখে অপর পা যার নীচে নাপাকী আছে উঠিয়ে রেখে সালাত আদায় করে, তবে এ সালাত দুরুস্ত হবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ সিজদার মধ্যে উভয় হাতের নীচে বা উভয় হাঁটুর নীচে যদি নাপাকী থাকে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা মতে এ সালাত ফাসিদ হবে না। ফকীহ্ আবুল রায়ছ (র.)-এর পসন্দনীয় মতানুসারে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। "উয়ুন" নামক কিতাবে এ মতটিকে সহীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন ব্যক্তি যদি পাক স্থানে দাঁড়িয়ে পাক স্থানে সিজদা করে সালাত আদায় করে এবং সিজদার অবস্থায় তার কাপড় যদি এমন স্থানে গিয়ে পতিত হয়, যেখানে শুকনা নাপাকী রয়েছে অথবা কোন নাপক কাপড়ের উপর পতিত হয়, তাহলে সালাত সহীহ্ হবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ প্রত্যেক পায়ের নীচে যদি এক দিরহামের কম নাপাকী থাকে এবং এগুলোকে একত্র করলে যদি এক দিরহামের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তবে এগুলোকে একত্রিত করা হবে এবং এ অবস্থায় সালাত জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ কাপড়ে নাপাকী লাগা অনুচ্ছেদ এবং মুযমারাতের পসন্দনীয় মত এবং ইতাবিয়্যা)। অনুরূপভাবে সিজদার স্থান ও পায়ের নীচের নাপাকীকে একত্র করা হবে (তাতারখানিয়্যা)। মুসল্লীর কাপড়ে যদি এক দিরহামের কম নাপাকী থাকে এবং পায়ের নীচেও এক দিরহামের কম নাপাকী থাকে আর এগুলোকে একত্র করা হলে যদি এক দিরহামের চেয়ে অধিক পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে এতদুভয় স্থানের নাপাকীকে একত্র করা হবে না (খুলাসা)।

১৮. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন মুসল্লী যদি পাক স্থানে দাঁড়ায়, অতঃপর নাপাক স্থানে চলে যায়, এরপর পুনরায় পাক স্থানে চলে আসে, তাহলে সে যদি নাপাক স্থানে এক রুকন আদায় করার সমপরিমাণ সময় বিলম্ব না করে থাকে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে। আর যদি এক রুক্ন আদায় করার সমপরিমাণ সময় বিলম্ব করে থাকে, তাহলে তার সালাত সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ কাপড়ে ও সালাতের জায়গায় নাপাক লাগা অনুচ্ছেদ)। কোন ব্যক্তি যদি নাপাক স্থানে সালাত শুরু করে পরে পাক স্থানে চলে যায়, তবে ধরতে হবে যে, সে সালাত শুরুই করেনি (খুলাসা)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি সওয়ারীর উপর সালাত আদায় করে এবং এর জিনের মধ্যে নাপাকী থাকে, যেমন রক্ত বা মল আর এ যদি এক দিরহামের অধিক হয়, তাহলে তার এ সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে বিশুদ্ধ মতে সহীহ্ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তি যদি এমন বিছানায় সালাত আদায় করে, যার এক কোণে নাপাকী আছে, এ নাপাকী যদি তার উভয় পায়ের নীচে না হয় এবং সিজদার স্থানেও না হয়, তাহলে এ স্থানে সালাত আদায় করতে কোন বাধা নেই। বিছানা চাই বড় হোক বা এমন ছোট হোক যে, এর এক প্রান্ত নাড়া দিলে অপর প্রান্তেও নাড়া পড়ে। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা ঃ চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মাসেহ্ করার মাসাইল)। কাপড় এবং চাটাইয়ের বিধানও অনুরূপই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ হুজ্জাসত কিতাবে আছে যে, বিছানায় নাপাকী লাগার পর কোথায় নাপাকী লেগেছে তা যদি মনে না থাকে, তাহলে তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করবে এবং যে স্থানটি পাক বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় ঐস্থানেই সালাত আদায় করবে (তাতারখানিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ মুসাল্লা বা জায়নামাযের আস্তর বা ভাঁজে যদি নাপাকী থাকে এবং একটির সাথে অপরটি যদি সেলানো বা লাগানো না থাকে, তাহলে এর উপর সালাত সহীহ্ হবে। যদি একটি অপরটির সাথে সেলানো থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে এর উপর সালাত জাইয হবে। কেননা, সেলানোর কারণে তা এক কাপড় হয়ে যায়নি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এর উপর সালাত সহীহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী র)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতটি অধিক সতর্কতাপূর্ণ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ ভেজা নাপাকীর উপর কাপড় ফেলে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে এই যে, কাপড় যদি এমন হয় যে, তাকে চওড়াভাবে দুই কাপড়ের ন্যায় করা যায়, যেমন লুঙ্গি, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এর উপরে সালাত জাইয হবে। যদি দুই কাপড় বানানো না যায়, তাহলে সালাত জাইয হবে না। নাপাকী যদি শুকনা হয় এবং কাপড় এ পরিমাণ হয়, যার দ্বারা সতর ঢাকা যায়, তবে এ কাপড়েও সালাত জাইয হবে (খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ার মাঝে উল্লেখ আছে যে, কোন কাপড় দুই ভাঁজ করা হলে এর উপরি ভাগ যদি পাক হয় এবং নীচের অংশ পাক না হয়, তবে এ কাপড়ের উপর সালাত আদায় করা জাইয আছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ এবং শরহুল মুনিয়্যা ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ, মুবতাগীর সূত্রে)।

২৪. মাসআলা ঃ জুতা বা চামড়ার মোযা পরিহিত অবস্থায় নাপাকীর উপর দাঁড়িয়ে যদি কেউ সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত জাইয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি জুতা খুলে জুতার উপর পা রেখে কেউ সালাত আদায় করে, তাহলে পায়ের সাথে লাগা জুতার অংশ পাক হলে তার সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। জুতার তলার নীচে মাটি পাক থাকুক বা নাপাক হোক এতে কোন পার্থক্য নেই।

২৫. মাসআলা ঃ ইটের একদিক যদি নাপাক হয় এবং অপরদিক পাক হয়, তাহলে এর উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা জাইয আছে। ইট বিছানো থাকুক বা মাটিতে এমনি রাখা থাকুক এতদুভয় অবস্থার মাঝে কোন পার্থক্য নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি চাকার পাথরের উপর অথবা দরজার উপর অথবা মোটা ফরাশের উপর অথবা চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে যার উপরের অংশ পাক এবং নীচের অংশ নাপাক ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এর উপর সালাত আদায় করা জাইয। শায়খ আবূ বকর ইসকাফ (র)এ মতেই ফাতওয়া দিতেন। এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ)। ছালার চটের হুকুমও অনুরূপই। অনুরূপভাবে কাঠ যদি এ পরিমাণ মোটা হয় যে, তা চিরা যায়, তবে এর পাক অংশের উপরও সালাত আদায় করা জাইয (খুলাসা)।

২৬. মাসআলা ঃ নাপাক স্থানে সালাত আদায়ের ইচ্ছায় কেউ যদি এর উপর মাটি ছিটিয়ে দেয়, তবে দেখতে হবে যে, মাটি যদি পরিমাণে এত কম হয় যে, যদি এর ঘ্রাণ নেয়া হয়, তাহলে নাপাকীর গন্ধ আসে, তাহলে এর উপর সালাত জাইয হবে না। মাটি যদি পরিমাণে বেশী হয় এবং নাপাকীর গন্ধ না পাওয়া যায়, তাহলে সালাত জাইয হবে (তাতারখানিয়্যা)। বিছানো কাপড়ের উপর যদি নাপাকী থাকে এবং এর উপর মাটি ছিটিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এর উপর সালাত আদায় করা জাইয হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৭. মাসআলা ঃ নাপাকীর উপর জামার আস্তিন রেখে এর উপর সিজদা করলে সহীহ্ মতে এ সালাত সহীহ্ হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি তুলা বা এ জাতীয় কোন কিছু ভর্তি করা জামা পরিধান করে সালাত আদায় করে, অতঃপর জানতে পারে যে, এর ভেতর মরা শুকনা ইঁদুর ছিল, তবে জামায় যদি ছিদ্র থাকে বা কোন ফাটা থাকে, তাহলে তিন দিনের সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। যদি এরূপ কিছু না থাকে, তাহলে এ জামা পরে যত সালাত সে আদায় করেছে, সবগুলোই পুনরায় আদায় করতে হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এ প্রসঙ্গের আরো কতিপয় মাসাইল।

২৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি আস্তিনের মাঝে এমন পচা ডিম রেখে সালাত আদায় করে যার কুসুম রক্ত-বর্ণ হয়ে গিয়েছে, তাহলে তার সালাত দুরুস্ত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন ডিমের ভেতর যদি মরা বাচ্চা থাকে, তবে এরূপ ডিম সাথে রেখে সালাত আদায় করাতেও কোন অসুবিধা নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "নিসাব" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সালাত আদায়ের অবস্থায় কারো আস্তিনে যদি পেশাব ভর্তি শিশি থাকে, তবে তার সালাত জাইয হবে না। শিশি পরিপূর্ণ হোক বা না হোক, এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, পেশাবের নাপাকী তার নিজ স্থানে নেই। আর পচা ডিমের হুকুমটি এর বিপরীত। কেননা, পচা ডিমের নাপাকী এর নিজ স্থানে বাকী আছে। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন শহীদ ব্যক্তি যার কাপড়ে রক্ত আছে এরূপ ব্যক্তিকে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ্ হবে। যদি শহীদের কাপড় কাঁধে নিয়ে কেউ সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে না। কোন কিছুর জীবিত বাচ্চা আস্তিনে রেখে এক ব্যক্তি সালাত আরম্ভ করল, সালাত শেষে দেখল, বাচ্চাটি মরে গেছে, এরূপ অবস্থায় তার যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সালাতের মধ্যেই বাচ্চাটি মরেছে, তবে এ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। আর যদি প্রবল ধারণা এরূপ না হয়, বরং এ ব্যাপারে সে সন্দিহান হয়, তাহলে এ সালাত দোহরাতে হবে না (খুলাসা)।

৩০. মাসআলা ঃ উৎপাটিত দাঁত মুখের মধ্যে রেখে সালাত আদায় করলে এ সালাত জাইয হবে। যদিও তা এক দিরহামের বেশী হয়। যাহিরী মাযহাব অনুসারে আমাদের ফকীহ্দের এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এটাই সহীহ্। কেননা, মানুষের দাঁত পাক (কাফী)।

৩১. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লীর ঘাড়ে যদি এমন হাড় থাকে, যার মাঝে কুকুর বা বাঘের দাঁত রয়েছে, তবে সালাত সহীহ্ হবে। কোন মুসল্লীর নিকট যদি ইঁদুর, বিড়াল বা সাপ থাকে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে। কিন্তু সে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপভাবে যে সব প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পানি

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বারা উযূ করা জাইয এর হুকুমও তাই। কারো আস্তিনে যদি শৃগাল অথবা কুকুর বা শূকরের বাচ্চা থাকে, তাহলে তার সালাত সহীহ্ হবে না। কেননা, এগুলোর উচ্ছিষ্ট হল নাপাক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ মুসল্লীর কোলে যদি এমন বাচ্চাকে রাখা হয় যে নিজেকে সামলাতে শিখেনি এবং তার শরীরে যদি এ পরিমাণ নাপাকী থাকে যা নিয়ে সালাত দুরস্ত নয়, তাহলে এ বাচ্চা যদি তার কোলে এ পরিমাণ সময় অবস্থান না করে যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে সে এক রুকন আদায় করতে পারে, তাহলে এর সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি এক রুকন আদায় করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু যে বাচ্চা নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারে তার কারণে কোন অবস্থাতেই সালাত ফাসিদ হবে না। যদিও সে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে। নাপাক কবুতরের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে, যদি তা কোন মুসল্লীর শরীরে বসে (খুলাসা ও ফাতহুল কাদীর)।

৩৩. মাসআলা ঃ জুনুবী এবং উযূহীন ব্যক্তিকে কোন মুসল্লী যদি উঠিয়ে নেয়, তবে তার সালাত দুরুস্ত হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩৪. মাসআলা ঃ নয় স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ ঃ ১. রাস্তার মাঝে, ২. উট বাঁধার স্থানে, ৩. ময়লা রাখার স্থানে, ৪. পশু যবাহ্ করার স্থানে, ৫. পায়খানায়, ৬. গোসলখানায়, ৭. হাম্মামখানায়, ৮. কবরস্তানে এবং ৯. কা'বা শরীফের ছাদের উপর। ঘাস, চাটাই, বিছানা এবং এ জাতীয় বস্তুর উপর সালাত আদায় করতে বা সিজদা করতে কোন অসুবিধা নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা ঃ মুসল্লীর মাথার উপর যদি নাপাক কাপড় ঝুলানো থাকে এবং সে যখন খাড়া হয়, তখন তা তার কাঁধের উপর এসে পড়ে, এমতাবস্থায় সে যদি এক রুকন আদায় করে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে মুসল্লীর গায়ে যদি কোন ব্যক্তি নাপাক আবা ফেলে দেয় তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)।

৩৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি অপর কারো কাপড়ে এক দিরহামের অধিক নাপাকী দেখে, এমতাবস্থায় তার হৃদয়ে যদি এ ধারণা হয় যে, সে বললে উক্ত ব্যক্তি নাপাকী ধৌত করে নিবে, তাহলে বলবে। আর যদি তার মনে ধারণা হয় যে, বললে উক্ত ব্যক্তি কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না, তবে না বলারও অবকাশ আছে। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দান করার বিষয়টিও অনুরূপই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। শামসুল আইম্মা সুরুখ্‌সী (র) বলেন, সৎকাজের আদেশ সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। উক্ত ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (খুলাসা)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়ার মাসাইল

১. মাসআলা ঃ ফরয, নফল, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং সালাতে জানাযা কিবলামুখী হওয়া ব্যতিরেকে জাইয নেই (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ্ একমত যে, যারা মক্কার অধিবাসী তাদের জন্য কা'বা শরীফই হল কিবলা। সুতরাং তাদেরকে ঠিক কা'বার দিকে

মুখ করেই সালাত আদায় করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ ধরনের ব্যক্তি ও কা'বার মাঝে কোন প্রাচীর থাকা এবং না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (তাবয়ীন)। সুতরাং এ ধরনের মানুষ যদি নিজ গৃহে সালাত আদায় করে, তাহলে তাদের জন্য উচিত হল এভাবে সালাত আদায় করা যেন দেয়াল সরিয়ে নিলে কা'বার কোন অংশ তাদের সম্মুখে পড়ে (কাফী)। যদি হাতীমের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে, তবে সালাত সহীহ্ হবে না। (মুহীত)। যারা মক্কার বাইরে কা'বার দিক হল তাদের জন্য কিবলা। অধিকাংশ মাশাইখের মত এটাই এবং এটাই সহীহ্। (তাবয়ীন)। কা'বার দিক চিনা যায় দলীলের দ্বারা। শহর গ্রামবাসীদের জন্য দলীল হল ঐ মিহ্‌রাব যা সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণ তৈরী করেছেন। তাদের অনুকরণ করা আমাদের জন্য জরুরী। কোথাও এ দলীল যদি না থাকে, তবে স্থানীয় লোকদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা জরুরী। সমুদ্র ও মাঠে তারকা দেখে কিবলা নির্ধারণ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কা'বাগৃহের জায়গার দিকে মুখ ফিরাতে হবে। হুবহু কা'বাগৃহের দিকে মুখ ফিরানো জরুরী নয়।

২. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে হুজ্জাতের মধ্যে আছে যে, গভীর কূপের ভেতর, পাহাড়ে, উঁচু টিলার উপর এবং কা'বার ছাদের উপর সালাত আদায় করা জাইয আছে। কেননা, সপ্ত যমীন হতে সপ্ত আকাশ পর্যন্তের কিবলা হল, কাবা শরীফ বরাবর হতে আরশ পর্যন্ত। (মুযমারাত)। কা'বার ভেতরে বা ছাদের উপর যদি কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করে, তবে যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে সালাম আদায় করতে পারবে। কোন ব্যক্তি যদি কা'বার দেয়ালের উপর সালাত আদায় করে, তাহলে তার মুখ যদি কাবার ছাদের দিকে থাকে তবে তার সালাত সহীহ্ হবে। অন্যথায় সহীহ্ হবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কোন শয্যাশায়ী রোগী ব্যক্তি যদি তার মুখ কাবার দিকে ফিরাতে সক্ষম না হয় এবং তার নিকট যদি এমন কোন লোকও না থাকে, যে তাকে কিবলামুখী করে দিবে, তবে সে যেদিকে সম্ভব মুখ করে সালাত আদায় করলে, জাইয হবে (খুলাসা)। যদি কিবলামুখী করে দেয়ার লোক পায় কিন্তু ফিরালে ক্ষতি হয়, তখনও এ হুকুম প্রযোজ্য (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ কিবলার দিকে মুখ ফিরালে যদি আশংকা থাকে, তবে যেদিকে ফিরাতে সক্ষম সেদিকে ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে (হিদায়া)। এ পর্যায়ে শত্রুর ভয়, হিংস্র প্রাণীর ভয় এবং চোরের ভয় সবই সমান। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি নদীর মাঝে কাঠের উপর থাকে এবং কিবলামুখী হলে ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলেও যেদিকে সক্ষম হবে, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে (তাবয়ীন)। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি ওযরের কারণে ফরয সালাত এবং ওযর ছাড়া নফল সালাত সওয়ারীর উপর আদায় করে, তাহলে সে যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে সালাত আদায় করতে পারবে (মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নৌকায় ফরয বা নফল সালাত পড়ার ইচ্ছা করে, তবে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। যে কোন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা জাইয নেই (খুলাসা)। সুতরাং তার সালাত আদায়ের অবস্থায় নৌকা যদি ঘুরে যায়, তবে নৌকা ঘুরার সাথে সাথে সেও ঘুরে যাবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী ইবন আমীরুল হাজ্জ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ কিবলা, দিক নির্ণয়ে কারো যদি সন্দেহ হয় এবং তার নিকট এমন কোন লোক না থাকে যাকে সে কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে, তবে সে মনে মনে চিন্তা করে কিবলা ঠিক করে সালাত আদায় করবে (হিদায়া)। সালাত আদায়ের পর যদি জানা যায় যে, তার ভুল হয়েছে তবে এ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। সালাত আদায়রত অবস্থায় যদি এ ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়, তবে সাথে সাথেই কিবলামুখী হয়ে যাবে এবং বাকী সালাত এভাবেই আদায় করবে (যাহিদী)। কোন ব্যক্তির কাছে যদি এমন লোক থাকে যাকে কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং যে সেখানকার বাশিন্দা ও কিবলা সম্পর্কে অবগত, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করা জাইয নেই (তাবয়ীন)। কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মত মানুষ উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ব্যক্তি যদি তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করে সালাত আদায় করে এবং কিবলা ঠিক হয় তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে অন্যথায় শুদ্ধ হবে না; (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ও শরহুত তাহাবী)। লোক কাছে থাকার সীমা হল, যদি সে তাকে চীৎকার করে ডাকে, তবে সে শুনতে পায় (আল্‌জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

৭. মাসআলা ঃ ময়দানে, বনে-জঙ্গলে যদি কোন ব্যক্তির কিবলা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা করে কোন এক দিকে কিবলা ঠিক করে নেয়, এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য দুই ব্যক্তি যদি বলে কিবলা অন্য দিকে, তবে এ ব্যক্তি দু'জন যদি মুসাফির হয়, তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করবে না। আর যদি স্থানীয় হয়, তবে তাকে তাদের কথার উপরই আমল করতে হবে (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি যদি চিন্তা-ভাবনা করে একদিকে কিবলা ঠিক করে এবং অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করে, তাহলে কিবলা ঠিক হলেও এ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি একদিকে মুখ করে সালাত আরম্ভ করে এবং কিবলা সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ না থাকে, কিন্তু পরে সন্দেহ পয়দা হয়, তবু তার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কিবলা নির্ধারণের ব্যাপারে ভ্রান্তির বিষয়ে যদি ইয়াকীন হয়ে যায়, তবে এ সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব (খুলাসা)। সালাতের ভেতর যদি এ ভ্রান্তি সম্পর্কে কোন লোক জানতে পারে, তবে সে নতুনভাবে সালাত আদায় করবে। যদি এ কথা প্রকাশ হয় যে, সে যথাযথ কিবলার দিকেই সালাত আদায় করেছে, তবে এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। শুদ্ধ মতে আরম্ভকৃত সালাত সে পূর্ণ করবে। নতুনভাবে সালাত আরম্ভ করা ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ কিবলা নির্ধারণের ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ হয়, তা সত্ত্বেও সে যদি চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই সালাত আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় এ সালাতের মধ্যেই যদি তার এ সন্দেহের নিরসন ঘটে অর্থাৎ সে জানতে পারল যে, তার কিবলা ঠিক আছে অথবা কিবলা ঠিক নেই, এরূপ অবস্থায় সে পুনরায় নতুনভাবে সালাত আদায় করে নিবে। যদি সালাত শেষে ভুল ধরা পড়ে অথবা কোন কিছুই প্রকাশিত না হয়, তাহলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। যদি সালাতান্তে এ কথা প্রকাশিত হয় যে, তার কিবলা ঠিকই ছিল, তাহলে তার সালাত সহীহ্ বলে গণ্য হবে (খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ কিবলা কোন্ দিকে এ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করল কিন্তু দিক নির্ণয় করতে পারল না এমতাবস্থায় সে কি করবে, এ সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেন, সে বিলম্বে সালাত আদায় করবে। কারো কারো মতে সে চতুর্দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। কেউ কেউ বলেন, যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে সালাত আদায় করবে (আল বাহ্রুর রাইক)। বিশুদ্ধতম মত হল এ অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নেয়া (মুযমারাত)। একদিকে মুখ করে সালাত আদায় করার পর যদি একথা জাহির হয় যে, কিবলা তার ঠিকই ছিল, তাহলে সালাত জাইয হবে, অনুরূপভাবে যদি একথা প্রকাশ হয় যে, কিবলা ঠিক ছিল না অথবা আদৌ কোন কথা প্রকাশিত না হয়, তাহলেও সালাত দুরুস্ত হবে (যহীরিয়া)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন শহরে যায় এবং সেখানে মিহরাব দেখতে পায়, তাহলে মিহরাবের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে তাহাররীর কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি বন-জঙ্গলে থাকে এবং আকাশ পরিস্কার থাকে এবং তারকা দেখে কিবলা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে তাহাররী করবে না (মুহীত-সুরুখ্সী)। যদি কোন ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করে, যেখানে মিহ্রাব নেই'। ফলে কিবলা নির্ধারণ করা তার জন্য জটিল হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করে একদিকে মুখ করে সালাত আদায় করার পর যদি এ কথা প্রকাশ হয় যে, কিবলা নির্ধারণ তার ভুল হয়েছে, তাহলে এ সালাত পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা, সে সেখানকার বাশিন্দাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম ছিল। যদি একথা প্রকাশ হয় যে, সে ঠিক কিবলার দিকেই সালাত আদায় করেছে, তবে সালাত দুরুস্ত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর যদি লোকেরা এ সম্পর্কে সংবাদ না দেয়, ফলে বাধ্য হয়ে সে চিন্তা-ভাবনা করে সালাত আদায় করে, তাহলেও সালাত জাইয হবে। যদিও পরে এ কথা প্রকাশ হয় যে, সে ভুল দিকে সালাত আদায় করেছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে অন্ধকার রজনীতে চিন্তা-ভাবনা করে সালাত আদায় করার পর তার নিকট এ কথা প্রকাশিত হল যে, সে কিবলার দিকে সালাত আদায় করেনি, তবু সালাত সহীহ্ হবে। কেননা, কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মানুষের দুয়ার খটখটানো তার উপর ওয়াজিব নয়। চিন্তা-ভাবনা করে কিবলা নির্ধারণ করে এক রাকাআত সালাত আদায় করার পর যদি কারো রায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় রাকাআত অন্যদিকে ফিরে আদায় করে, অতঃপর আবার তার রায় পরিবর্তন হয় এবং প্রথমে যেদিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে কিবলা সেদিকে বলে মনে করে, তবে তার করণীয় কি এ নিয়ে ফকীহ্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সে প্রথম দিকে ফিরে বাকী সালাত সমাধা করবে। আর কেউ কেউ বলেন, নতুনভাবে প্রথম থেকে সালাত আদায় করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ ময়দানের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাররী করে সালাত শুরু করার পর চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তি যদি তার ইকতেদা করে, তাহলে ইমামের কিবলা ঠিক হয়ে থাকলে উভয়ের সালাত দুরুস্ত হবে। আর ইমামের কিবলা ঠিক না হয়ে থাকলে ইমামের সালাত সহীহ্ হবে। কিন্তু মুক্তাদীর সালাত সহীহ্ হবে না (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ মক্কায় অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির যদি কিবলা সম্পর্কে সন্দেহ হয় যেমন সে বন্দী ছিল এবং জিজ্ঞাসা করার মত তার নিকটে কোন লোকও ছিল না, এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করে সালাত আদায় করার পর যদি এ কথা প্রকাশ হয় যে, সে ভুল করেছে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ সালাত পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। এটাই যুক্তিসম্মত কথা মদীনায় অবস্থানরত কোন ব্যক্তির যদি এরূপ হয়, তবে এরও এই হুকুম (যহীরিয়্যা)। কিবলা নির্ধারণের ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ হয়। অতঃপর চিন্তা-ভাবনা করে সে একদিকে মুখ ফিরিয়ে এক রাকাআত সালাত আদায় করে, এরপর তার রায় পরিবর্তন হয় এবং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে, এমনি করে চার রাকআত সে চার দিকে মুখ ফিরিয়ে আদায় করে, এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত দুরুস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ চিন্তা-ভাবনা করে এক রাকাআত আদায় করার পর যদি কারো রায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় রাকাআত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আদায় করে, অতঃপর স্মরণ হয় যে, প্রথম রাকাআতের এক সিজদা তাঁর ছুটে গিয়েছে তবে এ ব্যক্তির করণীয় কি এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (কিনয়া)। এক ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে সালাত আরম্ভ করল, আসলে তার ধারণা ভুল ছিল কিন্তু এ সম্বন্ধে তার জানা ছিল না, অতঃপর সালাতের ভেতরই সে তার এ ভ্রান্তি সম্বন্ধে জানতে পারল এবং কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসল, সে তার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে অবগত, এতদসত্ত্বেও আগন্তুক যদি তার সাথে সালাতে শরীক হয়, তাহলে প্রথম ব্যক্তির সালাত জাইয হবে এবং আগন্তুকের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

১৭. মাসআলা ঃ কোন অন্ধ ব্যক্তি কিবলামুখী না হয়ে এক রাকাআত আদায় করল, এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তি এসে তাকে কিবলামুখী করে দিল এবং তার পেছনে ইকতেদা করল। এরূপ অবস্থায় অন্ধ ব্যক্তির সালাত আরম্ভের সময় কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তার নিকট যদি কোন লোক উপস্থিত থাকে এবং সে তাকে কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে, তাহলে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের সালাতই ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোক তার নিকটে উপস্থিত না থাকে, তাহলে ইমামের সালাত সহীহ্ হবে এবং মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ অন্ধকার রজনীতে কিবলা সম্পর্কে যদি এক দল মানুষের সন্দেহ হয় এবং তারা ঘরের ভেতর থাকে এবং কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাদের নিকট কোন নির্ভরযোগ্য মানুষও না থাকে এবং কিবলার দিক-নির্দেশক কোন চিহ্ন বা আলামতও তাদের নিকট না থাকে অথবা তারা বন-জঙ্গলে ছিল, এমতাবস্থায় তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা এবং চিন্তা অনুসারে সালাত আদায় করে নিল। তারা যদি পৃথক পৃথক ভাবে সালাত আদায় করে, থাকে তাহলে তাদের সকলের সালাতই দুরুস্ত হয়ে যাবে। চাই তাদের কিবলা ঠিক হোক বা না হোক। আর যদি এক সাথে জামাআতে সালাত আদায় করে থাকে, তাহলেও সকলের সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইমামের থেকে অগ্রগামী অথবা যে ব্যক্তি সালাতের মাঝেই ইমামের

বৈপরীত্যের কথা জানতে পেরেছে, তার সালাত জাইয হবে না। এমনিভাবে যার ধারণা ছিল যে, সে ইমামের আগে আছে অথবা ইমামের বিপরীত দিকে সালাত আদায় করেছে, তাদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১৯. মাসআলা ঃ এক দল মানুষ বন-জঙ্গলে চিন্তা-ভাবনা করে সালাত আদায় করল, তাদের মাঝে মাসবূক এবং লাহিক মুসল্লীও ছিল, ইমাম সালাত শেষ করার পর তারা উভয়েই বাকী সালাত পূরা করার নিমিত্তে দাঁড়াল এ সময় এ কথা প্রকাশিত হল যে, ইমাম যেদিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে ঐ দিকে কিবলা ছিল না, তাহলে মাস্বূকের সালাতের সংশোধন হতে পারে, যেমন সে কিবলার দিকে ফিরে গেল। কিন্তু লাহিকের[১] সালাতের সংশোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। (খুলাসা)[২]। মাসবূক ঃ যার সালাতের প্রথমাংশ ছুটে গেছে। লাহিক ঃ যে প্রথম হতে সালাতে শরীক ছিল, মাঝে উযূ নষ্ট হওয়ায় উযূ করতে সালাতের এক রুকন ছুটে গেছে, তারপর শরীক হয়েছে।

২০. মাসআলা ঃ সালাতের মাঝে কিবলা ঠিক করার জন্য যেমনিভাবে তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করা জরুরী, এমনিভাবে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যও তাহাররী করে কিবলা ঠিক করে নেয়া জরুরী (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা

১. মাসআলা ঃ ফরয এবং নফল সালাত কা'বা ঘরের ভেতর আদায় করা জাইয আছে। যদি এক দল মানুষ কাবা ঘরের ভেতর জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে এবং তারা ইমামের চার পাশে দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় যার পিঠ ইমামের পিঠের দিকে থাকবে অথবা যার চেহারা ইমামের পিঠের দিকে থাকবে, তার সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। যার চেহারা ইমামের চেহারার দিকে থাকবে তার ও ইমামের মাঝে যদি সুতরা না থাকে, তাহলে তার সালাত সহীহ্ হবে কিন্তু মাকরূহ হবে। কিন্তু সুতরা থাকলে মাকরূহ হবে না। যার পিঠ ইমামের চেহারার দিকে থাকবে তার সালাত সহীহ্ হবে না (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা ও আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যে লোক ইমামের ডানে বা বামে থাকবে, সে যদি ইমাম যে দেয়ালের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছে এর প্রতি ইমামের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী না হয়, তবে তার সালাতও সহীহ হবে (যাদ ও শরহুল মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ ইমাম যদি মসজিদে হারামের মধ্যে সালাত আদায় করে এবং মুসল্লীগণ কা'বার চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে দাঁড়ায় এবং ইমামের সাথে শরীক হয়ে সালাত আদায় করে, তবে যে ব্যক্তি ইমামের দিক ব্যতীত অন্যদিকে ইমামের তুলনায় কাবার অধিক নিকটবর্তী তার সালাতও সহীহ্ হবে। কিন্তু ইমাম যেদিকে দাঁড়িয়েছেন, সেদিকের যে ব্যক্তি ইমামের তুলনায় কা'বার অধিক নিকটবর্তী হবে, তার সালাত সহীহ্ হবে না (হিদায়া)।

১. লাহিক ঃ যে প্রথম হতে সালাতে শরীক ছিল, মাঝে উযূ নষ্ট হওয়ায় উযূ করতে সালাতের এক রুকন ছুটে গেছে, তারপর শরীক হয়েছে

২. মাসবূক ঃ যার সালাতের প্রথমাংশ ছুটে গেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ ইমাম যদি কাবার ভেতর দাঁড়ায় এবং মুক্তাদীগণ কাবার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, তবে কাবার দরজা খোলা থাকলে সকলের সালাতই সহীহ্ হয়ে যাবে। (তাবয়ীন)। কোন মহিলা যদি ইমামের সামনে দাঁড়ায় এবং ইমাম তার ইমামতের নিয়্যাত করে আর উভয়ের চেহারা যদি মুখোমুখি থাকে, তবে ইমামের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি মহিলা অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়ায়, তাহলে ফাসিদ হবে না (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কা'বার ভেতর এক রাকআত একদিকে মুখ করে আদায় করে এবং অন্য রাকআত অন্যদিকে মুখ করে আদায় করে, তবে তার সালাত দুরুস্ত হবে না। কেননা, যেদিক কিবলা হওয়া নিশ্চিত ছিল, তা বিনা কারণে সে পরিবর্তন করে নিয়েছে (বাদাই')।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ নিয়্যাতের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ সালাতে দাখিল হওয়ার ইচ্ছা করাকে নিয়্যাত বলে। নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার জন্য মনের অবগতি হল শর্ত। অর্থাৎ একথা জানা থাকা যে, সে অমুক সালাত আদায় করছে। এর নিম্নতম পর্যায়ে হল, কেউ যদি মুসল্লীকে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারে যে, আমি অমুক সালাত আদায় করছি। জিজ্ঞাসা করার পর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে সে যদি উত্তর দিতে না পারে, তবে তার নিয়্যাত সহীহ্ হবে না এবং সালাতও দুরুস্ত হবে না। নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার জন্য মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা জরুরী নয়। যদি উচ্চারণ করেও নিয়্যাত করে, তবে দিলের ইরাদার সাথে মৌখিক উচ্চারণের সমন্বয় সাধিত হওয়ার ফলে এরূপ করা ভাল (কাফী)। হৃদয়ের একাগ্রতা এবং হুযূরে কলবের সাথে নিয়্যাত করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য মৌখিক নিয়্যাত করাই যথেষ্ট (যাহিদী)

২. মাসআলা ঃ নফল, সুন্নাত এবং তারাবীহের জন্য শুধু সালাতের নিয়্যাত করাই যথেষ্ট। এটাই বিশুদ্ধ মত (তাবয়ীন)। এটাই প্রকাশ্য জওয়াব এবং অধিকাংশ মাশাইখ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (তাজ্নীস)। অবশ্য তারাবীহের সালাতে তারাবীহ বা সুন্নাতে ওয়াক্ত বা কিয়ামুল লায়লের নিয়্যাত করা ভাল (মুনিয়াতুল মুসল্লী)

৩. মাসআলা ঃ সুন্নাত সালাতের মাঝে রাসূল (সা)-এর অনুকরণের লক্ষ্যে সতর্কতা হল, সালাতের নিয়্যাত করা (যখীরা)। ফকীহ্দের মতে ফরয এবং ওয়াজিব সালাত শুধু সাধারণ নিয়্যাতের দ্বারা আদায় হয় না (গিয়াছিয়্যা)। সুতরাং ফরয ওয়াজিব সালাতে নির্ধারিত নিয়্যাত করা জরুরী। এভাবে বলবে যে, আমি অদ্যকার যুহরের বা আসরের বা অত্র ওয়াক্তের বা অত্র ওয়াক্তের যুহরের সালাত আদায় করছি (শরহুল মুকাদ্দমা ঃ আবুল লায়ছ)। শুধু ফরযের নিয়্যাত যথেষ্ট নয়। যদি ওয়াক্তের ফরযের নিয়্যাত করে, তবে জাইয আছে। কিন্তু জুমুআর সালাতে জাইয হবে না। যদি জুমুআর দিন ব্যতীত অন্যদিনে যুহরের নিয়্যাত করে, তবে কারো কারো মতে জাইয হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্তের মাঝে সালাত আদায়কালে ওয়াক্তের ফরযের

নিয়্যাত করে তবে এও জাইয আছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর সালাত আদায় করে এবং তার ওয়াক্ত চলে যাওয়ার খবর না থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি ওয়াক্তের ফরযের নিয়্যাত করে, তবে সালাত সহীহ্ হবে না (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন ব্যক্তি যদি অদ্যকার যুহরের নিয়্যাত করে, তবে জাইয আছে। যদিও ওয়াক্ত চলে যায়। ওয়াক্ত চলে যাওয়া সম্পর্কে সন্দিহান ব্যক্তির এ পন্থাই অবলম্বন করা উচিত (তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ সালাতে জানাযার মধ্যে এ ভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি দু'আর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করছি। দুই ঈদের সালাতে সালাতুল ঈদের নিয়্যাত করবে এবং বিতরের সালাতে "সালাতুল বিতরের" নিয়্যাত করবে (যাহিদী)। "আলগায়া" নামক কিতাবে আছে যে, বিতরের সালাতে এ নিয়্যাত করবে না যে, এ হল ওয়াজিব। কেননা, ফকীহ্দের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ মান্নতের সালাত এবং তাওয়াফের দুই রাকআত সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাবে নিয়্যাত করা শর্ত (আল বাহ্রুর রাইক)। রাকআতের সংখ্যার নিয়্যাত করা শর্ত নয় (শরহে বেকায়া)। তাই কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ রাকআতের নিয়্যাত করে চার রাকআত পড়ে বসে যায়, তাহলে জাইয আছে। এ ক্ষেত্রে পাঁচ রাকআতের নিয়্যাত বেকার হয়ে যাবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লীঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ)।

৭. মাসআলা ঃ কা'বার দিকে মুখ করার নিয়্যাত করা শর্ত নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)।

৮. মাসআলা ঃ কাযার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করা শর্ত (ফাতহুল কাদির)। যদি কারো যিম্মায় অনেক কাযা থাকে এবং সে তা পড়তে আরম্ভ করে, তাহলে যুহর, আসর ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে নিয়্যাত করতে হবে। এবং এ-ও বলতে হবে যে, আমি অমুক দিনের যুহর বা অমুক দিনের আসর আদায় করছি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও যহীরিয়্যা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন ঃ প্রাসঙ্গিক মাসাইল অনুচ্ছেদ)। কোন ব্যক্তি যদি সহজতর পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায়, তাহলে বলবে, "আমি আমার যিম্মার প্রথম যুহরের কাযা করছি" (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান), যহীরিয়্যা এবং তাবয়ীন ঃ আনুষাঙ্গিক মাসাইল)।

৯. মাসআলা ঃ যে নফল আরম্ভ করে ভঙ্গ করে ফেলা হয়েছে এর কাযা পড়ার সময়ও নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করতে হবে (তাবয়ীন)। কাযা পড়ার সময় কেউ নিয়্যাত করল যে, আমি শনিবারের অমুক সালাতের কাযা করছি, আসলে তা রবিবারের কোন এক সালাত ছিল অথবা এর বিপরীত হল। এ বিষয়ে ফকীহ্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ওয়াক্তিয়া সালাতের মাঝে এরূপ হলে জাইয হবে (যাহিদী)। অন্তরে যুহরের নিয়্যাত ছিল কিন্তু মুখে আসরের কথা বেরিয়ে আসল, তাহলে ও সালাত দুরুস্ত হবে (শরহে মুকাদ্দমা ঃ আবুল লায়ছ (র) এবং কিন্য়া)।

১০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ফরয সালাত আরম্ভ করল পরে মনে হল যে, সে নফল পড়ছে এবং এ ধারণার উপরই সালাত শেষ করল। এ অবস্থায়ও ফরয সালাতই আদায় হবে। যদি অবস্থা এর বিপরীত হয়, তবে জওয়াবও অনুরূপ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যুহর শুরু করে যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ নফল বা আসর বা কাযা বা জানাযার নিয়্যাত করে এবং তাকবীর বলে, তাহলে সে প্রথমে শুরুকৃত সালাত থেকে বের হয়ে যাবে এবং অন্য সালাত আরম্ভ হয়ে যাবে।

১১. মাসআলা ঃ তাকবীর ব্যতীত শুধু নিয়্যাতের দ্বারা কোন মানুষ এক সালাত হতে অন্য সালাতে যেতে পারবে না (তাতারখানিয়্যা, ইতাবিয়্যার সূত্রে)। যুহরের এক রাকআত আদায় করার পর যদি কোন ব্যক্তি তাকবীর বলে এবং যুহরের নিয়্যাত করে, তবে ঐ সালাত এভাবেই থাকবে এবং প্রথম রাকআতও দুরস্ত হয়ে যাবে। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি দিলে দিলে নিয়্যাত করে। যদি মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা হয় এবং বলা হয়, আমি যুহরের সালাতের নিয়্যাত করলাম, তাহলে তার সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ঐ রাকআতও সহীহ্ হবে না (খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নফলের নিয়্যাতে তাকবীর বলে, অতঃপর ফরযের নিয়্যাতে তাকবীর বলে, তবে ফরয শুরু হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুনফারিদ (একা সালাত আদায়কারী) ব্যক্তির তিন ধরনের নিয়্যাতের প্রয়োজন ঃ (১) সে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করছে, (২) কোন সালাত আদায় করা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করা, (৩) কিবলার নিয়্যাত করা। এরূপ করলে সমস্ত ইমামের মতে তার সালাত জাইয হয়ে যাবে (খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ একা সালাত আদায়কারী যা নিয়্যাত করবে ইমামও তা নিয়্যাত করবে। ইমামতের নিয়্যাত করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং ইমাম যদি এ কথার নিয়্যাত করে যে, সে অমুকের ইমামত করবে না এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি এসে তার পেছনে ইক্তেদা করে, তবে তার সালাত জাইয হবে। মহিলাদের ইমামতের জন্য নিয়্যাত জরুরী। নিয়্যাত ব্যতীত কোন পুরুষ কোন মহিলার ইমাম হতে পারবে না (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কারো পেছনে ইক্তেদা করে, তবে একা সালাত আদায়কারীর ন্যায় নিয়্যাত করবে এবং ইক্তেদারও নিয়্যাত করবে, তবেই তার সালাত সহীহ্ হবে। কেননা, নিয়্যাত ব্যতীত ইক্তেদা সহীহ্ হয় না (ফাতাওয়া কাযীখান)। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি ইমামের সালাত শুরু করছি বা আমি ইমামের সালাতের ইক্তেদা করছি, তবে তার সালাত জাইয হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি শুধু ইক্তেদার নিয়্যাত করে অন্য কিছুর নয়, তবুও তার সালাত সহীহ্ হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মি'রাজুদ দিরায়া)। কোন ব্যক্তি যদি ইমামের সালাতের নিয়্যাত করে বা ইমামের ফরযের নিয়্যাত করে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে না (তাবয়ীন)।

১৫. মাসআলা ঃ ইমামের "আল্লাহু আকবার" বলার পর ইকতেদার নিয়্যাত করা উত্তম। এরূপ করলেই মুসল্লীর ইমামের পেছনে ইকতেদা করা সম্ভব হবে। ইমাম ইমামতির স্থানে দাঁড়ানোর সময় কোন ব্যক্তি যদি তার পেছনে ইকতেদা করার নিয়্যাত করে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে এ নিয়্যাত সহীহ্ হবে। ইমাম যাহিদ ইসমাঈল (র) এবং হাকিম আবদুর রহমান কাতিব এ মর্মেই ফাতওয়া দিতেন। এ মতটিই সুন্দর (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি "ইমামের সালাত" শুরু করার নিয়্যাত করে, অথচ এখনো পর্যন্ত ইমাম সালাত শুরু করেনি এবং এ সম্পর্কে উক্ত লোকও জানে, তবে ইমামের

সালাত আরম্ভ করার পর তার সালাতও আরম্ভ হয়ে যাবে। (মুহীত ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম সালাত শুরু করেছে এ ধারণায় কোন ব্যক্তি যদি এ মর্মে নিয়্যাত করে যে,আমি ইমামের সালাত আরম্ভ করছি অথচ এখনো পর্যন্ত ইমাম সালাত শুরু করেনি, তবে উক্ত মুক্তাদীর ইকতেদা সহীহ্ হবে না। (কাযীখান ও মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমামের পেছনে ইকতেদা করে এবং ইমামের সালাতের নিয়্যাত করে কিন্তু তার এ কথা জানা নেই যে, ইমাম জুমুআ পড়ছে, না যুহর পড়ছে, তবু তার সালাত দুরুস্ত হবে। কোন ব্যক্তি যদি ইমামের ইকতেদা করে কিন্তু ইমামের সালাতের নিয়্যাত না করে বরং সে যুহরের নিয়্যাত করেছে অথচ ইমাম জুমুআ আদায় করছে, তবে তার সালাত জাইয হবে না। মুক্তাদী যদি সহজতর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায়, তবে সে ইমামের সালাতের নিয়্যাত করবে এবং ইক্তেদার নিয়্যাত করবে অথবা এ মর্মে নিয়্যাত করবে যে, ইমাম যে সালাত আদায় করছে আমিও তাই আদায় করবো (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ জুমুআর সালাতে কোন ব্যক্তি যদি ইমামের ইকতেদা করে এবং জুমুআ ও যুহর উভয়ের নিয়্যাত করে, তবে কোন কোন ফকীহ্-এর মতে এরূপ করা জাইয আছে এবং তাঁরা ইকতেদার কারণে জুমুআর বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি ইমামের পেছনে ইকতেদা করে কিন্তু তার খিয়াল যে ইমাম যায়দ না আমর অথবা এরূপ খিয়াল ছিল যে, সে হচ্ছে যায়দ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হল আমর, এ অবস্থায়ও তার ইকতেদা সহীহ্ হবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। যদি মুক্তাদী ইমামের শরীর দেখে এবং বলে, আমি এ ইমামের পেছনে ইকতেদা করলাম, তার নাম হল আবদুল্লাহ্। অথবা সে ইমামের শরীর দেখতে পাচ্ছে না, না দেখে বলল, মিহরাবের মাঝে দন্ডায়মান আবদুল্লাহ্ নামক ইমামের পেছনে আমি ইকতেদা করলাম। পরে দেখা গেল, তার নাম 'আবদুল্লাহ্ নয়, বরং তার নাম হল জা' ফর। তবে মুক্তাদীর সালাত জাইয হবে (মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এ বলে নিয়্যাত করে যে, আমি যায়দের পেছনে ইকতেদা করলাম, অথচ ইমাম হল 'আমর, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে না (তাবয়ীন)। বড় জামাআতে মুক্তাদীর জন্য উচিত হল ইমামকে ব্যক্তিগত ভাবে নির্দিষ্ট না করা। এমনিভাবে সালাতে জানাযার মাঝেও মায়্যিতকে নাম বলে নির্ধারিত না করা উচিত (যহীরিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ মুসল্লী ছয় প্রকার। এক ঃ ঐ ব্যক্তি, যে সালাতের ফারায়েয এবং সুন্নাত সম্পর্কে অবগত। এবং সে এও জানে যে, ফরযের মানে হল, কেউ যদি তা বাস্তবায়ন করে, তবে ছওয়াব পাবে আর বর্জন করলে শাস্তির উপযুক্ত হবে। অনুরূপভাবে সে জানে যে, সুন্নাতের অর্থ হল, কেউ যদি এর বাস্তবায়ন করে, তাহলে সে ছওয়াব পাবে, আর যদি বর্জন করে, তবে শাস্তিযোগ্য হবে না। এ ধরনের কোন ব্যক্তি যদি শুধু ফজর বা যুহরের নিয়্যাত করে, তবে সহীহ্ হবে। যুহরের নিয়্যাতে ফরযের নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই। দুই ঃ ঐ ব্যক্তি, যে উপরোক্ত সবকিছু জানে এবং ফরযকে ফরয জেনে নিয়্যাত করে। অবশ্য সে এ কথা জানে না যে, এর মাঝে কতটি ফরয এবং কতটি সুন্নাত আছে। তবে তার নিয়্যাতও এভাবে জাইয হবে। তিন ঃ ঐ ব্যক্তি, যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফরযের নিয়্যাত করে কিন্তু ফরযের অর্থ জানে না, তার নিয়্যাত দুরুস্ত হবে না। চার ঃ ঐ ব্যক্তি, যে একথা জানে যে, লোকেরা যে সালাত আদায় করছে এর মাঝে কতিপয় ফরয এবং সুন্নাত ও নফল আমল রয়েছে। আর অন্যান্য লোক যেভাবে সালাত আদায় করছে, সেও সেভাবেই পড়বে, কিন্তু সে ফরয ও নফলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তবে তার সালাত জাইয হবে না। পাঁচ ঐ ব্যক্তি, যে এ কথা বিশ্বাস করে, এ সবই ফরয, তার সালাত জাইয হবে। ছয় ঃ ঐ ব্যক্তি, যে এ কথাও জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর সালাত ফরয করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে যদি ওয়াক্ত মত সালাত আদায় করে, তবে তার সালাতও দুরুস্ত হবে না (কিনয়া)।

২১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ফরয ও নফলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং প্রত্যেক সালাতে ফরযের নিয়্যাত করে, তবে যে সালাতের পূর্বে সুন্নাত নেই এ সালাতের মাঝে তার ইকতেদা সহীহ হবে। যেমন আসর, মাগরিব ও ঈশা। আর যে সালাতের পূর্বে সুন্নাত আছে এ সালাতের মাঝে তার ইকতেদা সহীহ্ হবে না। যেমন ফজর ও যুহ্র (শরাহুল মুনিয়্যা ঃ ইবন আমীরুল হাজ্জ ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের মায্হাবের ফকীহ্দের সর্বসম্মত রায় হল, সালাত শুরু করার সাথে সাথে নিয়্যাত করা উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তাকবীর বলার পূর্বে যে নিয়্যাত করা হয়, তা তাকবীরের সময়ের নিয়্যাতের মতই--যদি নিয়্যাতের পর নিয়্যাত বাতিল করার মত কোন কিছু না পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন কাজ যা, সালাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (কাফী)। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি নিয়্যাত করার পর উযূ করে এবং এরপর মসজিদে যেয়ে তাকবীর বলে, কিন্তু এ সময় নিয়্যাত তার অন্তরে ছিল না, তবু তার সারাত দুরুস্ত হবে। কেননা, তাকবীরের পরের নিয়্যাত ধর্তব্য নয় (তাবয়ীন)।

২২. মাসআলা ঃ রিয়া (লোক-দেখানো) ফরয আমলের মধ্যে ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে না (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকতার সাথে সালাত আরম্ভ করে, অতঃপর তার অন্তরে রিয়া অনুপ্রবেশ করে, তবে সে যে অবস্থায় সালাত আরম্ভ করেছে ঐ অবস্থার উপরই গণ্য হবে। নির্জনে থাকা অবস্থায় নামায না পড়া এবং লোকালয়ে থাকা অবস্থায় লোক-দেখানোর জন্য খুব নামায পড়া ও ইবাদত করাকে শরীআতে রিয়া বলা হয়। মানুষের সামনে খুব উত্তমরূপে সালাত আদায় করে কিন্তু একা পড়লে উত্তমরূপে আদায় করে না। এরূপ ব্যক্তি মূল সালাতের ছওয়াব পাবে কিন্তু উত্তমরূপে পড়ার ছওয়াব পাবে না (মুযমারাত ঃ নফলসমূহের বিবরণ অনুচ্ছেদ; ইতাবিয়্যার সূত্রে বর্ণিত)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে যুহরের সালাত পড়তে গিয়ে ইমামকে বসা অবস্থায় পেল। তার জানা নেই যে, এটা ইমামের প্রথম বৈঠক না আখিরী বৈঠক। এ অবস্থায় সে যদি ইমামের পেছনে ইকতেদা করে এবং এ নিয়্যাত করে যে, এটা যদি ইমামের প্রথম বৈঠক হয়, তবে আমি তার পেছনে ফরয সালাতের ইক্তেদা করলাম। আর যদি আখিরী বৈঠক হয়, তবে আমি তার পেছনে নফলের ইকতেদা করলাম। এভাবে নিয়্যাত করলে ফরযের ক্ষেত্রে তার ইকতেদা সহীহ্ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে সালাতের মধ্যে পায় কিন্তু এ কথা জানা নেই যে, ইমাম ঈশা পড়ছেন, না তারাবীহ্ এরূপ অবস্থায় সে যদি ইমামের পেছনে এ নিয়্যাতে ইকতেদা করে যে, এ যদি ফরয সালাত হয়, তবে আমি ইকতেদা করলাম। যদি তারাবীহ্ হয়, তবে ইকতেদা করলাম না। এরূপে ইকতেদা করলে ইকতেদা সহীহ্ হবে না। যদি এরূপ বলে যে, যদি ঈশা হয়, তবে আমি তার পেছনে ইকতেদা করছি। আর যদি তারাবীহ হয়, তবু ইকতেদা করছি। অতঃপর এ কথা প্রকাশ হল যে, ইমাম তারাবীহ্ পড়ছেন, তাহলে ইকতেদা সহীহ্ হবে (তাজনীস)। কেউ যদি ইমামকে সালাতের মধ্যে পায় এবং তার এ কথা জানা নেই যে, ইমাম ফরয পড়ছে, না তারাবীহ্, এ অবস্থায় সে যদি বলে যে, ঈশা হলে ইকতেদা করলাম, আর তারাবীহ্ হলে ইকতেদা করলাম না। এভাবে নিয়্যাত করলে ইকতেদা সহীহ্ হবে না। চাই ইমাম ঈশা পড়ুক আর তারাবী পড়ুক। সে যদি বলে ঈশার সালাত হলে ইকতেদা করলাম এবং তারাবীহ্ হলেও ইকতেদা করলাম, অতঃপর প্রকাশিত হল যে, ইমাম ঈশা পড়ছেন বা তারাবীহ্ পড়ছেন, তাহলে ইকতেদা সহীহ্ হবে (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের সিফাত এবং অবস্থা সম্বন্ধে

[এই পরিচ্ছেদে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ফরযসমূহের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সালাতের ফরয ছয়টি ঃ (১) তাহ্‌রীমা বাঁধা। তাহ্‌রীমা বাঁধা আমাদের মাযহাবে শর্ত। সুতরাং কেউ যদি ফরযের জন্য তাহ্‌রীমা বাঁধে, তবে এ তাহ্‌রীমা দ্বারা নফল সালাত আদায় করাও জাইয আছে (হিদায়া)। কিন্তু ফরয থেকে বের হওয়ার যে পদ্ধতি শরীঅত নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা বর্জন করার কারণে এরূপ করা মাকরূহ। এক ফরযের তাহ্‌রীমার উপর অন্য ফরযের ভিত্তি করা কোন ইমামের মতেই জাইয নেই। অনুরূপভাবে নফলের তাহ্‌রীমার উপর ফরযের ভিত্তি করাও জাইয নেই (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। নাপাকীর বোঝা মাথায় এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তাহ্‌রীমা বাঁধে এবং তাহ্‌রীমা বলার পরপরই যদি সে তা ফেলে দেয় অথবা সতর খোলা কোন মানুষ যদি তাহ্‌রীমা বলার পরপরই সামান্য আমলের মাধ্যমে নিজের সতর ঢেকে নেয় অথবা সূর্য হেলার পূর্বে তাকবীর আরম্ভ করা হয় এবং তাকবীর বলার পরপরই সূর্য হেলে যায় অথবা তাকবীর বলার সময় কেউ কিবলাবিমুখ ছিল কিন্তু তাকবীর বলার পরপরই সে যদি কিবলামুখী হয়ে যায়, তবে উপরোক্ত সকলের সালাতই দুরুস্ত হয়ে যাবে (আল বাহ্‌রুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ "আল্লাহু আকবর"-এর পরিবর্তে কেউ যদি "সুবহানাল্লাহ" বা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" দ্বারা সালাত আরম্ভ করে, তবে জাইয আছে[১]। কিন্তু "আল্লাহু আকবর" শব্দের দ্বারা শুরু করাই উত্তম (তাবয়ীন)। তাকবীর ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সালাত আরম্ভ করা মাকরূহ্ কিনা এ বিষয়ে মাশাইখদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এরূপ করা মাকরূহ্। এটাই বিশুদ্ধতম মত (যখীরা, মহীত ও যহীরিয়্যা)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ বিষয়ে মূল বিধান হল এই যে, আল্লাহ্‌র নামসমূহের মাঝে যে সব নাম তাযীমের অর্থ প্রকাশ করে এর দ্বারা সালাত আরম্ভ করা জাইয আছে। যেমন, আল্লাহ, ইলাহুন, সুবহানাল্লাহ্ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (তাবয়ীন)। এমনিভাবে আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা গায়রুহু এবং তাবারাকাল্লাহ দ্বারাও সালাত

১. গবেষক হানাফী ফকীহ্ মুহাদ্দিছগণের অভিমত হলো ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) এ উক্তি কুরআন-হাদীছের বর্ণনার ধারায় যুক্তির খাতিরে করেছেন। অন্যথায় তাঁর মতে আল্লাহু আকবর শব্দ দ্বারাই তাহ্‌রীমা শুরু করা ওয়াজিব তথা অবশ্য জরুরী। কেউ যদি অন্য শব্দ দ্বারা তাহ্‌রীমা করে, তবে তার সালাত মাকরূহ হয়ে যাবে। কাজেই পরবর্তী বাক্যে 'উত্তম' বলা কতটুকু সমীচীন হয়েছে, তা বিবেচ্য, মূল কিতাবে ' الاولى ' শব্দ আছে। কাজেই অনুবাদ ঠিক হয়েছে। আপত্তি অনুবাদে নয়, মূল কিতাবের শব্দে। পরবর্তীতে যা বলেছেন, তাতে আপত্তি দূর হয় না।

আরম্ভ করা জাইয (মুহীত)। এভাবে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহু আজাল্লু, আল্লাহু আযম অথবা আর রহমানু আকবার বলে সালাত আরম্ভ করে তবে তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে জাইয আছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি বলে, আবতাদিউ আজাল্লু বা আবতাদিউ আ'যমু বা আবতাদিউ আকবার অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সাথে আল্লাহ্‌র নাম যদি যোগ না করা হয়, তবে কোন ইমামের মতেই সালাত আরম্ভ করা সহীহ্ হবে না (আলজাওহারাতুন্ নায়্যারা এবং আসসিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহুম্মা বলে নামায আরম্ভ করে, তবে সমস্ত ফকীহ্‌র মতে এর দ্বারা সালাত আরম্ভ করা তার সহীহ্ হবে (খুলাসা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীতায়ন)। কোন ব্যক্তি যদি শুধু আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তাঁর গুণ উল্লেখ করে যেমন বলল, আল্লাহ, অথবা আররাহমানু অথবা আররাব্বু এর চেয়ে অধিক কিছু না বলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এভাবে সালাত আরম্ভ করা জাইয আছে (তাবয়ীন)। এটাই সহীহ্ মত।

৪. মাসআলা ঃ আল্লাহ্‌র খাস নাম এবং আল্লাহ্‌র খাস নাম ও মুশ্‌তারিক নাম যেমন রহীম, করীম ইত্যাদি এতদুভয় নামের দ্বারা সালাত আরম্ভ করা সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে রিওয়ায়েত এবং মাশাইখদের মাঝে মতভেদ রয়েছে ; তবে বিশুদ্ধতম এবং সুস্পষ্ট মত হল, আল্লাহ্‌র সকল প্রকার নামের দ্বারাই সালাত শুরু করা সহীহ্ আছে। ইমাম কারখী (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। ফকীহ্ মুরগিনানী (র)-ও এরূপ ফাতওয়া দিয়েছেন (যাহিদী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহুম্মাগফিরলী দ্বারা সালাত আরম্ভ করে, তবে তা সহীহ্ হবে না। কেননা, এতে খালিস আল্লাহ্‌র তাযীম নেই। বরং এতে বান্দার প্রয়োজনের কথাও মিশ্রিত আছে। (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি সালাতের শুরুতে আস্তাগফিরুল্লাহ্, আউযুবিল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ বা মা-শা আল্লাহ বলে, তবে তার এ শুরু করা সহীহ্ হবে না।(মুহীত)। কোন ব্যক্তি যদি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকবীর বলে, সম্মান প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয় অথবা মুয়াযযিনের আযানের জওয়াবে তাকবীর বলে, তবে এর দ্বারাও সালাত আরম্ভ করা সহীহ হবে না। যদিও সে এর দ্বারা সালাত আরম্ভের নিয়্যাত করে (তাতারখানিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলেও সালাত আরম্ভ করা দুরুস্ত নয় (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি যদি "আল্লাহু আকবার"-এর আলিফকে টেনে প্রশ্নবোধক আলিফ সংযোজন করে বলে, তবে কোন ইমামের মতেই তার এ আরম্ভ করা সহীহ্ হবে না (তাতারখানিয়্যা ঃ সায়রাফিয়্যার সূত্রে বর্ণিত)। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহু আকবর-এর কাফকে গাফ পড়ে, তবু তার শুরু করা সহীহ্ হবে (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ দাঁড়ানো বা দাঁড়ানোর কাছাকাছি অবস্থায় তাকবীর বলার দ্বারা মুসল্লীর সালাত আরম্ভ হয় (যাহিদী)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি বসে তাকবীর বলে, অতঃপর দাঁড়ায়, তবে তার এ আরম্ভ করা সহীহ্ হবে না। নফল সালাত দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে আরম্ভ করা জাইয আছে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইমামের তাহরীমার সাথে সাথে মুক্তাদীগণ তাহরীমা বাঁধবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ইমামের তাহরীমা বাঁধার পর মুক্তাদীগণ তাহরীমা বাঁধবে। তাঁদের মতের উপরই ফাতওয়া (মা দিন)। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, উভয়বিধ প্রক্রিয়া জাইয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন মতবিরোধ নেই। এটাই বিশুদ্ধ মত। মতভেদ তো কেবল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে (তাবয়ীন)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইমামের তাহরীমার সাথে সাথে মুক্তাদীর তাহরীমা বাঁধার মানে হল, উভয় তাহ্রীমা এমন একত্রে বাঁধবে, যেমন হাত নড়ার সাথে সাথে আংটিও একত্রে নড়তে থাকে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ইমামের তাহ্রীমার পর মুক্তাদীগণ তাহ্রীমা বাঁধবে--এ কথার মানে হল, ইমামের "আল্লাহু আকবার"-এর রা-শব্দের সাথে মুক্তাদীগণ তাদের আল্লাহু আকবার-এর আলিফকে মিলিয়ে বলবে (মুসাফফা ঃ হানাফিয়্যা অনুচ্ছেদ)।

১১. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি আল্লাহু আকবার বলে এবং তার আল্লাহু শব্দটি ইমামের আল্লাহু শব্দের সাথে হয় আর আকবার শব্দটি ইমামের আগে হয়ে যায়, তবে ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, বিশুদ্ধতম মতে এ ব্যক্তি সালাত আরম্ভকারীদের মধ্যে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেয়ে, অমনি আল্লাহু আকবার বলে, আল্লাহু শব্দটি দাঁড়ানো অবস্থায় বলে এবং রুকূতে গিয়ে আকবার শব্দটি বলে, তবে সেও সালাত আরম্ভকারী হবে না। ফকীহ্গণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন মুক্তাদী যদি আল্লাহু শব্দটি ইমামের আগে বলে শেষ করে ফেলে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে সে সালাত আরম্ভকারী হবে না (খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমামের আগে তাকবীর বলে এবং এর দ্বারা সে ইকতেদার নিয়্যাত করে, তবে তার এ শুরু করা সহীহ্ হবে না। আর যদি ইকতেদার নিয়্যাত না করে, তবে তার ব্যক্তিগত সালাত শুরু করা সহীহ্ হবে। জামাআতের সালাত এভাবে শুরু করা সহীহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১৩. মাসআলা ঃ তাকবীরে উলার ফযীলত কখন পাওয়া যাবে--এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। সহীহ্ মতে যে ব্যক্তি প্রথম রাক'আত পাবে, সে তাকবীরে উলার ফযীলত পাবে (হাস্র ঃ আবূ ইউসুফ অধ্যায়)। ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেয়ে কোন ব্যক্তি যদি রুকূতে যাওয়ার নিয়্যাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে। কিন্তু নিয়্যাত বেকার হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)

১৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ ফারসীতে তাকবীর বলে, তবে সালাত সহীহ্ হবে (মুতূন)। আরবী ভাল বলতে পারা এবং না পারা উভয় অবস্থাতে একই হুকুম। অবশ্য আরবী ভাল বলতে পারা অবস্থায় ফারসীতে তাকবীর বলা মাকরূহ্। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আরবী ভাল জানা অবস্থায় ফারসীতে তাকবীর বলা আদৌ জাইয নেই (মুহীত)। অনুরূপ ভাবে সালাতে পঠিত সমস্ত যিক্র যথা[১] তাশাহ্হুদ, দু'আই কুনূত; দু'আ এবং রুকূ-সিজদাহ্র

১. হানাফী গবেষক মুহাদ্দিছগণ এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। ফারসী বা অন্য ভাষায় বলার বৈধতা শুধুমাত্র যুক্তির খাতিরে--আমল বা কার্যক্রমে নয়। কাজেই এ মাসআলা একটি যুক্তির খাতিরে কথিত মাসআলা মাত্র।

তাসবীহসমূহের ক্ষেত্রেও আমাদের ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। আরবী নয় এমন সমস্ত ভাষা যেমন তুর্কী, হাবশী ও নাবতী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা ঃ মাবসূত কিতাবে আছে যে, বেদুঈন, মূক এবং এমন নিরক্ষর লোক, যারা কোন ভাষাই ভালভাবে বলতে পারে না শুধু নিয়্যাতের মাধ্যমেই তাদের সালাতের প্রারম্ভ সহীহ্ হয়ে যাবে। জিহবা নেড়ে মুখে উচ্চারণ করা তাদের জন্য জরুরী নয় (তাবয়ীন)।

১৬. মাসআলা ঃ সালাতের দ্বিতীয় রুকন হল কিয়াম। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। ফরয ও বিত্রের সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয (আল্জাওহারাতুন নায়্যারা ও আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। নূনতম পক্ষে যতটুকু দণ্ডায়মান থাকাকে কিয়াম বলা হয় এতটুকু সময় দণ্ডায়মান থাকলেই কিয়ামের ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে। (কাফী ঃ কিরাআত অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। কিয়ামের সীমা হল এমনভাবে দণ্ডায়মান হওয়া যে, উভয় হাত সম্প্রসারিত করলেও তা হাঁটু পর্যন্ত পৌছে না। ওযর ব্যতীত এক পায়ের উপর খাড়া হওয়া মাকরূহ্। তবে সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। যদি ওযর থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে না (আলজাওহারাতুন নায়্যারা এবং আস্সিরাজুল ওয়াহহাজ)।

১৭. মাসআলা ঃ সালাতের তৃতীয় ফরয হল কিরাআত পড়া। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ছোট এক আয়াত তিলাওয়াত করলেই কিরাআতের ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে (মুহীত)। খুলাসার মধ্যে আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাতারখানিয়্যা)। কিন্তু যে এর উপরই শেষ করে, সে গুনাহ্গার হবে (বিকায়া)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন ব্যক্তি যদি এমন ছোট আয়াত তিলাওয়াত করে, যার মধ্যে অনেকগুলো শব্দ আছে বা শুধু মাত্র দু'টি শব্দ আছে যেমন ثم قتل كيف قدر ثم نظر তবে এতেই সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে, এ বিষয়ে মাশাইখদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

১৮. মাসাআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন ছোট আয়াত পাঠ করে যার মধ্যে একটিই মাত্র শব্দ যেমন مدهامتان অথবা যার মধ্যে একটিই মাত্র অক্ষর যেমন, ص – ن – ق তবে এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে মাশাইখদের মাঝে মতভেদ আছে (মুসাফ্ফা)। বিশুদ্ধতম মতে এতটুকু কিরাআতের দ্বারা সালাত সহীহ্ হবে না (শরহুল মাজমা ঃ ইব্নুল মালিক, যহীরিয়্যা, আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ এবং ফাতহুল কাদির)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি একটি বড় আয়াত যেমন আয়াতুল কুরসী বা মাদানী আয়াত দুই রাকআতে ভাগ করে পাঠ করে অর্থাৎ এক রাকআতে কিছু অংশ এবং অপর রাকআতে কিছু অংশ পাঠ করে, তবে অধিকাংশ ফকীহ্র মতে এরূপ করা জাইয আছে (মুহীত)। এটাই বিশুদ্ধতম রায় (কাফী ও মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

২০. মাসআলা ঃ কিরাআতের মধ্যে হরফের সহীহ্ উচ্চারণ আবশ্যকীয়। যদি হরফ মুখে শুদ্ধ উচ্চারণ করে কিন্তু নিজে তা না শুনে, তবে এতে কিরাআত দুরুস্ত হবে না। অধিকাংশ ফকীহ্ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। এটাই পসন্দনীয় রায় (সিরাজিয়্যা)। এটাই সহীহ্ মত

pdf By Syed Mostafa Sakib

(নিকায়া)। যাবহের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা কসমের মধ্যে ইস্তিছনা করা এবং তালাক, ইতাক, ইলা ও বেচাকেনার হুকুমও এ-ই।

২১. মাসআলা ঃ ফরযের দুই রাকআত হল কিরাআতের স্থান (মুহীত)। সালাত চাই দুই রাকআত বিশিষ্ট হোক বা তিন[১] রাকআত বিশিষ্ট হোক বা চার রাকআত বিশিষ্ট হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে চাই প্রথম দুই রাকআত হোক, বা শেষ দুই রাকআত হোক, বা প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআত এবং শেষ দুই রাকাআতের এক রাকআত হোক সকল ক্ষেত্রে উক্ত হুকুমই প্রযোজ্য হবে (শরহুন্ নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র))। সুতরাং কেউ যদি এক রাকআতেও কিরাআত না পড়ে বা শুধু এক রাকআতে কিরাআত পাঠ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (শরহুন নিকায়া ঃ আল্লামা শামানী)।

২২. মাসআলা ঃ বিত্‌র ও নফলের সমস্ত রাকআতে কিরাআত পড়া ফরয (মুহীত)। ঘুমের অবস্থায় যদি কিরাআত পড়ে, তবে শুদ্ধ মতে তা জাইয হবে না (যহীরিয়্যা)। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ওযর ব্যতীত ফারসী ভাষায় কিরাআত পড়া জাইয নেই। এভাবেই ফাতওয়া দেয়া হয় (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ফারসী বা অন্য যে কোন ভাষায় কিরাআত পড়া জাইয। এটা সহীহ্ মত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর এ মত থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতের প্রতি রুজূ করেছেন। এটাই নির্ভরযোগ্য কথা (হিদায়া)। আসরার কিতাবে আছে যে, এটা আমারও পসন্দনীয় মত। "তাহকীক" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এটাই অধিকাংশ মুহাক্কিক, প্রজ্ঞাবান ফকীহ্‌দের পসন্দনীয় মত। এর উপরই ফাতওয়া। (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র)। এটাই বিশুদ্ধতম মত। (মাজ্‌মাউল বাহ্‌রায়ন)।

২৩. মাসআলা ঃ সালাতের চতুর্থ রুকন হল রুকূ করা। যতটুকু পরিমাণ ঝুঁকা বা বাঁকা হওয়াকে রুকূ বলা হয় এতটুকু পরিমাণ ঝুঁকা ও বাঁকা হওয়া রুকূর মধ্যে ওয়াজিব। এর সীমা হল, এতটুকু পরিমাণ ঝুঁকা যেন উভয় হাত সম্প্রসারিত করলে হাটু নাগাল পাওয়া যায় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রুকূ না করে সোজা খাড়া থেকে সিজদায় চলে যায় এবং সুন্নাতের বিপরীত উটের ন্যায় যায়, তবে এ সামান্য ঝুঁকার দ্বারাও রুকূ আদায় হয়ে যাবে। কোন কুঁজো ব্যক্তির কুঁজ যদি রুকূর অবস্থার ন্যায় হয়ে যায়, তাহলে রুকূর জন্য সে মাথার দ্বারা ইশারা করবে (খুলাসা ও তাজনীস)। কিরাআতের পরই রুকূ করার সময়। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ সালাতের পঞ্চম রুকন হল সিজদা করা। প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদাও ফরয। এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ্ একমত (যাহিদী)। সিজদার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত হল, কপাল এবং নাক উভয় মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করা। ওযরের কারণে যদি কোন একটি মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করা হয়, তবে মাকরূহ্ হবে না। ওযর না থাকা অবস্থায় নাক ব্যতীত যদি শুধু

১. মূলে আছে 'محل' যার অর্থ স্থান করা হয়েছে, অনুবাদ ঠিক আছে, তবে এর মর্ম হল ঃ কিরাআত কোথায় পাঠ করা জরুরী।

কপাল মাটিতে লাগান হয়, তবে সকলের মতে জাইয আছে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। যদি এর বিপরীত করা হয়, তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দুরুস্ত আছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এরূপ করা জাইয নেই। এর উপরই ফাতওয়া।

২৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নাক ও কপালের পরিবর্তে গাল বা চিবুক দ্বারা সিজদা করে, তবে ওযর থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই তা জাইয হবে না। অবশ্য কপাল ও নাকে যদি ওযর থাকে, তাহলে কেবল ইশারা করবে। সিজদা করবে না (খাযানাতুল মুফ্‌তিয়ীন)। শুধু নাক লাগিয়ে সিজদা করা তখনই যথেষ্ট হবে যদি নাকের শক্ত জায়গা দ্বারা সিজদা করা হয়। যদি নাকের নরম অংশ দ্বারা যেমন নাকের অগ্রভাগ-এর দ্বারা যদি সিজদা করা হয়, তবে শুধু নাক লাগিয়ে সিজদা করা জাইয নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ ও আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ঘাস বা ভুষির উপর অথবা তুলা বা বিছানা অথবা বরফের উপর সিজদা করে এবং কপাল ও নাক এর উপর স্থির এবং অবিচল থাকে আর উক্ত ব্যক্তি যদি এ কথা অনুভব করে যে, সে এ সব বস্তুর শক্ত স্থানের উপরই সিজদা করেছে, তবে জাইয হবে। আর যদি নাক ও কপাল এ সব বস্তুর উপর স্থির না থাকে, তবে এ সিজদা দুরুস্ত হবে না।

২৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি গাড়ীর উপর সিজদা করে এবং তা গরুর উপর থাকে, তাহলে এ সিজদা সহীহ্ হবে না। যদি মাটির উপর থাকে, তবে জাইয আছে। যেমন মাটিতে রক্ষিত চৌকির উপর সিজদা করা জাইয। চৌকির উপর সিজদা করার ন্যায় মাচানের উপর সিজদা করাও জাইয। (খুলাসা)।

২৯. মাসআলা ঃ গম এবং যবের উপর সিজদা করা জাইয[১] কেউ যদি শস্য ভাঙ্গার চাক্কির উপর অথবা চীনা বা চাউলের উপর সিজদা করে, তবে সিজদা সহীহ্ হবে না। কিন্তু চাউল, চীনা, চাক্কি এবং তুলা ধুনার যন্ত্র যদি মাচানের উপর থাকে, তবে সিজদা সহীহ্ হবে (আস সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩০. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লী যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় অন্য মুসল্লীর পিঠের উপর সিজদা করে, তবে সিজদা জাইয হবে। উক্ত ব্যক্তি যদি সালাতের অবস্থায় না থাকে অথবা তার সাথে একই সালাতে শরীক না থাকে, তবে জাইয হবে না। বিনা ওযরে শুদ্ধ মতে নিজের রানের উপর সিজদা করা জাইয নেই। অবশ্য ওযরের কারণে এরূপ করলে জাইয হবে। ওযর থাক বা না থাক কোন অবস্থাতেই নিজের হাঁটুর উপর সিজদা করা জাইয নেই (খুলাসা)।

৩১. মাসআলা ঃ হাতের তালু যদি মাটিতে বিছানো থাকে, এমতাবস্থায় এর উপর সিজদা করা বিশুদ্ধতম মতানুসারে জাইয আছে (তাবয়ীন)। মৃত ব্যক্তির গায়ের উপর যদি কাপড় থাকে, তবে তার শরীরের উপর সিজদা করলে যদি সিজদাকারী ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, সে তার শরীরের শক্ত অংশ স্পর্শের অনুভব করছে, তবে সিজদা জাইয হবে না। আর যদি সিজদায় শক্ত অংশের নাগাল না পায়, তবে জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

১. অর্থাৎ গম বা যবের রাশিকৃত গাদার উপর, যা নড়াচড়া করে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩২. মাসআলা ঃ সিজদার স্থান যদি পায়ের জায়গার চাইতে এক বা দু'টি খাড়া ইটের সমান উঁচু হয়, তবে এর উপর সিজদা করা জাইয হবে। এর চেয়ে অধিক উঁচু স্থানের উপর সিজদা করা জাইয নেই (যাহিদী)। ইটের উচ্চতার পরিমাণ হল এক হাতের চার ভাগের একভাগ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। হুজ্জাত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সিজদার জায়গায় যদি অনেক কাঁটা থাকে বা অনেক কাচ ভাংগা থাকে, এ কারণে কেউ যদি সিজদার স্থান হতে মাথা উঠিয়ে অন্য জায়গায় রাখে, তবে জাইয আছে। এ উত্তোলন করা দ্বিতীয় সিজদারূপে গণ্য হবে না বরং সব মিলিয়ে একই সিজদা হবে (তাতারখানিয়্যা)। যদি হাত ও হাঁটু মাটিতে না রেখে কেউ সিজদা করে, তবে সকল ফকীহ্র মতেই সিজদা জাইয হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৩. মাসআলা ঃ মাটিতে পা না রেখে সিজদা করা আদৌ জাইয নেই। বিনা ওযরে মাটিতে এক পা রেখে সিজদা করা জাইয, তবে মাকরূহ্ (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ)। আঙ্গুল রাখার দ্বারা পা রাখা প্রতীয়মান হয়। যদিও এক আঙ্গুল হোক না কেন। স্থানের সংকীর্ণতার কারণে কোন ব্যক্তি যদি পায়ের আঙ্গুল না রেখে পিঠ রাখে এবং এক পা রেখে সিজদা করে, তবে সালাত সহীহ্ হবে। যেমন এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা জাইয (খুলাসা)।

৩৪. মাসআলা ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় সিজদা করলে ঐ সিজদা পুনরায় আদায় করতে হবে। কিন্তু রুকূ সিজদায় হঠাৎ ঘুম এসে গেলে কোনটাই দোহরাতে হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তি যদি ছোট পাথরের উপর সিজদা করে এবং কপালের বেশীর ভাগ মাটির উপর রাখে, তবে জাইয হবে। অন্যথায় জাইয হবে না (তাজনীস ও মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ সালাতের ষষ্ঠ রুক্ন হল আখিরী বৈঠক। সালাতের শেষে তাশাহ্হুদ পড়া যায় এ পরিমাণ সময় বসা ফরয (তাবয়ীন)। তাশাহ্হুদ হল আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি থেকে আবদুহ ওয়া রাসূলুহ পর্যন্ত। এটাই সহীহ্। সুতরাং ইমামের আত্তাহিয়্যাতু শেষ হওয়ার আগে মুক্তাদী যদি তার আত্তাহিয়্যাতু শেষ করে কোন কথা বলে, তবে তার সালাত পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৩৬. মাসআলা ঃ ফরয ও নফল সকল সালাতেই আখিরী বৈঠক করা ফরয। সুতরাং দুই রাকআত সালাতে যদি কোন ব্যক্তি আখিরী বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। خروج بضع المصلى অর্থাৎ কোন কাজ করে মুসল্লীর সালাত থেকে বের হওয়া ফরয নয়। এটাই সহীহ্ মত (তাবয়ীন, কান্যের শরাহ আয়নী এবং অধিকাংশ কিতাব)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াজিবসমূহের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম দুই রাকআতকে ফরয কিরাআতের জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের শেষ দুই রাকআতে অথবা প্রথম দুই রাক'আতের এক রাকআতে এবং শেষ দুই রাকআতের এক

রাকআতে ভুলক্রমে কিরাআত পড়ে, তাহলে তার উপর সাহু সিজদা করা ওয়াজিব (বাহ্রুর রাইক)। প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা বা ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব (আন্নাহ্রুল ফাইক)।

২. মাসআলা ঃ নফল ও বিতরের সমস্ত রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্য কোন সূরা মিলানো ওয়াজিব। (বাহ্রুর রাইক)। সূরা মিলানোর পূর্বে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব (আন্নাহ্রুল ফাইক)। কেউ যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া ভুলে গিয়ে অন্য সূরা পড়তে আরম্ভ করে এবং পরে স্মরণ হয়, তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই সূরা ফাতিহা পড়ে এর সাথে অন্য কোন সূরা মিলিয়ে নিবে। এটাই যাহিরী রিওয়ায়েত (মুহীত)। ঈশার প্রথম দুই রাকআতে কেউ যদি শুধু সূরা পড়ে, সূরা ফাতিহা না পড়ে, তাহলে শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা[1] পুনরায় তা পড়তে হবে না।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি প্রথম দুই রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য কোন সূরা না পড়ে, তবে শেষের দুই রাকআতে সে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও মিলিয়ে পড়বে। এবং উভয়টিই উচ্চস্বরে পড়বে। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। কোন ব্যক্তি যদি প্রথম দুই রাকআতে কোন কিছুই না পড়ে, তবে পরের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্য সূরাও পড়ে নিবে এবং সমস্ত ফকীহ্র মতে উভয়টিই উচ্চস্বরে পড়বে। অবশেষে সাহু সিজদা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ সাহু সিজদা অনুচ্ছেদ)।

৪. মাসআলা ঃ প্রথম দুই রাকআতের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা এক একবার করে পাঠ করা ওয়াজিব। এর বেশী নয়। (মুনিয়্যা)। কোন ব্যক্তি যদি প্রথম দুই রাকআতে অথবা এর এক রাকআতে সূরা ফাতিহা এক সাথে দুইবার পাঠ করে, তবে সাহু সিজদা দেয়া তার উপর ওয়াজিব।

৫. মাসআলা ঃ ফাতিহার পর কোন সূরা পড়ে এরপর পুনরায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা ও তাজনীস)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (যাহিদী)।

৬. মাসআলা ঃ যে কাজ প্রত্যেক রাকআতে বারবার করতে হয়, যেমন সিজদা অথবা সমস্ত সালাতে বারবার করতে হয়, যেমন রাকআতের সংখ্যা, এগুলোর মধ্যে তারতীব (ক্রমধারা) রক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি প্রথম রাকআতের সিজদার কথা ভুলে যায় এবং তা সালাতের শেষে কাযা করে, তবে জাইয আছে। ইমাম সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর মাসবূক যা আদায় করে তা আমাদের মাযহাবে তার প্রথম দিকের সালাত।

৭. মাসআলা ঃ মোদ্দা কথা হল, তারতীব ওয়াজিব। ফরয নয়। যদি ফরয হতো, তাহলে তা আখিরী সালাত হতো। প্রথম দিকের সালাত হতো না। প্রত্যেক রাকআতে যে কাজ বারবার করতে হয় না যেমন কিয়াম, রুকূ অথবা সমস্ত সালাতে যে কাজ বারবার করতে হয় না যেমন

১. অবশ্য সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হবে। হিদায়া গ্রন্থে মাসআলাটির সপক্ষে যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছেন, তা বোধগম্য। কিন্তু সিজদায়ে সাহু'র উল্লেখ না করা আশ্চর্যজনক। সম্ভবত ওয়াজিব ছুটে গেলে শেষে সিজদা করতে হয় এটা সুস্পষ্ট বলে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। মাসআলাটি বিতর্কিত, ইমাম মুহাম্মদ ভিন্নমত পোষণ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আখিরী বৈঠক এগুলোর মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ফরয। সুতরাং কেউ যদি কিয়ামের পূর্বে রুকূ করে অথবা রুকূর পূর্বে সিজদা করে, তবে দুরুস্ত হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি আত্তাহিয়্যাতু পড়া পরিমাণ সময় বসে, অতঃপর মনে পড়ে যে, একটি সিজ্‌দা বা অনুরূপ কিছু তার বাকী রয়ে গিয়েছে, তাহলে তার এ বৈঠক বাতিল হয়ে যাবে (তাবয়ীন)।

৮. মাসআলা ঃ ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে রুকূ হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া ওয়াজিব নয় (যহীরিয়্যা)। অনুরূপভাবে দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসাও ওয়াজিব নয় (কাফী)। ইমাম কারখী (র) বলেন, রুকূ হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে ওয়াজিব (যহীরিয়্যা)। এটাই বিশুদ্ধ মত। (শরহে মুনিয়্যা ঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ)।

তা'দীলে আরকান মানে হল, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গসমূহ নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যাওয়া। এর ন্যূনতম পরিমাণ হল, এক তাসবীহ্ আদায় করার সমপরিমাণ সময়। (কানযের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আয়নী এবং আন্‌নাহ্‌রুল ফাহিক)।

৯. মাসআলা ঃ তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করার পর তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ সময় বসা ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধতম মত (যহীরিয়্যা)। আখিরী বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়া ওয়াজিব। অনুরূপভাবে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়াও ওয়াজিব। এটাই সহীহ্ মত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

তাশাহ্‌হুদ নিম্নরূপ ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(যাহিদী)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্‌হুদের উপর আমল করা থেকে উপরোক্ত তাশাহ্‌হুদের উপর আমল করাই উত্তম (হিদায়া)। তাশাহ্‌হুদ পড়ার সময় এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করাও জরুরী। মনে করতে হবে যেন সে আল্লাহ্‌র প্রতি সমস্ত ইবাদত নিবেদন করছে, রাসূল (সা)–এর প্রতি সালাম প্রেরণ করছে এবং দু'আ করছে নিজের জন্য ও সমস্ত ওলী–আল্লাহ্‌দের জন্য (যাহিদী)।

১০. মাসআলা ঃ সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা ওয়াজিব। বিতরের সালাতে দু'আই কুনূত পড়া ওয়াজিব। দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধ মত। এগুলো তরক করলে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব। জোরের জায়গায় জোরে পড়া এবং আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া ওয়াজিব (তাবয়ীন)। ইমামের জন্য ফজরের উভয় রাকআতে এবং মাগরিব ও

ঈশার প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত জোরে পড়া ওয়াজিব এবং মাগরিবে শেষের এক রাকআতে ও ঈশায় শেষের দুই রাকআতে কিরাআত আস্তে পড়া ওয়াজিব (যাহিদী)। ইমাম যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত আস্তে পড়বে। যদিও আরাফার মধ্যে তিনি থাকেন। জুমুআ ও দুই ঈদের সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করবে (হিদায়া)। অনুরূপভাবে তারাবীহ ও বিতরের সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়বে। একাকী সালাত আদায় করলে–যে সব সালাতে আস্তে কিরাআত পড়া হয় এগুলোতে আস্তে কিরাআত পড়া জরুরী। আর যে সব সালাতে জোরে কিরাআত পড়া হয় এগুলোর ব্যাপারে মুন্‌ফারিদ (একাকী সালাত আদায়কারী) ব্যক্তির ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে জোরেও পড়তে পারবে এবং আস্তেও পড়তে পারবে। তবে জোরে পড়াই উত্তম। অবশ্য ইমামের মত জোরে পড়বে না। কেননা, সে তো অন্য কাউকে কিরাআত শুনাচ্ছে না (তাবয়ীন)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম অধিক চিৎকার করে কিরাআত পড়ার চেষ্টা করবে না (আল–বাহ্‌রু রাইক)। ইমাম যদি মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে অধিক চিৎকার করে আওয়ায করে, তবে সে গুনাহ্‌গার হবে। কেননা, ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ে লোকদেরকে শুনানোর জন্য। যেন তারা ইমামের কিরাআতের মাঝে চিন্তা–ভাবনা করে নিজেদের দিলকে সালাতের মধ্যে হাযির রাখে (আসসিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ যে সমস্ত যিক্‌র সালাতে ওয়াজিব ইমাম তা উচ্চস্বরে বলবে। যেমন সালাত আরম্ভের তাকবীর। আর যে সমস্ত যিক্‌র ফরয নয়, শুধু আলামত হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, তাও উচ্চস্বরে বলবে। যেমন এক অবস্থা হতে অন্য–অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়া তথা উঠা–নামার তাকবীর। এগুলো জোরে বলতে হবে। এ হুকুম ইমামের জন্য প্রযোজ্য। মুন্‌ফারিদ এবং মুক্তাদী এগুলো উচ্চস্বরে বলবে না। যে যিক্‌র কোন কোন সালাতের জন্য খাস, যেমন দুই ঈদের তাকবীর, ইমাম এগুলো উচ্চস্বরে বলবে। অনুরূপভাবে ইরাকীদের মতে দু'আ কুনূতও উচ্চস্বরে বলা জরুরী। "হিদায়া" প্রণেতার মতে আস্তে পড়া জরুরী। এতদভিন্ন সালাতে যা কিছু পড়া হয়, তা আস্তে আস্তে পড়া জরুরী। যেমন তাশাহ্‌হুদ, আমীন এবং রুকূ–সিজদার তাসবীহ্ ইত্যাদি (বাহ্‌রুর রাইক)।

১৩. মাসআলা ঃ রাত্রে যে সালাত আদায় করা হয়, তা যদি ভুলে ছুটে যায় এবং দিনে জামাআতের সাথে কাযা করা হয় এবং এতে ইমাম যদি আস্তে কিরাআত পড়ে, তাহলে ইমামের উপর সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। দিনের সালাত যদি কেউ রাত্রে জামাআতের সাথে আদায় করে, তবে আস্তে কিরাআত পড়বে। উচ্চস্বরে কিরাআত পড়বে না। যদি ভুলে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ে, তবে সাহু সিজদা দিতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ সাহু সিজদা অনুচ্ছেদ)। একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি এ সমস্ত সালাতের কাযা আদায় করে, তবে যে সব সালাতে জোরে কিরাআত পড়া হয় এর মাঝে জোরে কিরাআত পড়া হবে কিনা এ নিয়ে ফকীহ্‌দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে জোরে পড়াই উত্তম (মুহীত ও কাফী)। শামসুল আইম্মা, ফখরুল ইসলাম এবং মুতাআখ্‌খির আলিমদের এক দল লোক এমতটিকে পসন্দ করেছেন। আল্লামা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযীখান (র) বলেন, এটা সহীহ্‌মত। "যখীরা" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত। (তাবয়ীন)। মূল কিতাবের সূত্রে "খুলাসা" নামক কিতাবের মাঝে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করছিল, সে ফাতিহা বা ফাতিহার কিয়দংশ তিলাওয়াত করার পর অপর এক ব্যক্তি এসে তার পেছনে ইকতেদা করল। এমতাবস্থায় ইমাম পুনরায় ফাতিহা পড়বে এবং উচ্চস্বরে পড়বে (বাহ্‌রুর রাইক)।

১৪. মাসআলা ঃ দিনের নফল সালাতে কিরাআত অবশ্যই অনুচ্চস্বরে পড়বে। অবশ্য রাতের নফল সালাতের ক্ষেত্রে কিরাআত আস্তে-জোরে পড়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে জোরে পড়তে পারবে এবং ইচ্ছা করলে আস্তেও পড়তে পারবে (যহিদী)। আস্তে-জোরে পড়ার সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর এবং শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফয্‌ল (র) বলেন, উচ্চস্বরে পড়ার ন্যূনতম সীমা হল, এমনভাবে পড়া যেন অন্য ব্যক্তিও শুনতে পায় এবং আস্তে পড়ার ন্যূনতম সীমা হল, এমনভাবে পড়া যেন নিজে শুনতে পায়। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য (মুহীত)। এটাই সহীহ্ মত (বিকায়া ও নিকায়া)। অধিকাংশ মাশাইখ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (যাহিদী)। কোন ব্যক্তি যদি এমনভাবে তার উভয় ঠোঁট নাড়ে যে, কেউ যদি তার মুখের সাথে কান লাগায়, তাহলে কানের ভেতর তার আওয়ায পৌঁছে এবং সে উক্ত ব্যক্তির পাঠ অনুধাবনও করতে পারে। এটাকে বলা হয় অস্পষ্ট আওয়ায। (খুলাশা)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সুন্নাত, আদাব এবং সালাতের নিয়ম-নীতির বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সালাতের সুন্নাত হল, তাহ্‌রীমার সময় উভয় হাত উঠানো, হাতের আঙ্গুলসমূহ খোলা রাখা, ইমামের উচ্চস্বরে তাকবীর বলা, ছানা, আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ এবং আমীন আস্তে বলা, নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা, রুকূর তাকবীর বলা, তিনবার রুকূতে তাসবীহ্ পাঠ করা, রুকূতে উভয় হাঁটু হাত দিয়ে ধরা, আঙ্গুলগুলো খোলা রাখা, সিজদায় যাওয়ার সময় এবং সিজদা হতে উঠার সময় তাকবীর বলা, সিজদায় তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করা, সিজদায় উভয় হাত এবং হাঁটু মাটিতে রাখা, বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে বসা, কওমা করা ও জলসা করা[১] (বাহ্‌রুর রাইক)। রুকূ হতে উঠে এবং উভয় সিজ্‌দার মাঝে এক তাসবীহ্ পরিমাণ অপেক্ষা করা (শরহুল মুনিয়্যা ঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ)। রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা এবং দু'আ মাছূরা পড়া।

২. মাসআলা ঃ সালাতের মাঝে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মুস্তাহাব। দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে, রুকূর অবস্থায় উভয় পায়ের পিঠের দিকে, সিজ্‌দার অবস্থায় নাকের অগ্রভাগের দিকে, বসা অবস্থায় কোলের দিকে, প্রথম সালামের সময় ডান কাঁধের দিকে এবং দ্বিতীয় সালামের সময় বাম কাঁধের দিকে নযর রাখা মুস্তাহাব। হাই তোলার সময় মুখ বন্ধ রাখা, তাকবীরে

১. রুকূ' হতে উঠে দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা।

তাহ্‌রীমা বলার সময় উভয় হাত আস্তিন হতে বের করা এবং যথাসম্ভব কাশি দমন করা (আল্‌বাহ্‌রুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ সালাতের মাসনূন তরীকা হল, সালাত আদায়ের ইচ্ছা করার পর প্রথমে তাকবীর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে যেন বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কানের লতি পর্যন্ত উঠে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ উভয় কানের বিপরীত পার্শ্বে থাকে (তাবয়ীন)। তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় মাথা আনত করবে না (খুলাসা)। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় উভয় হাতের তালু কিবলামুখী করে আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক কিছুটা ছড়িয়ে রাখবে। অতঃপর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় যথাযথভাবে কানের লতি বরাবর হলে তাকবীর বলবে। শামসুল আইম্মা সুরুখসী (র) বলেন, এটাই অধিকাংশ মাশাইখের মত (মুহীত)। বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাকবীরের পূর্বে হাত উঠাবে (হিদায়া)। অনুরূপভাবে দু'আ কুনূত পাঠ করার পূর্বে তাকবীরের সময় এবং দুই ঈদের সালাতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাবে। এ ছাড়া অন্য তাকবীরের সময় হাত উঠাবে না (আল্ ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। যদি হাত উঠায়, তবে আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে সালাত ফাসিদ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। মহিলাগণ তাদের হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া ও তাবয়ীন)। হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলো অধিক মিলিয়ে রাখবে না এবং বেশী খুলেও রাখবে না। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে থাকে ঐভাবেই রাখবে (নিহায়া)। এটাই নির্ভরযোগ্য মত (মুহীত)। কেউ যদি তাকবীর বলার সময় হাত না উঠায় এবং তাকবীর শেষ হয়ে যায়, তাহলে আর হাত উঠাবে না। তাকবীরের মাঝামাঝি অবস্থায় যদি হাত উঠানোর কথা মনে পড়ে, তবে সাথে সাথে হাত উঠাবে। এ অবস্থায় যদি সুন্নত সীমা পর্যন্ত হাত উঠানো সম্ভব না হয়, তবে যতটুকু পরিমাণ সম্ভব হয়, ততটুকু পরিমাণ উঠাবে। যদি এক হাত উঠানো সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয় হাত উঠানো সম্ভব না হয়, তবে এক হাতই উঠাবে। যদি কারো হাত সুন্নাত তরীকার উপরে উঠে, সুন্নাত স্থান পর্যন্ত উঠানো সম্ভব না হয়, তবে সে ঐ পর্যন্তই উঠাবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ মাবসূত কিতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে, কেউ যদি "আল্লাহ্" শব্দের আলিফ অক্ষরটি টেনে পড়ে, তবে সালাত শুরু করা তার সহীহ্ হবে না। অধিকন্তু ইচ্ছা করে এরূপ করলে কুফরীর আশংকা রয়েছে। এমনিভাবে কেউ যদি আকবর শব্দের আলিফ অথবা "বা" অক্ষরটি টেনে পড়ে তবে এভাবেও সালাত আরম্ভ করা সহীহ্ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ শব্দের "হা" অক্ষরটি টেনে পড়ে, তবে তা মারাত্মক ভুল হবে। অনুরূপভাবে আকবর শব্দের 'রা' অক্ষরটি টেনে পড়লেও আভিধানিকভাবে মারাত্মক ভুল হবে। আল্লাহ্ শব্দের লাম অক্ষরটি টেনে পড়া উচিত। "আল্লাহ্" শব্দের "হা" অক্ষরটি সাকিন করে পড়া ভুল (ফাতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি যদি "আল্লাহ আকবর" শব্দের আল্লাহ্-এর আলিফকে বা আকবর-এর আলিফকে টেনে পড়ে, তবে এর অর্থ হবে আল্লাহ্ কি মহান? তাই এভাবে সালাত শুরু করলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি "আকবর" শব্দের 'বা' ও 'রা'-এর মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে পড়ে, তবে কারো কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর কারো মতে ফাসিদ হবে না (নিহায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমা শেষ হওয়া মাত্রই নাভির নীচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। (মুহীত ঃ ইমাম খাহারবাদার সূত্রে ও নিহায়া)। মহিলাগণ তাদের হাত তাঁদের বুকের উপর রাখবে (মুনিয়া)

৭. মাসআলা ঃ যে কিয়ামের অবস্থায় যিক্‌রে মাসনূন আছে, এর মধ্যে হাত বাঁধা সুন্নাত। যেমন ছানা ও দু'আ কুনূত পাঠের অবস্থা এবং সালাতে জানাযার অবস্থা। আর যে কিয়ামের মাঝে যিকরে মাসনূন নেই, যেমন দুই ঈদের তাকবীরসমূহ, এ সময় হাত ছেড়ে দেয়া সুন্নাত (নিহায়া)। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। শামসুল আইম্মা সুরুখ্‌সী, সদ্‌রুল কবীর বুরহানুল আইম্মা এবং সদ্‌রুশ শহীদ শায়খ হুসামুদ্দীন প্রমুখ ফকীহ্ এরূপ ফাতওয়া দিতেন (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ রুকূ হতে খাড়া হওয়ার সময় সমস্ত ইমামের মতে হাত ছেড়ে দিবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যিক্‌র সুন্নাত। খাড়া হওয়ার জন্য নয় (শরহুন্ নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র)।

৯. মাসআলা ঃ হাত বাঁধার ক্ষেত্রে ধরা ও রাখার মাঝে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে অধিকাংশ ফকীহ্ মতামত ব্যক্ত করেছেন (খুলাসা)। মুসাফ্‌ফা নামক কিতাবে আছে যে, এটাই সহীহ্ মত (শরাহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র) হাত বাঁধার নিয়ম হল এই যে, 'ডান হাতের তালু বাম হাতের কবজির উপর রাখবে এবং ডান হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গলি দ্বারা বাম হাতের কবজি মযবুত ভাবে ধরবে। অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো কবজির উপর ছেড়ে রাখবে।

১০. মাসআলা ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা উচিত (খুলাসা)

এরপর এ ছানা পাঠ করবে,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَاسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

(হিদায়া)। ইমাম, মুক্তাদী এবং একা সালাত আদায়কারী সকলের জন্যই এ হুকুম (তাতারখানিয়্যা)। وَجَلَّ ثَنَائُكَ শব্দটি "আসল" এবং নাওয়াদির-এর মধ্যে উল্লেখ নেই (মুহতী)। ফরয সালাতের মধ্যে وَجَلَّ ثَنَائُكَ পড়বে না।

১১. মাসআলা ঃ তাহরীমা বাঁধার এবং ছানা পাঠ করার পর ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু পড়বে না (শরহে নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র)। উত্তম হল, তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বেও ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু না পড়া। তাহলেই নিয়্যাত ও তাকবীরে তাহরীমা একত্রে আদায় হবে। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)।

১২. মাসআলা ঃ অতঃপর তা'আওউযু পড়বে। তাআওউযু হল, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। ফকীহ্‌গণ এভাবেই ফাতওয়া দিতেন। তাআওউযু আস্তে আস্তে পড়া সুন্নাত। আমাদের মায্‌হাবের ফকীহ্‌দের এটাই মত (যখীরা)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাআওউযু কিরাআতের অধীন, ছানার অধীন নয়। তাই মাসবূক ব্যক্তি নিজের অবশিষ্ট সালাত আদায় করার জন্য যখন দাঁড়াবে, তখন সে

তা'আওউযু পড়বে। কিন্তু মুক্তাদী তাআওউযু পড়বে না। ঈদের তাকবীরের পর ইমাম তাআওউযু পড়বে (হিদায়া ও অধিকাংশ মুতূন)। সালাত আরম্ভ করার সময় তা'আওউযু পড়বে। এরপর আর পড়বে না। সালাত আরম্ভ করার পর কেউ যদি তাআওউযু পড়া ভুলে যায় এবং সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলে, তাহলে এরপর সে আর তা'আওউযু পড়বে না। (খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ এরপর চুপে চুপে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে। বিসমিল্লাহ্ কুরআন শরীফের একটি আয়াত, সূরাসমূহের মাঝে পার্থক্যকারীরূপে তা নাযিল করা হয়েছে (যখীরিয়া ঃ সালাতের মাকরূহ্‌সমূহ অনুচ্ছেদ)।

শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠের দ্বারা ফরয কিরাআত আদায় হবে না। (আল্‌জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (মুহীত)। হুজ্জত কিতাবে আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (তাতারখানিয়্যা)। সূরা ফাতিহা ও এর সাথে অন্য সূরা মিলানোর মাঝে বিসমিল্লাহ্ পড়বে না (বিকায়া ও নিকায়া)। এটাই সহীহ্ রায় (বাদাই' ও আল্‌জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

১৪. মাসআলা ঃ বিসমিল্লাহ্‌র পর সূরা ফাতিহা পড়বে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। ফাতিহা শেষে আমীন বলবে। আমীন চুপে চুপে বলা সুন্নাত (মুহীত)। এ ক্ষেত্রে একাকী সালাত আদায়কারী এবং ইমাম উভয়ই সমান। আওয়ায শুনা গেলে মুক্তাদীর 'জন্য' ও একই হুকুম (যাহিদী)। অভিধান অনুসারে আমীন দুই ভাবে বলা যায়। অর্থাৎ আমীন টেনেও পড়া যায় এবং টান ছাড়াও পড়া যায়। আমীন অর্থ হল, কবূল কর। মীম শব্দের উপর তাশ্‌দীদ যোগ করে আম্মীন বলা মারাত্মক ভুল। অবশ্য হামযাতে মদ ও মীমের উপর তাশদীদ যোগ করে آمين পড়লে সালাত ফাসিদ হবে না। এর উপরই ফাতওয়া। কেননা, এভাবে আল-কুরআনে বিদ্যমান আছে (তাবয়ীন)।

১৫. মাসআলা ঃ যে সব সালাতে চুপে চুপে কিরাআত পড়া হয়, যেমন যুহর ও আসর, এসব সালাতে মুক্তাদী যদি ইমামের وال الضالين পড়া শুনতে পায়, তবে কোন কোন মাশাইখের মতে মুক্তাদী আমঈন বলবে না। ফকীহ্ আবূ জা'ফর হিন্দুওয়ানী বলেন, আমীন বলবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ ঃ ফাতাওয়ার সূত্রে)

১৬. মাসআলা ঃ অতঃপর সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা তিন আয়াত মিলাবে (শরহুল মুনিয়্যা ঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ)। বড় এক আয়াত ছোট তিন আয়াতের সমান (তাবয়ীন)।

১৭. মাসআলা ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত শেষ করে রুকূতে যাবে। এটাই সহীহ্ মাযহাব (খুলাসা)। জামে' সগীরের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মাথা অবনত করার সাথে সাথে তাকবীর বলবে (হিদায়া)। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, এটাই বিশুদ্ধ মত (মি'রাজুদ' দিরায়া)। তাকবীর আরম্ভ হবে ঝুঁকার সাথে এবং শেষ হবে পূর্ণ রুকূতে যাওয়ার পর (মুহীত)। ইমাম রুকূ-সিজদা ইত্যাদির তাকবীর উচ্চস্বরে বলবে। এটা যাহিরী রিওয়ায়েতের কথা (তাতারখানিয়্যা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খুলাসা)। তাকবীর শব্দের "রা" অক্ষরটি সাকিন করে পড়বে (নিহায়া)। নিজের দুই হাত দ্বারা উভয় হাঁটু মযবুতভাবে ধরবে (হিদায়া)। এটাই সহীহ্ মত (বাদাই')। এ অবস্থায় আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত রাখবে। এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় আঙ্গুল খোলা রাখা

pdf By Syed Mostofa Sakib

মুস্তাহাব নয় এবং সিজদার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা মুস্তাহাব নয়। এতদুভয় অবস্থা ব্যতীত অন্য সব অবস্থায় আঙ্গুলসমূহকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে (হিদায়া)। রুকূর অবস্থায় পিঠ এমনভাবে বিছিয়ে দিবে যেন পানির পেয়ালা পিঠের উপর রাখলে তা স্থির হয়ে থাকে। এ অবস্থায় মাথা অধিক নত করে রাখবে 'না' এবং উপরের দিকে উঠিয়েও রাখবে না। বরং মাথা ও নিতম্ব সমান্তরাল রাখবে (খুলাসা)। উভয় হাঁটু কামানের ন্যায় বাঁকা করে রাখা মাকরূহ্। মহিলাগণ রুকূর অবস্থায় সামান্য ঝুঁকবে। নিজের হাতের উপর ভর করবে না এবং আঙ্গুলসমূহ খোলাও রাখবে না। বরং মিলিয়ে রেখে হাত হাঁটুর উপর রেখে দিবে। তারা নিজেদের হাঁটু সামান্য বাঁকা করে রাখবে এবং বাহু শরীর থেকে পৃথক করবে না (যাহিদী) বে রুকূর অবস্থায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ তিনবার বলবে। এটা হল তাসবীহ্র নিম্নতম সংখ্যা। কেউ যদি তাসবীহ্ না পড়ে বা একবার পড়ে, তবে জাইয আছে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে।

১৮. মাসআলা ঃ স্থিরভাবে রুকূ করার পর রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করবে। যদি স্থির ভাবে ইত্মিনানের সাথে রুকূ না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে সালাত জাইয হবে (খুলাসা)। ফাকীহ্দের সর্বসম্মত রায় অনুসারে ইমাম বলবে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ; এবং মুক্তাদীগণ বলবে, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ তারা سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে না। এতে কারো মতভেদ নেই। আর একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি বিশুদ্ধতম মতানুসারে উভয়টি বলবে (মুহীত)। এটাই নির্ভরযোগ্য মত (তাতারখানিয়া)। এটাই বিশুদ্ধতম রায় (হিদায়া)। রুকূ হতে উঠার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে এবং সোজা দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে (যাহিদী)। এটাই সহীহ্ মত (কিনয়া)। যে ব্যক্তি রুকূ হতে মাথা উত্তোলনকালে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলল না ; তার সম্পর্কে ফকীহ্ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, সে রুকূ হতে সোজা দাঁড়িয়ে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে না। অনুরূপভাবে অবস্থা পরিবর্তনের যে সময় যে দু'আ পাঠ করার হুকুম রয়েছে, তা অন্য অবস্থায় পাঠ করবে না। যেমন, রুকূতে বা সিজদায় যাওয়ার তাকবীর ইত্যাদি। এমনিভাবে সিজদার যে তাসবীহ্ বাকী থাকে, তা সিজদা হতে মাথা উঠানোর পর পড়বে না। তাই প্রত্যেক কাজ তার নিজ নিজ স্থানে আদায় করা ওয়াজিব (তাতারখানিয়া ঃ ইয়াতীমার সূত্রে)। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার সময় "হা" অক্ষরটি সাকিন করে পড়বে। "হা"-এর মাঝে হরকত লাগাবে না (তাতারখানিয়া হুজ্জত কিতাবের সূত্রে)।

১৯. মাসআলা ঃ অতঃপর সোজা দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে সিজদায় যাবে (হিদায়া)। সিজদায় যাওয়ার অবস্থায় তাকবীর বলবে এবং সিজদার মাঝে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলবে। এ হল নিম্নতম সংখ্যা (মুহীত)। রুকূ-সিজদার মধ্যে তাসবীহ্ তিনবারের অধিক বলা মুস্তাহাব। তবে বে-জোড় সংখ্যার উপর শেষ করবে (হিদায়া)। তাসবীহ্র নিম্নতম সংখ্যা তিনবার, মধ্যম সংখ্যা পাঁচ বার এবং পূর্ণতম সংখ্যা হল সাতবার (যাদ)। ইমাম হলে এমন অধিক সংখ্যা বলবে না যাতে মুক্তাদীদের কষ্ট হয় (হিদায়া)।

২০. মাসআলা ঃ ফকীহ্গণ বলেন, সিজদা করার ইচ্ছা করলে শরীরের ঐ অংশ প্রথমে যমীনে রাখবে, যা যমীনের অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং প্রথমে হাঁটু রাখবে, এরপর উভয় হাত এরপর নাক এবং এরপর কপাল রাখবে। আর উঠার সময় প্রথমে কপাল, এরপর নাক, এরপর হাত এবং উভয় হাঁটু উঠাবে। ফকীহ্গণ বলেন, যখন পা খালি থাকে, তখন এরূপ করবে। কিন্তু মোযা পরিহিত[১] অবস্থায় হলে প্রথমে হাঁটু রাখা সম্ভব হবে না। তাই এ অবস্থায় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখবে। ডান হাত আগে রাখবে পরে বাম হাত রাখবে (তাবয়ীন)।

২১. মাসআলা ঃ সিজদার মধ্যে উভয় হাত কান বরাবর স্থানে রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। এমনিভাবে পায়ের আঙ্গুলগুলোও কিবলামুখী রাখবে এবং এ সময় হাতের তালুর উপর ভর রাখবে। সিজদার অবস্থায় হাতের বাহু পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখবে এবং বাহুদ্বয় যমীনে বিছিয়ে রাখবে না (খুলাসা)। পেট রান থেকে পৃথক রাখবে (হিদায়া)। মহিলাগণ নিজেদের অঙ্গসমূহ রুকূ-সিজদার অবস্থায় পৃথক পৃথক রাখবে না, বরং মিলিয়ে রাখবে। তারা সিজদার অবস্থায় উভয় পায়ের উপর বসবে এবং পেট উরুর উপর বিছিয়ে দিবে (খুলাসা)।

২২. মাসআলা ঃ ক্রীতদাসীর হুকুম আযাদ নারীদের মতই। তবে তাকবীরে তাহ্রীমার সময় তারা উভয় হাত পুরুষের ন্যায় উত্তোলন করবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে সিজদা হতে মাথা উঠাবে। এ ব্যাপারে সুন্নাত হল, মাথা উত্তোলন করে সোজা বসে যাবে। এ বৈঠকে আমাদের মাযহাবে কোন মাসনূন দু'আ নেই (আল্‌জাওহারাতুন্ নায়্যারা)

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি সোজা না বসে দ্বিতীয় সিজদা করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয হবে (হিদায়া)। কেননা, সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করা সালাতের রুকন নয়। বরং রুকন হল, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যাওয়া। কারণ, এ পরিবর্তন ব্যতীত দ্বিতীয় সিজদা আদায় করা সম্ভব নয় এবং মাথা উত্তোলন ব্যতীত এ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রথম সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করা জরুরী। এ পরিবর্তন যদি মাথা উঠানো ব্যতীত সম্ভব হয়, যেমন কোন ব্যক্তি বালিশের উপর সিজদা করল, অতঃপর বালিশ তার সম্মুখ হতে সরিয়ে নেয়া হল, ফলে তার মাথা মাটিতে গিয়ে লাগল এতেও দুই সিজদা আদায় হয়ে যাবে (নিহায়া)।

২৪. মাসআলা ঃ কতটুকু পরিমাণ মাথা উঠাতে হবে এ নিয়ে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বসার দিকে বেশী উঠে তবে জাইয আছে। যদি যমীনের দিকে বেশী থাকে, তবে জাইয নেই (তাবয়ীন)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (হিদায়া)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যতটুকু উঠালে সাধারণত সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করা হয়েছে বলা হয়, এতটুকু পরিমাণ উঠালে সিজদা দুরুস্ত হবে। মুহীত কিতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত তাবয়ীন)। এটাই সহীহ্ রায় (বাদাই')। অতঃপর তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদার জন্য ঝুঁকবে এবং প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদায়ও তাসবীহ্ পাঠ করবে (মুহীত)

১. চামড়ার মোযা, যা অনেক সময় হাঁটু পর্যন্তও হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৫. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় বসবে না এবং উভয় হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে না। বরং হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়াবে (মুহীত)। যাদের কোন ওযর নেই আমাদের মাযহাবে এ ধরনের লোকদের জন্য টেক না লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এ কথা বর্ণিত আছে (বাহরুর রাইক)। কোন ব্যক্তি যদি বসে এবং হাতের উপর ভর করে দাঁড়ায় যেমন ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই (যহীরিয়া)।

২৬. মাসআলা ঃ প্রথম রাকআতে যা আমল করেছে দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ আমল করবে। তবে সুবহানাকা এবং আউযুবিল্লাহ্ পড়বে না (কুদূরী)। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। এ সময় হাত রানের উপর রেখে আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে দিবে (হিদায়া)। হাঁটু ধরবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খুলাসা)। মহিলা হলে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিবে (হিদায়া)।

২৭. মাসআলা ঃ বসার পর হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত তাশাহ্হুদ পড়বে (কাফী)। এর চেয়ে বেশী কিছু করবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। অবশ্য উত্তম হল, এভাবে ইশারা না করা (খুলাসা)। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত ঃ কুবরার সূত্রে)। বহু মাশাইখ ইশারা করাকে নাজায়েয মনে করতেন। মুনয়্যাতুল মুফতীর মধ্যে ইশারা করাকে মাকরূহ্ বলা হয়েছে (তাবয়ীন)।

২৮. মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদ পড়া শেষ হলে, দাঁড়িয়ে যাবে (মুহীত)। জিলাপবীতে বর্ণিত আছে যে, সিজদা হতে উঠার ন্যায় প্রথম বৈঠক হতেও অনরূপভাবে পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগের উপর ভর করে উঠবে। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, হাতে মাটির উপর ভর করে উঠাতে কোন দোষ নেই (যাহিদী)।

২৯. মাসআলা ঃ দাঁড়ানোর পর প্রথম দুই রাকআতে যেমন কিয়াস, রুকূ সিজদা করা হয়েছে শেষ দুই রাকআতেও অনুরূপ করবে (মুহীত)। শেষ দুই রাকআতে শুধু ফাতিহা পড়বে (কাফী)। এর থেকে বেশী পড়া মাকরূহ্ (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ, আল ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার এর সূত্রে)। কোন ব্যক্তি যদি শেষ দুই রাকআতে কিরাআত ও তাসবীহ না পড়ে তবে কোন ক্ষতি নেই। এ ক্ষেত্রে যদি ভুল হয় তবে সাহু সিজদাও ওয়াজিব হবে না। তবে কিরাআত পড়া উত্তম। এটাই সহীহ্ রিওয়ায়েত (যখীরা)। এটাই নির্ভরযোগ্য মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীকান)। এটা বিশুদ্ধ-তম মত (মুহীত ঃ কিরাআত অনুচ্ছেদ)। এটাই সহীহ্ মত এবং এটাই যাহিরী রিওয়ায়েত (বাদাই)। এ অবস্থায় চুপ দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ্ (খুলাসা)।

৩০. মাসআলা ঃ অতঃপর প্রথম বৈঠকের ন্যায় আখিরী বৈঠকেও বসবে (হিদায়া) এবং এতে ও তাশাহ্হুদ পড়বে। তাশাহ্হুদ শেষে রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ কেমন করে পড়বে, এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, দুরূদ শরীফ নিম্নরূপ,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

কোন কোন ফকীহ্ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ مُحَمَّدًا বলা মাকরূহ্ বলেছেন। সহীহ্ মতানুসারে এ কথা বলা মাকরূহ্ নয় (তাবয়ীন)। রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ পড়া শেষ করে নিজের জন্য, নিজের মাতা-পিতার জন্য এবং মু'মিন নর-নারী সকলের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে (খুলাসা)।

৩১. মাসআলা ঃ অতঃপর নিজের জন্য এবং অন্যান্য মু'মিনের জন্য দু'আ করবে। দু'আর মধ্যে নিজেকে খাস করবে না। এটাই সুন্নাত (তাবয়ীন)। অতঃপর বলবে;

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(খুলাসা)

এমন দু'আ করবে না, যা মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং এমন দু'আও করবে না, যা মানুষের নিকট চাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন কেউ বল্ল, হে আল্লাহ! আমাকে অমুকের সাথে বিবাহ করিয়ে দিন। এ তো মানুষের নিকট বলার বিষয়। যে কথা মানুষের নিকট বলা অসম্ভব যেমন, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দিন। এ কথা মানুষের নিকট বলার বিষয় নয়। "হে আল্লাহ্! আমাকে রিযক দিন, একথা প্রথম প্রকারের মধ্যে শামিল (হিদায়া)। তাই এ ধরনের শব্দের মাধ্যমে দু'আ করা জাইয নেই। এটাই সহীহ্ মত (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। কেউ যদি বলে, 'হে আল্লাহ্! আমাকে ইল্‌ম দিন এবং আমাকে হাজ্জ নসীব করুন তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (মুযমায়াত)। "ওয়াজিয্যা'' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সালাতের মাঝে মাসনূন দু'আ পড়া উত্তম। কেননা, মুখে এমন কথা এসে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, যা মানুষের নিকট চাওয়া যায়। অন্যথা যদি এসেই যায়, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (তাতারখানিয়া)।

৩২. মাসআলা ঃ সালাত ফাসিদ হওয়ার যে সব কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এ সবের দ্বারা তখনই সালাত ফাসিদ হবে যদি কোন ব্যক্তি আখিরী বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় না বসে। যদি আখিরী বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ সময় বসে, তবে সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা সে তার দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে (তাবয়ীন)। এ বিষয়ে বহু দু'আ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে। একদা তিনি রাসূল (স)-কে বললেন, (হে রাসূল! আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা আমি সালাতে পড়বো। তখন রাসূল (স) বললেন, পড় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّاِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَا اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) কতগুলো দু'আ করতেন এর মধ্যে একটি দু'আ হল এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَالَ اَعْلَمُ (নিহায়া)।

৩৩. মাসআলা ঃ সালাতের শেষ অবস্থায় মাসনূন দু'আসমূহ পড়ার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া মুস্তাহাব ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (তাতারখানিয়্যা ঃ হুজ্জতের সূত্রে)

অতঃপর দুই দিকেসালাম ফিরাবে। ডানে এক সালাম এবং বামে এক সালাম। প্রথম সালামে চেহারা ডানদিকে এমনভাবে ফিরাবে যেন ডান গালের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হয় এবং দ্বিতীয় সালামে চেহারা বামদিকে এমনভাবে ফিরাবে যেন বাম গালের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হয়। কিনয়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)।

৩৪. মাসআলা ঃ সালাম ফিরানোর সময় বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (মুহীত)। اَلسَّلَامُ শব্দটি الف و لام অক্ষর সহকারে বলা উত্তম। আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সময় ও اَلسَّلَامُ শব্দটি الف و لام সহকারে পড়া উত্তম (যহীরিয়্যা)। আমাদের মাযহাব মতে এ সালামের শেষে وبركاته শব্দটি বলবে না। সালামের মধ্যে সুন্নাত হল, দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা একটু নীচু স্বরে বলা (মুহীত)। এটাই উত্তম তাবয়ীন)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যায় এবং কোন কথা না বলে ও মসজিদ থেকে বের না হয়, তবে সাথে সাথে বসে যাবে এবং সালাম ফিরাবে (তাতারখানিয়্যা ঃ হুজ্জতের সূত্রে)। সহীহ্ মতে কিবলার দিক হতে পিঠ ফিরিয়ে নিলে তবে পুনরায় দ্বিতীয় সালাম ফিরাবে না (কিনয়া)। কেউ যদি প্রথমে বাম দিকে সালাম ফিরায়, তবে সাথে সাথে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে নিবে যতক্ষণ না কোন কথা বলে। ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর পুনরায় বামদিকে সালাম ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি যদি প্রথমে সম্মুখ দিকে সালাম ফিরায়, তবে সে বামদিকে সালাম ফিরিয়ে নিবে (তাবয়ীন)।

৩৬. মাসআলা ঃ মুক্তাদীর সালাম ফিরানোর মধ্যে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, মুক্তাদীর জন্য উত্তম হল, ইমামের অপেক্ষা করা। ইমাম ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদী ডানদিকে সালাম ফিরাবে এবং সে বামদিকে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদী বাম দিকে সালাম ফিরাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা ঃ সালামের সময় রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা এবং ডানে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের মুসল্লী এবং বামে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের মুসল্লীদের নিয়্যাত করবে (যাহিদী)। সালামের সময় মহিলা এবং যারা সালাতের মধ্যে শরীক নেই, তাদের নিয়্যাত করবে না।) এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)।

৩৮. মাসআলা ঃ মুক্তাদী উপরোক্ত লোকদের নিয়্যাত করার সাথে সাথে ইমামের নিয়্যাতও করবে। ইমাম ডানদিকে থাকলে ডান সালামে তাঁর নিয়্যাত করবে। বামদিকে থাকলে বাম সালামে তাঁর নিয়্যাত করবে। আর যদি বরাবর সামনে থাকে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ডান সালামের সময় তাঁর নিয়্যাত করবে আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় তাঁর নিয়্যাত করবে (মুহীত)। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরই একটি রিওয়ায়েত (কাফী)। ফাতাওয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এটাই সহীহ্ মত (তাতারখানিয়্যা)। একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কেবল রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতার নিয়্যাত করবে। অন্য কারো নয়। ফেরেশতাদের নিয়্যাত করার সময় নির্ধারিত সংখ্যার নিয়্যাত করবেন (হিদায়া)। এটাই সহীহ্ মত (বাদাই)।

৩৯. মাসআলা ঃ যুহর, ও মাগরিবে সালাম ফিরানোর পর ইমামের জন্য বসে অপেক্ষা করা মাকরূহ্, বরং তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে সুন্নাত আদায় করবে। তবে ফরয আদায় করার স্থানে সুন্নাত আদায় করবে না। বরং ডানে-বামে বা পেছনে সরে সুন্নাত আদায় করবে। অথবা বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে। মুক্তাদী বা একা সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি নিজ স্থানে বসে দু'আ করে, তবে জাইয আছে। অনুরূপভাবে তাঁরা যদি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত আদায় করে বা পেছনে সরে যায় অথবা ডানে-বামে সামান্য সরে যায়, তাহলে এও জাইয আছে। মোট কথা হল, মুক্তাদী ও একা সালাত আদায়কারীর জন্য এ সবই জাইয।

৪০. মাসআলা ঃ যে সালাতের পর সুন্নাত বা নফল নেই যেমন ফজর ও আসর, এ ধরনের সালাতের পর ইমামের জন্য নিজ স্থানে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা মাকরূহ্। এরূপ করাকে নবী করীম (সা) বিদ'আত বলেছেন। ফজরের সালাতে ইমাম স্বাধীন। ইচ্ছা করলে স্বীয় স্থান ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং ইচ্ছা করলে সূর্যোদয় পর্যন্ত মিহ্‌রাবের মধ্যে বসেও থাকতে পারে। শেষোক্ত বিষয়টি ইমামের জন্য উত্তম। অবশ্য সামনে যদি মাসবূক মুসল্লী না থাকে, তবে ইমাম মুসল্লীদের মুখ করে বসবে। সামনে যদি কোন মাসবূক মুসল্লী থাকে, তবে ডান বা বাম দিকে মুখ করে বসবে। এ হুকুমের ক্ষেত্রে শীত-গ্রীষ্ম উভয় কালই সমান। এটাই সহীহ্ মত (খুলাসা)। হুজ্জত কিতাবে আছে যে, যুহর, মাগরিব ও ঈশার ফরয আদায় করার পর ইমাম সুন্নাত পড়তে শুরু করবে। লম্বা-চওড়া দু'আয় মশগুল হবে না (তাতারখানিয়্যা)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ কিরাআতের বিবরণ[১]

১. মাসআলা ঃ সফরের মাঝে অস্থিরতা তথা ভয় বা তাড়াহুড়া থাকলে সুন্নাত হল সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা পাঠ করা। মুকীম অবস্থায় যদি ব্যস্ততা তথা সময়ের সংকীর্ণতা বা জানমালের ব্যাপারে কোন আশংকা থাকে, তবে সুন্নাত হল, ঐ পরিমাণ কিরাআত পড়া যেন ওয়াক্ত চলে না যায় বা যেন নিরাপত্তায় বিঘ্ন না ঘটে (যাহিদী)।

১. সালামের পর দু'আ করা সালাতের অংশ নয় বলে উল্লেখ করেন না অবশ্য জরুরী মনে না করে দু'আ করলে দোষের হবে না। সালামের পূর্বে সালাতের মধ্যে একাধিক দু'আর উল্লেখ করা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ সফরের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ সময়ের মাঝে যদি প্রশস্ততা থাকে এবং অবস্থা নিরাপদ ও শান্ত হয়, তাহলে ফজরের সালাতে সূরা বুরূজ বা এর ন্যায় অন্য কোন সূরা পড়বে। এরূপ আমল করলে সুন্নাত কিরাআত এবং সফরের বিধানের লঘুতা উভয়ের মধ্যেই সমন্বয় সাধিত হবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ)। যুহরের সালাতেও অনুরূপ কিরাআত পড়বে। আসর ও ঈশায় এর চেয়ে ছোট সূরা পড়বে। মাগরিবে অত্যন্ত ছোট সূরা পড়বে (যাহিদী)।

৩. মাসআলা ঃ মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত চল্লিশ বা পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়া সুন্নাত। জামিউস সগীরের বর্ণনা মতে যুহরেও ফজরের সমপরিমাণ পড়া সুন্নাত। আসলের মধ্যে আছে যে, অথবা এর থেকে কিছু কম পড়বে। আসর ও ঈশার দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত বিশ আয়াত পরিমাণ পড়া সুন্নাত। মাগরিবের প্রত্যেক রাকআতে ছোট সূরা পাঠ করা সুন্নাত (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ ফকীহ্‌গণ বলেন, ইকামতের অবস্থায় ফজর ও যুহরে তিওয়ালে মুফাসসাল, আসর ও ঈশায় আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং মাগরিবে কিসারে মুফাস্‌সাল-এর সূরাসমূহ থেকে পড়াকে উত্তম বলেছেন (বিকায়া)। তিওয়ালে মুফাস্‌সাল সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত। আওসাতে মুফাস্‌সাল সূরা বুরূজ হতে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত এবং কিসারে মুফাস্‌সাল হল সূরা লাম ইয়াকুন হতে সূরা নাস পর্যন্ত (মুহীত, বিকায়া ও মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। "ইয়াতীমা" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি মাকরূহ্ ওয়াক্তে আসরের সালাত আদায় করে, তবে এ অবস্থায় মাসনূন কিরাআত পড়া তার জন্য দুরুস্ত আছে[১] (তাতারখানিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ বিতরের সালাতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই (মি'রাজুদ দিরায়া)। অতএব যা পড়বে তাই ভাল (মুহীত) কিন্তু নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিতরের সালাতে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। অতএব বরকতের জন্য কখনো উপরোক্ত সূরাসমূহ পাঠ করবে আবার কখনো অন্যান্য সূরা পাঠ করবে যেন বাকী কুরআন বর্জন না করা হয় (তাহ্‌যীব)। মুস্তাহাব কিরাআত হতে বেশী পড়বে না। মানুষের উপর জটিলতা সৃষ্টি করবে না। বরং মাসনূন কিরাআত পূরা করার পর সহজতর পদ্ধতি অবলম্বন করবে (মুযমারাত ঃ ইমাম তাহাবী সূত্রে)।

৬. মাসআলা ঃ ফজরের প্রথম রাক'আত দ্বিতীয় রাক'আত অপেক্ষা লম্বা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সমস্ত সালাতে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা প্রথম রাক'আত লম্বা করা আমার নিকট উত্তম। এর উপরই ফাতওয়া (যাহিদী ও মি'রাজুদ দিরায়া)। হুজ্জত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ফাতওয়ার জন্য এটাই গ্রহণযোগ্য মত (তাতারখানিয়্যা)। জুমুআ ও দুই ঈদের সালাতে উভয় রাক'আতের কিরাআত একই রকম পড়বে (বাদাই')।

৭. মাসআলা ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআতের ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'আতের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-

১. এ মাসআলাটি বোধগম্য নয়, বরং ছোট সূরা পড়াই উত্তম।

তৃতীয়াংশের মধ্যে যে ব্যবধান এরূপ ব্যবধান করা উচিত। দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পড়া হবে প্রথম রাকআতে এবং এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পড়া হবে দ্বিতীয় রাকআতে। শরহুত তাহাবীতে উল্লেখ আছে যে, প্রথম রাকআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়া উচিত এবং দ্বিতীয় রাকআতে দশ বা বিশ আয়াত পরিমাণ পড়া উচিত (মুহীত)। এতো উত্তম এবং অনুত্তমের কথা। অন্যথায় দুই রাকআতের মধ্যে যদি প্রচুর ব্যবধানও থাকে, যেমন কেউ প্রথম রাকআতে একটি লম্বা সূরা পড়ল এবং দ্বিতীয় রাকআতে পড়ল কেবল তিনটি আয়াত, তাতেও কোন ক্ষতি নেই (যহীরিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ জামে সগীরের কোন কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআত প্রথম রাক'আতের কিরাআত অপেক্ষা তিন বা তিনাধিক আয়াত পরিমাণ দীর্ঘ করা মাকরূহ্। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআত প্রথম রাকআতের কিরাআত অপেক্ষা তিন আয়াতের চেয়ে কম পরিমাণ বড় হয় তাহলে মাকরূহ্ হবে না (খুলাসা)। ফকীহ্ মুরগিনানী (র) বলেন, আয়াত যদি সমান সমান হয়, তাহলে ছোট বড় নিরূপণ করা হবে "আয়াতের সংখ্যার দ্বারা।" আর যদি আয়াত সমান সমান না হয়, তাহলে ছোট-বড় নিরূপণ করা হবে শব্দ এবং অক্ষরের দ্বারা (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা ঃ সালাতের মধ্যে কুরআনের কোন অংশকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করে নেয়া মাকরূহ্। (তাহাবী ও ইসবীজাবী)। এরূপ করা তখনই মাকরূহ হবে, যদি এভাবে নির্ধারণ করাকে এমন ওয়াজিব মনে করা হয় যে, এ ছাড়া অন্য কিরাআত পড়া আদৌ জাইয নেই অথবা উক্ত কিরাআত ব্যতীত অন্য কিরাআত মাকরূহ্। কিন্তু যদি সহজের জন্য অথবা রাসূল (সা)-এর কিরাআত হতে বরকত হাসিলের জন্য এভাবে কোন কিরাআত কোন সালাতে নির্ধারণ করা হয়, তবে মাকরূহ্ হবে না। তবে শর্ত হল, এ কিরাআত ব্যতীত কখনো অন্য কিরাআত দ্বারাও সালাত আদায় করতে হবে। যেন মূর্খ এবং অজ্ঞ লোকেরা এ কথা মনে করতে না পারে যে, এ কিরাআত ব্যতীত অন্য কিরাআত বুঝি জাইয নেই (তাবয়ীন)।

১০. মাসআলা ঃ ফরয সালাতে উত্তম হল প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি পূর্ণ সূরা পাঠ করা। যদি প্রত্যেক রাকআতে পূর্ণ সূরা পাঠ করতে অপারগ হয় তাহলে দুই রাকআতে একটি সূরা পাঠ করবে (খুলাসা)। যদি সূরার কিছু অংশ এক রাকআতে পড়া হয় এবং অপর রাকআতে আরো কিছু অংশ পড়া হয়, তবে এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এরূপ করা মাকরূহ্। অপরাপর ফকীহ্‌গণ বলেন, মাকরূহ্ হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত যহীরিয়্যা)। তবে এরূপ না করা উচিত। যদি করে তবে কোন ক্ষতি নেই (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি এক রাকআতে কোন সূরার মধ্যাংশ হতে অথবা শেষাংশ হতে পাঠ করে এবং অন্য রাকআতে অন্য সূরার মধ্যাংশ বা শেষাংশ হতে পাঠ করে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এরূপ করা উচিত নয়। এরপর ও যদি কেউ এরূপ করে, তবে কোন ক্ষতি নেই (যখীরা)। "হুজ্জত" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি প্রথম রাকআতে সূরার শেষাংশ হতে তিলাওয়াত করে এবং দ্বিতীয় রাকআতে ছোট একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা পাঠ করে যেমন কেউ প্রথম রাকআতে امن الرسول (শেষ পর্যন্ত) পড়ল এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়ল, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাকরূহ্ হবে না (তাতারখানিয়া)। সূরার শেষাংশ যদি পূর্ণাঙ্গ সূরা থেকে দীর্ঘ হয়, তবে এরূপ সূরার শেষাংশ দুই রাকআতে পাঠ করা পূর্ণাঙ্গ সূরা পাঠ করা হতেও উত্তম। যদি শেষাংশের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ সূরার আয়াতের সংখ্যা বেশী হয়, তবে পূর্ণাঙ্গ সূরা পাঠ করাই উত্তম (যখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি লম্বা আয়াত তিলাওয়াত করার ইচ্ছা করে, যেমন ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ (থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত) অথবা তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করার ইচ্ছা করে, তবে এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে তিন আয়াত যদি আল-কুরআনের কোন ছোট সূরার সমপরিমাণ হয়, তবে এক আয়াত না পড়ে তিন আয়াত পড়াই উত্তম (তাতারখানিয়া)।

১৩. মাসআলা ঃ মাঝখানে এক বা একাধিক সূরা বাদ দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি এক রাকআতে দুই সূরা পাঠ করে, তবে মাকরূহ্ হবে। কিন্তু যদি মাঝখানে কয়েক সূরা বাদ দিয়ে দুই রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা, হয় তবে মাকরূহ্ হবে না। মাঝখানে এক সূরা বাদ দিয়ে যদি দুই রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা হয়, তবে কারো কারো মতে মাকরূহ্ হবে। আর কারো কারো মতে যদি মাঝখানে বাদ দেয়া সূরা লম্বা ও দীর্ঘ হয়, তবে মাকরূহ হবে না (মহীত)। যেমন দুই রাকআতে পঠিত দুই সূরার মাঝে দুই সূরা থাকলে সালাত মাকরূহ্ হয় না। (খুলাসা)। কেউ কেউ বলেন, এরূপ করা কোন অবস্থায়ই মাকরূহ্ নয়। কেউ যদি প্রথম রাকআতে একটি সূরা পড়ে অপর রাকআতে অথবা ঐ রাকআতেই এর উপরের সূরাও পাঠ করে, তবে মাকরূহ্ হবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি প্রথম রাকআতে একটি আয়াত পড়ে দ্বিতীয় রাক'আতে অথবা ঐ রাকআতেই এর উপরের আয়াত পড়ে. তবে মাকরূহ্ হবে। কোন ব্যক্তি যদি মধ্যখানে এক বা একাধিক আয়াত বাদ দিয়ে এক রাকআতে দুই আয়াত বা দুই রাকআতে দুই আয়াত পাঠ করে, তবে সূরার ক্ষেত্রে যে বিধান পূর্বে আলোচিত হয়েছে এখানেও তা প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। উপরোক্ত হুকুম ফরয সালাতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুন্নাতের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। তাই সুন্নাত সালাতে মাকরূহ্ হবে না (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি প্রথম রাকআতে এক সূরা পাঠ করে মাঝে এক সূরা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় রাকআতে পরের সূরা পড়ে অথবা ঐ সূরার পূর্বের সূরা পড়ে, তবে উত্তম হল আদায়কৃত সালাত না ছাড়া (যখীরা)। কারো এক সূরা পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুরু করে দিয়েছে অন্য সূরা, এমতাবস্থায় আরম্ভকৃত সূরার দু'এক আয়াত পড়ার পর তার ইচ্ছা জাগল যে, সে এ সূরা বাদ দিয়ে অভিষ্ট সূরা পড়বে, তবে এরূপ করা মাকরূহ্। কোন ব্যক্তি এক আয়াত হতে এক হরফ কম পড়া অবস্থায়ও যদি এরূপ করতে চায়, তবু মাকরূহ্ হবে। সালাতে রুকূর তাকবীর বলার পর কিরআত আরো বর্ধিত করার যদি কেউ ইচ্ছা করে, তবে রুকূ না করা পর্যন্ত এরূপ করাতে কোন দোষ নেই (খুলাসা)। সালাতের মধ্যে কেউ যদি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করে অথবা সূরা ফাতিহার সাথে কেবল এক বা দুই আয়াত মিলিয়ে থাকে, তবে তার জন্য এরূপ করা মাকরূহ্। (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ সালাতে কুরআন খতমের ইচ্ছায় কেউ যদি প্রথম রাকআতে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে রুকূ করে, তবে সে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার কিছু অংশ পাঠ করবে (খুলাসা)।

স্থলে مَثَانِيْنَ পড়ল অথবা اَلذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى এর স্থলে وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়ল অথবা اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى এর স্থলে وَاَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى পড়ল অথবা وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ এর স্থলে وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ وَاِنَّكَ পড়ল, এরূপ করলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ পড়া। এক শব্দের স্থানে যদি এমন একটি শব্দ পড়া হয় যা উক্ত শব্দের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা কুরআনে বিদ্যমান আছে, তাহলে এতে মুসল্লীর সালাত ফাসিদ হবে না। যেমন কেউ اَلْعَلِيْمُ এর স্থলে اَلْحَكِيْمُ পড়ল। তবে এতে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি পঠিত শব্দ আল-কুরআনে বিদ্যমান না থাকে, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ তবু ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন কোন ব্যক্তি اَلتَّوَّابِيْنَ এর পরিবর্তে اَلتَّيَابِيْنَ পড়ল। যদি উক্ত শব্দ কুরআনে না থাকে এবং অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এবং ঐ শব্দ তাসবীহ, তাহ্মীদ এবং যিকিরের অনুরূপও না হয়, তবে সমস্ত ইমামের মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ শব্দ যদি আল-কুরআনে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, যেমন কেউ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ এর স্থানে اِنَّا كُنَّا غَافِلِيْنَ পড়ল। অথবা অনুরূপ কোন শব্দ পরিবর্তন করে পড়ল, যার উপর বিশ্বাস করলে কুফরীর আশংকা রয়েছে, এরূপ পড়লে সমস্ত মাশাইখের মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর এটাই সহীহ্ মাযহাব (খুলাসা)। যদি কোন বস্তুকে এমন বস্তুর দিকে সম্বন্ধ জুড়ে দেয়া হয়, যার দিকে আসলে তা সম্বোধিত ছিল না এবং সম্বন্ধকৃত বস্তু কুরআনেও নেই। যেমন কেউ পড়ল "মারয়াম ইব্নাতু গায়লান", তাহলে সমস্ত ইমামের মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি উক্ত শব্দ কুরআনে বিদ্যমান থাকে, যেমন কেউ পড়ল "মারয়াম ইব্নাতু লুকমান" এবং "মূসা ইব্ন ঈসা", তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সালাত ফাসিদ হবে না। অধিকাংশ মাশাইখের মত এটাই। যদি কেউ "ঈসা ইব্ন লুকমান" বলে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, 'ঈসা (আ)-এর বাবা নেই। যদি কেউ "মূসা ইব্ন লুকমান" বলে তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, মূসা (আ)-এর পিতা আছে। তবে এতটুকু বলা যায় যে, উক্ত ব্যক্তি বাপের নাম বলার ক্ষেত্রে ভুল করেছে (ওয়াজী ঃ আল কুদূরী)।

৭. মাসআলা ঃ এমনভাবে কোন শব্দ বেশী বলা, যা কোন শব্দের পরিবর্তে বলা হয়নি। শব্দ বাড়ানোর ফলে যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং উক্ত শব্দটি কুরআনে বিদ্যমান থাকে, যেমন কেউ পড়ল وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ (মূলতঃ كفروا শব্দটি কুরআনে নেই)। অথবা বর্ধিত শব্দটি কুরআনে নেই। যেমন কেউ পড়ল, اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَّجَمَالًا (এখানে جمالا শব্দটি বেশী। তবে উভয়ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি শব্দ বাড়ানোর ফলে অর্থের বিকৃতি না ঘটে এবং শব্দটি আল্-কুরআনে বিদ্যমান থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি বলল, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ

pdf By Syed Mostafa Sakib

خَبِيْرًا بَصِيْرًا (خَبِيْرًا শব্দটি এখানে অতিরিক্ত) তাহলে ফকীহ্‌দের ইজমা অনুসারে তার সালাত ফাসিদ হবে না। উক্ত শব্দটি যদি আল্‌-কুরআনে বিদ্যমান না থাকে, যেমন কেউ পড়ল, فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَتُفَّاحٌ وَرُمَّانٌ তাহলে অধিকাংশ মাশাইখের মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কোন শব্দ বা কোন অক্ষর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা। যদি একটি অক্ষর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা হয় এবং এতে যদি কোন শব্দ দুইবার উচ্চারিত হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। যেমন কেউ وَمَنْ يَرْتَدِدْ দুই বার পড়ল। যদি কোন শব্দ এরচেয়েও অধিক বার তাকরার করা হয়, যেমন কেউ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তিন লামের সাথে পড়ে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি কেউ একটি শব্দ কয়েক বার পড়ে এবং এতে যদি অর্থের বিকৃতি না ঘটে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে, যেমন কেউ পড়ল رَبِّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বা, مَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তাহলে সহীহ্ মতানুসারে এ সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ আগের শব্দ আগে এবং পরের শব্দ পরে পড়ার মধ্যে ভুল করা। কোন শব্দকে যথাস্থানে না পড়ে যদি অগ্রে বা পশ্চাতে পড়া হয় এবং এতে যদি অর্থের বিকৃতি না ঘটে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। যেমন কেউ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ এর স্থলে لَهُمْ فِيْهَا شَهِيْقٌ وَزَفِيْرٌ পড়ল, এতে সালাত ফাসিদ হবে না (খুলাসা)। যদি এ অগ্র-পশ্চাতের কারণে অর্থের বিকৃতি ঘটে, যেমন কেউ পড়ল, اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ এরূপ পড়লে অধিকাংশ মাশাইখের মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই সহীহ্ মত (যহীরিয়্যা। যদি দু' টি শব্দকে যথাস্থানে না পড়ে অন্য দুই শব্দের আগে পড়া হয় এবং এতে অর্থের বিকৃতি ঘটে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, যেমন কেউ পড়ল اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَخَافُوْهُمْ وَلَاتَخَافُوْنَ যদি অর্থের বিকৃতি না ঘটে যেমন, কেউ পড়ল يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوْهٌ এতে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি কোন অক্ষরকে তার স্থানে না পড়ে অন্য অক্ষরের আগে পড়া হয়, যেমন কেউ كَعَصْفٍ এর স্থানে كَعَفْصٍ পড়ল। এতে যদি অর্থের পরিবর্তন ঘটে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি অর্থের পরিবর্তন না ঘটে, যেমন কেউ غُثَاءً اَحْوٰى এর স্থলে غُثَاءً اَوْحٰى পড়ল, এতে সালাত ফাসিদ হবে না। এটাই উত্তম কথা (খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত পড়া। কেউ যদি এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত পাঠ করে পরিপূর্ণ ওয়াক্‌ফ (বিরাম গ্রহণ) করে। অতঃপর অন্য আয়াতের পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ পড়ে, যেমন কেউ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ পাঠ করে اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ পড়ল, অথবা কেউ যদি وَالتِّيْنِ . . . وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ পর্যন্ত পড়ে ওয়াকফ করে এর পর لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ পড়ে অতঃপর اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ পর্যন্ত পড়ে ওয়াকফ করে এবং পরে اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ পাঠ করে

১৬. মাসআলা ঃ হুজ্জত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কুরআন শরীফ সাত কিরাআত এবং সমস্ত রিওয়ায়েত অনুযায়ীই পড়া জাইয। কিন্তু আমার নিকট ঠিক হল, আল্‌-কিরাআতুল 'আজীবা অর্থাৎ আশর্যজনক কিরাআতসমূহ ইমালা করে না পড়া এবং গরীব বর্ণনা দ্বারা যা প্রমাণিত ঐ সব কিরাআত না পড়া (তাতারখানিয়্যা)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বসে নফল সালাত আরম্ভ করেছিল, অতঃপর রুকূ করার সময় সে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করল এ ধরনের ব্যক্তির জন্য উত্তম হল, দাঁড়িয়ে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা। যদি দাঁড়িয়ে কিছু পড়ে সোজা রুকূতে চলে যায়, তবু জাইয আছে। কিন্তু যদি সোজা না দাঁড়িয়ে রুকূতে চলে যায়, তবে জাইয হবে না (খুলাসা)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ কারীর ত্রুটিসমূহের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কারীর ত্রুটিসমূহের মাঝে একটি ত্রুটি হল, এক শব্দের এক অক্ষরকে অন্য শব্দের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেয়া। কোন ব্যক্তি যদি এক শব্দের এক অক্ষরকে অন্য শব্দের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেয়, যেমন কেউ اياك نعبد পড়ার সময় কাফ ও নূন অক্ষরকে মিলিয়ে পড়ল, অথবা غير المغضوب عليهم পড়ার সময় "বা" ও "আয়ন" অক্ষরকে মিলিয়ে পড়ল অথবা سمع الله لمن حميده বলার সময় الله শব্দের 'হা' এবং لمن এর "লাম" অক্ষরকে মিলিয়ে পড়ল, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলেও শুদ্ধ মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না (খুলাসা)।

২. মাসআলা ঃ এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর বলা। কেউ যদি এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করে এবং এতে অর্থের বিকৃতি না ঘটে, যেমন কেউ ان المسلمين এর স্থলে ان المسلمون পড়ল এবং ان الظالمين এর স্থলে ان الظالمون পড়ল ইত্যাদি। এতে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি এরূপ পরিবর্তনের দ্বারা অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং ঐ দুই অক্ষর এমন ছিল যে, এর মধ্যে সহজেই পার্থক্য বিধান করা যেত যেমন, কেউ ط ও ص । সুতরাং কেউ যদি الصالحات এর স্থানে الطالحات পড়ে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি অক্ষর দু' টি এমন হয় যে, সহজে এদের মাঝে পার্থক্য বিধান করা সম্ভব নয় যেমন ظ ও ض , ص ও س এবং ط ও ت । শব্দের এরূপ বিকৃতির ক্ষেত্রে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে এরূপ কিরাআতের ফলে সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অধিকাংশ মাশাইখ এভাবেই ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। কাযী আবুল হাসান (র) এবং কাযী আবূ আসিম (র) বলেন, ইচ্ছা করে এরূপ করলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি হঠাৎ মুখ হতে বেরিয়ে যায় বা কোন ব্যক্তি যদি এক অক্ষরকে অন্য অক্ষর হতে পার্থক্য করতে সক্ষম না হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। এটাই ইনসাফপূর্ণ ও উত্তম কথা (ওয়াজীয ঃ শায়খ কুরদুরী)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন অক্ষর ঠিকভাবে আদায় করতে না পারে তবে তার চেষ্টা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে তাকে মাযুর মনে করা হবে না। কোন অক্ষর যদি মুখে উচ্চারণ হতে না

pdf By Syed Mostafa Sakib

চায় এবং ব্যক্তি যদি এমন আয়াত না পায় যার মাঝে উক্ত অক্ষর নেই, তবে তার সালাত দুরুস্ত হবে। কিন্তু এ অবস্থায় সে অন্যের ইমামত করতে পারবে না। আর যদি এমন আয়াত তার মুখস্থ থাকে, যার মধ্যে ঐ অক্ষরগুলো নেই, তাহলে সে ঐ আয়াত পড়বে এবং সকলের মতে তার সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। যদি সে ঐ আয়াত পড়ে, যার মাঝে উক্ত অক্ষরসমূহ আছে, তবে কারো কারো মতে তার সালাত দুরুস্ত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কোন অক্ষরকে বাদ দিয়ে দেয়া। সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে বা তারখীম করার লক্ষ্যে শর্ত সাপেক্ষে যদি কোন অক্ষরকে বাদ দেয়া হয়, যেমন কোন ব্যক্তি وَنَادَوْا يَامَالِ এর স্থলে وَنَادَوْا يَامَالِكُ পড়ল তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। অক্ষর বাদ দেয়া যদি ايجاز (সংক্ষেপকরণ) ও ترخيم (তারখীম)–এর উদ্দেশ্যে না হয় এবং বাদ দেয়ার কারণে যদি অর্থের বিকৃতি না ঘটে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। যেমন কেউ وَلَقَدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ এর স্থলে وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ পড়ল। আর যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে তবে সমস্ত মাশাইখের মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন কেউ فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এর স্থলে লাম অক্ষরটি বাদ দিয়ে فَمَالَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ পড়ল। (মুহীত)। 'ইতাবিয়্যা গ্রন্থ আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ এর স্থলে يُظْلَمُوْنَ فَرَاَيْتَ الَّذِىْ পড়ে অর্থাৎ اَفَرَاَيْتَ এর আলিফতে বিলুপ্ত করে يُظْلَمُوْنَ নূনকে فَرَاَيْتَ এর "ফা" অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেয় অথবা وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا এর وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ نَهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا পড়ে অর্থাৎ اَنَّهُمْ এর আলিফকে বিলুপ্ত করে يَحْسَبُوْنَ এর নূনকে نَهُمْ এর নূনের সাথে মিলিয়ে দেয়, তবে এতে তার সালাত ফাসিদ হবে না (যথীরা ঃ বিদ্যমান অক্ষরকে বিলুপ্ত করা এবং বিলুপ্ত অক্ষরকে উল্লেখ করা অনুচ্ছেদ)।

৫. মাসআলা ঃ অক্ষর বর্ধিত করা। কেউ যদি কোন অক্ষর বর্ধিত করে এবং এতে অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে অধিকাংশ মাশাইখের মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যেমন কেউ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ এর স্থলে ى সংযোজন করে وَانْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ পড়ল (খুলাসা)। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াত (যার মীম অক্ষরটি হল পেশ বিশিষ্ট এবং আলিফ হল সাকিন) কে هُمَ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا পড়ে অর্থাৎ মীমকে সাকিন এবং আলিফ অক্ষরটিকে যবর বিশিষ্ট পড়ে তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى-কে وَمَا خَلَقَ اَلذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়ে অর্থাৎ সাকিন বিশিষ্ট আলিফকে যবর দিয়ে এবং যে 'লাম' "যাল" এর মধ্যে ইদগাম হয়ে গিয়েছিল তাকে প্রকাশ করে পড়ে, তবে এতেও সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত)। যদি অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, যেমন কেউ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ এর স্থলে وَزَرَابِيْبُ مَبْثُوْثَةٌ পড়ল অথবা مَثَانِىْ এর

তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি ওয়াকফ না করে বরং মিলিয়ে পড়ে এবং এতে যদি অর্থের পরিবর্তন না ঘটে, যেমন কেউ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا এর স্থলে فَلَهُمْ جَزَاءُ الْحُسْنٰى পড়ল, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে, যেমন কেউ পড়ল اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ ....خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ এরূপ পড়লে আমাদের মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই সহীহ্ মত। (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ যথাস্থানে ওয়াকফ–'অসল' না করা এবং যথাস্থান হতে তিলাওয়াত আরম্ভ না করা। কোন ব্যক্তি যদি যথাযথ স্থানে ওয়াকফ না করে অথবা যথাযথ স্থান হতে তিলাওয়াত আরম্ভ না করে এবং এতে যদি অর্থের মাঝে বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, যেমন কেউ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ পড়ে ওয়াকফ করল অতঃপর اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ হতে আরম্ভ করল, এতে আমাদের মাযহাবের আলিমদের ঐকমত্য অনুসারে সালাত ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি যথাযথ স্থানে 'অসল' না করে অন্যস্থানে অসল করে, যেমন কেউ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ পড়ে না থেমে اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ কেও এর সাথে মিলিয়ে পড়ে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু এরূপ করা খুবই খারাপ (খুলাসা)। এ পরিবর্তনের কারণে যদি অর্থের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন কেউ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ পড়ে থামল। অতঃপর اِلَّا هُوَ পড়ল। এতে আমাদের অধিকাংশ আলিমের মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কারো কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সালাত ফাসিদ না হওয়ার উপরই ফাতওয়া (মুহীত)। কাযী সাঈদ নাজীব আবূ বকর (র) বলেন, কেউ যদি কিরাআত শেষ করে রুকূর তাকবীর বলার ইচ্ছা করে, তবে কিরাআত যদি আল্লাহ্‌র প্রশংসার উপর শেষ হয় তবে আল্লাহু আকবারের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। কিরাআত যদি প্রশংসার উপর খতম না হয়, তাহলে মিলিয়ে না পড়া উত্তম। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (তাতারখানিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ ইরাবের মধ্যে ভুল করা। কেউ যদি ইরাবের মাঝে এমন ভুল করে যার কারণে অর্থের মাঝে কোন বিকৃতি ঘটে না। যেমন কেউ পড়ল لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتُكُمْ "তা" অক্ষরের মাঝে পেশের সাথে, তবে ফকীহ্‌দের ঐকমত্যে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি অর্থের মাঝে বিশেষ ধরনের বিকৃতি ঘটে, যেমন কেউ وَعَصٰى اٰدَمَ رَبُّهُ মীমের মধ্য যবর এবং "বা" এর মধ্যে পেশের সাথে পড়ল, অথবা অনুরূপ ভাবে কোন আয়াত পড়ল, যা ইচ্ছাকৃতভাবে পড়লে মানুষ কুফরীতে পতিত হয়, এরূপ কিরাআত যদি কেউ ভুলবশত পড়ে, তবে মুতাকাদ্দিমীন ফকীহ্‌দের মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে মুতাআখ্‌খিরীন ফকীহ্‌দের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাঝে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবূ নস্‌র মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম, আবূ বক্‌র ইব্‌ন সাঈদ বলখী ফকীহ্ আবূ জা'ফর হিন্দওয়ানী, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল, ইমাম যাহিদ এবং শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) প্রমুখ ফকীহ্‌র মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। মুতাকাদ্দিম ফকীহ্‌গণ যা বলেছেন, তা অধিক সতর্কতাপূর্ণ। কেননা, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ পড়ে, তবে কুফরী হবে। আর যা পড়া কুফরী, তা কখনো কুরআনের অংশ হতে পারে না। মুতাআখ্‌খিরীন ফকীহ্‌গণ যা বলেছেন, তা ব্যাপক। কেননা, সাধারণ জনগণ ইরাবের মাঝে পাথক্য করতে সক্ষম নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ রায় (মুহীত)। এভাবেই ফাতওয়া প্রদান করা হয় (' ইতাবিয়্যা ও যহীরিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ তাশদীদ ও মদের স্থানে তাশদীদ ও মদ বাদ দিয়ে পড়া। কেউ যদি اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর তাশদীদ বাদ দিয়ে পড়ে অথবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-এর 'বা'-এর তাশদীদকে বাদ দিয়ে পড়ে, তাহলে পসন্দমত মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হবে না। অন্য সমস্ত স্থানেও অনুরূপ হুকুম। অবশ্য অধিকাংশ মাশাইখের মতে এরূপ পড়াতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। মদ বর্জন করাতে যদি অর্থের মাঝে কোন বিকৃতি না ঘটে যেমন কেউ اُولٰئِكَ শব্দটি মদ ছাড়া পড়ল অথবা اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ শব্দটি মদ ছাড়া পড়ল তাহলে এতে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে, যেমন কেউ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বা دُعَاءً এবং نِدَاءً শব্দ কটি মদ ছাড়া পড়ল, তাহলে পসন্দতম মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হবে না যেমন তাশদীদ বাদ দেয়ার কারণে সালাত ফাসিদ হয় না (খুলাসা)।

১৪. মাসআলা ঃ যেস্থানে ইদগাম নেই, সেখানে ইদগাম করা এবং যেখানে ইদগাম আছে, সেখানে ইদগাম না করা। কোন ব্যক্তি যদি এমন স্থানে ইদগাম করে, যেখানে কোন মানুষ ইদগাম করে না এবং যার দ্বারা আয়াতের মাধুর্য বিনষ্ট হয় এবং শব্দের অর্থ বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে, যেমন কেউ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ -এর গায়ন অক্ষরটিকে লামের মাঝে ইদগাম করে পড়ল, তাহলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি এমন জায়গায় ইদগাম করে, যেখানে কোন মানুষ ইদগাম করে না কিন্তু এ ইদগামের ফলে অর্থের পরিবর্তন হয় না বরং ইযহার করে পড়া অবস্থায় যে অর্থ বুঝা যায় ইদগামের অবস্থায়ও সে অর্থই বুঝা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি قُلْ سِيْرُوْا -এর লাম অক্ষরটিকে সীন-এর মধ্যে ইদগাম করে পড়ল, এতে সালাত ফাসিদ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি ইদগাম বর্জন করে اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ পড়ে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যদিও বাক্যের মাধুর্য বিনষ্ট হয়ে যায় (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ যে স্থানে ইমালা করার হুকুম নেই এরূপ স্থানে ইমালা করা। যদি কোন ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ বা مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অথবা অন্য কোন আয়াত ইমালা করে পড়ে, এতে সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ হযরত উছমান (রা)-এর লিপিবদ্ধকৃত কুরআন শরীফে যে আয়াত নেই

এরূপ আয়াত তিলাওয়াত করা। কোন কোন মাশাইখ বলেন, মাসহাফে উছমানীতে যে আয়াত লিপিবদ্ধ আছে এর বাইরে কেউ যদি অন্য কিরাআত পড়ে, যার দ্বারা কুরআনী আয়াতের অর্থ আদায় হয় না, এরূপ কিরাআত যদি দু'আ এবং প্রশংসাবাণী না হয়, তবে যদি কেউ মাসহাফে উছমানীর বাইরে এমন কিরাআত পড়ে, যার দ্বারা আসল কুরআনী আয়াতের অর্থ প্রকাশ পায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে সহীহ্ মতামত হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ইব্‌ন মাসউদ (রা) বা অন্য কারো মাসহাফ হতে পাঠ করে, তবে এর দ্বারা ফরয কিরাআত আদায় হবে না। তবে এতে সালাতও ফাসিদ হবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এর সাথে মাসহাফে 'উছমানী থেকে এ পরিমাণ পাঠ করে যতটুকু পাঠ করলে সালাত সহীহ্ হয়ে যায় তাহলে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন শব্দ পূর্ণ উচ্চারণ না করে কিছু উচ্চারণ করা। কেউ যদি পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ না করে কিছু অংশ উচ্চারণ করে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বা ভুলে যাওয়ার কারণে, অতঃপর বাকী অংশ স্মরণ হওয়ার পর বাকী অংশ উচ্চারণ করে, যেমন কোন ব্যক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করার ইচ্ছা করল। আল্ বলার পর তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল বা বাকী অংশ ভুলে গেল। অতঃপর স্মরণ হওয়ার পর সে পড়ল حَمْدُ لِلّٰهِ অথবা বাকী অংশ কারো আদৌ স্মরণ হল না, যেমন এক ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্য একটি সূরা পড়ার ইচ্ছা করল কিন্তু পড়তে পারল না বরং এর পাঠ ভুলে গেল অতঃপর পড়তে ইচ্ছা করে "আল্" বলার পর স্মরণ হল যে, সে তা পাঠ করেছে এ মনে করে এ কিরাআত ছেড়ে দিয়ে সে রুকূতে চলে গেল অথবা শব্দের কিয়দংশ পড়ার পর তা ছেড়ে অন্য শব্দ পড়তে আরম্ভ করল, উপরোক্ত এবং অনুরূপ অবস্থাসমূহে কোন কোন মাশাইখের মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) এরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। কোন কোন মাশাইখ বলেন, কেউ যদি কোন শব্দের কিছু অংশ পাঠ করে, তবে ঐ শব্দ যদি এমন হয় যে, তা পূরা পড়লে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, তাহলে কিয়দংশ পড়ার দ্বারাও সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। শব্দ যদি এমন হয় যে, তা পূর্ণ পড়লে সালাত ফাসিদ হয় না। তাহলে এর কিয়দংশ পড়লেও সালাত ফাসিদ হবে না (যখীরা ও মুহীত)। শব্দাংশের হুকুম পূর্ণ শব্দের ন্যায়। এটাই সহীহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, কেউ যদি শব্দাংশ পাঠ করে এবং আভিধানিক ভাবে তা সহীহ্ হয়, আর এতে যদি অর্থের বিকৃতি না ঘটে, তবে সালাত ফাসিদ না হওয়ারই কথা। যদি পঠিত শব্দাংশ অর্থবোধক না হয়, বরং অসার হয় বা অসার নয় কিন্তু এতে অর্থের বিকৃতি ঘটে, তবে এতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। অবশ্য অধিকাংশ মাশাইখের মতে সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, এ ধরনের পঠন থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভবপ্রায়। এতো সালাতে প্রতিহতকৃত গলা খাকারের ন্যায় (যখীরা ও মুহীত)। শব্দের কোন অংশ নীচু আওয়াযে পড়লে সহীহ্ মতে সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, ব্যাপকভাবে এরূপ হয়ে থাকে। এর থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভবপ্রায় (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ সালাতের মধ্যে কেউ যদি কুরআন শরীফ লাহান করে রাগিণীর স্বরে পড়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং এতে শব্দ বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি মদ ও লীনের অক্ষরের মধ্যে এরূপ করা হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি হলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। সালাতের বাইরে যদি কেউ এরূপ পড়ে, তবে এ সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশ মাশাইখ এভাবে পড়াকে অপসন্দ করেছেন (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (ওয়াজীয ঃ কুরদুরী (র))। এ ধরনের পড়া শ্রবণ করাও মাকরূহ্ (খুলাসা)। আবুল কাসিম সাফ্‌ফার আল-বুখারী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি সালাতের কিছু অংশ জাইয পদ্ধতিতে আদায় করা হয় এবং অপর কিছু অংশ না জাইয পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, তবে সতর্কতার লক্ষ্যে সালাত শুদ্ধ হয়নি বলেই হুকুম দেয়া হবে। তবে কিরাআতের বিষয়টি এর থেকে স্বতন্ত্র। কেননা, কিরাআত অশুদ্ধ পড়ার বিষয়টি ব্যাপক (যহীরিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ আল্লাহ্‌র নামসমূহের মাঝে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা। যদি কেউ সালাতে هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ আয়াতে يَاْتِيَهُمُ শব্দটিকে تَاْتِيَهُمْ পড়ে, তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ সাহিত্য বিশারদ বলেন, তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্‌র নামসমূহে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন সংযোগ জাইয নেই যেমনি ভাবে আল্লাহ্‌র বাণী اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ এবং لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ইত্যাদির মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন সংযোগ করা জাইয নেই। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র) বলেন, এরূপ পড়াতে সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, এতো গায়রুল্লাহ্‌র কাজ। কোন কোন ফকীহ্ ফযল (র)-এর মতকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন (মুহীত ও যখীরা)। "ফাওয়াইদ" এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি সালাতে প্রথমে ভুল পড়ে পরে সহীহ্ পড়ে, তবে আমার মতে তার সালাত দুরুস্ত হবে। 'ইরাবের বিষয়টিও অনুরূপ। কেউ যদি পেশের স্থানে যবর পড়ে, যবরের স্থানে পেশ পড়ে, পেশের স্থানে সাকিন পড়ে অথবা যবরের স্থানে সাকিন পড়ে, তবে তার সালাত ভঙ্গ হবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ইমামতের বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত সম্বন্ধে

১. মাসআলা ঃ জামাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা (মুতূন, খুলাসা, মুহীত ও মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। "গায়াত" কিতাবের মধ্যে আছে যে, আমাদের মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের মতে জামাআত ওয়াজিব। "মুফীদ" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, জামাআতকে সুন্নাত বলা হয়েছে এ কারণে যে, এর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সুন্নাত তথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। বাদাই' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জ্ঞানবান, বালিগ, আযাদ, জামাআতে সালাত আদায় করতে সক্ষম, ওযরহীন এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

২. মাসআলা ঃ কারো যদি জামাআত ছুটে যায়, তবে জামাআতের তালাশে অন্য মসজিদে যাওয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। এ নিয়ে আমাদের ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। তবে জামাআতের উদ্দেশ্যে অন্য মসজিদে যাওয়া উত্তম। অবশ্য এ অবস্থায় মহল্লার মসজিদে সালাত আদায় করাও ভাল। ইমাম কুদূরীর মতে এমতাবস্থায় নিজের ঘরের লোকদের একত্রিত করে তাদেরকে নিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে। শামসুল আইম্মা (র) বলেন, আমাদের যুগে উত্তম হল, মহল্লার মসজিদে প্রবেশ না করে থাকলে অন্যত্র জামাআত তালাশ করা। আর প্রবেশ করে ফেললে সেখানেই সালাত আদায় করবে। ওযরের কারণে জামাআতে হাযির হওয়ার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অসুস্থ, পঙ্গু, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত, ডান হাত, বাম পা বা বাম হাত, ডান পা কর্তিত ব্যক্তি, পা কাটা ব্যক্তি বা অর্ধাঙ্গ ব্যক্তি, যে চলাফেরা করতে অক্ষম, বয়স্ক মানুষ যে চলাফেরা করতে অক্ষম এবং অন্ধ ব্যক্তির জন্য জামাআতে হাযির হওয়া ওয়াজিব নয়।

৩. মাসআলা ঃ সহীহ্ মতে অতি বৃষ্টি, কাদা, প্রচণ্ড শীত এবং প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণেও জামাআতে হাযির হওয়ার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায় (তাবয়ীন)। অন্ধকার রজনীতে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণেও এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। অবশ্য দিনের বাতাস ওযর হিসাবে স্বীকৃত নয়। এমনিভাবে পেশাব-পায়খানা বা এর কোন একটির প্রবল চাপ থাকা অবস্থায়ও জামাআতে হাযির হওয়ার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ আশংকা থাকে যে, সে জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হলে পাওনাদার তাকে আটকিয়ে রাখবে। অথবা কেউ যদি সফরের ইচ্ছা করে এবং এদিকে জামাআত দাঁড়িয়ে যায় এ অবস্থায় তার যদি আশংকা হয় যে, সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামাআতে শরীক হলে কাফিলা তাকে ফেলে চলে যাবে,[১] অথবা কেউ যদি রোগীর খিদমতে থাকে অথবা মালের ক্ষতি হওয়ার যদি আশংকা থাকে, তবে এরূপ ব্যক্তিদের জন্য জামাআত ত্যাগ করা জাইয আছে। এমনিভাবে বিকালের খানা উপস্থিত হওয়া অবস্থায় যদি সালাত আরম্ভ হয় এবং খানার প্রতি মনের চাহিদাও প্রবল থাকে, তবে জামাআত ত্যাগ করা জাইয আছে। এমনিভাবে বিকালের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে খানা উপস্থিত হওয়া অবস্থায়ও যদি খানার প্রতি মনে প্রবল চাহিদা থাকে, তাহলেও জামাআত ত্যাগ করা জাইয আছে[২] (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ কোন মহল্লার মসজিদে যদি ইমাম ও জামাআত নির্দিষ্ট থাকে এবং মহল্লাবাসী যদি জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে নেয়, তবে দ্বিতীয়বার আযান দিয়ে এখানে পুনরায় জামাআত করা দুরুস্ত নেই। যদি মহল্লাবাসী আযান ব্যতীত সালাত আদায় করে থাকে, তাহলে সমস্ত ইমামের মতে এখানে দ্বিতীয় জামাআত করা জাইয আছে। এমনিভাবে রাস্তার মসজিদেও দ্বিতীয় জামাআত করা জাইয আছে (শরহুল মাজমা')। জুমুআ ব্যতীত অন্যান্য সালাতে যদি একের অধিক লোক হয়, তাহলেও জামাআত সহীহ্ হবে। যদি ইমামের সাথে একজন জ্ঞানবান বালক উপস্থিত থাকে (সিরাজিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ নফল সালাত ডাকাডাকি করে জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ্। সদ্‌রুশ শহীদ (র) কর্তৃক প্রণীত "আসল"-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, আযান-ইকামত ব্যতীত মসজিদের এক প্রান্তে জামাআতের সাথে নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ্ নয়। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, নফলের জামাআতে যদি ইমাম ব্যতীত তিন ব্যক্তি শরীক থাকে, তাহলে ইমামদের ঐকমত্যে মাকরূহ্ হবে না। মুসল্লী যদি চার জন হয়, তাহলে মাশাইখদের মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে এরূপ করা মাকরূহ্[৩] (খুলাসা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ইমামতের অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে?

১. মাসআলা ঃ ইমামতের সর্বাধিক উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে সালাতের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত (মুযমারাত)। এটাই সুস্পষ্ট মত (বাহ্‌রুর রাইক)। উক্ত ব্যক্তি এমনভাবে কিরাআত পড়তেও সক্ষম, যার দ্বারা সুন্নাত কিরাআত আদায় হয় (তাবয়ীন)। তার দীনী ব্যাপারেও কোন ত্রুটি নেই (কিফায়া ও নিহায়া)। সে প্রকাশ্য গুনাহের কাজসমূহ থেকেও বিরত থাকে। যদিও তার চেয়ে পরহিযগার অন্য কোন ব্যক্তি থাকে (মুহীত ও যাহিদী)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি সালাতের বিধান সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হয় এবং এছাড়া অন্যান্য ইল্‌মের ব্যাপারে কিছু না জানে, তবু সেই ইমামতের অধিক উপযুক্ত (খুলাসা)। যদি দুই ব্যক্তি সালাতের আহ্‌কাম জানার মধ্যে সমান সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে ভাল কারী অর্থাৎ

১. গাড়ী বা পশু ছুটে যবার আশংকা থাকলেও এই বিধান।

২. সাধারণত প্রবল ক্ষুধার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। যেমন রোযার পরে ইফতারী করবে। লোভের বশবর্তী হয়ে আগ্রহ বা চাহিদা ধর্তব্য নয়। ক্ষুধার কারণে সালাতে একাগ্রতা না আসার আশংকার ক্ষেত্রে এ ফত্‌ওয়া। এর অর্থ বিকৃতি বা অপব্যবহার করলে জামাআত পরিত্যাগের গুনাহ্ হবে।

৩. ডাকাডাকি ছাড়া ৫০ জন হলেও মাকরূহ্ হবে না, মাসআলাটা বিতর্কিত।

যে ইলমে কিরাআত সম্বন্ধে বেশী জানে তথা যে ওয়াক্‌ফের জায়গায় ওয়াক্‌ফ করে, মিলনের জায়গায় মিলিয়ে পড়ে এবং তাশদীদ ও সাকিন যথাযথভাবে উচ্চারণ করে, সে ইমামতের জন্য অধিক উপযুক্ত (কিফায়া)। যদি কিরআতেও সমান সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহিযগার ব্যক্তি ইমামতের জন্য অধিক উপযুক্ত। যদি পরহেযগারীতেও সমান সমান হয়, তাহলে যে বয়সে বেশী, সেই ইমামতের জন্য বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে (হিদায়া)। যদি বয়সেও সমান সমান হয়, তবে যার চরিত্র উত্তম, সে ইমামতের জন্য বেশী উপযুক্ত। যদি চরিত্রমাধুরীর মাঝেও সমান সমান হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে যার বংশ ভাল, সেই বেশী উপযুক্ত হবে। বংশগত দিক থেকেও যদি সমান সমান হয় তবে উভয়ের মধ্যে যে সুন্দর চেহারার অধিকারী, সেই ইমামতের জন্য অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে (ফাতহুল কাদীর)। উত্তম চেহারা মানে হল, যে রাত্রে বেশী বেশী সালাত আদায় করে (কাফী)। যদি সৌন্দর্যের মাঝে সমান সমান হয়, তবে তাদের মাঝে যার বংশীয় শরাফত আছে, সে ইমামতের বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, (ফাত্‌হুল কাদীর)। সর্বদিক থেকে যে পরিপূর্ণ সেই ইমামতের জন্য সর্বাধিক উত্তম। কেননা,, উদ্দেশ্য হল, জামাআতের মধ্যে অধিক পরিমাণ লোক উপস্থিত হওয়া। আর এ ধরনের লোক ইমাম হলেই জামাআতে হাযির হওয়ার ব্যাপারে লোকদের মাঝে বিপুল আগ্রহ থাকে (তাবয়ীন)।। দুই ব্যক্তির মাঝে যদি এ ধরনের গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে, তবে লটারী দিয়ে ইমাম নির্ধারণ করা হবে অথবা মুসল্লীদের ইখতিয়ারের উপর ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারাই তাদের ইমাম নির্ধারণ করে নিবে (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ এক বাড়ীতে বেশ কিছু মেহমান আছে। এ ধরনের বাড়ীতে যদি জামাআত হয়, তবে বাড়ীর মালিকই ইমামতের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত। তবে মেহমানদের মাঝে যদি বাদশাহ্ বা কাযী থাকেন, তবে তারাই ইমামত করবেন। যদি বাদশাহ্ উপস্থিত লোকদের কাউকে আগে বাড়িয়ে দেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে তা খুবই ভাল। আর যদি উপস্থিত মেহমানদের থেকে কেউ নিজেই আগে বেড়ে যায়, তবে তাও জাইয আছে। কোন ঘরে যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি, বাড়ীর মালিক এবং মেহমান থাকে, তাহলে ভাড়াটিয়া ব্যক্তির নিকট ইজাযত কামনা করবে এবং সেই অনুমতি দেয়ার হকদার (তাতারখানিয়্যা)। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি কারো নিকট হতে ঘর আরিয়াত (বিনা ভাড়ায় অনুমতি নিয়ে বসবাস করা) নিয়ে থাকে, তাহলে আরিয়াতদাতার থেকে আরিয়াত গ্রহীতাই অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। মহল্লার ইমাম থেকে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তিও যদি মসজিদে প্রবেশ করে, তবু মহল্লার ইমামই ইমামতের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে (কিনায়া)।

৪. মাসআলা ঃ মূক ব্যক্তি যদি একদল মূক মানুষের ইমাম হয়, তবে সকলের সালাত দুরুস্ত হবে। মূক ব্যক্তি যদি উম্মী ব্যক্তির ইমামত করে, তবে বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে আমাদের ইমামদের মতে তাদের সালাত দুরুস্ত হবে না। কিতাবুস সালাতের ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম (র) বলেছেন যে, মূক ও উম্মী এ দুই ব্যক্তি যদি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে, তবে উম্মী ব্যক্তি ইমাম হওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। উম্মী যদি মূক ব্যক্তির ইমামত করে, তবে উভয়ের সালাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাইয হবে। এতে কারো মতভেদ নেই (তাতারখানিয়্যা)। "মুনিয়্যাতুল মুসল্লী" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির চেয়ে জানাবাতের তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি ইমামতের জন্য অধিক হকদার (আন্নাহরুল ফাইক)।

৫. মাসআলা ঃ একদল লোক মসজিদের ভেতর বসা আছে এবং আরেক দল লোক মসজিদের বাইরে বসা আছে। এমতাবস্থায় মুআয্যিন ইকামত বলার পর বাইরের লোকদের থেকে একজন দাঁড়িয়ে ইমাম হয়ে বাইরের লোকদের ইমামত করল এবং ভেতরের লোকদের থেকে একজন ইমাম হয়ে ভেতরের লোকদের ইমামত করল। এতদুভয় ইমামের মধ্যে যে প্রথমে সালাত আরম্ভ করল, তার এবং তার মুক্তাদীদের সালাত মাকরূহ্ হবে না (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি ফিকাহ্ ও পুণ্যতার মধ্যে সমান সমান হয় কিন্তু তাদের একজন কিরাআতে বেশী জ্ঞান রাখে এ অবস্থায় মসজিদের মুসল্লীগণ যদি অপর ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে দেয়, তাহলে এটা ভাল নয়। কিছু মুসল্লী যদি কারীকে পসন্দ করে আর কিছু লোক যদি অপর ব্যক্তিকে পসন্দ করে, তবে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হবে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি মহল্লার মধ্যে ইমামতের যোগ্য কেবল একজন মানুষ থাকে, তবে তার জন্য ইমাম হওয়া জরুরী নয় এবং ইমামত ছেড়ে দেয়ার কারণে সে গুনাহ্গারও হবে না (কিনয়া)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ব্যক্তি ইমামতের যোগ্য এবং কোন্ ব্যক্তি ইমামতের অযোগ্য।

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুরগিনানী (র) বলেন, বিদআতী ও[1] প্রবৃত্তির গোলামীকারী ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করা জাইয আছে। রাফিযী, জাহমী, কদ্‌রী, আল্লাহ্‌কে মাখলুকের সাথে তুলনাকারী সম্প্রদায় এবং কুরআন সৃষ্টি একথার প্রবক্তা লোকদের পেছনে সালাত জাইয নেই। সার কথা হল, কেউ যদি প্রবৃত্তির এমন অনুসারী হয়, যার আমিলকে কাফির বলা যায় না এ ধরনের লোকদের পেছনে সালাত জাইয। তবে মাকরূহ্। কেউ যদি এমন না হয়, তবে তাঁর পেছনে সালাত জাইয নয় (তাবয়ীন ও খুলাসা)। এটাই সহীহ্ (বাদাই')।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মি'রাজের সত্যতাকে অস্বীকার করে, তবে দেখতে হবে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পরিভ্রমণকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির। যদি বায়তুল মুকাদ্দাস হতে সম্মুখের মি'রাজের ঘটনাকে অস্বীকার করে, তবে কাফির বলা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি ফাসিক বা বিতআতীর পেছনে সালাত আদায় করে, তবে সে জামাআতের ছওয়াব পাবে। অবশ্য পরহিযগারের পেছনে সালাত আদায় করলে যে পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায় ঐ পরিমাণ পাবে না (খুলাসা)। শাফিঈ মায্হাবের কোন ইমাম যদি মতভেদের স্থানসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখে যেমন পায়খানা–পেশাবের রাস্তা ছাড়া অন্য কোন স্থান হতে নির্গত নাপাকী, যেমন শিঙ্গা লাগানোর পর নির্গত রক্তের কারণে উযূ করে এবং সে কিবলার দিক হতে

১. আকীদাগত বিদআতীর পিছনে সালাত জাইয নয়, আমলী বিদআতীর পিছনে জাইয। প্রবৃত্তির গোলামী অর্থ প্রকাশ্যে অবাধে হারামে লিপ্ত ব্যক্তি নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কখনো বক্ষ ফিরায় না, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে হানাফী মাযহাবের লোকদের সালাত জাইয হবে (নিহায়া ও কিফায়া ঃ বিতরের সালাত অনুচ্ছেদ)

৩. মাসআলা ঃ ইমাম যদি পুরা পশ্চিম দিক হতে ফিরে যায়, তাহলে এটাকে পূর্ণাঙ্গ ফিরে যাওয়া বলে গণ্য করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম সাম্প্রদায়িক হবে না, স্বীয় ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান থাকবে না এবং স্থির অল্প পানির মাঝে উযূ করবে না। কাপড়ে বীর্য লাগলে তা ধৌত করে নিবে এবং শুষ্ক বীর্য কাপড়ে লাগা থাকলে তা খুঁটে পরিষ্কার করে নিবে। বিতর ত্যাগ করবে না। কাযা সালাতের মাঝে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করবে (নিহায়া ও কিফায়া ঃ বিতর অনুচ্ছেদ)। অল্প পানি যাতে নাপাকী পতিত হয়েছে এর দ্বারা উযূ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ব্যবহৃত পানি দ্বারা উযূ করবে না[1] (সিরাজিয়্যা)। ইমাম তামারতাশী (র) শায়খুল ইসলাম খাহরযাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উপরোল্লিখিত ব্যাপারে মুক্তাদী যদি ইমাম সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে না জানে, তবে এ ধরনের ব্যক্তির উপরও মুসল্লীদের ইকতেদা সহীহ্ হবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে (কিফায়া ও নিহায়া)।

৫. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি ইমাম সম্বন্ধে এমন কোন কথা জানে, যার দ্বারা ইমামের মাযহাবে সালাত নষ্ট হয়ে যায়, যেমন কোন মহিলা বা লিঙ্গ স্পর্শ করা অথবা এ জাতীয় কোন কিছু করা। অথচ এ বিষয়টি ইমাম জানে না, তবে অধিকাংশ ফকীহ্র মতে তার সালাত জাইয হয়ে যাবে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বলেন, জাইয হবে না। কেননা,, মুক্তাদী তো ইমামের সালাতকে জাইয মনে করছে। আর তার ক্ষেত্রে তার নিজের রায়ই গ্রহণযোগ্য। তাই ইমামের সালাত জাইয ও দুরুস্ত হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ আল্লামা ফযলী (র) বলেন, বিতরের সালাতে হানাফী ব্যক্তির ইকতেদা ঐ ব্যক্তির পেছনেও সহীহ্ হবে যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মাযহাবকে সহীহ্ মনে করে (খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে তায়াম্মুমকারী উযূকারী লোকদের ইমামত করতে পারবে (হিদায়া)। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, এ মতভেদ ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যদি উযূকারীদের নিকট পানি না থাকে। যদি উযূকারীদের নিকট পানি থাকে, তাহলে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি উযূকারী লোকদের ইমামত করতে পারবে না (নিহায়া)। সালাতে জানাযায় উযূকারী তায়াম্মুমকারীর পেছনে ইকতেদা করতে পারবে। এতে কারো দ্বিমত নেই (খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ মাযূর ব্যক্তি মাযূর ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করতে পারবে। যদি উভয়ের ওযর একই ধরনের হয়। যদি ওযর ভিন্ন ধরনের হয়, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে না (তাবয়ীন)।

১. এসব ব্যাপারে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের পার্থক্য থাকার কারণে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় এক মাযহাবের অনুসারী অন্য মাযহাবের অনুসারীর পিছনে সর্বসম্মতিক্রমে সালাত আদায় করতে পারবে। সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামদের যুগ হতে এইভাবে একে অপরের পিছনে সালাত আদায় করে আসছেন।

সুতরাং যদি কারো বায়ু নির্গত হওয়ার ওযর থাকে, তবে সে ঐ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করতে পারবে না যার প্রস্রাব ঝরে পড়ার রোগ আছে (বাহ্রুর রাইক)। এমনিভাবে যার পেশাব ঝরে পড়ার রোগ সে ঐ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করতে পারবে না যার বায়ু নির্গত হওয়ার বা ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার রোগ আছে। কেননা,, ইমামের ওযর দুইটি এবং মুক্তাদীর ওযর একটি (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৯. মাসআলা ঃ পাক ব্যক্তি পেশাব ঝরে পড়া ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে পাক মহিলা ইসতিহাযা রোগে আক্রান্ত মহিলার পেছনে সালাত আদায় করতে পারবে না। এটা ঐ সময় যদি উযূর পরপরই হাদাছ হয় অথবা যদি উযূর অবস্থায়ই হাদাছ হয় (যাহিদী)। মোযা এবং পট্টির উপর মাসেহ্কারীর ইকতেদা পা ধৌতকারী ব্যক্তির পেছনে সহীহ্ আছে। অনুরূপভাবে শিংগা লাগানো ব্যক্তির যদি রক্ত বের হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে সে সুস্থ লোকদের ইমামত করতে পারবে।

১০. মাসআলা ঃ সওয়ারীর উপর আরোহণকারী ব্যক্তি তার সাথে সওয়ারীতে আরোহণকারী[১] অন্য লোকদের ইমামত করতে পারবে। ইশারা করে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি ইশারাকারী অন্য ব্যক্তিদের ইমামত করতে পারবে। উলঙ্গ উলঙ্গের ইমামত করতে পারবে (খুলাসা)। উত্তম হল, উলঙ্গ ব্যক্তি একাকী বসে ইশারা করে সালাত আদায় করবে এবং পরস্পর একে অন্যের থেকে দূরে গিয়ে সালাত আদায় করবে। তারা যদি জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, তবে মহিলাদের জামাআতের মত ইমাম লোকদের মধ্যখানে দাঁড়াবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। ইমাম যদি অগ্রসর হয়ে সামনে দাঁড়ায়, তাহলেও জাইয আছে (নিহায়া)। উলঙ্গ লোকদের জামাআত করা মাকরূহ্ (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা ও আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ বসে রুকূ-সিজদা করে সালাত আদায়কারীর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর ইকতেদা সহীহ্ আছে। তবে রুকূ-সিজদা করে সালাত আদায়কারীর ইকতেদা ইশারাকারীর পেছনে সহীহ্ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কুঁজো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির ইমামত করতে পারবে, যেমন বসে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির ইমামত করতে পারে (যখীরা ও খানিয়্যা)। "নযম" কিতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কুঁজোর দণ্ডায়মান অবস্থা এবং রুকূর অবস্থার মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তবে ফকীহ্দের ঐকমত্যে তার ইমামত সহীহ্ হবে। যদি পার্থক্য প্রকাশ না পায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও তার ইমামত সহীহ্ হবে। অধিকাংশ আলিমগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন (কিফায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি ইমামের পা বাঁকা হয় এবং সে এর কিছু অংশের উপর ভর করে দাঁড়ায়, তবে তার ইমামত জাইয আছে। কিন্তু অন্য কারো ইমাম হওয়া উত্তম (তাবয়ীন)। নফল সালাত আদায়কারী ফরয আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করতে পারবে (হিদায়া)। যদিও ফরয আদায়কারী শেষ দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে না (তাতারখানিয়্যা ঃ জামিউল জাওয়ামি'-এর

১. এমন সওয়ারী যাতে রুকূ-সিজদা করা যায় যেমন ট্রেন, লঞ্চ, স্টীমার, উট বা ঘোড়া ইত্যাদি নয়।

সূত্রে)। কোন নফল আদায়কারী ব্যক্তি যদি ফরয আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করার পর স্বীয় সালাত নষ্ট করে দেয়, অতঃপর উক্ত নফলের কাযা করার লক্ষ্যে সে যদি এ ফরযের মধ্যেই পূর্ব ইমামের পেছনে ইকতেদা করে, তবে আমাদের মাযহাবে এ কাযা সহীহ্ হবে (কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ সব সময় পাগল এরূপ ব্যক্তি এবং উন্মাদ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা সহীহ্ নয়। কেউ যদি ক্ষণিকের জন্য পাগল হয় আবার ভাল হয়ে যায়, তবে তার সুস্থ অবস্থায় তার পেছনে ইকতেদা সহীহ্ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ্ (র) বলেন, যাহিরী রিওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, এরূপ পাগল ব্যক্তির সুস্থ থাকার সময় নির্ধারিত থাকা এবং না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুস্থ অবস্থায় সে পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির মতই। আমরা এ মতকেই গ্রহণ করি (তাতারখানিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ ওয়াক্তের ভেতর এবং বাইরে উভয় অবস্থাতেই মুসাফিরের পেছনে মুকীমের ইকতেদা দুরস্ত আছে। অনুরূপভাবে ওয়াক্তের ভেতরে মুকীমের পেছনে মুসাফিরের ইকতেদা সহীহ্ আছে। কিন্তু ওয়াক্তের বাইরে জাইয নেই। মুকীম ব্যক্তি আসরের দুই রাকআত আদায় করার পর যদি সূর্য ডুবে যায়, অতঃপর কোন মুসাফির যদি এ সালাতে তার পেছনে ইকতেদা করে, তবে তার এ ইকতেদা দুরুস্ত হবে না। দুই রাকআত যুহর আদায়কারী ব্যক্তি যদি চার রাকআত আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করে, তবে এ ইকতেদা দুরুস্ত হবে (খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ বেদুঈন, অন্ধ, ক্রীতদাস, জারজ সন্তান এবং ফাসিক ব্যক্তির ইমামত জাইয আছে (খুলাসা)। তবে মাকরূহ্ (মুতূন)। পুরুষ স্ত্রীলোকের ইমামত করতে পারবে। যদি পুরুষ ইমাম মহিলা মুক্তাদীর ইমামতির নিয়্যাত করে এবং নির্জন স্থানে না হয়। ইমাম যদি নির্জন স্থানে থাকে এবং সে সমস্ত মহিলার বা কতেক মহিলার মাহরাম হয়, তবে এ ইমামত দুরুস্ত হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে (নিহায়া ঃ শরহে তাহাবী সূত্রে)। সালাতুল জুমুআয় পুরুষের পেছনে মহিলার ইকতেদা জাইয আছে। যদিও ইমাম মহিলাদের ইমামতির নিয়্যাত না করে। অনুরূপভাবে ঈদের সালাতেও পুরুষের পেছনে মহিলাদের ইকতেদা জাইয আছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খুলাসা)। মহিলার পেছনে পুরুষ লোকের ইকতেদা জাইয নেই (হিদায়া)। ফরয, নফল তথা সমস্ত সালাতে কোন মহিলা ইমাম হয়ে মহিলাদের জামাআত করা মাকরূহ্। কিন্তু সালাতে জানাযায় মাকরূহ্ নয় (নিহায়া)। অগত্যা যদি মহিলাগণ জামাআত করে, তবে ইমাম কাতারের মধ্যস্থলে দাঁড়াবে। মধ্যস্থলে দাঁড়ানোর কারণে কারাহাত শেষ হবে না। মাকরূহ হবেই। মহিলা ইমাম যদি মহিলাদের কাতারের মধ্যস্থলে না দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে দাঁড়ায়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। মহিলাদের একাকী সালাত আদায় করাই উত্তম (খুলাসা)।

১৭. মাসআলা ঃ নপুংসক ব্যক্তি মহিলাদের ইমামত করতে পারবে, যদি সে তাদের অগ্রে দাঁড়ায়। হিজড়া যদি মহিলাদের কাতারের মাঝে দাঁড়ায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। মহিলাদের সমান- সমান হয়ে দাঁড়ানোর কারণে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। নপুংসক ব্যক্তি পুরুষ লোকদের ইমামতও করতে পারবে না।

১৮. মাসআলা ঃ যে বালক বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পদার্পণ করেছে, তার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ বালকদের ইমামত করা দুরস্ত আছে (খুলাসা)। বলখী ইমামদের মতানুসারে তারাবীহ্ ও সুন্নাত সালাতে বালকদের ইমামত জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উত্তম কথা হল, কোন সালাতেই বালকের ইমামত জাইয নেই (হিদায়া)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত)। অধিকাংশ আলিমের অভিমত এই এবং এটাই যাহিরী রিওয়ায়েত (বাহ্রুর রাইক)। মূক ব্যক্তির কারীর পেছনে ইকতেদা করা সত্ত্বেও একা সালাত আদায় করা জাইয (তাতারখানিয়্যা)।

১৯. মাসআলা ঃ উম্মী ব্যক্তির জন্য উম্মী কওমের ইমামত করা জাইয (আস্‌সিরাজিয়্যা)। কোন উম্মী ব্যক্তি যদি এক উম্মী এবং এক কারী ব্যক্তির ইমামত করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে শুধু কারীর সালাত ফাসিদ হবে। যদি তারা পৃথক পৃথকভাবে সালাত আদায় করে, তবে কেউ কেউ বলেন যে, এতে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে তাদের সালাত শুদ্ধ হবে। এটাই সহীহ্ মত। (শরহে মাজমাউল বাহ্‌রায়ন ঃ লিখক কর্তৃক প্রণীত)। উম্মী ব্যক্তি নামায আরম্ভ করার পর যদি কারী ব্যক্তি এসে তার সাথে নামাযে শরীক হয়, তবে কোন কোন ফকীহ্-এর মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম কারখী (র) বলেন, সালাত ফাসিদ হবে না। কারী ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল, এমতাবস্থায় একজন উম্মী লোক আসল এবং সে তার পেছনে ইকতেদা করল না বরং একা সালাত আদায় করল। এ বিষয় নিয়ে ফকীহ্‌দের মাঝে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কারী যদি মসজিদের দরজায় থাকে অথবা মসজিদের পার্শ্বে থাকে এবং উম্মী মসজিদের ভেতর একা সালাত আদায় করে, তবে মতভেদ ব্যতীত এ অবস্থায় উম্মীর সালাত জাইয হবে।

২০. মাসআলা ঃ কারী এক সালাতে এবং উম্মী ব্যক্তি অন্য সালাতে থাকলে উম্মীর জন্য একাকী সালাত আদায় করা জাইয আছে। এ অবস্থায় উম্মীর জন্য কারী ব্যক্তির সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে সমস্ত ইমাম একমত। ইমাম তামারতাশী (র) বলেন, উম্মীদের উপর ওয়াজিব হল, রাত্র-দিন চেষ্টা করে এ পরিমাণ কুরআন শরীফ শিক্ষা করা, যার দ্বারা সালাত আদায় করা সহীহ্ হয়ে যায়। যদি চেষ্টায় ত্রুটি করে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট কোন উযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না (নিহায়া)।

২১. মাসআলা ঃ কারীর জন্য উম্মী ও বোবা ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা সহীহ্ নয়। অনুরূপভাবে উম্মীর ইকতেদা বোবার পেছনে সহীহ্ নয়। কাপড় পরিহিত ব্যক্তির ইকতেদা উলঙ্গ ব্যক্তির পেছনে সহীহ্ নয়। মাসবূকের ইকতেদা বাকী সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে অন্য মাসবূকের পেছনে সহীহ্ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ লাহিকের ইকতেদা লাহিকের পেছনে সহীহ্ নয় এবং মাটিতে অবস্থানকারী ব্যক্তির ইকতেদা সওয়ারীতে আরোহণকারী ব্যক্তির পেছনে সহীহ নয় (খুলাসা)। যুহর আদায়কারীর ইকতেদা আসর আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ নয়। এমনিভাবে অদ্যকার যুহর আদায়কারীর ইকতেদা গতকালের যুহর আদায়কারীর পেছনে সহীহ নয়। অনুরূপভাবে যুহর আদায়কারীর ইকতেদা জুমুআ আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ নয়। জুমআ আদায়কারীর ইকতেদাও যুহর আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ নয়।

২৩. মাসআলা ঃ ফরয আদায়কারীর ইকতেদা নফল আদায়কারীর পেছনে এবং মান্নতের সালাত আদায়কারীর ইকতেদা মান্নতের সালাত আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ নয়। কিন্তু দুইজনের কোন একজন যদি অপরজনের অনুরূপ সালাত আদায় করার মান্নত করে এবং একজন অন্যজনের পেছনে এ সালাত আদায় করার জন্য ইকতেদা করে, তবে তার ইকতেদা সহীহ্ হবে। দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই যদি নফল সালাত আরম্ভ করে তা ভঙ্গ করে দেয়, অতঃপর এর কাযা করতে গিয়ে একে অন্যের ইকতেদা করে, তবে এ ইকতেদাও সহীহ্ হবে না। কিন্তু উভয় ব্যক্তি যদি একই নফল আরম্ভ করে পরে তা ফাসিদ করে দেয়, অতঃপর এর কাযা পড়তে ইচ্ছা করে একে অন্যের পেছনে ইকতেদা করে, তবে এ ইকতেদা সহীহ্ হবে।

২৪. মাসআলা ঃ কসমের সালাত আদায়কারী ব্যক্তির ইকতেদা কসমের সালাত আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ আছে। কিন্তু মান্নতের সালাত আদায়কারীর ইকতেদা কসমের সালাত আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ নেই। তবে কসমের সালাত আদায়কারীর ইকতেদা মান্নতের সালাত আদায়কারীর পেছনে সহীহ্ আছে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। উলঙ্গ ব্যক্তি যদি কতিপয় উলঙ্গ এবং পোশাক পরিহিত কতিপয় লোকের ইমামত করে, তবে ইমাম ও উলঙ্গ মুসল্লীদের সালাত সহীহ্ হবে। কিন্তু পোশাক পরিহিত লোকদের সালাত সহীহ্ হবে না। এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ্ একমত (খুলাসা)।

২৫. মাসআলা ঃ সুস্থ ব্যক্তি, যার কাপড় নাপাক হওয়ায় সে ধৌত করতে পারে না, তার ইকতেদা ঐ ব্যক্তির পেছনে সহীহ্ নয়, যার সর্বদা হাদাছ হয় (তাতারখানিয়্যা)। তোতলা, যে কোন কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে সক্ষম নয়, সে তার অনুরূপ তোতলাদের ইমামত করতে পারবে। এ ঐ সময় পারবে যদি কওমের মধ্যে এমন লোক না থাকে, যে ঐ অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে সক্ষম। কওমের মধ্যে এ ধরনের লোক থাকলে তোতলা ইমাম এবং মুক্তাদী সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

২৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি যথাস্থানে ওয়াক্‌ফ না করে ইচ্ছামত স্থানে ওয়াক্‌ফ করে, তার জন্য ইমামত করা উচিত নয়। এমনিভাবে যে বেশী কাশে তার জন্যও ইমামত করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তা তা করে অর্থাৎ কয়েকবার না বলে "তা" শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে না এবং যে ফা-ফা করে অর্থাৎ কয়েকবার না বলে 'ফা' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে না, তার জন্যও ইমামত করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি খুব কষ্টের সাথে শব্দ উচ্চারণ করে কিন্তু তা-তা এবং ফা-ফা করতে হয় না, তার অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, অক্ষর যা বলে তা সহীহ্ বলে, তবে তার ইমামত মাকরূহ্ নয় (মুহীত ঃ কারীর ত্রুটি অনুচ্ছেদ)।

২৭. মাসআলা ঃ কারী যদি উম্মীর পেছনে ইকতেদা করে, তবে তার সালাত শুরু করা সহীহ্ হবে না। এ সালাত যদি নফল হয়, তবে শুদ্ধ মতে এর কাযাও ওয়াজিব নয়। কারী উম্মীর পেছনে ইকতেদা করে ভেঙ্গে ফেললে যে বিধান অনুরূপ বিধানই প্রযোজ্য হবে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে মহিলার পেছনে অথবা বালকের পেছনে অথবা উযূহীনের পেছনে অথবা জুনুবী ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করে, অতঃপর তার সালাতকে ভঙ্গ করে দেয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে মূল বিধান হল এই যে, ইমামের অবস্থা যদি মুক্তাদীর অবস্থার সমমানের হয় বা আরো একটু উপরের হয়, তাহলে সকলের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালাত সহীহ্ হবে। আর ইমামের অবস্থা যদি মুক্তাদীর অবস্থার চেয়ে নিম্নমানের হয়, তবে ইমামের সালাত সহীহ্ হবে, মুক্তাদীর সালাত সহীহ্ হবে না (মুহীত)। কিন্তু ইমাম যদি উম্মী হয় এবং মুক্তাদী কারী হয় অথবা ইমাম যদি বোবা হয়, এবং মুক্তাদী উম্মী হয় তবে ইমামের সালাতও সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ্ আবূ আবদুল্লাহ্ জুরজানী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উম্মী এবং বোবা ইমামের সালাত তখনই ফাসিদ হবে যদি সে জানে যে, তার পেছনে কারী লোক আছে। কিন্তু যদি এ কথা না জানে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যাহিরী রিওয়ায়েতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, পেছনে কারী আছে এ কথা জানা থাকা এবং না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (নিহায়া)।

২৮. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি একত্রে সালাত আরম্ভ করে এবং প্রত্যেকেই অপরের ইমামতের নিয়্যাত করে, তবে উভয়ের সালাতই পুরা হয়ে যাবে। কিন্তু দু'জনের প্রত্যেকেই যদি অন্যের পেছনে ইকতেদা করার নিয়্যাত করে, তবে উভয়ের সালাতই ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তির শরীরে যদি ছবি থাকে এবং সে অন্য মানুষের ইমাম হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, ছবি তো কাপড় দ্বারাই আবৃত আছে। অনুরূপভাবে কেউ যদি এমন আংটি পরে সালাত আদায় করে, যার মধ্যে ছোট ছবি আছে অথবা কেউ যদি এমন দিরহাম সাথে নিয়ে সালাত আদায় করে, যার মধ্যে ছোট ছবি আছে, তবে এ অবস্থায়ও সালাত দুরুস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা ঃ ইমামের উপযুক্ত এক ব্যক্তি যে নিজ মহল্লায় ইমামত করে না বরং রমযান মাসে অন্য মহল্লায় ইমামত করে, তবে ঈশার ওয়াক্ত আসার পূর্বেই তার জন্য সে মহল্লায় চলে যাওয়া উচিত। ঈশার ওয়াক্ত হওয়ার পর যদি যায়, তাহলে মাকরূহ্ হবে (খুলাসা)। জুমুআর দিন কোন ফাসিক লোক ইমামত করে এবং লোকেরা তাকে বাধা দিতে অক্ষম হয়, তবে কোন কোন ফকীহ্ বলেন, জুমুআয় তার পেছনে ইকতেদা করবে। তার ইমামতির কারণে জুমুআ ত্যাগ করবে না। অবশ্য জুমুআ ছাড়া অন্য সালাতে তার পেছনে ইকতেদা না করে অন্য মসজিদে চলে যাওয়া জাইয আছে (যহীরিয়্যা)।

৩০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি এক কওমের ইমামত করে কিন্তু কওমের লোকেরা তাকে অপসন্দ করে, তবে দেখতে হবে যে, এ অপসন্দের হেতু কি? যদি তার ত্রুটির কারণে হয় অথবা যদি অন্য ব্যক্তি তার তুলনায় ইমামতের জন্য অধিক উপযুক্ত এ কারণে হয়, তবে এ অবস্থায় তার ইমামত করা মাকরূহ্। আর যদি ইমামতের সেই উপযুক্ত হয়, তাহলে মাকরূহ্ হবে না (মুহীত)। সালাত অনেক দীর্ঘ করা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। মাসনূন কিরাআতের পর জামাআতের সালাতে ইমামের জন্য দীর্ঘ কিরাআত না পড়া উচিত। তার জন্য উচিত জামাআতের লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৩১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একমাস ইমামত করার পর যদি বলে যে, আমি অগ্নিপূজক। তবে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে এবং তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

লোকদের আদায়কৃত সালাত দুরুস্ত বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হবে। এমনিভাবে কেউ যদি বলে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিনা উযূতে আমি তোমাদের ইমামত করেছি এবং সে যদি নির্লজ্জ লোক হয়, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি এমন না হয় বরং পরহিযগারী এবং সন্দেহ দূর করার জন্য বলে থাকে, তাহলে তাদের সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। এমনিভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার কাপড়ে ময়লা ছিল, তবে তার হুকুমও এ-ই হবে (খুলাসা)। এমনিভাবে যদি এ কথা প্রকাশিত হয় যে, ইমাম কাফির অথবা পাগল অথবা মহিলা অথবা নপুংসক অথবা উম্মী ছিল অথবা সে উযূহীন বা জুনুবী বা ইহ্রাম ব্যতীত ইমামত করেছে, তবে উপরোক্ত হুকুমই প্রযোজ্য হবে (তাবয়ীন)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ স্থানে ইকতেদা করা শুদ্ধ এবং কোন্ স্থানে ইকতেদা করা অশুদ্ধ

১. মাসআলা ঃ তিন প্রকার বস্তু ইকতেদা শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে।

২. মাসআলা ঃ এক. এমন রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি চলাচল করে এ ধরনের রাস্তা ইকতেদা শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক (শরহুত তাহাবী)। ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে রাস্তা যদি এমন সংকীর্ণ হয় যে, এর মাঝে গাড়ী-ঘোড়া কিছু চলে না, তবে এ রাস্তা ইকতেদা শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। রাস্তা যদি এমন প্রশস্ত হয় যে, এর মাঝে গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি চলে, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যদি কাতারসমূহ রাস্তার উপর মিলিত না হয়। কাতারসমূহ যদি মিলিত হয়, তবে ইকতেদা নিষিদ্ধ হবে না। পথের উপর এক ব্যক্তি দাঁড়ালে কাতার মিলিত হবে না। তিনজন থাকলে কাতার মিলিত বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। রাস্তার উপর দুই ব্যক্তি দাঁড়ালে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে এ অবস্থায় কাতার মিলিত হয়েছে বলে ধরা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে কাতার মিলিত বলে গণ্য হবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম যদি রাস্তার উপর দাঁড়ায় এবং লোকজন তার পেছনে রাস্তায় লম্বা হয়ে দাঁড়ায় এ অবস্থায় ইমাম ও মুক্তাদীদের মাঝে রাস্তার উপর যদি এমন জায়গা না থাকে যার উপর দিয়ে গাড়ী, ঘোড়া চলতে পারে, তবে তাদের সালাত জাইয হবে। অনুরূপ হুকুম প্রথম কাতার এবং দ্বিতীয় কাতারের মধ্যে এবং এইভাবে শেষ কাতার পর্যন্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ ময়দানের মধ্যে যদি এ পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকে যে, এর মাঝে দুই কাতার হতে পারে, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে না। ঈদগাহের ময়দানে জায়গা ফাঁকা থাকার কারণে ইকতেদা নিষিদ্ধ হয় না। যদিও এর পরিমাণ দুই কাতার বা এর চেয়ে বেশী হয়। জানাযার ময়দান সম্পর্কে মাশাইখদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নাওয়াযিল কিতাবের মধ্যে তাকে মসজিদের হুকুম গণ্য করা হয়েছে (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ দুই. এমন নহর বা খাল যা কোন উপায় যেমন পুল ইত্যাদি অবলম্বন করা ব্যতিরেকে পার হওয়া যায় না (শরহুত তাহাবী)। ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে যদি এমন নহর থাকে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যার মধ্যে নৌকা এবং ডোঙ্গা চলাচল করে–এ অবস্থায় ইকতেদা সহীহ্ হবে না। যদি এমন ছোট নহর থাকে, যার মাঝে নৌকা ইত্যাদি চলাচল করতে পারে না, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (জাওয়াহিরুল আখ্লাতী)। যদি জামে মসজিদের ভেতর নহর থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ খালের উপর যদি পুল থাকে এবং এর উপর কাতার মিলিত থাকে, তবে যে ব্যক্তি খালের ওপারে থাকবে, তার ইকতেদাও সহীহ্ হবে। তিন ব্যক্তি হলেই সকলের মতে কাতার হয়ে যায়। এক ব্যক্তির দ্বারা কাতার হয় না। এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ্ একমত। দুই ব্যক্তির দ্বারা কাতার হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন রাস্তার আলোচনায় এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ইমাম ও মুসল্লীর মাঝে যদি হাউয বা কূপ থাকে, তবে দেখতে হবে যে, তা যদি এমন পরিমাণ হয় যে, এর এক প্রান্তে নাপাকী পড়লে অন্য প্রান্ত নাপাক হয়ে যায়, তবে ইকতেদা নিষিদ্ধ হবে না। আর যদি এক প্রান্তে নাপাকী পড়লে অন্য প্রান্ত নাপাক না হয়, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ তিন. ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ এক কাতার বিদ্যমান থাকা (শরহুত্ তাহাবী)। ইমামের পেছনে যদি মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ এক কাতার থাকে এবং এর পেছনে পুরুষের কাতার থাকে, তবে ইস্তিহ্সানের দাবী অনুসারে এ সমস্ত কাতারের লোকদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)। যদি কতিপয় লোক মসজিদের ছাপ্পরের ছাদের উপর সালাত আদায় করে এবং তাদের নীচে সামনের দিকে মহিলা বা রাস্তা থাকে, তবে তাদের সালাত দুরুস্ত হবে না। তিনজন মহিলা হলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে প্রত্যেক কাতারের তিন ব্যক্তির সালাত শেষ কাতার পর্যন্ত ফাসিদ হয়ে যাবে এবং বাকীদের সালাত জাইয হবে। পূর্ণ এক কাতার মহিলা হলে সকলের সালাতই ফাসিদ হয়ে যাবে। যারা ছাপ্পরের উপর সালাত আদায় করছে যদি তাদের বরাবর নীচে মহিলা থাকে, তবে ছাপ্পরের উপর সালাত আদায়কারী সকলের সালাত জাইয হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ সন্দেহের মাসাইল অনুচ্ছেদ)।

৮. মাসআলা ঃ শায়খ যাহিদ আবুল হাসান রাস্তাগ্ফানী (র)-এর "ফাওয়াইদ"-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মসজিদের মধ্যে যদি বালাখানা থাকে এবং বালাখানায় মহিলাদের কাতার থাকে, এখানে দাঁড়িয়ে যদি মহিলাগণ ইমামের পেছনে ইকতেদা করে এবং বালাখানার নীচে যদি পুরুষের কাতার থাকে, এমতাবস্থায় যারা মহিলাদের পেছনে দণ্ডায়মান, তাদের সালাত ফাসিদ হবে না।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ইমামত করে এবং মহিলাদের কাতার পুরুষের কাতারের বরাবর হয়, তবে শুধু একই ব্যক্তির সালাত ফাসিদ হবে, যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যখানে দণ্ডায়মান আছে। বস্তুত এ লোকটিকে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যখানের সুতরা বা প্রাচীর গণ্য করা হবে। যেমন পুরুষ ও মহিলার কাতারের মাঝে যদি উটের হাওদায় রক্ষিত কাষ্ঠের ন্যায় কোন কাঠখণ্ড দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তবে তা পুরুষের জন্য সুতরা হয়ে যাবে এবং কারো সালাত ফাসিদ হবে না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি তাদের মাঝে একহাত পরিমাণ উঁচু দেয়াল থাকে তবু। কিন্তু দেয়ালের উচ্চতা এক হাতের কম হলে তা সুতরাং হিসাবে গণ্য হবে না।

১০. মাসআলা ঃ এক হাত উঁচু দেয়ালের উপর যদি মহিলাগণ দাঁড়ায়, তবে তা সুতরা হিসাবে গণ্য হবে না। দেয়াল যদি মানুষের সমপরিমাণ উঁচু হয়, তবে যে সমস্ত পুরুষ মাটিতে দেয়ালের নীচে আছে তা তাদের জন্য সুতরা হবে। কিন্তু দেয়ালের উপরের লোকদের জন্য সুতরা হবে না (মুহীত)। ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে যদি এমন বড় প্রাচীর থাকে, যার ফলে মুক্তাদী ইচ্ছা করলেও ইমাম পর্যন্ত পৌছতে পারে না, তবে এ অবস্থায় ইকতেদা সহীহ্ হবে না। চাই ইমামের অবস্থা তার নিকট সন্দেহজনক[১] হোক বা না হোক (যখীরা)। কিন্তু প্রাচীর যদি ছোট হয় এবং মুক্তাদী ইমামের নিকট পৌছতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় অথবা বড় দেয়ালে যদি ছিদ্র থাকে, ইমাম পর্যন্ত পৌছতে যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে এ অবস্থায়ও ইকতেদা সহীহ্ হবে। এমনি হুকুম ঐ অবস্থায় যদি দেয়ালের ছিদ্র ছোট হয়, ইমাম পর্যন্ত না পৌছা যায়[১] কিন্তু শ্রবণ ও দেখার দিক থেকে ইমামের অবস্থা মুক্তাদীর নিকট সন্দেহজনক নয় এ অবস্থায় ও সহীহ্ মতে ইকতেদা দুরুস্ত হবে। যদি দেয়াল ছোট হয়, কিন্তু ইমাম পর্যন্ত পৌছা যায় অবশ্য ইমামের অবস্থা মুক্তাদীদের নিকট লুক্কায়িত নয়, এমতাবস্থায় কারো কারো মতে কতেদা সহীহ্ হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। (মুহীত) যদি দেয়ালের দরজা বন্ধ থাকে, তবে কারো কারো মতে ইকতেদা সহীহ্ হবে না। কেননা, ইমাম পর্যন্ত পৌছা মুক্তাদীর জন্য সম্ভব নয়। কারো কারো মতে ইকতেদা সহীহ্ হবে। কেননা, দরজা তো বানানো হয়েছে ইমাম পর্যন্ত পৌছার জন্যই। সুতরাং দরজা বন্ধ থাকলেও তা খুলা থাকার মতই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ মসজিদ বড় হলেও ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যকার দূরত্ব ইকতেদা সহীহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে না (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))। ইমাম মিহ্রাবের ভেতর এমতাবস্থায় কেউ যদি মসজিদের শেষ প্রান্ত থেকে উক্ত ইমামের পেছনে ইকতেদা করে, তবু জাইয আছে (শরহুত তাহাবী)। কেউ যদি মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘরের ছাদের উপর থেকে ইমামের পেছনে ইকতেদা করে, তবে তার ইকতেদা সহীহ্ হবে না। যদি ইমামের অবস্থা তার নিকট সন্দেহজনক হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই সহীহ্ মত। কিন্তু মসজিদের দেয়ালের মাথায় বসে ইকতেদা করা জাইয আছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি তার ঘর এবং মসজিদের মাঝে বিদ্যমান দেয়ালের উপর দাঁড়ায় এবং ইমামের অবস্থা তার নিকট যদি সন্দেহজনক না থাকে, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি মসজিদের বাইরে কিন্তু মসজিদের সাথে মিলিত কোন দোকানে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করে, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে। তবে শর্ত হল, কাতার মিলিত থাকতে হবে (খুলাসা)। মসজিদের পার্শ্ববর্তী মানুষের জন্য নিজ গৃহে থেকে মসজিদের ইমামের পেছনে ইকতেদা করা জাইয আছে যদি ঐ ঘর এবং মসজিদের মধ্যখানে লোক চলাচলের কোন রাস্তা না থাকে। যদি লোক চলাচলের রাস্তা থাকে এবং পুরো রাস্তা কাতার হয়, তবে গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য মসজিদের ইমামের পেছনে ইকতেদা করা দুরুস্ত আছে (তাতাখানিয়্যা ঃ হুজ্জত এর সূত্রে)।

---

১. সন্দেহজনক অর্থ ইমাম কী করছে? তা সঠিকভাবে জানতে পারছে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে মসজিদে অবস্থানকারী ইমামের পেছনে ইকতেদা করে, তবে ছাদে যদি মসজিদে ঢুকার কোন দরজা থাকে এবং ইমামের অবস্থা তার নিকট সন্দেহজনক না থাকে, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে। আর যদি ইমামের অবস্থা মুসল্লীর নিকট সন্দেহজনক থাকে, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ছাদে মসজিদে ঢুকার কোন দরজা নেই কিন্তু ইমামের অবস্থা মুক্তাদীর নিকট সন্দেহজনক নয়, এ অবস্থায়ও ইকতেদা সহীহ্ হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি কেউ মিনারে দাঁড়িয়ে মসজিদের ইমামের পেছনে ইকতেদা করে (খুলাসা)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর জায়গার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমামের সাথে যদি একজন পুরুষ থাকে অথবা সালাত বুঝে এমন কোন বালক থাকে, তবে সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। এটাই পসন্দনীয় মত। যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুযায়ী এ অবস্থায় ইমামের পেছনে খাড়া হবে না (মুহীত)। এক মুক্তাদী যদি ইমামের বা দিকে খাড়া হয়, তবে জাইয আছে কিন্তু সুন্নাতের খিলাফ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি পেছনে দাঁড়ায়, তবু জাইয আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এ অবস্থাতে পরিষ্কারভাবে মাকরূহ্ হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। এ সম্পর্কে মাশাইখদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ করা মাকরূহ্। এটাই সহীহ্ (বাদাই)। ইমামের সাথে মুক্তাদী যদি দু'জন হয়, তাহলে তারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে একজন পুরুষ এবং একজন বালক হলেও তারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। দু'জন মুসল্লীর একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হলে পুরুষ ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে এবং মহিলা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। যদি দুই পুরুষ এক মহিলা মুক্তাদী হয়, তবে পুরুষ দু'জন ইমামের পেছনে দাঁড়াবে এবং মহিলা তাদের পেছনে দাঁড়াবে। যদি ইমামের সাথে দু'জন মুক্তাদী থাকে এবং ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তবে জাইয আছে।

২. মাসআলা ঃ মাঠে দুই ব্যক্তির একজন অন্যজনের ডানে দাঁড়িয়ে একজন অন্যজনের পেছনে ইকতেদা করে সালাত আদায় করছে, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এসে যদি প্রথম তাকবীর বলার পূর্বে মুক্তাদীকে নিজের দিকে টেনে নেয়, তবে ইমাম আবূ বকর তারখাল (র)-এর মতে তৃতীয় ব্যক্তির এ টানার কারণে মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হবে না। তাকবীর বলার আগে টানুক বা পরে টানুক এতে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত)। ফাতাওয়ায়ে 'ইতাবিয়্যাতে উল্লেখ আছে যে, এটাই সহীহ্ মত (তাতারখানিয়্যা)। ময়দানের মধ্যে এক ইমাম এক মুক্তাদী নিয়ে সালাত আদায় করছে, এমতাবস্থায় তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে তাদের সাথে জামাআতে শরীক হল, অতঃপর ইমাম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে সিজদার স্থান অতিক্রম করে দাঁড়াল অর্থাৎ ইমাম ও প্রথম কাতারের মাঝে যে পরিমাণ ফাঁকা থাকে ঐ পরিমাণ জায়গা সামনের দিকে চলে গেল, এতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যদিও ইমাম সিজদার স্থান অতিক্রম করে চলে গেছে (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ পুরুষ, বালক, নপুংসক, মহিলা এবং বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী বয়সে পদার্পণকারী বালিকা একত্রে কোন জামাআতে শরীক হলে ইমামের পেছনে পুরুষ লোকেরা দাঁড়াবে, অতঃপর বালক অতঃপর নপুংসক অতঃপর মহিলা এবং সর্বশেষে বালিকারা দাঁড়াবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(শরহুত তাহ্‌বী)। মহিলাদের জন্য জামাআতে হাযির হওয়া মাকরূহ্। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাআতে হাযির হওয়া মাকরূহ নয়। অবশ্য বর্তমান যামানা[1] যেহেতু ফিতনা-ফাসাদের যমানা, তাই বর্তমানকালে ফাতওয়া হল, মহিলাদের সব জামাআতে হাযির হওয়াই মাকরূহ (কাফী)। এটাই উত্তম মত (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ জামাআতের সাথে সালাত আদায়কারী লোকদের জন্য উচিত হল, যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন কাতার সোজা করে নিবে যাতে মাঝে কোন ফাঁক না থাকে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করবে। কাতার সোজা করার ব্যাপারে যদি ইমাম আদেশ করে, তবে কোন ক্ষতি নেই (বাহ্‌রুর রাইক)। ইমামের জন্য উচিত কাতারের মাঝ বরাবর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। ইমাম যদি মধ্যভাগের ডান দিকে বা বাম দিকে দাঁড়ায়, তবে সুন্নাতের খিলাফ করল (তাবয়ীন)। ইমামের সোজা পেছনে ঐ সমস্ত লোক দাঁড়াবে, যারা জামাআতের লোকদের মাঝে উত্তম (শরহুত তাহ্‌বী)।

৫. মাসআলা ঃ প্রথম কাতারে দাঁড়ানো দ্বিতীয় কাতার থেকে উত্তম, দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো তৃতীয় কাতারে দাঁড়ানো থেকে উত্তম। যদি দ্বিতীয় কাতারে জায়গা না থাকে বরং প্রথম কাতারে কিছু জায়গা থাকে, তাহলে দ্বিতীয় কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে চলে যেতে হবে (কিনয়া)। ইমামের নিকটবর্তী স্থান মুক্তাদীর জন্য উত্তম জায়গা। ইমামের পেছনে কয়েকজনের জায়গা খালি আছে এবং সবগুলো ইমাম থেকে একই দূরত্বে অবস্থিত, তাহলে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানোই উত্তম (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের সমান সমান হয়ে দাঁড়ায়, তবে এতে পুরুষের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এর জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। (১) উক্ত মহিলা এমন কামোদ্দীপনাসম্পন্ন হওয়া যে, তার সাথে সহবাস করা যায়। এ ক্ষেত্রে বয়সের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন)। সুতরাং কোন বালিকা যদি কামোদ্দীপনাসম্পন্ন না হয় কিন্তু সালাত সম্পর্কীয় জ্ঞান আছে, এরূপ বালিকা কোন পুরুষের সমান সমান হয়ে দাঁড়ালে এতে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না (কাফী)। (২) সালাত রুকূ-সিজদাবিশিষ্ট হওয়া। যদি তারা ইশারা করে সালাত আদায় করে। (৩) তাহরীমা ও আদায়ের দিক থেকে উভয়ের একই সালাতের মাঝে শরীক থাকা। তাহরীমার মাঝে শরীক থাকার মানে হল, তাদের উভয়ের তাহরীমার ভিত্তি হল ইমামের তাহরীমা। আদায়ের মধ্যে শরীক থাকার মানে হল, তারা যে সালাত আদায় করছে এর মাঝে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে ইমাম একজনই। মুদরিক (যে মুসল্লী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শরীক)-এর তাহ্‌রীমার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে ইমামের তাহ্‌রীমার উপর এবং তার আদায়ের প্রকৃত ভিত্তিও ইমামের আদায়ের উপর। লাহিক (যে মধ্য সালাতে ইমামের সাথে শরীক নেই)-এর তাহরীমার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে ইমামের তাহরীমার উপর এবং তার ছুটে যাওয়া

---

১. বাদশাহ আলমগীর (র)-এর যুগ আজ হতে প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, চাল-চলন প্রায় সবই ছিল, পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শনের নগ্নতা-অশ্লীলতার বিষ-বাষ্প সমাজে প্রবেশ করেনি তবু বলছেন বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের যমানা। তাহলে আমাদের যে সব ধর্মপ্রাণ পুরুষেরা নারীদের জামাআত কায়েমে উদগ্রীব, তারা চিন্তা করুন।

সালাতের আদায়ের ভিত্তি অভ্যন্তরীণভাবে ইমামের আদায়ের উপর। মাসবূক (যে প্রথম হতে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হতে পারেনি) ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা করার সময় ইমামের তাহরীমা থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সময় কোন মহিলা যদি পুরুষের সমান সমান হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। (৪) উভয়ের একই স্থানে সালাত আদায় করা। সুতরাং পুরুষ যদি উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় এবং মহিলা দাঁড়ায় যমীনের উপর এবং ঐ জায়গা যমীন থেকে এক পুরুষ পরিমাণ উঁচা, তাহলে এভাবে দাঁড়ানোর কারণে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না। (৫) পর্দা ব্যতীত উভয়ের এক স্থানে দাঁড়ানো। সুতরাং উভয় যদি এক স্থানে তথা এক যমীনে বা একই উঁচু স্থানে থাকে এবং উভয়ের মাঝে কোন খুঁটি থাকে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না (কাফী)। পর্দা বা বেড়ার নিম্নতম পরিমাণ হল, হাওদার কাষ্ঠের সমপরিমাণ হওয়া এবং আঙ্গুলের মত মোটা হওয়া। মধ্যখানের ফাঁকাও বেড়ার মতই। ফাঁকার নিম্নতম পরিমাণ হল ঐ পরিমাণ জায়গা, যার মধ্যে একজন পুরুষ দাঁড়াতে পারে (তাবয়ীন)। (৬) মহিলা এমন হওয়া যার সালাত আদায় করা সহীহ্ আছে। সুতরাং পাগল মহিলা যদি কোন পুরুষের সমান সমান হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এতে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না (কাফী)। (৭) ইমামের উক্ত মহিলার ইমামতের নিয়্যাত করা। মহিলাদের ইমামতের নিয়্যাত প্রথম হতেই করতে হবে—সলাত আরম্ভ করার পর নয়। মহিলাদের ইমামতের নিয়্যাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য মহিলাদের হাযির থাকা শর্ত নয়। (৮) সালাতে উক্ত মহিলার কমপক্ষে পূর্ণ এক রুকন আদায় করার সময় পরিমাণ পুরুষের পাশাপাশি দণ্ডায়মান থাকা। সুতরাং কোন মহিলা যদি এক কাতারে তাকবীর বলে, দ্বিতীয় কাতারে গিয়ে রুকূ করে এবং তৃতীয় কাতারে সিজদা করে, তবে প্রত্যেক কাতারের যে ব্যক্তি তার ডানে-বামে এবং পেছনে থাকবে, তাদের প্রত্যেকের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (৯) উভয়ের দিক এক হতে হবে। পুরুষ ও মহিলা যদি ভিন্নমুখী হয়ে একত্রে দাঁড়ায়, তবে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না। দ্বিমুখী হয়ে দাঁড়ানোর এ অবস্থা কাবাগৃহে সালাত আদায় করাকালীন হতে পারে অথবা অন্ধকার রজনীতে চিন্তা-ভাবনা করে সালাত আদায় করার কালেও এ অবস্থা হতে পারে। পুরুষ ও মহিলার সমান সমান হয়ে সালাত আদায় করার উপরোক্ত মাসআলার মধ্যে সহীহ্ মতে পায়ের নালা ও টাখনু হল ধর্তব্য বিষয় (তাবয়ীন)। মহিলা বলতে সমস্ত মহিলাই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অপরিচিতা, মুহাররামা, স্বীয় স্ত্রী, কামোদ্দীপনাসম্পন্ন বালিকা এবং এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের ঘৃণা হয় সবই এর মধ্যে শামিল (কিফায়া)।

৭. মাসআলা ঃ একজন মহিলার কারণে তিনজন পুরুষ লোকের সালাত ফাসিদ হয়। অর্থাৎ ডান, বাম ও পশ্চাতের এই তিন জনের সালাত নষ্ট হয়। এর বেশী লোকের সালাত ফাসিদ হয় না (তাবয়ীন)। এর উপরই ফাতওয়া (তাতারখানিয়্যা)। দুই মহিলার কারণে চার পুরুষের অর্থাৎ ডান দিকের এক ব্যক্তি, বাম দিকের এক ব্যক্তি এবং উভয়ের সোজা পেছনের দুই ব্যক্তির সালাত ফাসিদ হয়। তিন জন মহিলা হলে তাদের কারণে ডানের এক ব্যক্তির, বামের এক ব্যক্তির এবং তাদের সোজা পেছনের প্রত্যেক কাতার হতে তিন ব্যক্তির সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এভাবে পেছনের কাতার পর্যন্ত চলতে থাকবে। এটা হল যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা (তাবয়ীন)।

৮. মাসআলা ঃ নপুংসক ব্যক্তি যদি কোন পুরুষের সমান সমান হয়ে দাঁড়ায়, তবে এতে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না (তাতারখানিয়্যা ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাসাইল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কাজে ইমামের অনুসরণ করা জরুরী এবং কোন্ কাজে ইমামের অনুসরণ করা জরুরী নয়

১. মাসআলা ঃ ইমামের তাশাহ্হুদ পড়া অবস্থায় কোন মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে শরীক হয় এবং তার তাশাহ্হুদ পুরা করার পূর্বে ইমাম যদি দাঁড়িয়ে যায় অথবা আখিরী বৈঠকে শেষ করে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে মুক্তাদীর জন্য উত্তম হল, তাশাহ্হুদ পুরা করা (গিয়াছিয়্যা)। যদি তাশাহ্হুদ পুরা না করে, তবে তাও জাইয আছে। ইমাম যদি মুক্তাদীর তাশাহ্হুদ শেষ করার পূর্বে কথা বলে, তবে মুক্তাদী তাশাহ্হুদ পূর্ণ করবে, যেভাবে ইমামের সালাম ফিরানো অবস্থায় করা হয়ে থাকে। ইমাম যদি মুক্তাদীর তাশাহ্হুদ শেষ করার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ ভঙ্গের কোন কারণ সৃষ্টি করে, তবে মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)।। ইমাম প্রথম বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষ করে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, এ অবস্থায় মুক্তাদীদের কোন এক ব্যক্তি তাশাহ্-হুদ পড়া ভুলে গেল এবং সকলের সাথে সেও দাঁড়িয়ে গেল, এরূপ অবস্থায় যে আশাহ্হুদ পড়েনি তার উপর ওয়াজিব হল পুনরায় বসে তাশাহ্হুদ পাঠ করে ইমামের ইকতেবা করা। যদিও তার রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে (কিফায়া)। ইমাম যদি মুক্তাদীর তাশাহ্হুদের পরবর্তী দু'আ বা দুরূদ শরীফ শেষ করার আগে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে মুক্তাদীও ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নিবে।

২. মাসআলা ঃ রুকূ-সিজদার অবস্থায় মুক্তাদীর তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করার পূর্বেই ইমাম যদি রুকূ-সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তবে সহীহ্ মতে এ অবস্থায় মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। রুকূ-সিজদার মধ্যে মুক্তাদী যদি ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করে ফেলে, তবে সে পুনরায় রুকূ-সিজদায় ফিরে যাবে। এতে দুই রুকূ বা দুই সিজদা হবে না (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ প্রথম সিজদায় ইমামের দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার কারণে মুক্তাদী মনে করল, ইমাম হয়তো দ্বিতীয় সিজদায় আছে, তাই মাথা উঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সিজদায় চলে গেল, এ অবস্থায় সে যদি প্রথম সিজদার নিয়্যাত করে থাকে বা কোন নিয়্যাতই তার ছিল না অথবা ইমামের অনুসরণের নিয়্যাতে সে যদি দ্বিতীয় সিজদার নিয়্যাত করে থাকে, তবে এ সিজদা প্রথম সিজদাই হবে। আর যদি শুধু দ্বিতীয় সিজদার নিয়্যাত করে থাকে, এর সাথে অন্য কোন নিয়্যাত না থাকে, তবে দ্বিতীয় সিজদা আদায় হবে। সুতরাং ইমাম যদি এ সিজদায় তার সাথে শরীক হয়ে যায়, তবে তার সিজদা দুরুস্ত হবে (তাবয়ীন)। কিন্তু দ্বিতীয় সিজদার উদ্দেশ্যে ইমাম যমীনে কপাল রাখবার পূর্বেই মুক্তাদী যদি দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে নেয়, তবে তার এ সিজদা দুরুস্ত হবে না। বরং পুনরায় তাকে সিজদা করতে হবে। যদি পুনরায় সিজদা না করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)। মুক্তাদী প্রথম সিজদা খুব লম্বা করল, এদিকে ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় সিজদায় চলে গেল। অতঃপর মুক্তাদী মাথা উঠিয়ে মনে করল যে, ইমাম হয়তো প্রথম সিজদার মধ্যেই রয়েছেন, এ কথা মনে করে সে দ্বিতীয় সিজদায় চলে গেল, তবে এ সিজদা মুক্তাদীর দ্বিতীয় সিজদা হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সে শুধু প্রথম সিজদার নিয়্যাত করে থাকে। কেননা, তার নিয়্যাত স্বীয় কর্ম অনুসারে ও জায়গা মত হয়নি এবং ইমামের কর্ম অনুসারেও জায়গা মত হয়নি (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৪. মাসআলা ঃ পাঁচটি কাজ এমন, যদি ইমাম তা ছেড়ে দেয়, তবে মুক্তাদীও তা ছেড়ে দিবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে। (১) ঈদের তাকবীর, (২) প্রথম বৈঠক, (৩) তিলাওয়াতের সিজদা, (৪) সাহু সিজদা এবং (৫) দু'আ কুনূত–যদি রুকূ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে। (ওয়াজীব ঃ ইমাম কুরদুরী (র))। আর যদি রুকূ ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তবে কুনূত পড়ে রুকূ করবে (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ চারটি কাজ এমন, ইমাম যদি তা ইচ্ছাকৃতভাবে করে, তবু মুক্তাদী তার অনুসরণ করবে না। (১) যদি ইমাম ইচ্ছা করে কোন রাকআতে সিজদা বেশী করে, (২) বা ঈদের তাকবীরের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনার অধিক তাকবীর বলে, (৩) অথবা সালাতে জানাযায় পাঁচ তাকবীর বলে, (৪) অথবা ভুলক্রমে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে না (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী)। যদি পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পূর্বে বসে যায় এবং সালাম ফিরায়, তবে মুক্তাদীও ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। যদি ইমাম পঞ্চম রাকআতের সিজদা করে নেয়, তবে মুক্তাদী সালাম ফিরিয়ে দিবে। ইমাম যদি চার রাকআতের পর না বসে ভুলক্রমে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং মুক্তাদী তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, অতঃপর ইমাম পঞ্চম রাকআতের সিজদা করে, তবে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ নয়টি কাজ এমন, যদি ইমাম এগুলো ছেড়ে দেয়, তবে মুক্তাদী এগুলো আদায় করে নিবে। তাকবীরে তাহ্রীমার সময় হাত না উঠানো এবং ছানা পাঠ করা, যদি ইমাম ফাতিহা পড়া অবস্থায় থাকে। ইমাম যদি সূরা পড়তে আরম্ভ করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে মুক্তাদী ছানা পড়বে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। অথবা রুকূ বা সিজদার তাকবীর না বলা, বা রুকূ–সিজদার তাসবীহ না পড়া বা সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা না বলা, বা তাশাহ্হুদ না পড়া অথবা সালাম না বলা, অথবা তাকবীরে তাশরীক না পড়া। ইমাম এগুলো না বললেও মুক্তাদী তা বলবে। কেউ যদি সমস্ত রাকআতে ইমামের আগে রুকূ–সিজদা করে, তবে এক রাকআত কিরাআত ব্যতীত কাযা করবে (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী)। কেউ যদি ইমামের আগে সিজদা করে এবং ইমাম তাকে সিজদার মধ্যে গিয়ে পায়, তবে জাইয আছে। তবে এরূপ করা মুক্তাদীর জন্য মাকরূহ্। (মুহীত ঃ সালাত আদায়ের পদ্ধতি অনুচ্ছেদ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ মাসবূক ও লাহিকের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মাসবূক ঐ ব্যক্তি, যে ইমামের সাথে প্রথম রাকআত পায়নি। মাসবূকের বহু বিধান রয়েছে (আল বাহ্রুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ মাসবূক যদি ইমামকে এমন রাকআতের কিরাআতে পায়, যে রাকআতের মধ্যে ইমাম শব্দ করে কিরাআত পড়ে, তবে সে ছানা পড়বে না (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (তাজনীস)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))। চাই সে ইমামের নিকটে হোক বা দূরে হোক অথবা বধির হওয়ার কারণে ইমামের আওয়ায শুনতে না পাক (খুলাসা)। মাসবূক যখন নিজের বাকী সালাত আদায় করার নিমিত্তে দাঁড়াবে, তখন সে ছানা ও আউযুবিল্লাহ্ পড়ে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, খুলাসা ও যহীরিয়্যা)। যে সালাতে ইমাম অনুচ্চস্বরে কিরাআত পড়ে, সেখানে মুক্তাদী ছানা পড়বে (খুলাসা)। ইমাম যদি উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ে, তবে মুক্তাদী ছানা না পড়ে চুপ থাকবে। এটাই সহীহ্ মত (তাতারখানিয়্যা ঃ মুসল্লী সালাত অবস্থায় কি কি করবে অনুচ্ছেদ)। কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকূ বা সিজদার অবস্থায় পায়, তবে মুক্তাদী চিন্তা করবে যদি মনে প্রবল ধারণা হয় যে, ছানা পাঠ করে ইমামকে রুকূ বা সিজদায় পাবে, তবে দাঁড়িয়ে ছানা পাঠ করবে, আর তা না হলে ইমামের অনুসরণ করবে। ছানা পাঠ করবে না। যদি ইমামকে রুকূ বা সিজদার অবস্থায় না পায়, তবে ছানা ও আউযুবিল্লাহ্ পড়বে না। কেউ যদি ইমামকে বৈঠকের অবস্থায় পায়, তবে ছানা পড়বে না। বরং প্রথমে তাকবীরে তাহ্রীমা বলবে, পরে আল্লাহ আকবর বলে বসে যাবে। (বাহ্রুর রাইক ঃ সালাতের বিবরণ অনুচ্ছেদ)

৩. মাসআলা ঃ মাসবূক প্রথমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে সালাত আদায় করবে, পরে ছুটে যাওয়া বাকী সালাতের কাযা করবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। মাসবূক যদি প্রথমেই নিজের ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা আরম্ভ করে, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। জামিউল ফাতাওয়ার মাঝে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন মুতাআখ্খিরীনের নিকট তার সালাত জাইয হবে। এর উপরই ফাতাওয়া (মুযমারাত)। কিন্তু প্রকাশ্য বর্ণনা মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (আল বাহ্রুর রাইক)

৪. মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে মাসবূক ব্যক্তি দাঁড়াবে না। কিন্তু কয়েক অবস্থায় ইমামের আগে খাড়া হওয়া জাইয আছে। মাসবূক যদি মোযার উপর মাসেহ্ করে এবং মাসেহের মুদ্দত চলে যাওয়ার যদি তার আশংকা হয়, অথবা মা'যূর ব্যক্তির যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় হয় অথবা জুমুআর সালাতে মাসবূকের যদি আসর ওয়াক্ত এসে যাওয়ার আশংকা হয় অথবা ঈদের সালাতে যদি তার যুহরের ওয়াক্ত এসে যাওয়ার আশংকা হয় অথবা ফজরের সালাতে যদি সূর্য উঠে যাওয়ার আশংকা হয়, অথবা তার যদি উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে মাসবূকের জন্য জাইয আছে ইমামের সালাত শেষ হওয়ার এবং সাহু সিজদার অপেক্ষা না করা। কিন্তু যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কারণে সালাত ফাসিদ হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তবে ইমামের অনুসরণ করবে। মাসবূকের যদি ভয় হয় যে, সে ইমামের সালামের অপেক্ষা করলে লোকজন তার সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হবে,

তবে ইমাম সালাম ফিরানোর পূর্বে সে দাঁড়িয়ে নিজের ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা করবে (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))। মাসবূক ব্যক্তি যদি এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সহীহ্ হবে। কিন্তু মাকরূহ্ তাহ্রীমী হবে (ফাতহুল কাদীর ও বাহ্রুর রাইক)। তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পূর্বেই মাসবূক যদি দাঁড়িয়ে যায়, তবে জাইয হবে না। ইমামের সালাম ফিরানোর আগে মাসবূক যদি সালাত শেষ করে ফেলে এবং সালামের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করে, তবে কারো কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হবে, কারো মতে সালাত ফাসিদ হবে না। এর উপরই ফাতওয়া (খুলাসা ও ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ ইমামের উভয় সালাম ফিরানোর পরপরই মাসবূক তার বাকী সালাত কাযা করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে না। বরং সে ইমামের ফারিগ হওয়ার অপেক্ষা করবে (বাহ্রুর রাইক)। ফরয সালাতের পর যদি নফল থাকে, তবে ইমামের নফল পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো পর্যন্ত মাসবূক তার অপেক্ষা করবে, আর ফরযের পর যদি নফল না থাকে, তবে ইমামের মিহ্রাব হতে ফিরে বসার অথবা তার স্থান হতে সরে যাওয়ার অথবা এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষা করবে যে সময়ের মধ্যে সাহু সিজদা ওয়াজিব হলে সে তা আদায় করতে পারত (তামারতাশী ঃ ঈদের সালাত অধ্যায়)।

৬. মাসআলা ঃ মাসবূক ব্যক্তি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার মাঝে ইমামের অনুসরণ করবে। তাশাহ্হুদ শেষে সে অন্যান্য দু'আসমূহের মাঝে লিপ্ত হবে না। অতঃপর সে কি করবে এ নিয়ে ফকীহ্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইব্ন শুজা' (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ অবস্থায় মাসবূক ব্যক্তি বারবার তাশাহ্হুদ তথা "আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে থাকবে। এটাই উত্তম মত (গিয়াছিয়্যা)। বিশুদ্ধ মত হল, মাসবূক ব্যক্তি ধীরে ধীরে তাশাহ্হুদ পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর সময় তার তাশাহ্হুদ শেষ হয় (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র), ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, খুলাসা ও ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা ঃ মাসবূক যদি ভুলে ইমামের আগে বা ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। যদি ইমামের পর সালাম ফিরায়, তবে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। এটাই উত্তম কথা (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। মাসবূক যদি ইমামের সাথে এ কথা জেনে সালাম ফিরায় যে, ইমামের সাথে তাকে সালাম ফিরাতে হবে, তবে এ সালাম ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। তাই তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ মাসবূক যদি ইমামের সাথে ভুলে সালাম ফিরায় এবং মনে করে যে, এতে তার সালাত ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, অতঃপর সে যদি তাকবীর বলে নতুনভাবে সালাত আদায়ের নিয়্যাত করে, তবে সে জামাআতের সালাত থেকে বের হয়ে পড়েছে বলে মনে করা হবে। কিন্তু একাকী সালাত আদায়কারীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ একাকী সালাত আদায়কারী যদি সন্দেহের বশীভূত হয়ে নতুনভাবে সালাত আদায়ের নিমিত্তে তাকবীর বলে, তবে সে সালাত থেকে বের হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার সময় কিরাআতের ক্ষেত্রে

তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। সে ফিরে আসুক বা না আসুক এতে কোন পার্থক্য নেই। এ সম্পর্কে মূলনীতি হল এই যে, মাসবূক যদি পৃথক হওয়ার স্থানে ইকতেদা করে অথবা ইকতেদার ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (আল্ বাহ্রুর রাইক)।

১৮. মাসআলা ঃ লাহিক ঃ ঐ ব্যক্তি যে ইমামের সাথে প্রথম হতে জামাআতে শরীক ছিল কিন্তু পরে তার রাকআত ছুটে যায়। তা ঘুমের কারণে হোক বা উযূ ভঙ্গের কারণে হোক বা ভীড়ের কারণে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হোক ইত্যাদি। সালাতুল খাওফের প্রথম দল হল লাহিক। লাহিক মুসল্লী ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা কিরাআতও পড়বে না এবং সাহু সিজদাও করবে না (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম যদি সাহু সিজদা করে, তবে লাহিক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় না করে ইমামের অনুসরণ করবে না। মাসবূকের হুকুমটি এর থেকে ব্যতিক্রম (খুলাসা)। উযূ করে ফিরে আসার পর লাহিকের কর্তব্য হল, সে উপস্থিত না থাকা অবস্থায় ইমাম যে সালাত আদায় করেছে, তা কিরাআত ব্যতীত আদায় করা। এ অবস্থায় লাহিক ইমামের কিয়ামের সমপরিমাণ সময় কিয়াম করবে, তার রুকূর সমপরিমাণ সময় রুকূতে থাকবে এবং তার সিজদার সমপরিমাণ সময় সিজদায় থাকবে। এর মধ্যে যদি কম-বেশী করে, তবে কোন অসুবিধা নেই (শরহুত্ তাহাবী)।

২০. মাসআলা ঃ ইমামের সাথে তাকবীর বলার পর কেউ যদি ঘুমিয়ে যায় এবং ইমাম এক রাকআত পড়ার পর সে যদি জাগ্রত হয়, তবে সে প্রথমে প্রথম রাকআত আদায় করবে। যদিও ইমাম দ্বিতীয় রাকআতে চলে যায় (যখীরা)। লাহিক যদি প্রথম রাকআত আদায় করাতে লিপ্ত না হয়ে প্রথমে ইমামের অনুকরণ করে, অতঃপর ইমামের সালামের পর নিজের ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা করে, তবু আমাদের মাযহাবে জাইয আছে (শরহুত্ তাহাবী)। লাহিক মুসাফির ছিল, সে যদি ইমামের সাথে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার অবস্থায় ইকামতের নিয়্যাত করে অথবা উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি নিজ শহরে প্রবেশ করে, তবে মুসাফির হিসাবে সালাত পূর্ণ করবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি ইমাম তার সালাত শেষ করে ফেলে। ইমাম যদি তার সালাত শেষ না করে থাকে, তবে লাহিক চার রাকআত পুরা করবে। এ বিষয়ে সমস্ত ইমাম একমত (মুসাফ্ফা)। চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে ইমাম যদি ভুলক্রমে প্রথম বৈঠক না করে, এ সময় লাহিক মুসল্লীও তার পেছনে ছিল যেমন কোন ব্যক্তি কিছু সময় নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হল বা কারো উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে উযূ করে ফিরে এসে দেখল, ইমাম কয়েক রাকআত আদায় করে নিয়েছে, তবে সে ইমামের বসার সময় বসবে না। ইমাম যুফার (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। মাসবূকের হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম (হাসর)।

২১. মাসআলা ঃ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে ছয় বিষয়ে লাহিক থেকে ভিন্নতর হুকুম রাখে। কোন মহিলার পুরুষের সমান সমান হয়ে দাঁড়ানো, কিরাআত, সাহু সিজদা, প্রথম বৈঠক যদি ইমাম তা বর্জন করে, সালামের সময় ইমামের হাসা এবং ইমামের ইকামতের নিয়্যাত করা এমতাবস্থায় যে, মাসবূক তার ছুটে যাওয়া রাকআতের সিজদা করে নিয়েছে (যহীরিয়্যা)। চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে যদি কারো এক রাকআত ছুটে যায় অর্থাৎ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসবূক হয়, অতঃপর ইমামের সাথে শরীক হয় এবং ঘুমিয়ে যায়, তাহলে জাগ্রত হয়ে সে প্রথমে ঐ রাকআতসমূহের কাযা পড়বে যার মধ্যে সে ঘুমিয়ে ছিল। এর মধ্যে কিরাআত পড়বে না কিন্তু ইমামের অনুসরণের লক্ষ্যে বৈঠকের স্থানে বসবে। শেষে দাঁড়িয়ে কিরাআতের সাথে এক রাকআত আদায় করবে এবং বসে সালাত পুরা করবে। কেউ যদি দুই রাকআতের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে এবং এক রাকআতের ব্যাপারে সন্দেহ যে, সে এ রাকআতে ইমামের সাথে শরীক ছিল কিনা? তবে সন্দেহযুক্ত রাকআত শেষে আদায় করবে (খুলাসা)।

ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত প্রাসংগিক মাসাইল

১. মাসআলা ঃ রাকআতের সংখ্যা নিয়ে যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে মতভেদ হয়। মুক্তাদীগণ বলে আমরা তিন রাকআত পড়েছি এবং ইমাম বলে চার রাকআত পড়েছি, তবে ইমামের কথার ব্যাপারে যদি তার ইয়াকীন এবং নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে, তাহলে মুক্তাদীদের কথায় সালাত দুহ্‌রাতে হবে না। যদি ইয়াকীন না থাকে, তবে দুহ্‌রাতে হবে। যদি মুক্তাদীদের মধ্যে বিরোধ হয়, কেউ বলে তিন রাকআত হয়েছে আবার কেউ বলে চার রাকআত হয়েছে, এবং ইমাম এক দলের সাথে থাকে, তবে ইমামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও ইমামের সাথে এক ব্যক্তি থাকে (খুলাসা)। যদি ইমামের মতের সমর্থনে কেউ না থাকে এবং ইমাম পুনরায় সালাত আদায় করে এবং মুক্তাদীগণ তার পেছনে ইকতেদা করে, তাহলে তাদের ইকতেদা সহীহ্ হবে (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি জামাআতের মধ্যে এক ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তিন রাকআত পড়া হয়েছে এবং অন্য এক ব্যক্তি এ মর্মে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে যে, চার রাকআত হয়েছে। এ অবস্থায় ইমাম ও অপরাপর মুক্তাদীগণ যদি সন্দেহের মধ্যে থাকে, তবে ইমাম ও জামাআতের লোকদের উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)। পুনরায় সালাত আদায় করা ইমামের জন্য মুস্তাহাবও নয়। তবে রাকআত কম হয়েছে বলে যাদের ইয়াকীন রয়েছে, তাদের উপর ওয়াজিব হল পুনরায় সালাত আদায় করা। ইমামের যদি ইয়াকীন থাকে যে, সে তিন রাকআত আদায় করেছে এবং কোন ব্যক্তি যদি ইয়াকীনের সাথে বলে যে, চার রাকআত হয়েছে, তবে ইমামের উপর ওয়াজিব হল, মুসল্লীদেরকে নিয়ে পুনরায় সালাত আদায় করা। তবে সালাত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যার ইয়াকীন আছে, তার পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয় (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ রাকআত কম হয়েছে বলে যদি কোন এক ব্যক্তির ইয়াকীন হয় এবং এ ব্যাপারে ইমাম ও বাকী মুক্তাদীদের যদি সন্দেহ হয়, তবে ওয়াক্তের মাঝে যদি সময় বাকী থাকে, তাহলে সতর্কতা হিসাবে সকলেই পুনরায় সালাত আদায় করে নিবে। যদি পুনরায় আদায় না করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। যদি আদিল ন্যায়পরায়ণ-দুই ব্যক্তি কম হওয়া সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে, তবে পুনরায় আদায় করা আবশ্যক হবে (খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে চলে যাওয়ার পর যদি মুক্তাদীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, কেউ বলে এ যুহরের সালাত ছিল, কেউ বলে, না, আসরের সালাত ছিল, তবে এ ঘটনা যদি যুহরের সময় ঘটে তাহলে যুহর ধরা হবে, যদি আসরের সময় ঘটে, তাহলে আসর ধরতে হবে। আর যদি বিষয়টি জটিল হয়, তবে উভয় দলের সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মনে করবে যে, সে সালাতের প্রথম অংশ কাযা করছে এবং তাশাহ্‌হুদের ক্ষেত্রে মনে করবে যে, সে সালাতের শেষ অংশ আদায় করছে। সুতরাং কেউ যদি মাগরিবের এক রাকআত পায়, তাহলে সে দু'রাকআত পরে আদায় করবে এবং এ দু'রাকআতের মাঝে বৈঠক করবে। ফলে, তার তিন বৈঠক হয়ে যাবে। এ দু'রাকআতের প্রত্যেক রাকআতে সে ফাতিহা এবং সূরা পাঠ করবে। যদি এ দু'রাকআতের কোন এক রাকআতে কিরাআত না পড়ে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের এক রাকআত পায়, তবে সে এক রাকআতে ফাতিহা এবং সূরাসহ পড়ে বসবে এবং তাশাহ্‌হুদ পড়বে। অনুরূপভাবে আরেক রাকআত আদায় করবে। তবে এতে তাশাহ্‌হুদ পড়বে না। অতঃপর তৃতীয় আরেক রাকআত আদায় করবে। এতে কিরাআত পড়া তার ইচ্ছাধীন, অবশ্য কিরাআত পড়াই উত্তম (খুলাসা)। যদি কেউ চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের দু রাকআত পায়, তবে বাকী দু রাকআত কিরাআতসহ আদায় করবে। যদি কোন এক রাকআতে কিরাআত না পড়ে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম যদি প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত না পড়ে পরের দুই রাকআতে কিরাআত পাঠ করে এবং এ অবস্থায় যদি কেউ জামাআতে শরীক হয় তবে মাসবূক পরের দুই রাকআতেও কিরাআত পড়বে। যদি কিরাআত তরক করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))।

১১. মাসআলা ঃ মাসবূক ব্যক্তি তার বাকী সালাত আদায়ের সময় মুনফারিদ ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে চার মাসআলায় এর থেকে ব্যতিক্রম হবে। (১) সে অন্য কারো উপর ইক্তেদা করতে পারবে না এবং তার উপরও অন্য ব্যক্তি ইকতেদা করতে পারবে না। মাসবূক যদি অন্য কোন মাসবূকের পেছনে ইকতেদা করে, তবে মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমামের সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম কিরাআত পড়ুক বা না পড়ুক (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)। যদি দুই মাসবূক ব্যক্তির কোন একজন কত রাকআত পড়তে হবে, এ কথা ভুলে যায় এবং দ্বিতীয় জনকে দেখে বাকী সালাত আদায় করে, তবে তার উপর ইকতেদা করেনি তাহলে তার সালাত সহীহ্ হবে (খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ যদি ইমামের সাহু সিজদার ধারণা হয় এবং সে সাহু সিজদা করে এ অবস্থায় মাসবূক যদি তার ইত্তেবা করে অতঃপর জ্ঞাত হয় যে, ইমামের উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়নি, তবে এ সম্পর্কে দু ধরনের রিওয়ায়েত আছে। এক ধরনের বর্ণনা মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সে পৃথক হওয়ার স্থানে ইমামের ইকতেদা করেছে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, বর্তমান যুগে ফাসিদ হবে না (যহীরিয়া)। মাসবূক যদি পরে এ সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, তবে কারো মতেই তার সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই পসন্দনীয় মত। আবূ হাফ্‌স কবীর (র)-এর উপরই ফাতওয়া দিতেন এবং এটাই গ্রহণযোগ্য মত (গিয়াছিয়্যা)। ইমাম যদি পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং মাসবূক তার অনুসরণ করে, তবে ইমাম যদি চতুর্থ রাকআতে বৈঠক করে থাকে, তাহলে মাসবূকের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি বৈঠক না করে থাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম পঞ্চম

রাকআতের সিজদা না করবে। ইমাম পঞ্চম রাকআতের সিজদা করতেই সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ মাসবূক যদি প্রথম হতে সালাত আরম্ভ করার নিয়্যাতে তাকবীর বলে, তবে প্রথম হতে তার সালাত আরম্ভ হয়ে যাবে এবং পেছনের সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু একা হলে পেছনের পঠিত সালাত বাতিল হবে না।

১৪. মাসআলা ঃ মাসবূক যদি তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ায় অথচ সে জামাআতে শরীক হওয়ার পূর্বে ইমামের উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়েছিল ইমাম এখনো সে সিজদা আদায় করেনি, তাহলে মাসবূকের জন্য ওয়াজিব হল, ফিরে এসে ইমামের সাথে সাহু সিজদায় শরীক হওয়া, যতক্ষণ না সে ছুটে যাওয়া রাকআতের সিজদা করবে। যদি ফিরে না আসে এবং সিজদা সাহু করে নেয়, তবে সে সালাত পুরা করে নিবে এবং সালাত শেষে সাহু সিজদা করবে। একা সালাত আদায়কারীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, অন্যের ভুলের কারণে একা সালাত আদায়কারীর উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না।

১৫. মাসআলা ঃ ইমামদের ঐক্যবদ্ধ মতানুসারে মাসবূক তাকবীরে তাশরীক বলবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একা সালাত আদায়কারীর উপর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব নয় (ফাতহুল কাদীর ও বাহ্রুর রাইক)।

১৬. মাসআলা ঃ মাসবূক সাহু সিজদার মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে। কিন্তু সালাম, তাকবীর এবং তালবিয়া পাঠের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে না। যদি সালাম ও তালবিয়া পাঠের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। নিজের মাসবূক হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তাকবীরের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। শামসুল আইম্মা সুরুখসী (র) এদিকে ধাবিত হয়েছেন (যহীরিয়্যা)। এখানে তাকবীর বলে তাকবীরে তাশরীককে বুঝানো হয়েছে (বাহ্রুর রাইক)।

১৭. মাসআলা ঃ ইমামের যদি তিলাওয়াতে সিজদার কথা মনে পড়ে এবং সে তা কাযা করার জন্য ফিরে আসে, তাহলে মাসবূক যদি নিজের রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তবে সে রাকআত ছেড়ে দিয়ে ইমামের অনুসরণ করবে এবং ইমামের সাথে সাহু সিজদা করবে। অতঃপর নিজের অবশিষ্ট রাকআতসমূহ আদায় করবে। মাসবূক যদি ফিরে না আসে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি নিজের রাকআতের সিজদা করার পর ইমামের অনুসরণ করে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে একই রিওয়ায়েত। আর মাসবূক যদি ইমামের অনুসরণ না করে, তবে মূল কিতাবের বর্ণনা অনুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর, বাদাই', তাতারখানিয়্যা ঃ তাহাবীর সূত্রে, মুযমারাত, শরহুল মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখসী, সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ও খুলাসা)। ইমাম যদি তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করার জন্য ফিরে না আসে, তবে সর্বাবস্থায় মাসবূকের সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে তার যিম্মায় যা রয়েছে, তা কাযা করতে হবে (তাতাখানিয়্যা)। ইমামের যদি সালাতের সিজদার কথা স্মরণ হয় এবং এর জন্য সে ফিরে আসে, তবে এ সিজদা মধ্যে মাসবূক তার অনুসরণ করবে। যদি অনুসরণ না করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। মাসবূক যদি উক্ত রাকআতের সিজদাও করে নেয়, তবে সমস্ত বর্ণনা অনুসারে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে উযূ ভঙ্গ হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় যদি কারো উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে সে উযূ করে 'বিনা' অর্থাৎ আদায়কৃত সালাতের স্থান হতে আরম্ভ করবে (কানয)। এ হুকুমের মধ্যে পুরুষ-মহিলা উভয়ই সমান (মুহীত)। যে রুকনের মধ্যে উযূ ভঙ্গ হয়েছে তা ধর্তব্য নয়। তা পুনরায় আদায় করতে হবে (হিদায়া ও কাফী)। অবশ্য বিনা না করে পুনরায় সালাত আদায় করা উত্তম (মুতূন)। কোন কোন মাশাইখের মতে সকলের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য। কারো কারো মতে এ হুকুম একা সালাত আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য হুকুম হল, যদি তারা অন্য জামাআত পায়, তবে প্রথম হতে জামাআত করাই উত্তম। আর যদি অন্য জামাআত না পায় তাহলে বিনা করা উত্তম। তবেই জামাআতের ফযীলত লাভ করা সম্ভব হবে। ফাতাওয়ার মধ্যে এ মতটিকে বিশুদ্ধ বলে প্রকাশ করা হয়েছে। (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২. মাসআলা ঃ বিনা জাইয হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। বিনা করার জন্য এমন হাদাছ হওয়া আবশ্যক, যা উযূকে ওয়াজিব করে এবং এমন না হওয়া যা ঘটনাক্রমে সাংঘটিত হয়েছে। আসমানী কারণে উযূ ভঙ্গ হওয়া আবশ্যক। যার মধ্যে এবং যার কারণের মধ্যে বান্দার কোন ইচ্ছা ও শক্তি নেই (আল-বাহ্রুর রাইক)। অতএব কোন মুসল্লী যদি পেশাব-পায়খানা, বদবায়ু এবং নাকে রক্ত প্রবাহিত ইচ্ছাকৃতভাবে করে, তবে তার সালাত সহীহ্ হবে না এবং বিনাও করতে পারবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ না করে, তবে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ ঘটলে ঐ একই হুকুম হবে। আর যদি উযূ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়, তবে এ যদি কোন মানুষের কারণে ঘটে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ কারো যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে মুখ ভরে বমি হয়, তবে কথা না বলা পর্যন্ত উযূ করে বিনা করতে পারবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, তবে বিনা করতে পারবে না। (মুহীত)। যদি কোন মুসল্লীর অন্যের কর্মের দ্বারা হাদাছ হয় অর্থাৎ উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, যেমন কেউ গুলিবিদ্ধ হল বা কেউ তার প্রতি প্রস্তর বা ঢিলা নিক্ষেপ করল, ফলে তার মাথা ফেটে গেল অথবা কারো ফোঁড়ায় আঘাত করে কেউ রক্ত বের করে দিল, তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে তার জন্য বিনা করা জাইয হবে না (শরহুত তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ ছাদ থেকে ঢিলা বা কাঠ পড়ে যদি কারো মাথা ফেটে যায় এবং এ যদি কারো পদচারণার কারণে হয়ে থাকে, তবে তাকে প্রথম হতে সালাত আদায় করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। আর এ যদি কারো পদচারণার কারণে না হয়ে থাকে, তবে কোন কোন ইমামের মতে সে বিনা করতে পারবে। এতে কারো মতভেদ নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ কেউ বলেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে, এটাই সহীহ্ মত। কেউ যদি গাছের নীচে থাকে এবং গাছ থেকে ফল পতিত হয়ে তার শরীর ক্ষত হয়ে যায়, তবে ঐ একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

৫. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লীর পায়ে যদি কাঁটা ফুটে অথবা সিজদা করা অবস্থায় কারো কপালে যদি কাঁটা ফুটে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে এর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহলে এ ব্যক্তির জন্য বিনা করা জাইয নেই। তোমরা যদি কারো শরীরে হুল বিদ্ধ করে এবং এতে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে তার জন্যও বিনা করা জাইয নেই। হাঁচি দেয়ার পর কারো যদি উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় অথবা জোরে গলা খাকার দেয়ার পর কারো যদি বায়ু নির্গত হয়, তাহলে সেও বিনা করতে পারবে না। এটাই সহীহ্ মত (যহীরিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ মহিলার জননেন্দ্রিয়ের উপর বাধা কুরসুফ যদি তার কর্ম ব্যতিরেকে খসে পড়ে যায় এবং তা আর্দ্র থাকে, তাহলে কোন ইমামের মতেই সে আর বিনা করতে পারবে না। যদি উক্ত মহিলা কর্তৃক নাড়া লেগে পড়ে যায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে বিনা করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিনা করতে পারবে না (তাবয়ীন)।যদি কারো ফোঁড়া থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়ে তবে সে তা ধৌত করে উযূ করেত বিনা করবে। চাপ দেয়ার কারণে যদি ফোঁড়া থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হাঁটুতে ফোঁড়া ছিল, সিজদার অবস্থায় হাঁটুতে ভর দেয়ার কারণে যদি ফোঁড়ার মুখ খুলে যায় তবে তা ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ ভঙ্গের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ অবস্থায় পূর্ব আদায়কৃত সালাতের উপর সে বিনা করতে পারবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ যদি বেহুশ বা পাগল হয়ে যায় অথবা অট্টহাসি দেয়, তাহলে সে উযূ করে প্রথম হতে সালাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় ঘুমিয়ে যায় এবং স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে ইসতিহ্সানের দাবী অনুসারে সে নতুনভাবে সালাত আদায় করবে, বিনা করবে না। কোন মহিলার লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানোর কারণে যদি কারো বীর্যপাত ঘটে, তবে সেও বিনা করতে পারবে না।

৮. মাসআলা ঃ পেশাবের ফোঁটা যদি মুসল্লীর কাপড়ে লাগে এবং তা যদি এক দিরহাম পরিমাণ হয় এবং মুসল্লী ঐ অংশটুকু ধৌত করে নেয়, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে তার জন্য বিনা করা সহীহ্ হবে না (শরহুততাহাবী)

৯. মাসআলা ঃ বিনা করতে হলে হাদাছ হওয়ার সাথে সাথেই সালাত ছেড়ে উযূ করতে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং কেউ যদি হাদাছ অবস্থায় এক রুকন আদায় করে অথবা এক রুকন আদায় করা যায় পরিমাণ সময় নিজ স্থানে অবস্থান করে,তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। হাদাছ হওয়ার পর উযূ করতে যাওয়া অবস্থায় কেউ যদি কিরাআত পড়ে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি আসার পথে কিরাআত পড়ে, তবে ফাসিদ হবে না। কোন কোন ফকীহ্ এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। তবে শুদ্ধ মত হল, উভয় অবস্থাতেই সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাসবীহ্ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা বিনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয় (তাবয়ীন)।

১০. মাসাআলা ঃ রুকূর অবস্থায় ইমামের যদি হাদাছ হয় এবং মাথা উত্তোলন করার পর

pdf By Syed Mostafa Sakib

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে অথবা সিজদার মধ্যে হাদাছ হওয়ার পর যদি সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করাকালীন আল্লাহ আকবর এ উদ্দেশ্যে বলে যে, ঐ রুক্‌ন আদায় করা, তবে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি কোন রুক্‌ন আদায় করার উদ্দেশ্য না থাকে, তবে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়[১] (কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ ইমামের যদি সিজদার অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হয় এবং মাথা উত্তোলন করতে করতে সে তাকবীর বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি তাকবীর বলা ব্যতীত মাথা উত্তোলন করে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। এ অবস্থায় অন্য কাউকে নিজের প্রতিনিধি বানাবে (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুদূরী (র))। যদি সালাতে ঘুমন্ত অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হয় এবং সামান্য পরই নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে বিনা করতে পারবে। যদি জাগ্রত হয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মি'রাজুদ দিরায়া)।

১২. মাসআলা ঃ উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর সালাতের পরিপন্থী কোন কাজ না করা। উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর কেবল ঐ কাজ করতে পারবে যা আবশ্যকীয় বা আবশ্যকীয় কাজের অংশ বিশেষ বা পরিপূরক। সুতরাং উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর কেউ যদি কথা বলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ ভঙ্গ করে বা উযূ ভঙ্গের পর হাসে অথবা পানাহার করে কিংবা এ জাতীয় কোন কাজ করেই তবে তার জন্য বিনা করা জাইয নেই। সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ যদি পাগল বা বেহুশ হয়ে যায় অথবা কেউ যদি জুনুবী হয়ে যায়, তবে তার জন্যও বিনা করা জাইয হবে না (বাদাই')। কোন মহিলার প্রতি নজর করার কারণে কারো যদি বীর্যপাত ঘটে, তবে তার জন্যও বিনা করা জাইয নেই (শরহুত তাহাবী)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি পাত্র বা কূপ থেকে পানি নিয়ে উযূ করে, তবে তার জন্য বিনা করা জাইয আছে। উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর যদি কেউ ইস্তিনজা করে এবং এ সময় সে যদি উলঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে বিনা বাতিল হয়ে যাবে। কাপড় দিয়ে আবৃত হয়ে যদি ইস্তিনজা করে, তবে বিনা জাইয হবে (বাদাই')। মুসল্লীর উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর সে যদি উযূ করতে যায় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে সতর খুলে যায় অথবা নিজেই খুলে নেয়, তবে কাযী আবূ আলী নাসাফী (র)-এর মতে যদি সতর খোলা ছাড়া উযূ করা সম্ভব না হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (নিহায়া)। উযূ করার সময় কোন মহিলা যদি নিজ বাহু খুলে নেয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে এটাই সহীহ্ মত।

১৪. মাসআলা ঃ সালাতে উযূ ভঙ্গ ব্যক্তি উযূ করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ' তিনবার করে ধৌত করবে, সমস্ত মাথা মাসেহ্ করবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিবে এবং উযূর সমস্ত সুন্নাত আদায় করে উযূ করবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন)। এক এক অঙ্গ যদি চারবার করে ধৌত করে, তবে পুনরায় শুরু থেকে সালাত আরম্ভ করতে হবে (তাতারখানিয়্যা)। পানি দূরে এবং কূপ যদি নিকটে হয় এতাবস্থায় উযূ ভঙ্গ হলে এতদুভয় পানির স্থান হতে ঐস্থানের পানি দ্বারাই উযূ করবে, যা যাতায়াতের দিক থেকে নিকটে এবং উঠানোর দিক থেকেও খুব সহজ। তবে সহীহ্ মতে,

---

১. ফাসিদ হয়ে যাবে, অপর বর্ণনায় হবে না।

কূপের পানি উঠিয়ে উযূ করলে প্রথম হতে আবার সালাত আদায় করতে হবে (মুযমারাত)। এটাই উত্তম মত (খুলাসা)।

১৫. মাসআলা ঃ কারো সালাত আদায়ের অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হল, বাড়ীতে তার পানি আছে, এমতাবস্থায় সে যদি হাউযের পানি দ্বারা উযূ করার ইচ্ছা করে অথচ বাড়ী হাউয থেকে অধিক নিকটে, তবে দেখতে হবে, যদি বাড়ী ও হাউযের মাঝে দুই কাতারের কম ব্যবধান হয়, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু এর থেকে অধিক ব্যবধান হলে ফাসিদ হয়ে যাবে। উযূ ভঙ্গ ব্যক্তির বাড়ীতে পানি আছে, কিন্তু তার অভ্যাস হল হাউযের পানি দ্বারা উযূ করা, তাই বাড়ীর পানির কথা ভুলে গিয়ে সে যদি হাউযের পানি দ্বারা উযূ করে, তাহলে বিনা তার সহীহ্ হবে (খুলাসা)। হাউযে উযূ করার সুযোগ ছিল, এমতাবস্থায় কেউ যদি ওযরের কারণে হাউয ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, যেমন জায়গা সংকীর্ণ ছিল, তবে সে বিনা করতে পারবে। যদি ওযরের কারণে এমনটি না করে, তবে বিনা সহীহ্ হবে না (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))।

১৬. মাসআলা ঃ উযূ করার পর কারো যদি মনে পড়ে যে সে মাথা মাসেহ্ করেনি, তবে মাথা মাসেহ্ করে এসে সালাত আরম্ভ করা তার জন্য দুরুস্ত আছে। সালাত আরম্ভ করার পর যদি একথা স্মরণ হয়, তবে পুনরায় শুরু হতে সালাত আদায় করবে (খুলাসা)।। মুসল্লী যদি নিজের কাপড়ের কথা ভুলে সালাত আরম্ভ করে, অতঃপর কাপড়ের কথা মনে পড়ে এবং নিজের স্থানে গিয়ে কাপড় উঠিয়ে রেখে আসে, তবে নতুন ভাবে সালাত আদায় করবে (তাতারখানিয়্যা)।

১৭. মাসআলা ঃ মসজিদের ভেতর একটি পাত্রে কিছু পানি ছিল। এমতাবস্থায় কারো উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর সে যদি পাত্রটি সালাত আদায় স্থানে নিয়ে যায়, তবে পাত্রটি বহন করার ক্ষেত্রে সে যদি এক হাত ব্যবহার করে, তাহলে "বিনা" জাইয হবে (মুহীত)। মুসল্লীর উযূ ভঙ্গ হওযার পর উযূ করার জন্য সে নিজ বাড়ীতে গেল। এ সময় ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, সে ঘরের দরজা খুলে উযূ করল। যদি চোরের ভয় থাকে, তাহলে উযূ শেষ করে দরজা বন্ধ করে দিবে। যদি চোরের ভয় না থাকে, তবে দরজা বন্ধ করবে না (তাতারখানিয়্যা)। পাত্র যদি পানিতে ভর্তি করে উভয় হাত দিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়, তবে বিনা সহীহ্ হবে না। উঠানোর জন্য যদি এক হাত ব্যবহার করা হয়, তাহলে বিনা জাইয হবে (আল্‌জাইহারাতুন নায়্যারা)।

১৮. মাসআলা ঃ যে পরিমাণ নাপাকী সালাতের বিশুদ্ধতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এ পরিমাণ নাপাকী যদি শরীর বা কাপড়ে লাগে এবং মুসল্লী তা ধৌত করে নেয়, তবে এ নাপাকীর কারণে যদি উযূ ভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে "বিনা" করতে পারবে। আর অন্য কারণে উযূ ভঙ্গ হয়ে থাকলে "বিনা" করতে পারবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। নাপাকী যদি উযূ ভঙ্গের কারণ হয় এবং অন্য কারণও এর সাথে থাকে, তাহলে বিনা সহীহ্ হবে না। যদিও উভয় নাপাকী একই স্থানে লাগে (তাবয়ীন)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লীর কাপড়ে যদি নাপাকী লাগে এবং এ নাপাকী যদি দূর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, যেমন সে একটি পাক কাপড় পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টি বদলিয়ে নিল, তবে জাইয আছে। যদি নাপাক কাপড়টি সাথে সাথে খুলে নেয়া সম্ভব না হয় অর্থাৎ সে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাক কাপড় পেল না–এমতাবস্থায় সে যদি এ নাপাক কাপড় নিয়ে সালাতের কোন অংশ আদায় করে, তবে সমস্ত ইমামের মতানুযায়ী তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি ঐ কাপড় পরিধান করে কোন রুক্ন আদায় না করে বরং এ অবস্থায় কিছু সময় অপেক্ষা করে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। যদিও তা দীর্ঘ হয়। যদি পাক কাপড় পাওয়ার পর তা পরিবর্তন না করে এবং সালাতের কোন রুকন আদায়ও না করে, তবে এ নিয়ে আমাদের মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)।'সালাতে উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর উযূ করতে গিয়ে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় হাদাছ করে, তবে তার জন্য বিনা করা জাইয নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ আসমানী কারণে উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর পূর্ব কোন হাদাছের বহিঃপ্রকাশ না ঘটা আবশ্যক (বাহ্রুর রাইক)। সুতরাং মোযার উপর মাসেহ্কারী ব্যক্তির উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর সে যদি উযূ করতে যায় এবং উযূ করা অবস্থায় মাসেহের মুদ্দত যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে নতুনভাবে সালাত আরম্ভ করতে হবে। এটাই সহীহ্ মত। যেমন তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় হাদাছ হয় এবং সে উযূ করতে গিয়ে পানি পায়, তাহলে তার জন্য বিনা জাইয হবে না। অনুরূপভাবে ইস্‌তিহাযাওয়ালী মহিলার যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হয়; অতঃপর সে উযূ করতে যায়, তাহলে সেও বিনা করবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। পট্টির উপর মাসেহ্কারী ব্যক্তির হুকুমও অনুরূপই। এ সময় যদি যখম ভাল হয়ে যায় অথবা যখম হতে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় যদি সালাতের ওয়াক্ত খতম হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায়ও বিনা জাইয নেই (তাতারখানিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ সালাতে উযূ ভঙ্গ ব্যক্তি যদি মুক্তাদী হয় এবং ইমাম যদি সালাত থেকে ফারিগ না হয়ে থাকে এবং তার ও ইমামের মাঝে এমন ব্যবধান হয় যে, ঐ স্থান থেকে ইমামের পেছনে ইকতেদা জাইয নেই, তাহলে পুনরায় ইমামের নিকট ফিরে আসবে। উযূ করার সময়ের ভেতর যদি ইমাম সালাত থেকে ফারিগ হয়ে যায়, তাহলে ইমামের নিকট ফিরে আসতে হবে না। যদি ফিরে আসে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উযূর স্থানে অবস্থিত মুক্তাদী ও ইমামের মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে ঐ স্থানে থেকে, উক্ত ইমামের পেছনে ইকতেদা করা জাইয আছে (বাহ্রুর রাইক)।

২২. মাসআলা ঃ এক সালাত আদায়কারী ব্যক্তি উযূ করার পর স্বাধীন সে ইচ্ছা করলে নিজ স্থানে সালাত পুরা করবে এবং ইচ্ছা করলে পূর্বের স্থানে এসে পুরা করবে। তবে পূর্বের স্থানে এসে পূর্ণ করাই উত্তম (কাফী)।

২৩. মাসআলা ঃ খলীফা[1] ইমাম সালাত থেকে ফারিগ হয়ে যাওয়ার পর ইমাম একা সালাত আদায়কারীর ন্যায় স্বাধীন। আর যদি ফারিগ না হয়, তবে খলীফার নিকট ফিরে আসবে এবং তার পেছনে সালাত পূর্ণ করবে (শরহে বিকায়া)।

---

১. উযূ ভঙ্গের কারণে ইমাম যকে ইমা বানিয়ে গেছে।

২৪. মাসআলা ঃ সাহিবে তারতীব ব্যক্তির আসমানী কারণে উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর ফাইতা (কাযা) সালাতের কথা মনে না পড়া আবশ্যক (আল বাহ্‌রুর রাইক)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়, তবে এমন লোককে খলীফা বানাবে না, যে ইমামতের উপযুক্ত নয়। কেউ যদি কোন মহিলাকে খলীফা নিযুক্ত করে, তবে প্রথম হতে সে সালাত আরম্ভ করবে, বিনা করতে পারবে না (আল বাহ্‌রুর রাইক)।

খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করার মাসাইল

১. মাসআলা ঃ যে সব ক্ষেত্রে বিনা করা জাইয ঐসব ক্ষেত্রে ইমামের জন্য খলীফা এবং প্রতিনিধি বানানোও জাইয। যে সব ক্ষেত্রে বিনা করা জাইয নেই, ঐসব ক্ষেত্রে খলীফা বানানোও জাইয নেই। যে ব্যক্তি প্রথম হতে ইমাম হওয়ার উপযুক্ত, সে ইমামের উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর খলীফা হওয়ার জন্যও উপযুক্ত । আর যে ব্যক্তি প্রথম হতে ইমাম হওয়ার উপযুক্ত নয়, সে খলীফা হওয়ার জন্যও উপযুক্ত নয় (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ খলীফা বানানোর পদ্ধতি হল এই যে, নিজে কিছুটা ঝুঁকে নাকে হাত দিয়ে পেছনের দিকে সরে যাবে যেন লোকেরা মনে করে যে, হয়তো তার নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অতঃপর প্রথম কাতার থেকে ইশারার মাধ্যমে একজনকে আগে বাড়িয়ে দিবে। মুখে কিছু বলবে না। খোলামাঠ হলে মুসল্লীদের কাতারসমূহ অতিক্রম না করা পর্যন্ত এবং মসজিদ হলে মসজিদ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধি বানানো জাইয আছে (তাবয়ীন)। উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর কেউ যদি মসজিদের বাইরের কোন মুসল্লীকে খলীফা বানায় এবং বাইরের কাতার যদি মসজিদের কাতারের সাথে মিলিত থাকে, তবু এভাবে খলীফা বানানো তার জন্য জাইয নেই। এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমামের সালাত ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে দুই ধরনের রিওয়ায়েত আছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে ইমামের সালাতও ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ ইমামের জন্য উত্তম হল মাসবূক ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন না করা। ইমাম যদি মাসবূক মুসল্লীকে খলীফা বানায়, তবে তার জন্য উচিত হল এ দায়িত্ব গ্রহণ না করা। যদি সে গ্রহণ করে, তবে জাইয আছে (যহীরিয়্যা)।

মাসবূক যদি ইমামতের জন্য এগিয়ে যায়, তবে ইমাম যেখানে শেষ করেছে, সে সেখান থেকে আরম্ভ করবে। সালাম ফিরানোর সময় হলে কোন মুদরিককে অর্থাৎ যে ইমামের সাথে পূর্ণ সালাত পেয়েছে এ ধরনের কোন মুসল্লীকে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুসল্লীদেরকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। যদি মাসবূক প্রতিনিধি ইমামের সালাত শেষ করার সময় অট্টহাসি দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ ভঙ্গ করে বা কথা বলে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে কিন্তু মুসল্লীদের সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। এ সময় যদি প্রথম ইমামের সালাত শেষ হয়ে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি তার সালাত শেষ না হয়, তাহলে তার সালাতও ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (হিদায়া)।

৪. মাসআলা ঃ যদি ইমামের রুকূ ছুটে যায়, তবে হাঁটুর উপর হাত রেখে প্রতিনিধিকে রুকূ করার প্রতি ইংগিত করবে। যদি সিজদা ছুটে যায়, তবে কপালের উপর হাত রেখে প্রতিনিধিকে সিজদা করার প্রতি ইশারা করবে এবং যদি কিরাআত ছুটে যায়, তবে মুখের উপর হাত রেখে প্রতিনিধিকে কিরাআত পাঠের প্রতি ইংগিত করবে। (আল-বাহ্‌রুর রাইক)। এক রাকআত বাকী থাকলে এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে এবং দুই রাকআত বাকী থাকলে দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। তিলাওয়াতের সিজদা বাকী থাকলে কপাল ও জিহবায় হাত রেখে ইশারা করবে। সাহু সিজদা বাকী থাকলে কল্‌বের উপর হাত রেখে এর প্রতি ইশারা করবে (যহীরিয়্যা)।

এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি খলীফা ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে। যদি জ্ঞাত থাকে, তবে এরূপ করার কোন প্রয়োজন নেই (তাতারখানিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে কেউ যদি কারো পেছনে ইকতেদা করে এমতাবস্থায় ইমামের যদি উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ইমাম উক্ত ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দেয় অথচ ইমাম কত রাকআত পড়েছে এবং কত রাকআত তার বাকী রয়েছে একথা মুক্তাদীর জানা নেই। এরূপ অবস্থায় মুক্তাদী চার রাকআত আদায় করবে এবং সন্দেহকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক রাকআতে বসবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ মাসবূক অনুচ্ছেদ) ।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম যদি লাহিক মুসল্লীকে খলীফা বানায়, তবে লাহিক খলীফার জন্য উচিত হল, জামাআতের লোকদেরকে ইশারা করে প্রথমে নিজের সালাত আদায় করা, অতঃপর লোকদেরকে নিয়ে সালাত সমাপ্ত করা। কিন্তু সে যদি এরূপ না করে, বরং প্রথমে প্রতিনিধি হিসাবে লোকদেরকে নিয়ে ইমামের সালাত আদায় করে এবং নিজের ছুটে যাওয়া সালাত বিলম্বে আদায় করে। সালাম ফিরানোর সময় অন্য কাউকে খলীফা বানায়, যে জামাআতের লোকদেরকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবে। এরূপ করাও জাইয আছে (মুযমারাত)।

৭. মাসআলা ঃ যে ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, তার ইমামত ঐ সময় পর্যন্ত বাকী থাকবে, যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে বের হবে বা কাউকে খলীফা নির্বাচন করবে এবং খলীফা ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতের নিয়্যাত করবে। অথবা যতক্ষণ না লোকেরা অন্য কাউকে খলীফা নির্বাচন করবে। ইমামের উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের কোন একটিও যদি অবলম্বন না করা হয়, বরং মসজিদের এক কোণে গিয়ে ইমাম যদি উযূ করে নেয় এবং এ অবস্থায় মুসল্লীগণ যদি তার অপেক্ষা করতে থাকে, অতঃপর ইমাম নিজ স্থানে এসে যদি নিজের বাকী সালাত মুসল্লীদেরকে নিয়ে সমাপ্ত করে, তবে জাইয আছে।

৮. মাসআলা ঃ যদি ইমাম কাউকে খলীফা না বানায় এবং মুক্তাদীগণও কাউকে খলীফা না বানায়, এমতাবস্থায় ইমাম যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে সমস্ত মুসল্লীর সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ইমাম উযূ করে বিনা করবে। কেননা, ইমাম নিজের ব্যাপারে একা সালাত আদায়কারীর মত (মুহীত)। ইমাম মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই কেউ যদি নিজে নিজে ইমামের স্থানে পৌঁছে যায়, তবে জাইয আছে। উক্ত ব্যক্তির মিম্বরের নিকট পৌঁছে ইমামের স্থানে দাঁড়ানোর পূর্বেই ইমাম যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে তার সালাত এবং জামাআতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যান্য লোকদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামের সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমামের পেছনে যদি একজন মুসল্লী থাকে এবং ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়, তবে ঐ ব্যক্তিই ইমামতের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। নিয়্যাতের মাধ্যমে ইমাম তাকে নির্ধারিত করুক বা না করুক।

৯. মাসআলা ঃ যদি ইমাম এক ব্যক্তিকে ইমামতের জন্য আগে বাড়িয়ে দেয় এবং মুক্তাদীগণ অন্য ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তিই ইমাম হবে যাকে ইমাম আগে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যদি তার নিয়্যাত করার পূর্বে মুক্তাদীগণ অপর ব্যক্তির পেছনে উকতেদা করার নিয়্যাত করে নেয় তবে অপর ব্যক্তিই ইমাম মনোনীত হবে। যদি এক এক দল এক এক জনকে ইমামতের জন্য আগে বাড়িয়ে দেয়, তবে অধিকাংশ মুসল্লী যার পক্ষে থাকবে সেই ইমাম হবে। যদি উভয় দিকে সমান সমান হয়, তবে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমামতীর জন্য যদি দুই ব্যক্তি নিজের থেকে অগ্রসর হয়ে যায়, তবে যে ইমামের স্থানে আগে পৌছতে পারবে, সেই ইমাম মনোনীত হবে। যদি দুই ব্যক্তিকে এক সাথে ইমামতীর জন্য আগে বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং কিছু লোক একজনের পেছনে ইকতেদা করে এবং অন্য কিছু লোক অপর জনের পেছনে করে, এ অবস্থায় অধিকাংশ লোক যার পেছনে ইকতেদা করবে, তাদের সালাত সহীহ্ হবে। আর কম পরিমাণ লোক যার পেছনে ইকতেদা করবে, তাদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি উভয় দিকে মুসল্লী সমান সমান হয়, তবে যেহেতু কোন দিককে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়, তাই উভয় দলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (তাবয়ীন)

১০. মাসআলা ঃ ইমাম যদি শেষ কাতার থেকে কাউকে খলীফা বানিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং খলীফা ইমাম যদি তৎক্ষণাৎ ইমামতের নিয়্যাত করে নেয়, তবে সে ইমাম হয়ে যাবে। তবে যারা তার সম্মুখে থাকবে, তাদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ব ইমাম এবং বর্তমান ইমামের কাতারসহ ডানের এবং বামের মুসল্লীদের সালাত ফাসিদ হবে না এবং পেছনের মুসল্লীদের সালাতও ফাসিদ হবে না। খলীফা যদি এরূপ নিয়্যাত করে যে, যখন আমি পূর্ব ইমামের স্থানে দাঁড়াব, তখন ইমাম হবো,। এমতাবস্থায় খলীফা পূর্ব ইমামের স্থানে পৌছার আগেই এবং ইমামতের নিয়্যাত করার আগেই ইমাম যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

১১. মাসআলা ঃ খলীফা এবং মুসল্লীদের সালাত সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হল, ইমাম মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই খলীফাকে মিহ্রাবে পৌছে যেতে হবে (আল বাহ্রুর রাইক)। যদি ইমাম কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে এবং সে পুনরায় অপরজনকে খলীফা নিযুক্ত করে, তবে ইমাম ফযলী (র)—এর মতে প্রথম ইমাম যদি মসজিদ থেকে বের না হয় এবং খলীফা যদি তার স্থানে না গিয়েই অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, তবে জাইয আছে এবং দ্বিতীয় ইমাম এমন হবে যেন সে নিজেই এগিয়ে গিয়েছে অথবা ইমাম তাকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে। এরূপ অবস্থা না হলে জাইয হবে না (খুলাসা)।

১২. মাসআলা ঃ কারো যদি উযূ ভঙ্গ হয় এবং তার সাথে কোন মুক্তাদী না থাকে এবং সে

এখনো পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের না হয়, এমতাবস্থায় কেউ এসে যদি তার পেছনে ইকতেদা করে এবং এরপর সে মসজিদ থেকে বের হয়, তবে আমাদের ইমামদের মতে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির খলীফা হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ ইমাম যদি কিরাআত পড়তে গিয়ে আটকিয়ে যায়, তবে তার জন্য জাইয আছে কাউকে খলীফা নিয়োগ করা। প্রতিনিধি ঐ সময় নিয়োগ করতে পারবে যদি ঐ পরিমাণ কিরাআত না পড়া হয় যতটুকু পড়লে সালাত সহীহ্ হয়। অথবা লজ্জা বা ভয়ের কারণে যদি কিরাআত পড়তে আটকিয়ে যায়, তাহলেও খলীফা নিয়োগ করতে পারবে। যতটুকু পড়লে সালাত সহীহ্ হয়, ততটুকু পড়া হলে খলীফা নিযুক্ত করা জাইয হবে না। বরং রুকূ করে সালাত আদায় করতে থাকবে। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি কাউকে খলীফা নির্বাচন করে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এ অবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচন করার তার কোন আবশ্যক ছিল না (তাবয়ীন)। কেউ যদি কিরাআত পড়তে একেবারেই ভুলে যায়, তবে কোন ইমামের মতেই তার জন্য খলীফা নির্বাচন করা জাইয নেই (আয়নীঃ শরহুল হিদায়া)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন মুসাফির যদি কোন মুসাফিরের পেছনে ইকতেদা করে, অতঃপর ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ইমাম কোন মুকীম ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করে, তবে পূর্ণ সালাত আদায় করা মুসাফিরের জন্য আবশ্যক নয়। বরং সে দুই রাকআত আদায় করবে। আর যদি মুসাফির ব্যক্তিকে খলীফা বানায় এবং এ অবস্থায় সে ইকামতের নিয়্যাত করে নেয়, তবে মুক্তাদীদের পূর্ণ সালাত আদায় করা আবশ্যক নয় (মুহীতঃ ইমাম সুরুখসী (র) : মুসাফিরের সালাত অনুচ্ছেদ)।

এ প্রসঙ্গের আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ উযূ ভঙ্গের ধারণায় কেউ যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং পরে জানতে পারে যে, তার উযূ ভঙ্গ হয়নি, তবে সে পুনরায় সালাত আরম্ভ করবে। যদি মসজিদ থেকে বের না হয়, তবে বাকী সালাত সমাপ্ত করবে (হিদায়া)। তা বিপরীত ঐ অবস্থার, যদি কারো ধারণা হয় যে, সে উযূ ব্যতীত সালাত আরম্ভ করেছে অথবা মোযার উপর মাসেহ্কারী ব্যক্তির ধারণা হল যে, তার মাসেহের সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অথবা তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি মরীচিকা দেখে মনে করল যে, সে পানি পেয়ে গিয়েছে অথবা যুহর আদায়কারী মনে করল যে, সে ফজরের সালাত আদায় করেনি অথবা কাপড়ের উপর কোন দাগ দেখে তাকে নাপাকী মনে করে ফিরে গেল, তাহলে উপরোক্ত অবস্থায় তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

২. মসআলা ঃ ঘর, গোরস্তান এবং সালাতে জানাযার স্থান মসজিদের মতই। খোলামাঠে যতটুকু পর্যন্ত কাতার হয়, তাও মসজিদের হুকমের অন্তর্ভুক্ত। উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর ইমাম যদি সামনে এগিয়ে যায় এবং তার সামনে সুতরা না থাকে, তবে কাতারের জায়গা যে পরিমাণ তার পেছনে আছে সম্মুখের দিকেও ঐ পরিমাণ ধর্তব্য হবে। ইমামের সামনে যদি সুতরা থাকে, তবে সুতরাই হবে তার সীমানা (তাবয়ীন)। মাঠে কেউ যদি একা সালাত আদায় করে, তবে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিজদার জায়গা পর্যন্ত এবং ডানে, বামে ও পেছনে ঐ পরিমাণ জায়গা মসজিদের হুকুমের ন্যায় হবে (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ মহিলা যদি নিজের সালাত আদায়ের স্থান থেকে নেমে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, তার মুসল্লা তার ক্ষেত্রে মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই মহিলা তার মুসল্লাতেই ইতিকাফ করে থাকে (তাবয়ীন)। উযূ ভঙ্গ হওয়ার আশংকায় কোন মুসল্লী যদি সালাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অতঃপর উযূ ভঙ্গ হয়, তবে তার জন্য বিনা করা জাইয নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নিম্নোক্ত অবস্থায় মুসল্লীর সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

৪. মাসআলা ঃ ফজরের সালাতের মধ্যে সূর্যোদয় হলে, জুমুআর সালাত আসরের ওয়াক্তে অনুপ্রবেশ করলে, যখম শুকিয়ে পট্টি পড়ে গেলে, মাযুর ব্যক্তির ওযর খতম হয়ে গেলে, উম্মী ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করলে, ইশারাকারী ব্যক্তি রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম হলে, অথবা মোযার উপর মাসেহ্কারী ব্যক্তির মাসেহের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পানি পাওয়া গেলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। পানি না পাইলে সালাত বাতিল হবে না। কারো কারো মতে এ অবস্থায়ও বাতিল হয়ে যাবে। অথবা মোযার উপর মাসেহ্কারী ব্যক্তির মোযা সামান্য নাড়াচাড়ার ফলে খুলে গেলে যেমন মোযা[১] এমন ঢিলা ছিল যে, তা খুলতে তেমন চেষ্টা করতে হয় না। বহু চেষ্টা করে যদি মোযা খোলা হয়, তবে সমস্ত ইমামর মতে তার সালাত পুরা হয়ে যাবে। অথবা উম্মীর কোন সূরা মুখস্থ হয়ে গেলে যেমন আকস্মিক কোন সূরা তার স্মরণ হয়ে গেল অথবা কোন কারীর নিকট শিক্ষা গ্রহণের কাজে আত্মনিয়োগ করা ব্যতিরেকে তার কাছ থেকে শুনে কোন সূরা তার মুখস্থ হয়ে গেল। যদি প্রকৃতপক্ষে কারীর নিকট উম্মী ব্যক্তি কোন সূরা শিক্ষা করে, তবে তার সালাতপুরা হয়ে যাবে। উম্মী সম্পর্কিত উপরোক্ত হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি উম্মী একা সালাত আদায় করে অথবা যে ক্ষেত্রে তার ইমামত জাইয এরূপ ক্ষেত্রে সে ইমামত করে। কিন্তু উম্মী যদি কোন কারীর পেছনে সালাত আদায় করে, তবে অধিকাংশ ইমামের মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। এটাই সহীহ্ মত (যহীরিয়া)। অথবা উলঙ্গ মুসল্লী এ পরিমাণ কাপড় প্রাপ্ত হলে যার দ্বারা সালাত আদায় করা তার জন্য জাইয, যেমন সে যে কাপড় পেয়েছে এর মাঝে এমন নাপাকী নেই, যা সালাত আদায় করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা প্রাপ্ত কাপড়ে নাপাকী তো আছে, কিন্তু তার নিকট নাপাকী দূর করার মত বস্তুও আছে অথবা নাপাকী দূর করার বস্তু তো নেই কিন্তু প্রাপ্ত কাপড়ের চতুর্থাংশ বা এর অধিক পাক, যার দ্বারা উক্ত ব্যক্তি সতর ঢাকতে পারে। অথবা তায়াম্মুমকারী মুসল্লীর সালাত আদায়ের অবস্থায় পানি ব্যবহারের উপর সক্ষম হলে অথবা সাহিবে তারতীব ব্যক্তির ছুটে যাওয়া সালাতের কথা স্মরণ হলে তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

উযূকারী ব্যক্তি যদি তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করে এবং মুক্তাদী যদি পানি দেখতে পায় অথবা কেউ যদি এমন ইমামের পেছনে ইকতেদা করে। যার যিম্মায় ফাইতা সালাত[২]

১. পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, মোযা বলতে চামড়ার মোযা।
২. পূর্বের অনাদায়ী সালাতসমূহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল, এমতাবস্থায় মুক্তাদীর যদি ইমামের ফাইতা সালাতের কথা বারবার মনে পড়ে, তবে শুধু মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হবে (তাবয়ীন)। উপরোক্ত অবস্থাসমূহের বাতিল হওয়া সালাত নফলে রূপান্তরিত হবে না। কিন্তু তিন অবস্থায় নফল হবে। অর্থাৎ ফাইতা (ছুটে যাওয়া) সালাতের কথা স্মরণ হলে, ফজরের সালাতে সূর্য উদিত হয়ে গেলে অথবা জুমুআর সালাতে যুহর ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে–এ তিন অবস্থায় ফরয নফলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। (আলজাওহারাতুন নায়্যারা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে এ বারটি মাসআলা। এর সাথে আরো কতিপয় মাসআলা সংযোজিত হল। (১) এক ব্যক্তি নাপাক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করছিল, সে যদি তা ধৌত করার মত কোন কিছু পায়। (২) কেউ কাযা আদায় করছিল এ অবস্থায় যদি মাকরূহ্ ওয়াক্ত চলে আসে। অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, বা সূর্যাস্তের সময় সূর্যোদয়ের সময় হয়ে গেল। (৩) কোন বাঁদী উড়নি ব্যতীত সালাত আদায় করছিল, এ সময় সে আযাদ হয়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের সতর ঢাকল না। উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসার পর বা সাহু সিজদার সময় সংঘটিত হয় তবে তার সালাত এবং ইমাম হলে পেছনের মুসল্লীদের সালাতও বাতিল হয়ে যাবে।

যিম্মায় সাহু সিজদা বাকী থাকা অবস্থায় যদি সে সালাম ফিরায় এবং এরপর উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি আপতিত হয়, তবে সিজদা করলে সালাত তার বাতিল হয়ে যাবে। অন্যথায় বাতিল হলে না। তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসার পর মুক্তাদীগণ যদি ইমামের আগে সালাম ফিরায়, এরপর উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি সংঘটিত হয় তবে ইমামের সালাত বাতিল হয়ে, যাবে। কিন্তু মুক্তাদীদের সালাত বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে ইমাম যদি সাহু সিজদা করে এবং মুক্তাদীগণ সাহু সিজদা না করে, এ অবস্থায় যদি উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি সংঘটিত হয়, তাহলেও ঐ হুকুম হবে (তাবয়ীন)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যে কারণে সালাত ফাসিদ হয় এবং যে কারণে মাকরূহ হয়

[এই পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে সব কারণে সালাত ফাসিদ হয়

১. মাসআলা ঃ যে সব কারণে সালাত ফাসিদ হয়, তা দুই প্রকার। (১) কথা, (২) কর্ম। প্রথম প্রকার হল কথাবার্তা। সালাত আদায়ের অবস্থায় যদি কেউ ভুলবশত বা জ্ঞাতসারে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বা বেশী কথা বলে, চাই তা নিজের সালাত শুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হোক, যেমন ইমাম বসার স্থানে দাঁড়িয়ে গেল, এ দেখে মুক্তাদী তাকে বলল, বসুন অথবা দাঁড়ানোর স্থানে ইমাম বসে গেল, এ দেখে মুক্তাদী তাকে বলল, বসে পড়ুন। অথবা নিজের সালাত শুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে না হোক এবং এ কথা যদি মানুষের পরস্পর কথাবার্তা বলার মত হয়, তবে আমাদের মাযহাব মতে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে (মুহীত)। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যদি কেউ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পূর্বে কথা বলে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ

হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি কেউ অন্যকে শুনিয়ে কথা বলে। কেউ যদি অন্যকে শুনিয়ে কথা না বলে, বরং নিজের আওয়ায নিজে শুনতে পায়, তবু তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)। যদি নিজেও শুনতে না পায়, কিন্তু অক্ষর সহীহ্ হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (যাহিদী)। "নাওয়াফিল" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সালাতে ঘুমন্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি কথা বলে, তবে পসন্দনীয় মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরালে[১] সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধারণায় সালাত ফিরায় যে, তার সালাত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। সালাতের কথা ভুলে গিয়ে কেউ যদি সালাম ফিরায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। সালাতের অবস্থায় কেউ যদি কাউকে সালাম দেয়, তবে সকল অবস্থায় তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (শরহে আবুল মাকারিম)। মাসবূক যদি এ ধারণায় সালাম ফিরায় যে, ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হয়, তবে এ সালাম ইচ্ছাকৃত সালামের মধ্যে গণ্য হবে, তাই তার জন্য "বিনা" করা জাইয নেই (খুলাসা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মাসবূক যদি ইমামের সাথে সালাম ফিরায়, তবে দেখতে হবে যে, বাকী সালাতের কথা তার স্মরণ ছিল কিনা? যদি স্মরণ থাকে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি বাকী সালাতের কথা স্মরণ না থাকে, তবে ফাসিদ হবে না। কেননা, এ সালাম তো ভুলবশত সালাম। এ সালাম কাউকে সালাতের তাহ্রীমা থেকে বের করে না (শরহুত তাহাবী ঃ সাহু সিজদা অনুচ্ছেদ)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি সালাতুল ঈশা আদায় করছিল। কিন্তু তারাবীহ মনে করে দুই রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে দিল অথবা যুহরের সালাতে জুমুআ মনে করে দুই রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে দিল অথবা মুকীম নিজেকে মুসাফির মনে করে দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাল, তাহলে সে পুনরায় নতুনভাবে সালাত আরম্ভ করবে। দুই রাকআতের পর তাকে চতুর্থ রাকআত মনে করে কেউ যদি সালাম ফিরায়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। বরং সালাত সমাপ্ত এবং পরে সাহু সিজদা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ প্রসঙ্গে মূল বিধান হল এই যে, সালামের মধ্যে যে ভুল হয় তা যদি মূল সালাতের মধ্যে হয়, তবে এতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি সালাতের আনুষাঙ্গিক ব্যাপারে হয়, তবে ফাসিদ হবে না (মুহীত ঃ সাহু সিজ্দা অনুচ্ছেদ)। সালাতের অবস্থায় কেউ যদি কাউকে সালাম দেয়ার ইচ্ছা করে এবং আস্সালামু বলার পর তার স্মরণ হয় যে, এ অবস্থায় সালাম দেয়া তার জন্য উচিত নয় এবং চুপ করে থাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি সালামের নিয়্যাতে মুসাফাহা করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এও কথাবার্তার শামিল। ইশারা করেও সালামের জওয়াব দিবে না। যদি ইশারা করে কেউ সালামের জওয়াব দেয় অথবা মুসল্লী থেকে কেউ কোন কিছু চাওয়ার পর সে হাত বা মাথা দ্বারা ইশারা করে, হা বা না বুঝায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। তবে মাকরূহ্ হবে (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ)।

১. অর্থাৎ সালাত শেষ হবার আগে, মাঝখানে।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির হাঁচি দেয়ার পর মুসল্লী যদি এর জওয়াবে "ইয়ার হামুকাল্লা" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীতায়ন)। হাঁচিদাতা ব্যক্তি যদি নিজেকে সম্বোধন করে "ইয়ারহামুকাল্লা" বলে, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই (খুলাসা)। সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ হাঁচি দিল অতঃপর অপর এক ব্যক্তি বলল, ইয়ারহামুকাল্লা। এরপর মুসল্লী বলল, আমীন, এতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ও মুহীত)। কেউ হাঁচি দেয়ার পর মুসল্লী যদি "আলহামদু লিল্লাহ্" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, এ বাক্যটি হাঁচির জওয়াব নয়। এর দ্বারা উক্ত মুসল্লী যদি জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা করে অথবা কোন কিছু বুঝাতে চায়, তবে সহীহ্ মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (তামারতাশী)। হাঁচিদাতা যদি "আল্হামদু লিল্লাহ্" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। অবশ্য এ দু'আ মনে মনে বলা উচিত। তবে হাঁচির দু'আ না পড়ে চুপ থাকাই তার জন্য উত্তম (খুলাসা)। হাঁচিদাতা যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় আলহামদু লিল্লাহ্ না বলে তবে সালাত শেষ করে সে "আলহামদু লিল্লাহ্" বলবে কি না? এ সম্পর্কে সহীহ্ মত হল, সালাত শেষে "আল্হামদু লিল্লাহ্" বলবে। মুক্তাদী হলে মনে মনেও "আল্হামদু লিল্লাহ্" বলবে না এবং সালাত শেষেও আল্হামদু লিল্লাহ্ বলা জরুরী নয় (তামারতাশী)।

৬. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি একত্রে সালাত আদায় করছে। এমতাবস্থায় একজন যদি হাঁচি দেয় এবং সালাতের বাইরে থেকে অপর ব্যক্তি যদি "ইয়ারহামুকাল্লা" বলে, অতঃপর মুসল্লী দু'জন যদি আমীন বলে, তবে হাঁচিদাতার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য জনের সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা সে তার জন্য দু'আ করেনি (যহীরিয়্যা ও ফাতাওয়া কাযীখান)। "ফাতাওয়ার" মাঝে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি হাঁচিদাতা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে ইয়ারহামুকাল্লা এবং দুই মুসল্লীর একজন শুনে বলে "আমীন", তবে যে আমীন বলবে, তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, সে তো তার জন্য দু'আ করেনি (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কুরআন পড়ে বা যিকির করে এবং এর দ্বারা কোন মানুষকে কোন কাজের আদেশ বা নিষেধ করা তার উদ্দেশ্য হয় তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সালাতে আছে এ কথা বুঝানো যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তবে ফাসিদ হবে না (তাহ্যীব)।

৮. মাসআলা ঃ ইমামের যদি ভুল হয় এবং মুক্তাদী "সুবহানাল্লাহ্" বলে, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এর দ্বারা সালাতের সংশোধনই কেবল তার উদ্দেশ্য। অবশ্য ইমাম যদি প্রথম বৈঠক বাদ দিয়ে পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায় তবে মুক্তাদী "সুবহানাল্লাহ্ বলবে না। কেননা, দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে গেলে ইমামের জন্য প্রত্যাবর্তন করা জাইয নেই। সুতরাং এ সময় 'সুবহানাল্লাহ্' বলার কোন অর্থ নেই। (আল বাহ্রুর রাইক ঃ বাদাই'–এর সূত্রে)। কেউ যদি নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লুকমা দেয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। অবশ্য এতে যদি তার তিলাওয়াত উদ্দেশ্য হয়, তালীম উদ্দেশ্য না হয়, তবে ফাসিদ হবে না (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখসী (র))।

একবার লুকমা দিলেই সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। বারংবার লুকমা দেয়া শর্ত নয়। এটাই বিশুদ্ধতম মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী ব্যতীত অন্য কেউ কোন মুসল্লীকে লুকমা দেয় এবং সে তার লুকমা গ্রহণ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)। কেউ যদি নিজের ইমামকে লুকমা দেয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, যে লোক ইমামকে লুকমা দিবে, সে তিলাওয়াতের নিয়্যাতে লুকমা দিবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুসারে লুকমাদাতা লুকমা দেয়ারই নিয়্যাত করবে– কিরাআতের নিয়্যাত করবে না। এ হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যদি কোন ইমাম ঐ পরিমাণ তিলাওয়াতের পূর্বেই আটকে যায় যতটুকু তিলাওয়াত করলে সালাত সহীহ্ হয় অথবা ঐ পরিমাণ তিলাওয়াত করার পর অন্য আয়াত আরম্ভ করার আগে যদি এ অবস্থা হয়। যতটুকু তিলাওয়াত করলে সালাত সহীহ্ হয়, ততটুকু তিলাওয়াত করার পর অথবা তিলাওয়াত করে অন্য আয়াত আরম্ভ করার পর কেউ যদি ইমামকে লুকমা দেয়, তবে লুকমাদাতার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ মতে লুকমাদাতার সালাত কোন অবস্থাতেই ফাসিদ হবে না এবং লুকমা গ্রহণ করার কারণে ইমামের সালাতও ফাসিদ হবে না (কাফী)।

১০. মাসআলা ঃ ভুল হওয়ার সাথে সাথে লুকমা দেয়া মুক্তাদীর জন্য মাকরূহ্। কেননা, সাথে সাথে ইমামের স্মরণ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিরাআত পড়া হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। মুক্তাদীদেরকে লুকমা দেয়ার জন্য বাধ্য করা ইমামের জন্য উচিত নয়। এরূপ করা ইমামের পেছনে মুক্তাদীদেরকে কিরাআত পাঠে বাধ্য করার শামিল, অথচ ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের কিরাআত পড়া মাকরূহ্। বরং যতটুকু কিরাআতের দ্বারা সালাত সহীহ্ হয়ে যায়, ততটুকু পড়া হলে রুকূতে চলে যাবে। আর এ পরিমাণ পড়া না হলে অন্য আয়াত আরম্ভ করবে (কাফী)। মুক্তাদীদেরকে বাধ্য করার মানে হল, কোন আয়াত বারবার পড়তে থাকা অথবা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। (নিহায়া)। কিরাআতের মধ্যে ইমাম আটকিয়ে গিয়েছে, অতঃপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক নেই এরূপ কোন ব্যক্তি যদি তাকে লুকমা দেয় এবং সাথে সাথে ইমামেরও আয়াত স্মরণ এসে যায়, তবে লুকমা শেষ হওয়ার আগেই ইমাম যদি তিলাওয়াত আরম্ভ করে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি শেষ হওয়ার পর ইমাম তিলাওয়াত আরম্ভ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, তার স্মরণ আসা এ ব্যক্তির লুকমার কারণেই হয়েছে। বালিগের নিকটবর্তী বালকের লুকমা বালিগ ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। জামাআতে শরীক নেই এরূপ কোন ব্যক্তির থেকে শুনে যদি মুক্তাদী ইমামকে লুকমা দেয়, তবে সকলের সালাতই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সালাতের বাইরের ব্যক্তি থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে (আল বাহ্রুর রাইক ঃ কিনয়ার সূত্রে)।

১১. মাসআলা ঃ দুঃসংবাদ শুনে কেউ যদি ইন্নালিল্লাহ্ পড়ে অথবা সুসংবাদ শুনে কেউ যদি আলহামদু লিল্লাহ পড়ে এবং এর দ্বারা তার জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা না করে থাকে অথবা এ কথা জানানোর ইচ্ছা করে থাকে যে, সে সালাত আদায়ে মশগুল আছে, তবে সমস্ত ইমামের ঐকমত্য অনুসারে তার সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

১২. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লীকে আশ্চর্যজনক সংবাদ দেয়ার পর সে যদি "সুবহানাল্লাহ্"–বা

'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ আকবর বলে এবং জওয়াবের নিয়্যাত[১] না করে, তবে কারো মতেই তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি সংবাদদাতার জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কোন কোন ফকীহ–এর মতে ফাসিদ হবে না। কেননা, এতো মানুষের এতো মানুষের কথার মত কথা নয়। "নিসাব"–এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (আল বাহরুর রাইক)।

১৩. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় চাঁদ দেখে কেউ যদি বলে رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। জ্বর বা অসুখের কারণে কেউ যদি কুরআন শরীফের কোন অংশ পড়ে পানাহ্ চায়, তবে সকলের মতেই তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (যহীরিয়্যা)। রোগী ব্যক্তি যদি দাঁড়ানো বা বসার সময় কষ্টের কারণে "বিসমিল্লাহ্" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে না। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। সদরুশ শহীদ (র) কর্তৃক প্রণীত "আলজামিউস সগীর" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" বলার দ্বারা কারো যদি জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে সকলের মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ যদি "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদ" অথবা "আল্লাহু আকবার" বলে এবং এর দ্বারা কারো জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা না করে, তবে সমস্ত ফকীহ্র ঐকমত্য অনুসারে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি কারো জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ফকীহ্র মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট মত।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় নবী করীম (সা)–এর প্রতি দুরূদ পাঠ করে এবং এর দ্বারা অন্যের জওয়াব উদ্দেশ্য না হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। অবশ্য নবী করীম (সা)–এর নাম শুনে কেউ যদি জওয়াব দেয়ার উদ্দেশ্যে দুরূদ শরীফ পড়ে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ পড়ার পর কেউ যদি সালাতের অবস্থায় নবী (সা)–এর প্রতি দুরূদ পাঠ করে, তবে উক্ত ব্যক্তির সালাত ফাসিদ হবে না। অনুরূপ কেউ এমন আয়াত তিলাওয়াত করল, যার মধ্যে শয়তানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তিলাওয়াত শুনে কোন মুসল্লী যদি لَعْنَةُ اللّٰهِ বলে তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না।

১৫. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি চীৎকার করে এ কথা ঘোষণা করে যে, "তোমরা মুশকিল আসানের জন্য ফাতিহা পড়" এবং তার এ কথা শুনে কোন মাসবূক মুসল্লী যদি ফাতিহা পাঠ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এর উপরই ফাতওয়া (খুলাসা)। কেউ যদি কুরআনের আয়াত কবিতার ন্যায় পাঠ করে, যেমন বলল ঃ

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

অথবা বলল ঃ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ – وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

১. স্মর্তব্য যে, জওয়াব অর্থে ঃ এক দু'আ পড়া বা সংবাদে যেসব দু'আ পড়ার বিধান আছে এই মুসল্লী সেই উদ্দেশ্যে এইসব দু'আ পড়ে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইত্যাদি। এবং আয়াত পড়ে কবিতা পাঠের নিয়্যাত করে , তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি মনে মনে কোন কবিতা বা বক্তৃতা আওড়ায়, কিন্তু উচ্চারণ করে না বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু এরূপ করা ভাল নয় (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)।

১৬. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ যদি চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে এবং চিন্তা করতে করতে কোন হাদীছ বা কবিতা বা কোন বক্তৃতা বা কোন মাসআলা স্মরণ হয়, তবে মাকরূহ্ হবে। কিন্তু সালাত ফাসিদ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। সালাত আদায়ের অবস্থায় কারো মুখ থেকে যদি শব্দ নিঃসৃত হয় এবং এরূপ বলা যদি তার অভ্যাসগত ব্যাপার হয়, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি এরূপ না হয় তবে ফাসিদ হবে না। কেননা, এরূপ বলা শেষ পর্যন্ত আল-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখসী (র))।

১৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ফারসীতে আরে বলে, তবে তার হুকুম বলার হুকুমের মতই। যদি অভ্যাসগতভাবে বলে থাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ না হয় তবে ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় যদি এমন দু'আ করা হয়, যা মানুষের নিকট চাওয়া অসম্ভব। যেমন মাগফিরাত, সুস্থতা এবং রিযিকের জন্য দু'আ করা। যেমন কেউ বলল, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي বা اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَجَّ এতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যে জিনিস মানুষের নিকট চাওয়া অসম্ভব নয় এমন জিনিসের জন্য কেউ যদি দু'আ করে যেমন, বলল, اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْنِي হে আল্লাহ্ আমাকে খাওয়াও। اَللّٰهُمَّ اقْضِ دَيْنِي হে আল্লাহ্! আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও বা اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِي হে আল্লাহ্! আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي فُلَانَةَ হে আল্লাহ্! অমুক মহিলার খানার ব্যবস্থা কর। এরূপ বললে, সহীহ্ মত অনুসারে তার সালাত পরস্পর আলোচনার মধ্যে বলে থাকে। যদি কেউ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করে দিন" বলে তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, এ শব্দটি কুরআন শরীফে বিদ্যমান আছে। কেউ যদি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِي "হে আল্লাহ্! আমার ভাইকে মাফ করে দিন" বলে, তবে শায়খ আবুল ফযল বুখারীর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, এ বাক্যটিও আল-কুরআনে মওজুদ আছে। (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأُمِّي أَوْ لِعَمِّي أَوْ لِخَالِي أَوْ لِزَيْدٍ "হে আল্লাহ্! আমার মা, আমার চাচা, আমার মামা অথবা যায়দকে মাফ করে দিন" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৯. মাসআলা ঃ ইমামের ভয়-ভীতি বা উৎসাহব্যঞ্জক আয়াত পাঠ করার পর মুক্তাদী যদি صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ "আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং রাসূলগণ তা পৌছিয়েছেন বলে, তবে তার এ বলা ভাল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু এতে তার সালাত ফাসিদও হবে না।

(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও যহীরিয়্যা)। কোন মুসল্লী যদি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا পড়ার সময় মাথা উত্তোলন করে لَبَّيْكَ سَيِّدِي "হে মনিব! আমি উপস্থিত আছি" বলে, তবে এ সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, এ রূপ না করা ভাল। তথাপিও যদি কেউ করে, তবে কোন কোন ফকীহ্‌র মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। এটাই সহীহ্ মত ঃ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান কুরআন পাঠ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ)।

২০. মাসআলা ঃ কোন হাজী যদি সালাতের মধ্যে "লাব্বায়কা" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। আয়্যামে তাশরীকের মধ্যে কেউ যদি "আল্লাহ্ আকবর" বলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সালাতের মধ্যে কেউ যদি আযানের বাক্য আযানের নিয়্যাতে উচ্চারণ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)। আযান শুনে কেউ যদি মুআয্যিনের অনুরূপ বলে এবং এর দ্বারা জওয়াব দেয়ার নিয়্যাত করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি জওয়াব দেয়ার নিয়্যাত না থাকে, তবে ফাসিদ হবে না। যদি তার কোন প্রকার নিয়্যাত না থাকে, শুধু আযানের শব্দ উচ্চারণ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। শয়তান কারো দিলে কুমন্ত্রণা দেয়ার পর কেউ যদি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ পড়ে তবে দেখতে হবে যে, এ কুমন্ত্রণা যদি আখিরাতের বিষয়ে হয়, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যদি দুনিয়া সম্বন্ধে হয়, তবে ফাসিদ হয়ে যাবে (তামারতাশী)।

২১. মাসআলা ঃ সালাত শেষে কেউ যদি তাশাহ্‌হুদ পড়া ভুলে যায় এবং সালাম ফিরায়, অতঃপর স্মরণ হওয়ার পর তাশাহ্‌হুদ পড়তে আরম্ভ করে এবং কতটুকু পড়ার পর তাশাহ্‌হুদ শেষ না করে যদি পুনরায় সালাম ফিরায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, তার প্রথম বৈঠক তাশাহ্‌হুদ পড়তে আরম্ভ করার কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাশাহ্‌হুদ শেষ করার আগে সালাম ফিরানোর কারণে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, তাশাহ্‌হুদ আরম্ভ করার কারণে তার প্রথম বারের বসা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়নি। শুধু এতটুকু বাতিল হয়েছে। যতটুকু সে তাশাহ্‌হুদ পড়েছে অথবা কিছুই বাতিল হয়নি। কেননা, তাশাহ্‌হুদ পড়ার স্থান হল বৈঠক, তা বাতিল করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এর উপরই ফাতওয়া। এ কারণেই যে মাসআলার মধ্যে কোন রিওয়ায়েত ? এ সম্পর্কে মাশায়খদের মাঝে মতভেদ আছে। যেমন কোন মুসল্লী সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়া ভুলে রুকূতে চলে গেল, রুকূর মধ্যে এ ভুলের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র পুনরায় দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তে আরম্ভ করল। অতঃপর লজ্জিত হয়ে রুকূ না করে সিজদায় চলে গেল। এমতাবস্থায় কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সে যখন কিরাআত পড়তে আরম্ভ করেছে, তখন তার রুকূ বাতিল হয়ে গিয়েছে, অতঃপর পুনরায় সে যেহেতু রুকূ করেনি, তাই তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে পূর্ণ রুকূ বাতিল হবে না। অথবা কিছুই বাতিল হবে না। কেননা, কিরাআত পড়লে রুকূ বাতিল হয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেতো। সে যেহেতু কিরাআতই পড়েনি, তাই সে কিছুই করেনি মনে করা হবে। সুতরাং রুকূ বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় কেউ যদি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে এবং যদি কোন শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে এ যদি জান্নাত বা জাহান্নামের আলোচনার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যথা বা বিপদের কারণে হয়ে থাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। অধিক গুনাহের কারণে কেউ যদি হাউমাউ করে কাঁদে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। সালাতে কেউ যদি অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করে এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। "আনীন" মানে হল, আহ্ আহ্ শব্দ করে কাঁদা। "আওয়াহ" মানে হল, উহ্, উহ্ করে ক্রন্দন করা (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি "আখ্ আখ্" বলে, তবে সমস্ত ইমামের ঐকমত্য অনুসারে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি তার আওয়ায শ্রুত না হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। কেননা, এ মানুষের কথার মত কথা নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজের সিজদার স্থানে ফুঁক দিয়ে ধুলা পরিষ্কার করে এবং এতে যদি কোন শব্দ না হয়, শ্বাস গ্রহণের মত হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা মাকরূহ্। আর যদি আওয়ায শোনা যায় এবং এর দ্বারা বর্ণমালা সৃষ্টি হয়, তবে তা কথাবার্তা বলার মতই। এতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি "সর" বলে কোন পশুকে তাড়ায় অথবা "দূর" বলে কোন কুকুরকে তাড়ায়, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি এমনভাবে তাড়ায় যে, বর্ণমালা সৃষ্টি হয় না, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কোন শব্দ এবং বর্ণমালার মাধ্যমে যদি কেউ বিড়াল ডাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি বর্ণমালা ব্যতিরেকে এমনি আওয়ায করে ডাকে, তবে ফাসিদ হবে না। এমনিভাবে কোন শব্দমালার দ্বারা যদি বিড়ালকে তাড়ান হয় তবু সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যখীরা)। বিনা ওযরে গলা খাঁকার দিলে এবং এতে যদি কোন বর্ণমালা সৃষ্টি হয়, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (তাবয়ীন)। যদি কোন শব্দ সৃষ্টি না হয়, তবে ফকীহ্দের ঐকমত্য অনুসারে ফাসিদ হবে না। তবে মাকরূহ্ হবে (বাহ্রুর রাইক)।

২৫. মাসআলা ঃ ওযরের কারণে বাধ্য হয়ে গলা খাকার দিলে সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে ওযরের কারণে কেউ যদি উহ্-আহ্ করে কাঁদে যেমন কেউ এমন অসুস্থ যে, এধরনের শব্দ না করে সে পারে না, তবে এভাবে ক্রন্দন করাকে হাঁচি এবং ঢেকুর দেয়ার মত ধরে নেয়া হবে এবং এতে সালাত ফাসিদ হবে না। হাঁচি বা ঢেকুর দেয়ার কারণে যদি শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। আওয়ায ঠিক করার জন্য অথবা আওয়ায সুন্দর করার জন্য কেউ যদি গলা খাঁকার দেয়, তবে সহীহ্ মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম ভুল করার পর মুক্তাদীদের কেউ যদি তাকে এসম্পর্কে নির্দেশনা করার নিমিত্তে গলা খাঁকার দেয়, তবে তার সালাতও ফাসিদ হবে না। "গায়া" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, "আমি সালাত আদায়ে রত আছি" এ কথা বুঝানোর জন্য কেউ যদি গলা খাঁকার দেয়, তবে এতেও তার সালাত ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)।

২৬. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কেউ যদি কুরআন শরীফ দেখে কিরাআত পড়ে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল হল এই যে, কুরআন শরীফ বহন করা, পাতা উল্টানো এবং এর প্রতি নযর করা আমলে কাছীরের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এ না করেও সালাত আদায় করা যায়। উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, কোন মুসল্লীর সামনে রেহালের উপর যদি কুরআন শরীফ থাকে এবং সে তা না উঠায় এবং এর পাতা না উল্টায় অথবা মিহ্রাবে ' লিখিত আয়াত যদি কেউ পাঠ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দ্বিতীয় দলীল হল এই যে, কুরআন শরীফ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা সালাতের অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ নয়। এ হিসাবে কুরআন শরীফ উঠানো বা না উঠানো উভয়ই হচ্ছে সমান। সুতরাং কুরআন শরীফ দেখে কিরাআত পাঠ করলে সর্বাবস্থায় সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই সহীহ্ মত (কাফী)।

২৭. মাসআলা ঃ কুরআন শরীফ উঠানো ব্যতিরেকে কোন হাফিয ব্যক্তি যদি কোন লিখা দেখে কিরাআত পড়ে, তবে ফকীহ্দের মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, সে কুরআন শরীফ উঠায়ওনি এবং কুরআন থেকে শিক্ষাও গ্রহণ করেনি। কুরআন শরীফ সামান্য দেখে পড়া এবং বেশী দেখে পড়ার মাঝে মুখতাসার ও জামি' সগীরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কোন মাশাইখ বলেন, কেউ যদি এক আয়াত পরিমাণ তিলওয়াত করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। তা না হলে ফাসিদ হবে না। কেউ কেউ বলেন, সূরা ফাতিহার সমপরিমাণ দেখে তিলাওয়াত করলে সালাত ফাসিদ হবে। অন্যথায় ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। লিখিত কুরআনের প্রতি কারো যদি নজর পড়ে এবং সে তা বুঝে ফেলে, তবে মতভেদ ছাড়া তার সালাত জাইয হবে (তাতরখানিয়্যা)।

২৮. মাসআলা ঃ মিহ্রাবের মধ্যে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু যদি লিখা থাকে এবং তার দিকে যদি মুসল্লী নজর করে ও চিন্তা করার পর তার মর্ম উপলব্ধি করে ফেলে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আমাদের ফকীহ্গণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যখীরা)। অবশ্য বিশুদ্ধ মতে সমস্ত ফকীহ্র ঐকমত্য হল, তার সালাত ফাসিদ হবে না (হিদায়া)। সহীহ্ মতে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে বুঝার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (তাবয়ীন)। সালাতে কেউ যদি ইনজীল, তাওরাত বা যাবূরের কিছু অংশ পাঠ করে, তবে সে ভাল ভাবে কুরআন পড়তে জানুক বা না জানুক তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় প্রকার হল কর্ম, যার দ্বারা সালাত ফাসিদ হয়ে যায়। আমলে কাছীর-এর দ্বারা সালাত ফাসিদ হয়ে যায়। আমলে কালীল তথা সামান্য কর্মের দ্বারা সালাত ফাসিদ হয় না (মুহীত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))। আমলে কাছীর এবং আমলে কালীলে সীমা কি? এ সম্পর্কে ইমামদের তিন ধরনের মতামত বিদ্যামান রয়েছে।

(১) যে কাজ করতে সাধারণত উভয় হাত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তাকে আমলে কাছীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে। যদিও কোন ব্যক্তি এধরনের কাজে এক হাত ব্যবহার করে। যেমন পাগড়ী পরিধান করা, জামা পরিধান করা, পায়জামা পরিধান করা এবং ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। আর যে কাজ করতে সাধারণত এক হাত ব্যবহার করতে হয়, তাকে আমলে কালীল বলে। যদি কেউ এধরনের কাজে উভয় হাত ব্যবহার করে থাকে। যেমন জামা ও পায়জামা খোলা, টুপি পরিধান করা ও খোলা এবং লাগাম খোলা ইত্যাদি (তাবয়ীন)। এক হাত দিয়ে যে কাজ করা হয়, তা আমলে কালীল। যতক্ষণ না তা বারংবার করা হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(২) আমলে কাছীর ও আমলে কালীলের সীমা নির্ধারণের বিষয়টি মুসল্লীর মতামতের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। সে যাকে আমলে কাছীর মনে করবে, তাই হবে আমলে কাছীর আর যাকে আমলে কালীল মনে করবে, তাই হবে আমলে কালীল। এ বর্ণনাটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের অধিক নিকটবর্তী।

(৩) কোন ব্যক্তি যদি মুসল্লীকে দূর থেকে দেখে নিশ্চিতভাবে এ কথা মনে করে যে, সে নিঃসন্দেহে সালাত আদায়ে মশগুল নয়, তবে এটাই হবে আমলে কাছীর এবং এ ধরনের কোন কর্ম করলে মুসল্লীর সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি কারো ব্যাপারে দর্শকের সন্দেহ হয়, তবে এরূপ কর্মের দ্বারা সালাত ফাসিদ হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন)। এবং এটাই উত্তম মত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। অধিকাংশ ফকীহ্ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)।

৩০. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় কেউ যদি গলায় তরবারি লটকায় অথবা গা থেকে তরবারি খোলে, তবে এতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি চাদর পরিধান করে অথবা এক হাতে কোন হালকা বস্তু উঠায় অথবা কোন বাচ্চা বা কাপড় যদি কেউ নিজের কাঁধের উপর তুলে নেয়, তবে এতে তার সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি এমন কোন বস্তু উঠায় যা উঠাতে কষ্ট হয় এবং ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

৩১. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পানাহার করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কারো দাঁতের মাঝখানে যদি খাদ্য লাগা থাকে এবং সে তা গিলে ফেলে, তবে তা যদি চনা (ছোলা) বুটের চেয়ে ছোট হয়, তাহলে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। যদি চনা বুটের সমান হয়, তবে ফাসিদ হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ঃ ফাতাওয়ার সূত্রে, তাবয়ীন, বাদাই' এবং শরহুত তাহাবী)। আল্লামা বাক্কালী (র) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম মত (বারজুন্দী)।

৩২. মাসআলা ঃ দাঁতের মাঝে আটকিয়ে থাকা রক্ত যদি কেউ গিলে ফেলে এবং রক্তের উপর থুথু যদি প্রবল হয় তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। 'নিসাবের' মধ্যে উল্লেখ আছে যে, সালাত আরম্ভ করার পূর্বে কেউ যদি পানাহার করে, অতঃপর সালাত আরম্ভ করে, এমতাবস্থায় খাদ্য ও পানীয় বস্তু থেকে সামান্য পরিমাণ যদি তার মুখে বাকী থেকে যায় এবং সালাতের অবস্থায় সে তা খায় বা পান করে, তবে এতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। এর

উপরই ফাতওয়া। অনুরূপভাবে সালাত আদায়ের অবস্থায় দাঁতের ফাঁকে আটকিয়ে থাকা কোন বস্তু কেউ যদি গিলে ফেলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যদিও তা বুটের সমপরিমাণ হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত (মুযমারাত)।

৩৩. মাসআলা ঃ দাঁত হতে নির্গত রক্ত কেউ যদি গিলে ফেলে এবং তা যদি মুখভরা পরিমাণ না হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, খুলাসা ও মুহীত)। মুসল্লী যদি মুখের বাইরে থেকে একটি তিল তুলে মুখে দিয়ে তা গিলে ফেলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। মিষ্টান্ন খেয়ে এবং গলাধকরণ করে কেউ যদি সালাত আরম্ভ করে এবং সালাতের অবস্থায় মুখে মিঠা মিঠা ভাব অনুভূত হয় এবং তা গিলে ফেলে এতে সালাত ফাসিদ হবে না। মুখে মিছরি বা চিনি রেখে না চিবিয়ে কেউ যদি সালাত আরম্ভ করে এবং এর মধুরতা পেটের ভেতর পৌঁছতে থাকে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। এটাই উত্তম মত (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি লাসাযুক্ত বস্তু খুব বেশী চিবায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৩৪. মাসআলা ঃ সুপারি চিবানোর পর তা যদি টুকরা না হয়, তাই যদি বেশী চিবায়, তাহলে আমলে কাছীর হওয়ার কারণে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি টুকরা হয় এবং এর কোন অংশ গলা দিয়ে প্রবেশ করে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদিও তা পরিমাণে কম হয়। যদি না চিবায় এবং এ থুথু গলার ভেতর প্রবেশ করে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। মুখে বৃষ্টির ফোঁটা বা বরফের টুকরা প্রবেশ করার পর কেউ যদি তা গিলে ফেলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৫. মাসআলা ঃ মুসল্লী যদি সালাতের ভেতর চেরাগের সলিতা উঠায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি চেরাগের ভেতর সলিতা ঢুকায়, তবে তার সালাতও বাতিল হবে না। কেননা, এ কাজ আমলে কালীলের অন্তর্ভুক্ত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ঃ ফাতাওয়ার সূত্রে)।

৩৬. মসআলা ঃ কেউ যদি মুখ ভরে বমি করে, তবে তার তাহ্‌রাত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সালাত বাতিল হবে না। যদি মুখ ভরে বমি না হয়, তবে উযূও ভঙ্গ হবে না এবং সালাতও ফাসিদ হবে না। মুখ ভরা বমি কেউ যদি গিলে ফেলে অথচ ইচ্ছা করলে সে তা ফেলে দিতে পারত, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি মুখ ভরা পরিমাণ না হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ মতটিই অধিক সতর্কতাপূর্ণ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি ইচ্ছা করে বমি করে এবং তা মুখ ভরে না হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি মুখ ভরে হয়, তবে ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লী যদি সালাত আদায়ের অবস্থায় হাঁটে, কিবলার দিকে হাঁটে এবং সে যদি লাহিক না হয় এবং মসজিদ থেকে বের না হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর ময়দানে সালাত আদায় করলে তার সালাত বাতিল হবে না কাতারের সীমানা অতিক্রম না

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা পর্যন্ত (মুনিয়্যা)। যদি কিবলার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কোন মুসল্লী যদি এক কাতার পরিমাণ হাঁটে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। যদি এক সাথে দুই কাতার পরিমাণ হাঁটে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি এক কাতার পরিমাণ হেঁটে সামান্য কিছুক্ষণ থেমে থাকে, অতঃপর এক কাতার পরিমাণ হাঁটে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হাত উত্তোলন করার কারণে সালাত ফাসিদ হয় না।

৩৮. মাসআলা ঃ দুই পা ছড়িয়ে কেউ যদি গাধা হাঁকায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি এক পা দিয়ে হাঁকানো হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি এক পা নাড়ায়, কিন্তু সব সময় না নাড়ায় তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর কেউ যদি উভয় পা নাড়ায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে ফকীহ্গণ দুই পা নাড়ানোর বিষয়টিকে দুই হাত নাড়ানোর উপর এবং এক পা নাড়ানোর বিষয়টিকে এক হাত নাড়ানোর উপর কিয়াস করেছেন। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে কেউ যদি উভয় পা হালকা বা মৃদু নাড়ায়, তবে তা, সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত)। এটাই যুক্তিসম্মত কথা (বাহ্রুর রাইক)।

৩৯. মাসআলা ঃ বিনা ওযরে কেউ যদি কিবলা থেকে বুক ফিরায়, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ যদি শুধু চেহারা ফিরায়, বক্ষ না ফিরায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (যাহিদী)। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যদি সাথে সাথে মুখ কিবলার দিকে ফিরিয়ে নেয় (যখীরা)। কেউ যদি সালাতের অবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহণ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এ কাজ দু'হাত ব্যবহার করা ব্যতীত পুরা হয় না। কোন মুসল্লী যদি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসল্লীকে উপরের দিকে উঠিয়ে পুনরায় ঐস্থানে রেখে দেয় এবং কিবলার দিক হতে তার মুখ না ফিরায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু কোন মুসল্লীকে স্বস্থান থেকে উঠিয়ে যদি কোন জানোয়ারের উপর বসিয়ে দেয়া হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বিনা ওযরে কেউ যদি ইমাম থেকে আগে বেড়ে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪১. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে ফযলীর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি মাঠে সালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় সে যদি নিজের দাঁড়ানোর স্থান হতে সিজদা করা পরিমাণ জায়গা পেছনে সরে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। সিজদা পরিমাণ জায়গা পেছনে, ডানে, বামে এ হুকুমের মধ্যে শামিল হবে এবং এর হুকুম মসজিদের হুকুমের ন্যায় হবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসল্লী এ পরিমাণ স্থান থেকে না সরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মসজিদ হতে বের হয়েছে বলে মনে করা হবে না। এ ক্ষেত্রে রেখা টেনে নেয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, কেউ যদি রেখা টেনে নয় এবং রেখা হতে বের না হয় কিন্তু সিজদা পরিমাণ জায়গা হতে বের হয়ে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ ইকতেদা সহীহ্ হওয়ার শর্ত কী এবং কোন কারণে ইকতেদা সহীহ্ হয় না অনুচ্ছেদ)।

৪২. মাসাআলা ঃ কাতারের মধ্যে জায়গা খালি ছিল, তাই কেউ এতে প্রবেশ করল।

অতঃপর অপর কোন মুসল্লী যদি এ কাতারে জায়গা খালি হয়ে যাওয়ার কারণে অন্য কাতারে চলে যায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (খাযানাতুল ফাতাওয়া ও কিনয়া)।

৪৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে মাগরিবের সালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এসে নফলের নিয়্যাতে তাঁর পেছনে মাগরিবের ইকতেদা করল। অতঃপর ইমাম তৃতীয় রাকআত শেষে না বসে যদি ভুলক্রমে চতুর্থ রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং মুক্তাদীও তার অনুসরণ করে, তবে ফকীহ্দের মতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ ইমামের পেছনে কার ইকতেদা সহীহ্ অনুচ্ছেদ)।

৪৪. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় সাপ-বিচ্ছু মারাতে সালাত ফাসিদ হয় না। চাই এক আঘাতে মারুক বা কয়েক আঘাতে মারুক। এটাই সুস্পষ্ট মতামত। মাজমুউন নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ঘটনা যদি কোন মুক্তাদীর ঘটে এবং জুতা হাতে নিয়ে যদি সে সাপ- বিচ্ছুর দিকে অগ্রসর হয় এবং ইমাম থেকে আগেও বেড়ে যায়, তথাপি তার সালাত ফাসিদ হবে না (খুলাসা)। এক্ষেত্রে সমস্ত সাপের হুকুম একই। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)।

৪৫. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় সাপ-বিচ্ছু মারা তখনই জাইয হবে যদি সাপ-বিচ্ছু মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং তাকে আক্রমণ করার আশংকা থাকে। কিন্তু যদি ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে (মুহীত)। কোন মুসল্লী যদি একাধারে তিনটি পাথর নিক্ষেপ করে অথবা একাধারে উকুন মারে বা একাধারে তিনটি চুল উৎপাটিত করে কিংবা চোখে সুরমা লাগায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। হুজ্জত কিতাবে উল্লেখ আছে, কোন কোন মাশাইখ বলেন, কেউ যদি হাত খুলে খুব শক্তি দিয়ে শূন্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করে তবে এক পাথরেই তা সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (তাতার খানিয়্যা)।

৪৬. মাসআলা ঃ হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, জানোয়ারের উপর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি জানোয়ারের গতিকে দ্রুত করার জন্য যদি তাকে প্রহার করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, একবার-দুইবার মারাতে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি একই রাকআতে তিনবার প্রহার করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ একাধারে প্রহার করলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (মুহীত)। কোন মুসল্লী যদি কোন মানুষকে একহাত দিয়ে বা চাবুক দিয়ে প্রহার করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুনিয়্যাতুল মুসল্লী)

৪৭. মাসআলা ঃ কোন পাখির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করাতে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু মাকরূহ্ হবে (খুলাসা)। সালাতের অবস্থায় পা থেকে ঢিলা মোযা খোলার কারণে সালাত ফাসিদ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী (র))। মোযা পরিধান করলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ যদি কোন পশুর মাথায় লাগাম বাঁধে অথবা জানোয়ারের যীন ধরে টানে বা যীন খসায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৮. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় কেউ যদি তিন শব্দ পরিমাণ লিখে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এর চেয়ে কম হলে ফাসিদ হবে না। ফাতাওয়ার মধ্যে আছে যে, তিন শব্দের কথা "মাজমূউন নাওয়াযিল" কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে (খুলাসা)। যদি শূন্যে অথবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজের শরীরে এমন কিছু লিখা হয়, যা প্রকাশ হয় না, তবে এসব লিখা পরিমাণে বেশী হলেও সালাত ফাসিদ হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি দরজা বন্ধ করে, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু বন্ধ করা দরজা যদি খোলে, তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা ঃ কোন বাচ্চা যদি সালাতরত কোন মহিলার স্তন চোষে এবং এর থেকে দুগ্ধ বের হয়, তবে মহিলার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর বের না হলে সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, দুধ বের হলে তা পান করানো হল, আর বের না হলে পান করানো হল না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। শিশু তিনবার স্তন্য চোষলে দুধ বের না হলেও সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)।

৫০. মাসআলা ঃ সালাতরত কোন মহিলার সাথে তার স্বামী যদি উভয় উরুর মাঝে সহবাস করে, তবে বীর্যপাত না হলেও এবং আর্দ্রতা প্রকাশ না পেলেও তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে কামোদ্দীপনার সাথে অথবা কামোদ্দীপনা ব্যতিরেকে চুম্বন করে অথবা কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করে, তবে স্ত্রীলোকটির সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু কোন মহিলা যদি তার স্বামী মুসল্লীকে চুম্বন করে এবং এতে তার মধ্যে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি না হয়, তবে পুরুষের সালাত ফাসিদ হবে না।

৫১. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় কোন মুসল্লী যদি রজঈ তালাক দেয়া তার স্ত্রীর প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে নজর করে, তবে এতে রজ'আত হয়ে যাবে। কিন্তু মুসল্লীর সালাত ফাসিদ হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)।

৫২. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় কেউ যদি মাথায় অথবা দাড়িতে তৈল দেয় অথবা মাথায় যদি গোলাপ জলের পানি দেয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যদি বোতল থেকে তৈল ঢেলে মাথায় দেয়া হয়। কিন্তু যদি হাতের মধ্যে তৈল থাকে এবং ঐ তৈল মাথায় বা দাড়িতে মাখা হয়, তবে এতে সালাত ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সালাতে দাড়ি আঁচড়ালে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। একই রুক্‌নের মধ্যে কেউ যদি তিনবার শরীর চুলকায়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যদি প্রত্যেক বার হাত উঠিয়ে চুলকানো হয়। যদি প্রত্যেক বার হাত উঠিয়ে চুলকানো না হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না। একবার চুলকানো মাকরূহ্ (খুলাসা)।

৫৩. মাসআলা ঃ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে সিজদার স্থানের মাঝ দিয়ে কেউ যদি অতিবাহিত হয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। অবশ্য অতিক্রমকারী ব্যক্তি গুনাহ্‌গার হবে। মুসল্লীর সম্মুখে যে স্থান দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ্, তা নিরূপণ করার ক্ষেত্রে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে মুসল্লীর পায়ের জায়গা হতে সিজদার স্থানের মধ্য দিয়ে যাওয়া মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। আমাদের মাশাইখদের মতে কোন ব্যক্তি যদি সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে সালাত আদায় করে এবং এ সময় যদি কোন ব্যক্তি ঐ স্থান দিয়ে হেঁটে যায় এবং চলে যাওয়া ব্যক্তির উপর যদি তার নজর পতিত না হয়, তাহলে মাকরূহ্ হবে না। এটাই সহীহ্ মত (খুলাসা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (বাদাই')। এ মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত (নিহায়া)। এ হল ময়দানে সালাত আদায় করার হুকুম। যদি মসজিদের মধ্যে হয় এবং মুসল্লী ও অতিক্রমকারী ব্যক্তির মাঝে কোন আড় থাকে অর্থাৎ মানুষ বা কোন খুঁটি যদি থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে না। আর যদি কোন আড় না থাকে এবং মসজিদ ছোট হয়, তবে সম্মুখের যে কোন স্থান দিয়ে যাওয়া মাকরূহ্। বড় মসজিদের হুকুম ময়দানের হুকুমের মতই (কাফী)।

৫৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি দোকানে সালাত আদায় করে এবং তার সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়, তবে অতিক্রমকারীর অঙ্গ যদি মুসল্লীর অঙ্গের সামনা-সামনি হয়, তাহলে মাকরূহ্ হবে। অন্যথায় মাকরূহ্ হবে না (মুহীতঃসুরুখ্সী)। সমান সমান হয়ে যদি দুই ব্যক্তি কোন মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হয়, তবে মুসল্লীর নিকট দিয়ে যে যাবে তার জন্য এরূপ করা মাকরূহ্ (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। সওয়ারীর উপর আরোহণকারী ব্যক্তি যদি মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যেতে চায়, তবে তার জন্য হীলা হচ্ছে এই যে, সে সওয়ারীকে আড় করে চলে যাবে। সওয়ারী তার জন্য সুতরা হবে এবং এতে সে গুনাহ্‌গার হবে না (নিহায়া)।

৫৫. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তি যদি মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যেতে চায়, তবে এক ব্যক্তি মুসল্লীর সামনে দাঁড়াবে এবং অপরজন তাকে আড় করে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তিও অনুরূপভাবে পথ অতিক্রম করবে (কিনয়া)।

৫৬. মাসআলা ঃ ময়দানে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির জন্য উচিত হল সম্মুখে সুতরা খাড়া করে সালাত আদায় করা। আঙ্গুল পরিমাণ মোটা এবং একহাত লম্বা সুতরা খাড়া করবে। সুতরার নিকটবর্তী হয়ে সুতরাকে ডানে বা বামে রেখে দাঁড়াবে। তবে ডান দিকে রেখে দাঁড়ানো উত্তম (তাবয়ীন)। যদি কাঠ খাড়া করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা ফেলে রাখবে (কাফী)। একদল ফকীহ্ এ মতটিকে সত্যায়ন করেছেন। তন্মধ্যে কাযীখান ও জামিউস সগীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে এমতটিকে সত্যায়ন করেছেন (বাহ্‌রুর রাইক)। খুলাসার মধ্যে আছে যে, এ মতটিই হল বিশুদ্ধতম মত। কিনয়ার মাঝে বর্ণিত আছে যে, এটাই পসন্দনীয় মত (শরহু আবিল মাকারিম)। যদি রেখে দিতে হয়, তবে লম্বা করে রাখবে, চওড়া করে রাখবে না (তাবয়ীন)।

৫৭. মাসআলা ঃ কারো কাছে যদি কোন কাঠ না থাকে বা পুঁতে রাখার মত বা ফেলে রাখার মত কোন বস্তু না থাকে, তবে সে সামনে রেখা টেনে নিবে কিনা এ সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ্র মত হল, সে রেখা টেনে নিবে না। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর একটি বর্ণনা। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, সে রেখা টেনে নিবে। এটাও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর একটি বর্ণনা। যারা রেখা টেনে নেয়ার কথা বলেন, তাদের মধ্যেও এর ধরন নিয়ে ভীষণ মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, লম্বা করে রেখা টেনে নিবে। আর কেউ কেউ বলেন, সামনে মিহরাবের মত বানিয়ে নিবে (মুহীত)। সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তির পথ অতিক্রম করার যদি আশংকা না থাকে এবং রাস্তামুখী হয়েও না দাঁড়ায়, তবে সুতরা বর্জন করাতে কোন দোষ নেই (তাবয়ীন)।

৫৮. মাসআলা ঃ ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্যও যথেষ্ট। মুক্তাদীর সামনে যদি সুতরা না থাকে এবং তার সম্মুখ দিয়ে কেউ যদি যেতে চায় অথবা সুতরা ও মুক্তাদীর মাঝ দিয়ে কেউ যদি যেতে চায়, তবে মুসল্লী তাকে ইশারা করে বা তাসবীহ পাঠ করে বাধা দিবে (হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহ্‌দের মতে উপরোক্ত বিধান পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। অবশ্য মহিলাগণ তাসফীক করবে অর্থাৎ হাতের উপর হাত মারবে, এর তরীকা হল এই যে, ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠ বাম হাতের তালুতে মারবে (আল্‌–বাহ্‌রুর রাইক ঃ গায়াতুল বয়ানের সূত্রে)। ইশারা ও তাসবীহ্‌ পাঠ উভয় কাজ একত্রে করা মাকরূহ্‌। মাথা দ্বারা ইশারা করবে অথবা চক্ষু দ্বারা ইশারা করবে অথবা এতদুভয় অঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা ইশারা করবে (কাফী)।

৫৯. মাসআলা ঃ যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে সালাতের মধ্যে কেউ যদি রুকূ–সিজদা বেশী করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি দুই বা ততোধিক সিজদা বেশী করে, তবে এতেও সালাত ফাসিদ হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ দুই বা ততোধিক রুকূ অধিক আদায় করে, তবে এতেও তার সালাত ফাসিদ হবে না। সালাত পূর্ণ করার আগেই কেউ যদি এক রাকআত অতিরিক্ত আদায় করে ফেলে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

৬০. মাসআলা ঃ রুকূ ও এক সিজদা আদায় করে ইমাম মাথা উত্তোলন করার পর কোন ব্যক্তি এসে তার সাথে যদি সালাতে শরীক হয় এবং রুকূ করে দুই সিজদা আদায় করে, তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এতে সে পূর্ণ এক রাকআত অর্থাৎ রুকূ–সিজদা বর্ধিত করে ফেলেছে এবং এতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

৬১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যুহরের সালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় সে যদি নতুন তাকবীর বলে আসর বা নফল আরম্ভ করে, তবে তার পূর্বের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, তার অন্য সালাত আরম্ভ করা সহীহ্‌ হয়েছে। আর অন্য সালাত হল নফল। যদি সে নফলের নিয়্যাত করে থাকে, অথবা সাহেবে তারতীব ব্যক্তি আসরের নিয়্যাত করল, তবে তার পূর্বের সালাত বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তি যদি সাহেবে তারতীব না হয়, যেমন অধিক সালাত ছুটে যাওয়ার কারণে অথবা ওয়াক্তের সংকীর্ণতার কারণে তার থেকে যদি তারতীব রহিত হয়ে যায়, তথাপি তার পূর্বের সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং যে সালাত আরম্ভ করেছে, তা শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নফল পড়ছিল, এমতাবস্থায় সে ফরয আরম্ভ করে দিল অথবা জুমুআ পড়ছিল পরে যুহর আরম্ভ করল অথবা এর উল্টো করল, তবে প্রথমে সে যা পড়ছিল তা থেকে সে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ তার পূর্বের সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং পরে যা শুরু করেছে, তা শুদ্ধ হবে। কারণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে (তাবয়ীন)।

৬২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যুহরের এক রাকআত আদায় করে পুনরায় তাকবীর বলে ঐ যুহরই আবার আরম্ভ করল, তবে এতে তার পূর্বের সালাত ফাসিদ হবে না। বরং এ রাকআতটিও হিসাবে ধর্তব্য হবে। অতএব, এ রাকআতটি ধরে যদি আখিরী বৈঠক না করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (বাহ্‌রুর রাইক)। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি নিয়্যাত মনে মনে করে থাকে। আর যদি এ বলে নিয়্যাত করে যে, "আমি যুহরের সালাত আদায় করছি" তবে পূর্বের যুহর বাতিল হয়ে যাবে এবং এ রাকআত হিসাবে ধর্তব্য হবে না (কাফী)। একাকী সালাত আরম্ভ করার পর অন্য কেউ এসে যদি তার পেছনে ইকতেদা করে এবং এ কারণে উক্ত ব্যক্তি যদি পুনরায় সালাত আরম্ভ করে, তবে তার প্রথম সালাত বাতিল হবে না। বরং তার পূর্বের সালাত বাকী থাকবে। কিন্তু ইকতেদাকারী মহিলা হলে তার দ্বিতীয়বার আরম্ভ করা শুদ্ধ হবে (নিহায়া)।

৬৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যুহরের সালাত আরম্ভ করে পরে যদি তাকবীর বলে ইমামের পেছনে ঐ যুহরেরই ইকতেদা করে, তবে তার প্রথম সালাত বাতিল হয়ে যাবে। বাড়ীতে যুহরের সালাত আদায় করার পর যদি পুনরায় তা জামাআতের সাথে আদায় করা হয়, তবে পূর্বে আদায়কৃত সালাত বাতিল হবে না (কাফী)।

৬৪. মাসআলা ঃ যুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করে সালাম ফিরানোর পর যদি স্মরণ হয় যে, ভুলে সে একটি সিজদা ছেড়ে দিয়েছে, এরপর সে যদি পুনরায় যুহরের চার রাকআত আদায় করে সালাম ফিরায়, তবে তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, দ্বিতীয় বার যুহর আরম্ভ করার নিয়্যাত তার অযথা হয়েছে। সুতরাং পুনরায় এক রাকআত আদায় করার পর ফরয থেকে ফারিগ হওয়ার পূর্বেই সে ফরযকে নফলের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে (আল্‌–বাহ্‌রুর রাইক ও খুলাসা)।

৬৫. মাসআলা ঃ মাগরিবের দুই রাকআত আদায় করে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর কারো যদি ধারণা হয় যে, তার সালাত শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ধারণায় সে যদি সালাম ফিরায় এবং দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে সুন্নাত আরম্ভ করে, তবে সুন্নাতের সিজদা করা হোক বা না হোক, তার মাগরিবের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সে ফরয শেষ করার পূর্বেই ফরয থেকে নফলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু যদি মাগরিবের দুই রাকআত আদায় করে সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হয় যে, সালাত শেষ হয়নি এবং ভাবে যে, তার সালাত ফাসিদ হয়ে গিয়েছে, এ ধারণায় সে যদি পুনরায় তাকবীর বলে তিন রাকআত সালাত আদায় করে এবং এক রাকআত পড়ে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ সময় বসে, তবে তার মাগরিবের সালাত শুদ্ধ হবে। অন্যথায় শুদ্ধ হবে না। মাগরিব আরম্ভ করে এক রাকআত আদায় করার পর যদি মনে মনে ধারণা হয় যে, সে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলেনি, অতঃপর সে পুনরায় সালাত আরম্ভ করে যদি তিন রাকআত আদায় করে, তবে তার সালাত সহীহ্‌ হবে। যদি দুই রাকআত পড়ার পর ধারণা হয় যে, সে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলেনি এ ধারণায় যদি পুনরায় সালাত আরম্ভ করে তিন রাকআত আদায় করে, তবে তার সালাত সহীহ্‌ হবে না। যহীরের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি পুনরায় সালাত আরম্ভ করে সে এক রাকআত আদায় করে আখিরী বৈঠক না করে। কেননা, সে আখিরী বৈঠক বর্জন করেছে এবং ফরয শেষ না করে নফলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে (খুলাসা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কি কি কাজ সালাতের মধ্যে মাকরূহ্‌ এবং কি কি কাজ মাকরূহ নয়

১. মাসআলা ঃ কাপড়, শরীর এবং দাঁড়ি নিয়ে খেলা করা মুসল্লীর জন্য মাকরূহ্‌। অনুরূপভাবে সিজদা করার সময় সামনে ও পেছনের দিক থেকে কাপড় উঠানো মাকরূহ্‌ (মি'রাজুদদিরায়া)। রুকূর মধ্যে কাপড় যেন শরীরের সাথে পেঁচিয়ে না যায় এ জন্য কাপড় গুছিয়ে নেয়াতে কোন দোষ নেই। সালাত শেষে কপালের মাটি ও শুষ্ক তৃণ মুছে ফেলতে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে সালাতে যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তবে সালাতের ভেতরও এসব মুছতে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

দোষ নেই। সালাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হলে সালাতের ভেতর মোছা মাকরূহ্। অবশ্য তাশাহ্হুদ ও সালামের পূর্বে মোছা মাকরূহ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তবে না মোছাই উত্তম (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় কপালের ঘাম মুছতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যে কাজ উপকারে আসে এরূপ কোন কাজ করতে মুসল্লীর কোন ক্ষতি নেই। কেননা, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতের অবস্থায় কপালের ঘাম মুছতেন এবং সিজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডানে বা বামে কাপড় মৃদু ঝাড়তেন। যে কাজ উপকারে আসে না এরূপ কাজ সালাতের অবস্থায় করা মাকরূহ্ (খুলাসা ও নিহায়া)।

৩. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় যদি নাকের ডগায় শ্লেষ্মার পানি এসে জমা হয়, তবে এর ফোঁটা মাটিতে পড়ার চেয়ে মুছে নেয়াই উত্তম (কিনয়া)। আয়াত ও তাসবীহ্ হাতে গণনা করা মাকরূহ্। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কোন দোষ নেই। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তাদের এ মতভেদ ফরযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নফলের মধ্যে এরূপ করা সমস্ত ইমামের ঐকমত্যে জাইয। কারো কারো মতে এ মতভেদ নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরযের মধ্যে এরূপ করা আদৌ জাইয নেই। কিন্তু সুস্পষ্ট মত হল, ফরয-নফল উভয়ের ক্ষেত্রেই এ মতভেদ সমভাবে প্রযোজ্য (তাবয়ীন)। আমাদের মাশাইখগণ বলেন ঃ কারো যদি গণনা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সে ইশারায় গণনা করবে। অপারগ ব্যক্তি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতের উপর আমল করবে (নিহায়া)। কেউ যদি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা ইশারা করে, তা মাকরূহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ সালাতের বাইরে তাসবীহ্ গণনা করার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। "মুস্-তাস্ফা"-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, সহীহ্ মতে সালাতের বাইরে তাসবীহ্ গণনা করা মাকরূহ্ (তাবয়ী)। সূরাসমূহ গণনা করা মাকরূহ্। কেননা, এ কাজ সালাতের আমলের মধ্যে শামিল নয় (হিদায়া)। কঙ্কর সরানো মাকরূহ্। কিন্তু এর কারণে যদি সিজদায় অসুবিধা হয়, তবে এক-দুইবার সরানো মাকরূহ্ নয়। যাহিরুর রিওয়ায়েতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, একবার সরাতে পারবে (মুনিয়্যা)। অবশ্য না সরানো উত্তম (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ভেতর ঢুকানো মাকরূহ্। আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আঙ্গুল ফুটানো মানে হল, আঙ্গুলে এমনভাবে টিপ দেয়া বা আঙ্গুলে এমনভাবে টান দেয়া যেন আওয়ায হয় (নিহায়া)।

৬. মাসআলা ঃ সালাতের বাইরে আঙ্গুল ফুটানো অধিকাংশ আলিমের মতে মাকরূহ্ (যাহিদী)। পুরুষ লোকের চুলের জোড়া মাথার উপর বাঁধা মাকরূহ্। অর্থাৎ সমস্ত চুল মাথার উপর একত্রিত করে কোন কিছু দ্বারা তা বাঁধা যেন খুলে না যায় (তাবয়ীন)। এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের তিন ধরনের মতামত বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মাথার মধ্যখানে সমস্ত চুল একত্রিত করে বাঁধা মাকরূহ্। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, মহিলাদের মত মাথার পাশে বেণী বাঁধা মাকরূহ্। কারো মতে মাথার পশ্চাদভাগে চুল জমা করে নেকড়া বা সূতা দ্বারা তা বেঁধে রাখা মাকরূহ্ (আল-বাহরুর রাইক ঃ গায়াতুল বয়ানের সূত্রে)।

৭. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় কোমরে হাত রাখা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সালাতের বাইরেও কোমরে হাত রাখা মাকরূহ্ (যাহিদী)। সালাতে ডানে-বামে তাকানো অর্থাৎ মুখ কিবলার দিক হতে ফিরিয়ে তাকানো মাকরূহ্। চেহারা না ফিরিয়ে আড় চোখে দেখাতে কোন ক্ষতি নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। চক্ষু উত্তোলন করে আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ্ (তাবয়ীন)।।

৮. মাসআলা ঃ তাশাহহুদ বা দুই সিজদার মাঝখানে "ইক'আ" করা মাকরূহ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সহীহ্ মতে اقعاء মানে হল, নিতম্ব যমীনের উপর রেখে হাঁটু সোজা খাড়া করে বসা (হিদায়া)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (কাফী ও নিহায়া ঃ মাবসূতের সূত্রে)। কেউ কেউ বলে اقعاء মানে উভয় পায়ের গোড়ালির উপর বসা। কারো কারো মতে اقعاء মানে পায়ের আঙ্গুলের উপর বসা। অন্যান্য ফকীহ্র মতে اقعاء মানে উভয় হাঁটু বুকের সাথে মিশিয়ে বসা। কেউ কেউ বলেন, উভয় হাঁটু বুকের সাথে মিলিয়ে দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়ে বসা। এরূপ বসা কুকুরের ন্যায় বসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব অবস্থায় বসা মাকরূহ্ (যাহিদী)। হাতে সালামের জবাব দেয়া মাকরূহ্। বিনা ওযরে চারজানু হয়ে বসা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা ঃ রুকূতে উভয় হাত বিছিয়ে রাখা মাকরূহ্। রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলনের সময় উভয় হাত জাগান এবং কাপড় লটকিয়ে রাখা মাকরূহ্ (মুনিয়্যা)। কাপড় লটকিয়ে রাখার মানে হল, মাথার উপর বা কাঁধের উপর রেখে এর দুই পার্শ্ব ঝুলিয়ে রাখা। আবা-কাবার হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপর তা ঝুলিয়ে রাখাও সদল (উপরোক্ত হুকুম)-এর অন্তর্ভুক্ত (তাবয়ীন)। কাবার নীচে জামা থাকা এবং না থাকা উভয়ই সমান (নিহায়া)।

১০. মাসআলা ঃ "খুলাসা ও নিসাব"-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, কোন মুসল্লী যদি শুক্কা ও ফুরজা (এক প্রকার পোশাক, যার সামনের অংশ ফাড়া) পরিধান করে সালাত আদায় করে এবং হাতায় হাত না ঢুকায়, তবে এ সম্পর্কে মুতাআখ্খিরীনদের মতভেদ রয়েছে। তবে উত্তম মত হল, এভাবে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ নয় (মুযমারাত)। ফকীহ্গণ বলেন, কেউ যদি কাবা পরিধান করে সালাত আদায় করে তবে তার জন্য উচিত হল, কাবার হাতায় হাত ঢুকিয়ে ফিতা দ্বারা বেঁধে সালাত আদায় করা। যেন সদল না হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সালাতের বাইরে সদল করা মাকরূহ্ কিনা? এ সম্বন্ধে মাশাইখদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে (দিরায়া)। কিনয়া-এর কারাহাত অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, সালাতের বাইরে এরূপ করা মাকরূহ্ নয় (আল-বাহরুর রাইক)।

১১. মাসআলা ঃ পাগড়ী থাকা অবস্থায় আলস্যবশত খালি মাথায় সালাত আদায় করা মাকরূহ্। কিন্তু কেউ যদি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশার্থে এরূপ অবস্থায় সালাত আদায় করে, তবে মাকরূহ্ হবে না। বরং এরূপ করা ভাল (যখীরা)। যার জামা আছে এরূপ ব্যক্তি যদি শুধু পায়জামা পরিধান করে সালাত আদায় করে, তবে মাকরূহ্ হবে (খুলাসা)। আল্-ফাতাওয়াল 'ইতাবিয়্যার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, উঁচু পশমী টুপি মাথায় দিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্। অবশ্য যুদ্ধের সময় এরূপ টুপি পরিধান করা মাকরূহ্ নয় (তাতারখানিয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ জামার আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সালাতে ই'শ্তিমালে সাম্মা করা মাকরূহ্। এর মানে হল, শরীরে অর্থাৎ মাথা হতে পা পর্যন্ত ঝুলির ন্যায় এমনভাবে কাপড় পরিধান করা যে, এর ভেতর থেকে হস্ত বের করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ করা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। কাপড়ের মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে দিয়ে এর উভয় পার্শ্ব বাম কাঁধের উপর রেখে দেয়া মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মাথার মধ্যভাগ খালি রেখে চতুষ্পার্শ্বে পাগড়ী পেঁচিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। ইমাম ওয়ান ওয়ালজী (র) বলেন, এরূপভাবে পাগড়ী বাঁধা সালাতের বাইরেও মাকরূহ্ (আল্ বাহরুর রাইক)। অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (মি'রাজুদ দিরায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ নাক-মুখ ঢেকে সালাত আদায় করা এবং সালাতে হাই তোলা মাকরূহ্। যদি হাই এসেই যায়, তবে যথাসম্ভব তা প্রতিহত করবে। যদি প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে হাত অথবা আস্তিন মুখের উপর রাখবে (তাবয়ীন)। হাই আসার সময় মুখ না ঢাকা মাকরূহ্ (খাযানাতুল ফিকাহ্)। মুখে হাত রাখলে হাতের পিঠ মুখের উপর রাখবে (বাহ্রুর রাইক ঃ মুখ তারাতুন নাওয়ায়িল-এর সূত্রে)। দাঁড়ান অবস্থায় হাই আসলে ডান হাত রাখবে এবং এতদ্ভিন্ন অবস্থায় হাই আসলে বাম হাত রাখবে (যাহিদী)।

১৪. মাসআলা ঃ সালাতে শরীর মোড়া দেয়া এবং চক্ষু বন্ধ রাখা মাকরূহ্। পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্। পায়খানা-পেশাবের চাপের কারণে সালাত আদায়ে যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তবে সালাত ছেড়ে আগে এ কাজ সেরে নিবে। বদবায়ুরও এই হুকুম। বদবায়ুর চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা জাইয আছে। তবে ভাল নয়। যদি ওয়াক্ত এমন সংকীর্ণ হয় উযূ করতে গেলে সময় শেষ হয়ে যাবে, তবে এ অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা, কাযা করার চেয়ে কারাহাত (অপসন্দনীয়তা)-এর সাথে আদায় করা উত্তম।

১৫. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় পাখা বা আস্তিন দ্বারা নিজের গায়ে নিজে বাতাস করা মাকরূহ্। যদি অধিক না করা হয়, তবে সালাত ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। সালাতের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কাশি ও গলাখাঁকার দেয়া মাকরূহ্। যদি বাধ্য হয়ে এরূপ করে, তবে মাকরূহ হবে না (যাহিদী)।

১৬. মাসআলা ঃ সালাতে থুথু ফেলা মাকরূহ্। এমনিভাবে রুকূ-সিজদায় স্থির না হওয়া অর্থাৎ পিঠ সোজা না করা মাকরূহ্ (মুহীত)। এমনিভাবে রুকূ হতে সোজা হয়ে খাড়া না হওয়া এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে না বসা মাকরূহ্ (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইবন আমীরুল হাজ্জ)। একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য জামাআতের কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্। কেননা, সে উঠা-বসার মধ্যে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

১৭. মাসআলা ঃ সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকা অবস্থায় মুক্তাদীর জন্য পেছনের কাতারে একা দাঁড়ানো মাকরূহ্। যদি সামনের কাতারে জায়গা খালি না থাকে, তবে মুহাম্মদ ইব্ন শুজা এবং হাসান ইবন যিয়াদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ অবস্থায় একা পেছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ্ নয়। যদি সে সামনের কাতার থেকে কাউকে

নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং তার সাথে একত্রে দাঁড়ায়, তবে ভাল (মুহীত)। তবে এরূপ করার জন্য শর্ত হল, উক্ত ব্যক্তি এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া জরুরী-যেন তার নিজের সালাতকে সে নষ্ট না করে ফেলে (খাযানাতুল ফাতাওয়া)। "হাবী"-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মুসল্লীর পার্শ্বে কবর থাকে, তবে এতে সালাত মাকরূহ্ হবে না। কেননা, যদি মুসল্লী ও কবরের মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব থাকে যে, এ পরিমাণ দূরত্বে থেকে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে কেউ যদি অতিবাহিত হয়, তবে মাকরূহ্ হয় না, তাহলে সালাতও মাকরূহ্ হবে না (তাতারখানিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ মুসল্লীর সামনে, উপরে, ডানে, বামে ছবি থাকলে অথবা কাপড়ে ছবি থাকলে সালাত মাকরূহ্ হয়ে যাবে। বিছানায় ছবি থাকলে এ সম্পর্কে দুই প্রকার বর্ণনা আছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে যদি ছবির উপর সিজদা না করা হয়, তবে এরূপ বিছানায় সালাত আদায় করা মাকরূহ্ নয়। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ছবি বড় হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই দর্শকের সামনে তা প্রকাশিত হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কিন্তু ছবি যদি ছোট হয় এবং খুব চেষ্টা করে দেখতে হয়, তাহলে মাকরূহ্ হবে না। যদি ছবির মাথা কাটা থাকে, তবে কোন অবস্থাতেই মাকরূহ্ হবে না। ছবির মাথা কাটার মানে হল সেলাই করে ছবির মাথা এমনভাবে মিটিয়ে দেয়া যেন মাথার কোন চিহ্ন বাকী না থাকে। যদি ছবির মাথা ও শরীরের মধ্যখানে সেলাই করা হয়, তবে এ সেলাই ধর্তব্য নয়। কেননা, কোন কোন পাখির গলার বেড়ীও থাকে। ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা বেশী মাকরূহ্। এরপর হল মাথার উপর থাকা, এরপর হল ডানে থাকা, এরপর হল বামে থাকা এবং এরপর হল পেছনে থাকা (কাফী)। মুসল্লীর সামনে খাড়া করা বালিশের উপর যদি ছবি থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে। যদি ঐ বালিশ মাটিতে ফেলানো থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে না (তাতারখানিয়্যা) প্রাণহীন বস্তুর ছবি মাকরূহ্ নয় (নিহায়া)।

১৯. মাসআলা ঃ ফরযের এক রাকআতে একই সূরা বারবার পড়া মাকরূহ্। তবে নফলের মধ্যে মাকরূহ্ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি একই আয়াত বারংবার পাঠ করা হয় এবং একা নফল আদায় করার অবস্থায় এরূপ করা হয়, তবে মাকরূহ্ হবে না। যদি ফরয সালাতের মধ্যে এরূপ করা হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা হয়, তবে মাকরূহ্ হবে। আর যদি ওযরের কারণে ও ভুলবশত এরূপ করা হয়, তবে এতে কোন ত্রুটি হবে না (মুহীত)। জুমুআর সালাতে সিজদা বিশিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ্। অনুরূপভাবে যে সব সালাতে আস্তে কিরাআত পড়া হয়, তাতেও সিজদা বিশিষ্ট সূরা পাঠ করা মাকরূহ্ (খুলাসা ঃ সাহু সিজদা অনুচ্ছেদ)।

২০. মাসআলা ঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাঁটুর আগে হাত রাখা এবং উঠার সময় হাতের আগে হাঁটু উঠানো মাকরূহ্। কিন্তু ওযরের কারণে এরূপ করলে মাকরূহ্ হবে না (মুনিয়া)। মুক্তাদীর জন্য ইমামের আগে রুকূ-সিজদায় যাওয়া এবং রুকূ-সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করা মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২১. মাসআলা ঃ বিসমিল্লাহ্ ও আমীন জোরে না বলা উত্তম। রুকূর মধ্যে গিয়ে কিরাআত শেষ করা মাকরূহ্ এবং যে সমস্ত দু'আ অবস্থা পরিবর্তনের সময় পড়া হয়, তা অবস্থা পরিবর্তনের শেষে পাঠ করা মাকরূহ্। ফরয সালাতে ওযর ব্যতীত লাঠির উপর ভর করা মাকরূহ্। কিন্তু নফলের মধ্যে লাঠিতে ভর দেয়া মাকরূহ্ নয় (যাহিদী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২২. মাসআলা ঃ বাচ্চা নিয়ে সালাত আদায় করা জাইয। তবে মাকরূহ্[১]। কিন্তু যদি বাচ্চাকে দেখা-শুনা করার মত কোন মানুষ না থাকে এবং সে কাঁদে, তবে মাকরূহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

"আমলে ইয়াসীর" তথা অল্প নড়াচড়ার দ্বারা সালাত আদায় অবস্থায় জামা ও টুপি খোলা এবং তা পরিধান করা অথবা মোযা খোলা মাকরূহ্ (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ মাথা হতে পাগড়ী খুলে মাটিতে রাখা বা মাটি থেকে পাগড়ী উঠিয়ে মাথায় রাখাতে সালাত ফাসিদ হবে না। কিন্তু মাকরূহ্ হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। পাগড়ীর পেঁচের উপর সিজদা করা মাকরূহ্ (যখীরা)। পাগড়ীর পেঁচের উপর সিজদা করা অবস্থায় মাটির কাঠিন্যতা যদি অনুভব করা যায়, তবেই তা মাকরূহ্ হবে। যদি মাটির কাঠিন্যতা অনুভব না করা যায়, তবে সালাত আদৌ জাইয হবে না (বরজুন্দী)।

২৪. মাসআলা ঃ চেহারায় মাটি লাগার থেকে বাঁচার জন্য কেউ যদি তার জামার আস্তিন বিছিয়ে তার উপর সিজদা করে, তবে মাকরূহ্ হবে। আর পাগড়ী ও কাপড় মাটি থেকে রক্ষা করার জন্য কেউ যদি এরূপ করে, তবে মাকরূহ্ হবে না (আল-বাহ্রুর রাইক)। কেউ যদি মাটিতে সালাত আদায় করে এবং মাটির উত্তাপ থেকে বাচার জন্য সে যদি সামনে রক্ষিত নেকড়ার উপর সিজদা করে, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই (যহীরিয়্যা)। সিজদার মধ্যে উভয় পা ঢেকে রাখা মাকরূহ্ (খুলাসা)। একা নফল সালাত আদায়কারীর জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি কামনা করা, ইসতিগফার করা এবং রহমতের বিবরণ সম্বলিত আয়াত পাঠকালে রহমত কামনা করতে কোন দোষ নেই। অবশ্য ফরয সালাতে এরূপ করা একা সালাত আদায়কারীর জন্য মাকরূহ্। ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য ফরয ও নফল উভয় অবস্থাই এরূপ না করা ভাল (মুনিয়্যা)।

২৫. মাসআলা ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় ডানে-বামে ঝুকা মাকরূহ্ (যখীরা)। সালাত আদায়ের অবস্থায় এক পায়ের উপর ভর করা এবং এক পায়ের উপর দাঁড়ান মাকরূহ্। কিন্তু ওযরের কারণে এরূপ করলে মাকরূহ্ হবে না (যহীরিয়্যা)। দাঁড়ানোর সময় কোন পা অগ্রে বাড়িয়ে দেয়া মাকরূহ্। বসার সময় ডান অঙ্গের উপর এবং উঠার সময় বাম অঙ্গের উপর জোর দেয়া মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। সালাতের মধ্যে কোন সুগন্ধি এবং ফলের ঘ্রাণ নেয়া মাকরূহ্ (যখীরা)।

২৬. মাসআলা ঃ রুকূ-সিজদা এবং অন্যান্য সময়ে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিক হতে ফিরিয়ে রাখা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমামের জন্য একা মিহ্রাবের ভেতর খাড়া হওয়া মাকরূহ্। অবশ্য মিহ্রাবের বাইরে দাঁড়িয়ে মিহ্রাবের ভেতর সিজদা করা মাকরূহ্ নয় (তাবয়ীন্)। যদি ইমামের পেছনে স্থান সংকীর্ণ হয়, তবে মিহ্রাবের ভেতর দাঁড়ানো মাকরূহ্ নয়। (আল্-ফাতাওয়াল বুরহানিয়্যা)।

২৭. মাসআলা ঃ ইমাম যদি একা উঁচু স্থানে দাঁড়ায় এবং মুক্তাদীগণ নীচে দাঁড়ায় অথবা মুক্তাদীগণ যদি উঁচু স্থানে দাঁড়ায় এবং ইমাম দাঁড়ায় একা নীচুস্থানে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী এদের সালাত মাকরূহ্ হবে (হিদায়া)। যদি কিছু সংখ্যক মুক্তাদী ইমামের সাথে থাকে

১. মাকরূহ না বলে পসন্দনীয় নয়-'না করা উত্তম' বলা ভাল।

তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে মাকরূহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এ উচ্চতর পরিমাণ হল এক মানুষ পরিমাণ হওয়া। এর চেয়ে কম হলে কোন ক্ষতি হবে না (তাহাবী)। কেউ কেউ বলেন, মুক্তাদী ও ইমামের দাঁড়ানোর স্থানে যদি এ পরিমাণ ব্যবধান থাকে যে, এর দ্বারা উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝা যায়-তবে একে উঁচু-নীচু ধরা হবে এবং এরূপ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে সালাত মাকরূহ্ হয়ে যাবে। কোন কোন ফকীহ্ এর মতে উভয়ের দাঁড়ানোর স্থলে যদি এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকে, তবে একে উঁচু-নীচু ধরা হবে। তারা এ বিষয়টিকে সুতরার উপর কিয়াস করেছেন। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য (তাবয়ীন)। "গায়াতুল বয়ান" নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এ মতটিই বিশুদ্ধ (আল-বাহ্রুর রাইক)।

২৮. মাসআলা ঃ কা'বাগৃহের ছাঁদের উপর সালাত আদায় করা মাকরূহ্। কেননা, এতে কা'বার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। কোন ব্যক্তির সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে স্থান নির্ধারণ করে নেয়া মাকরূহ্ (তাতারখানিয়্যা)। কোন ব্যক্তির মুখোমুখি হয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (মা'দান)। যদি মাঝখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকে, যার পিঠ মুসল্লীর দিকে আছে তবে মাকরূহ্ হবে না (তামারতাশী)। কোন মুসল্লীর দিকে মুখ ফিরানো 'মাকরূহ্'। চাই সে মুসল্লী প্রথম কাতারে হোক বা শেষ কাতারে (মুনিয়্যা)। কথা বলায় লিপ্ত ব্যক্তি নিকটে হলেও তার পিঠের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা মাকরূহ নয়। অবশ্য সে যদি এমন জোরে কথা বলে যে, এতে মুসল্লী তার কিরাআতে ভুল হওয়ার আশংকা করে, তবে মাকরূহ্ হবে (খুলাসা)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অগ্নি প্রজ্বলিত উনান বা বড় চুল্লির দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা মাকরূহ্। লণ্ঠন বা বাতির দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খাযানাতুল ফাতাওয়া)। মুসল্লীর সম্মুখে বা মাথার উপরে কুরআন অথবা ঝুলন্ত তরবারি বা এরূপ অন্য কিছু রেখে সালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা ঃ রুকূতে গিয়ে ইমাম যদি কোন আগন্তুকের আগমনের আওয়ায শুনতে পায় এবং রুকূতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করে, যেন আগন্তুক তার সাথে শরীক হতে পারে, তবে ইমাম যদি আগন্তুককে চিনে, তাহলে মাকরূহ্ হবে। অন্যথায় এক বা দুই তাসবীহ্ পরিমাণ দেরী করাতে কোন ক্ষতি নেই (মুখতারুল ফাতাওয়া)। ইমামের এরূপভাবে দাঁড়ানো, যার ফলে কাতার সোজা হয় না, এরূপ করা মাকরূহ্ (আল-বাহ্রুর রাইক)।

৩১. মাসআলা ঃ দিরহাম অথবা দীনার মুখে নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্। যদিও এরূপ করাতে কিরাআত পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তথাপি মাকরূহ্। হাতের মুষ্টির মধ্যে কোন বস্তু নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মলমূত্র সামনে নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৩২. মাসআলা ঃ সালাতের অবস্থায় ওযর ব্যতিরেকে কয়েক কদম হাঁটা এবং একেক কদম হাঁটার পর একটু থামা, এরূপ করা মাকরূহ্। যদি ওযরের কারণে এরূপ করা হয়, তবে মাকরূহ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না (মুহীত)। কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে তাকবীর বলা এবং এরপর কাতারে শামিল হওয়া মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৩৩. মাসআলা ঃ ওযর ব্যতিরেকে রুকূর অবস্থায় হাঁটুতে হাত না রাখা এবং সিজদার অবস্থায় মাটিতে হাত না রাখা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া মাকরূহ্ তাহ্রীমী (হিদায়া)।

৩৪. মাসআলা ঃ সালাতে মাথা নীচু করে রাখা, মাথা উঁচু করে রাখা, তাকবীরে তাহ্রীমার সময় উভয় হাত কানের উপরে উঠানো এবং উভয় হাত কাঁধের নীচে রাখা, পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখা এবং ইকামতের সময় ইমাম আসার আগে মুসল্লীদের কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া মাকরূহ্ (খাযানাতুল ফিকাহ্)। ইমামের এমত তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করা, যার ফলে মুক্তাদীগণ সুন্নাত তরীকা মত সালাত আদায় করতে অক্ষম হয়ে যায় (মুনিয়া)।

৩৫. মাসআলা ঃ "হুজ্জত" কিতাবে আছে যে, সালাতের অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে মশা-মাছি তাড়ানো মাকরূহ্। অবশ্য প্রয়োজন হলে সামান্য নড়াচড়ার মাধ্যমে তাড়ালে জাইয আছে (তাতারখানিয়া)। ওযর ব্যতীত সালাতের অবস্থায় আমলে কালীল করা তথা সামান্য পরিমাণ নড়াচড়া করাও মাকরূহ্ (আল-বাহ্রুর রাইক)। ধনুক বা তূণীর গলাতে লটকিয়ে সালাত আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি এগুলোর নড়াচড়ার কারণে সালাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তবে মাকরূহ্ হবে। কিন্তু সালাত জাইয হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৬. মাসআলা ঃ জবর দখল করা ভূমিতে সালাত আদায় করা জাইয। কিন্তু অত্যাচারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ জুলুম যদি আল্লাহ্ও ঐ ব্যক্তির মাঝে সীমিত থাকে, তবে তো সালাতের ছওয়াব প্রদান করা হবে। আর যদি এ জুলুম তার ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হয়ে থাকে, তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে (মুখতারুল ফাতাওয়া)। সালাত মাকরূহ্ হওয়ার যে সব সূরত পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এসব অবস্থায় সালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এসব অবস্থায় সালাতের শর্ত এবং রুকুন সবই পাওয়া যায়। এতদ্সত্ত্বেও এ সালাত পুনঃরায় এমনভাবে আদায় করতে হবে যেন মাকরূহ্ না হয়। কারাহাতের সাথে যে সালাত আদায় করা হয়, এর বিধান এই (হিদায়া)। কেননা, কারাহাত দুই প্রকার ঃ ১. মাকরূহ্ তাহ্রীমী, ২. মাকরূহ্ তানযীহী। মাকরূহ্ তাহ্রীমী হলে তো সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। আর মাকরূহ তানযীহী হলেও পুনরায় আদায় করা মুস্তাহাব। কারণ, মাকরূহ্ তাহ্রীমী ওয়াজিবের সমপর্যায়ের (ফাতহুল কাদীর)।

সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কোন মুসল্লীকে যদি তার মাতা-পিতা কেউ ডাকে, তবে সে সালাত শেষ না করা পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। কিন্তু তারা যদি তার নিকট কোন কিছুর জন্য সাহায্য চায়, তবে উত্তর দিবে। কেননা, কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে সালাত ভঙ্গ করা জাইয নেই। অনুরূপভাবে কোন অপরিচিত ব্যক্তি যদি ছাঁদ থেকে পড়ে যাওয়ার, অথবা আগুনে ভস্ম হওয়ার অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার যদি আশংকা করে এবং কোন মুসল্লী ব্যক্তিকে ডাকে, তবে সালাত ছেড়ে তার ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব।

২. মাসআলা ঃ সালাতে দাঁড়ানোর পর চোর যদি কারো মাল চুরি করে নিয়ে যায়, যার মূল্য এক দিরহাম, তবে সালাত ছেড়ে চোরের পশ্চাদ্ধাবন করা তার জন্য জাইয আছে। চাই এ সালাত ফরয হোক বা নফল। কেননা, দিরহাম পরিমাণ হওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে মাল। এর কম হলে নয়।

৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা সালাত আরম্ভ করার পর তার চুলার হাঁড়ি যদি উথলিয়ে উঠে, তবে তার জন্য সালাত ছেড়ে দেয়া জাইয আছে। এমনিভাবে মুসাফিরের সওয়ারী যদি কোন দিকে পালিয়ে যায় কিংবা রাখাল যদি তার বকরীর পালের উপর বাঘের আক্রমণের আশংকা করে অথবা অন্ধকে কূপের নিকট দেখে কেউ যদি তার কূপে পড়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে এসব অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির সালাত ছেড়ে দেয়া জাইয (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ কোন যিম্মী কাফির লোক যদি কোন মুসল্লীর সামনে এসে বলে, আমাকে মুসলমান করুন, তবে সে সালাত ছেড়ে দিবে। যদিও ফরয সালাত হয় (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ সুবহে সাদিক হওয়ার পর ভাল কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলা মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। শত্রুতা দূর করার নিয়্যাতে সালাত আদায় করা উচিত নয় (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখা মাকরূহ। কারো কারো মতে মসজিদের আসবাবপত্র সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সালাতের সময় ব্যতীত অন্য সময় মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখাতে কোন অসুবিধা নেই। এটাই বিশুদ্ধ মত।

৭. মাসআলা ঃ মসজিদের ছাদের উপর স্ত্রী-সহবাস করা এবং পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ। ঘরের ভেতর কোন জায়গা সালাত আদায়ের নিমিত্তে নির্ধারণ করে নিয়ে এতে যদি সালাত আদায় করা হয়, তবে এ ঘরের ছাদের উপর এসব কাজ করা মাকরূহ নয়। ঈদগাহে এবং সালাতে জানাযা আদায়ের স্থানে এসব কাজ করা যাবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধ মত হল, এগুলো মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য ইকতেদা করা জাইয হওয়ার ক্ষেত্রে একই স্থান হওয়ার কারণে এগুলোর হুকুম মসজিদের হুকুমের মতই হবে (তাবয়ীন)।

৮. মাসআলা ঃ মসজিদের বারান্দা মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি বারান্দায় থেকে ইমামের পেছনে ইকতেদা করে, তবে তার ইকতেদা সহীহ্ হবে। যদি কাতার মিলানো না থাকে এবং মসজিদ পরিপূর্ণ না থাকে। এদিকে ইংগিত করেই ইমাম মুহাম্মদ (র) জুমুআ অধ্যায়ে এ কথা বলেছেন যে, তাক এবং দেয়ালের উপর থেকেও ইমামের পেছনে ইকতেদা সহীহ্ আছে। যদিও কাতার মিলানো না থাকে। মুদ্রা ব্যবসায়ীর ঘরে দাঁড়িয়ে ইমামের পেছনে ইক্তেদা সহীহ নেই। হাঁ, যদি কাতার মিলানো থাকে, তবে এ অবস্থায় ইকতেদা সহীহ্ হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে মসজিদের দরজার সামনে বিদ্যমান দুই দোকানের উপর থেকেও ইমামের পেছনে ইকতেদা করা সহীহ্ আছে। কেননা, এ দোকানসমূহ মসজিদের বারান্দার অন্তর্ভুক্ত এবং মসজিদের সাথে মিলানো থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ চুনা এবং সোনালী রং-এর পানি দ্বারা মসজিদ নকশা করা মাকরূহ্ নয় (তাবয়ীন)। উপরোক্ত নকশা তখনই জাইয হবে যদি তা নিজের টাকা-পয়সা দিয়ে করা হয়। মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের মাল দ্বারা ইমারত সম্বন্ধীয় কাজ করাতে পারবে। নকশার কাজ করাতে পারবে না। যদি করায়, তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে (হিদায়া)। মসজিদের জন্য যদি প্রচুর মাল এবং টাকা-পয়সা জমা হয় এবং মুতাওয়াল্লীর আশংকা হয় যে, কোন জালিম ব্যক্তি হয়তো তা ধ্বংস করে দিবে, তবে এ অবস্থায় ওয়াক্‌ফের মাল দ্বারা নকশা করাতে কোন ক্ষতি নেই (কাফী)।

১০. মাসআলা ঃ মসজিদের মিহ্‌রাব এবং দেয়ালে কুরআন শরীফের কোন আয়াত লিখা ভাল নয়। কেননা, তা পড়ে গিয়ে পদদলিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। "জাম'উন্ নাসাফী" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মুসাল্লা বা ফরাশে আল্লাহ্‌র নাম লিখা থাকলে তা বিছানো এবং ব্যবহার করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে অন্যের ব্যবহারের আশংকা থাকলে নিজের মালিকানা থেকে তা বের করাও মাকরূহ্। এমতাবস্থায় আবশ্যক হল, তা এমন স্থানে রেখে দেয়া, যেখানে এর উপর কোন বস্তু রাখা হবে না। অনুরূপভাবে কাগজের টুকরায় আল্লাহ্‌র নাম লিখে তা দরজায় ঝুলানোও মাকরূহ্। কেননা, এতে আল্লাহ্‌র নামের অবমাননা হয় (কিফায়া)।

১১. মাসআলা ঃ মসজিদে কুলি করা এবং উযূ করা মাকরূহ্। কিন্তু মসজিদে যদি এমন জায়গা থাকে, যা একাজের জন্য নির্দিষ্ট এবং এতে সালাত আদায় করা হয় না, তবে এরূপ স্থানে উযূ করা জাইয আছে। মসজিদে বসে কোন পাত্রে উযূ করা জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মসজিদের দেয়ালে, সম্মুখস্থ কোন পাথরের উপর এবং চাটাইয়ের উপর বা নীচে থুথু ফেলা মাকরূহ্। এমনিভাবে নাক ঝাড়াও মাকরূহ্। মসজিদে থুথু ফেলা এবং নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে নিজের কাপড়ে থুথু ফেলবে এবং নাক ঝাড়বে। অগত্যা কেউ যদি তা মসজিদে ফেলে, তবে তা পরিষ্কার করা তার জন্য আবশ্যক (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। কেউ মসজিদে থুথু ফেলতে বাধ্য হলে চাটাইয়ের নীচে থুথু ফেলার চেয়ে উপরে থুথু ফেলা তার জন্য কম অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে চাটাই মসজিদ নয়। কিন্তু চাটাইয়ের নীচের স্থান প্রকৃতভাবেই মসজিদ। মসজিদে যদি চাটাই না থাকে, তবে তা মাটির নীচে পুঁতে রাখবে। মাটির উপর রেখে দিবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ কাঁদা মাটিতে হাঁটার কারণে পাঁয়ে কাদা লাগলে, তা মসজিদের দেয়ালে বা খুঁটিতে মোছা মাকরূহ্। চাটাইয়ের উপর মোছায় কোন ক্ষতি নেই। তবে এরূপ না করাই ভাল। আর মসজিদের মাটিতে মুছলে দেখতে হবে, মাটি যদি একত্রিত থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে না। আর যদি ছড়ানো থাকে, তবে মাকরূহ্ হবে। এ কথাটিই উত্তম। মসজিদে ফেলে রাখা কাঠের উপর মুছলে কোন ক্ষতি নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

১৩. মাসআলা ঃ মসজিদে কূপ খনন করা জাইয নেই। যদি পূর্ব হতেই কূপ থাকে, তবে যেরূপ আছে তেমনই রেখে দিবে। যেমন যমযম কূপটি আছে। মসজিদের ভেতর গাছ লাগানো মাকরূহ। কেননা, এরূপ করলে কাফিরদের উপাসনালয়ের সদৃশ হয়ে যাবে এবং সালাতের জায়গা কমে যাবে। কিন্তু যদি গাছ লাগানোর কারণে মসজিদের উপকার হয়, যেমন মাটি এমন নরম যে, খুটি স্থির থাকে না তবে এতে গাছ লাগানো জাইয আছে, যাতে মাটি বসে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মসজিদের চাটাই রাখার জন্য মসজিদের ভেতর কোন কামরা তৈরী করা জাইয আছে (খুলাসা)। শহর প্রাচীরের উপর নির্মিত মসজিদে সালাত আদায় করা জাইয নেই। কেননা, এ হল সর্বসাধারণের হক। অবশ্য এ মাসআলাটি বিস্তারিত বিবরণ সাপেক্ষ। অর্থাৎ কোন শহর যদি জোরপূর্বক দখল করা হয় এবং রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ তৈরী করা হয়, তবে এতে সালাত জাইয আছে। কেননা, রাষ্ট্র প্রধান ইচ্ছা করলে রাস্তাকে মসজিদ বানাতে পারে। অতএব শহর রক্ষার দেয়ালে মসজিদ নির্মাণ করা অতি সহজ কাজ।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মসজিদের ভেতর দিয়ে চলাফেরা করে এবং তাকে রাস্তা বানিয়ে নেয়, তবে বিনা ওযরে এরূপ করলে জাইয নেই। কিন্তু ওযরের কারণে এরূপ করলে জাইয আছে। এরূপ যাতায়াতকারী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হল প্রত্যহ একবার এর মধ্যে সালাত আদায় করা। প্রত্যেক বার নয়।

১৫. মাসআলা ঃ মসজিদে বসে সেলাই কর্ম করা মাকরূহ্। কিন্তু যদি মসজিদ হতে ছেলে-মেয়েদেরকে তাড়ানোর জন্য অথবা মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বসে মসজিদে সেলাই কাজ করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনিভাবে কোন লিখক যদি পয়সার বিনিময়ে মসজিদে বসে লিখে, তবে মাকরূহ্ হবে। আর যদি বিনা পয়সায় লিখে, তবে মাকরূহ্ হবে না। শিক্ষক, যিনি মজুরী নিয়ে বালক-বালিকাদেরকে শিক্ষা দেন, তিনি যদি গরমের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মসজিদে বসে পড়ান, তবে মাকরূহ্ হবে না। কাযী ইমামের কিতাবে এবং "ইকরারুল 'উয়ূন" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শিক্ষকের বিষয়টি লিখক এবং দরজীর বিষয়ের মতই (খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ঘরের ভেতর যদি মসজিদ থাকে এবং ঐ ঘরটি যদি এমন হয় যে, এর দরজা বন্ধ করা হলে ঐ ঘরের লোকেরা জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে, তাহলে এ ঘর "জামে মসজিদ" হিসাবে গণ্য হবে এবং মসজিদের হুকুম এর জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এর মধ্যে বেচা-কেনা করা হারাম এবং জুনুবী ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ঘরের লোকেরা অন্যান্য লোকদেরকে এ মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ না করে। যদি ঘরের দরজা বন্ধ করার পর সেখানে জামাআত না হয় বরং দরজা খোলার পর জামাআত করা সম্ভব হয়, তবে তা মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে না। যদিও সালাত আদায় করতে কোন লোককে নিষেধ না করা হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদের বাতি নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাবে না এবং ঘরের বাতিও মসজিদে আনবে না (খুলাসা)। মসজিদের বাতি রাতের তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখাতে কোন দোষ নেই। এর বেশী সময় জ্বালিয়ে রাখতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়াক্‌ফকারী বেশী সময় পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখার শর্তে ওয়াক্‌ফ করে অথবা সেখানকার লোকদের যদি বেশী সময় বাতি জ্বালিয়ে রাখার অভ্যাস থাকে, তবে বেশী সময় পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মসজিদের মধ্যে যে সব বস্তু পড়ে থাকে, যেমন চাটাই ইত্যাদি, এগুলোর থেকে কিছু যদি মুসল্লীর কাপড়ের সাথে জড়িয়ে আসে এবং সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ না করে, তবে এ সামান্য বস্তু ফেরত দেয়ার জন্য পুনরায় সে জায়গায় যাওয়া ওয়াজিব নয় (খুলাসা)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ তৈরী করে তা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ করে দেয়, তবে এর মেরামত, ইমারত, চাটাই এবং বিছানা বিছানো এবং বাতির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সেই অধিক হকদার। এমনিভাবে সক্ষম হলে আযান, ইকামত এবং ইমামতের ব্যাপারেও সে অধিক হকদার। যদি সে নিজে সক্ষম না হয়, তবে তার প্রস্তাবে অন্য কোন ব্যক্তি একাজের জন্য নির্দিষ্ট হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ সালাতের সময় ব্যতীত অন্য সময় মসজিদে বসাতে কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু এ সময় কোন কিছু ক্ষতি হলে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (খুলাসা)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ সালাতুল বিত্‌রের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সালাতুল বিত্‌রের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) তিন ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এক বর্ণনায় ফরয, অপর বর্ণনায় সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং তৃতীয় বর্ণনায় তাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। এ তৃতীয় মতটিই তাঁর শেষোক্ত মত। এটাই বিশুদ্ধ (মুহীত। সুরুখসী)।

২. মাসআলা ঃ বিত্‌র যদি 'ঈশার অধীন সুন্নাত হত, তাহলে তাকে শেষ রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা মাকরূহ্ হত। যেমন 'ঈশার সুন্নাত শেষ রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ দাঁড়ানোর শক্তি থাকা অবস্থায় বসে বসে বিত্‌র আদায় করা এবং ওযর ব্যতীত সওয়ারীর উপর আরোহণ করে বিত্‌র আদায় করা জাইয নেই (মুহীত ঃ সরুখ্‌সী)। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিত্‌র ছেড়ে দিলে অনেক দিন হয়ে গেলেও এর কাযা পড়া ওয়াজিব।

৪. মাসআলা ঃ নিয়্যাত ব্যতীত বিত্‌র আদায় করা দুরুস্ত নয় (কিফায়া)। বিত্‌রের কাযা পড়ার সময় দু'আ কুনূতসহ কাযা পড়তে হবে (মুহীত)। বিত্‌র শেষ রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা মুস্তাহাব। মাকরূহ্ নয়। যেমন ঈশার পরের সুন্নাত শেষ রাত্র পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা মাকরূহ্ (তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ সালাতুল বিত্‌র তিন রাকআত। এর মধ্যখানে কোন সালাম নেই (হিদায়া)। বিশুদ্ধ মতে বিত্‌রের সালাতে কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব (আলজাওয়াহরাতুন নায়্যারা)। তৃতীয় রাকআতে কিরাআত শেষ করে "আল্লাহু আকবর" বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানোর পর রুকূর আগে দু'আ কুনূত পাঠ করবে। সমস্ত বছরই এভাবে আমল করতে হবে। দু'আ কুনূত পাঠকালে সূরা ইনশিকাকের সমপরিমাণ সময় দাঁড়াতে হবে (মুহীত)। কুনূত পাঠের অবস্থায় হাত ছেড়ে দিবে না, হাত বেঁধে রাখবে। এ সম্বন্ধে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। তবে উত্তম হল, হাত বেঁধে রাখা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা ঃ ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই আস্তে আস্তে কুনূত পাঠ করবে। এটাই উত্তম। (নিহায়া)। যে ব্যক্তি একা বিত্‌র পড়বে, সেও আস্তে আস্তে কুনূত পড়বে। এটাই পসন্দনীয় মত (মাজমাউল বাহরায়ন ঃ ইব্‌নুল মালিক)।

৭. মাসআলা ঃ কুনূতের জন্য কোন দু'আ নির্দিষ্ট নেই (তাবয়ীন)। তবে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ

অতঃপর পড়বে ঃ

اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَنْ اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَلَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

যে ব্যক্তি উক্তরূপে দু'আ কুনূত পড়তে সক্ষম নয় সে رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ পাঠ করবে (মুহীত)। অথবা اَللّٰهُمَّ غْفِرْ لَنَا তিনবার পাঠ করবে। এটা আবুল লায়ছ সমরকন্দী (র)-এর মত (সিরাজিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি কুনূত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকূর মধ্যে স্মরণ হয়, তবে রুকূর মধ্যে সে কুনূত পড়বে না এবং কুনূত পড়ার জন্য পুনরায় দাঁড়াবেও না[১] (তাতারখানিয়্যা)। যদি সে পুনরায় দাঁড়ায় এবং কুনূত পাঠ করে কিন্তু পরে রুকূ না করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হবে না (বাহ্রুর' রাইক)। যদি রুকূ হতে মাথা উঠানোর পর স্মরণ হয় যে, তার কুনূত ছুটে গিয়েছে তবে যা বিস্মৃত হয়েছে, তা পাঠ করতে হবে না। এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত (মুযমারাত)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর সূরা মিলানো ভুলে গিয়ে কুনূত পাঠ করে রুকূতে চলে যায় এবং রুকূর অবস্থায় এ কথা স্মরণ হয়, তবে রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে প্রথমে সূরা মিলাবে। অতঃপর পুনরায় কুনূত পাঠ করে পুনরায় রুকূ করবে। অবশেষে সাহু সিজদা করবে। কেউ যদি সূরা ফাতিহা ভুলে যায়, তবে সে মাথা উঠিয়ে ফাতিহা, সূরা এবং কুনূত পুনরায় পাঠ করবে এবং রুকূও দ্বিতীয় বার করবে। যদি দ্বিতীয় বার রুকূ না করে, তবুও সালাত জাইয হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ ইমামের যদি রুকূর অবস্থায় স্মরণ হয় যে, সে কুনূত পাঠ করেনি, তবে কুনূত পাঠ করার জন্য তার পুনরায় না দাঁড়ানো উচিত। যদি সে দাঁড়িয়ে কুনূত পড়ে নেয়, তবে পুনরায় তার রুকূ না করা উচিত। এতদসত্ত্বেও সে যদি পুনরায় রুকূ করে নেয় এবং মুক্তাদীগণ যদি প্রথম রুকূতে তার অনুসরণ না করে, দ্বিতীয় রুকূতে অনুসরণ করে অথবা প্রথম রুকূতে

১. অবশ্যই সহু সিজদা করতে হবে।

অনুসরণ করে এবং দ্বিতীয় রুকূতে অনুসরণ না করে, তবে কোন অবস্থাতেই তাদের সালাত ফাসিদ হবে না (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ কুনূত পাঠের অবস্থায় রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করবে না। আমাদের মাশায়িখে কিরামের পসন্দনীয় মত এটাই (যহীরিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ বিত্‌রের কুনূতের মধ্যে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে। বিত্‌রের সালাতে ইমাম যদি মুক্তাদীর কুনূত পাঠ শেষ করার পূর্বে রুকূতে চলে যায়, তবে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম যদি কুনূত না পড়ে রুকূতে চলে যায়, এমতাবস্থায় মুক্তাদীদের কুনূতের সামান্য অংশ যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে রুকূ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে মুক্তাদীগণও রুকূতে চলে যাবে। আর যদি রুকূ ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে কুনূত পড়ে রুকূতে যাবে (খুলাসা)।

১৩. মাসআলা ঃ আল্লামা নাতিফী (র) তৎপ্রণীত কিতাব "আজনাস"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, বিত্‌রের সালাতে কারো যদি সন্দেহ হয় যে, সে প্রথম রাকআতে আছে, না দ্বিতীয় রাকআতে, না তৃতীয় রাকআতে, তবে সে যে রাকআতে আছে, সে রাকআতেই কুনূত পড়বে। অতঃপর বসবে এবং পরে দাঁড়িয়ে দুই বৈঠকসহ দুই রাকআত আদায় করবে। সতর্কতা হেতু এতদুভয় রাক'আতেও কুনূত পাঠ করবে। অপর এক বর্ণনা মতে, কোন রাকআতেই কুনূত পড়বে না। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাই বিশুদ্ধতম। কেননা, কুনূত পড়া ওয়াজিব। আর যে কাজ ওয়াজিব হওয়া এবং বিদ'আত হওয়ার মধ্যে ঘূর্ণায়মান, তা আদায় করার মধ্যেই সতর্কতা (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

১৪. মাসআলা ঃ মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সাথে কুনূত পড়বে। এরপর দ্বিতীয় বার আর কুনূত পড়বে না (মুনিয়্যা)। অর্থাৎ ইমামের সাথে একবার কুনূত পড়ার পর পরে নিজের অবশিষ্ট সালাত আদায়ের সময় সে পুনরায় আর কুনূত পড়বে না (মুহীত, সুরুখ্‌সী)। এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ সকলেই একমত (মুযমারাত)। মাসবূক ব্যক্তি যদি তৃতীয় রাকআতের রুকূতে ইমামের সাথে শরীক হয় এবং কুনূত পড়ার সুযোগ না পায়, তবে অবশিষ্ট সালাত আদায় করার সময় সে আর কুনূত পড়বে না (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ বিত্‌র ব্যতীত অন্য কোন সালাতে কুনূত পড়বে না। (মুতূন)। কোন ব্যক্তি যদি বিত্‌রের সালাতে রুকূর পর কাওমার অবস্থায় কুনূত পড়ে, তবে তার পেছনের মুক্তাদী যদি অন্য মাযহাবের হয়, তাহলে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে এবং কাওমার অবস্থায় কুনূত পড়বে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম যদি ফজরের সালাতে কুনূত পড়ে, তবে তাঁর পেছনের মুক্তাদীগণ চুপ করে থাকবে (হিদায়া)। অর্থাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এটাই বিশুদ্ধ মত (নিহায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম পরিচ্ছেদ ঃ নফল[১] সালাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত এবং যুহর, মাগরিব ও ঈশার ফরযের পর দুই রাকআত করে সুন্নাত যুহরের ফরযের পূর্বে এবং জুম'আর ফরযের পূর্বে ও পরে চার রাকআত সুন্নাত (মুতূন)। আমাদের মাযহাবে চার রাকআত এক সালামে আদায় করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি চার রাকআত দুই সালামে আদায় করে, তবে তাতে সুন্নাত আদায় হবে না। সবচেয়ে বেশী তাকিদ দেয়া হয়েছে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের প্রতি। অতঃপর মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত। এরপর যুহরের ফরযের পরের দুই রাকআত সুন্নাত। এরপর ঈশার ফরযের পরের দুই রাকআত সুন্নাত। এরপর যুহরের ফরযের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাত (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন, কোন ফকীহ্ ব্যক্তি যদি ফাতওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে তবে তার জন্য সমস্ত সুন্নাত ছাড়া জাইয আছে। কেননা, ফাতওয়ার ব্যাপারে লোকেরা খুবই মুখাপেক্ষী। কিন্তু ফজরের সুন্নাত ছাড়তে পারবে না। (নিহায়া)। ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর কারো যদি এ কথা মনে হয় যে, রাত্র এখনো বাকী রয়েছে। অতঃপর এ কথা প্রকাশিত হল যে, তখন সুবহে সাদিক উদিত হয়েছিল, তাহলে এ ব্যক্তির করণীয় কি ? এ সম্পর্কে কাযী আলাউদ্দীন মাহমুদ নাসাফী (র) "শরহুল মুখতালিফাত"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, এ মাসআলা সম্পর্কে কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় না। তবে মুতাআখ্খির আলিমদের মতে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত তার আদায় হয়ে যাবে। ইমাম শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) কিতাবুস্ সালাতের শরাহ্তে লিখেন, উপরোক্ত মাসআলার যাহিরী জওয়াব হল, এতে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এ সালাত ওয়াক্তের ভেতরই আদায় করা হয়েছে (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার ক্ষমতা রাখে, সে যদি ফজরের সুন্নাত বসে আদায় করে, তবে তা জাইয হবে না। এ কারণেই বলা হয় যে, ফজরের সুন্নাত ওয়াজিবের নিকটবর্তী (তাতারখানিয়া ঃ নাফি'-এর সূত্রে)। ফজরের সুন্নাত ওযর ব্যতীত সওয়ারীর উপর পড়া জাইয নেই (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত এবং ফজরের সুন্নাত আউয়াল ওয়াক্তে নিজ গৃহে আদায় করাও সুন্নাত (খুলাসা)। এ দুই রাক'আত সুন্নাত সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে আদায় করা জাইয নেই।' যদি সুন্নাত আরম্ভ করতেই ফজর উদিত হওয়া শুরু হয়, তবে এ সালাত দুরুস্ত হবে। যদি

১. নফল অর্থে ফরয, ওয়াজিব নয়, সুন্নাতও এর অন্তর্ভুক্ত।

উদিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে এ সালাত দুরুস্ত হবে না। ফজর উদিত হওয়ার পর যদি কেউ দুইবার সুন্নাত পড়ে, তবে তার শেষোক্ত সালাতই সুন্নাত বলে গণ্য হবে। কেননা, এ সালাতই ফরযের নিকটবর্তী এবং এতদুভয় সালাতের মাঝে কোন ব্যবধান নেই। সর্বোপরি সুন্নাত সালাত তো তাই, যা ফরযের সাথে মিলিতভাবে আদায় করা হয়। সুন্নাত সালাত যথাস্থানে সময় মত আদায় করা না হলে এর কাযা পড়তে হবে না। অবশ্য ফজরের সুন্নাতের হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ফজরের সুন্নাত যদি ফরযসহ ছুটে যায়, তবে সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তা কাযা করবে। এ সময়ের ভিতর সম্ভব না হলে সুন্নাতের আর কাযা পড়তে হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এটাই বিশুদ্ধ মত (বাহ্রুর রাইক)। আর যদি ফরয ব্যতীত কেবল সুন্নাত কাযা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এর কাযা করতে হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এর কাযা করতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ কারো যদি যুহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছুটে যায় যেমন, কেউ সুন্নাত আদায় না করে ইমামের সাথে জামাআতের সালাতে শরীক হয়ে গেল, তবে অধিকাংশ ফকীহ্র মতে যুহরের ফরয থেকে ফারিগ হওয়ার পর সে এ সুন্নাত আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকী থাকে। এটাই বিশুদ্ধ মত (মুহীত)। "হাকাইক" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ফরযের পরপরই দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। এর পরে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, প্রথমে চার রাকআত সুন্নাত এবং পরে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। এর উপরই ফাতওয়া (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ কেউ বলেন, একা সালাত আদায় করার সময় ফজর ও যুহরের সুন্নাত আদায় না করাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্যান্য ফকীহ্ তা বলেন, কোন অবস্থাতেই উহা বর্জন করা জাইয নেই। এ মতটিই সর্বাধিক সতর্কতাপূর্ণ। সুন্নাতকে হক মনে না করে কেউ যদি সুন্নাত বর্জন করে, তবে সে কুফ্রী করল। কেননা, সে সুন্নাতকে তুচ্ছ মনে করে বর্জন করেছে। কিন্তু সুন্নাতকে হক জেনে কেউ যদি সুন্নাত বর্জন করে, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে সে গুনাহ্গার হবে। কেননা, সুন্নাত বর্জন করার ব্যাপারে হাদীছে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাত আদায় করে এবং প্রথম বৈঠক না করে তবে استحسانا (قياس خفى) জাইয হবে। (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত, ঈশার ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত এবং মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামায মুস্তাহাব (কানয)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আসরের পূর্বে এবং ঈশার পর চার রাকআত সুন্নাত পড়া ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে উত্তম হল, উভয় স্থানেই চার রাকআত করে আদায় করা (কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ ইশরাকের দুই রাকআত/চার রাকআত সুন্নাতের উল্লেখ করা হয়নি।

pdf By Syed Mostofa Sakib

চাশতের সালাত মুস্তাহাব। কমপক্ষে দুই রাকআত এবং বেশীর পক্ষে বারো রাকআত পড়বে। এর সময় সূর্য সামান্য উপরে উঠার পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত।

৯. মাসআলা ঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ মুস্তাহাব। তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকআত। উযূর পর দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূ আদায় করাও মুস্তাহাব। ইস্তিখারার সালাত মুস্তাহাব এবং এ সালাত হল, দুই রাকআত। সালাতুল হাজত মুস্তাহাব। এও দুই রাকআত।

১০. মাসআলা ঃ এমনিভাবে তাহাজ্জুদের সালাতও মুস্তাহাব[১] (বাহ্রুর রাইক)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদের সর্বোচ্চ রাকআত ছিল আট রাকআত এবং সবনিম্ন সংখ্যা ছিল দুই রাকআত (ফতহুল কাদীর ঃ মাবসূতের সূত্রে)।

১১. মাসআলা ঃ সালাতুত তাসবীহ্ নামাযও মুস্তাহাব। "মুলতাকাত" নামক কিতাবের বর্ণনা মতে, সালাতুত তাসবীহ্ পড়ার নিয়ম হল, প্রথমে তাক্বীর তাহ্রীমা বলে ছানা পড়বে। অতঃপর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পনের বার বলবে। অতঃপর আউযুবিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং পরে সূরা মিলাবে। এরপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এ দু'আ দশবার পড়বে। অতঃপর রুকূতে দশবার রুকূ থেকে উঠে দশবার, প্রত্যেক সিজদায় দশবার এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে দশ বার উক্ত তাসবীহ্ পাঠ করবে। এভাবে চার রাকআত সালাত আদায় করবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, এ সালাতের জন্য কোন সূরা আপনার জানা আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ, জানা আছে। তা হল, সূরা তাকাছুর, সূরা ওয়াল আসর, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস। মু'আল্লা (র) বলেন, এ সালাত যুহরের পূর্বে আদায় করা ভাল (মুযমারাত)।

১২. মাসআলা ঃ প্রত্যেক ওয়াক্তে কিছু নফল সালাত আদায় করা মস্তাহাব (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। দিনের নফল এক সালামে চার রাকআতের অধিক পড়া এবং রাতের নফল এক সালামে আট রাকআতের অধিক পড়া মাক্রূহ্। উত্তম হল, চার রাকআত করে আদায় করা। কেননা, এতে বেশী সময় তাহ্রীমার মধ্যে থাকা হয়। ফলে এর মধ্যে কষ্টও বেশী হয়। সুতরাং এতে ফযীলতও বেশী রয়েছে। অতএব, কেউ যদি এক সালামে চার রাক'আত আদায় করার মান্নত করে, তবে দুই সালামে পড়লে মান্নত আদায় হবে না। কিন্তু কেউ যদি দুই সালামে চার রাক'আত পড়ার মান্নত করে, তবে এক সালামে চার রাকআত পড়লে মান্নত আদায় হয়ে যাবে (তাবয়ীন)।

১৩. মাসআলা ঃ সুন্নাত ও নফল সালাত নিজের ঘরে পড়া উত্তম। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, পুরুষের সালাত ঘরেই উত্তম। কিন্তু ফরয সালাত মসজিদে পড়া উত্তম। যদি মসজিদের বারান্দা থাকে এবং মসজিদের মধ্যে জামাআত হয়, তবে সুন্নাত বারান্দায় পড়া উত্তম। মসজিদ যদি একই হয়, যদি বারান্দায় জামাআত হয়, তবে মসজিদের ভেতর সুন্নাত পড়া উত্তম। মসজিদ যদি একই হয়, তবে খুঁটির আড়ালে সুন্নাত পড়া উত্তম। কাতারের পেছনে কোন বস্তুকে আড়াল করা ব্যতিরেকে সুন্নাত আদায় করা মাক্রূহ্। জামাআতের কাতারের সাথে মিলে সুন্নাত পড়া সাংঘাতিক ভাবে মাকরূহ্। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ইমাম জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে মশগুল থাকে। ইমামের জামাআত আরম্ভ করার পূর্বে মসজিদের যেখানে ইচ্ছা সুন্নাত আদায় করতে পারবে।

১. মুস্তাহাব না বলে সুন্নাত বলাই উত্তম ছিল, কারণ সকল মুস্তাহাব সালাতের মাঝে তাহাজ্জুদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাই সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা বলা উত্তম।

১৪. মাসআলা ঃ ফরযের পর যে সুন্নাত রয়েছে, তা ঐ স্থানেই আদায় করবে, যে স্থানে ফরয আদায় করা হয়েছে। তবে উত্তম হল, এক কদম পিছিয়ে (সম্ভব হলে) সুন্নাত আদায় করা। ইমাম অবশ্যই ফরয পড়ার স্থান হতে সরে সুন্নাত আদায় করবে (কাফী)। হুলওয়ানী (র) বলেন, তারাবীহ্ ব্যতীত সমস্ত সুন্নাতই ঘরে আদায় করা উত্তম। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, কখনো কখনো সুন্নাত ঘরে আদায় করা উত্তম। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হল, ফযীলতের ক্ষেত্রে সব জায়গাই সমান। তবে যে স্থানে রিয়া কম হয়, ইখলাস বেশী থাকে, একাগ্রতা ও মনোযোগ বেশী পয়দা হয় এবং খুশূ-খুযূ বেশী থাকে, ঐ স্থানেই সুন্নাত পড়া উত্তম (নিহায়া)।

১৫. মাসআলা ঃ যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং জুমুআর পূর্বে ও পরে চার রাকআত সুন্নাত পড়ার সময় প্রথম বৈঠকে নবী (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করবে না এবং তৃতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে সুবহানাকাও পড়বে না। কিন্তু চার রাকআত বিশিষ্ট নফল সালাতে এর ব্যতিক্রম করবে। অর্থাৎ প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়বে এবং তৃতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে সুবহানাকাও পড়বে (যাহিদী)।

১৬. মাসআলা ঃ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত এবং যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর বেচা-কেনা বা পানাহারে মশগুল হলে সুন্নাত পুনরায় পড়তে হবে। অবশ্য এক লোকমা খানা খেলে বা একবার পানি পান করলে সুন্নাত বাতিল হবে না (খুলাসা)।

১৭. মাসআলা ঃ ফরয পড়ার পর কথা বললে সুন্নাত বাতিল হবে কিনা এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, বাতিল হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেন, বাতিল হবে না। তবে কথা না বলে সুন্নাত পড়ার তুলনায় কথা বলার পর সুন্নাত পড়লে ছওয়াব কমে যাবে (নিহায়া)।

১৮. মাসআলা ঃ নফলের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর এর সাথে সূরা মিলাতে হবে। কেউ যদি এক বা দুই রাকআতে কিরাআত না পড়ে, তবে তার এ দুই রাকআতই বাতিল হয়ে যাবে (মুযমারাত)। কেউ যদি এ ধারণায় নফল পড়তে আরম্ভ করে যে, এ সালাত তার দায়িত্বে বাকী রয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরে এ কথা প্রকাশ হল যে, তার দায়িত্বে কোন সালাত বাকী নেই, তাই সে তা ছেড়ে দিল, তবে এ সালাতের কাযা পড়তে হবে না (যাহিদী)।

১৯. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ যদি কোন রাকআতের কথা উল্লেখ না করে নফলের নিয়্যাত করে নফল আরম্ভ করে দেয়, তবে দুই রাকআতের অধিক পড়া তাঁর জন্য অপরিহার্য নয়। অবশ্য যদি চার রাকআতের নিয়্যাত করে নফল আরম্ভ করে, তবে এর মধ্যে ইমামদের মতভেদ আছে (খুলাসা)। কেউ যদি চার রাকআত নফলের নিয়্যাত করে সালাত আরম্ভ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে দুই রাক'আত আরম্ভ করল (কিনয়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি চার রাকআত নফল পড়ে এবং দুই রাকআত আদায়ের পর ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম বৈঠকে না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে استحسانا তার সালাত ফাসিদ হবে না। কিয়াস অনুযায়ী ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। কেউ যদি তিন রাকআত নফল পড়ে এবং দুই রাকআতের পর না বসে, তবে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে । কেউ যদি এক বৈঠকে ছয় রাকআত বা আট রাকআত নফল আদায় করে, তবে এ মাসআলায় মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমামুস্‌সিফার "আসল"-এর নিজ কপিতে উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি নফল সালাতের প্রথম বৈঠকে না বসে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী সে প্রথম বৈঠকে ফিরে আসবে এবং বসবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে সে প্রথম বৈঠক করবে না। অবশ্য শেষে সাহু সিজদা করবে (খুলাসা)। চার রাকআত নফলের নিয়্যাত করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি চার রাকআতের নিয়্যাত না করা অবস্থায় এরূপ হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকআতের পর না বসে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে অবশ্যই তাকে ফিরে এসে প্রথম বৈঠক করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। ফিরে না এলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (বরজুন্দী)

২১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাতের হুকুম নফলের হুকুমের মতই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ বিষয়ে কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান উভয়ের পৃথক পৃথক দাবী রয়েছে। ইস্‌তিহ্‌সানের দাবী অনুসারে এ সালাত ফাসিদ হবে না। এ মতটিই গ্রহণযোগ্য (মুযমারাত)।

২২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিত্‌রের হুকুমও নফলের হুকুমের মতই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এর মধ্যেও কিয়াস এবং ইস্‌তিহ্‌সানের পৃথক পৃথক দাবী রয়েছে। ইস্‌তিহ্‌সানের দাবী অনুসারে সালাত ফাসিদ হবে না এবং কিয়াস অনুসারে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি উযূ ব্যতীত অথবা নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় নফল আরম্ভ করে, তবে সে নামাযে দাখিল হয়েছে বলে গণ্য হবে না। যেহেতু সে দাখিলই হয়নি এবং তার শুরুই যেহেতু সহীহ্ হয়নি, তাই এর কোথাও তার উপর ওয়াজিব নয় (মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্যও বসে নফল আদায় করা জাইয আছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে এভাবে নফল আদায় করা মাকরূহ্ নয়। (শরহে মাজমা' উল বাহ্‌রায়ন ঃ ইবনুল মালিক)। কেউ যদি নফল সালাত দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে পরে ওযর ব্যতীত বসে পড়ার ইচ্ছা করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে استحسانا এরূপ করা তার জন্য জাইয আছে (মুহীত)। কোন ব্যক্তি যদি নফল দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে অতঃপর ক্লান্ত হয়ে লাঠি অথবা দেয়ালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, তবে কোন ক্ষতি নেই (শরহ জামিউস্ সগীর আল-হসামী)।

২৫. মাসআলা ঃ ওযর ব্যতীত কেউ যদি নফল সালাত ইশারা করে আদায় করে, তবে দুরুস্ত হবে না। নফল সালাত শুরু করে কেউ যদি ভঙ্গ করে দেয় এবং এমনভাবে ভঙ্গ করে যে, সে তাহরীমা থেকেও বের হয়ে যায়, যেমন, উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া অথবা কারো সাথে কথাবার্তা বলা, তবে এর উপর বাকী দুই রাকআতের বিনা করা সহীহ্ হবে না। আর যদি তাহ্‌রীমা থেকে বের না হয়, যেমন কিরাআত তরক করা, তবে এর উপর বাকী দুই রাকআতের বিনা করা সহীহ্ হবে (তাতারখানিয়্যা)।

২৬. মাসআলা ঃ দাঁড়ানোর শক্তি না থাকা অবস্থায় কেউ যদি নফল বা ফরয সালাত বসে আদায় করে, তবে তার ইখ্‌তিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে কিরাআত পড়া অবস্থায় উভয় হাঁটুর পাশে রেখে হালকা বানিয়ে বসবে অথবা চার জানু হয়ে বসবে (তাতারখানিয়্যা ঃ শরহ্‌ত তাহাবী সূত্রে বর্ণিত)। তবে উত্তম হল, তাশাহহুদের অবস্থার ন্যায় বসে কিরাআত পড়া (হিদায়া)। নফল শুরু করে কেউ যদি এর কিছু অংশ বসে আদায় করে, অতঃপর বাকী সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করে, তবে সমস্ত ইমামের মতে তার সালাত জাইয হবে (মুহীত)। এভাবে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ও নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী) (র)।

২৭. মাসআলা ঃ নফল সালাত বসে আদায় করা অবস্থায় কেউ যদি রুকূ দাঁড়িয়ে আদায় করে, তবে উত্তম হল, দাঁড়ানো অবস্থায় কিছু কিরাআতও পাঠ করা। যদি সোজা দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া ব্যতিরেকে রুকূতে চলে যায়, তবে সালাত জাইয হবে। আর যদি সোজা না দাঁড়িয়ে রুকূতে চলে যায়, তবে সালাত দুরুস্ত হবে না (খুলাসা)।

২৮. মাসআলা ঃ চার রাকআতের নিয়্যাত করে কেউ যদি প্রথম বৈঠকের পূর্বে বা পরে তা ফাসিদ করে দেয়, তবে সে দুই রাকআত কাযা করবে (কান্‌য)। যুহরের সুন্নাতেরও এই হুকুম। কেননা, এও নফল। কেউ কেউ বলেন, সতর্কতাবশত চার রাকআত কাযা করবে। কারণ এ চার রাকআত একই সালাতের অন্তর্ভুক্ত (হিদায়া ও কাফী)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুযমারাত)। নিসাব কিতাব প্রণেতা সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, এ মতটিই বিশুদ্ধতম (বাহ্‌রুর রাইক)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকআতের পর না বসে তৃতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর স্মরণ হয় যে, সে প্রথম বৈঠক করেনি, তাহলে সে প্রথম বৈঠকে ফিরে আসবে। যদিও তা যুহরের সুন্নাত হয়। আলী বাযদূবী (র) বলেন, সে ফিরে আসবে না। চার রাকআতের নিয়্যাত না করা অবস্থায় কেউ যদি দ্বিতীয় রাকআতের পর না বসে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে সমস্ত ইমামের মতে সে প্রথম বৈঠকে ফিরে আসবে। ফিরে না আসলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে (বরজুনদী)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি চার রাকআতের নিয়্যাত করে দুই রাকআতের পর বসে এবং এরপর সালাম ফিরায় বা কথা বলে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, তার দুই রাকআত কাযা করতে হবে। চার রাকআতের নিয়্যাত করে যদি কেউ চার রাকআতের কোন রাকআতেই কিরাআত না পড়ে অথবা শেষের দুই রাকআতের শুধু এক রাকআতে কিরাআত পড়ে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম দুই রাকআতের কাযা পড়বে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে চার রাকআতের কাযা করতে হবে। কেউ যদি চার রাকআত নফলের প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআতে পড়ে অথবা প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে শুধু কিরাআত পড়ে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে চার রাকআত কাযা পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতের কাযা পড়বে। কোন ব্যক্তি যদি প্রথম দুই রাকআতে শুধু কিরাআত পড়ে অথবা প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষের এক রাকআতে কিরাআত পড়ে, তবে সমস্ত ইমামের মতে সে শেষের দুই রাকআতের কাযা পড়বে। কোন ব্যক্তি যদি শুধু শেষের দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে অথবা শেষের দুই রাকআতে এবং প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত পড়ে, তবে সমস্ত ইমামের মতে সে প্রথম দুই রাকআতের কাযা করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, বিষয়ে বিধান হল এই যে, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা অথবা প্রথম দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহ্রীমা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং কিরাআতবিহীন অবস্থায় যেহেতু প্রথম রাকআতের সিজদা হয়ে গিয়েছে, তাই এর উপর বিনা কোনক্রমেই সহীহ্ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত বর্জন করার ফলে তাহরীমা বাতিল হয় না। কেননা, কিরাআত হল, সালাতের এক অতিরিক্ত রুকন। কারণ কোন কোন অবস্থায় কিরাআত ছাড়াও সালাত সহীহ্ হয়ে যায়। যেমন উম্মী, মূক এবং মুক্তাদীর সালাত। অবশ্য কিরাআত তরক করার কারণে আদা ফাসিদ হয়ে যায়। তাহ্রীমা বাতিল হয় না। অতএব, শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ্ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে যায়। কেননা, কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের সকলেই একমত। সুতরাং এ অবস্থায় প্রথম দুই রাকআতের উপর বিনা সহীহ্ হবে না। প্রথম দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে কিরাআত তরক করা হলে এ সম্বন্ধে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। সুতরাং কাযা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আমরা বলি যে, এ তাহ্রীমা বাতিল হয়ে যাবে এবং শেষের দুই রাকআত আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আমরা সতর্কতা হেতু বলি যে, তাহরীমা এখনো বাকী আছে (তাবয়ীন)।

৩১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নফলের প্রথম দুই রাকআতে শরীক হয়েছে, সে যদি ইমামের শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করার পূর্বেই কথা বলে ফেলে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে প্রথম দুই রাকআতের কাযা করবে। আর সে যদি ইমামের শেষের দুই রাকআত শুরু করার পর কথা বলে এবং উপরোক্ত চার রাকআতেই কিরাআত পড়ে থাকে, তবে সে চার রাকআত কাযা করবে। কোন ব্যক্তি যদি শেষের দুই রাকআতে ইমামের পেছনে ইকতেদা করে এবং ইমামের সাথে এ দু'রাকআত পূরা করে, তবে সে প্রথম দুই রাকআতের কাযা করবে।

৩২. মাসআলা ঃ নফলের নিয়্যাত করে কোন ব্যক্তি যদি যুহর আদায়কারীর পেছনে সালাতের প্রথমাংশে অথবা শেষাংশে ইকতেদা করে, অতঃপর কারো সাথে কথা বলে, তবে সে চার রাকআত কাযা করবে। নফলের নিয়্যাত করে কেউ যদি যুহর আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করে, অতঃপর তার স্মরণ হয় যে, সে যুহরের ফরয পড়েনি, তখন সে যদি নফল ছেড়ে দিয়ে নতুনভাবে যুহরের নিয়্যাত করে তাকবীর বলে, তবে তাকে কাযা পড়তে হবে না। এক ব্যক্তি যুহরের ফরয পড়ছে, এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তি এসে বলল, আমি তার পেছনে এই নফল পড়ার মান্নত করলাম। অতঃপর তার স্মরণ হল যে, সে যুহর পড়েনি। তৎক্ষণাৎ সে যুহরের নিয়্যাত করে তার সাথে শরীক হয়ে গেল। তবে তার যুহরের সালাত আদায় হয়ে যাবে এবং কোন কাযা পড়তে হবে না।

৩৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি চার রাকআত নফল পড়ে পঞ্চম রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর পর অপর এক ব্যক্তি এসে পঞ্চম রাকআতে তার পেছনে ইকতেদা করল, পরে ইমাম তার সালাত ফাসিদ করে দিল। এমতাবস্থায় মুক্তাদী ছয় রাকআতের কাযা পড়বে। কোন ব্যক্তি দুই রাকআত আদায় করার পর অপর ব্যক্তি এসে যদি তার পেছনে ইকতেদা করে, অতঃপর মুক্তাদীর নাক হতে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয় এবং সে উযূ করতে যায়। এ সময় ইমাম আরো তিন রাকআত আদায় করে নেয়। ইত্যবসরে মুক্তাদী অন্যের সাথে কথাবার্তাও বলে। এদিকে ইমাম ছয় রাকআত পড়ে সালাত শেষ কর দেয়। এরূপ অবস্থায় মুক্তাদী চার রাকআত কাযা করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

আনুষংগিক আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি সুন্নাত সালাতের মান্নত করে এবং ঐ মান্নত আদায় করে, তবে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। মুহীত গ্রন্থ প্রণেতা ফকীহ্ তাজুদ্দীন (র) বলেন, এত সুন্নাত আদায় হবে না। কেননা, মান্নত করার কারণে তা আর সুন্নাত থাকেনি। বরং অন্য সালাতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ সালাত সুন্নাত সালাতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। (আল বাহ্রুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি এরূপ বলে যে, আমি একদিন সালাত আদায় করার মান্নত করলাম, তবে দুই রাকআত পড়া তার উপর ওয়াজিব হবে (কিন্য়া)।

কেউ যদি এক মাস সালাত আদায় করার মান্নত করে, তবে এক মাসের মধ্যে যত ফরয এবং যত বিত্র আছে ঐ পরিমাণ সালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। সুন্নাত পড়া আবশ্যক হবে না।[১] অবশ্য বিত্র ও মাগরিবের তিন তিন রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত করে আদায় করতে হবে (আল বাহ্রুর রাইক)। কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকআত সালাত উযূ ব্যতীত আদায় করার মান্নত করলাম, তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (সিরাজিয়্যা)। যদি বলে, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিরাআত ব্যতীত দুই রাকআত সালাত আদায় করার মান্নত করলাম, তবে আমাদের তিন ইমামের মতে কিরাআতসহ সালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে।

১. এর অর্থ সে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্তের ফরয এবং বিত্র অবশ্য পড়ে মান্নত পূরা করার জন্য ফরয পরিমাণ পড়বে ও তিন রাকআত নামায চার রাকআত পড়ে মান্নত আদায় করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে অর্ধ-রাকআত বা এক রাকআত সালাত আদায় করার মান্নত করলাম, তবে তার উপর দুই রাকআত পড়া ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। এটাই পসন্দনীয় মত। কেউ যদি তিন রাকআতের মান্নত করে, তবে চার রাকআত আদায় করা তার জন্য আবশ্যক হবে। কোন ব্যক্তি যদি যুহ্রের ফরয আট রাকআত পড়ার মান্নত করে, তবে চার রাকআত পড়াই তার জন্য আবশ্যক হবে (খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ দুই রাকআত সালাত আদায় করার মান্নত করে তা যদি বসে আদায় করে তবে মান্নত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সওয়ার হয়ে পড়লে মান্নত আদায় হবে না। (সিরাজিয়্যা)। দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার মান্নত করলে দাঁড়িয়ে পড়াই আবশ্যক হবে। তখন কোন বস্তুর উপর হেলান দেয়া মাকরূহ্ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আজ দুই রাকআত সালাতের মান্নত করলাম, কিন্তু পরে পড়ল না, তবে কাযা করতে হবে। কেউ যদি কসম খেয়ে বলে, আমি আজ দুই রাকআত আদায় করব কিন্তু আসলে আদায় করল না, তবে সে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিবে। কিন্তু কাযা করতে হবে না। কেউ যদি মান্নত করে যে, সে মাসজিদুল হারামে অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে সালাত আদায় করবে, অতঃপর সে অন্যত্র এ সালাত আদায় করল, তবে তার মান্নত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র) এ মতের বিরোধিতা করেন (সিরাজিয়্যা)।

সালাতুত তারাবীহ্-এর মাসাইল

১. মাসআলা ঃ তারাবীহ্-এর সালাতে পাঁচ তারবীহা রয়েছে। প্রত্যেক তারবীহাতে আছে চার রাকআত। এ চার রাকআত দুই সালামে আদায় করতে হবে (সিরাজিয়্যা)। জামাআতের সাথে পাঁচ তারবীহার অধিক তারাবীহ্ পড়া মাকরূহ্ (খুলাসা)। সহীহ্ মতে তারাবীহ্ এর ওয়াক্ত ঈশার পর হতে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। কিন্তু তারাবীহ বিতরের আগে-পরে উভয় অবস্থায়ই আদায় করা যায়। সুতরাং এ কথা যদি প্রকাশ হয় যে, কোন ব্যক্তি ঈশা বিনা উযূতে এবং তারাবীহ্ ও বিত্র উযূর সাথে আদায় করেছে, তবে ঈশার সাথে তারাবীহ্ পুনরায় আদায় করতে হবে। বিত্র পুনরায় আদায় করতে হবে না। কেননা, তারাবীহ্ ঈশার অধীন সালাত। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। কিন্তু বিত্রের সালাত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে "ওয়াক্তের মধ্যে" ঈশার সালাতের অধীন নয়। তবে ঈশার সালাতকে বিত্রের সালাতের আগে পড়া শুধু তারতীবের জন্য ওয়াজিব। অবশ্য ভুলে যাওয়ার কারণে এ তারতীব জরুরী থাকে না। সুতরাং কেউ যদি ভুলবশত ঈশার পূর্বে বিত্র আদায় করে, তবে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারাবীহ্-এর সালাত এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ঈশা আদায় করার পর তারাবীহ-এর সময় হয়। সুতরাং যে সালাত ঈশার পূর্বে আদায় করা হয়েছে, তা ধর্তব্য নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তারাবীহ্-এর ন্যায় বিত্রও ঈশার সুন্নাত। সুতরাং ঈশা আদায় করার পর এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। তাই কেউ যদি ভুলেও ঈশার আগে বিত্র আদায় করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তারাবীহ-এর ন্যায় বিত্রও পুনরায়

আদায় করা ওয়াজিব হবে। মোট কথা, বিত্র পুনঃআদায় করার মাঝে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তারাবীহ্ এবং ঈশার বাকী সুন্নাত আদায় করার ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই যদি ওয়াক্ত বাকী থাকে (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ দুই তারবীহার মধ্যে এক তারবীহার সমপরিমাণ সময় বসা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে পঞ্চম তারবীহা এবং বিত্রের মাঝেও এ পরিমাণ বসা মুস্তাহাব (কাফী ও হিদায়া)। ইমাম যদি মনে করে যে, পঞ্চম তারবীহা এবং বিত্রের মাঝে এ পরিমাণ সময় বসলে জামাআতের লোকদের কষ্ট হবে, তবে এ পরিমাণ সময় বসবে না (সিরাজিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ বসা অবস্থায় মুসল্লীগণ তাসবীহ্ পড়তে পারবে এবং ইচ্ছা করলে চুপ চাপ বসেও থাকতে পারবে। মক্কাবাসী লোকেরা এ সময় সাতবার তাওয়াফ করে নেয় এবং দুই রাকআত সালাত আদায় করে নেয়। মদীনার লোকেরা এ সময় একা একা চার রাকআত সালাত আদায় করে নেয় (তাবয়ীন)।

পাঁচ সালামের পর আরাম গ্রহণ করা জমহুর আলিমদের নিকট মাকরূহ্ (কাফী)। এটাই বিশুদ্ধ মত (খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ তারাবীহ্-এর সালাত রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অথবা অর্ধরাতের মধ্যে আদায় করা মুস্তাহাব। অর্ধরাত্রির পর আদায় করা সম্বন্ধে ফকীহ্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে মাকরূহ্ হবে না।

৫. মাসআলা ঃ তারাবীহ্-এর সালাত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত। কেউ কেউ বলেন, এটা উমর (রা)-এর সুন্নাত তবে প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধতম (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। তারাবীহ্র সালাত পুরুষ এবং মহিলা সকলের জন্য সুন্নাত (যাহিদী)। বস্তুত আমাদের মাযহাবে তারাবীহ্ সুন্নাত। যেমন হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, মুস্তাহাব। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধতম। তারাবীহ্র জামাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া (তাবয়ীন)। এটাই সহীহ মত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি তারাবীহ জামাআত ব্যতীত আদায় করে অথবা মহিলারা যদি পৃথক পৃথকভাবে নিজ গৃহে তারাবীহ্ আদায় করে, তবে তারাবীহ্ আদায় হয়ে যাবে (মিরাজুদ দিরায়া)।

৬. মাসআলা ঃ যদি মসজিদের সমস্ত মুসল্লী তারাবীহ্-এর জামা'আত ছেড়ে দেয়, তবে তারা খারাপ করল এবং সকলেই গুনাহ্গার হবে। (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কোন এক ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দেয় এবং নিজ গৃহে তারাবীহ্ আদায় করে, তবে সে ফযীলত ছেড়ে দিল। কিন্তু সে গুনাহ্গার হবে না এবং সুন্নাত বর্জনকারীও হবে না। কোন ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, লোকেরা তার ইকতেদা করে, অনুসরণ করে এবং তার উপস্থিতির কারণে জামাআতে লোক বেশী হয় এবং তার অনুপস্থিতির কারণে লোক কম হয়, তবে এরূপ ব্যক্তির জামাআত ছাড়া উচিত নয় (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি ঘরে জামাআতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করে, তবে এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে ঘরে জামাআত করলেও ফযীলত রয়েছে। তবে মসজিদের জামাআতে অন্য ধরনের ফযীলত রয়েছে। কেউ যদি ঘরে জামাআতের সাথে তারাবীহ্ আদায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে, তবে সে জামাআতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করার ফযীলত লাভ করল। কিন্তু অন্য ফযীলত তার ছুটে গেল। কাযী আবূ আলী নাসাফী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শুদ্ধ মতে মসজিদে জামাআতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করা উত্তম। ফরয সালাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। কোন ফকীহ্ ব্যক্তি যদি কারী হন, তবে উত্তম হল নিজের কিরাআতে স্বীয় সালাত আদায় করা। অন্যের পেছনে ইকতেদা না করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ কাযী আবূ আলী নাসাফী (র) বলেন, নিজ মহল্লার মসজিদের ইমামের কিরাআতে যদি ভুল থাকে, তবে নিজ মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মহল্লায় তারাবীহ্-এর জামাআত তালাশ করাতে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে অন্য মহল্লার ইমামের কিরাআত যদি হালকা হয় এবং আওয়ায যদি সুন্দর হয়, তবে এ ইমামের পেছনে তারাবীহ্ পড়াতেও কোন ক্ষতি নেই। এতে এ কথাও প্রতিভাত হচ্ছে যে, যদি কারো নিজ মহল্লার মসজিদে কুরআন শরীফ খতম না হয়, তবে তার জন্য জাইয আছে নিজ মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে খতমে তারাবীহ্ তালাশ করা (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ মুসলমানদের জন্য উচিত তারাবীহ্র সালাতে সুন্দর লাহানে তিলওয়াতকারীকে ইমাম না বানিয়ে শুদ্ধ পাঠকারীকে ইমাম নিয়োজিত করা। কেননা, ইমাম সুন্দর আওয়াযে তিলাওয়াত করলে খুশূতে এবং আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ শুধু রমযান মাসে বিত্‌রের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করবে। এ বিষয়ে মুসলমানদের ইজমা (ঐকমত্য) সংঘটিত হয়েছে (তাবয়ীন)। রমযানে বিতরের সালাত ঘরে পড়ার চেয়ে জামাআতের সাথে পড়া উত্তম। এটাই সহীহ্ মত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, বিত্‌রের সালাত নিজ গৃহে একা একা আদায় করা উত্তম। এ মতটি পসন্দনীয় (তাবয়ীন)। নিজ গৃহে তারাবীহ্র ইমামত করার জন্য কাউকে পারিশ্রমিক দিয়ে নির্দিষ্ট করা পুরুষ লোকদের জন্য মাকরূহ্। কেননা পারিশ্রমিক দিয়ে ইমাম ঠিক করা জাইয নেই।

১০. মাসআলা ঃ একই মসজিদে দুইবার তারাবীহ্-এর জামাআত করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ইমাম যদি দুই মসজিদে পূর্ণ তারাবীহ্র জামাআত পড়ায়, তবে জাইয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। মুক্তাদী যদি দুই মসজিদে তারাবীহ্র জামাআত পড়ে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তবে দ্বিতীয় মসজিদের বিত্‌র পড়া সমীচীন নয়। কোন মসজিদে তারাবীহ্র জামাআত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যদি দ্বিতীয় বার তারাবীহ পড়তে চায়, তবে তারা একা একা পড়বে (তাতারখানিয়া)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ গৃহে ঈশা, তারাবীহ্ এবং বিত্‌র আদায় করার পর সে যদি অন্য লোকের তারাবীহ্-এর জামাআতে ইমামত করে, তবে এরূপ করা তার জন্য মাকরূহ্। কিন্তু মুক্তাদী লোকদের জন্য মাকরূহ্ নয়। কোন ব্যক্তি ইমামতের নিয়্যাত না করে সালাত আরম্ভ করল, অতপর লোকজন এসে তার পেছনে তারাবীহ্র ইকতেদা করল, তবে কারো জন্যই মাকরূহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ উত্তম হল, এক ইমামের পেছনেই তারাবীহ্র পূর্ণ সালাত আদায় করা। কেউ যদি দুই ইমামের পেছনে তারাবীহ্ পড়ে, তবে প্রত্যেক ইমামের জন্য মুস্তাহাব হল, কোন এক তারবীহায় নিজের সালাত খতম করা। কিন্তু কোন ইমাম যদি সালাম ফিরিয়েই নিজ স্থান থেকে সরে যায়, তবে শুদ্ধ মতে তা মুস্তাহাব হবে না। যেহেতু দুই ইমামের পেছনে তারাবীহ্ জাইয, তাই একজনের ফরয এবং অন্য জনের তারাবীহ্ পড়ানোও জাইয। এ কারণেই হযরত উমর (রা) ফরয ও বিত্‌রের ইমামত করতেন এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) তারাবীহ্-এর ইমামত করতেন (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন কোন ইমামের নিকট জ্ঞানবান বালকের জন্য তারাবীহ্ এবং নফল সালাতের ইমামত করা জাইয, কিন্তু অধিকাংশের মতানুযায়ী জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। তারাবীহ্ যদি ছুটে যায়। তবে এর কাযা করতে হবে না। জামাআতের সাথেও নয় এবং জামাআত ব্যতীতও নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কারো যদি একথা স্মরণ হয় যে, গত রাতে তার দুই রাকআত সালাত ফাসিদ হয়ে গিয়েছে, তবে তা যদি তারাবীহ্-এর নিয়্যাতে কাযা করা হয় তাহলে মাকরূহ্ হবে। বিত্‌র শেষ করার পর মুসল্লীদের যদি এ কথা স্মরণ হয় যে, তাদের এক তারবীহ তথা দুই রাকআত ছুটে গিয়েছে, তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল (র) বলেন, এ সালাত তারা জামাআতের সাথে আদায় করবে না। কিন্তু সদ্‌রুশ শহীদ (র) বলেন, জামাআতের সাথে আদায় করাও তাদের জন্য জাইয আছে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৫. মাসআলা ঃ এক তারবীহা শেষ করে ইমাম সালাম ফিরানোর পর জামাআতের কেউ বলল, তিন রাকআত পড়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলল, দুই রাকআত পড়া হয়েছে। এরূপ অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী ইমাম নিজের মতের অনুসরণ করবে। ইমামের যদি কোন দিক সম্পর্কে ইয়াকীন না থাকে, তবে ইমাম ঐ ব্যক্তির মত গ্রহণ করবে, যাকে সে সত্যবাদী বলে মনে করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি সালামের সংখ্যা নিরূপণে মুসল্লীদের সন্দেহ হয়, তবে এ সালাত পুনঃ আদায় করবে, না করবে না, জামাআতের সাথে আদায় করবে, না একা একা আদায় করবে-এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। শুদ্ধ মত হল, এ সালাত পুনরায় এক একা আদায় করবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি ঈশার সালাত একা আদায় করে, তার জন্য ইমামের সাথে তারাবীহ্ আদায় করা জাইয আছে। যদি সমস্ত মানুষ ঈশার জামাআত তরক করে, তবে তাদের জন্য তারাবীহ্ জামাআতের সাথে পড়া জাইয নেই। কোন ব্যক্তি যদি এক ইমামের সাথে কয়েক রাকআত তারাবীহ্ আদায় করে অথবা কেউ যদি ইমামের সাথে তারাবীহ্ না পায় অথবা অন্য ইমামের সাথে তারাবীহ্ আদায় করে থাকে, তবে তার জন্য জাইয আছে ঐ ইমামের সাথে বিতরের সালাত জামাআতে আদায় করা। এটাই সহীহ্ মত (কিন্‌য়া)। কারো যদি এক তারবীহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বা দুই তারবীহা[১] ছুটে যায় এবং তারাবীহ্ শেষে সে যদি তা আদায়ে লিপ্ত হয়, তবে তার জামাআতের সাথে বিত্‌র আদায় করা ছুটে যাবে। এমতাবস্থায় সে প্রথমে জামাআতের সাথে বিত্‌র আদায় করবে। অতঃপর ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ আদায় করবে। ওস্তাদ যহীরুদ্দীন (র) এভাবেই ফাতওয়া দিতেন।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে সালাত আদায়ের অবস্থায় পায় এবং তার যদি জানা না থাকে যে, তিনি ফরয পড়ছেন, না তারাবীহ্! এমতাবস্থায় সে যদি এভাবে নিয়্যাত করে যে, 'তিনি যদি ঈশা পড়ান, তাহলে আমি তার পেছনে ইকতেদা করলাম", আর যদি তারাবীহ্ পড়ান, তবে আমি তার পেছনে ইকতেদা করলাম না, তবে কোন অবস্থাতেই তার ইকতেদা সহীহ্ হবে না। চাই তিনি ঈশা পড়েন বা তারাবীহ্ পড়েন। যদি এরূপ বলে যে, তিনি ঈশা পড়ালে আমি তাঁর পেছনে ঈশার ইকতেদা করলাম, আর যদি তারাবীহ্ পড়ান, তাহলে আমি তার পেছনে তারাবীহ-এর ইকতেদা করলাম। পরে দেখা গেল, তিনি তারাবীহ্ বা ঈশা আদায় করেছেন, তবে তার ইকতেদা সহীহ্ হবে (খুলাসা)।

১৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ফরয অথবা বিত্‌র অথবা নফল সালাত আদায় করছে বিশুদ্ধ মতানুসারে এ ব্যক্তির পেছনে তারাবীহ্-এর ইকতেদা করা ঠিক নয়। এরূপ করা মাকরূহ্ এবং বুযর্গানে দীনের আমলের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি প্রথম দুই রাকআত আদায় করছে, সে যদি ঐ ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করে, যে দ্বিতীয় দুই রাকআত আদায় করছে, তবে সহীহ্ মতে এরূপ করা জাইয আছে। যেমনিভাবে জাইয আছে যুহরের শেষ দুই রাকআত আদায়কারীর জন্য চার রাকআত আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করা (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২০. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ঈশার ফরযের পরের সুন্নাত আদায় করেনি, সে যদি তারাবীহ্ আদায়কারী ইমামের পেছনে ইকতেদা করে এবং ঈশার সুন্নাতের নিয়্যাত করে, তবে তা জাইয আছে।

২১. মাসআলা ঃ তারাবীহ্র প্রত্যেক দুই রাকআতের জন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করার প্রয়োজন আছে কি না, এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধতম মত হল, প্রত্যেক দুই রাকআতের জন্য নতুন নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই। কেননা, তারাবীহ্-এর পুরা সালাত একই সালাত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি ইমামের পেছনে জামাআতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করে এবং প্রত্যেক দুই রাক্আতের জন্য নতুনভাবে নিয়্যাত না করে, তবে জাইয আছে (সিরাজিয়্যা)। কেউ যদি ঈশার সালাম না ফিরিয়েই এর উপর তারাবীহ্র বিনা করে, তবে বিশুদ্ধ মতে এরূপ করা সহীহ্ নয়। বরং মাকরূহ্। কেউ যদি ঈশার সুন্নাতের উপর তারাবীহ্ এর বিনা করে, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এরূপ করা জাইয নেই (খুলাসা)।

২২. মাসআলা ঃ তারাবীহ্-এর সালাতে একবার কুরআন খতম করা সুন্নাত। মুক্তাদীদের অলসতার কারণে তা ছাড়া যাবে না (কাফী) কিন্তু তাশাহ্হুদের পর যে সব দু'আ আছে এ দু'আ পড়ার কারণে মুসল্লীদের যদি কষ্ট হয়, তাহলে এসব দু'আ ছেড়ে দেয়া জাইয আছে। অবশ্য নবী

১. এক 'তারবীহা' অর্থ চার রাকআত। প্রতি চার রাকআতের পরে অপেক্ষা করা হলো তারবীহা।

করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্জন না করে তা পড়ে নেয়া উচিত (নিহায়া)। তারাবীহ্তে কুরআন শরীফ দুইবার খতম করা ভাল। তবে তিনবার খতম করা খুবই ভাল (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৩. মাসআলা ঃ উত্তম হল, তারাবীহ্-এর প্রত্যেক দুই রাকআতে সমান সমান কিরাআত পড়া। কেউ যদি এর ব্যতিক্রম করে তবে তাতে কোন দোষ নেই। একই শুফ'আ (দুই রাকআত)-তে হলে দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআত দীর্ঘ করা ভাল নয়, যেমনিভাবে অন্যান্য সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআত দীর্ঘ করা ভাল নয়। যদি প্রথম রাকআতের কিরাআত দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ পড়া হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উভয় রাকআতে কিরাআত সমান সমান পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় প্রথম রাকআতের কিরাআত লম্বা করতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ইমাম হাসান (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক রাকআতে দশ আয়াত বা এর সমপরিমাণ পাঠ করবে। এটাই সহীহ্ মত (তাবয়ীন)।

২৪. মাসআলা ঃ সালাতের কোন রুকন আদায় করার ক্ষেত্রে এবং কিরাআত পাঠের সময় তাড়াহুড়া করা মাকরূহ্ (সিরাজিয়্যা)।

যত বেশী তারতীলের সাথে পড়বে, ততই ভাল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের যুগে এমনভাবে তিলাওয়াত করা উত্তম, যাতে মুক্তাদীদের মনে তাদের অলসতার দরুন ঘৃণাভাব সৃষ্টি না হয়। কেননা, লম্বা কিরাআতের চেয়ে জামাআতে লোক বেশী হওয়া উত্তম (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। পরবর্তীকালের মুফতী সাহেবদের ফাতওয়া হল, ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পাঠ করবে। যেন মুক্তাদীগণ বিরক্ত না হয় এবং মসজিদ বিরান না হয়ে যায়। এভাবে কিরাআত পড়াই উত্তম (যাহিদী)।

২৫. মাসআলা ঃ কুরআন শরীফ খতম করার ইচ্ছা করলে ইমামের জন্য উত্তম হল, ২৭ শে রমযান খতম করা (মুহীত)। কুরআন খতমের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে একুশের রজনীতে বা এর পূর্বে খতম করা মাকরূহ্। বর্ণিত আছে, মাশায়িখগণ গোটা কুরআনে পাঁচশত চল্লিশটি রুকূ নির্ধারণ করেছেন এবং কুরআনের মধ্যে এর বিশেষ চিহ্নও সংযোজন করে দিয়েছেন, যাতে সাতাশের রজনীতে খতম করা সম্ভব হয়। অন্যান্য দেশের কুরআন শরীফে দশ দশ আয়াতে চিহ্ন দেয়া আছে এবং একে রুকূ নিরূপণ করা হয়েছে, যেন তারাবীহ্র প্রত্যেক রাকআতে সুন্নাত-কিরাআত পড়া সম্ভব হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি উনিশ বা একুশের রজনীতে কুরআন খতম হয়ে যায়, তবে বাকী মাসের তারাবীহ্ ছাড়বে না। কেননা, তারাবীহ্ সুন্নাত (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী অবশিষ্ট মাসের তারাবীহ্ বর্জন করা মাকরূহ্ (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি তারাবীহ্র সালাতে কিরাআত ভুল হয় অর্থাৎ যদি আয়াত বা সূরা বাদ দিয়ে এর পরের আয়াত বা সূরা পড়া হয়, তবে মুস্তাহাব হল, বাদ দেয়া আয়াত বা সূরা পাঠ করে পরে পঠিত আয়াত বা সূরাটি পড়বে। তবেই আল-কুরআনের তারতীব (ক্রম) ঠিক থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি দুই রাকআতের মধ্যে কিছু আয়াত পাঠ করা হয় এবং তা ফাসিদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়ে যায়, তবে ঐ দুই রাকআতের কিরাআত গণ্য করা হবে না। বরং এ কিরাআত পুনরায় পড়ে নিতে হবে। তাহলেই পূর্ণ সালাতের মাঝে আল-কুরআনের এক খতম পুরা হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, ঐ কিরাআতও গ্রহণযোগ্য হবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২৭. মাসআলা ঃ দীনী কাজের ব্যাপারে অলসতার দরুন কোন শহরের লোকজন খতমে তারাবীহ ছেড়ে দিয়েছে, আবার কেউ প্রত্যেক রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়াকে অবলম্বন করেছে, আবার কেউ কেউ সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত পড়াকে ইখতিয়ার করেছে। এহেন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি ভাল। কেননা, এতে রাকআতের বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং তা স্মরণ রাখতে কোন প্রকার কষ্টও অনুভূত হবে না (তাজ্নীম)।

২৮. মাসআলা ঃ ওযর ব্যতিরেকে বসে তারাবীহ্ পড়া ভাল নয়। এ ব্যাপারে সমস্ত ইমাম একমত। তবে এর বৈধতার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে জাইয আছে। এটাই সহীহ্। তবে বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় অর্ধেক ছওয়াব হবে। ইমাম যদি ওযরের কারণে অথবা ওযর ছাড়াই বসে সালাত আদায় করে এবং মুক্তাদীরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করে, তবে কোন কোন ফকীহ বলেন, সকলের নিকটই তাদের সালাত জাইয হবে এটাই সহীহ্ মত। অবশ্য বসা ব্যক্তির পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির ইকতেদা সহীহ্ আছে এ সম্পর্কে কারোই কোন মতবিরোধ নেই। তবে মুক্তাদীদের জন্য এ অবস্থায় উত্তম কি? এ নিয়ে ফকীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এ অবস্থায় মুক্তাদীদের জন্য বসে সালাত আদায় করাও মুস্তাহাব। তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীদের মধ্যে বিরোধিতা আর বাকী থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ সালাতুত্ তারাবীহ বসে আদায় করা অনুচ্ছেদ)।

২৯. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি চার রাকআত এক সালামে আদায় করে, দুই রাকআতের পর বৈঠক না করে, তবে ইস্তিহ্সান-এর দাবীর ভিত্তিতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এটাই আযহার (পরিষ্কার) রিওয়ায়েত। মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র.) বলেন, যদিও ফাসিদ হবে না, কিন্তু এতে দুই রাকআতই আদায় হবে। এটাই সহীহ্ মত (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা ঃ আবূ বকর ইসকাফ (র) থেকে বর্ণিত, একদা তাকে প্রশ্ন করা হল যে, যদি কোন ব্যক্তি তারাবীহ্র সালাতে দুই রাকআত পড়ে না বসে তৃতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায়, তবে কিয়ামের অবস্থায় স্মরণ হওয়া মাত্রই সে বসবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি তৃতীয় রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হয়, তবে এর সাথে আরো এক রাকআত যদি মিলিয়ে নেয়, তাহলে এ চার রাকআত দুই রাকআতের স্থলাভিষিক্ত হবে। যদি দ্বিতীয় রাকআতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ মাশায়িখের মতে এতে চার রাকআত আদায় হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি দশ সালামে তারাবীহ্ আদায় করে এবং প্রত্যেক সালামে তিন রাকআত করে আদায় করে এবং দুই রাকআতের পর না বসে, তবে কিয়াসের আলোকে তার তারাবীহ্ সহীহ হবে না। পুনরায় এর কাযা করতে হবে। অন্য কিছু করতে হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে এবং এক বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। অবশ্য ইসতিহসানের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর একটি মত ঐ ব্যক্তির মতের অনুরূপ, যে বলে এতে তারাবীহ্ আদায় হবে না। অর্থাৎ এ মত অনুসারেও তাকে তারাবীহ্র কাযা করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ঐ তৃতীয় রাকআতের কারণে তার উপর অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। চাই এ তৃতীয় রাকআত ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ুক বা ভুলবশত পড়ুক। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ভুলে এরূপ করলে তার উপর অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে, তবে তারাবীহ্-এর কাযা করার সাথে আরো বিশ রাকআত অতিরিক্ত পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক তৃতীয় রাকআতের পরিবর্তে দুই রাকআত করে পড়তে হবে। এ হিসাবে বিশ রাকআত হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ তৃতীয় রাকআত যদি ভুলবশত পড়া হয়ে থাকে, তবে এ কারণে অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা হয়ে থাকে, তবে তাদের মতেও এ অবস্থায় বিশ রাকআত অতিরিক্ত আদায় করতে হবে (যহীরিয়্যা ঃ ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তারাবীহ্র সালাত এক সালামে ছয় রাকআত অথবা আট রাকআত অথবা দশ রাকআত আদায় করে এবং দুই রাকআত পরপর বৈঠক করে, তবে অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতে দুই রাকআতে দুই রাকআতই আদায় হয়ে যাবে। এটাই সহীহ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি যদি বিশ রাকআত তারাবীহ্ এক সালামে আদায় করে এবং দুই রাকআত পরপর বৈঠক করে, তবে এতে পূর্ণ তারাবীহ্ আদায় হয়ে যাবে। যদি সে দুই রাকআত পর না বসে, বরং বিশ রাকআত পর একবারে বসে, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে কিয়াসে খফীর আলোকে এতে তার এক তাসলীমা অর্থাৎ দুই রাকআত আদায় হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ মুক্তাদীদের জন্য মাকরূহ্ হল, ইমামের পেছনে বসে থাকা, অতঃপর ইমাম রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে জামাআতে শরীক হওয়া। অনুরূপভাবে প্রচণ্ড ঘুমের চাপের অবস্থায় জামাআতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করাও মাকরূহ্। বরং এ অবস্থায় সালাত ছেড়ে দিবে। পূর্ণ জাগ্রত হলে সালাত আদায় করবে। কেননা, এ অবস্থায় সালাত আদায় করলে উদাসীনতা, গাফলত সৃষ্টি হয় এবং কিরাআতে চিন্তা-গবেষণা করার সুযোগ থাকে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ্ শুরু করেছিল, পরে ইমামের বৈঠকের অবস্থায় সে ঘুমিয়ে গেল। এদিকে ইমাম তাকে ফেলে আরো দুই রাকআত আদায় করে তাশাহ্হুদ পড়ার উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসল। এ সময় উক্ত ব্যক্তি যদি জাগ্রত হয় এবং তার যদি ইমামের অবস্থা জানা থাকে, তবে সালাম ফিরিয়ে পুনঃ নিয়্যাত করে ইমামের সাথে দ্বিতীয় দুই রাকআতে তাশাহ্হুদের মধ্যে শরীক হয়ে যাবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরালে দাঁড়িয়ে ত্বরিৎভাবে দুই রাকআত আদায় করে নিবে। এরপর ইমামের সাথে তৃতীয় দুই রাকআতে শরীক হয়ে যাবে (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযে শরীক হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ফজর বা মাগরিবের এক রাকআত আদায় করার পর যদি জামাআত শুরু হয়, তাহলে ঐ রাকআত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শরীক হবে। যদি দ্বিতীয় রাকআতে থাকে এবং এখনো পর্যন্ত সিজদা না করে থাকে, তবে এ অবস্থায়ও ঐ রাকআত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শরীক হতে হবে। যদি দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা করা হয়ে যায়, তবে সালাত আর ছাড়বে না। বরং পুরা করবে। সালাত পূর্ণ হওয়ার পর ইমামের সাথে আর জামাআতে শরীক হবে না। কেননা, ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ এবং মাগরিবের সালাতেও এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, এতে হয়তো মাগরিবের পর নফল তিন রাকআত হয়ে যাবে, অথবা (যদি চার রাকআত পড়ে) ইমামের বিরোধিতা হয়ে যাবে (তাবয়ীন)। এ সমস্ত হল বিদআত। এতদ্‌সত্ত্বেও কেউ যদি ইমামের সাথে শরীক হয়, তবে সে চার রাকআত আদায় করবে। কেননা, সুন্নাতের অনুসরণ করা ইমামের অনুসরণ করার চাইতে বেশী পালনীয় (কাফী)। অবশ্য এরূপ করা অপসন্দনীয় (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। যদি এ ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে এবং চার রাকআত কাযা করতে হবে। কেননা, ইকতেদা করার কারণে তার উপর এ চার রাকআত কাযা করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে (শামানী)। এরূপ নফল আদায়কারী ব্যক্তি যদি ঐ মাগরিব আদায়কারীর পেছনে ইকতেদা করে, যে তৃতীয় রাকআতে কিরাআত পড়েনি, এমতাবস্থায় মুক্তাদী যদি কিরাআত পড়ে নেয়, তবে তার সালাত দুরুস্ত হয়ে যাবে। আর যদি সে কিরাআত না পড়ে, তবু ইমামের অনুসরণের কারণে তার সালাতও জাইয হয়ে যাবে (ইমাম উস্তাদখানী)। ইমাম যদি চতুর্থ রাকআতকে তৃতীয় রাকআত মনে করে দাঁড়িয়ে যায় এবং মুক্তাদীও চতুর্থ রাকআতে তার অনুসরণ করে, তবে মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। চাই ইমাম তৃতীয় রাকআতের পর বৈঠক করুক অথবা না করুক। এটাই পসন্দনীয় মত। যদিও ইমামের সালাত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে নফল সালাতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে ফরয ছিল, পরে নফলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সে যেন দুই সালাত দুই তাহরীমায় আদায় করেছে। সুতরাং মুক্তাদী যেন হদছের ওযর ব্যতিরেকে একই সালাত দুই ইমামের পেছনে আদায় করল। তাই তার সালাত দুরুস্ত হবে না।

২. মাসআলা ঃ নফল শুরু করার পর যদি জামাআত আরম্ভ হয়ে যায়, তবে পসন্দনীয় মতানুসারে সালাত ভঙ্গ করা যাবে না। চাই সিজদা করা হোক বা না হোক। মান্নতের সালাত এবং কাযা সালাত আরম্ভ করার পর এর হুকুমও অনুরূপ (খুলাসা ঃ ইমামের ইকতেদা এবং মুক্তাদীর করণীয় অধ্যায়)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যুহরের সালাত এক রাকআত পড়ার পর যদি জামাআত শুরু হয়ে

যায়, তবে আরো এক রাকআত আদায় করে সে ইমামে সাথে শরীক হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তবে এ রাকআত ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। এখানে ইকামাতে সালাতের অর্থ হল, ইমামের সালাত আরম্ভ করা। মুআযযিনের ইকামত বলা নয়। কেননা, মুআযযিন ইকামত আরম্ভ করা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি সালাত শুরু করে এবং এখনো প্রথম রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তবে তার জন্য হুকুম হল, দুই রাকআত পুরা করা। এতে আমাদের কোন মতভেদ নেই (নিহায়া)।

৪. মাসআলা ঃ অন্য জায়গায় যদি জামাআত আরম্ভ হয়—যেমন, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে সালাত আদায় করছে, এমতাবস্থায় মসজিদে জামাআত আরম্ভ হল অথবা এক ব্যক্তি এক মসজিদে সালাত আরম্ভ করছে, এমতাবস্থায় অন্য এক মসজিদে জামাআত আরম্ভ হয়েছে, তাহলে সে কোন অবস্থায়ই সালাত ভঙ্গ করবে না।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যুহরের তিন রাকআত আদায় করল। এদিকে জামাআতও দাঁড়িয়ে গেল। এমতাবস্থায় সে সালাত পূর্ণ করে ইমামের পেছনে নফলের নিয়্যাতে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু যদি তৃতীয় রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তবে সালাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর বসে সালাম ফিরাবে। অথবা দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরাবে না (তাবয়ীন)। এরূপ ইখতিয়ার দেয়াই বিশুদ্ধতম (মি'রাজুদ দিরায়া)। কোন কোন ফকীহ বলেন, দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় একদিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত খতম করে দিবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেননা, সালাত শেষ করার জন্য বৈঠক শর্ত। আর এ হল সালাত ভঙ্গ করা। সালাত শেষ করা নয়। কারণ, যুহরের সালাত দুই রাকআতে, শেষ হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় এক সালামই যথেষ্ট (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। ঈশা এবং আসরের সালাতের ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম প্রযোজ্য। তবে আসরের সালাত শেষে নফলের নিয়্যাতে জামাআতের সাথে শরীক হবে না।

৬. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকআত ইমামের সাথে পেল, সে সমস্ত ইমামের মতে যুহরের পূর্ণ সালাত জামাআতের সাথে আদায় করল না। তবে জামাআতের ফযীলত পাবে। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তিন রাকআত পেল, সে পূর্ণ সালাত ইমামের সাথে জামাআতে আদায় করল (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি নফল সালাত আরম্ভ করার পর জামাআত শুরু হয়ে যায়, তবে যে দুই রাকআত আদায় করছিল তা পূর্ণ করবে। অতিরিক্ত পড়বে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ যুহর বা জুমুআর ফরযের পূর্বের সালাত আদায় করতে থাকে এবং এ অবস্থায় জামাআত দাঁড়িয়ে যায় বা খুতবা আরম্ভ হয়ে যায়, তবে দুই রাকআত পড়ে সালাত ভঙ্গ করে দিবে। এ কথাটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, সালাত পূর্ণ করে নিবে (হিদায়া)। এ মতটিই বিশুদ্ধতম (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। এ মতটি সহীহ্ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ইমামকে ফজরের সালাত আদায়ের অবস্থায় পেল। অথচ সে এখনো ফজরের সুন্নাত পড়েনি। এমতাবস্থায় সে যদি এক রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং এক রাকআত পাবে বলে ধারণা করে, তবে সে মসজিদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুন্নাত আদায় করে পরে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হবে। যদি উভয় রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা করে, তবে তৎক্ষণাৎ ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে (হিদায়া)। কিতাবে এ কথার কোন উল্লেখ নেই যে, কেউ যদি ইমামকে বৈঠকের মধ্যে পাবে বলে ধারণা করে, তবে সে কি করবে? এ মাসআলার সমাধানে এ কথা বলা হবে যে, কিতাবে বর্ণিত মাসআলা থেকে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, কারো যদি এরূপ আশংকা হয় যে, সে কোন রাকআতই পাবে না। বরং আখিরী বৈঠক পেতে পারে, তবে সে সুন্নাত পড়বে না। ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে যদি আখিরী বৈঠক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সুন্নাত পড়বে। কেননা, তাঁদের মতে তাশাহ্হুদ পাওয়া রাকআত পাওয়ারই শামিল (কিফায়া)। অন্যান্য সুন্নাতের ক্ষেত্রে যদি মুক্তাদীর এরূপ ধারণা হয় যে, ইমামের রুকূ করার আগেই সে সুন্নাত সমাধা করে নিতে পারবে, তবে মসজিদের বাইরে সুন্নাত আদায় করে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। আর যদি এক রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকূর অবস্থায় পায় এবং তার এ কথা জানা না থাকে যে, সে কোন রুকূতে আছে, প্রথম রাকআতের রুকতে, না দ্বিতীয় রাকআতের রুকূতে, এরূপ হলে সুন্নাত ছেড়ে দিবে এবং ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে (খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ মসজিদে আযান হওয়ার পর কেউ যদি মসজিদে গমন করে, এমতাবস্থায় সালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাকরূহ্। কিন্তু সে যদি অন্য কোন মসজিদের ইমাম বা মুআযযিন হয় এবং সে না গেলে যদি জামাআতের লোকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, তবে তার মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। এ হুকুম তখনি প্রযোজ্য হবে, যদি সে সালাত না আদায় করে থাকে। যদি সালাত আদায় করে নিয়ে থাকে, তাহলে ঈশা ও যুহরের সালাতে মুআযযিনের ইকামত না বলা পর্যন্ত মসজিদ হতে বের হয়ে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। যদি মুআযযিন ইকামত শুরু করে দেয়, তবে মসজিদ থেকে বের হবে না। বরং নফল হিসাবে ঈশা বা যুহর আদায় করে নিবে। আসর, মাগরিব এবং ফজরের সালাতে বের হয়ে চলে যাবে। যদি থেকে যায় এবং জামাআতে শরীক না হয়, তবে মাকরূহ্ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকূর অবস্থায় পেয়ে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে থাকে আর এ অবস্থায় ইমাম রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে নেয়, তবে সে এ রাকআত পেল না (হিদায়া)। চাই দাঁড়িয়ে থাকার সময়ের ভেতর তার রুকূ করার সুযোগ থাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থাতে একই হুকুম। অনুরূপভাবে উক্ত মুক্তাদী যদি তাকবীর বলে বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ রুকূতে চলে যায় এবং এদিকে ইমামও তার মাথা উঠিয়ে নেয় এ অবস্থায়ও সে এ রাকআত পেল না।

১২. মাসআলা ঃ ফকীহ্ মাহবুবী (র) বলেন, কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে যদি রুকূর অবস্থায় পায়, তবে কোন কোন ফকীহ্র মতে তার জন্য উচিত হল, তৎক্ষণাৎ তাকবীর বলে রুকূতে চলে যাওয়া। পরে হেঁটে গিয়ে কাতারের সাথে মিলিত হবে। এরূপ করবে, যেন তার

রুকূ না ছুটে যায়। আমাদের মাযহাবে সে একাধারে তিন কদম হাঁটলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর এক সাথে না হাঁটলে মাকরূহ্ হবে। অধিকাংশ মাশায়িখের মতে এরূপ অবস্থায় সে তাকবীর বলবে না। তাহলেই সালাতের অবস্থায় তাকে আর হাঁটতে হবে না। ফকীহ্ জিলাবী (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকূর অবস্থায় পায় এবং তৎক্ষণাৎ তাকবীর বলে রুকুর জন্য ঝুঁকতে আরম্ভ করে এবং এদিকে ইমামও উঠতে আরম্ভ করে, তবে ইমামের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে সে যদি ইমামের সাথে শরীক হতে পারে, তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে এ রাকআত পেল। যদিও ইমামের সাথে শরীক হওয়ার সময়টি একেবারেই কম (মি'রাজুদ দিরায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কেউ যদি ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পায় এবং তাকবীর বলে, কিন্তু ইমামের সাথে রুকূ না করে, বরং ইমাম প্রথমে রুকূ করে এবং সে পরে রুকূ করে, তবে সে এ রাকআত পেল। ফকীহ্গণ এ বিষয়েও একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি ইমামের রুকূ হতে উঠে সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় ইকতেদা করে, তবে সে এ রাকআত পেল না (বাহ্রুর রাইক)।

১৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেল, সে সোজা দাঁড়িয়ে তাহ্রীমা বাঁধবে, তাকবীর বলবে এবং ইমামের সাথে রুকূতে শরীক হতে পারবে বলে যদি প্রবল ধারণা থাকে, তবে সুবহানাকা পড়বে এবং ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলবে। আর যদি রুকূ ছুটে যাওয়ার আশংকা করে, তবে সাথে সাথে রুকূ করবে। দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত তাকবীর বলবে না। বরং রুকূতে তাকবীর বলবে (কাফী ঃ সালাতুল ঈদ অধ্যায়)। যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূর অবস্থায় পাবে, তার জন্য দুই তাকবীর বলার কোন প্রয়োজন নেই। যদি রুকূর তাকবীর দিয়ে রুকূতে চলে যায়, প্রারম্ভিক তাকবীর না বলে, তবে সালাত দুরুস্ত হয়ে যাবে। অবশ্য নিয়্যাত অযথা হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

১৫. মাসআলা ঃ মুক্তাদী যদি সমস্ত রাকআতে ইমামের আগে রুকূ–সিজদা করে, তবে কিরাআত ব্যতিরেকে অতিরিক্ত আরো এক রাকআত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি রুকূ করে ইমামের সাথে এবং সিজদা করে ইমামের পূর্বে, তবে সে দুই রাকআত সালাত কাযা করবে। কোন ব্যক্তি যদি ইমামের আগে রুকূ করে এবং সিজদা করে ইমামের সাথে, তবে সে কিরাআত ব্যতীত চার রাকআত কাযা করবে। কোন ব্যক্তি যদি ইমামের পরে রুকূ–সিজদা করে তবে তার সালাত জাইয হবে। কেউ যদি ইমামকে রুকূ–সিজদার শেষ অবস্থায় পায়, তবে তার সালাতও জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ যে মসজিদে সালাত হয়ে গিয়েছে কেউ যদি এরূপ মসজিদে গমন করে, তবে ওয়াক্তের মধ্যে যদি অবকাশ থাকে, তাহলে সে ফরযের পূর্বে যত ইচ্ছা নফল পড়তে পারবে। যদি ওয়াক্তের মাঝে সংকীর্ণতা থাকে, তবে নফল পড়বে না। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, যুহর এবং ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাতের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (হিদায়া)। শামসুল আইম্মা সুরুখ্সী (র.), সাহিবী মুহীত, কাযীখান, তমরতাশী এবং ফকীহ মাহবূবী (র) এ মতটি পসন্দ করেছেন (কিফায়া)। উত্তম হল, কোন অবস্থাতেই এ সমস্ত সুন্নাত বর্জন না করা (হিদায়া)। চাই ফরয জামাআতের সাথে আদায় করা হোক বা না হোক। অবশ্য যদি ফরযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে সুন্নাত তরক করা জাইয আছে (কিফায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ কাযা সালাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যে সালাত যে ওয়াক্তে ফরয হয়েছে ঐ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর এ সালাতের কাযা করা ফরয। চাই এ সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে ফওত হয়ে যাক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ফওত হোক অথবা ঘুমের কারণে ফওত হয়ে যাক। চাই ফওত হওয়া সালাতের সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী হোক।

২. মাসআলা ঃ সুস্থ থাকা অবস্থায় যে সালাত ফওত হয়েছে পাগল অবস্থায় ঐ সালাতের কাযা করা ওয়াজিব নয়। যেমনিভাবে সুস্থ অবস্থায় ঐ সালাতের কাযা ওয়াজিব নয়, যা পাগল অবস্থায় ফওত হয়েছে।

৩. মাসআলা ঃ ধর্মত্যাগীর উপর ঐ সালাতের কাযা করা ওয়াজিব নয়, যা ধর্মত্যাগ অবস্থায় ছুটে গিয়েছে। ঐ মুসলমান যে দারুল হরবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) মুসলমান হয়েছে এবং সেখানে অবস্থানকালে না জানার কারণে সে যদি সালাত আদায় না করে, তবে এ সালাতের কাযা করাও তার উপর ওয়াজিব নয়।

৪. মাসআলা ঃ এমন বেহুশ বা অসুস্থ ব্যক্তি যে ইশারা করে সালাত আদায় করতেও সক্ষম নয়, তার যদি এ অবস্থায় সালাত ফওত হয়ে যায় এবং তা যদি এক দিন এক রাতের সালাতের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হয়, তবে এ সালাতের কাযা ওয়াজিব নয়।

৫. মাসআলা ঃ কাযা সলাতের হুকুম এই যে, যে সালাত যে অবস্থায় ছুটে গিয়েছে, ঐ সালাত ঐভাবেই কাযা করতে হবে। কিন্তু ওযর ও প্রয়োজনের অবস্থায় এ হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুকীম অবস্থায় যে ব্যক্তির চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয সালাত ছুটে গিয়েছে, সে সফরের অবস্থায় চার রাকআতেরই কাযা করবে। যদি সফরের অবস্থায় কারো চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত ছুটে যায়, তবে মুকীম অবস্থায় সে দুই রাকআতের কাযা করবে।

৬. মাসআলা ঃ ফরযের কাযা ফরয। ওয়াজিবের কাযা ওয়াজিব এবং সুন্নাতের কাযা সুন্নাত। কাযার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। তিন সময় ব্যতীত জীবনের পুরা সময়ই কাযা নামাযের ওয়াক্ত। সে তিন সময় হল, সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময়। এ তিন সময় সালাত আদায় করা জাইয নেই (আল্ বাহ্রুর রাইক)।

৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করার পর ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর ওয়াক্তের মধ্যে আবার মুসলমান হয়ে যায়, তবে এ সালাত পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব[১] (কাফী)। কোন বালক ঈশা আদায় করার পর ঘুমাল, অতঃপর ঘুমন্ত অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হল এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই সে জাগ্রত হল, তবে তার ঈশার কাযা করতে

১. ওয়াজিব অর্থে ফরয। সাধারণত ফরযের বেলায় يَجِبُ ওয়াজিব ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

হবে। কিন্তু বালিকার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কোন বালিকা যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে বালিগা হয়ে যায়, তবে ঈশার সালাত তার কাযা করতে হবে না। কেননা, সালাত ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় যদি হায়েয দেখা দেয়, তবে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। সুতরাং সালাত ওয়াজিব[১] হওয়ার কালে যদি হায়েয দেখা দেয়, তবে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সালাত রহিত হয়ে যাবে। কোন বালিকা যদি বয়সের হিসাবে বালিগা হয়, তবে তার ঈশা কাযা করতে হবে। বালক যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে নিজের স্বপ্নদোষ সম্পর্কে অবহিত না হয়, তবে কারো কারো মতে এ অবস্থায়ও ঈশার কাযা করতে হবে। (মুহীত ঃ সুরুখ্সী) ঃ "ওয়াক্তের বয়ান যার সাথে সালাত ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক" অনুচ্ছেদ)। এটাই পসন্দনীয় মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ সালাতুল কাযা যদি জামাআতের সাথে আদায় করা হয়, তবে যে সালাতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়া হয় এরূপ সালাত হলে ইমাম এতেও উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করবেন। আর যদি একা আদায় করে, তবে উচ্চস্বরে এবং চুপে চুপে উভয়ভাবে পড়া জাইয। তবে উচ্চস্বরে পড়াই উত্তম। কাযার বিধান ওয়াক্তের ভেতর সালাত আদায় করার মতই। আর যে সব সালাতে চুপে চুপে কিরাআত পড়া হয়, এতে চুপে চুপেই কিরাআত পড়বে। একা সালাত আদায়কারীও এরূপ করবে এবং জামাআতের সাথে পড়লে ইমামও এরূপ করবে (যহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ কাযা ও ওয়াক্তিয়া সালাতের মধ্যে অনুরূপভাবে কাযা সালাতসমূহের মধ্যেও তারতীব রক্ষা করে সালাত আদায় করা ওয়াজিব (কাফী)। সুতরাং কাযা আদায় করার পূর্বে ওয়াক্তিয়া আদায় করা জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এমনিভাবে ফরয ও সালাতুল বিত্রের মাঝেও তারতীব রক্ষা করে সালাত আদায় করা ওয়াজিব (শরহে বিকায়া)।

১০. মাসআলা ঃ "বিত্র পড়েনি" এ কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি ফজরের সালাত আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার ফজরের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। নফল সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি কারো তার কাযা সালাতের কথা স্মরণ হয়, তবে তার এ নফল ফাসিদ হবে না। কেননা, ফরয সালাতসমূহের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব হওয়া (خلاف قياس) ব্যতিক্রমধর্মীভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তারতীবের ব্যাপারে ফরযের সাথে যা ফরয না তাকে সম্পৃক্ত করা যাবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ "আল্ ফাতওয়াল 'ইতাবিয়্যা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বালক বালিগ হয়ে ওয়াক্তের ভেতর সালাত আদায় করে নিলে, সেও "সাহিবে তারতীব" বলে গণ্য হবে। যেমনি বালিকা বালিগা হওয়ার সময় স্বচ্ছ রক্ত একবার দেখার দ্বারাই মহিলা "সাহিবে আদত" হিসাবে পরিগণিত হয় (তাতারখানিয়্যা)। কিন্তু সালাতের কোন কোন আমলের মধ্যে আমাদের মাযহাবে তারতীব ফরয নয় (মুহীত)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে শুরু সালাতে পায়, অতঃপর সে ইমামের পেছনে শুয়ে পড়ে বা তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, এদিকে ইমাম তাকে এ অবস্থায় রেখে সামনে চলতে থাকে। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে উযূ করে আসে, তবে তার জন্য অপরিহার্য হল প্রথমে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করা, অতঃপর ইমামকে পেলে ইমামের সাথে শরীক হওয়া।

১. ওয়াজিব অর্থে ফরয। সাধারণত ফরযের বেলায় يَجِبُ ওয়াজিব ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন ব্যক্তি যদি প্রথমে ইমামের অনুসরণ করে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা করে, তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে তার সালাত জাইয হবে। জুমুআর সালাতেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ইমামের পেছনে ইকতেদা করার পর মানুষের ভীড়ের কারণে ইমামের সাথে প্রথম রাকআত আদায় করতে সক্ষম না হয়ে শুধু সোজা দাঁড়িয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় রাকআত আদায় করতে সক্ষম হয় ও প্রথম রাকআতের পূর্বে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে, অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পর প্রথম রাকআত আদায় করে, তাহলেও আমাদের মাযহাবে জাইয আছে (শরহুত তাহাবী ঃ সতর ঢাকা অনুচ্ছেদ)।

১২. মাসআলা ঃ ভুলে যাওয়া এবং এরূপ অন্য কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায় (মুযমারাত)। ওয়াক্তিয়া আদায় করার পর ফওত হওয়া সালাতের কথা স্মরণ হলেও ওয়াক্তিয়া সালাত দুরুস্ত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উযূ আছে এ ধারণায় কেউ যুহরের সালাত আদায় করল। অতঃপর উযূ করে আসরের সালাত আদায় করল। এরপর এ কথা প্রকাশ হল যে, সে যুহরের সালাত উযূহীন অবস্থায় আদায় করেছে, তাহলে সে শুধু যুহর দুহরিয়ে পড়বে। কেননা, যুহরের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি ভ্রমে পতিত ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি উযূ আছে এ ধারণায় আরাফার দিন যুহরের সালাত আদায় করে নেয়, অতঃপর উযূ করে আসর আদায় করে, এরপর এ কথা প্রকাশ পায় যে, যুহরের সালাত সে উযূহীন অবস্থায় পড়েছে, তাহলে তাকে উভয় সালাত পুনঃ আদায় করতে হবে। কেননা, আরাফায় আসরের সালাত যুহরের সালাতের অধীন (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১৩. মাসআলা ঃ ফজরের সালাত আদায় করেনি, একথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি যুহরের সালাত আদায় করে, তবে তার যুহর ফাসিদ হয়ে যাবে। অতঃপর যুহরের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় সে যদি ফজর আদায় করে পরে আসরও আদায় করে, তবে তার আসর সহীহ্ হয়ে যাবে। কেননা, আসর আদায় করার সময় তার ধারণায় তার উপর কোন কাযা নামায ছিল না, তার এ ধারণা গ্রহণযোগ্য (তাবয়ীন)। যুহর আদায়ের সময় "ফজর পড়ছে কিনা?" এ মর্মে কারো যদি সন্দেহ হয় এবং যুহর পড়ে নেয়। অতঃপর সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, সে ফজরের সালাত আদায় করেনি, তাহলে সে প্রথমে ফজর ও পরে যুহরের সালাত পুনঃ আদায় করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। সালাত আদায়ে রত থাকা অবস্থায় কারো যদি কাযা সালাতসমূহের কথা স্মরণ হয়, তবে ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের মাযহাবের আলিমদের মতে তার এ সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু স্মরণ হতেই তা ভঙ্গ করবে না। বরং দুই রাকআত পুরা করবে। এ দুই রাকআত সালাত নফল হয়ে যাবে। চাই কাযা পুরাতন হোক বা নতুন (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ জুমুআ আদায়কারী মুসল্লীর যদি এ কথা স্মরণ হয় যে, তার ফজরের সালাত রয়ে গেছে, তবে অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, জুমুআ ছেড়ে সে ফজর আদায়ে লিপ্ত হলে তার জুমুআর সালাত ফওত হয়ে যাবে কিন্তু ওয়াক্ত ফওত হবে না, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে সে জুমুআ ছেড়ে দিয়ে ফজর আদায় করবে। অতঃপর যুহর আদায় করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জুমুআ শেষ করবে। জুমুআ ছাড়বে না। অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, ফজর পড়েও সে ইমামের সাথে জুমুআয় শরীক হতে পারবে, তবে সমস্ত ইমামের মতে প্রথমে সে ফজর পড়বে, পরে জুমুআয় শরীক হবে। আর যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, জুমুআ ছেড়ে সে ফজর আদায়ে রত হলে তার ওয়াক্তই খতম হয়ে যাবে, তবে সমস্ত ইমামের ঐকমত্য হল, সে জুমুআই আদায় করবে এবং পরে ফজরের কাযা পড়বে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৫. মাসআলা ঃ ওয়াক্তের সংকীর্ণতার কারণেও তারতীব রহিত হয়ে যায় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি সংকীর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে কাযা আদায় করে, তবে জাইয হবে কিন্তু সে গুনাহ্গার হবে (আন্নাহ্রুল ফাইক)। ওয়াক্তের সংকীর্ণতার অর্থ হল, ওয়াক্তের মধ্যে এ পরিমাণ সময় বাকী আছে, যে সময়ের মধ্যে ওয়াক্তিয়া এবং কাযা উভয় সালাত আদায় করা যায় না। যেমন কারো উপর ঈশার কাযা বাকী রয়েছে, এমতাবস্থায় সে যদি নিশ্চিতভাবে জানে যে, ঈশার কাযা পড়ার পর সে যদি ফজর আদায় করে, তবে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পূর্বেই সূর্য উদয় হয়ে যাবে, তাহলে সে ওয়াক্তের মধ্যে ফজর আদায় করবে। অতঃপর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে ঈশার কাযা পড়বে (তাবয়ীন)। ওয়াক্তিয়া সালাত উত্তমরূপে আদায় না করা গেলেও তারতীব-এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন ওয়াক্ত এমন সংকীর্ণ যে, যদি কাযা আদায় করে, তবে ওয়াক্তিয়া সালাত সংক্ষেপ কিরাআতে এবং অন্যান্য আরকান খাটো করে আদায় করতে হয়, তবু তারতীব রক্ষা করতে হবে এবং উভয় সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতে হবে (তামারতাশী)।

১৬. মাসআলা ঃ ওয়াক্তের সংকীর্ণতা শুরু সালাত হতেই ধর্তব্য হবে। সুতরাং ছুটে যাওয়া সালাত স্মরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি ওয়াক্তিয়া আরম্ভ করে এবং কিরাআত এমন লম্বা করে যে, এর ফলে ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবে তার এ সালাত জাইয হবে না। হাঁ, ছেড়ে দিয়ে আবার শুরু করলে জাইয হবে। ফাইতা সালাতের কথা ভুলে গিয়ে কেউ যদি ওয়াক্তিয়া আরম্ভ করে এবং কিরাআত এমন লম্বা করে যে, ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তার যদি ফাইতা সালাতের কথা স্মরণ হয়, তবে তার এ সালাত শুদ্ধ হবে। এ সালাত ভঙ্গ করতে হবে না (তাবয়ীন)।

১৭. মাসআলা ঃ মূল ওয়াক্ত হিসাবেই ওয়াক্তের সংকীর্ণতা ধর্তব্য হবে। মুসল্লীর ধারণার ভিত্তিতে ওয়াক্তের সংকীর্ণতা নির্ণীত হবে না (আল-বাহ্রুর রাইক)। সুতরাং যার ঈশা কাযা আছে, সে যদি ধারণা করে যে, ফজরের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এ ধারণায় সে যদি ফজর আদায় করে নেয়, অতঃপর এ কথা প্রকাশিত হয় যে, ওয়াক্তের মধ্যে প্রশস্ততা ছিল, তবে তার ফজর বাতিল হয়ে যাবে। ফজরের সালাত বাতিল হওয়ার পর দেখতে হবে, যদি উভয় সালাত আদায় করার অবকাশ ওয়াক্তের মধ্যে থাকে, তবে সে ঈশা ও ফজর পরপর আদায় করে নিবে। নতুবা ফজরের সালাত পুনঃ আদায় করবে। এরপর আবারো লক্ষ্য করবে, সময় কি পরিমাণ বাকী আছে? যদি এবারো দেখা যায় যে, সময়ের মধ্যে অবকাশ আছে, তবে এ সালাতও বাতিল হয়ে যাবে। শেষ সময় পর্যন্ত অনুরূপ চলতে থাকবে। এরূপ অবস্থায় কেউ যদি ঈশা আদায় করে এবং ফজর পুনঃ আদায় না করে এবং ঈশা আদায়ের অবস্থায় তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পূর্বেই যদি সূর্য উদিত হয়ে যায়, তবে তার ফজরের সালাত শুদ্ধ বলে গণ্য হবে (তাবয়ীন)। অনুরূপভাবে যুহরের শেষ ওয়াক্তে কারো যদি ফজরের কাযার কথা স্মরণ হয় এবং এ সময়ে দুই ওয়াক্তের সালাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদায় করা যাবে না মনে করে সে যদি যুহর আরম্ভ করে এবং তা পুরা করে নেয়, অতঃপর দেখা যায় যে, এখনো যুহরের কিছু ওয়াক্ত বাকী রয়ে গিয়েছে, তবে দেখতে হবে যে, যুহরের এ সময়ের মধ্যে যদি ফজর ও যুহর আদায় করা সম্ভব হয়, তাহলে যুহরের যে সালাত সে পূর্বে আদায় করেছে তা বাতিল হয়ে যাবে। তাকে প্রথম ফজর পড়তে হবে এবং পরে যুহর পুনঃ আদায় করতে হবে। এ হুকুম ঐ অবস্থায়ও প্রযোজ্য হবে, যদি ওয়াক্ত এ পরিমাণ বাকী থাকে যে, এ সময়ের মধ্যে ফজর পড়ে যুহরের এক রাকআত আদায় করা যায় (তাতারখানিয়া ঃ হুজ্জাতের সূত্রে)।

১৮. মাসআলা ঃ কাযা যদি একাধিক হয় এবং ওয়াক্ত এ পরিমাণ হাতে থাকে যে, এর মধ্যে ওয়াক্তিয়ার সাথে কিছু কাযা আদায় করা যায়, সব আদায় করা যায় না, তাহলে ঐ কিছু কাযা আদায় না করা পর্যন্ত ওয়াক্তিয়া সালাত সহীহ্ হবে না। সুতরাং ফজরের সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি কারো ঈশা এবং বিতরের কাযার কথা স্মরণ হয় এবং পাঁচ রাকআত পড়া যায় এ পরিমাণ সময় বাকী থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে প্রথমে বিত্র এবং পরে ফজর আদায় করবে। অতঃপর সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর ঈশার কাযা আদায় করবে। অনুরূপভাবে আসর আদায় করার সময় কারো যদি স্মরণ হয় যে, সে ফজর ও যুহরের সালাত পড়েনি, এ অবস্থায় সময় যদি এ পরিমাণ হাতে থাকে যে, এর মধ্যে শুধু আট রাকআত সালাত আদায় করা যায়, তবে সে প্রথমে যুহরের কাযা পড়বে, অতঃপর আসর আদায় করবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে ছয় রাকআত সালাত আদায় করা যায়, বেশী নয়, তাহলে প্রথমে ফজর পড়বে, তারপর আসর পড়বে এবং এরপর যুহরের কাযা পড়বে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে আসরের ওয়াক্তের মধ্যে শেষ সময় হল ধর্তব্য বিষয় (তাবয়ীন)। "মাবসূত" গ্রন্থে শামসুল আইম্মা সুরুখ্সী (র) বলেন, সূর্য বিবর্ণ হওয়ার পূর্বে সে যদি যুহর এবং আসর আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য অপরিহার্য হল তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে উভয় সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে প্রথমে আসর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। যদি যুহরের সালাত সূর্য বিবর্ণ হওয়ার পূর্বে আদায় করা সম্ভব হয় এবং আসরের পূর্ণ সালাত বা আংশিক সালাত সূর্য বিবর্ণ হওয়ার পর আদায় করতে হয়, তবু তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ (র)-এর মতানুযায়ী প্রথমে আসরের সালাত আদায় করবে। কেননা, সূর্য বিবর্ণ হওয়ার পর তার নিকট আসরের ওয়াক্ত আর বাকী থাকে না (নিহায়া)। যদি এ পরিমাণ ওয়াক্ত বাকী থাকে যে, এর মধ্যে যুহরের সালাত আদায় করা সম্ভব নয়, তাহলে সমস্ত ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এ অবস্থায় তারতীব রহিত হয়ে যাবে (তাবয়ীন)।

২০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি আউয়াল ওয়াক্তে আসরের সালাত আরম্ভ করল, তার স্মরণ ছিল না যে, তার উপর যুহরের কাযা বাকী রয়েছে. তাই সে সালাত এতো দীর্ঘ করল যে, আসরের মাকরূহ্ ওয়াক্ত চলে এলো। অতঃপর তার যুহরের কাযার কথা স্মরণ হল, তাহলে সে আসরের সালাত সমাপ্ত করবে (আল জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

২১. মাসআলা ঃ ওয়াক্তের সংকীর্ণতার কারণে যদি তারতীব রহিত হয়ে যায়, তবে ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর বিশুদ্ধ মতে ঐ তারতীব আর ফিরে আসবে না। সুতরাং ওয়াক্তিয়া সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি ওয়াক্ত চলে যায়, তবে বিশুদ্ধ মতে ঐ সালাত ফাসিদ হবে না। সর্বোপরি বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাকে আদায়কারী গণ্য করা হবে, কাযাকারী নয় (যাহিদী)।

২২. মাসআলা ঃ ভুলের কারণে যদি তারতীব রহিত হয়, তবে যতক্ষণ ভ্রমের অবস্থা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারতীব জরুরী বলে পরিগণিত হবে না। অবশ্য কাযার কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই পুনরায় তারতীব অপরিহার্য হয়ে যাবে (তাতারখানিয়া ঃ খুলাসা-এর সূত্রে)।

২৩. মাসআলা ঃ কাযার সংখ্যা বেশী হলেও তারতীব রহিত হয়ে যায়। এটাই সহীহ্ মত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। বেশী হওয়ার পরিমাণ হল, ছয় ওয়াক্তের সালাত কাযা হওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হতেই তারতীব রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ষষ্ঠ সালাতের ওয়াক্ত আসতেই তারতীব রহিত হয়ে যাবে। প্রথমোক্ত মতটি সহীহ্ (হিদায়া)। সালাত কাযা হয়ে যাওয়ার পর ছয় ওয়াক্ত সালাত মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। যদিও এরপর সালাতসমূহ ওয়াক্ত মত আদায় করা হয়। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তারতীব রহিত হওয়ার জন্য কাযা সালাতের সংখ্যা ছয় হওয়া আবশ্যক। যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন ওয়াক্তের হয়। বস্তুত ইমামদের এ মতভেদের ফলাফল বুঝা যাবে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার তিন ওয়াক্তের সালাত ফওত হয়ে গিয়েছে। যেমন একদিনের যুহর, এক দিনের আসর এবং এক দিনের মাগরিব। কিন্তু তার জানা নেই কোন ওয়াক্ত আগের এবং কোন ওয়াক্ত পরের। তবে প্রথমোক্ত মতানুযায়ী তারতীব রহিত হয়ে যাবে। কেননা, কাযা সালাতের মধ্যবর্তী সালাতের সংখ্যা ছয়ের চেয়েও অনেক বেশী। আর দ্বিতীয় মতানুসারে তারতীব রহিত হবে না। কেননা, উক্ত বর্ণনা মতে কাযা সালাতের সংখ্যা ছয় হওয়া আবশ্যক ছিল। এরূপ হলে সাত ওয়াক্ত আদায় করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ প্রথম যুহর তারপর আসর, তারপর যুহর, তারপর মাগরিব, তারপর যুহর, তারপর আসর এবং তারপর যুহর, পড়তে হবে। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি হল বিশুদ্ধতম (তাবয়ীন)। এর মাঝে সহজ ও সরলতা বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফযল (র) দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। এতে অধিক সতর্কতা বিদ্যমন রয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা ঃ অধিক সালাত ছুটে গেলে যেমন আদায়ের মধ্যে তারতীব রহিত হয়ে যায়, অনুরূপভাবে কাযার মধ্যেও তারতীব রহিত হয়ে যায়। যেমন কারো এক মাসের নামায ছুটে গেল। অতঃপর সে এভাবে কাযা করল যে, প্রথমে ত্রিশ দিনের ফজরের কাযা পড়ল। এরপর ত্রিশ দিনের যুহরের কাযা পড়ল। এমনিভাবে অন্যান্য নামাযের কাযা পড়ল। তবে তার নামায শুদ্ধ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। অধিক নামায ছুটে যাওয়ার ফলে তারতীব রহিত হয়ে যাওয়ার পর কিছু নামাযের কাযা আদায় করার পর ছুটে যাওয়া নামাযের সংখ্যা ছয় ওয়াক্তের কম বাকী থাকলেও বিশুদ্ধতম মতানুসারে তারতীব ফিরে আসবে না (খুলাসা)। ইমাম আবূ হাফস কবীর (র) বলেন ঃ এর উপরই ফাতওয়া (মুহীত)। সুতরাং কারো যদি এক মাসের নামায ছুটে যায় এবং সে যদি এক ওয়াক্ত ব্যতীত বাকী সব নামাযের কাযা পড়ে নেয়, অতঃপর এ এক ওয়াক্ত নামাযের কথা স্মরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকা অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে, তবে তার ওয়াক্তিয়া সহীহ্ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ কাযা নামায দুই প্রকার ঃ ১. নতুন, ২. পুরাতন। নতুন কাযা নামাযের কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেইএকমত। অবশ্য পুরাতন কাযা নামাযের বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তির এক মাসের নামায কাযা হয়েছে। এরপর অনেক দিন পর্যন্ত সে নামায পড়েছে। কিন্তু পূর্বের কাযা নামাযসমূহ আদায় করেনি। এদিকে আরেক ওয়াক্ত নামায তার ফওত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি নতুন কাযা স্মরণ থাকা অবস্থায় ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে, তবে কোন কোন ফকীহ্-এর মতে তার ওয়াক্তিয়া নামায সহীহ্ হবে না। আর কারো কারো মতে সহীহ্ হবে। এর উপরই ফাতওয়া (কাফী)।

২৬. মাসআলা ঃ কাযা নামাযের কথা স্মরণ হওয়ার পর আদায় করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি তা আদায় না করে বিলম্বিত করা হয়, তবে মাকরূহ্ হবে কিনা? এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কথা হল, "আসল" (মূল কিতাব)[১] এর বর্ণনা মতে মাকরূহ্ হবে। কেননা, স্মরণ হওয়ার সময়টিই মূলত কাযা নামাযের ওয়াক্ত ছিল। আর নামাযকে ওয়াক্ত হতে দেরীতে আদায় করা সকলের নিকটই মাকরূহ্। এতে কারো দ্বিমত নেই (মুহীত)। "আসল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যুহরের নামায পড়েনি, এ কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় সে যদি আসরের নামায আদায় করে, তবে তার আসরের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ ওয়াক্তে পড়ে থাকলে ফাসিদ হবে না। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার ফরয নামায ফাসিদ হবে কিন্তু মূল নামায বাতিল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মূল নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত মাসআলাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মাসআলা। স্মর্তব্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার আসরের নামায "ফাসাদে মওকুফ" (যা আপাতত ফাসিদ, কিন্তু পরবর্তীতে আবার সহীহ্ হয়ে যায়) হিসাবে ফাসিদ হবে। তাই কেউ যদি যুহরের নামায কাযা হওয়ার পর ছয় ওয়াক্ত বা তদপেক্ষা বেশী নামায পড়ে নেয় এবং যুহরের নামাযের কাযা না পড়ে, তবে তার ঐ আসরের নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। তা পুনঃ পড়ার আর আবশ্যক হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তার এ নামায নিশ্চিতরূপে ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই জাইয হবে না। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মূলনীতি হল, অধিক নামায কাযা হওয়ার কারণে যেমনিভাবে কাযা ও ওয়াক্তিয়া নামাযের মধ্যে তারতীব রহিত হয়ে যায় অনুরূপভাবে অনেক আদা নামায জমা হওয়ার কারণেও তারতীব রহিত হয়ে যায় (মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ফাসিদ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি ভুলে যায় যে, এটা কোন্ ওয়াক্তের নামায ছিল। অবশেষে চিন্তা-ভাবনা করেও যদি কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারে, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী সে এক দিন এক রাত্রের নামায পুনরায় আদায় করবে

১. ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত কিতাবকে 'আসল' কিতাব বলা হয়। তিনি ঐ সব গ্রন্থে ইমাম আবূ হানিফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও তাঁর নিজের ইজতিহাদকৃত মাসআলাসমূহ (সর্বসম্মতিক্রমে বা স্বতন্ত্র মতের) বর্ণনা করেছেন।

(যহীরিয়্যা)। ফকীহ্ (র) বলেন, এ মতটিকেই আমরা গ্রহণ করেছি (তাতারখানিয়্যা ঃ ইয়ানাবি'-এর সূত্রে)। অনুরূপভাবে দুই দিন, তিন দিন এবং পাঁচ দিন যে কয় দিনের যে কয় ওয়াক্ত নামায হবে, সে কয় দিনের নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। কেউ যদি দুই দিনের যুহর ও আসরের নামায তরক করে এবং তার যদি এ কথা মনে না থাকে যে, কোন্ নামাযটি সে প্রথমে তরক করেছে, তবে সে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। যদি চিন্তা-ভাবনা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী প্রথমে যা আদায় করা হয়েছে, তা পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, ইবাদতের মধ্যে সতর্কতার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর এ ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে তারতীব তথা ক্রমধারা ঠিক রাখার নিশ্চিত অবকাশ রয়েছে। তাই এ নামায পুনরায় পড়তে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ অবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করে সহীহ্ সিদ্ধান্ত নেয়া তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে সে যেহেতু অক্ষম, তাই তারতীব তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। যেহেতু তার উপর ওয়াজিব নয় তাই এ নামায দ্বিতীয় বার তাকে আদায় করতে হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। অতএব, সে যদি প্রথমে যুহর, পরে আসর এবং এরপর যুহর আদায় করে, তবে উত্তম হবে। অবশ্য সে যদি প্রথমে আসর পড়ে, যুহর এবং আবার আসর পড়ে, তবু জাইয আছে।

২৮. মাসআলা ঃ আসরের নামায আদায় করা অবস্থায় কারো যদি একথা মনে পড়ে যে, সে একটি সিজদা ছেড়ে দিয়েছে, তবে যুহরের নামাযে এরূপ হয়েছে, না আসরের নামাযে এ কথা তার মনে নেই, তাহলে সে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে যে, কোন্ নামাযে এরূপ হয়েছে। যদি চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত না নিতে পারে, তবে আসরের নামায পুরা করে একটি সিজদা করে নিবে। কেননা, হতে পারে উক্ত সিজদাটি আসরের নামায হতেই ছুটেছিল। অতঃপর সতর্কতাবশত যুহরের নামায পুনরায় আদায় করবে। এরপর আসরের নামাযও পুনরায় আদায় করবে। অবশ্য আসরের নামায পুনরায় আদায় না করলে এতে কোন ক্ষতি নেই (মুহীত)।

আনুষঙ্গিক আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ "ইয়াতীমা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আমার পিতাকে কেউ প্রশ্ন করল যে, এক ব্যক্তি আসরের নামায পড়ছিল। এমতাবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেল। এ নামাযে কোন ব্যক্তি যদি তার ইকতেদা করে, তবে উক্ত ব্যক্তির ইকতেদা সহীহ্ হবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম যদি মুকীম এবং মুক্তাদী মুসাফির না হয়, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে (তাতারখানিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী কোন ব্যক্তি যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায় এবং পূর্বের কিছু নামায যদি তার যিম্মায় বাকী থেকে যায় এবং এ অবস্থায় সে যদি ঐ নামাযের কাযা পড়ে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী এ নামায সে কাযা করবে (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম কবযী পর্যন্ত এবং বিতরের নামায এক রাকআত পড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাইয মনে করত, অতঃপর এ ব্যক্তি যদি কনুইসহ তায়াম্মুম করতে শুরু করে এবং বিত্‌রের নামায তিন রাক'আত পড়তে আরম্ভ করে, তবে অতীত নামায তাকে পুনরায় পড়তে হবে না। যদি অজ্ঞতাবশত কাউকে জিজ্ঞাসা না করে সে এরূপ করে থাকে, অতঃপর কাউকে জিজ্ঞাসা করে এবং তাকে তিন রাকআত বিত্‌র পড়ার হুকুম দেয়, তবে অতীত নামায তাকে পুনরায় দুহরাতে হবে (যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ "সায়রাফিয়্যা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোন মহিলার এক ওয়াক্ত নামায ছুটে যাওয়ার পর তার যদি রজস্রাব হয়, অতঃপর সে পাক হয়, এমতাবস্থায় সে যদি কাযা নামায,[১] স্মরণ থাকা অবস্থায় ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে, তবে তার নামায জাইয হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কোন হরবী যদি দারুল হরব (অমুসলিম রাষ্ট্র)-এ ইসলাম গ্রহণ করে এবং শরীআত তথা নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু না জানে, অতঃপর সে যদি ইসলামী রাষ্ট্রে দাখিল হয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান তথা কোন দলীলের আলোকেই তার উপর নামায-রোযা ইত্যাদির কাযা ওয়াজিব নয় এবং মরে যাওয়ার পর তাকে কোনরূপ শাস্তিও প্রদান করা হবে না। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান হয় এবং শরীআত সম্পর্কে না জানে, তবে ইস্‌তিহ্‌সানের আলোকে অতীত সময়ের নামায আদায় করা তার উপর অপরিহার্য (ফাতওয়ায়ে কাযীখান ঃ কাফিরের ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়া-না হওয়া অধ্যায়ের শেষাংশ)। দারুল হরবে মুসলমান হওয়ার পর কেউ যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট শরীআতের বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দেয়, তবে তার উপর কাযা অপরিহার্য। হযরত হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দুই পুরুষ অথবা এক পুরুষ ও দুই মহিলা তাকে শরীআত সম্বন্ধে অবগত না করে, তবে তার উপর কাযা অপরিহার্য নয়। (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। "ইতাবিয়্যা" গ্রন্থে আবূ নসর (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যার কোন নামায কাযা হয়নি এমন ব্যক্তি যদি সতর্কতার লক্ষ্যে উমরী কাযা আদায় করতে চায়, তবে দেখতে হবে যে, সে যদি অতীত নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণের জন্য এরূপ করতে চায়, তবে ভাল। আর যদি এরূপ নিয়্যাত না থাকে, তবে এরূপ করবে না। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এরূপ করা জাইয আছে। কেননা, "নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হেতু" পূর্বসূরী বুযুর্গ লোকদের অনেকেই এরূপ করেছেন। তবে এ নামায ফজর এবং আসরের পর পড়বে না (মুযমারাত)।

৫. মাসআলা ঃ কাযা নামায আদায়কারী ব্যক্তি সমস্ত রাকআতেই "আলহামদু"-এর সাথে সূরা মিলাবে (যহীরিয়্যা)। "ফাতওয়ার" মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, কাযা নামায আদায়কারী ব্যক্তি কাযার সাথে বিত্‌রের নামাযেরও কাযা পড়বে। "বিত্‌রের নামায তার যিম্মায় বাকী আছে কিনা" এ কথা যদি নিশ্চিতভাবে কারো জানা না থাকে, তবে সে বিত্‌রের নিয়্যাতে তিন রাকআত নামায পড়বে এবং তৃতীয় রাকআতে কুনূত পড়বে। অতঃপর তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসবে, এরপর দাঁড়িয়ে আরো এক রাকআত নামায এর সাথে মিলিয়ে নিবে। বস্তুত তার যিম্মায় যদি বিত্‌র বাকী রয়ে থাকে, তবে তো তা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তার যিম্মায় বিত্‌র

---

১. রজঃস্রাবের পূর্বের, কারণ রজঃস্রাবকালীন সালাতের কাযা করতে হয় না।

বাকী না থেকে থাকে, তবে এ চার রাকআত নফল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, নফল নামাযে কুনূত পড়তে কোন ক্ষতি নেই।

৬. মাসআলা ঃ "হুজ্জাত" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কাযা নামায পড়া নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু প্রসিদ্ধ সুন্নাত নামায, চাশ্‌তের নামায, সালাতুত তাস্‌বীহ এবং ঐ সমস্ত নফল, যার মধ্যে বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তা নফলের নিয়্যাতে পড়বে। এ ছাড়া সমস্ত নফল কাযা নামাযের নিয়্যাতে পড়বে (মুযমারাত)।

৭. মাসআলা ঃ কাযা নামায মসজিদে পড়বে না। কাযা নামায নিজের ঘরে আদায় করবে (ওয়াজীয ঃ কুরদুরী (র))। "মুলতাকাত" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পিতা যদি পুত্রকে নির্দেশ করে যে, সে যেন তার পক্ষ হতে কয়েক দিনের নামায এবং রোযা কাযা করে, তবে আমাদের মাযহাবে এরূপ করা জাইয নেই (তাতারখানিয়্যা)। কোন ব্যক্তি যদি মরে যায় এবং তার যিম্মায় যদি অনেক নামায বাকী থাকে এবং সে যদি ঐ নামাযসমূহের কাফ্‌ফারা দিতে ওসিয়ত করে যায়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মাল হতে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য পৌনে দুই সের[১] গম এবং বিত্‌রের জন্য পৌনে দুই সের গম এবং প্রত্যেক রোযার জন্য পৌনে দুই সের গম দিবে। যদি তার পরিত্যাজ্য কোন মাল না থাকে, তবে তার ওয়ারিছগণ পৌনে দুই সের গম হাওলাত গ্রহণ করবে। অতঃপর তা কোন মিসকীনকে প্রদান করবে। পরে এ মিসকীন তা তার কোন ওয়ারিছকে সদকা দিবে। আবার তা কোন মিসকীনকে সাদাকা দিবে। মিসকীন পুনরায় তা তার কোন ওয়ারিছকে সাদাকা দিবে। সমস্ত কাফ্‌ফারা আদায় হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ করা হবে (খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ "ফাতাওয়ায়ে হুজ্জাতের" মধ্যে উল্লেখ আছে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি ওয়ারিছদেরকে ওসিয়ত না করে যায় এবং কোন ওয়ারিছ স্বেচ্ছায় তা আদায় করে দেয়, তবে জাইয আছে। অবশ্য প্রত্যেক নামাযের জন্য পৌনে দুই সের গম প্রদান করতে হবে। সমস্ত সাদাকা যদি এক ফকীরকে দেয়া হয়, তবু জাইয আছে। কিন্তু কসম, যিহার এবং রোযার কাফ্‌ফারা এক ফকীরকে দেয়া জাইয নেই। "আল্-উলূজিয়্যা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কাফ্‌ফারা দুই ব্যক্তির মধ্যে এভাবে বন্টন করে দেয় যে, একজনকে দিল সের এবং অপরজনকে দিল পৌনে দুই সের তবে ফকীহ্ (র)-এর মতে এতে চার ওয়াক্ত নামাযের কাফ্‌ফারা আদায় হবে। পঞ্চম ওয়াক্তের কাফ্‌ফারা আদায় হবে না।

৯. মাসআলা ঃ "ইয়াতীমা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত হাসান ইবন আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মৃত্যুকালীন রোগের সময়ের নামাযের সাদাকা দেয়া জাইয আছে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, জাইয নেই। হিময়ার আলওয়াবেরী (র) এবং আবূ ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ (র)-কে 'অতিশয় বৃদ্ধ' সম্বন্ধে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর জীবিত অবস্থায় যেমনিভাবে রোযার কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব, অনুরূপভাবে নামাযের কাফ্‌ফারা আদায় করাও কি তার উপর ওয়াজিব? জবাবে তিনি বলেছেন, না। ওয়াজিব নয় (তাতারখানিয়্যা)।

---

১. পৌনে দুই সের, বরং এক সের সাড়ে বারো ছটাক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ সমরকন্দবাসীদের ফাতওয়ায় বর্ণিত আছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর কারো মনে পড়ল যে, সে এ পাঁচ ওয়াক্তের কোন এক ওয়াক্তের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়েনি, তবে কোন্ নামাযে এরূপ হয়েছে, তা তার জানা নেই, তাহলে সে সতর্কতা হেতু ফজর এবং মাগরিবের নামায পুনরায় আদায় করে নিবে। যদি এ কথা স্মরণ হয় যে, শুধু এক রাকআতে সে কিরাআত তরক করেছে, তবে কোন্ রাকআতে এরূপ হয়েছে তা তার মনে নেই, তবে ফকীহ্‌দের মতে সে ফজর ও বিতরের নামায পুনরায় আদায় করবে। যদি এ কথা মনে পড়ে যে, সে দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে, তবে ফজর, মাগরিব এবং বিতরের নামায পুনরায় আদায় করবে। আর যদি এ কথা স্মরণ হয় যে, সে চার রাকআতে কিরাআত তরক করেছে, তবে সে যুহ্‌র, আসর এবং ঈশা পুনরায় আদায় করবে। বিত্‌র, ফজর এবং মাগরিব পুনরায় আদায় করতে হবে না (মুহীত)। ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না।[১] (কাফী ঃ কাযা নামায পরিচ্ছেদ)

১. এটা হানাফী মাযহাবে। ইমাম শাফেঈ (র) ও আহমদ (র)-এর মাযহাবে হত্যা করতে হবে। হানাফী মাযহাবে বন্দী করে রাখতে হবে। হয় তওবা করে সালাত আদায় করা শুরু করবে, না হয় বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাহু সিজদার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। (তাবয়ীন) এটাই সহীহ্ মত। (হিদায়া) সাহু সিজদা করা তখনই ওয়াজিব হবে, যদি ওয়াক্তের মধ্যে তা আদায় করার অবকাশ থাকে। যেমন কারো উপর ফজরের নামাযে সাহু সিজদা ওয়াজিব ছিল, এখনো সে সাহু সিজদা করেনি, এমতাবস্থায় প্রথম সালামের পর যদি সূর্যোদয় ঘটে, তবে সাহু সিজদা তার দায়িত্ব হতে রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি আসরের নামাযের কাযা পড়ছিল। এ অবস্থায় তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হল, কিন্তু সিজদা করার পূর্বেই সূর্য রক্তিম আভা ধারণ করল। এ অবস্থায়ও সাহু সিজদা তার যিম্মা হতে রহিত হয়ে যাবে। যে আমলের কারণে এক নামাযের উপর অন্য নামাযের বিনা (ভিত্তি স্থাপন) নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এরূপ কোন আমল সালামের পর সংঘটিত হলে এতেও সাহু সিজদা রহিত হয়ে যায় (আল বাহ্‌রুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ "কিনয়া" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যদি কারো ফরয নামাযে সাহু হয়, অতঃপর সে যদি এর উপর নফল নামাযের বিনা করে, তবে সে আর সাহু সিজদা করবে না (আন্ নাহ্‌রুল ফাইক)। নামাযের মধ্যে ভুলে কোন কাজ কম করা হোক বা বেশী করা হোক, উভয় অবস্থাতেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। সালামের পর সাহু সিজদা করতে হবে। সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করলেও আমাদের মাযহাবে তা জাইয হবে। "উসূল"-এর বর্ণনায় এমনি উল্লেখ রয়েছে। দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে। এটা বিশুদ্ধ মত (হিদায়া)। কিন্তু নির্ভরযোগ্য অভিমত হল, এক সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে। এটাই জমহুর (অধিকাংশ) আলিমের মত। "আসল"-এর মধ্যে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে (কাফী)। ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে (যাহিদী)। এর নিয়ম হল, প্রথম সালামের পর তাকবীর বলে সিজদায় অবনত হবে এবং সিজদার তাসবীহ্ পাঠ করবে। অতঃপর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সিজদা করবে। এরপর পুনরায় তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে (মুহীত)। তাশাহ্‌হুদের পর মহানবী (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ এবং দু'আও পাঠ করবে। এটাই সহীহ্ মত। কেউ কেউ বলেন, দুরূদ ও দু'আ প্রথমেই পড়ে নিবে (তাবয়ীন)। উত্তম ও সতর্কতা হল, সাহু সিজদা করার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থাতেই দুরূদ ও দু'আ পাঠ করা (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ সাহু সিজদার হুকুম ফরয ও নফল নামাযে একই ধরনের (মুহীত)। ফাতাওয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, সাহু সিজদার পর বৈঠক করা নামাযের রুক্ন নয়। সাহু সিজদার পর বসার বিধান এ জন্য দেয়া হয়েছে যেন বৈঠকের মাধ্যমে নামাযের পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং সাহু সিজদার পর কেউ যদি না বসে দাঁড়িয়ে অন্যত্র চলে যায়, তবে তার নামায ফাসিদ হবে না। ইমাম হালওয়ানী (র) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ "আল্‌ওয়ালুজিয়্যা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহু সিজদার বিষয়ে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, নামাযের ছুটে যাওয়া আমল তিন প্রকার হতে পারে। ১. ফরয, ২. সুন্নাত, ৩. ওয়াজিব।ফরয ছুটে যাওয়ার পর যদি তা আদায় করা যায়, তাহলে নামায সহীহ্ হবে। অন্যথায় নামায ফাসিদ হয়ে যাবে[১]। নামাযে যদি কোন সুন্নাত আমল ছুটে যায়, তবে নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, নামায নামায হিসাবে পরিগণিত হয় রুকনের দ্বারা। আর তা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। নামাযে যদি কোন ওয়াজিব আমল ছুটে যায়, তবে তা যদি ভুলবশত ছুটে থাকে, তাহলে সাহু সিজদার মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করা হবে।আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তবে সাহু সিজদার মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ হবে না (তাতারখানিয়্যা)। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়। এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)।

৫. মাসআলা ঃ নিম্নোক্ত অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। যেমন ওয়াজিব ছুটে যাওয়া বা ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব হওয়া, অথবা ফরয আদায়ে বিলম্ব হওয়া কিংবা কোন ফরয কাজ সময়ের আগে আদায় করা অথবা ফরয কাজ দুই বার আদায় করা অথবা কোন ওয়াজিবকে পরিবর্তন করে দেয়া, যেমন যে নামায চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব, তা সশব্দে পড়া ইত্যাদি। মোদ্দা কথা, ওয়াজিব তরক করার কারণেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়ে থাকে (কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্, সুব্‌হানাকা এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য যে তাকবীর বলা হয়, এগুলো তরক করাতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর তাকবীর ছেড়ে দিলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। দুই ঈদের নামায এবং অন্যান্য নামাযের তাকবীরের সময় হাত উঠানো ছেড়ে দিলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। এ কারণেই ভুলবশত প্রথমে বাম দিকে সালাত ফিরালেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ভুলবশত কেউ যদি রুকূ হতে খাড়া হওয়া তরক করে অর্থাৎ রুকূ হতে না দাঁড়িয়ে সিজদায় চলে যায়, তবে ফাতওয়ায়ে কাযীখানের বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর)।

নামাযের ওয়াজিব কয়েক প্রকার

৭. মাসআলা ঃ ১. সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্য কোন সূরা মিলিয়ে পাঠ করা। প্রথম দুই রাকআতে বা এক রাকআতে সূরা ফাতিহা না পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। যদি সূরা ফাতিহার বেশীর ভাগ অংশ পাঠ করে সামান্য অংশ কেউ ভুলে যায়, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর যদি বেশীর ভাগ অংশ কেউ ভুলে যায়, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। ইমাম হোক বা একাকী নামায আদায়কারী হোক, এতে কোন পার্থক্য নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শেষের দুই রাকআতে কেউ সূরা ফাতিহা তরক করলে এবং তা ফরয নামায হলে, তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর তা নফল বা বিত্‌র নামায হলে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)।

১. সাহু সিজদার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হবে না।

৮. মাসআলা ঃ প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা দুইবার করে পড়লে এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। যদি সূরা মিলানোর পর সূরা ফাতিহা দুইবার করে পড়া হয় অথবা যদি শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা দুইবার পড়া হয়, তবে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। এক শব্দ ব্যতীত পূর্ণ সূরা ফাতিহা অথবা সূরা ফাতিহার বেশীর ভাগ অংশ পাঠ করার পর যদি ভুলবশত তা আবার পড়া হয়, তবে তা দুইবার পাঠ করার মতই (যহীরিয়্যা)। যদি কেউ শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে এবং সূরা মিলানো তরক করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি সূরা ফাতিহার সাথে শুধুমাত্র ছোট একটি আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উপরও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। সূরা ফাতিহার পর দুই আয়াত তিলাওয়াত করে কেউ যদি ভুলে রুকূতে চলে যায়, অতঃপর স্মরণ হওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে তৃতীয় আয়াতটিও তিলাওয়াত করে, তবে তার উপরও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি সূরার সাথে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তবে তার উপরও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কিন্তু কেউ যদি রুকূ, সিজদা বা তাশাহ্‌হুদের মধ্যে কিরাআত পাঠ করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। উক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি প্রথমে কিরাআত পড়ে, এরপর তাশাহ্‌হুদ পড়ে। কিন্তু যদি প্রথমে তাশাহ্‌হুদ পড়ে, এরপর কিরাআত পড়ে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা না পড়লে "যাহিরুর রিওয়ায়েত" অনুযায়ী সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ ঃ ফাতাওয়ার সূত্রে)। কেউ যদি শেষ দুই রাকআতে মোটেই কিরাআত না পড়ে এবং তাসবীহ্ও না পড়ে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ইচ্ছাপূর্বকভাবে সে যদি এরূপ করে, তবে খুবই খারাপ করল। আর যদি ভুলক্রমে সে এরূপ করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বর্ণনা করেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলে কোন অসুবিধা হবে না এবং ভুলবশত এরূপ করলেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার কথা ভুলে গিয়ে অন্য সূরা পড়তে আরম্ভ করে, অতঃপর কিছু অংশ তিলাওয়াত করার পর তার যদি সূরা ফাতিহার কথা স্মরণ হয় তবে তৎক্ষণাৎ সূরা ফাতিহা পড়বে এবং এরপর সূরা মিলাবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, অন্য সূরার এক অক্ষর পড়লেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। যদি পূর্ণ সূরা পাঠ করার পর কিংবা রুকূতে বা রুকূ হতে মাথা উঠানোর পর সূরা ফাতিহা ছুটে যাওয়ার কথা স্মরণ হয়, তথাপি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। এরপর সূরা মিলাবে এবং পরে সাহু-সিজদা করবে। খুলাসা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সূরা না মিলিয়ে কেউ যদি রুকূতে চলে যায়, তবে সে মাথা উঠিয়ে সূরা মিলাবে। এরপর পুনরায় রুকূ করবে এবং শেষে সাহু সিজদা করবে। এটাই সহীহ্ মত (তাতারখানিয়্যা)। প্রথম রাকআতে এক সূরা তিলাওয়াত করে দ্বিতীয় রাকআতে এর পূর্ববর্তী সূরা তিলাওয়াত করলে সাহুসিজদা ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ আল্ওয়ালুজিয়্যা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোন মুসল্লী যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা দিতে ভুলে যায়, অতঃপর স্মরণ হওয়া মাত্র সিজদা করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা, সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হয়েছিল। অথচ সে তা বর্জন করেছে। কারো কারো মতে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ (তাতারখানিয়্যা)। কেউ নামাযে এক সূরা পড়ার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু ভুলে অন্য সূরা পাঠ করল, তবে এতে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না[১] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ ২. নামাযের দ্বিতীয় ওয়াজিব হল, প্রথম দুই রাকআতকে কিরাআতের জন্য নির্দিষ্ট করা (আল্ বাহ্রুর রাইক)। ৩. নামাযের তৃতীয় ওয়াজিব হল, যে কাজ নামাযে বারবার করতে হয় এর তারতীব (ক্রমধারা) রক্ষা করা। সুতরাং কেউ যদি কোন রাকআতে এক সিজদা ছেড়ে দেয় এবং নামাযের শেষ পর্যায়ে একথা তার স্মরণ হয়, তবে সেই ঐ সিজদা আদায় করে সাহু সিজদাও করবে। কেননা, সিজদার তারতীব তার ছুটে গিয়েছে। অবশ্য পূর্বে সে যা আদায় করেছে পুনরায় তা আর তাকে আদায় করতে হবে না। কেউ যদি কিরাআতের পূর্বে রুকূ করে নেয়, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু পূর্বের রুকূ ধর্তব্য না হওয়ায় কিরাআতের পর পুনরায় তার উপর রুকূ করা ফরয (আল বাহ্রুর রাইক)।

১৩. মাসআলা ঃ ৪. নামাযের চতুর্থ ওয়াজিব হল, তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকূ সিজদা ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। অবশ্য "তা'দীলে আরকান" তরক করার ফলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কেননা, তা'দীলে আরকান ওয়াজিব, না সুন্নাত এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। এ মতপার্থক্যের ফলেই উপরোক্ত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সঠিক মতে তা'দীলে আরকান হল ওয়াজিব। ভুলে তা ত্যাগ করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। বাদাই' কিতাবে এমতটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে (আল্ বাহ্রুর রাইক)। ৫. নামাযের পঞ্চম ওয়াজিব হল প্রথম বৈঠক। কেউ যদি তা তরক করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)।

১৪. মাসআলা ঃ ৬. নামাযের ষষ্ঠ ওয়াজিব হল তাশাহ্হুদ পড়া। কেউ যদি প্রথম বৈঠক বা শেষ বৈঠকে তা বর্জন[২] করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি তাশাহ্হুদের কিয়দংশ বর্জন করে, তবে এতেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। ফরয এবং নফল অর্থাৎ সব নামাযেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য (আল বাহ্রুর রাইক)। কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়ে এবং প্রথম রাকআতে এভাবে পড়ে, তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না[৩]। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতে সে এরূপ করে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে

---

১. মারাত্মক ভুল, 'না'-কে হাঁ করে দেয়া হয়েছে। এ টীকা ছাপার সময় দিতে হবে না।

২. স্মর্তব্য ঃ বর্জন মানে ভুল বশতঃ।

৩. এর অর্থ এ নয় যে, ২য় রাকআতের পরে সে আর বসে তাশাহ্হুদ পড়বে না বরং এই ভুল পড়ার কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।

ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (যাহীরিয়্যা)। কেউ যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে তাশাহ্হুদ পড়ে নেয়, তবে এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেননা, সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানোর স্থান এবং সূরা ফাতিহার পূর্বাংশ হল সুব্হানাকা পড়ার স্থান। এতসত্ত্বেও সে যেহেতু ওয়াজিবকে বিলম্ব করেছে অর্থাৎ সূরা মিলানোকে বিলম্ব করেছে, তাই এ অবস্থায় তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। কেউ যদি শেষের দুই রাকআতে দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়ে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

১৫. মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদের পর কেউ যদি ভুলে সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তবে এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি তাশাহ্হুদের স্থানে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ফাতিহা পাঠের পর তাশাহ্হুদ পড়ে, তবে এতেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। "আল ওয়াকিআতুন নাতিকিয়া" কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। উপরোক্ত কিতাবে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, তাশাহ্হুদের স্থানে কেউ যদি কিরাআত আরম্ভ করে এবং এরপর তাশাহ্হুদ পড়ে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কেউ যদি প্রথমে তাশাহ্হুদ পড়ে এবং এরপর কিরাআত আরম্ভ করে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি দাঁড়ানো কিংবা রুকূ অথবা সিজদার অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়ে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়জিব হবে না (মুহীত)। প্রথম বৈঠকে দুইবার তাশাহ্হুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে তাশাহ্হুদের পর দুরূদ শরীফ পড়লেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। এর উপরই ফাতওয়া (মুযতারাত)। অবশ্য এর পরিমাণ নিরূপণের ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পর্যন্ত বললে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অন্য ফকীহ্দের মতে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ পর্যন্ত বললে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অবশ্য প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধতম।

১৬. মাসআলা ঃ শেষ বৈঠকে দুইবার তাশাহ্হুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। তাশাহ্হুদ পড়া ভুলে গিয়ে কেউ যদি সালাম ফিরিয়ে দেয়, অতঃপর স্মরণ হওয়া মাত্র তাশাহ্হুদ পড়ে নেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। কেউ যদি দাঁড়ানোর স্থানে বসে যায় এবং বসার স্থানে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সে ইমাম হোক বা একাকী নামায আদায়কারী হোক, তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। দাঁড়ানোর মানে হল, পূর্ণ দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হওয়া। এ অবস্থায় উক্ত মুসল্লী বসার দিকে আর ফিরে আসবে না। তাই শেষে সে সাহু সিজদা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দাঁড়ানোর পর কেউ যদি বসে। তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধ মত (তাবয়ীন)। দাঁড়ানোর নিকটবর্তী না হলে বসে যাবে এবং সাহু সিজদা করতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (হিদায়া ও তাবয়ীন)। দাঁড়ানো বা

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি মানুষের নিম্নের অর্ধাঙ্গ দ্বারা নিরূপণ করা হবে। যদি নিম্নের অর্ধাঙ্গ সোজা হয়ে যায়, তবে এ অবস্থাকে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী বলে গণ্য করা হবে। এরূপ না হলে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী বলে গণ্য হবে না (কাফী)। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি উঠার উদ্দেশ্যে হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়ায়, (পূর্ণ না দাঁড়ায়) তবে সে বসবে এবং সাহ সিজদা করবে। এ হুকুমের ব্যাপারে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বৈঠকই সমান। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য। আর কেউ যদি নিতম্ব উঠিয়ে ফেলে এবং হাঁটু যমীনের উপর থাকে, তবে তার উপর সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ রুকূর স্থানে সিজদা করলে এবং সিজদার স্থানে রুকূ করলে অথবা কোন রুক্ন দুইবার আদায় করলে অথবা কোন রুক্ন যথাস্থানের আগে বা পেছনে আদায় করলে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। কুদূরী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নামাযের এমন কোন কাজ কেউ যদি তরক করে, যার মধ্যে কোন যিকির (ওয়াযীফা) নির্ধারিত রয়েছে, তবে এতে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা, কোন কাজে যিক্র বিদ্যমান থাকাই এ কথার আলামত যে, এ কাজটি নামাযের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এরূপ কাজ বর্জন করাতে অবশ্যই নামাযের ক্ষতি সাধিত হবে। অতএব, সাহ সিজদার মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আর যদি কেউ এমন কাজ বর্জন করে যার মধ্যে যিকির নির্ধারিত নেই তবে এতে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না। যেমন ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা এবং রুকূ-সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১৮. মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে (বৈঠকের স্থানে) বসে তাশাহ্হুদ পড়ার পর তিন রাকআত পড়েছে, না চার রাকআত এমর্মে কারো যদি সন্দেহ হয় এবং এভাবে চিন্তা করার কারণে নামায আদায়ে যদি বিলম্ব হয়, অতঃপর নিশ্চিত হয় যে, সে চার রাকআত আদায় করেছে, তবে সে তার নামায পূর্ণ করবে এবং নামায শেষে সাহ সিজদা করবে। আর যদি এক সালাম ফিরানোর পর এরূপ সন্দেহ হয়, তবে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না। নামাযে উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর উযূ করতে গিয়ে কারো এরূপ সন্দেহ হলে এবং এ কারণে উযূ করতে সামান্য বিলম্ব হলে সাহ সিজদা করতে হবে (মুহীত)।

১৯. মাসআলার ঃ ৭. নামাযের সপ্তম ওয়াজিব হল, দু'আ কুনূত পড়া কুনূত তরক করলে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। "রুকূ হতে মাথা উঠাতেই কুনূত করা হয়েছে বলে" মনে করা হবে। এর আগে নয়। কিরাআতের পর দু'আ কুনূতের পূর্বে যে তাকবীর বলা হয়, তা যদি কেউ বর্জন করে, তবে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা, এ তাকবীর দুই ঈদের তাকবীরের অনুরূপই (তাবয়ীন)। ৮. নামাযের অষ্টম ওয়াজিব হল দুই ঈদের তাকবীরসমূহ। "বাদাঈ" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ঈদের তাকবীর ছেড়ে দিলে অথবা কম-বেশী করলে অথবা যথাস্থানে আদায় না করে অন্য স্থানে আদায় করলে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে (আল বাহরুর রাইক)। এ বিষয়ে কম ও বেশী সামান্য ও অনেক একই সমান। ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে ইমাম হাসান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, ঈদের নামাযে ইমাম যদি ভুলবশত একটি তাকবীরও তরক করে তবে এতেও সাহ

সিজদা ওয়াজিব হবে (যখীরা)। "কাশফুল আস্‌রার" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, ইমাম যদি ঈদের তাকবীরসমূহ ভুলে রুকূতে চলে যায়, তবে সে পুনরায় দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। কিন্তু মাসবূকের হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। মাসবূক যদি ইমামকে রুকূর অবস্থায় পায়, তবে সে রুকূর অবস্থায়ই তাকবীর বলে নিবে (আল্ বাহরুর রাইক)। ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর তাকবীর ছেড়ে দিলে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা, এও ঈদের তাকবীরের সাথে মিলে ঈদের তাকবীরের ন্যায় ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথম রাকআতের রুকূর তাকবীর এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, তা অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় (তাবয়ীন)।

২০. মাসআলা ঃ জুমুআ, ঈদ, ফরয এবং নফল অর্থাৎ সকল নামাযের ক্ষেত্রে সাহ সিজদার হুকুম একই। কিন্তু আমাদের শায়খগণ বলেছেন যে, জুমুআ ও দুই ঈদের নামাযে সাহ সিজদা করবে না, যেন মুসল্লীগণ ফিতনায় পতিত না হয় (মুযমারাত ঃ মুহীত এর সূত্রে)।

২১. মাসআলা ঃ ৯. নামাযের নবম ওয়াজিব হল, আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া এবং জোরের জায়গায় জোরে পড়া। অতএব, কেউ যদি আস্তের জায়গায় জোরে পড়ে বা জোরের জায়গায় আস্তে পড়ে, তবে এতে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। কতটুকু পরিমাণ আস্তে বা জোরে পড়লে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে, এ বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যে পরিমাণ পড়লে নামায জাইয হয়, উভয় ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ পড়লে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। এ বিষয়ে ফাতিহা এবং অন্য সূরার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একা নামায আদায়কারী ব্যক্তি কিরাআত আস্তে পড়ুক বা জোরে, কোন অবস্থাতেই তার উপর সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা, উপরোক্ত অবস্থা দুটো জামাআতের নামাযের বৈশিষ্ট্য (তাবয়ীন)। আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ অথবা আমীন জোরে বললে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ ইমামের ভুলের কারণে ইমাম এবং মুসল্লী সকলের উপর সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে। ইমামের সাহুর সময় নামাযে শরীক থাকা মুক্তাদীর জন্য শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি ইমামের ভুলের পর নামাযে শরীক হয়, তবে ইমামের অনুসরণের জন্য ইমামের সাথে তাকেও সাহ সিজদা করতে হবে। ইমামের একটি সাহ সিজদা করার পর কেউ যদি ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, তবে সে দ্বিতীয় সিজদায় ইমামের সাথে শরীক হবে। প্রথম সিজদার কাযা করতে হবে না তার। আর কেউ যদি উভয় সিজদা করার পর ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, তবে এ সিজদা দুটোর কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। মুক্তাদীর ভুলের কারণে সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না। ইমাম সাহ সিজদা তরক করলে মুক্তাদীর উপর সাহ সিজদা ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ মাসবূক ইমামের সাথে সাহ সিজদা করার পর নিজের বাকী নামায আদায় করবে। তবে নামায শেষে পুনরায় তাকে সাহ সিজদা করতে হবে না। লাহিক ব্যক্তি ইমামের সাথে যে সিজদা করেছে তা ধর্তব্য নয়। তাই সে নামায শেষে সাহ সিজদা করবে। মাসবূকের জন্য উচিত হল, ইমামের সালামের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা। কেননা, ইমামের উপর সাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিজদা থাকতে পারে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে সাহু সিজদা না করে নিজ নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার সাহু সিজদা রহিত হবে না। বরং নামায শেষে সে সাহু সিজদা করে নিবে। ইমামের সালাম ফিরানোর পর মাসবূক যদি দাঁড়িয়ে যায় এবং এরপর যদি ইমামের সাহু সিজদার কথা স্মরণ হয় এবং সে সিজদা করে, তবে মাসবূক নিজের রাকআতের সিজদা না করে থাকলে এ রাকআত ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে সাহু সিজদা করার জন্য ফিরে আসবে এবং ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে নিজের নামায কাযা করবে। কিয়াম, কিরাআত, রুকূ, যা পূর্বে সে করেছে, তা ধর্তব্য নয়। আর সে যদি ইমামের সাথে সিজদা করার জন্য ফিরে না আসে, বরং নিজের নামায আদায়ে রত থাকে, তবে তার নামায জাইয হবে। অবশ্য নামায শেষে তাকে সাহু সিজদা আদায় করতে হবে। মাসবূক যদি নিজের রাকআতের সিজদা করে থাকে, তবে সে আর ফিরে আসবে না। অর্থাৎ ইমামের সাথে সাহু সিজদায় শরীক হবে না। যদি ফিরে আসে এবং শরীক হয়, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৪. মাসআলা ঃ সালাতুল খাওফের মধ্যে ইমাম যদি সাহু সিজদা করে এবং তার সাথে যদি দ্বিতীয় দল সাহু সিজদায় শরীক হয়, তবে প্রথম দলটি নিজেদের নামায শেষে সাহু সিজদা করবে (আল-বাহ্রুর রাইক)। লাহিক মুসল্লীর অবশিষ্ট নামায আদায় করার সময় যদি ভুল হয়, তবে এ ভুলের কারণে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য মাসবূক ব্যক্তি তার অবশিষ্ট নামায আদায় করার সময় যদি ভুল করে তবে এ ভুলের কারণে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। ইমামের ভুল হওয়ার পর মাসবূক যদি ইমামের সাথে সাহু সিজদায় শরীক না হয়, এমতাবস্থায় সে তার বাকী নামায আদায় করার সময় যদি ভুল করে বসে, তবে দুই সিজদাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। মুকীম যদি মুসাফিরের পেছনে ইকতেদা করে তবে সাহু সিজদার ক্ষেত্রে তার হুকুম মাসবূকের হুকুমের অনুরূপ। ইমামের ভুল হওয়ার পর যদি তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, অতঃপর সে যদি কোন মাসবূককে ইমাম বানায়, তবে সে নামায শেষ করবে কিন্তু সালাম ফিরাবে না। বরং সে এমন এক ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে, যে শুরু থেকে নামাযে শরীক ছিল। অতঃপর সে সালাম ফিরাবে এবং ভুলের জন্য সাহু সিজদা করবে। মাসবূকও তার সাথে সাহু সিজদা করবে। "শুরু থেকে নামাযে শরীক ছিল" এমন কোন ব্যক্তি যদি সেখানে না থাকে, তবে প্রত্যেকেই নিজের অবশিষ্ট নামায আদায় করার জন্য দাঁড়াবে এবং নামায শেষে সাহু সিজদা করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি যুহরের নামাযের চতুর্থ রাকআত শেষে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর পঞ্চম রাকআতের[১] উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায়, তবে পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পূর্বে যদি তার এ কথা স্মরণ হয় যে, পঞ্চম রাকআত পড়ছে, তাহলে সে বসে যাবে এবং সালাম ফিরাবে (মুহীত)। আর সাহু সিজদাও করবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পর তার এ কথা স্মরণ হয় যে, সে পঞ্চম রাকআত পড়ছে, তবে বসবে না এবং সালামও ফিরাবে না। বরং আরো এক রাকআত পড়ে দুই রাকআত পুরা করবে। এরপর

তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে (মুহীত)। এবং ইস্তিহ্সান"-এর দাবীর আলোকে সাহু সিজদা করবে (হিদায়া)। এটাই পসন্দনীয় মত (কিফায়া)। সাহু সিজদার পর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে (মুহীত)। এ দু'রাকআত নফল হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যুহরের দুই রাকআত সুন্নাতের বদল হবে না। এটাই সহীহ্ মত (আল্জাওহারাতুন নায়্যারা)। ফকীহ্গণ বলেন, আসরের নামাযে ষষ্ঠ রাকআত মিলাবে না। কেউ কেউ বলেন, আসরের নামাযেও ষষ্ঠ রাকআত মিলানো হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাবয়ীন)। নির্ভরযোগ্য মত এটাই। কেননা, আসরের নামাযের পর ইচ্ছাপূর্বকভাবে নফল পড়া মাকরূহ্। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলে মাকরূহ্ হবে না ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৬. মাসআলা ঃ ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআত শেষে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর কেউ যদি তৃতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং সিজদাও করে নেয়, তথাপি এর সাথে চতুর্থ রাকআত মিলাবে না (তাবয়ীন)। "তাজনীস" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হিশাম (র)-এর বর্ণনার উপরই ফাতওয়া। অর্থাৎ অন্য রাকআত মিলানো অপসন্দ না হওয়ার ক্ষেত্রে ফজর এবং আসরের নামাযের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই (আল্ বাহ্রুর রাইক)। ফজরের নামাযে দুই রাকআতের পর যদি কোন ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পরিমাণ না বসে, তবে বৈঠক না করার কারণে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নফলও হবে না। কেননা, ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআতের অধিক নফল পড়া মাকরূহ্। কিন্তু আসরের নামাযে যদি কোন ব্যক্তি চতুর্থ রাকআতের শেষে বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকআতের সিজদা করে নেয়, তবে এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলিয়ে নিবে। কারণ, আসরের ফরযের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ্ নয় (তাবয়ীন)। যদি কোন ব্যক্তি আসরের চতুর্থ রাকআতে না বসে পঞ্চম রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং এখনো পর্যন্ত সিজদা না করে থাকে, তবে বসে পড়বে। (মুহীত)। খুলাসা কিতাবে আছে, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সাহু সিজদা করবে (তাতারখানিয়া)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি যুহরের চতুর্থ রাকআতে না বসে পঞ্চম রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং সিজদাও করে নেয়, তবে আমাদের মাযহাবে তার যুহরের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার ফরয নফলে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলিয়ে নিতে হবে। না মিলালে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)। উপরোক্ত ফরয কখন ফাসিদ হবে, এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, পঞ্চম রাকআতের সিজদার উদ্দেশ্যে মাথা রাখতেই তার ফরয ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সিজদা হতে মাথা উত্তোলন না করা পর্যন্ত তার নামায ফাসিদ হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকট মাথা রাখতেই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মাথা রাখা ও উঠানো উভয়ের দ্বারাই সিজদা আদায় হবে। শুধু মাথা রাখার দ্বারা নয় (মুহীত)। "আল জামিউস্ সগীর" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, ফখরুল ইসলাম (র) বলেন, ফাতওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতই অধিক পসন্দনীয় (নিহায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত ইমামদ্বয়ের মতভেদের ফলাফল হল এই যে, কোন ব্যক্তির যদি পঞ্চম রাকআতের এ সিজদায় উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এ মতে তা সংশোধনের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তা সংশোধন করা সম্ভব। অর্থাৎ সে যেয়ে উযূ করে আসবে (মুহীত)। এরপর বসে তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে (ফতহুল কাদীর)। বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার সাহ্ সিজদা করতে হবে না (নিহায়া)।

২৮. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির উপর সাহ্ সিজদা ওয়াজিব, সে যদি নামায খতম করার নিয়্যাতে সালাম ফিরায়, তবে সে এ সময়ও নামাযের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, যদি সে এ সালামের পর সাহ্ সিজদা করে। আর যদি সাহ্ সিজদা না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। এ মতটিই বিশুদ্ধতম। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং ইমাম যুফার (র)-এর মতে সাহ্ সিজদা না করলেও সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং সালামের পর কেউ যদি তার পেছনে ইকতেদা করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ ইকতেদা সর্বাবস্থায় সহীহ্ হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে সাহ্ সিজদা করলে আগন্তুকের ইকতেদা সহীহ্ হবে। অন্যথায় নয়। আর এ সময় যদি সে অট্টহাসি দেয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উযূ ভঙ্গ হবে না। অবশ্য আলিমদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার নামায পুরা হয়ে যাবে এবং সাহ্ সিজদা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি এ সময় ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে চার রাকআত ফরয আদায় করতে হবে তার এবং নামায শেষে সে সাহ্ সিজদা আদায় করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী ফরয নামায চার রাকআত আদায় করতে হবে না তার এবং সাহ্ সিজদাও তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা, সাহ্ সিজদা ওয়াজিব একথা বলার দ্বারা ঐ সিজদা অনর্থক বলে গণ্য হয় (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি দুই রাকআত নফল নামায আদায় করে এবং যদি এতে তার ভুল হয়ে যায় এবং এ ভুলের কারণে সে যদি সাহ্ সিজদা করে থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি আরো নামায পড়ার ইচ্ছা করে, তবে সে এ নামাযের উপর অন্য নামাযের বিনা করতে পারবে না (হিদায়া)। যদি বিনা করে, তবে নামায সহীহ্ হবে। কেননা, তাহরীমা এখনো বাকী আছে। অবশ্য উত্তম হল, পুনরায় সাহ্ সিজদা করা। অনুরূপভাবে কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি সাহ্ সিজদা করার পর ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে চার রাকআত আদায় করা তার উপর অপরিহার্য হবে এবং তাকে সাহ্ সিজদাও করতে হবে (তাবয়ীন)।

৩০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ঈশার নামাযে ভুল করল এবং নামাযে সে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করল কিন্তু সিজদা করল না। এমনকি এক রাকআতের একটি সিজদা সে করল না, এ অবস্থায়ই সালাম ফিরিয়ে দিল। এ মাসআলার চার অবস্থা হতে পারে। হয়ত এসব কাজ সে ভুলক্রমে করেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে অথবা তিলাওয়াতের সিজদা সে ভুলে তরক করেছে

এবং নামাযের সিজদা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করেছে অথবা নামাযের সিজদা ভুলে তরক করেছে এবং তিলাওয়াতের সিজদা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করেছে। প্রথম অবস্থায় কারো মতেই তার নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, এ সালাম ভুলে ফিরানো হয়েছে। আর ভুলক্রমে সালাম ফিরানোর কারণে মুসল্লী নামাযের তাহ্রীমা হতে খারিজ হয় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরালে মুসল্লী নামাযের তাহ্রীমা হতে খারিজ হয়ে যায়। আর চতুর্থ অবস্থায় যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ সাহ্ সিজদার মধ্যে ভুলের কারণে পুনরায় সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হয় না। কেননা, এরূপ ভুলের কারণে সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হলে সাহ্ সিজদার সিল্‌সিলা কখনো খতম হবে না (তাহযীব)। কারো যদি সাহ্ সিজদার মধ্যে ভুল হয়, তবে তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা)-এর মাধ্যমে কাজ করবে। যদি নামাযে কারো একাধিক ভুল হয়, তবে দুই সিজদাই যথেষ্ট (খুলাসা)।

৩২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে নফল নামাযের ইমামত করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কিরাআত চুপে চুপে পড়ে, তবে খারাপ কাজ করল। আর যদি ভুলে এরূপ করে, তবে সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "ইয়াতীমা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বিত্র এব তারাবীহ্ নামাযের কিরাআত অনুচ্চস্বরে পড়লে সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে (তাতারখানিয়্যা)। ইমামের নামাযে ভুল হওয়ার পর যদি তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, অতঃপর সে যদি কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে, তবে খলীফা সালামের পর সাহ্ সিজদা করবে। অবশিষ্ট নামায পুরা করতে গিয়ে যদি খলীফারও ভুল হয়, তবে দুই সিজদাই করবে। যেমন ইমামের দুই ভুলের জন্য দুই সিজদাই যথেষ্ট হয়। যদি ইমামের ভুল না হয়ে থাকে, বরং খলীফার ভুল হয়, তবে খলীফার ভুলের কারণে প্রথম ইমামের উপরও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। যদি খলীফা নিযুক্ত করার পর প্রথম ইমামের ভুল হয়ে যায়, তবে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (যখীরা)। "আসল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোন ইমাম যদি চতুর্থ রাকআতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ভুলক্রমে তাশাহ্হুদ না পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তবে সে তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে সাহ্ সিজদা করবে। অতঃপর পুনরায় তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে (মুহীত)।

সালাতের মধ্যে সন্দেহ হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ "নামায তিন রাকআত পড়েছে, না চার রাকআত" এ বিষয়ে কারো যদি সন্দেহ হয় এবং এ যদি তার প্রথম বারের ঘটনা হয়ে থাকে, তবে সে পুনরায় এ নামায আদায় করবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। পূর্বের নামায না ছেড়ে নতুনভাবে নামায আদায় করা সম্ভব নয়। পূর্বের নামায ছেড়ে দেয়া সালামের দ্বারা হতে পারে, কথাবার্তার দ্বারা হতে পারে অথবা এমন কাজের দ্বারাও হতে পারে, যা নামাযে নিষিদ্ধ। বসে সালাম ফিরিয়ে অন্য নামায আরম্ভ করা উত্তম। নতুন ভাবে নামায আরম্ভ করার জন্য শুধু নিয়্যাত করাতে কোন ফায়দা নেই। কেননা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর দ্বারা পূর্বের নামায হতে বের হওয়া যায় না (তাবয়ীন)। "জীবনে প্রথমবার এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার" মর্ম নিরূপণের ক্ষেত্রে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, এরূপ সন্দেহ হওয়া তার অভ্যাস নয়। পক্ষান্তরে এর অর্থ এ নয় যে, জীবনে কখনো তার এরূপ হয়নি। কারো কারো মতে এর অর্থ হল, এই নামাযে এটাই হল তার সর্বপ্রথম সাহ (ভুল)। মতামতদ্বয়ের প্রথমটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ নামাযে কারো যদি বেশী বেশী সন্দেহ হয়, তবে সে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের প্রবল ধারণার উপর আমল করবে (তাবয়ীন)। যদি চিন্তা-ভাবনা করার পর কোনটাই ঠিক না করা যায়, তবে কমের উপর আমল করবে। যেমন কারো সন্দেহ হল যে, সে এক রাকআত পড়েছে, না, দুই রাকআত, দুই রাকআত, না তিন রাকআত অথবা তিন রাকআত, না চার রাকআত, তবে প্রথম অবস্থায় এক রাকআত, দ্বিতীয় অবস্থায় দুই রাকআত এবং তৃতীয় অবস্থায় তিন রাকআত ধরে নিয়ে নামায পুরা করবে। উল্লেখ্য যে, কমের উপর বিনা করার ক্ষেত্রে যে সব অবস্থায় বৈঠকের স্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ঐ সব অবস্থায় বৈঠক করা আবশ্যক। চাই এ বৈঠক ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব। উদ্দেশ্য হল বৈঠক যেন না ছুটে যায়। কেননা, বৈঠক ছাড়লে ফরয কিংবা ওয়াজিব ছুটে যাবে। চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যদি সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকআত, না দ্বিতীয় রাকআত, তবে এ রাকআতকে প্রথম রাকআত ধরবে এবং এর মধ্যেই বৈঠক করবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে এক রাকআত পড়বে এবং বৈঠক করবে। এরপর দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত পড়বে এবং বৈঠক করবে। অতঃপর পুনরায় দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত পড়বে এবং বৈঠক করবে। মোট বৈঠক হবে চারটি। দু'টি অর্থাৎ তৃতীয় এবং চতুর্থ বৈঠক হবে ফরয। আর বাকী দু'টি হবে ওয়াজিব (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)। তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর সালাম ফিরানোর আগে বা পরে যদি সন্দেহ হয়, তবে এ সন্দেহ ধর্তব্য হবে না নামায পুরা হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে। (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ "নামায পড়েছে কিনা" এ মর্মে যদি কারো সন্দেহ হয় তবে ওয়াক্ত থাকলে পুনরায় নামায পড়া তার উপর ওয়াজিব হবে। আর ওয়াক্ত না থাকলে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। যদি ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় কারো সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকআত, না তৃতীয় রাকআত, তবে সে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসে পূর্বের কিয়াম বাতিল করে দিবে। অতঃপর পুনরায় দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাবে এবং তাশাহ্‌হুদের পর সাহু সিজদা করবে। যদি সিজদার মধ্যে সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকআত, না দ্বিতীয় রাকআত, তবে এ ভাবেই নামায শেষ করতে হবে। সন্দেহ চাই প্রথম সিজদায় হোক বা দ্বিতীয় সিজদায়। কেননা, এ রাকআত যদি প্রথ[ম] রাকআত হয়, তবে তো এভাবেই পড়তে থাকা ওয়াজিব। আর যদি দ্বিতীয় রাকআত হয়, তবে ত[া] পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব ।অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার প[র] দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত আদায় করবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি ফজরের নামাযের সিজদার মধ্যে সন্দেহ হয় যে, সে দুই রাকআত পড়েছে, না তিন রাকআত? তবে এ সিজদা যদি প্রথম সিজদা হয়, তবে এ নামায ঠিক করে নেয়া তার জন্য সম্ভব। কেননা সে যদি দুই রাকআত পড়ে থাকে তবে এ হচ্ছে তার দ্বিতীয় রাকআত। এ রাকআত পুরা করা তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং তার নামায জাইয হবে। আর যদি এ রাকআত তৃতীয় রাকআত হয়ে থাকে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তার নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, এ কথা যেহেতু তার প্রথম সিজদায় স্মরণ হয়েছে, তাই তার সিজদা যেন সিজদাই হয়নি। যেমন পঞ্চম রাকআতের প্রথম সিজদায় উযূ ভঙ্গ হলে "উযূই করা হয়নি" বলে মনে করা হয়। এ মাসআলাকে "মাসআলায়ে যিহ্" বলা হয়। এ সন্দেহ যদি দ্বিতীয় সিজদায় হয়ে থাকে, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি ফজরের নামাযে সন্দেহ হয় যে, এটা দ্বিতীয় রাকআত, না তৃতীয় রাকআত? এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করে সে যদি কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে আরো এক রাকআত পড়ে বসবে। আর বসা অবস্থায় থাকলে পূর্বের ন্যায় আমল করবে। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করবে। চিন্তা-ভাবনার পর যদি মনে হয় যে, এ হল দ্বিতীয় রাকআত, তবে এভাবেই নামায পুরা করবে। যদি প্রবল ধারণা এ হয় যে, এ হচ্ছে তৃতীয় রাকআত, তবে স্বীয় বৈঠক সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করবে। চিন্তা-ভাবনার দ্বারা যদি এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, দ্বিতীয় রাকআতের পর সে বৈঠক করেনি, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি চিন্তা-ভাবনার কোন দিকেই প্রবল ধারণা না হয়, তবু তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে সন্দেহ হয় যে, তা চতুর্থ রাকআত, না পঞ্চম রাকআত? তবে এ অবস্থায়ও পূর্বের হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কারো সন্দেহ হয় যে, এটা তৃতীয় রাকআত, না পঞ্চম রাকআত? তবে "ফজরের নামায সম্বন্ধে বর্ণিত মাসাইলের অনুপাতে" সে আমল করবে। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ সে বসে যাবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে এক রাকআত আদায় করে পুনরায় বসবে এবং সাহু সিজদা করবে।

৫. মাসআলা ঃ যদি বিত্‌র নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ হয় যে, এটা দ্বিতীয়, না তৃতীয় রাক'আত? তবে দু'আ কুনূত পাঠ করে এ রাকআত পুরা করবে এবং বৈঠক করবে। পরে দাঁড়িয়ে আরো এক রাকআত পড়বে এবং এতেও দু'আ কুনূত পাঠ করবে। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। স্মর্তব্য যে, সন্দেহের প্রত্যেক স্থানে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। চাই চিন্তা-ভাবনা করে সে মুতাবিক আমল করা হোক বা কর্মের উপর বিনা করা হোক, সব অবস্থাতেই উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (আল্ বাহ্‌রুর রাইক ঃ ফাতহুল কাদীর-এর সূত্রে)। নামাযে কারো সন্দেহ হল যে, সে তিন রাকআত পড়েছে, না চার রাকআত পড়েছে। অতঃপর সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করল। অবশেষে তার ইয়াকীন হল যে, সে তিন রাকআতই পড়েছে। এবার দেখতে হবে যে, তার এ চিন্তা-ভাবনা যদি নামাযের কোন রুক্ন আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে থাকে, যেমন সে নামাযও পড়ল এবং চিন্তা-ভাবনাও করল, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর যদি চিন্তা-

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাবনা এত দীর্ঘ হয় যে, এর কারণে রাকআত বা সিজদা আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অথবা উক্ত ব্যক্তি রুকূ-সিজদা আদায়ে রত ছিল এবং এদিকে সে এত দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করল যে, এর ফলে তার অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হল। এরূপ অবস্থায় ইস্তিহ্সানের হুকুমের ভিত্তিতে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। যদি কারো নামাযে এরূপ সন্দেহ হয় যে, তার উযূ ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে অথবা সে মাসেহ্ করেনি। এরপর তার সন্দেহ দূরীভূত হল এবং সে নিশ্চিত হল যে, এর কোন একটি তার অবশ্যই হয়েছে। পরক্ষণেই তার এ মর্মে ইয়াকীন হল যে, তার উযূ ভঙ্গ হয়নি অথবা সে অবশ্যই মাসেহ্ করেছে, তবে ফকীহ্ আবূ বক্র (র)-এর মতে সে যদি উযূ ভঙ্গ হওয়া এবং মাসেহ্ না করার ইয়াকীনের সাথে কোন রুকন আদায় করে থাকে, তাহলে সে পুনরায় এ নামায আদায় করবে। অন্যথায় সে ঐ নামাযই পুরা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "এক রুকন আদায় করেছে" এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যদি কারো এ মর্মে সন্দেহ হয় যে, সে প্রারম্ভিক তাকবীর বলেছে, না বলেনি অথবা তার উযূ ভঙ্গ হয়েছে, না হয়নি অথবা তার কাপড়ে নাপাকী লেগেছে, না লাগিনি অথবা সে মাথা মাসেহ্ করেছে, না করেনি। তবে এ যদি তার প্রথম বারের ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে সে এ নামায পুনরায় আদায় করবে। তা না হলে সে এ নামাযই পুরা করবে এবং নতুনভাবে উযূ করা বা কাপড় ধুয়ে নেয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ আল্-ফাতাওয়াল ইতাবিয়্যা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কারো নামাযে সন্দেহ হয় যে, সে মুসাফির, না মুকীম? তবে সে চার রাকআত পড়বে এবং সতর্কতার জন্য দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করবে (তাতারখানিয়্যা)। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা আদায় করার পর যদি ইমামের সন্দেহ হয় যে, সে এক রাকআত পড়েছে, না দুই রাকআত অথবা ইমামের যদি সন্দেহ হয় যে, এটা চতুর্থ রাকআত, না তৃতীয় রাকআত? তবে সে মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি তারা দাঁড়ায়, তবে সেও দাঁড়াবে। যদি তারা বসে, তবে সেও বসে যাবে। মুক্তাদীদের অবস্থার উপর নির্ভর করাতে কোন দোষ নেই এবং ইমামের উপর সাহু সিজদাও ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। যদি ইমামের সন্দেহ হয় এবং দু'জন বিশ্বাসযোগ্য লোক তাকে খবর দেয়, তবে সে তাদের কথা গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি একা নামায আদায় করছিল অথবা ইমাম হয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করছিল, অতঃপর যখন সে সালাম ফিরাল, তখন কোন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে বলল, "তুমি যুহরের নামায তিন রাকআত পড়েছো", এমতাবস্থায় মুসল্লীর যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, সে চার রাকআত পড়েছে, তবে সংবাদদাতার বক্তব্যের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ করবে না (মুহীত)। "যহীরিয়্যা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র) বলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদে সর্বাবস্থায় আমি আমার নামায দুহ্রিয়ে নিই (তাতারখানিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ যদি সংবাদদাতা সম্বন্ধে মুসল্লীর সন্দেহ হয় যে, সে সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? এমতাবস্থায়ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে সতর্কতার জন্য উক্ত মুসল্লী তার

নামায দুহ্রিয়ে নিবে। যদি নির্ভরযোগ্য সংবাদদাতার বক্তব্য সম্বন্ধে মুসল্লীর সন্দেহ হয়, তথাপি এ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। অবশ্য সংবাদদাতা যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে তার কথা ধর্তব্য হবে না। ইমাম এক জামাআত লোক নিয়ে নামায আদায় করার পর চলে যান। অতঃপর মুসল্লীগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এ নামায যুহরের নামায ছিল। কিন্তু অপর কেউ কেউ বলল যে, না এ নামায আসরের নামায ছিল। এমতাবস্থায় ওয়াক্ত যদি যুহরের হয়, তাহলে এ নামায যুহরের নামায বলে গণ্য হবে। আর ওয়াক্ত যদি আসরের হয়, তবে এ নামায আসরের নামায হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, কার বক্তব্য সত্য, তা সময়ের দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে। যদি ওয়াক্তের মধ্যে জটিলতা থাকে, তবে কিয়াসের ভিত্তিতে উভয় দলের নামাযই জাইয হবে (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কুরআন শরীফে তিলাওয়াতে সিজদার সংখ্যা চৌদ্দটি (হিদায়া)।

(১) সূরা আ'রাফের আখিরী আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ এর তিলাওয়াত শেষে সিজদা করা ওয়াজিব।

(২) সূরা রা'দ এ উল্লিখিত وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদা করা।

(৩) সূরা নাহল-এ উল্লিখিত وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ এর তিলাওয়াতের পর সিজদা করা।

(৪) সূরা বনী ইসরাঈল-এ উল্লিখিত اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا আয়াতদ্বয় তিলাওয়াতের পর সিজদা করা।

(৫) সূরা মারয়াম এর اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা।

(৬) সূরা হাজ্জ-এর اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ - اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা।

(৭) সূরা ফুরকান-এর وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা।

(৮) সূরা নামলের وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদা করা।

(৯) সূরা আলিফ লাম মীম সাজদাহ্-এর اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা।

(১০) সূরা সাদ-এর فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ -এর পর সিজদা করা।

(১১) সূরা হামীম সাজদাহ্-এর فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা

(১২) সূরা নাজম-এর فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা।

(১৩) সূরা ইন্‌শিকাক-এর فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা।

(১৪) সূরা আলাক এর وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করা। (আয়নী)।

(২) মাসআলা ঃ উপরোক্ত স্থানসমূহে পাঠক এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। চাই শ্রবণকারী শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুক (হিদায়া)। কেউ যদি সিজদার আয়াত শুধু ওষ্ঠ নেড়ে পড়ে, তবে এতে সিজদা ওয়াজিব না। অবশ্য যদি কেউ শুদ্ধভাবে অক্ষর উচ্চারণ করে সশব্দে তিলাওয়াত করে যার আওয়ায সে নিজে শুনতে পায় অথবা ঐ ব্যক্তিও শুনতে পায়, যে তার মুখের কাছে কান লাগিয়ে শুনার চেষ্টা করে, তবে এ অবস্থায় তার উপর তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ সিজদার আয়াত পড়ে কিন্তু শেষ অক্ষর[১] না পড়ে, তবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি শুধু ঐ অক্ষর পড়ে, যা পড়লে সিজদা দিতে হয়, তবে তার উপরও সিজদা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য কেউ যদি অধিকাংশ আয়াত সিজদার অক্ষরসহ তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। "মুখতাসারুল বাহ্‌র" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি وَاسْجُدْ পড়ে চুপ করে থাকে وَاقْتَرِبْ না পড়ে, তবে তার উপরও সিজদা ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি যদি একদল মানুষ হতে সিজদার আয়াত এভাবে শুনে থাকে যে, এক এক অক্ষর সে এক এক ব্যক্তি থেকে শ্রবণ করেছে, তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা কোন এক তিলাওয়াতকারী থেকে সে এ আয়াত শ্রবণ করেনি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি হল, যার মধ্যে নামায ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ততা আছে, চাই তা আদা হিসাবে হোক বা কাযা হিসাবে, তার মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ততাও বিদ্যমান আছে। আর যার মধ্যে নামায ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ততা নেই, তার মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ততাও বিদ্যমান নেই (খুলাসা)। সুতরাং তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি যদি কাফির হয় অথবা পাগল হয়, অথবা

১. অক্ষর অর্থে শব্দ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাবালেগ হয় অথবা হায়েযওয়ালী হয় বা নিফাসওয়ালী হয় অথবা দশ দিনের কমে হায়েয বা চল্লিশ দিনের কমে নিফাস হতে পবিত্র হয়ে তিলাওয়াত আরম্ভ করেছে, তবে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে তাদের উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে অনুরূপ শ্রবণকারীদের উপরও সিজদা ওয়াজিব হবে না (যাহিদী)। অবশ্য তাদের থেকে যদি কোন জ্ঞানবান, বালেগ মুসলমান সিজদার আয়াত শ্রবণ করে, তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ উযূহীন অথবা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে বা শ্রবণ করে, তবে তাদের উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে। অসুস্থ ব্যক্তির হুকুমও অনুরূপই। কেউ যদি কোন পাখী হতে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে, তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত। যদি নিদ্রিত ব্যক্তি হতে শুনে, তবে বিশুদ্ধ মতে সিজদা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ গম্বুজের মধ্যে বসে চীৎকার করে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং এর প্রতিশব্দ কেউ শ্রবণ করে, তবে শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)।

৪. মাসআলা ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে যদি এ মর্মে খবর দেয়া হয় যে, সে ঘুমের অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছে, তবে তার উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে। "নিসার" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতম মত (তাতারখানিয়া)। যদি মাতাল অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তিলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন মহিলা যদি নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে কিন্তু সিজদা না করে, অতঃপর যদি তার হায়েয আরম্ভ হয়ে যায়, তবে তার যিম্মা হতে সিজদা রহিত হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ যদি নফল নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে, অতঃপর নামায যদি ফাসিদ হয়ে যায়, তবে এর কাযা পড়া তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু পুনরায় সিজদা করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় মুসলমান হয়, তবে ঐ সিজদা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কুরআন শরীফ লিখার কারণে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি ফারসিতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে পাঠক এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে। চাই শ্রবণকারী তা বুঝতে সক্ষম হোক বা না হোক। উল্লেখ্য যে, শ্রবণকারীর উপর সিজদা তখনই ওয়াজিব হবে যদি তাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে শ্রবণকারী যদি বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছে, তবে তার উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে সিজদা ওয়াজিব হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত (মুহীত) ঃ সুরুখ্সী)। আরবীতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলে সর্বাবস্থায় সিজদা ওয়াজিব হবে। অবশ্য জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। বধির ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে, সে নিজে না শুনতে পেলেও তার উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে

(খুলাসা)। কেউ যদি বানান করে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না (সিরাজিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে সে নিজে সিজদা করবে এবং মুক্তাদীগণও তার সাথে সিজদা করবে। মুক্তাদীগণ চাই তার তিলাওয়াত শ্রবণ করুক বা না করুক এবং চাই ইমাম কিরাআত আস্তে পড়ুক বা জোরে পড়ুক সর্বাবস্থায়ই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য ইমামের জন্য উত্তম হল, যে সব নামাযে কিরাআত আস্তে পড়া হয় এতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত না করা। যদি ইমাম থেকে এমন কোন লোক সিজদার আয়াত শ্রবণ করে, যে ইমামের সাথে নামাযে নেই এবং পরেও নামাযে শরীক হয়নি, তবু তার সিজদা করতে হবে (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। এটাই বিশুদ্ধ মত (হিদায়া)। কোন ব্যক্তি ইমাম হতে সিজদার আয়াত শ্রবণ করার পর ইমামের সিজদা করার পূর্বে সে যদি ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়ে যায়, তবে সে ইমামের সাথে সিজদা করবে। আর সে যদি ইমামের সিজদা করার পর ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, তবে তিলাওয়াতের সিজদা তার উপর ওয়াজিব হবে না। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে ঐ রাকআতেই ইমামের সাথে শরীক হয়। কিন্তু যদি সে অন্য রাকআতে ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, তবে নামায শেষে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করবে (কাফী ও নিহায়া)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন মুক্তাদী সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে ইমাম এবং অন্য মুক্তাদীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না। নামাযের মধ্যে বা নামাযের পরে কখনই ওয়াজিব হবে না (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। নামাযরত কোন ব্যক্তি যদি নামাযের বাইরের কোন লোকের মুখে সিজদার আয়াত শুনতে পায়, তবে নামায শেষে সে সিজদা করবে। নামাযের মধ্যে সিজদা করলে এ সিজদা যথেষ্ট হবে না। অবশ্য এতে তার নামায ফাসিদও হবে না (তাহযীব)। এটাই সহীহ্ মত (খুলাসা)। এ হুকুম ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যদি নামাযী ব্যক্তি নিজে এ আয়াত প্রথমে তিলাওয়াত না করে থাকে। যদি তিলাওয়াত করে থাকে, অতঃপর নামাযের বাইরের ব্যক্তি থেকে শুনে থাকে এবং সিজদা দিয়ে থাকে, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয় বার সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। আর সে যদি প্রথমে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে, অতঃপর নিজে তিলাওয়াত করে, তবে এ অবস্থায় দুই ধরনের মতামত বর্ণিত রয়েছে। "আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ" গ্রন্থে নিশ্চিতভাবে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয়বার সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না (আন্-নাহ্রুল ফাইক)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং এ যদি সূরার মধ্যখানে হয়, তবে উত্তম হল সাথে সাথে সিজদা করা। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা খতম করে রুকূ করা। যদি কেউ সিজদা না করে রুকূ করে এবং রুকূর মধ্যে তিলাওয়াতে সিজদার নিয়্যাত করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী জাইয হবে। আমরা এ মতটিই গ্রহণ করে থাকি। যদি রুকূ-সিজদা না করে সূরা শেষ করে রুকূ করে এবং ঐ রুকূতে সিজদার নিয়্যাত করে, তবে এতে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হবে না। এ রুকূর কারণে তিলাওয়াতের সিজদা তার থেকে রহিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না। বরং যতক্ষণ সে নামাযে থাকবে এ সময়ের মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম খাহ্বরযাদাহ্ (র) বলেন, সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর যদি কেউ তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করে, তবে তৎক্ষণাৎ সিজদা করার হুকুম খতম হয়ে যায় এবং তখন আর রুকূ সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ রুকূ দ্বারা সিজদা আদায় হয় না। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, তিন আয়াতের অধিক না পড়া পর্যন্ত রুকূর দ্বারা তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করার হুকুম রহিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি সিজদার আয়াত সূরার শেষে থাকে, তবে উত্তম হল, রুকূর মাধ্যমে সিজদা আদায় করা। যদি সিজদা করে রুকূ না করে, তবে সিজদা হতে মাথা উঠানোর পর অন্য সূরা হতে কিছু অংশ পড়ে নেয়া উচিত। যদি সিজদা হতে মাথা উঠানোর পর অন্য সূরা হতে কিছু অংশ তিলাওয়াত না করে রুকূতে চলে যায়, তবে জাইয আছে। আর যদি রুকূ বা সিজদা কিছুই না করে নামায সামনের দিকে পড়তে থাকে, তবে রুকূর দ্বারা আর তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হবে না। অবশ্য নামাযে থাকা অবস্থায় তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব থাকবে। যদি সিজদার আয়াত সূরার শেষে থাকে এবং এরপর দুই বা তিন আয়াত বাকী থাকে, তবে মুসল্লী ইচ্ছা করলে রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে সিজদাও করতে পারবে। নামাযী যদি রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করতে চায়, তবে সূরা খতম করেও রুকূ করা তার জন্য জাইয আছে। আর যদি সিজদা করে, তবে পুনরায় দাঁড়িয়ে সূরা খতম করে রুকূ করবে। অবশ্য এর সাথে অন্য সূরার কিছু অংশ মিলিয়ে নেয়া উত্তম (মুযমারাত)। সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর যদি সাথে সাথে এর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে রুকূ বা সিজদা করা হয়, তবে পুনরায় দাঁড়াবে। মুস্তাহাব হল সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সাথে সাথে রুকূ না করা, বরং আরো দুই-তিন আয়াত তিলাওয়াত করে রুকূ করা (শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করতে চায়, তবে রুকূ করার সময় তিলাওয়াতের সিজদার নিয়্যাত করা জরুরী। যদি রুকূ করার সময় এর নিয়্যাত না করে, তবে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হবে না। যদি কেউ রুকূর মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদার নিয়্যাত করে, তবে এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, যথেষ্ট হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, যথেষ্ট হবে না (মুযমারাত)। অবশ্য সুস্পষ্ট মতে এতে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হবে না (শরহে আবিল মাকারিম)। বাদাই' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, রুকূ হতে মাথা উঠানোর পর সিজদার নিয়্যাত করলে ফকীহ্দের সর্বসম্মত রায় অনুসারে এতে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হবে না (আল্-বাহ্রুর রাইক) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর ইমাম যদি রুকূর অবস্থায় সিজদার নিয়্যাত করে এবং মুক্তাদীগণ নিয়্যাত না করে, তবে এতে মুক্তাদীদের সিজদা আদায় হবে না। ইমামের সালাম ফিরানোর পর পুনরায় বৈঠক করবে। বৈঠক যদি না করে, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (কিনয়া)।

১১. মাসআলা ঃ এ কথায় সকলেই একমত যে, তিলাওয়াতের সিজদার নিয়্যাত না করলেও তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের সিজদা দ্বারা আদায় হয়ে যায় (খুলাসা)। মুসল্লী যদি যথাস্থানে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করার কথা ভুলে যায়, অতঃপর রুকূ অথবা সিজদা অথবা বৈঠকের অবস্থায় যদি এর কথা স্মরণ হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সিজদা করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে এবং ইস্তিহ্সানের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী রুক্নটি সে পুনরায় আদায় করবে। অবশ্য পুনরায় আদায় না করলেও নামায জাইয হবে (যহীরিয়্যা ঃ সাহু সিজদা পরিচ্ছেদ)। ইমাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদার জন্য তাকবীর বলল, এ সময় কতিপয় মুসল্লী মসজিদের আঙ্গিনায় ছিল, তারা মনে করল যে, ইমাম হয়তো রুকূর জন্য তাকবীর বলেছে। তাই তারা রুকূতে চলে গেল। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করল, তখন তারা মনে করল যে, ইমাম হয়তো রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করেছে। তাই তারা তাকবীর বলে মাথা উত্তোলন করল। এরূপ অবস্থায় তারা যদি এর চেয়ে অধিক কিছু না করে থাকে, তবে তাদের নামায ফাসিদ হবে না।

১২. মাসআলা ঃ নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের বাইরের কোন ব্যক্তির মুখ থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে এবং তিলাওয়াতকারী সাথে সাথে সিজদা করে, তবে এ সিজদার দ্বারা সে যদি তিলাওয়াতকারীর অনুসরণ ইচ্ছা করে, তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। নামাযের বাইরে মুস্তাহাব হল তিলাওয়াতকারীর সাথে সাথে শ্রবণকারীরও সিজদা করা এবং তার আগে সিজদা হতে মাথা উত্তোলন না করা (খুলাসা)। সিজদা দেয়ার মুস্তাহাব নিয়ম হল, তিলাওয়াতকারী সম্মুখে এগিয়ে যাবে এবং শ্রবণকারিগণ তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে সিজদা করবে। ফকীহ্ আবূ বকর (র) বলেন, তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে মহিলাও পুরুষের ইমাম হতে পারবে (আল্ বাহ্রুর রাইক)। তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে تداخل (অন্তর্ভুক্ত হওয়া)-এর বিধান রয়েছে। সুতরাং তিলাওয়াতকারী যদি নিজে পড়ে এবং শুনে তবে এক সিজদাই যথেষ্ট হবে। تداخل তথা অন্তর্ভুক্তির জন্য শর্ত হল আয়াত এক হওয়া এবং মহলিসও এক হওয়া। সুতরাং মজলিস যদি একাধিক হয় এবং আয়াত এক হয় অথবা মজলিস যদি এক হয় এবং আয়াত হয় একাধিক, তবে এ অবস্থায় تداخل তথা কয়েক সিজদার ক্ষেত্রে এক সিজদা যথেষ্ট হবে না (মুহীত)। শ্রবণকারীর মজলিস যদি পরিবর্তন হয় এবং তিলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন না হয়, তবে শ্রবণকারীর উপর একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে তিলাওয়াতকারীর মজলিস যদি পরিবর্তন হয় এবং শ্রবণকারীর মজলিস পরিবর্তন না হয়, তবে অধিকাংশ মাশাইখের মতে তিলাওয়াতকারীর উপর একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে কিন্তু শ্রবণকারীর উপর একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে না। আমরা এ মতটিই গ্রহণ করে থাকি ('ইতাবিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ মজলিস দীর্ঘ হলে অথবা এক লুক্মা খেলে অথবা এক ঢোক পানি পান করলে অথবা মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে গেলে অথবা এক-দুই কদম হাঁটলে অথবা ঘরের বা মসজি-দের এক কোণ থেকে অন্য কোণে গেলে মজলিস পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ঘর বড় হলে, যেমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাজা–বাদশাহ্র ঘর, তবে মজলিস পরিবর্তন হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি জামে মসজিদের এক কোণ থেকে অন্য কোণে যায়, তবে এতে একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ জামে মসজিদে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায় তবে যতটুকু স্থানে যাওয়া অবস্থায় ইমামের পেছনে ইকতেদা সহীহ্ থাকে, ততটুকু স্থানকে একই স্থান বলে গণ্য করা হবে। নৌকার ভেতর চলাফেরা করার কারণে স্থান পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সওয়ারীর উপর আরোহণকারী ব্যক্তি যদি নামাযরত না হয়, তবে সওয়ারীর চলার কারণে মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর তাসবীহ্–তাহ্লীল বা কিরাআতে মশগুল থাকে, তবে এতে স্থান পরিবর্তন হয় না। কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে এবং সওয়ারী চলা আরম্ভ করার পূর্বে আবার নীচে অবতরণ করে, তবে এতেও স্থান পরিবর্তন হয় না। কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করে, অতঃপর দীর্ঘক্ষণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে এবং এরপর পুনরায় ঐ আয়াত পড়ে, তবে দ্বিতীয় সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি একস্থানে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে সওয়ারীর উপর আরোহণ করে, এরপর সওয়ারী চলার আগেই যদি সে পুনরায় ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহলে একই সিজদা তার উপর ওয়াজিব হবে। মাটিতে অবতরণ করে সে এ সিজদা আদায় করবে। আর যদি সওয়ারী কিছুদূর যাওয়ার পর সে পুনরায় ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর দুই সিজদা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি সওয়ারী অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, এরপর সওয়ারী এ স্থান থেকে চলার পূর্বেই সে যদি পুনরায় ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহলে তার উপর এক সিজদাই ওয়াজিব হবে। মাটিতে নেমে সে এ সিজদা আদায় করে নিবে (আলজাওহারাতুন নায়্যারা)। মজলিস পরিবর্তনের কারণে একাধিক সিজদা ওয়াজিব হয়। اعراض তথা আগে না পড়ার খিয়াল ছিল এখন আবার পড়ার খিয়াল করেছে এর দ্বারা একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে না। অতএব কেউ যদি এক মজলিসে একবার সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলে আমি এ আয়াত পুনরায় তিলাওয়াত করব না। অতঃপর সে যদি পুনরায় ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এক সিজদাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কাপড়ের তানা করায়, কোন বস্তু পা দ্বারা দলিত করায় এবং যমীন চাষ করায় একাধিকবার সিজদা করা ওয়াজিব হয় (কাফী)।

১৫. মাসআলা ঃ গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাওয়ার কারণেও বিশুদ্ধতম মতানুসারে একাধিক সিজদা ওয়াজিব হয় (মুযমারাত) কেউ যদি চলা অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে প্রত্যেক বাব তিলাওয়াতের কারণে এক এক সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি বড় নদী বা বড় খালে সাঁতার কাটা অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে যতবার তিলাওয়াত করবে, ততবার সিজদা করা ওয়াজিব হবে। সীমা নির্ধারিত এমন হাউয বা পুষ্করিণীতে যদি কেউ সাঁতার কাটে, তবে সহীহ্ মতে এ অবস্থায়ও একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে। যে ঘরে চাক্কি বসানো আছে, এ ঘরে কেউ যদি চাক্কির চতুষ্পার্শে ঘুরে ঘুরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এতেও একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে। এটাই সহীহ্ মত (খুলাসা)।

১৬. মাসআলা ঃ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর যদি কোন ব্যক্তি "আমলে কাছীর" করে, যেমন অধিক পরিমাণে খায় অথবা কোন কাজ করে, তবে ইস্তিহ্সানের ভিত্তিতে তার উপর আরেক বার সিজদা করা ওয়াজিব হবে। কেননা, এসব কাজের কারণে মজলিসের নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং ওরফ অনুসারে মজলিস পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। তাই একাধিক সিজদা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যে সিজদা নামাযে ওয়াজিব হয়েছে, তা নামাযের বাইরে আদায় করা জাইয হবে না (সিরাজিয়্যা ও কাফী)। নামাযের সিজদা তরফ করলে গুনাহ্গার হতে হবে (আল্–বাহ্রুর রাইক)। সিজদা করার পূর্বে নামায যদি ফাসিদ না হয়, তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সিজদা করার পূর্বে নামায ফাসিদ হয়ে যায়, তবে নামাযের বাইরে তা আদায় করবে। আর যদি সিজদা করার পর নামায ফাসিদ হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় বার সিজদা করতে হবে না (কিন্য়া)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি রুকূ সিজদার অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমার মতে এ অবস্থায়ও সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু রুকূ সিজদার মধ্যে তা আবার আদায়ও হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করে নেয়। অতঃপর ঐ স্থানেই সে যদি নামায আরম্ভ করে এবং ঐ আয়াতই পুনরায় তিলাওয়াত করে, তবে পুনরায় সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি প্রথমে সিজদা না করে থাকে, তবে এক সিজদাই তার উপর ওয়াজিব হবে। পূর্বের সিজদা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন রাকআতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা আদায় করে নেয়, অতঃপর ঐ রাকআতে ঐ আয়াত পুনরায় তিলাওয়াত করে, তবে দ্বিতীয় বার সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি নামাযের প্রথম রাকআতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে নেয়, অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাকআতেও যদি ঐ আয়াত পুনরায় পাঠ করে, তবে আবার সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (খুলাসা)। কেউ যদি নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে নেয়, অতঃপর সে যদি সালামের পর ঐ স্থানেই ঐ আয়াত পুনরায় তিলাওয়াত করে, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে পুনরায় সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, সালামের পর সে যদি কথা বলে থাকে, তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা না করে। এমনিভাবে সে যদি সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করে দেয়। অতঃপর সে যদি পুনরায় ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এক সিজদা তার উপর ওয়াজিব হবে। প্রথম সিজদা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ নামাযের কোন রাকআতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর কারো যদি উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর সে যদি উযূ করে ফিরে এসে ঐ আয়াতই অন্য কারো থেকে শুনতে পায়, তবে তার উপর দুই সিজদা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। নামাযে কেউ যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা নামাযের বাইরের কোন ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে এবং সাথে সাথে সিজদাও করে নেয়, অতঃপর উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি উযূ করে পূর্বের নামাযের উপর বিনা করে এবং এরপর সে যদি অন্য কারো থেকে ঐ আয়াত পুনরায় শুনতে পায়, তবে দ্বিতীয় বার সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য নামায হতে ফারিগ হওয়ার পর এ সিজদা সে আদায় করবে। কিন্তু কেউ যদি নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এরপর তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি উযূ করে পূর্বের নামাযের উপর বিনা করে এবং ঐ আয়াতই পুনরায় তিলাওয়াত করে, তবে পুনরায় সিজদা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ মুবাহ ওয়াক্তে সিজদার আয়াত পড়ে মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদা করলে তা জাইয হবে না। মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদার আয়াত পড়লে মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদা করা জাইয আছে। কেউ যদি যানবাহন হতে অবতরণ করে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, অতঃপর ভয়ের কারণে যানবাহনে সওয়ার হয় এবং সেখানে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করে, তবে ভয়ের অবস্থায় জাইয হবে। কিন্তু ভীতিহীন অস্থায় জাইয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২১. মাসআলা ঃ তাহরীমা ব্যতীত নামাযের জন্য যে শর্ত তিলাওয়াতের সিজদার জন্যও ঐ সব শর্ত রয়েছে। এর রুক্ন হল, মাথা যমীনের উপর রাখা অথবা ঐ আমল করা, যা এর স্থলাভিষিক্ত যেমন রুকূ করা, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ইশারা করা অথবা সফরের অবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহণ করা। যমীনের উপর থাকা অবস্থায় যে সিজদা ওয়াজিব হয়েছে, তা সওয়ার অবস্থায় আদায় করলে জাইয হবে না। অবশ্য সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় যে সিজদা ওয়াজিব হয়েছে, তা মাটির উপর অবতরণ অবস্থায় আদায় করা জাইয আছে। যে সব কারণে নামায ফাসিদ হয় ঐ সমস্ত কারণে সিজদাও ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ ভঙ্গ করা, কথাবার্তা বলা এবং অট্টহাসি দেয়া। তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করার সময় এ সব পাওয়া গেলে নামাযের সিজদার মত তিলাওয়াতের সিজদাও পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে অট্টহাসি দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয় না। অনুরূপভাবে তিলাওয়াতের সিজদার সময় পুরুষের সামনে মহিলা মুখোমুখি হলেও সিজদা বাতিল হবে না। এমনিভাবে তিলাওয়াতের সিজদার সময় ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে সহীহ্ মতে উযূ ভঙ্গ হয় না (আল্-বাহ্রুর রাইক)। তিলাওয়াতের সিজদার জন্য সুন্নাত হল, তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া এবং তাকবীর বলে সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করা (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এটাই পরিষ্কার কথা (তাবয়ীন)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ যদি সিজদা করার ইচ্ছা করে, তবে সে "আল্লাহু আকবর" বলবে। কিন্তু হাত উঠাবে না এবং সিজদা করবে। অতঃপর "আল্লাহু আকবর" বলে মাথা উত্তোলন করবে। এতে তাশাহ্হুদ পড়া এবং সালাম ফিরানো ওয়াজিব নয় (হিদায়া)। সিজদার মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলবে। তিনবারের কম বলবে না। যেমনিভাবে ফরয নামাযে এর থেকে কম পড়া হয় না (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফরয নামাযের সিজদার মত তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে কোন তাসবীহ্ না পড়লেও তা জাইয হবে (খুলাসা)। উচ্চ আওয়াযে তাকবীর বলবে। সিজদার মুস্তাহাব তরীকা হল, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে সিজদা করবে। অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াবে এবং এরপর বসবে (যহীরিয়্যা)। অতঃপর আবার কেউ যদি সিজদা করার ইচ্ছা করে, তবে মনে মনে নিয়্যাত করবে এবং মুখে বলবে, আমি আল্লাহকে রাযী করার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করছি "আল্লাহু আকবর" (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। "ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যার" মধ্যে উল্লেখ আছে যে, সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে সিজদা করা ওয়াজিব নয়। অতএব, কেউ যদি তিলাওয়াতের সিজদা অন্য সময় আদায় করে, তবে তা কাযা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা আদায় হিসাবেই গণ্য হবে (তাতারখানিয়্যা)। উপরোক্ত হুকুম নামাযের বাইরের জন্য প্রযোজ্য। যে সিজদা নামাযের ভেতর ওয়াজিব হয়েছে, তা আদায়ে যদি বিলম্ব করা হয় এবং সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর যদি কেউ দীর্ঘক্ষণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, এরপর সিজদা আদায় করে, তবে তা কাযা হিসাবে গণ্য হবে এবং এতে গুনাহ্গার হতে হবে (আল-বাহরুর রাইক)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি তিলাওয়াতকারীর নিকট এমন লোকজন থাকে, যারা সিজদা করার ব্যাপারে অভ্যস্ত এবং সিজদা করা তাদের জন্য ক্লেশকর নয়, তবে তিলাওয়াতকারী সিজদার আয়াত উচ্চস্বরে পড়বে। আর যদি তারা উযূহীন হয় এবং তিলাওয়াতকারী যদি একথা মনে করে যে, তারা সিজদার আয়াত শুনলেও সিজদা আদায় করবে না অথবা সিজদা আদায় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে, তবে সে অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াত করবে। তিলাওয়াতকারী চাই নামাযে হোক বা নামাযের বাইরে হোক, উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)। পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত না করা মাকরূহ্। কেউ যদি নামাযের বাইরে শুধু সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এতে মাকরূহ্ হবে না। অবশ্য মুস্তাহাব হল এর সাথে আরো দুই এক আয়াত মিলিয়ে নেয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি না মিলায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না (খুলাসা)।

সিজদায়ে শুক্র-এর মাসাইল

১. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সিজদায়ে শুকর কোন বিষয়ই নয়। এতে কোন সওয়াব নেই। বরং সিজদায়ে শুক্র হল মাকরূহ্। তাই তা বর্জন করা উত্তম। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এটা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে সওয়াব রয়েছে। তাদের মতে এর নিয়ম হল, কেউ যদি নতুন নতুন নিয়ামতপ্রাপ্ত হয় অথবা আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে সন্তান-সন্তুতি বা ধনৈশ্বর্য দান করে অথবা কেউ যদি হারানো সম্পদ প্রাপ্ত হয় অথবা কারো থেকে যদি বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়ে যায় অথবা কোন রোগী যদি রোগমুক্ত হয় অথবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারো নিরুদ্দেশ কোন আত্মীয় যদি ফিরে আসে, তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সিজদায়ে শুকর আদায় করা। এতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করবে এবং তাসবীহ্‌ পাঠ করবে। অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে, যেমনিভাবে তিলাওয়াতের সিজদার মধ্যে করা হয়ে থাকে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। হুজ্জাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, লোকদেরকে শুকরের সিজদা আদায় করা হতে বারণ করা হবে না। কেননা, এতে বিনয় প্রকাশ হয় এবং আল্লাহ্‌র দাসত্বেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এর উপরই ফাতওয়া (তাতার-খানিয়্যা)। ফরয নামাযের পর যে সব ওয়াক্তের নফল পড়া মাকরূহ্‌ ঐ ওয়াক্তে শুক্‌রের সিজদা আদায় করাও মাকরূহ্‌। অন্য সময় সিজদায়ে শুকর আদায় করা মাকরূহ্‌ নয় (কিন্‌য়া)। বিনা কারণে সিজদায়ে শুকর আদায় করা ইবাদতও নয় এবং মাকরূহ্‌ও নয়। ফরয নামাযের পর সিজদায়ে শুকর আদায় করা মাকরূহ্‌। কেননা, এরূপ করা হলে মূর্খ লোকেরা একে সুন্নাত বা ওয়াজিব বলে জ্ঞান করতে থাকবে। উল্লেখ্য যে, যে মুবাহ কাজ এ পর্যায়ের হয়, তাই মাকরূহ্‌ বলে পরিগণিত হয়। তাই ফরয নামাযের পর সিজদায়ে শুকর আদায় করা মাকরূহ্‌ (যাহিদী)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর সালাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ রুগ্ন ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয়, তবে বসে রুকূ-সিজদাসহ নামায আদায় করবে (হিদায়া)। অক্ষম হওয়ার বিশুদ্ধতম মানে হল, দাঁড়ালে ক্ষতি হয়। এর উপরই ফাতওয়া (মি'রাজুদ দিরায়া)। দাঁড়ালে যদি রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকে অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকে অথবা মাথা ঘুরে পড়ার আশংকা থাকে, তাহলে এ অবস্থাকেও অক্ষম হওয়ার মধ্যে গণ্য করা হবে (তাবয়ীন)। দাঁড়ালে যদি ব্যথা হয়, তবে একেও অক্ষমতার মধ্যে গণ্য করা হবে। দাঁড়ালে যদি সামান্য কষ্ট হয়, তবে এ কারণে বসে নামায পড়া জাইয নেই (কাফী)। কেউ যদি সামান্য সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়, পূর্ণ নামায দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হয়, তবে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অতএব, কেউ যদি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে সক্ষম হয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তে সক্ষম না হয় অথবা কেউ যদি কিরাআতের সামান্য অংশ দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয় কিন্তু পূর্ণ কিরাআত দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হয়, তবে তাকে হুকুম করা হবে যেন সে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে এবং যতক্ষণ দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তে পারে, ততক্ষণ যেন দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়ে। অতঃপর অক্ষম হলে সে যেন বসে নামায আদায় করে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এটাই সহীহ্‌ মাযহাব। এ বিধান ত্যাগ করলে তার নামায হবে না বলে আমি আশংকা বোধ করছি (খুলাসা)। কেউ যদি কোন কিছুর উপর ভর করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবে সে ভর করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। এছাড়া অন্য ভাবে নামায আদায় করলে তা জাইয হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি লাঠি বা খাদিমের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারে, তবে সে এভাবে ভর করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে (তাবয়ীন)। অসুস্থ ব্যক্তি যদি ঘরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হয় এবং বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হয়, তবে তার ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে, উত্তম হল সে ঘরেই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)।

২. মাসআলা ঃ অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে বসে নামায আদায় করবে এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধতম মত হল, সে যেভাবে বসে নামায পড়তে পারে, সেভাবে বসেই নামায আদায় করবে (আস্‌-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এটাই সহীহ্‌ মত। (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ)। কেউ যদি সোজা হয়ে বসে নামায পড়তে সক্ষম না হয়, বরং কোন কিছুর উপর ভর করে অথবা দেয়াল কিংবা মানুষের উপর হেলান দিয়ে যদি নামায পড়তে সক্ষম হয়, তবে সে কোন কিছুর উপর ভর করে বা হেলান দিয়ে নামায আদায় করবে (যখীরা)। এ অবস্থায় কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়া তার জন্য জাইয নেই (তাবয়ীন)। কেউ যদি দাঁড়িয়ে রুকূ-সিজদাসহ নামায পড়তে সক্ষম না হয় কিন্তু বসে নামায পড়তে সক্ষম হয় তবে বসে ইশারা করে নামায আদায় করবে। অবশ্য রুকূর তুলনায় সিজদার মধ্যে মাথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অতএব, কেউ যদি রুকূ সিজদায় একই সমান মাথা ঝুঁকায়, তবে তার নামায সহীহ্ হবে না (আল্-বাহরুর রাইক)। কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়, কিন্তু রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল, বসে ইশারা করে নামায আদায় করা। যদি দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামায আদায় করে, তবে আমাদের মাযহাবে তার নামায জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ ইশারা করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি ইশারা করেই সাহু সিজদা আদায় করবে (মুহীত)। ইশারায় নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য কাঠ বা বালিশ উঁচিয়ে এর উপর সিজদা করা মাকরূহ্। যদি কেউ এরূপ করে এবং রুকূর তুলনায় সিজদায় অধিক মাথা ঝুঁকায়, তবে তার নামায জাইয হবে (খুলাসা)। কিন্তু এরূপ করা খারাপ (মুযমারাত)। আর কেউ যদি রুকূ-সিজদায় মাথা না ঝুঁকায় বরং কাঠ জাতীয় কোন বস্তু কপালের সাথে লাগিয়ে নেয়, তবে তার নামায জাইয হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত। তাকিয়া বা বালিশ যদি মাটির উপর রাখা থাকে এবং এর উপর কেউ সিজদা করে, তবে তার নামায জাইয হবে (খুলাসা)। কারো কপালে যদি ক্ষত থাকে এবং এ কারণে সে যদি সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তবে ইশারা করে নামায পড়া তার জন্য জাইয নয়। বরং সে নাকের উপর সিজদা করে নামায আদায় করবে। যদি সে নাকের উপর সিজদা না করে, বরং ইশারা করে নামায পড়ে, তবে তার নামায জাইয হবে না (যখীরা)। কেউ যদি বসে নামায পড়তে সক্ষম না হয়, তবে সে কিবলার দিকে পা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারা করে রুকূ-সিজদা আদায় করবে। মাথার নীচে একটি বালিশ রেখে দেয়া ভাল। এতে কিঞ্চিত বসার মত অবস্থা হবে এবং ইশারা করে রুকূ সিজদা আদায় করা সহজ হবে। কেউ যদি কাত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে মুখ করে ইশারা করে নামায আদায় করে, তবে জাইয হবে। তবে প্রথমটি হল উত্তম (কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ ডান কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়তে না পারলে বাম কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এ অবস্থায়ও মুখমণ্ডল কিবলার দিকে থাকবে (কিনয়া)। কোন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় নামায শুরু করেছি। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়া তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সে বসে রুকূ-সিজদাসহ নামায আদায় করবে। যদি রুকূ-সিজদাসহ নামায আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বসে ইশারা করে নামায আদায় করবে। এতেও যদি কেউ সক্ষম না হয়, তবে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে (তাবয়ীন)। অসুস্থতার কারণে কেউ বসে রুকূ-সিজদাসহ নামায আদায় করছিল, এমতাবস্থায় সে যদি সুস্থ হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে উক্ত নামাযের উপর বিনা করবে। এবং বাকী নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে। নামাযের কিছু অংশ কেউ যদি ইশারা করে আদায় করে, অতঃপর উক্ত নামাযের মধ্যেই সে যদি রুকূ সিজদার উপর সক্ষম হয়, তবে সমস্ত ইমামের মতে এ নামায সে নতুনভাবে আদায় করবে (হিদায়া)। ইশারা দ্বারা রুকূ-সিজদা করার পর যদি এ শক্তি অর্জিত হয়, তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি ইশারায় রুকূ-সিজদা করার পূর্বে এ কুদরত হাসিল হয়, তবে রুকূ-সিজদাসহ এ নামাযই পুরা করবে (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৫. মাসআলা ঃ অসুস্থ ব্যক্তি যদি মাথা দ্বারা ইশারা করতেও অক্ষম হয়ে যায়, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে তার যিম্মা হতে নামাযের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যাবে। চক্ষু এবং ভ্রূ দ্বারা ইশারা করা ধর্তব্য নয়। অতঃপর রোগ কিছুটা হালকা হলে এর উপর উক্ত নামাযের কাযা ওয়াজিব হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, রোগীর অক্ষমতা যদি একদিন ও এক রাতের চেয়ে অধিক সময় পর্যন্ত থাকে, তবে কাযা ওয়াজিব হবে না। এর চেয়ে কম হলে কাযা ওয়াজিব হবে। যেমন বেহুশ অবস্থায় বিধান রয়েছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এর উপরই ফাতওয়া (যহীরিয়্যা)। উক্ত রোগী এ রোগে মারা গেলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না এবং ফিদয়া আদায় করাও তার উপর ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি বসে বসে চার রাকআত নামায আদায় করে এবং সে যদি চতুর্থ রাকআতের জন্য বসে তাশাহ্হুদ পড়ার আগে কিরাআত পড়ে ও রুকূ করে, তবে এভাবে বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার মতই। এভাবেই নামায পড়বে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "হাবী" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতঃপর সে সাহু সিজদা করবে (তাতারখানিয়্যা)। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর কেউ যদি দাঁড়ানোর নিয়্যাত করে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিরাআত পড়েনি এমতাবস্থায় তার যদি বৈঠকের কথা স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে বসে যাবে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন অসুস্থ ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করছিল। এমতাবস্থায় চতুর্থ রাকআতের আখিরী সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করার পর তার মনে হল যে, সে তৃতীয় রাকআতে আছে। অতঃপর সে পুনরায় কিরাআত পড়ল এবং ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সিজদা করল। এতে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকআতে থাকা অবস্থায় মনে করে যে, আমি দ্বিতীয় রাকআতে আছি। এ ধারণায় সে যদি কিরাআত পড়ে, অতঃপর জানতে পারে যে, সে মূলত তৃতীয় রাকআতে আছে, তবে সে বসবে না এবং তাশাহ্হুদ পড়বে না। বরং কিরাআত পড়ে নামায শেষ করবে। অবশেষে সাহু সিজদা করবে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ তাজরীদ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তিদের মতই নামাযে কিরাআত, তাসবীহ এবং তাশাহ্হুদ পড়বে। অসুস্থ ব্যক্তি যদি এগুলো পড়তে সক্ষম না হয়, তবে এসব ছেড়ে দিবে (তাতারখানিয়্যা)। অসুস্থ ব্যক্তি যে সব কাজ করতে অক্ষম ঐ বিষয়েই সুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তি যে সব কাজ করতে সক্ষম ঐ কাজে অসুস্থ ও সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং এগুলো সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় আদায় করবে। অতএব, কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি কিবলার দিক নির্ণয় করতে পারে কিন্তু কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয় এবং কিবলার দিকে ফিরানোর মত কোন মানুষ না পায়, তবে যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে সে এ অবস্থায়ই নামায আদায় করবে এবং তা পুনরায় আদায়ও করতে হবে না। আর কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেয়ার মত মানুষ যদি পাওয়া যায়, তবে তাকে ফিরিয়ে দিতে বলবে। যদি না বলে এবং কিবলামুখী না হয়ে অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করে, তবে এ নামায জাইয হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি নাপাক বিছানায় থাকে, এমতাবস্থায় পাক বিছানা পাওয়া যাক বা না যাক, যদি এমন লোক না পাওয়া যায় যে, তার বিছানা বদলিয়ে দিবে, তবে সে নাপাক বিছানায়ই নামায আদায় করবে। যদি বিছানা বদলিয়ে দেয়ার মত লোক পাওয়া যায়, তবে তাকে বদলিয়ে দিতে বলবে। যদি না বলে নাপাক বিছানায় নামায পড়ে, তবে নামায জাইয হবে না (মুহীত)। রোগীর নীচে যদি নাপাক বিছানা থাকে এবং অবস্থা যদি এমন হয় যে, বদলিয়ে দিলে সাথে সাথেই আবার নাপাক হয়ে যাবে, তবে সে ঐ বিছানায় নামায পড়বে। বিছানা বদলালে যদি রোগীর কষ্ট হয়, তবে এ অবস্থায়ও বিছানা বদলাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ রোগী যদি পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত বেহুশ অবস্থায় থাকে, তবে এ নামাযের কাযা পড়া তার উপর ওয়াজিব হবে।এর চেয়ে অধিক সময় বেহুশ থাকলে এ সময়ের নামাযের কাযা পড়তে হবে না। পাগলের হুকুমও বেহুশের মতই। এটাই বিশুদ্ধ মত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সময়ের এ আধিক্য নির্ণীত হবে নামাযের ওয়াক্তের ভিত্তিতে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেউ যদি অনবরত বেহুশ থাকে, কখনো সুস্থ হয় না, তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি কখনো সুস্থ হয়, তবে দেখতে হবে যে, এ সুস্থতার নির্ধারিত কোন সময় আছে কিনা, যদি নির্ধারিত সময় থাকে, যেমন কোন রোগীর অবস্থা এমন যে, সকালে তার রোগের প্রচণ্ডতা কিছুটা লঘু হয় এবং অল্প সময়ের জন্য সে কিছুটা সুস্থ হয়, এরপর রোগের প্রচণ্ডতা পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং সে বেহুশ হয়ে যায়। কারো অবস্থা যদি এমন হয়, তবে এ সুস্থতা ধর্তব্য হবে। অতএব, এর পূর্ববর্তী সময় যদি একদিন একরাত হতে কম হয়, তবে পূর্ব বর্ণিত বেহুশীর হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। যদি সুস্থতার কোন সময় নির্ধারিত থাকে, বরং অবস্থা যদি এমন হয় যে, রোগী কখনো হঠাৎ সুস্থ হয়ে যায় এবং সুস্থ মানুষের মত কথাবার্তা বলে, অতঃপর আবার বেহুশ হয়ে যায়, তবে এ সুস্থতা ধর্তব্য হবে না (তাবয়ীন)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন হিংস্র প্রাণী এবং মানুষের ভয়ে একদিন এবং এক রাতের অধিক সময় বেহুশ অবস্থায় থাকে, তবে ফকীহ্দের সর্বসম্মত মতানুসারে তার থেকে কাযা রহিত হয়ে যাবে। মদ্যপানের কারণে কেউ যদি একদিন এক রাতের অধিক সময় জ্ঞানহারা অস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকে, তবে এর থেকে কাযা রহিত হবে না। কেউ যদি ভাং বা ঔষধ জাতীয় কোন বস্তু সেবন করার কারণে একদিন এক রাত্রের অধিক সময় জ্ঞানহীন অবস্থায় থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে এ সময়ের নামায তার থেকে রহিত হবে না (খুলাসা)। একদিন ও এক রাতের থেকে অধিক সময় নিদ্রা অবস্থায় থাকলে এ নামাযের কাযা পড়তে হবে। কোন ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, রমযানে রোযা রাখলে সে বসে নামায পড়ে আর রোযা না রাখলে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে সে রোযা রাখবে এবং নামায বসে বসে আদায় করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ রোগের প্রচণ্ডতার কারণে হয়তো নামাযে বাধা সৃষ্টি হবে এ আশংকায় কোন রোগী যদি ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ওয়াক্ত আসার পূর্বেই নামায পড়ে নেয় তবে এ নামায

যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে কোন রোগী যদি কিরাআত অথবা উযূ ব্যতীত নামায পড়ে, তবে তার এ নামাযও জাইয হবে না। কেউ যদি কিরাআত পড়তে না পারে, তবে সে ইশারা করে কিরাআত ছাড়াই নামায আদায় করবে। রোগী যদি কারো গোলাম হয় এবং অসুস্থতার কারণে সে যদি উযূ করতে সক্ষম না হয়, তবে মনিব তাকে উযূ করিয়ে দিবে। স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়, তবে তাকে উযূ করিয়ে দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয় (মুহীত)। কোন ব্যক্তি যদি নামাযের নির্দিষ্ট কোন রুক্ন উযূহীন হওয়া ব্যতিরেকে আদায় করতে সক্ষম না হয়, তবে ঐ রুক্ন তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ শরীরে ক্ষত থাকার কারণে সিজদা করার সময় যদি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি কিয়াম-কিরাআত এবং রুকূ করতে সক্ষম হয়, তবে সে বসে ইশারা করে নামায আদায় করবে। সে যদি রুকূ করে নামায পড়ে এবং বসে ইশারা করে সিজদা করে, তবে জাইয আছে। অবশ্য প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি উত্তম (মুহীত)। কারো যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে পেশাব নির্গত হয় অথবা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা এ অবস্থায় কেউ যদি কিরাআত ভুলে যায় কিন্তু বসে নামায পড়লে উপরোক্ত কোন কিছুই তার হয় না, তবে সে বসে নামায পড়বে (সিরাজিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি কারো শত্রুর ভয় থাকে অথবা কেউ যদি এমন তাঁবুর মধ্যে থাকে, যেখানে দাঁড়ানো যায় না। অপরদিকে কাদা ও বৃষ্টির কারণে বাইরে গিয়েও নামায পড়া যায় না, তবে সে বসে নামায আদায় করবে।

১৪. মাসআলা ঃ কোন অসুস্থ ব্যক্তির নামায ছুটে গেলে সে যদি তা সুস্থ অবস্থায় কাযা করে, তবে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সে ঐ নামায আদায় করবে। যে অবস্থায় নামায ফওত হয়েছে ঐ অবস্থার ন্যায় আদায় করলে নামায সহীহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যে নামায সুস্থ অবস্থায় কাযা হয়েছে কেউ যদি তা অসুস্থ অবস্থায় আদায় করে, তবে বসে ইশারা করে যেভাবে পারে আদায় করবে (সিরাজিয়্যা)। অনন্যোপায় হয়ে রুগ্ন নামাযী যদি নিজের কাছে কোন ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে বসিয়ে রাখে যেন রুকূ সিজদায় ভুল হলে সে তাকে বলে দিতে পারে, তবে এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে পাশে বসিয়ে নামায পড়া জাইয আছে (কিন্য়া)। রোগীর জন্য মুস্তাহাব হল যুহরের নামায এমন বিলম্বে আদায় করা যেন ইমাম জুমুআর নামায হতে ফারিগ হয়ে যায়। যদি বিলম্বে আদায় না করে, তবে মাকরূহ্ হবে। এটাই সহীহ্ মত (মুযমারাত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সালাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সর্বনিম্ন সফর যার দ্বারা শরীআতের বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা হল তিন দিনের সফর (তাবয়ীন)। এটাই বিশুদ্ধতম মত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। সফরের কারণে শরীআতের বহু হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন সফরে ফরয নামায কসর পড়া ওয়াজিব। মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা জাইয, মোযার উপর তিন দিন পর্যন্ত মাসেহ্ করা জাইয, মুসাফির ব্যক্তির উপর জুমুআ, দুই ঈদের নামায এবং কুরবানী ওয়াজিব নয় এবং মাহ্‌রাম ব্যতীত কোন মহিলার জন্য সফরে বের হওয়া জাইয নেই (ইতাবিয়্যা)। সফরের ক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের চলা হল গ্রহণযোগ্য (সিরাজিয়্যা)। বছরের সবচেয়ে ছোট দিনসমূহের মধ্যে উট এবং পায়ে হেঁটে চলা এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য বিষয় (তাবয়ীন)। সফরের অবস্থায় ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা শর্ত কিনা, এ পর্যায়ে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এভাবে সারা দিন চলা শর্ত নয়। অতএব, কেউ যদি একদিন ভোর হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলে এবং মনযিলে পৌঁছে যায়। অতঃপর তথায় অবতরণ করে এবং রাত্রি যাপন করে। এরপর এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন চলে। তবে সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এ ক্ষেত্রে ফরসখ্ (তিন মাইলে এক ফরসখ)-এর হিসাব ধর্তব্য নয়।[১] এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ স্থলপথের ভ্রমণ নদীপথের ভ্রমণের মধ্যে এবং নদীপথের ভ্রমণ স্থলপথের ভ্রমণের মধ্যে ধর্তব্য হবে না। বরং প্রত্যেক স্থানের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে (আল্ জাওহারাতুন্ ন্যায়্যারা)। যে রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করবে ঐ রাস্তা হিসাবেই মুদ্দতের বিষয়টি ধর্তব্য হবে (আল্-বাহ্‌রুর রাইক)। যেমন কোন ব্যক্তি এক শহরে যাওয়ার ইরাদা করেছে। ঐ শহরে যাওয়ার দু'টি পথ রয়েছে। একটি পথ এমন যে, ঐ পথে গেলে তিন দিন তিন রাত সময় লাগে। আর অপর রাস্তায় গেলে এর চেয়ে কম সময় লাগে। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি দূরের পথ দিয়ে ভ্রমণ করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি সে নিকটের পথ দিয়ে ভ্রমণ করে, তবে পূর্ণ নামায আদায় করবে (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)। কেউ যদি এমন স্থানে থাকে যেখানে দু'টি পথ রয়েছে, একটি জলপথ এবং একটি স্থলপথ। জলপথ দিয়ে যেতে সময় লাগে তিন দিন আর স্থলপথ দিয়ে যেতে সময় লাগে দুই দিন। এমতাবস্থায় সে যদি জলপথ দিয়ে যায়, তবে নামাযে কসর করবে। আর যদি স্থলপথ দিয়ে যায়, তবে কসর পড়বে না। যদি অবস্থা এমন হয় যে, স্থলপথ দিয়ে গেলে তিন দিন লাগে আর জলপথ দিয়ে গেলে

১. মুফতীগণ একদিনে ১৬ মাইলের সফর হিসাব করে ১৬X৩=৪৮ মাইলের উপর ফতওয়া প্রদান করেছেন। অন্যথায় আজকাল তো এমন দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমায় ৩ দিন লাগে না। কাজেই বর্তমানে যানবাহনের গতি ধর্তব্য নয়, বরং দূরত্ব ধর্তব্য এবং তা হল ৪৮ মাইল। অবশ্য গমন পথের দূরত্বের বেশী-কম ধর্তব্য। যে পথে গমন, সেটাই ধরা হবে।

দু'দিন লাগে, তবে স্থলপথে ভ্রমণ করলে কসর পড়বে কিন্তু জলপথ দিয়ে ভ্রমণ করলে কসর পড়বে না।

৩. মাসআলা ঃ সমুদ্রপথের ভ্রমণের ক্ষেত্রেও বাতাস যখন দ্রুত বা ধীরগতিতে প্রবাহিত না হয়ে স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়, তখনকার তিন দিনের সফর গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে পাহাড়-পর্বতেও সেখানকার তিন দিনের স্বাভাবিক সফর গ্রহণযোগ্য। যদিও সমতল ভূমিতে ঐ পথ তিন দিনের কম সময়ে অতিবাহিত করা যায়। যদি স্বাভাবিক দূরত্ব তিন দিনের থাকে, এমতাবস্থায় কেউ যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে দ্রুত চলে দুই দিনে বা এর চেয়ে কম সময়ে ঐ স্থানে পৌঁছে যায়, তবে সে কসর পড়বে (আল-জাওয়ারাতুন্ নায়্যারা)।

৪. মাসআলা ঃ চার রাকআত বিশিষ্ট নামায মুসাফিরের উপর দুই রাকআত পড়া ফরয (হিদায়া)। কসর পড়া আমাদের নিকট ওয়াজিব (খুলাসা)। কেউ যদি নামায চার রাকআত আদায় করে এবং দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসে থাকে, তবে তার নামায জাইয হয়ে যাবে। শেষের দুই রাকআত নফল হয়ে যাবে। অবশ্য সে যেহেতু সালাম ফিরাতে বিলম্ব করেছে, তাই গুনাহ্‌গার বলে গণ্য হবে। আর সে যদি দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক না করে থাকে, তবে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে (হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে কেউ যদি প্রথম দুই রাকআতে অথবা প্রথম দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে কিরাআত না পড়ে, তবে তার নামাযও আমাদের মাযহাবে বাতিল হয়ে যাবে (তাতারখানিয়্যা)। সমস্ত মুসাফিরের উপরই কসর পড়ার হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। চাই সে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করুক বা কোন পাপ কাজের উদ্দেশ্যে সফর করুক। হুকুমের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য হবে না (মুহীত)। এমনিভাবে সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করা এবং পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করাতে কোনরূপ পার্থক্য নেই (তাহ্‌যীব)। সুন্নাত নামাযে কসর নেই (মুহীত ঃ সুরুখসী)। কোন কোন ফকীহ্ মুসাফিরের জন্য সুন্নাত নামায তরক করা জাইয হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য উত্তম মত হল, ভয়-ভীতির অবস্থায় সুন্নাত পড়বে না। কিন্তু নিরাপদ ও স্থিতিশীল অবস্থায় সুন্নাত নামায আদায় করবে (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুদূরী (র))।[১]

৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মুসাফির ব্যক্তি নিজ শহর হতে বের হতেই এবং নিজ শহরের ঘর-দরজা চোখের আড়াল হতেই নামাযে কসর আরম্ভ করবে (মুহীত)। ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যাতে বর্ণিত আছে যে, এটাই পসন্দনীয় মত এবং এর উপরই ফাতওয়া (তাতারখানিয়্যা)। অবশ্য সহীহ্ মত হল, শহরের লোকালয় অতিক্রম করলে কসর পড়তে হবে। শহরের সাথে যদি এক বা একাধিক গ্রাম মিলিত অবস্থায় থাকে, তবে ঐ গ্রাম অতিক্রম করার পর কসর পড়তে হবে। কিন্তু শহরতলির সাথে মিলিত যে গ্রাম আছে, তা অতিক্রম করার পূর্বে কসর পড়া জাইয আছে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যখন সফর হতে নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন

১. সঠিক মত হল যানবাহনে চলন্ত অবস্থায় বা কোন স্টেশনে নামলে সুন্নাত পড়বে না-গন্তব্যস্থলে যেমন কেউ চিটাগাং হতে ঢাকা আসলো ৫ দিনের জন্য, তখন সুন্নাত পড়া উত্তম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লোকালয়ে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসর পড়তে থাকবে। নিজ এলাকা হতে বের না হয়ে শুধু নিয়্যাত করাতেই কেউ মুসাফির হবে না। কিন্তু শুধু নিয়্যাত দ্বারা মুসাফির মুকীম হয়ে যায় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যে দিক দিয়ে এলাকা হতে বের হবে ঐ দিক অতিক্রম করাই ধর্তব্য হবে। অতএব কেউ যদি এক প্রান্ত দিয়ে শহর অতিক্রম করে এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে শহরের কিছু ঘর-বাড়ী তার সামনে থেকে যায় এ অবস্থায়ও সে কসর পড়বে (তাবয়ীন)। মুসাফির যে প্রান্ত দিয়ে শহর অতিক্রম করেছে ঐ প্রান্তে যদি এমন কোন মহল্লা থাকে, যা পূর্বে শহরের সাথে মিলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে শহর হতে সামান্য বিচ্ছিন্ন, তবে ঐ মহল্লা অতিক্রম না করা পর্যন্ত মুসাফির কসর পড়বে না (খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ তিন মনযিল সফরের নিয়্যাত করলেই মুসাফির ব্যক্তি রুখসতের হুকুমের মধ্যে শামিল হবে। ঐ পরিমাণ সফরের নিয়্যাত না করে যদি কেউ দুনিয়া ঘুরে আসে, তবু সে মুসাফিরের জন্য নির্ধারিত রুখ্সতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি পলায়নকারী গোলাম বা ঋণগ্রহীতা কোন ব্যক্তিকে ধরার জন্য বহুদূর পর্যন্ত সফর করল, কিন্তু তার কোন নিয়্যাত ছিল না। এমতাবস্থায় সে রুখ্সতের হুকুমের মধ্যে শামিল হবে না। নিয়্যাতের ক্ষেত্রে শুধু ধারণাই যথেষ্ট। দৃঢ় বিশ্বাস শর্ত নয়। অতএব, কারো যদি প্রবল ধারণা এরূপ হয় যে, সে তিন দিনের জন্য সফর করবে, তবে সে কসর পড়বে (তাবয়ীন)। যে ব্যক্তি সফরের নিয়্যাত করবে, তার মধ্যে নিয়্যাতের উপযুক্ততা থাকা আবশ্যক। সুতরাং কোন বালক এবং খৃষ্টান ব্যক্তি যদি সফরে বের হয় এবং দুই দিন চলার পর বালক যদি বালিগ হয়ে যায় এবং খৃষ্টান যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে বালক পূর্ণ নামায পড়বে এবং খৃষ্টান (যে মুসলমান হয়েছে) কসর পড়বে (যাহিদী)।

৯. মাসআলা ঃ মুসাফির ব্যক্তি যত দিন পর্যন্ত কোন শহরে বা গ্রামে পনের (১৫) বা ততোধিক দিন অবস্থানের নিয়্যাত না করবে, ততদিন পর্যন্ত কসর পড়তে থাকবে (হিদায়া)। তিন দিন সফর করার পর উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি তিন দিন সফর না করে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করে নেয় অথবা ইকামতের নিয়্যাত করে নেয়, তবে সে ময়দানে হলেও মুকীম হয়ে যাবে।

১০. মাসআলা ঃ পাঁচ শর্ত সাপেক্ষে ইকামতের নিয়্যাত কার্যকরী হবে ঃ

(১) চলাফেরা বন্ধ করে দেয়া। ইকামতের নিয়্যাত করে চলতে থাকলে ইকামাতের নিয়্যাত শুদ্ধ হবে না।

(২) যে স্থানে অবস্থানের নিয়্যাত করা হচ্ছে ঐ স্থান অবস্থানের উপযুক্ত হওয়া। অতএব কেউ যদি ময়দান, সাগর অথবা দ্বীপে অবস্থানের নিয়্যাত করে, তবে তার নিয়্যাত সহীহ হবে না।

(৩) একই স্থানে অবস্থানের নিয়্যাত করা।

(৪) একাধারে পনের দিন অথবা এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থানের নিয়্যাত করা।

(৫) ইকামতকারী ব্যক্তি স্থিরমতি হওয়া (মিরাজুদ দিরায়া)।

১১. মাসআলা ঃ শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) বলেন, মুসলিম বাহিনী যদি কোন স্থানে

যাওয়ার ইচ্ছা করে এবং তাদের সাথে যদি শামিয়ানা এবং ছোট-বড় তাঁবু থাকে এবং তারা যদি পথে কোন ময়দানে নেমে তাঁবু স্থাপন করে এবং তথায় পনের দিন থাকার নিয়্যাত করে, তবে তারা মুকীম হবে না। কেননা,, এগুলো তো সাথে নিয়ে চলবার বস্তু। বাসস্থান নয় (মুহীত)। যাযাবর লোক, যারা তাঁবু ইত্যাদিতে থাকে, তারা যদি ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে এতে তারা মুকীম হবে কিনা এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে দু'টি মতামত বিবৃত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী তারা মুকীম হবে না। আর অপর রিওয়ায়েত অনুসারে তারা মুকীম হবে। এর উপরই ফাতওয়া (গিয়াছিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি পনের দিনের কম সময় কোথাও অবস্থানের নিয়্যাত করে, তবে সে কসর পড়বে (হিদায়া)। কেউ যদি কোন শহরে এই নিয়্যাতে এক বছর অবস্থান করে যে, কাজ সমাধা হতেই সে বাড়ীতে চলে যাবে এবং পনের দিন অবস্থানের নিয়্যাত না করে, তবে সে কসর পড়বে (তাহ্যীব)। হজ্জযাত্রী লোক যদি বাগদাদে পৌছে সেখানে অবস্থানের নিয়্যাত না করে বরং শুধু মনে মনে এরূপ সংকল্প করে যে, কাফেলা ছাড়া তারা রওনা করবে না। যখন কাফেলা যাবে, তখন তারাও যাবে। কিন্তু তাদের জানা আছে যে, কাফেলা আজ হতে পনের দিনের মধ্যে বা এর থেকেও কিছু দিন পর আসবে, তবে তারা নামায পূর্ণ চার রাকআত আদায় করবে। কসর পড়বে না।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই স্থানে পনের দিন অবস্থান করার নিয়্যাত করে এবং এ দুটো স্থানের প্রত্যেকটি যদি পৃথক পৃথক জায়গা হয় যেমন মক্কা, মিনা, কূফা এবং হীরা, তবে এতে সে মুকীম হবে না। যদি এক স্থান অন্য স্থানের অধীন হয়, এমনকি সেখানকার লোকদের জুমুআও ওয়াজিব হয় না, তবে সে মুকীম হবে। কেউ যদি দুই গ্রামে পনের দিন অবস্থান করার জন্য এমনভাবে নিয়্যাত করে যে, দিনে এক গ্রামে অবস্থান করবে এবং রাতে অবস্থান করবে অন্য গ্রামে, তবে রাতে যে গ্রামে অবস্থান করার সে নিয়্যাত করেছে ঐ গ্রামে ঢুকার সাথে সাথেই মুকীম হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কিন্তু যে গ্রামে দিনে অবস্থান করার নিয়্যাত করেছে ঐ গ্রামে প্রথম প্রবেশ করার পর সে মুকীম হবে না (খুলাসা)।

১৪. মাসআলা ঃ "কিতাবুল মানাসিক"-এ বর্ণিত আছে যে, হজ্জে গমনকারী ব্যক্তি যদি যিলহাজ্জের প্রথম দশকে মক্কায় প্রবেশ করে এবং তথায় অর্ধমাস অবস্থান করার নিয়্যাত করে, তবে তার এ নিয়্যাত সহীহ্ হবে না। কেননা,, এ সময় আরাফা গমন করা তার উপর অপরিহার্য। অতএব, শর্ত পুরা হচ্ছে না। তাই এ নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণিত আছে যে, উক্ত মাসআলাকে কেন্দ্র করেই প্রখ্যাত ফকীহ্ ঈসা ইব্ন আবান (র) ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। ঘটনাটি হল, ঈসা ইব্ন আবান (র) সর্বদা হাদীছ নিয়েই চর্চা ও গবেষণা করতেন। এক সময় তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানকার ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'আমি আমার জনৈক বন্ধুর সাথে যিলহাজ্জের প্রথম দশকে মক্কা শরীফ যাই। সেখানে যেয়ে আমি তথায় এক মাস অবস্থানের সংকল্প করি এবং নামায পুরা আদায় করতে থাকি। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জনৈক ছাত্রের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বললেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি ভুল করছেন। কেননা, আপনাকে মিনা ও আরাফায় যেতে হবে। কেমন করে আপনি চার রাকআত পুরা আদায় করছেন?) মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের পর আমার সাথী সফরের ইচ্ছা করলে আমি তার সাথে সফরের ইচ্ছা করলাম এবং নামায কসর পড়তে আরম্ভ করলাম। এ অবস্থা দেখে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্ত ছাত্র আমাকে পুনরায় বললেন, আপনি এবারও ভুল করেছেন। আপনি তো মক্কায় মুকীম আছেন। এখান থেকে যতদিন পর্যন্ত প্রস্থান না করবেন মুসাফির হিসাবে গণ্য হবেন না।[১] তখন আমি বললাম, এক মাসআলার মধ্যেই দু'টি ভুল করে ফেললাম। এরপরই আমি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মজলিসে যাই এবং ফিকাহ্ চর্চায় মনোনিবেশ করি (আল্‌বাহ্‌রুর রাইক)।

১৫. মাসআলা ঃ একদল মুসলিম যদি দারুল হরবের কোন শহর অবরোধ করে রাখে অথবা রাষ্ট্রদ্রোহী লোকদেরকে দারুল ইসলামের এমন জায়গায় অবরোধ করে রাখে, যেখানে কোন শহর নেই এবং তারা যদি উক্ত স্থানে পনের দিন অবস্থান করার নিয়্যাত করে, তথাপি তারা কসর পড়বে। কেননা, তাদের অবস্থা দোটানায় দোদুল্যমান। থাকতেও পারে এবং পলায়নও করতে পারে। সুতরাং গৃহে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাদের নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য নয় (তামারতাশী (র))। এ কারণেই আমাদের ইমামগণ বলেছেন, ব্যবসায়ী যদি নিজস্ব প্রয়োজনে কোন শহরে প্রবেশ করে এবং স্বীয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তথায় পনের দিন অবস্থান করার নিয়্যাত করে, তথাপি সে মুকীম হবে না। কেননা, তার অবস্থাও দোটানায় দোদুল্যমান। কাজ হলে চলে আসবে, আর না হলে আরো অবস্থান করবে। কাজেই তার নিয়্যাত মযবূত নয় এবং এ নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য নয়। যে বলে, কেউ যদি নিকটবর্তী স্থানের সফর করে সফরের রুখসত হাসিল করতে চায়, তবে তার জন্য উচিত, দূরবর্তী স্থানের নিয়্যাত করা", তার এ বক্তব্যের ভ্রান্তির ব্যাপারে উক্ত মাসআলাটি একটি মযবূত দলীল (আল্ বাহ্‌রুর রাইক ঃ মি'রাজুদ দিরায়ার সূত্রে)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং অবস্থানযোগ্য স্থানে অবস্থানের নিয়্যাত করে, তবে তার নিয়্যাত সহীহ হবে (খুলাসা)। কোন হরবী যদি দারুল হরবে মুসলমান হয় এবং হরবীরা (কাফিররা) যদি তার ইসলাম গ্রহণের কথা জেনে ফেলে এবং তাকে হত্যা করার জন্য তালাশ করে, তখন সে যদি তাদের ভয়ে তিন দিনের সফরের নিয়্যাত করে ভেগে চলে যায়, তবে সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সে কোন স্থানে একমাস বা তদপেক্ষা বেশী সময় পালিয়ে থাকে। কেননা, এখন সে তাদের সাথে বিবাদকারী হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে কোন مستامن (আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যদি আমান নিয়ে দারুল হরবে যায় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। অতঃপর হরবীরা যদি তাকে হত্যা করার জন্য তালাশ করে, তবে সেও মুসাফির গণ্য হবে। দারুল হরবের কোন ব্যক্তি যদি দারুল হরবের কোন শহরে অবস্থান করে, অতঃপর তারা তাকে হত্যা করার জন্য তালাশ করলে সে ঐ শহরের কোন স্থানে যদি আত্মগোপন

১. যেহেতু ইনি এক মাস মক্কা শরীফে অবস্থানের নিয়্যাত করেছিলেন। মিনা হতে যিলহাজ্জ মাসের ১৩ তারিখে প্রত্যাবর্তনের পরও ১৫ দিন বা তদূর্ধ্ব দিন থেকে গেছে, সেহেতু তিনি তাঁর নিয়্যাতের কারণে মুকীম হয়ে গেছেন।

হয়ে যায়, তবে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে। কেননা, সে ঐ শহর হতে বের না হওয়া পর্যন্ত মুকীম ছিল।

১৭. মাসআলা ঃ দারুল হরবের কোন শহরের লোক যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং হরবীরা যদি তাদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়, এমতাবস্থায় যারা মুসলমান হয়েছে তারা যদি ঐ শহরেই অবস্থান করে, তবে তারা পূর্ণ নামায আদায় করবে। যদি হরবীরা মুসলমানদের উপর জয়লাভ করে এবং মুসলমান দল সামনে এক দিনের পথ অর্থাৎ এক মনযিল যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবু তারা পূর্ণ নামায আদায় করবে। আর যদি তিন দিনের নিয়্যাত করে তারা সফরে বের হয়, তবে কসর পড়বে। তারা যদি নিজেদের শহরে পুনরায় ফিরে আসে এবং মুশরিকগণ সেখানে না থাকে, তবে পূর্ণ নামায আদায় করবে। যদি মুশরিকগণ মুসলমানদের শহর জয় করে নেয় এবং সেখানে মুকীম থাকে এ অবস্থায় তারা যদি পুনরায় নিজেদের শহরে আসে এবং মুশরিকগণ তাদের জন্য শহর খালি করে দেয় এবং তারা যদি ঘর দরজা তৈরী করে ঐ শহরে বসবাস আরম্ভ করে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার ইরাদা না করে, তবে এ শহর দারুল ইসলাম হিসাবে গণ্য হবে। এখানে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। যদি তারা সেখানে ঘর বানানোর ইচ্ছা না করে, বরং সেখানে একমাস অবস্থান করে দারুল ইসলামে চলে আসার ইচ্ছা করে, তবে নামায কসর করবে (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ দারুল হরবে কোন মুসলমান বন্দী হওয়ার পর সে যদি সেখান থেকে পালিয়ে গুহায় বা অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তথায় পনের দিন থাকার ইরাদা করে, তবে সে মুকীম হবে না (খুলাসা)। "তাজনীস" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মুসলমান সৈন্য যদি দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর দখল করে নেয় এবং তথায় তারা ঘর-বাড়ী বানিয়ে নেয়, তবে পুরা নামায আদায় করবে। যদি ঘর-বাড়ী না বানায়, কিন্তু এক মাস বা এর চেয়ে বেশী সময় তথায় অবস্থান করার নিয়্যাত করে, তাহলে কসর পড়বে (আল্-বাহ্‌রুর রাইক)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি এমন কোন ব্যক্তির অধীনস্থ হয়, যার আনুগত্য তার জন্য আবশ্যক, তাহলে সে উক্ত ব্যক্তির ইকামতের কারণে মুকীম হিসাবে গণ্য হবে এবং তার সফরে বের হওয়ার নিয়্যাত ও সফরে বের হওয়ার কারণে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। অতএব, আমীর যদি শহরে ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে সেনাদল ময়দানে মুকীম বলে গণ্য হবে (কাফী ঃ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ)। এ বিষয়ে মূলনীতি হল, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা মতে ইকামত করতে সক্ষম, সে তার নিজের নিয়্যাতের ভিত্তিতে মুকীম হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা মতে ইকামত করতে সক্ষম নয়, সে তার নিজের নিয়্যাতের ভিত্তিতে মুকীম হবে না। সুতরাং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে, গোলাম তার মনিবের সাথে, ছাত্র তার উস্তাদের সাথে, কর্মচারী তার মালিকের সাথে এবং সৈন্য তার সেনাপতির সাথে সফর করলে যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে তারা তাদের নিজেদের নিয়্যাতের দ্বারা মুকীম হতে পারবে না (মুহীত)। স্বামী স্ত্রীর নগদ মহর পরিশোধ করে থাকলে স্ত্রী স্বামীর অধীন বলে গণ্য হবে। আর যদি মহর না আদায় করে থাকে, তবে সহবাস না করা পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর অধীন বলে গণ্য হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেনাপতি যদি সৈন্যদের আহারের ব্যবস্থা করে, তবেই সেনাদল সেনাপতির অধীন বলে বিবেচিত হবে (তাবয়ীন)। সৈন্যরা নিজের খরচে খানা খেলে তাদের নিয়্যাতই গ্রহণযোগ্য হবে (যহীরিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ঋণের দায়ে বন্দী হয় এবং ঋণ গ্রহীতার যিম্মায় থাকে, তবে দেখতে হবে যে, সে ঋণ আদায়ে সক্ষম না অক্ষম। অক্ষম হলে ঋণদাতা পাওনাদার ব্যক্তির নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ঋণ আদায় করতে সে সক্ষম হয়, তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিয়্যাতই গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য সক্ষম ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ না করার সংকল্প করে নেয়,[১] তবে তার হুকুমও অক্ষম ব্যক্তির অনুরূপ হবে (মুযমারাত)। কোন গোলামের দুই মালিক যদি সফরে উপস্থিত থাকে এবং তাদের একজন যদি ইকামতের নিয়্যাত করে এবং অন্যজন যদি না করে এবং প্রত্যেকের খিদমতের সময় নির্ধারিত থাকে, তবে গোলাম মুকীম মনিবের খিদমতে থাকাকালে পূর্ণ নামায পড়বে এবং মুসাফির মনিবের খিদমতে থাকাকালে কসর পড়বে। আর যদি খিদমতের সময় নির্ধারিত না থাকে, তবে আসল হিসাবে চার রাকআত আদায় করবে। অবশ্য সতর্কতা হিসাবে দুই রাকআত পর বৈঠক করবে (গিয়াছিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ অধীনস্থ ব্যক্তি যদি কর্তা ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে, তবে কারো কারো মতে সে মুকীম হিসাবে গণ্য হবে এবং কারো কারো মতে সে মুকীম হিসাবে গণ্য হবে না। শেষোক্ত মতটিই হচ্ছে বিশুদ্ধতম। কেননা, কোন কিছু সম্বন্ধে জানার পূর্বে তা কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হলে এতে তার কষ্ট এবং ক্ষতি হবে। অথচ এরূপ করা আদৌ শরীআত সমর্থিত নয়। গোলাম মনিবের সাথে কোথাও গেলে "মনিব সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে কিনা" এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিত। সে যদি অস্বীকার করে, তবে গোলাম চার রাকআত পুরা আদায় করবে। গোলাম যদি কয়েকদিন পর্যন্ত প্রথম বৈঠক না করে চার রাকআত নামায পুরা আদায় করে অতঃপর মনিব যদি তাকে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, সে সফরের উদ্দেশ্যেই বাড়ী হতে বের হয়েছে, তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী এ নামায পুনরায় আবার আদায় করতে হবে না। এর কারণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ গোলাম যদি নিজের মনিবের ইমামত করে এবং ঐ জামাআতে তার সাথে যদি আরো মুসাফির থাকে এবং এক রাকআত পর মনিব যদি ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে নিজের ব্যাপারে ও গোলামের ব্যাপারে তার নিয়্যাত সহীহ্ হবে। কিন্তু জামাআতের অন্যদের ব্যাপারে এ নিয়্যাত কার্যকরী হবে না। অতএব গোলাম দুই রাকআত আদায় করার পর মুসাফিরদের থেকে কাউকে সালাম ফিরানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দিবে। অতঃপর মনিব ও গোলাম দাড়িয়ে প্রত্যেকেই চার রাকআত করে আদায় করবে। মনিব যে ইকামতের নিয়্যাত করেছে, তা কিভাবে সে গোলামকে জানাবে এ বিষয়ে ফকীহ্দের কেউ কেউ বলেন, মনিব গোলামের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে দুই আঙ্গুল খাড়া করে ইশারা করবে। অতঃপর চার আঙ্গুল খাড়া করে এর দ্বারা ইশারা করবে (মুহীত)।

১. এর অর্থ এ নয় যে, কাউকে ঋণ পরিশোধ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা পক্ষে অনুমতি দেয়া হচ্ছে। ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য, না করলে মহাপাপ হবে, তার পরেও যদি কেউ পরিশোধ না করার সংকল্প করে, তবে সে অবস্থায় সে সালাত আদায় ও অন্যান্য ইবাদতে মুকীম নয়, মুসাফির বলে গণ্য হবে। আইনের সেই চুলচেরা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

২৩. মাসআলা ঃ ওয়াক্তের ভিতর নামায আদায় করার সময় কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে। চাই সে একাকী নামায পড়ুক বা ইমামের পেছনে নামায পড়ুক বা মাসবূক হোক অথবা মুদরিক হোক, সর্বাবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। মুসল্লী যদি লাহিক হয় এবং ইমাম নামায শেষ করার পর সে যদি ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে পূর্ণ নামায আদায় করবে না। কিন্তু ইমাম নামায শেষ করার পূর্বে লাহিক মুসল্লী যদি ইকামতের নিয়্যাত করে এবং ইকামতের নিয়্যাতের পর সে যদি কথাবার্তা বলে এবং নামাযের ওয়াক্তও বাকী থাকে, তবে পূর্ণ চার রাকআত নামায আদায় করবে। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবে দুই রাকআত আদায় করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। নামায আদায়রত অবস্থায় যদি ওয়াক্ত খতম হয়ে যায় এবং এরপর কেউ যদি ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে এ নামাযে তার চার রাকআত ফরয আদায় করতে হবে না (খুলাসা)। মুসাফির ব্যক্তি যদি সালাম ফিরানোর পর ইকামতের নিয়্যাত করে এবং তার যিম্মায় যদি সাহু সিজদাও ওয়াজিব থাকে, তথাপি এ নামাযে তার নিয়্যাত সহীহ্ বলে গণ্য হবে না। কেননা, সে ইকামতের নিয়্যাত করেছে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর। তাই এ নিয়্যাত গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সাহু সিজদা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা, সে যদি সাহু সিজদা আদায় করে, তবে তার ইকামতের নিয়্যাত সহীহ্ হয়ে যাবে এবং তাকে ফরয নামায চার রাকআত আদায় করতে হবে। কিন্তু সাহু সিজদা নামাযের মধ্যে আদায় করার কারণে তার পুরা নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। যদি সাহু সিজদা আদায় করার পর ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে নিয়্যাত সহীহ্ হবে এবং নামায চার রাকআত আদায় করতে হবে। চাই সিজদা একটি করুক বা দুইটি করুক অথবা সিজদার মধ্যে ইকামতের নিয়্যাত করুক। কেননা, সাহু সিজদা করার পর উক্ত ব্যক্তি নামাযের তাহ্রীমায় পুনরায় ফিরে আসল। সুতরাং এ অবস্থায় নামায চার রাকআত আদায় করতে হবে যেমন সিজদার মধ্যে ইকামতের নিয়্যাত চার রাকআত আদায় করতে হয়।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি নামাযের আউয়াল ওয়াক্তে মুসাফির থাকে এবং নামাযে কসর করে, অতঃপর ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় সে যদি ইকামতের নিয়্যাত করে নেয়, তবে তার ফরয পরিবর্তিত হবে না। অর্থাৎ ওয়াক্তের ভেতর পুনরায় চার রাকআত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। আর যদি নামায না পড়ে থাকে এবং শেষ ওয়াক্তে ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে তার ফরয পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফরয নামায চার রাকআত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদিও ওয়াক্তের মধ্যে এ পরিমাণ সময় না থাকে, যার মধ্যে চার রাকআত নামায আদায় করা যায়। কেউ যদি ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে সে সফরের নামায কাযা করবে। অর্থাৎ দুই রাকআত কাযা পড়বে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি যুহরের নামায আদায় করে যুহরের ওয়াক্তেই সফর আরম্ভ করে, অতঃপর ওয়াক্ত মত আসরের নামায আদায় করে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সফর বন্ধ করে। এরপর তার যদি স্মরণ হয় যে, সে যুহর এবং আসরের নামায বিনা উযূতে আদায় করেছে, তবে সে উযূ করে যুহরের নামায দুই রাকআত এবং আসরের নামায চার রাকআত আদায় করবে। কেউ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি মুকীম অবস্থায় যুহর ও আসরের নামায আদায় করে সূর্যাস্তের পূর্বে সফর আরম্ভ করে, অতঃপর তার যদি এ কথা স্মরণ হয় যে, সে বিনা উযূতে নামায পড়েছে, তবে সে উযূ করার পর যুহর চার রাকআত এবং আসর দুই রাকআত আদায় করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২৬. মাসআলা ঃ কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি মুসাফির কওমের ইমামত করে এবং নামাযে যদি তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, অতঃপর সে যদি অন্য কোন মুসাফির ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করে এবং এ দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি নামাযে ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে পেছনের মুক্তাদীদের ফরয পরিবর্তিত হবে না। অর্থাৎ নামায চার রাকআত আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে না। মুসাফির ইমামের উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বে সে যদি ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে ইমাম ও মুক্তাদী সকলের উপরই চার রাকআত আদায় করা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি অন্য কোন মুসাফিরের পেছনে ইকতেদা করে, অতঃপর ইমামের উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর ইমাম যদি কোন মুকীম ব্যক্তিকে খলীফা নিয়োগ করে, তবে মুসাফির ব্যক্তির উপর পূর্ণ নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২৭. মাসআলা ঃ মুসাফির মুকীমের পেছনে ইকতেদা করলে মুসাফিরও পূর্ণ চার রাকআত আদায় করবে। আর যদি মুসাফির স্বীয় নামায ফাসিদ করে দেয়, তবে দুই রাকআত আদায় করবে। কিন্তু মুসাফির ব্যক্তি নফলের নিয়্যাতে মুকীমের পেছনে ইকতেদা করার পর সে যদি তার নামায ফাসিদ করে দেয়, তাহলে চার রাকআত আদায় করাই তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)।

২৮. মাসআলা ঃ কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম লোকদের ইমামত করে, তবে ইমাম দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং মুক্তাদীগণ পরে নিজেদের নামায পুরা করবে (হিদায়া)। অবশিষ্ট নামায আদায়কালে মুক্তাদীগণ মাসবূক মুসল্লীর ন্যায় একা নামায আদায়কারী হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ সময় তারা কিরাআত পড়বে না (তাবয়ীন)। মুসাফির ইমামের জন্য মুস্তাহাব হল মুক্তাদীদেরকে এ কথা বলে দেয়া যে, "তোমরা তোমাদের নামায পুরা কর। আমি মুসাফির ব্যক্তি (হিদায়া)।

২৯. মাসআলা ঃ খলীফা (বাদশাহ) সফরে বের হলে সেও মুসাফিরদের ন্যায় কসর পড়বে (যখীরা)। জুমুআর দ্বিপ্রহরের আগে ও পরে সফরে বের হওয়া মাকরূহ্ নয়। সফরকারী যদি এ কথা জানে যে, সে জুমুআর ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর নিজ শহর হতে বের হবে, তবে জুমুআর নামাযে হাযির হওয়া তার জন্য অপরিহার্য। এ অবস্থায় জুমুআ না পড়ে সফরে বের হওয়া তার জন্য মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। মাহ্রাম ব্যতীত তিন দিন বা এর চেয়ে বেশী সময়ের জন্য সফরে বের হওয়া মহিলাদের জন্য জাইয নেই। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তি মাহ্রাম হতে পারবে না। বুদ্ধির বিভ্রম ঘটেনি এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি মাহ্রাম হতে পারবে (মুহীত ঃ কিতাবুল ইস্তিহ্সান ওয়াল কারাহাত)। মুসাফির ব্যক্তি নিজ শহরে প্রবেশ করলে নিয়্যাত ছাড়াই সে মুকীম হয়ে যাবে এবং পুরা নামায আদায় করবে। চাই সে তথায় নিজের ইচ্ছায় আসুক বা কোন প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আসুক (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা)।

৩০. মাসআলা ঃ ফকীহ্দের মতে ওয়াতান (ঠিকানা) তিন প্রকার। (এক) ওয়াতানে আসলী (وطن اصلى) অর্থাৎ নিজের জন্মভূমি বা ঐ স্থান যেখানে নিজের সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজন আছে। (দুই) ওয়াতানে সফর (وطن سفر) অর্থাৎ সফর বা ভ্রমণভূমি। একে ওয়াতানে ইকামতও বলা হয়। ওয়াতানে ইকামত ঐ স্থানকে বলা হয়, যেখানে মুসাফির ব্যক্তি পনের দিন বা এর চেয়ে অধিক সময় অবস্থান করার নিয়্যাত করে। (তিন) ওয়াতানে সুক্না (وطن سكن) অর্থাৎ এমন স্থান, যেখানে মুসাফির ব্যক্তি পনের দিনের কম অবস্থান করার নিয়্যাত করে। মুহাক্কিক ফকীহ্দের মতে প্রকৃত ওয়াতান (ঠিকানা) দুই প্রকার। এক. ওয়াতানে আসলী, দুই. ওয়াতানে ইকামত। তাদের মতে ওয়াতানে সুক্না মূলত কোন ওয়াতান নয়। এটাই সহীহ্ মত (কিফায়া)।

৩১. মাসআলা ঃ ওয়াতানে আসলী ওয়াতানে আসলী দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কারো যদি দু'টি ওয়াতান থাকে এবং সে যদি সপরিবারে এক ওয়াতান থেকে অন্য ওয়াতানে চলে যায়, তবে প্রথম ওয়াতানের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সপরিবারে না যায় বরং অন্য শহরে আরেকটি বিয়ে করে, তবে এতে পূর্বের ওয়াতান বাতিল হবে না। উক্ত ব্যক্তি উভয় স্থানে পূর্ণ নামায আদায় করবে। ওয়াতানে আসলী সফর এবং ওয়াতানে ইকামত দ্বারা বাতিল হয় না। অবশ্য ওয়াতানে ইকামত অন্য ওয়াতানে ইকামত, সফর এবং ওয়াতানে আসলী দ্বারা বাতিল হয়ে যায় (তাবয়ীন)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ যদি সপরিবারে সামানপত্রসহ নিজ বাড়ী হতে অন্য কোন শহরে চলে যায় এবং পূর্বের ঠিকানায় যদি তার জায়গা-যমীন এবং বাড়ী-ঘর থাকে, তবে পূর্বের স্থানে তার ওয়াতান বহাল থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) তৎপ্রণীত কিতাবে এদিকেই ইংগিত করেছেন (যাহিদী)। সমস্ত ফকীহ্র সর্বসম্মত রায় অনুসারে ওয়াতানে আসলী প্রমাণ করার জন্য সফর করা শর্ত নয় (মুহীত)। ওয়াতানে ইকামত প্রমাণ করার জন্য সফর শর্ত কিনা, এ বিষয়ে দুই রকমের বর্ণনা রয়েছে। এক ঃ ওয়াতানে ইকামত তিন দিন সফর করার পর নির্ধারিত হবে। দুই ঃ সফরের দূরত্ব না হলেও এবং তার ও তার পরিবারের মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব না হলেও ওয়াতানে ইকামত ওয়াতানে ইকামত হিসাবে গণ্য হবে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যাহিরুর রিওয়ায়েত এটাই (আল্ বাহ্রুর রাইক ও শরহে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ঃ ইব্ন আমীরুল হাজ্জ (র))। মুসাফির যদি চোর-ডাকাতের আশংকা করে এবং সফরসঙ্গীদের সাথে সাক্ষাত হবে বলে যদি সে আশাবাদী না হয়, তবে বিলম্বে নামায আদায় করা তার জন্য জাইয আছে। কেননা, সে মা'যূর ব্যক্তি (ফাতাওয়ায়ে গারায়েব)।

সওয়ারী এবং নৌকায় নামায পড়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ শহরের বাইরে সওয়ারীর উপর আরোহণ করে নফল নামায পড়া জাইয। সওয়ারী যেদিকে যাবে, সেদিকে মুখ করে ইশারা করে নামায আদায় করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সওয়ারী যেদিকে যায় এর বিপরীত দিকে মুখ করে নামায পড়া জাইয নেই (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্–হাজ)। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে শহরের ভেতর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে নামায পড়া জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। সহীহ্ মতে শহরের বাইরে উপরোক্ত বিষয়ে মুসাফির এবং মুকীম উভয়ই সমান। অতএব মুসাফির নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জমা–যমীন পরিদর্শনে যায়, তবে তার জন্যও সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় নফল আদায় করা জাইয আছে (মুহীত)। خارج المصر তথা "শহরের বাইরের" সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে 'যতদূর' সফর করলে মুসাফিরের জন্য কসর পড়া জাইয, ততদূর পর্যন্ত জায়গা হল خارج المصر অর্থাৎ "শহরের বাইরের" সীমার আওতাভুক্ত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ সওয়ারীর উপর নামায পড়ার নিয়ম হল, ইশারা করে নামায পড়া (খুলাসা)। হুজ্জাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যীন বা পালানের উপর বসে নামায পড়বে। কিরাআত পড়বে, রুকূ–সিজদা করবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে (তাতারখানিয়া)। রুকূর তুলনায় সিজদার মধ্যে মাথা অধিক নত করবে। কোন কিছুর উপর মাথা রাখবে না। সওয়ারী চাই দাঁড়ানো অবস্থায় থাকুক বা চলমান অবস্থায় থাকুক একই হুকুম (খুলাসা)। নিজের কাছে রক্ষিত কোন বস্তুর উপর বা যীনের উপর সিজদা করলে জাইয হবে না (আল্–বাহ্রুর রাইক)। যে কোন সওয়ারীর উপর ইশারা করে নামায পড়া জাইয। কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করা এবং কিবলাবিমুখ হয়ে নামায শুরু করা উভয় অবস্থাই আমাদের মাযহাবে সমান (মুহীত)। হুজ্জাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটাই পসন্দনীয় মত (তাতারখানিয়া)। সওয়ারী অবস্থায় একাকী নামায আদায় করবে। যদি জামাআতের সাথে নামায আদায় করা হয়, তবে ইমামের নামায সহীহ্ হবে, কিন্তু মুক্তাদীর নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ শহরের বাইরে সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় কেউ যদি নামায আদায় করে, তবে সওয়ারী তাড়া করা এবং হাঁকানো জাইয আছে কিনা, এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম (র) "শরহ্স্ সিয়ার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ মাসআলার মধ্যে ব্যাখ্যা রয়েছে। সওয়ারী যদি আপনা হতে চলে, তবে তাড়া করা জাইয নেই। সওয়ারী যদি আপনা হতে না চলে, তবে চাবুক দিয়ে তাড়া করলে বা ভয় দেখালে এতে নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, এটা আমলে কালীল। এতে নামায নষ্ট হবে না (যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ সুন্নাতে মুআক্কাদা নফলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তা সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় আদায় করা জাইয আছে (তাবয়ীন)। কেউ যদি শহরের বাইরে সওয়ারীর উপর নফল পড়তে আরম্ভ করে, অতঃপর নামায শেষ না হতে সে যদি শহরে প্রবেশ করে, তবে অধিকাংশ ফকীহ্র মতে সে সওয়ারী হতে অবতরণ করে বাকী নামায পুরা করবে। এটাই গ্রহণীয় মত (গিয়াছিয়া)। কেউ যদি মাটির উপর নফল আরম্ভ করে সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় তা শেষ করে, তবে তার নামায জাইয হবে না। অবশ্য সওয়ারীর উপর নামায আরম্ভ করে মাটিতে নেমে তা সমাপ্ত করা জাইয আছে (মুতূন)। একই সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নফল নামাযে দুই

ব্যক্তির এক জনের পেছনে অন্য জনের ইকতেদা সহীহ্ আছে। বিশেষ প্রয়োজনের কারণে ফরয নামাযেও এরূপ করা জাইয আছে (সিরাজিয়া)। এ নামাযে তারা চাই এক দিকে থাকুক বা দুই দিকে, এতে কোন ব্যবধান নেই। কেননা, তাদের মধ্যে এমন কোন অন্তরায় নেই, যা ইকতেদা সহীহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। যদি প্রত্যেকে পৃথক পৃথক জানোয়ারের উপর সওয়ার থাকে, তবে মুক্তাদীর নামায সহীহ্ হবে না। কেননা, উভয় জানোয়ারের মধ্যে রয়েছে চলার মত রাস্তা। সুতরাং এ অবস্থায় ইকতেদা সহীহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

৫. মাসআলা ঃ ওযর ব্যতীত ফরয নামায সওয়ারীর উপর আদায় করা জাইয নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে ওয়াজিব তথা বিত্‌রের নামায, মান্নতের নামায, আরম্ভ করে ভঙ্গ করা হয়েছে এমন নামায, জানাযার নামায এবং তিলাওয়াতের সিজদা যা মাটির উপর তিলাওয়াত করা হয়েছে–এগুলোও সওয়ারীর উপর আদায় করা জাইয নেই (আয়নী ঃ কান্‌যের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। যদি জান–মালের আশংকা থাকে অথবা জানোয়ারের ব্যাপারে কোন আশংকা থাকে অথবা যদি চোর–ডাকাত, হিংস্র প্রাণী বা শত্রুর আশংকা থাকে অথবা জানোয়ার এমন দুষ্ট প্রকৃতির যে, এর থেকে অবতরণ করার পর পুনরায় এর উপর আরোহণ করা কোন সহযোগী ব্যতীত সম্ভব নয় অথবা আরোহণকারী ব্যক্তি এমন বৃদ্ধ যে, সে সওয়ারীর উপর নিজে উঠতে পারে না এবং উঠিয়ে দেয়ার মত কোন লোকও খুঁজে পাচ্ছে না অথবা সমস্ত যমীন যদি কাদাযুক্ত থাকে, নামায পড়ার মত কোন শুকনা জায়গা না থাকে, তবে উপরোক্ত অবস্থাসমূহকে উযর হিসাবে গণ্য করা হবে (মুহীত)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি যমীনে এমন কাদা থাকে যে, সওয়ারী হতে নামলে তার মুখ যমীনে ডুবে যাবে। কিন্তু অবস্থা যদি এমন না হয়, বরং যমীন যদি ভিজা হয়, তবে যমীনে অবতরণ করে নামায পড়তে হবে (খুলাসা)। যমীনে অবতরণ করে নামায পড়তে সক্ষম হওয়ার পর সওয়ারীর উপর যে নামায আদায় করা হয়েছে, তা পুনরায় আদায় করতে হবে না (আস্–সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ মাযূর ব্যক্তি যদি সওয়ারী থামাতে সক্ষম হয়, তবে থামিয়ে ইশারা করে নামায আদায় করবে। যদি থামাতে সক্ষম না হয়, তবে নামায জাইয হবে না (মুযমারাত)। গাড়ীর কোন দিক যদি জানোয়ারের উপর থাকে, তবে গাড়ী চলুক বা না চলুক এর উপর নামায পড়া সওয়ারীর উপর নামায পড়ার মতই। এর হুকুম পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর যদি গাড়ীর কোন অংশ সওয়ারীর উপর না থাকে, তবে তা চৌকির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনিভাবে কেউ যদি গাড়ীর নীচে কোন কাষ্ঠ এমনভাবে গেড়ে দেয়, যার ফলে গাড়ীটি মাটির উপর স্থির হয়ে থাকে, তবে তা যমীনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ জানোয়ারের শরীরে যদি কোন নাপাকী থাকে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারো কারো মতে, যদি যীনের উপর অথবা পাদানির উপর নাপাকী থাকে, তবে নামায জাইয হবে না। কোন কোন ফকীহ্–এর মতে, নাপাকী যদি পাদানির মধ্যে থাকে, তবে নামায জাইয হবে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে সর্বাবস্থায়ই নামায জাইয হবে (আয়নী ঃ কান্‌যের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।

pdf By Syed Mostofa Sakib

৮. মাসআলা ঃ নৌকায় নামায পড়ার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, ফরয নামায সম্ভব হলে নৌকার বাইরে বের হয়ে আদায় করা (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। চলন্ত নৌকায় দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বসে নামায আদায় করা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয। তবে মাকরূহ্। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এভাবে নামায পড়া জাইয নয়। যদি নৌকা বাঁধা থাকে, চলন্ত অবস্থায় না থাকে, তবে বসে বসে নামায পড়া কারো মতেই জাইয নেই (তাহযীব)। যমীনের উপর স্থির, এমন বাঁধা নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া জাইয। নৌকা যদি যমীনের উপর স্থিরীকৃত না হয় এবং এর ভেতর হতে যদি বের হওয়া সম্ভব হয়, তবে এরূপ নৌকার ভেতর নামায পড়া জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ নৌকা যদি সমুদ্রের মধ্যে বাঁধা থাকে এবং হেলে-দোলে, তবে বিশুদ্ধতম মতে বায়ুর আঘাতে নৌকা যদি প্রচণ্ডভাবে হেলে-দোলে, তবে তা চলন্ত নৌকার হুকুমে হবে। আর বাতাসের আঘাতে নৌকা যদি হালকাভাবে নড়ে, তবে তা স্থির নৌকার হুকুমে হবে (তামারতাশী)। নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি মাথায় চক্কর আসে, তবে সমস্ত ইমামের মতানুসারে বসে নামায পড়া জাইয আছে (খুলাসা)। নৌকায় নামায আরম্ভ করা অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে নামায আরম্ভ করা আবশ্যক (কাফী ঃ রোগীর নামায অনুচ্ছেদ)। নৌকা ঘুরে যাওয়ার সাথে সাথে নামাযীও নিজের মুখ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে নিবে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুসল্লী যদি কিবলার দিকে মুখ না ফিরায়, তবে নামায জাইয হবে না। রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি নৌকায় ইশারা করে নামায পড়ে, তবে কোন ইমামের মতেই তার নামায জাইয হবে না (মুযমারাত ঃ মুসাফিরের নামায অনুচ্ছেদ)।

১০. মাসআলা ঃ নৌকায় ইমামতের নিয়্যাত করলে মুকীম হবে না। অনুরূপভাবে নৌকার মালিক এবং মাঝি-মাল্লার জন্যও এই একই হুকুম। কিন্তু নৌকা যদি শহর বা গ্রামের নিকটবর্তী হয়, তবে মূল ইকামতের নিয়্যাত অনুযায়ী মুকীম বলে গণ্য করা হবে (মুহীত)। "আল্-ওয়ালুজিয়্যা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি ইকামতের অবস্থায় নদীর তীরে বাঁধা নৌকায় নামায আরম্ভ করেছিল, অতঃপর ঝড় এসে নৌকা একদিক হতে অন্যদিকে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে যদি নৌকার ভেতর নামাযরত থাকে এবং ইকামতের নিয়্যাত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে। "হুজ্জাত" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতার উদ্দেশ্যে ইমাম আবূ ইউসফ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। "ইতাবিয়্যা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুসাফির যদি শহরের বাইরে নৌকায় নামায আরম্ভ করে, আর ঐ অবস্থায় নৌকা চলতে চলতে যদি শহরের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে (তাতারখানিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ এক নৌকায় থাকা অবস্থায় অন্য নৌকার কোন ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করা জাইয নেই। উভয় নৌকা যদি একত্রে বাঁধা থাকে, তবে ইক্তেদা জাইয হবে (খুলাসা)। "নাওয়াযিল" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, উভয় নৌকা যদি এমনভাবে থাকে যে, এক নৌকা হতে বিনা কষ্টে অন্য নৌকায় লাফ দিয়ে যাওয়া যায়, তবে এ দুই নৌকা একত্রে বাঁধা দুই নৌকার

হুকুমের মধ্যে শামিল হবে এবং উভয় নৌকার মুসল্লীদের নামায জাইয হবে (তাতারখানিয়া)। যমীনের উপর দাঁড়ানো কোন ব্যক্তি যদি নৌকায় অবস্থানরত কোন ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করে অথবা নৌকায় অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি যমীনে দাঁড়ানো কোন ব্যক্তির পেছনে ইকতেদা করে, তবে তাদের মধ্যে কোন রাস্তা বা খাল থাকলে ইকতেদা জাইয হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে রাস্তা বা খাল না থাকে, তবে ইকতেদা জাইয হবে। নৌকার ভেতর দাঁড়ানো ইমামের পেছনে নৌকার ছই-এর উপর দাঁড়ানো ব্যক্তির ইকতেদা সহীহ্ আছে। কিন্তু মুক্তাদী যদি ইমামের আগে দাঁড়ায়, তবে ইকতেদা সহীহ্ হবে না (মুহীত)। কেউ যদি নামাযের অবস্থায় নৌকা বাঁধে, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে এ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, এ কাজ "আমলে কাছীর"-এর মধ্যে শামিল (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ জুমুআর সালাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ জুমুআর নামায ফরযে আইন (তাহযীব)। জুমুআর নামায ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তা হল আযাদ হওয়া, পুরুষ হওয়া, মুকীম হওয়া এবং সুস্থ্য হওয়া (কাফী)। হাঁটতে সক্ষম হওয়া (আল-বাহ্রুর রাইক)।দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া (তামারতাশী)। সুতরাং গোলাম, স্ত্রীলোক, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির উপর জুমুআর নামায ফরয হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। খোঁড়া ব্যক্তির উপর কোন ইমামের মতেই জুমুআর নামায ফরয নয় (মুহীত)। নিয়ে যাওয়ার মত লোক থাকলেও খোঁড়ার উপর জুমুআ ওয়াজিব নয় (যাহিদী)। অন্ধ ব্যক্তির উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়, যদিও নিয়ে যাওয়ার মত লোক থাকে (সিরাজিয়্যা)। অতিশয় বৃদ্ধ মানুষও অসুস্থের মতই। সুতরাং তার উপরও জুমুআর নামায ওয়াজিব হবে না। প্রচণ্ড বৃষ্টির অবস্থায় অথবা অত্যাচারী বাদশাহ্র ভয়ে আত্মগোপন করার অবস্থায় জুমুআর নামায রহিত হয়ে যায়[1] (ফাতহুল কাদীর)। গোলামকে জুমুআর নামায, নামাযের জামাআত এবং দুই ঈদের নামাযে শরীক হওয়া থেকে বারণ করার অধিকার মনিবের রয়েছে। মুকাতাব গোলাম (অর্থের বিনিময়ে যে গোলাম নিজের আযাদীকে ক্রয় করে নিয়েছে)-এর উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যে গোলামের আংশিক আযাদ হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ আযাদের জন্য সে প্রচেষ্টারত, এমন গোলামের উপরও জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। 'আবদে মাযূন () এবং যে গোলাম দৈনন্দিন কিছু আদায় করছে, তাদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ যে গোলাম জামে মসজিদের দরজায় মনিবের জানোয়ার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত, তার উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে যদি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে, তবে জুমুআ আদায় করবে (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। মালিক শ্রমিককে জুমুআর নামাযে শরীক হওয়া থেকে ইচ্ছা করলে নিষেধ করতে পারবে। ইমাম আবূ হাফ্স (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবূ আলী আদ্‌দাক্কাক্ (র) বলেন, শহরের মধ্যে নিষেধ করা উচিত নয়। অবশ্য মসজিদ যদি দূরে থাকে, তবে যে পরিমাণ সময় এ কাজে ব্যয় হবে এ পরিমাণ পারিশ্রমিক কাটা যাবে। কিন্তু মসজিদ যদি নিকটে হয়, তবে পারিশ্রমিক আংশিকভাবেও কাটা যাবে না। যে পরিমাণ পারিশ্রমিক কাটা যাবে, তা চাওয়া শ্রমিকের জন্য উচিত নয় (মুহীত)। ইমাম দাক্কাক (র) কৃত যাহিরী মুতূন এবং আল্-বাহ্রুর রাইক)। যার উপর জুমুআর নামায ফরয নয়, সে যদি তা আদায় করে, তবে তার যুহর আদায় হয়ে যাবে (কানয)।

১. যুহর আদায় করবে।

৩. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের আদায় সহীহ্ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তবে এ শর্তগুলো মুসল্লীর সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং নামাযের বাইরের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

(১) শহর হওয়া (কাফী)। যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে শহর ঐ স্থানকে বলা হয়ে থাকে, যেখানে মুফতী এবং কাযী থাকে, যারা তথায় ন্যায়বিচার কায়েম করে, ইসলামের হুকুম-আহ্কাম জারী করে এবং যার আবাদী মিনার আবাদীর মত হবে (যহীরিয়্যা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খুলাসা কিতাবে আছে, এ মতটি নির্ভরযোগ্য (তাতারখানিয়্য)। "ন্যায়বিচার কায়েম করার" মানে হল, "কায়েম করার ক্ষমতা রাখা" (গিয়াছিয়্যা)। শহরে যেমনিভাবে জুমুআর নামায আদায় করা জাইয অনুরূপভাবে শহরতলিতেও জুমুআর নামায আদায় করা জাইয। শহরতলি হল, শহর সংলগ্ন ঐ জায়গা, যা শহরের উপকারের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। যারা এমন স্থানে বসবাস করে, যা শহর হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত এবং শহর ও ঐ স্থানের মধ্যে চাষাবাদ উপযোগী যমীন এবং চারণভূমি রয়েছে, তবে ঐ সমস্ত লোকের উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। যদিও ঐ স্থানে শহরের আযানের আওয়ায পৌঁছে। এ ক্ষেত্রে এক মাইল ও দুই মাইলের দূরত্বের হিসাব ধর্তব্য নয় (খুলাসা)। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে এ মতটি উদ্ধৃত করেছেন। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) এ মতটি পোষণ করেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ গ্রাম্য লোক যদি শহরে প্রবেশ করার পর জুমুআর দিন তথায় থাকার নিয়্যাত করে, তার উপরও জুমুআ ওয়াজিব হবে। কেননা, এ দিনের জন্য সেও শহরবাসীদের একজনের ন্যায় হয়ে গিয়েছে। আর যদি শহরে প্রবেশ করার পর কেউ এরূপ নিয়্যাত করে যে, সে জুমুআর নামাযের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে চলে যাবে, তবে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু জুমুআ আদায় করলে ছওয়াব পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, তাজ্নীস ও মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ পল্লীগ্রাম এবং মাঠে-ময়দানের অধিবাসী, যাদের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়, তাদের জন্য জাইয আছে জুমুআর দিন আযান-ইকামতসহ যুহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা। মুসাফির লোক যদি জুমুআর দিন শহরে প্রবেশ করে, তবে তারা একা একা যুহরের নামায আদায় করবে। অনুরূপভাবে শহরবাসীদের যদি জুমুআর নামায ফওত হয়ে যায়, তবে তারা এবং কারাবন্দী ও অসুস্থ লোকেরাও পৃথক পৃথক ভাবে যুহরের নামায আদায় করবে। কেননা, জামাআতের সাথে নামায পড়া তাদের জন্য মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ হজ্জের মওসুমে মিনার ময়দানে খলীফা এবং আমীরে হিজাযের জন্য জাইয আছে জুমুআর নামায কায়েম করা। অবশ্য মওসুমী আমীরের জন্য এরূপ করা জাইয নেই (আল্-বিকায়া)। মওসুমের আমীর মুকীম হোক বা মুসাফির উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সে যদি ইরাকের আমীর বা মক্কার আমীর কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, তবে সেও জুমুআর নামাযের ব্যবস্থা করতে পারবে। কারো মতে মুকীমের জন্য এরূপ করা জাইয কিন্তু মুসাফিরের জন্য জাইয নেই। অবশ্য প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধ (বাদাই')। হজ্জের মওসুম ব্যতীত অন্য সময়

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরূপ করা জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ইমামের মতেই আরাফার ময়দানে জুমুআর নামায জাইয নেই (কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ একই শহরের কয়েক স্থানে জুমুআর নামায আদায় করা জাইয আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটাই বিশুদ্ধতম মত। ইমাম সুরুখ্সী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশুদ্ধ মাযহাব এটাই। আমরা এ মতটিই গ্রহণ করেছি (আল্-বাহ্রুর রাইক)। জুমুআর দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হলে জুমুআর নামাযে হাযির না হওয়াও জাইয আছে (খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ শহর হওয়া-না হওয়া বা অন্যান্য শর্ত থাকা-না থাকার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে কোন জায়গায় জুমুআ জাইয হওয়ার বিষয়ে যদি সন্দেহ হয় এবং এমন স্থানে কেউ যদি জুমুআর নামায আদায় করে, তবে জুমুআর ফরযের পর চার রাকআত নামায যুহরের নিয়্যাতে আদায় করে নিবে। যাতে জুমুআ সহীহ্ না হলে যুহর নিশ্চিতভাবে আদায় হয়ে যায় (কাফী ও মুহীত)। এ নামাযের নিয়্যাতের মধ্যে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এভাবে নিয়্যাত করবে যে, "আমি আখিরী যুহর আদায় করছি যা আমার যিম্মায় রয়েছে।" এভাবে নিয়্যাত করাই উত্তম। কারো কারো মতে এভাবে নিয়্যাত করাতে সতর্কতা অনেক বেশী যে, "আমি চার রাকআত আখিরী যুহরের নিয়্যাত করছি। যার ওয়াক্ত আমি পেয়েছি এবং এখনও পর্যন্ত আদায় করিনি" (কিনয়া)। "ফাতাওয়ায়ে আহ"তে বর্ণিত আছে যে, আমাদের দেশে জুমুআর পর যে চার রাকআত নামায পড়া হয়, এর প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো উচিত (তাতারখানিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ (২) জুমুআর আদায় সহীহ্ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, নামাযে আমীর বা বাদশাহ্ উপস্থিত থাকা আবশ্যক। চাই সে ন্যায়পরায়ণ হোক বা জালিম হোক (তাতারখানিয়্যা ঃ নিসাব এর সূত্রে)। অথবা বাদশাহর আদেশপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন আমীর, কাযী বা খতীব (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। অতএব বাদশাহ্ বা বাদশাহ্র প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতিরেকে জুমুআর নামাযের ব্যবস্থা করা জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। জুমুআর দিন ইমাম উপস্থিত থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তার অনুমতি ছাড়া খুতবা পাঠ করে. তবে তা জাইয হবে না। কিন্তু ইমামের নির্দেশে এরূপ করা জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমীর অসুস্থ, এ অবস্থায় পুলিশ নামায পড়ালে নামায জাইয হবে না। কিন্তু আমীরের অনুমতিতে পড়ালে জাইয হবে (তাতারখানিয়্যা ঃ জামিউল জাওয়ামি'-এর বরাতে)।

১০. মাসআলা ঃ গোলাম কোন জিলার শাসক নিয়োজিত হওয়ার পর জুমুআ পড়ালে তা জাইয হবে (খুলাসা)। জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তি যার প্রতি কেন্দ্রীয় আমীরের পক্ষ হতে কোন অনুমতি নেই, তার স্বভাব-প্রকৃতি যদি আমীর-উমরাদের অনুরূপ হয় এবং স্বীয় কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সে যদি প্রজাদের মধ্যে হুকুম-আহকাম জারী করে, তবে তার পেছনে জুমুআর নামায জাইয হবে। মহিলা সম্রাজ্ঞীর জন্য জুমুআর নামায কায়েম করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া জাইয আছে। কিন্তু নিজে জুমুআ পড়ানো জাইয নেই (ফাতহুল কাদীর)। বিশুদ্ধ মতে আমাদের যুগে

কোতওয়াল, কাযী এবং কোন নেতার পক্ষে জুমুআর নামায কায়েম করা জাইয নেই। কেননা, এ কাজ তাদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু এ কাজের দায়িত্ব যদি তাদের প্রতি ন্যস্ত থাকে এবং এ সব বিষয়াদি যদি তাদের নির্দেশের আওতাভুক্ত হয়, তবে জুমুআর নামায কায়েম করা তাদের জন্য জাইয হবে (গিয়াছিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ শহরের গভর্নর মারা যাওয়ার পর তার প্রতিনিধি অথবা কোতওয়াল অথবা কাযী যদি নামায পড়ায়, তবে জাইয হবে। তাদের কেউ যদি সেখানে না থাকে এবং জনসাধারণ যদি একমত হয়ে কাউকে ইমাম নিয়োগ করে এবং সে যদি তাদের নামায পড়ায়, তবে জাইয আছে (সিরাজিয়্যা)। যদি ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) হতে অনুমতি না নিতে পেরে সকলে মিলে কাউকে ইমাম নির্ধারিত করে এবং সে জুমুআর নামায পড়ায়, তবে জাইয আছে (তাহ্যীব)। খলীফার মৃত্যুবরণ করার সময় মুসলমানদের শৃংখলা রক্ষণার্থে তাঁর পক্ষ হতে যদি কতিপয় গভর্নর এবং আমীর নিয়োজিত থাকে, তবে কর্ম হতে অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত তারা নিজ দায়িত্বে বহাল থাকবে এবং জুমুআর নামাযের ইমামত করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১২. মাসআলা ঃ আমীরের পক্ষ হতে খুতবা পাঠের অনুমতি প্রদান জুমুআ পড়ানোর অনুমতি প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে জুমুআ পড়ানোর অনুমতি প্রদানও খুতবা পাঠের অনুমতি প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। আমীর যদি কাউকে এরূপ হুকুম করে যে, খুতবা পাঠ কর। তবে নামাযের ইমামত করবে না। তবে নামায পড়ানোও জাইয আছে (যাহিদী)। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা কোন খৃস্টান ব্যক্তিকে শাসনকর্তা বানানোর পর খৃস্টান যদি মুসলমান হয় এবং বালক যদি বালিগ হয়, তবে খলীফার পক্ষ হতে নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা জুমুআর নামায পড়াতে পারবে না। কিন্তু খলীফা যদি পূর্বেই বলে দেন যে, তুমি মুসলমান হলে আর তুমি বালিগ হলে নামায পড়াবে, তবে অনুমতি ছাড়াই নামায পড়াতে পারবে (তাহ্যীব)। খলীফা যদি সফর করেন এবং তিনি গ্রামে থাকেন, তবে তাঁর সেখানে জুমুআ পড়া জাইয নেই। পক্ষান্তরে খলীফা যদি নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন কোন শহর দিয়ে অতিবাহিত হন এবং তিনি সেখানে মুসাফির হন তবে এ স্থানে জুমুআ পড়া তাঁর জন্য জাইয আছে। কেননা, এ স্থানে অন্য মুসলমানদের নামায যেহেতু তাঁর হুকুমেই জাইয হচ্ছে, তাই তাঁর নামায জাইয হওয়াতে আর কোন বাধা থাকতে পারে না।

১৩. মাসআলা ঃ ইমাম যদি কোন স্থানকে শহর ঘোষণা করে, এরপর লোকজন যদি শত্রুর ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণবশত ঐ স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। অতঃপর পুনরায় যদি লোকজন সেখানে এসে সমবেত হয়, তবে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) পক্ষ হতে নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত জুমুআর নামায আদায় করা তাদের জন্য জাইয নেই। বাদশাহ্ যদি কোন শহরবাসীকে জুমুআ আদায় করতে নিষেধ করেন, তবে তারা জুমুআর নামায আদায় করবে না। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন ঃ বাদশাহ যদি কোন বিশেষ কারণে এ ফরমান জারী করেন এবং এ কারণে জারী করেন যে, এ স্থান ভবিষ্যতে শহর হিসাবে থাকবে না, তবেই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাদশাহ যদি শত্রুতাবশত এবং উক্ত এলাকার লোকদের কষ্ট দেয়ার নিমিত্তে এরূপ ঘোষণা করেন, তবে শহরের লোকেরা কোন এক ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন করে জুমুআর নামায আদায় করতে পারবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(যহীরিয়্যা)। ইমাম তার পদ হতে বরখাস্ত হওয়ার পর যতদিন পর্যন্ত তাঁর নিকট বরখাস্তপত্র না পৌছবে অথবা অন্য কোন ইমাম তাঁর স্থানে নিযুক্ত হয়ে না আসবে, ততদিন পর্যন্ত পূর্বোক্ত ইমামের জুমুআর নামায পড়ানো জাইয হবে। যখন বরখাস্তপত্র তাঁর নিকট পৌছবে অথবা অন্য ইমামের আগমন সম্পর্কে অবগত হবে, তখন হতে তাঁর নামায বাতিল বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বরখাস্তকৃত ইমাম নামায আরম্ভ করার পর যদি নতুন কর্মকর্তা এসে যায়, তবে প্রথমোক্ত ইমাম এভাবেই নামায শেষ করবে (খুলাসা)। কোন শহরের গভর্নর যদি কাফির হয়, তবে সেখানকার মুসলমানদের জন্য জুমুআর নামায আদায় করা জাইয আছে। সাধারণ মুসলমানদের মনোনয়নে কাযী নির্ধারণ করা জাইয আছে। অবশ্য তথাকার মুসলমানদের উচিত, মুসলমান শাসক নির্বাচন করা (সিরাজুদ্ দিরায়া)।

১৪. মাসআলা ঃ তৃতীয় শর্ত হল, যুহরের ওয়াক্ত হওয়া। জুমুআর নামাযের অবস্থায় যদি যুহরের ওয়াক্ত খতম হয়ে যায়, তবে জুমুআর নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর ওয়াক্ত খারিজ হয়ে যায়, তথাপি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত)। এ অবস্থায় জুমুআর নামাযের উপর যুহরের নামাযের বিনা করা জাইয নেই। কেননা, উভয় নামায ভিন্ন ভিন্ন (তাবয়ীন)। কোন মুক্তাদী যদি জুমুআর নামাযে ঘুমিয়ে যায় এবং জাগ্রত হতে হতে যদি ওয়াক্ত খারিজ হয়ে যায়, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি ইমাম নামায হতে ফারিগ হওয়ার পর মুসল্লী ঘুম থেকে জাগ্রত হয় এবং ওয়াক্ত তখনও বাকী থাকে, তবে জুমুআ পুরা করে নিবে (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ চতুর্থ শর্ত হল, জুমুআর ফরয নামাযের আগে খুতবা পাঠ করা। অতএব বিনা খুতবায় জুমুআ আদায় করলে অথবা নামাযের পরে খুতবা দিলে নামায জাইয হবে না (কাফী)। খুতবার মধ্যে কিছু কাজ হচ্ছে ফরয এবং কিছু কাজ হচ্ছে সুন্নাত। খুতবার ফরয দু'টি। (১) ওয়াক্ত মত খুতবা প্রদান। আর তা হল, দ্বিপ্রহরের পর হতে নামাযের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং কেউ যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে বা নামাযের পর খুতবা পাঠ করে, তবে খুতবা সহীহ্ হবে না (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।(২) খুতবায় আল্লাহ্র যিকির বিদ্যমান থাকা (আল্-বাহ্রুর রাইক)। এ ক্ষেত্রে আল্হামদু লিল্লাহ্ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অথবা সুবহানাল্লাহ্ পড়া যথেষ্ট হবে (মুতূন)। খুতবার নিয়্যাতে কেউ এই আযকার পাঠ করলে তা খুতবার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু কেউ যদি হাঁচি দেয়ার পর আল্হামদু লিল্লাহ্ পড়ে অথবা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যদি সুবহানাল্লাহ্ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে, তবে কোন ইমামের মতেই খুতবা আদায় হবে না (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। কেউ যদি একা খুতবা পাঠ করে অথবা মহিলাদের সামনে খুতবা পাঠ করে, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ খুতবা সহীহ্ হবে না (মিরাজুদ্ দিরায়া)। ইমাম যদি এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির সামনে খুতবা পাঠ করে এবং তিনজন মুসল্লী নিয়ে নামায আদায় করে তবে নামায জাইয হবে (খুলাসা)। ইমামের খুতবা পাঠকালে মুসল্লীরা যদি ঘুমিয়ে থাকে অথবা উপস্থিত সমস্ত মুসল্লী যদি বধির হয়, তবে খুতবা সহীহ্ হবে (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।

১৬. মাসআলা ঃ খুতবার সুন্নাত মোট পনেরটি। (১) খুতবা পাঠকারীর শরীর পবিত্র হওয়া।

উযূহীন এবং জুনুবী ব্যক্তির খুতবা পাঠ করা মাকরূহ্। (২) খুতবা দাঁড়িয়ে পাঠ করা (আল্-বাহ্রুর রাইক)। বসে বা কাত হয়ে শুয়ে খুতবা পড়াও জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। (৩) মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুতবা পাঠ করা। (৪) খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে মনে মনে "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্শায়তানির রাজীম" পাঠ করা। (৫) খুতবা এমনভাবে পাঠ করা যাতে মুসল্লীগণ তা শুনতে পায়। না শুনিয়ে পড়লেও জাইয আছে। (৬) "আল্-হাম্দু লিল্লাহ্"-এর দ্বারা খুতবা আরম্ভ করা। (৭) শান মুতাবিক আল্লাহ্র প্রশংসা করা। (৮) খুতবার মধ্যে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ পাঠ করা। (৯) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। (১০) ওয়ায-নসীহত বিদ্যমান থাকা। (১১) কুরআন শরীফ (দু'চার আয়াত) পাঠ করা। কুরআন পাঠ না করা বড় গুনাহের কাজ (আল্-বাহ্রুর রাইক)। খুতবায় যতটুকু তিলাওয়াত করা হবে এর ন্যূনতম পরিমাণ হল, ছোট তিন আয়াত এবং বড় এক আয়াত (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। (১২) দ্বিতীয় খুতবার মধ্যে পুনরায় আল্লাহ্র হাম্দ, প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রদি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। (১৩) মুসলিম নর-নারী সকলের জন্য দু'আ করা। (১৪) খুতবা অত্যধিক দীর্ঘ না করে একটু সংক্ষিপ্ত করা, যেন তিওয়ালে মুফাস্সালের কোন সূরার অনুরূপ হয়। খুতবা অত্যধিক দীর্ঘ করা মাকরূহ্। (১৫) দুই খুতবার মধ্যখানে বসা (আল্-বাহ্রুর রাইক)। যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুসারে দুই খুতবার মধ্যে তিন আয়াত পরিমাণ বসা (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ঃ ফাতাওয়ার বরাতে)। দুই খুতবার মধ্যে কি পরিমাণ সময় বসতে হবে, এ বিষয়ে শামসুল আইম্মা সুরুখসী (র) বলেন, বসার স্থানে ধীর-স্থিরভাবে বসার পর বিলম্ব করা ব্যতিরেকে দাঁড়িয়ে যাবে (তাতারখানিয়্যা)। শামসুল আইম্মা সুরুখসী (র)-এর মতটি খুবই পসন্দনীয় (গিয়াছিয়্যা)। বিশুদ্ধতম মতানুসারে দুই খুতবার মধ্যকার বসা তরক করা গুনাহের কাজ (কিনয়া)। খুতবা পাঠ করার আগে একটু বসা সুন্নাত (আয়নী ঃ কান্য-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। খতীবের জন্য জুমুআর নামাযের বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া শর্ত (যাহিদী)।

১৭. মাসআলা ঃ সুন্নাত হল, খতীব যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করেন। মুস্তাহাব হল উচ্চ আওয়াযে খুতবা পাঠ করা। অবশ্য দ্বিতীয় খুতবা প্রথম খুতবার তুলনায় কিছুটা নীচু আওয়াযে পড়বে (আল্-বাহ্রুর রাইক)। দ্বিতীয় খুতবা اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ দ্বারা আরম্ভ করবে। খুতবার মধ্যে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই চাচার কথা উল্লেখ করা ভাল। বরাবর এ নিয়মই চলে আসছে (তাজ্নীস)। খতীবের জন্য খুতবার অবস্থায় কথাবার্তা বলা মাকরূহ্। কিন্তু সৎ কাজের আদেশ দান প্রসঙ্গে হলে তা জাইয হবে (ফাত্হুল কাদীর)।

১৮. মাসআলা ঃ খতীব ব্যতীত অন্য কারো জুমুআর নামায পড়ানো উচিত নয় (কাফী)। খুতবার পর যদি ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে সে কাউকে খলীফা নিয়োগ করবে। খুতবার সময় যারা উপস্থিত ছিল, তাদের কাউকে খলীফা বানালে জাইয আছে। কিন্তু যারা উপস্থিত ছিল না, তাদের কাউকে খলীফা বানালে নামায জাইয হবে না। নামায শুরু করার পর যদি কারো উযূ ভঙ্গ হয়, তবে যে কোন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করা জাইয আছে (তাহ্যীব)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম যখন খুতবা পাঠের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন থেকে কেউ কোন নামায পড়বে না এবং কথাবার্তাও বলবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ইমামের বের হওয়ার পর এবং খুতবা পাঠের পূর্বে কথা বলতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে খুতবার পর এবং নামায আরম্ভ করার পূর্বে কথা বলতেও কোন দোষ নেই (কাফী)। এ ক্ষেত্রে সাধারণ কথাবার্তা, তাসবীহ্ এবং হাঁচির জওয়াব বা সালামের জওয়াব সব একই পর্যায়ের (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ফিকাহ্ পাঠ করা, ফিকাহ্-এর কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং ফিকাহ্-এর কিতাব লিখা, ইত্যাদি জাইয কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এগুলো করাও মাকরূহ্। আবার কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এগুলো করাতে কোন ক্ষতি নেই। কেউ যদি মুখে কোন কথা না বলে হাত দ্বারা, মাথা দ্বারা বা চোখ দ্বারা ইশারা করে, যেমন কেউ অপর এক ব্যক্তিকে গর্হিত কাজ করতে দেখে তাকে হাতে বাধা দিল বা কোন সংবাদ শুনে মাথা দ্বারা ইশারা করে এর প্রতি সম্মতি প্রদান করল, তবে বিশুদ্ধ মতে এতে কোন ক্ষতি নেই (মুহীত)। এ সময় নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পড়া মাকরূহ্ (শরহুত্ তাহ্বী)।

২০. মাসআলা ঃ খুতবা পাঠ করার সময় দূরে বসা ব্যক্তিও নিকটে বসা ব্যক্তির ন্যায় নীরব থাকবে। এটাই পসন্দনীয় মত (জাওয়াহিরুল আখ্লাতী)। এ মতটি সতর্কতাপূর্ণও বটে (তাবয়ীন)। কেউ বলেন, এ সময় কুরআন শরীফ পাঠ করবে। কারো মতে নীরব থাকবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যে সব কাজ নামাযের অবস্থায় হারাম খুতবার অবস্থায়ও তা হারাম। সুতরাং ইমামের খুতবারত অবস্থায় পানাহার করা সমীচীন নয় (খালাসা)। খুতবার অবস্থায় মুসল্লীদের জন্য মুস্তাহাব হল, ইমামের দিকে মুখ করে বসা। ইমামের সামনের মুসল্লীর জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যারা ইমামের নিকটে ডানে ও বামে আছে, তারা খুতবা শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ইমামের দিকে ফিরে বসবে (খুলাসা)। অধিকাংশ ফকীহ্র মতে মুসল্লীদের জন্য অপরিহার্য হল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুতবা শ্রবণ করা।

২১. মাসআলা ঃ ইমামের নিকটে বসা দূরে বসা হতে উত্তম। আমাদের মাশায়িখদের সহীহ্ মত এটাই (মুহীত)। ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া উচিত নয়। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) আমাদের ইমামদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম খুতবা শুরু না করা পর্যন্ত মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ইমামের খুতবা আরম্ভ করার পর এরূপ করা মাকরূহ্। কেননা, খুতবা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আগত মুসল্লীদের জন্য জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং ইমামের নিকটে বসার ফযীলত লাভের নিমিত্তে মুসল্লীদের জন্য উচিত সামনে এগিয়ে মিহরাবের নিকটে গিয়ে বসা। যদি প্রথমে আগত ব্যক্তি এরূপ না বসে, তবে সে বিনা ওযরেই এ স্থান প্রত্যাখ্যান করল। অতএব, তারপর যে আসবে, সে ঐ স্থানে বসবে। ইমামের খুতবা পাঠের অবস্থায় কেউ যদি মসজিদে আসে, তবে সে যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। কেননা, এ সময় হাঁটা-চলা করা এবং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়া খুতবার অবস্থায় খুতবার পরিপন্থী কাজ করার অন্তর্ভুক্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ভিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় সকল ইমামের মতে মাকরূহ্ (আল্-বাহ্রুর রাইক)। এ সম্বন্ধে পসন্দনীয় মত হল, যাচঞাকারী ব্যক্তি যদি নামাযীর সামনে দিয়ে না যায়, মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে আস্ফালন করে না যায় এবং নাছোড়বান্দা হয়ে যাচঞা না করে, বরং নিজের অতীব প্রয়োজনে যাচ্ঞা করে, তবে এরূপ যাচঞা করা ও দান করাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যাচঞাকারী ব্যক্তি যদি এরূপ গুণের না হয়, তবে মসজিদের ভেতর তাকে কোন কিছু দেয়া জাইয নেই (ওয়াজীয ঃ আল কুরদরী (র))।

২২. মাসআলা ঃ খুতবার সময় যারা উপস্থিত থাকবে, তারা হাঁটু তুলে, অথবা আসন পেতে অথবা যেভাবে ইচ্ছা বসবে। কেননা, খুতবা মূলত ও কার্যত নামাযের মত নয় (মুযমারাত)। অবশ্য নামাযের বসার ন্যায় বসে খুতবা শ্রবণ করা মুস্তাহাব (মি'রাজুদ্ দিরায়া)। নফল পড়া অবস্থায় ইমাম যদি খুতবা আরম্ভ করে দেয়, তবে সিজদা না করে থাকলে নামায ছেড়ে দিবে। আর সিজদা করে থাকলে দুই রাকআত পড়ে নামায শেষ করবে (কিন্য়া)।

২৩. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের অবস্থায় কারো যদি এ কথা স্মরণ হয় যে, তার যিম্মায় ফজরের নামায বাকী রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি জুমুআ ফওত হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে জুমুআ ছেড়ে ফজরের নামায আরম্ভ করবে। আর যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে যেহেতু সময়ের সংকীর্ণতা রয়েছে, তাই তারতীব রহিত হওয়ায় সে জুমুআর নামায পূরণ করবে। যদি জুমুআ ফওত হওয়ার আশংকা থাকে, ওয়াক্ত ফওত হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জুমুআ ছেড়ে ফজর আরম্ভ করবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জুমআ পুরা করবে (মি'রাজুদ্ দিরায়া)। ধনুক বা লাঠির উপর ভর করে খুতবা দেয়া মাকরূহ্ (খুলাসা ও মুহীত)। যে সব শহর তলোয়ারের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, সেখানে গলায় তরবারি ঝুলিয়ে খতীব খুতবা পাঠ করবে (শরহুত্ তাহ্বী)।

২৪. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের আদায় সহীহ্ হওয়ার পঞ্চম শর্ত হল, জামাআত হওয়া। ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিন ব্যক্তির জামাআত হওয়া আবশ্যক (তাবয়ীন)। খুতবার সময় এসব লোকের উপস্থিত থাকা শর্ত নয় (ফাতহুল কাদীর)। ইমাম জুমআর খুতবা পাঠ করার পর খুতবা শ্রবণকারী লোকেরা যদি সবাই চলে যায় এবং অন্য মুসল্লীগণ (যারা খুতবার সময় উপস্থিত ছিল না) এসে যদি জামাআতে শরীক হয় এবং ইমাম তাদের নিয়ে নামায পড়ে, তবে জাইয আছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। জামাআতে শরীক লোকদের মধ্যে ইমাম হওয়ার যোগ্যতা থাকা শর্ত। মুসল্লীদের মধ্যে যদি ইমাম হওয়ার যোগ্যতা না থাকে, যেমন মহিলা এবং বালক, তবে তাদের জুমুআর নামায সহীহ্ হবে না (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২৫. মাসআলা ঃ মুসল্লীগণ যদি গোলাম হয়, মুসাফির হয়, অসুস্থ লোক হয়, উম্মী হয় অথবা বোবা হয়, তথাপি তাদের নামায সহীহ্ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ইমাম জুমুআর নামায আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে "আল্লাহু আকবার" বলার সময় উপস্থিত মুসল্লীগণ যদি তাঁর সাথে জামাআতে শরীক না হয় এবং তারা যদি ইমামের রুকূ হতে মাথা উঠানোর আগে তাকবীর বলে নামাযে শরীক হয়, তবে তাদের নামায সহীহ্ হবে। নতুবা ইমাম নতুনভাবে নামায শুরু করবে। এ বিষয়ে কারো

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিমত নেই (গিয়াছিয়্যা)। মুসল্লীগণ যদি ইমামের সাথে তাকবীর বলার পর চলে যায় এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, অতঃপর যদি তারা পুনরায় এসে ইমামের রুকূ হতে মাথা উঠানোর পূর্বে নামাযে শরীক হয়, তবে তাদের নামায সহীহ্ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২৬. মাসআলা ঃ ইমামের তাকবীর বলার সময় যদি তার নিকট এমন লোকজন উপস্থিত থাকে, যাদের উযূ আছে কিন্তু তারা যদি ইমামের সাথে তাকবীর না বলে, এমতাবস্থায় যদি তাদের উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অন্য লোকজন আসে আর তারা চলে যায়, তবে استحسانا তাদের নামায জাইয হবে। যদি উপস্থিত লোকজন উযূহীন অবস্থায় থাকে, আর এ অবস্থায় ইমাম তাকবীর বলে, অতঃপর যদি অন্য লোকজন এসে নামাযে শরীক হয়, তবে ইমামের জন্য আবশ্যক হল, পুনরায় তাকবীর বলা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নামায শুরু করার পর সিজদা করার আগে যদি জামাআতের লোকজন নামায ছেড়ে চলে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের জুমুআ সহীহ্ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বিপরীত মত পোষণ করেন (তামারতাশী (র))। আর যদি সিজদা করার পর মুসল্লীগণ নামায ছেড়ে চলে যায়, তবে আমাদের তিন ইমামের মতানুযায়ী উক্ত ইমাম সাহেব জুমুআর নামায পূর্ণ করবে (মুযমারাত)।

২৭. মাসআলা ঃ জুমুআর নামাযের ষষ্ঠ শর্ত হল, (মসজিদগৃহে) সব সময় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা। আর তা হবে এভাবে যে, মসজিদের দরজা খোলা থাকবে এবং সমস্ত মানুষের এতে প্রবেশ করার অনুমতি থাকবে। অতএব, কতিপয় লোক যদি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের দরজা বন্ধ করে নামায আদায় করে, তবে এতে জুমুআর নামায সহীহ্ হবে না। বাদশাহ্ যদি নিজ গৃহে আপন লোকজন নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করে এবং দ্বার খোলা রেখে সর্বসাধারণের জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে, তবে এ নামায সহীহ হবে। জনসাধারণ এ জামাআতে শরীক হোক বা না হোক এতে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত)। বাদশাহ্র জন্য এভাবে জামাআত করা মাকরূহ্ (তাতারখানিয়্যা)। এভাবে জামাআত করতে গিয়ে যদি নামায-গৃহের দরজা খোলা না রেখে দরজায় দ্বাররক্ষী মোতায়েন রাখা হয়, তবে এ নামায সহীহ্ হবে না (মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ মুসাফির, গোলাম এবং রোগীর জন্য জাইয আছে জুমুআর নামাযের ইমামত করা (কুদূরী)। যার কোন ওযর নেই এরূপ ব্যক্তি যদি জুমুআর নামাযের পূর্বে যুহরের নামায আদায় করে, তবে মাকরূহ্ (কান্‌য)। রোগী, মুসাফির এবং কারাবন্দীদের জন্য ইমাম জুমুআর নামায হতে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে যুহরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। যদি অপেক্ষা না করে যুহর আদায় করে নেয়, তবে সহীহ্ মতে মাকরূহ্ হবে (ওয়াজীয ঃ ইমাম কুরদুরী (র))। কেউ যদি যুহর আদায় করার পর জুমুআ আদায় করার জন্য চেষ্টা করে এবং ইমামকে জুমুআর নামাযে পায়, তবে যুহর বাতিল হয়ে যাবে। চাই তারা মাযূর হোক যেমন মুসাফির, রোগী বা গোলাম অথবা মাযূর না হোক। তারা যদি ইমামকে জুমুআর নামাযে না পায়, তবে ঘর হতে বের হওয়ার সময় ইমামের নামায যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কারো মতেই তাদের যুহর বাতিল হবে না। আর যদি তাদের ঘর হতে বের হওয়ার সময় ইমাম নামাযে থাকে এবং সে গিয়ে

পৌঁছার পূর্বে ইমামের নামায শেষ হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের যুহর বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাদের নামায বাতিল হবে না। আর কেউ যদি জুমুআর উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের না হয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে কারো মতেই তাদের নামায বাতিল হবে না (কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ যুহর আদায় করার পর কেউ যদি জুমুআ আদায় করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তবে এ রওয়ানার সময়ই ইমাম যদি নামায হতে ফারিগ হয়, তবে তার নামায বাতিল হবে না (তাবয়ীন)। কেউ যদি নিজ গৃহে নামায আদায় করার পর মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং ইমাম যদি এখনো নামায না পড়ে থাকে, আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, দূরত্বের কারণে নামায পাবে বলে আশাও করতে পারছে না, তবে বলখের ফকীহ্দের মতে তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে। এটাই সহীহ্ মত। কেউ যদি এমন অবস্থায় জুমুআর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে যে, ইমাম ওযরের কারণে এখনো পর্যন্ত জুমুআ আদায় করেনি অথবা এমনিই এখনো পর্যন্ত নামায আদায় করেনি, তবে তার যুহর বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে বাতিল হবে না। লোকজন জুমুআর নামায আরম্ভ করার পর কেউ যদি নিজ গৃহ হতে রওয়ানা করে এবং কোন দুর্ঘটনার কারণে নামায পূর্ণ করার পূর্বেই সে যদি বেরিয়ে চলে আসে, তবে সহীহ্ মতে তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে (কিফায়া)। জুমুআর উদ্দেশ্যে চেষ্টা করার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হল, নিজ বাড়ী হতে পৃথক হওয়া। সুতরাং নিজ বাড়ী হতে পৃথক হওয়া তথা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যুহর বাতিল হবে না। পসন্দনীয় মত এটাই (ফাতহুল কাদীর)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি যুহরের নামায আদায় করে মসজিদে বসে থাকে, তবে ইমামের সাথে নামায শুরু না করা পর্যন্ত সর্বসম্মত মতানুসারে তার নামায বাতিল হবে না (আল্-বাহ্রুর রাইক)। অসুস্থ ব্যক্তি নিজ গৃহে যুহরের নামায আদায় করার পর কিছুটা সুস্থ অনুভূত হওয়ার পর সে যদি জুমুআর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং জুমুআ আদায় করে, তবে তার যুহর নফলে পরিণত হবে (নিহায়া)। কেউ যদি তাশাহ্হুদ বা সাহু সিজদার অবস্থায় ইমামের সাথে জুমুআয় শরীক হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী সে জুমুআ পুরা করবে। শহরের মধ্যে ইমামের জুমআর নামায আদায় করার আগে বা পরে মা'যূর এবং অন্যান্য লোক যেমন কারাবন্দী ও মুসাফির ইত্যাদি লোকদের জন্য যুহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ্। শহরবাসী মানুষ যারা কোন কারণবশত জুমুআর নামাযে শরীক হতে পারেনি, তাদের জন্যও যুহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ্।

৩১. মাসআলা ঃ গ্রামীণ লোকদের জন্য যুহরের নামায আযান-ইকামতসহ জামাআতের সাথে আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কাযীখান এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন (মুখতাসারুল বিকায়া ঃ আবুল মাকারিম (র))। জুমুআর প্রথম আযান হতেই বেচা-কেনা বন্ধ করে জুমুআর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, মিম্বরের সামনে আযান দেয়ার সময় জুমুআর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা এবং বেচা-কেনা বন্ধ করা ওয়াজিব। ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, মিম্বরের সামনে যে আযান দেয়া হয়, তাই হল ধর্তব্য বিষয়। এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধতম মত হল,

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে আযান হবে তা ধর্তব্য নয়। অবশ্য দ্বিপ্রহরের পর প্রথমে যে আযান হবে, তা ধর্তব্য হবে। চাই তা মিম্বরের নিকট হোক বা "যাওরা" এর নিকট হোক বা অন্য কোথাও হোক (কাফী)। আযানের পর দৌড়িয়ে মসজিদে যাওয়া আমাদের মাযহাবে এবং অন্যান্য ফকীহদের মতে কারো নিকটই ওয়াজিব নয়। অবশ্য এভাবে যাওয়া মুস্তাহাব কিনা এ নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী আযানের পর মুসল্লী ধীর-স্থিরভাবে মসজিদে গমন করবে (কিনয়া)।

৩২. মাসআলা ঃ খুতবার উদ্দেশ্যে ইমাম মিম্বরে উপবিষ্ট হওয়ার পর তার সামনে আযান দেয়া হবে। আযানের পর ইকামত বলা হবে। এ নিয়মই পূর্ব হতে চলে আসছে (আল্-বাহ্‌রুর রাইক)। জুমুআর নামায দুই রাকআত। এর প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা ইচ্ছা পাঠ করবে। উভয় রাকআতেই সশব্দে কিরাআত পাঠ করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৩৩. মাসআলা ঃ তাকবীর বলার পর কেউ যদি ভিড়ের কারণে সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তবে অন্য লোকদের দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি ফাঁক পায়, তবে সিজদা করবে। সে যদি অন্য কারো পিঠের উপর সিজদা করে, তবু জাইয হবে। কিন্তু জায়গা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কোন মুসল্লীর পিঠের উপর সিজদা করে, তবে জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মানুষের ভিড়ের কারণে সিজদা করতে সক্ষম না হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইমাম যদি সালাম ফিরিয়ে দেয়, তবে সে "লাহিক" হিসাবে গণ্য হবে। তাই সে বাকী নামায বিনা কিরাআতে পুরা করবে (আল্-বাহ্‌রুর রাইক)। কোন ব্যক্তি জুমুআর নামাযে যদি মাসবূক হয় এবং পরে নিজের নামায কাযা করার জন্য দাঁড়ায়, তবে বাকী নামায আদায় করার ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ফজরের নামায একা নামায আদায়কারী ব্যক্তির ন্যায় সে চাইলে সশব্দে কিরাআত পাঠ করতে পারবে এবং চাইলে নিঃশব্দেও কিরাআত পাঠ করতে পারবে (খুলাসা)। জুমুআর নামাযে যে উপস্থিত হবে, তার জন্য মুস্তাহাব হল, শরীরে তৈল লাগানো, সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সংগতি অনুসারে উত্তম কাপড় পরিধান করা। সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব। যথাসম্ভব নামাযের প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে (মি'রাজুদ্ দিরায়া)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের সালাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ঈদের নামায ওয়াজিব। বিশুদ্ধতম মত এটাই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ঈদুল ফিত্‌রের দিন পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং নিজের উত্তম পোশাক[১] পরিধান করা (কিনয়া)। পোশাক চাই নতুন হোক বা পুরাতন (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। আংটি পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সকাল সকাল ঈদের ময়দানে গমন করা, ঈদের নামাযের পূর্বে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা, ফজর নামায নিজ মহল্লার মসজিদে আদায় করা, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া এবং (এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করা (কিনয়া)। জুমুআ এবং দুই ঈদের নামাযে যানবাহনে আরোহণ করে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। অবশ্য সক্ষম মানুষের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়াই উত্তম (যহীরিয়্যা)। ঈদুল ফিত্‌রের নামাযের পূর্বে বে-জোড় সংখ্যক তথা তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি অথবা কিছু কম বা বেশী খেজুর খেয়ে/না পেলে যে কোন ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব (আয়নী ঃ কান্য-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়াতে কোনরূপ গুনাহ নেই। অবশ্য সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু না খেলে শাস্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

২. মাসআলা ঃ ঈদুল আযহাও ঈদুল ফিত্‌রের মতই। কিন্তু ঈদুল আযহার মধ্যে নামাযের পূর্বে কিছু খাবে না (কিনয়া)। "কবরা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঈদুল আযহার পূর্বে কোন কিছু খাওয়া মাকরূহ্ কিনা, এ সম্বন্ধে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। পসন্দনীয় মতানুযায়ী মাকরূহ্ হবে না। অবশ্য মুস্তাহাব হল, কিছু আহার না করা (তাতারখানিয়্যা)। কুরবানীর দিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আয়োজিত যিয়াফতের দিন। তাই ঐ দিন সর্বপ্রথম কুরবানীর গোশত হতে কিছু আহার করা মুস্তাহাব (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ)। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে মসজিদে স্থান সংকুলান হওয়া সত্ত্বেও ঈদের নামায আদায়ের জন্য মুসল্লীদের ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত। সহীহ্ মত এটাই (মুযমারাত)। দুই জায়গায় ঈদের নামায আদায় করা জাইয। অবশ্য তিন জায়গায় ঈদের নামায আদায় করার ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয নেই (মুহীত)। ঈদের দিন ঈদগাহে মিম্বর নিয়ে যাবে না। অবশ্য ময়দানে মিম্বর বানানোর ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এরূপ করা মাকরূহ্ নয়। আবার কেউ বলেন, এরূপ করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিশুদ্ধ মতে এরূপ করা মাকরূহ্ হবে না (গারাইব)।

৩. মাসআলা ঃ ঈদগাহে পায়ে হেঁটে ধীর-স্থিরভাবে গমন করবে এবং যেসব জিনিস দেখা

১. অর্থাৎ বৈধ সুন্দর পোশাকাদি পরিধান করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাইয নেই তা থেকে দৃষ্টি নীচু করে রাখবে (মুযমারাত)। ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমনাগমনের সময় পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে এবং ঈদগাহে পৌঁছে তাকবীর খতম করবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত। অবশ্য ঈদুল ফিত্‌রের দিন চুপে চুপে তাকবীর বলবে। এ মতটিই গ্রহণযোগ্য (গিয়াছিয়্যা)। চুপে চুপে তাকবীর বলা মুস্তাহাব (আল্‌-জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৪. মাসআলা ঃ যাদের উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব, তাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব (হিদায়া)। খুতবা ব্যতীত জুমুআর নামাযের জন্য যা শর্ত, ঈদের জন্য ঠিক তাই শর্ত (খুলাসা)। কেননা, ঈদের খুতবা ঈদের নামাযের পর পাঠ করা সুন্নাত। খুতবা ব্যতীতও ঈদের নামায আদায় করা জাইয আছে। কেউ যদি নামাযের পূর্বে খুতবা পাঠ করে, তবে জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ্‌ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। নামাযের আগে পড়া হলে নামাযের পর পুনরায় তা দুহরাতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ঈদের নামাযের পর বাড়ীতে ফিরে আসার পর চার রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব (যাদ)।

৫. মাসআলা ঃ যদি ঈদের নামাযের পূর্বে ফজরের কাযা নামায আদায় করা হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। ফজরের নামায আদায় না করা সত্ত্বেও ঈদের নামায পড়া জাইয আছে। অনুরূপভাবে ঈদের নামাযের পূর্বে পুরাতন কাযা নামায আদায় করাও জাইয আছে। কিন্তু পরে পড়া ভাল এবং উত্তম (তাতারখানিয়্যা ঃ হুজ্জত-এর সূত্রে)।

৬. মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্য উদ্ভাসিত হলে শুরু হয় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাকী থাকে (সিরাজিয়্যা ও তাবয়ীন)। উত্তম হল, ঈদুল আযহার নামায বিলম্ব না করে আদায় করা (খুলাসা)। ইমাম দুই রাকআত নামায পড়বে। প্রথমে তাকবীর বলে সুবহানাকা পাঠ করে তিনবার তাকবীর বলবে। এরপর উচ্চ শব্দে কিরাআত পড়বে এবং এরপর রুকূ-সিজদা করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়ে তিনবার তাকবীর বলবে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। এ হিসাবে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা হবে ছয়টি। তিনটি প্রথম রাকআতে এবং তিনটি দ্বিতীয় রাকআতে। এছাড়াও এতে আরো রয়েছে তিনটি মূল তাকবীর। একটি নামায আরম্ভ করার সময় এবং বাকী দু'টি দুই রুকূর সময়। এভাবে দুই রাকআতে তাকবীরের সংখ্যা হবে মোট নয়টি। ঈদের নামাযের উভয় রাকআতে কিরাআত পড়তে হবে। এটা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা। আমাদের ইমামগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। অতিরিক্ত তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। দুই তাকবীরের মধ্যে তিন তাসবীহ্‌ পরিমাণ সময় খামোশ থাকবে (তাবয়ীন)। আমাদের ফকীহ্‌গণ এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন (গিয়াছিয়্যা)। উভয় তাকবীরের মধ্যে হাত ছেড়ে দিবে। হাত বাঁধবে না (যহীরিয়্যা)। নামাযের পর দুই খুতবা পাঠ করবে (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)। উভয় খুতবার মধ্যে ইমাম সামান্য সময় বসবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের মাযহাবে খুতবার উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণকালে মিম্বরের উপর বসা আবশ্যক নয় (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। খুতবার মধ্যে তাকবীর, তাসবীহ্‌, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে (তাতারখানিয়্যা)। প্রথম খুতবার শুরুতে ক্রমান্বয়ে নয়বার এবং

দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাতবার তাকবীর বলা মুস্তাহাব (যাহিদী)। খুতবার মধ্যে লোকদেরকে সাদাকায়ে ফিত্‌র এবং তার হুকুম-আহকাম সম্বন্ধে শিক্ষা দিবে। সাদাকায়ে ফিত্‌র সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম পাঁচ প্রকার ঃ ১। সাদাকায়ে ফিত্‌র কার উপর ওয়াজিব, (২) কারা তা পাবে, (৩) কখন ওয়াজিব হয়, (৪) কি পরিমাণ ওয়াজিব হয়, (৫) এবং কোন্‌ বস্তু দ্বারা তা আদায় করতে হয় (আল্‌-জাওহারাতুন নায়্যারা)। ঈদুল আযহার খুতবায় ঈমাম তাকবীর বলবে এবং তাসবীহ্‌ পাঠ করবে। লোকদেরকে নসীহত করবে এবং লোকদেরকে কুরবানী এবং যবাহ্‌ করার হুকুম-আহকাম জানাবে (তাতারখানিয়্যা)। তাদেরকে তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দিবে (যাদ)। ইমাম যখন খুতবার মধ্যে তাকবীর বলবে তখন মুসল্লীগণও তার সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং ইমাম যখন দুরূদ শরীফ পড়বে, তখন শ্রোতাগণও নির্দেশ পালনার্থে তার সাথে মনে মনে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। বাকী সময় চুপ থাকা সুন্নাত (তাতারখানিয়্যা ঃ হুজ্জত- এর সূত্রে)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি এমন ইমামের পেছনেও ইকতেদা করে, যিনি ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলার সময় হাত উঠানো জাইয মনে করেন না, তবু সে হাত উঠাবে। কেননা, এই সামান্য বিষয়ে ইমামের অনুসরণ না করলেও কোন ক্ষতি নেই (গিয়াছিয়্যা)। ইমাম মুহাম্মদ (র) "জামি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি ঈদের নামাযে ইমামের সাথে শরীক হয় এবং সে যদি ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাকবীর পসন্দ করে এবং ইমাম অন্য তাকবীর বলা পসন্দ করে, তবে মুক্তাদী এ ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করবে। কিন্তু ইমাম যদি এমনভাবে তাকবীর বলে, যা কোন ফকীহ্‌ হতে অনুসৃত হয়নি, তবে মুক্তাদী এ তাকবীরের ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করবে না (মুহীত)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুক্তাদী ইমামের এত নিকটে যে, সে তার সমস্ত তাকবীর শুনতে পায়। কিন্তু মুক্তাদী যদি ইমাম থেকে দূরে থাকে এবং ইমামের তাকবীর শুনতে না পায়, বরং মুকাব্বির-এর তাকবীর শুনতে পায়, তবে যতবার তাকবীর শুনবে, সেও ততবার তাকবীর বলবে। এতে সাহাবীদের মতের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ অবস্থায় সম্ভাবনা রয়েছে যে, মুকাব্বিরগণ ভুল করেছে এবং এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে যে তাকবীর তরক করেছে তা মূলত ইমামের তাকবীর ছিল (বাদাই')।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) "কবীর"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি ঈদের নামযের প্রথম রাকআতে ইমামের সাথে এমতাবস্থায় শরীক হয় যে, ইমাম হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর তরীকা অনুযায়ী অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করেছেন, অথচ আগত মুসল্লীর নিকট ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর তরীকা অনুযায়ী তাকবীর বলা উত্তম, তবে প্রথম রাকআতে ইমামের কিরাআতের অবস্থায় সে স্বীয় মাযাহাব-অনুসারে তাকবীর বলবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে ইমামের মাযহাবের অনুসরণ করবে (তাতারখানিয়্যা)। ঈদের নামাযে ইমাম রুকূতে যাওয়ার পর কেউ যদি ইমামের সাথে শরীক হয়, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথমে সে নামায শুরু করার তাকবীর বলবে। অতঃপর তাকবীর বলে যদি ইমামকে রুকূতে পাওয়া যায়, তবে তাকবীর বলেই রুকূতে যাবে। আর যদি এরূপ সম্ভব না হয়, তবে মুক্তাদী সরাসরি রুকূতে চলে যাবে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী সে রুকূতেই তাকবীর পাঠে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মশগুল হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। অবশ্য রুকূতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাবে না (কাফী)। উক্ত মুসল্লী কয়েক তাকবীর বলার পর ইমাম যদি রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে নেয়, তবে ইমামের অনুসরণ করে সেও রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে নিবে এবং অবশিষ্ট তাকবীর তার থেকে রহিত হয়ে যাবে।

৯. মাসআলা ঃ ইমামকে কেউ যদি কওমার অবস্থায় পায়, তবে সে তাকবীর বলবে না। কেননা, ঐ প্রথম রাকআত সে তাকবীরসহ শেষে আদায় করবে। লাহিক ব্যক্তি ইমামের মাযহাব অনুযায়ী তাকবীর বলবে। যেমন এক ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায আরম্ভ করে ঘুমিয়ে গেল এবং এরপর জাগ্রত হল, তবে সে ইমামের মাযহাব অনুসারে তাকবীর বলবে। কেননা, সে ইমামের পেছনে আছে। কিন্তু মাসবূক ব্যক্তি নিজের নামাযে ইমামের মুক্তাদী নয় (কাফী)। ঈদের নামাযে কেউ যদি ইমামের তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে অথবা সালাম ফিরানোর পর সাহ সিজদা করার পূর্বে অথবা সাহু সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরানোর পূর্বে জামাআতে শরীক হয়, তবে সে দাঁড়িয়ে নিজের বাকী নামায পুরা করবে। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, এ অভিমতটি ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং আবূ ইউসুফ (র)-এর । ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ লোক ঈদের জামাআত প্রাপ্ত হয়নি। আবার কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এ বিষয়ে কারো দ্বিতীয় নেই। এ মতটিই সহীহ (যহীরিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ "আনফা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঈদের নামাযে রুকূর তাকবীর বলা ওয়াজিব। কেননা, এ-ও ঈদের তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত। আর ঈদের তাকবীর ওয়াজিব বৈ কি ? "নাফি" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নামায আরম্ভ করা তাকবীরের মধ্যে ঠিক "আল্লাহু আকবর" শব্দ বলা ওয়াজিব। অতএব, কেউ যদি ঈদের নামাযে আল্লাহু আকবর-এর স্থলে اَللّٰهُ اَجَلُّ বা اَللّٰهُ اَعْظَمُ বলে, তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম যদি ঈদের তাকবীর ভুলে গিয়ে কিরাআত আরম্ভ করে, তবে তিনি কিরাআতের পর তাকবীর বলবে অথবা রুকূ হতে মাথা উঠানোর পূর্বে তাকবীর বলবে (তাতারখানিয়্যা)। যদি কোন কারণবশত ঈদুল ফিতরের নামায নির্দিষ্ট দিনে আদায় না করা যায়। যেমন মেঘের কারণে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। অতঃপর যদি দ্বিপ্রহরের পরে চাঁদ দেখা গিয়েছে বলে ইমাম সাহেবকে জানানো হয় অথবা যদি দ্বিপ্রহরের আগে এমন সময় এ সম্পর্কে জানানো হয়, যখন দ্বিপ্রহরের পূর্বে আর লোকদেরকে একত্রিত করা সম্ভব নয়, তবে ঈদুল ফিতরের নামায পরের দিন আদায় করবে। অনুরূপভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় ঈদের নামায আদায় করার পর যদি এ কথা প্রকাশিত হয় যে, দ্বিপ্রহরের পর নামায আদায় করা হয়েছে, তবে এ অবস্থায়ও দ্বিতীয় দিন নামায আদায় করে নিবে। দ্বিতীয় দিন যদি ইমাম জামাআতের সাথে নামায পড়ে নেয় এবং কতেক লোক নামায না পায়, তবে দ্বিতীয় দিনের পর তারা আর ঐ নামায পড়বে না। ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাক বা ওয়াক্ত বাকী থাক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে (তাবয়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ কোন ওযরের কারণে যদি ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামায না পড়া যায়, তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন তা আদায় করে নিবে। এ সময় না পড়লে এরপর আর তা আদায় করতে পারবে না (আল্‌জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। উল্লেখ্য যে, ঈদুল আযহার মধ্যে যে "ওযর"-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা কেবল কারাহাত থেকে বাঁচার জন্যই। তাই ওযর ছাড়াও কেউ যদি ঈদুল আযহার নামায বিলম্ব করে তৃতীয় দিন আদায় করে, তবু তাদের নামায জাইয হবে। কিন্তু এরূপ করা খুবই খারাপ। কিন্তু ঈদুল ফিতরের মধ্যে দ্বিতীয় দিন নামায আদায় করা শুধু ওযরের কারণেই জাইয আছে। সুতরাং কেউ যদি ওযর ব্যতিরেকে দ্বিতীয় দিন ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করে, তবে তার নামায আদৌ জাইয হবে না (তাবয়ীন)। প্রথম দিন নামাযের ওয়াক্ত যা, দ্বিতীয় দিনও নামাযের ওয়াক্ত ঠিক তাই (তাতারখানিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ ঈদুল ফিতরের দিন ইমাম মুসল্লীদেরকে নিয়ে ঈদের নামায আদায় করার পর যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে এ কথা জানতে পারে যে, সে বিনা উযূতে নামায পড়িয়েছে, তবে পুনরায় সে নামায আদায় করবে। আর যদি দ্বিপ্রহরের পর এ কথা জানতে পারে, তবে দ্বিতীয় দিন নামায আদায় করবে। যদি দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পর এ সম্পর্কে অবগত হয় তবে এ নামায সে আর আদায় করতে পারবে না। যদি ঈদুল আযহার মধ্যে এরূপ হয় এবং এ বিষয়টি ইমাম যদি দ্বিপ্রহরের পর জানতে পারে এবং লোকেরা যদি কুরবানী করে ফেলে, তবে যারা কুরবানী করেছে, তাদের কুরবানী জাইয হবে এবং ইমাম দ্বিতীয় দিন মুসল্লীদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায আদায় করবে। অনুরূপভাবে ইমাম যদি দ্বিতীয় দিন এ বিষয়ে অবগত হয়, তবে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সে লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করতে পারবে। যদি দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে পর জানতে পারে, তবে পরের দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে এ নামায পুনরায় আদায় করে নিবে। আর যদি তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পর এ সম্বন্ধে অবগত হয়, তবে এ নামায আর আদায় করতে পারবে না। বিষয়টি যদি কুরবানীর দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে জানতে পারে, তবে "পুনরায় নামায আদায় করা হবে" এ কথাটি জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করে দিবে এবং যারা এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে কুরবানী করেছে, তাদের কুরবানী জাইয হবে। অবশ্য যারা জ্ঞাত হওয়ার পর কুরবানী করবে, তাদের কুরবানী সূর্য না হেলা পর্যন্ত সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ ঈদের নামায ও জানাযার নামায একত্রিত হলে প্রথমে ঈদের নামায আদায় করবে অতঃপর জানাযার নামায আদায় করে খুতবা পাঠ করবে (কিনয়া)। আরাফার দিবসে আরাফায় অবস্থানকারী লোকদের অনুকরণ করার লক্ষ্যে কোন এক স্থানে লোকদের সমবেত হয়ে "আরাফা দিবস" উদ্‌যাপন করা আদৌ কোন ছওয়াবের কাজ নয় (তাবয়ীন)।

আইয়ামে তাশরীকের তাকবীরের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ তাকবীরে তাশরীকের মধ্যে চারটি বিষয়ের বর্ণনা আবশ্যক। (১) তাকবীরে তাশরীকের হুকুম। (২) তাকবীর কতবার বলতে হবে? (৩) এর শর্ত কি? (৪) তাকবীর কখন বলতে হবে? তাকবীর বলা ওয়াজিব। তাকবীর বলার নিয়ম হল ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

দু'আটি একবার পাঠ করবে। এর শর্ত হল, মুকীম হওয়া, শহর হওয়া এবং ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা (তাবয়ীন)। বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে আযাদ হওয়া এবং বাদশাহ্ উপস্থিত থাকা এর জন্য শর্ত নয় (মি'রাজুদ্ দিরায়া)। এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয় আরাফার দিন ফজরের নামাযের পর হতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতানুযায়ী এর সময় শেষ হয়–আইয়ামে তাশরীকের আখিরী দিনের আসরের নামাযের সময় (তাবয়ীন)।

সমস্ত শহরে সর্বকালের মানুষ তাদের মতামতের ভিত্তিতেই আমল করে আসছে। এবং এর উপরই ফাতওয়া (যাহিদী)।–সালামের সাথে সাথেই তাকবীর পাঠ করা উচিত। অতএব, কেউ যদি সালামের পর কথা বলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ ভঙ্গ করে দেয়, তবে তাকবীর বলা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (তাহ্যীব)। বিত্র ও ঈদের নামাযের পর তাকবীর বলবে না।

২. মাসআলা ঃ আইয়ামে তাশরীকের মধ্যকার কোন নামাযের কথা কেউ যদি ভুলে যায় এবং তা যদি ঐ বছরের আইয়ামে তাশরীকের সময়ের মধ্যেই স্বরণ হয় তবে এর কাযা করবে এবং তাকবীর বলবে (খুলাসা)। আইয়ামের তাশরীক আগমনের পূর্বে কারো নামায ফওত হয়ে থাকলে সে যদি ঐ নামায এ সময়ের মধ্যে আদায় করে, তবে নামাযান্তে তাকবীর বলবে না। অনুরূপভাবে কারো যদি আইয়ামে তাশরীকের কোন নামায কাযা হয়ে যায় এবং সে যদি এ নামায আইয়ামে তাশরীক অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করে অথবা পরবর্তী বছরের আইয়ামে তাশরীকের সময় আদায় করে, তবে উপরোক্ত অবস্থায় নামাযান্তে তাকবীর পাঠ করতে হবে না। মহিলা বা মুসাফির ব্যক্তি পুরুষের পেছনে ইক্তেদা করলে তাদের উপরও তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব হবে। অবশ্য মহিলাগণ আস্তে আস্তে তাকবীর বলবে। মাসবূক মুসল্লীরও তাকবীর বলা ওয়াজিব। সে তার নামায পুরা করার পর তাকবীর বলবে। যদি ইমাম তাকবীর ছেড়ে দেয়, তথাপি মুক্তাদীগণ তাকবীর বলবে। অবশ্য মুক্তাদীগণ ঐ ইমামের অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না সে এমন কোন কাজ করে যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, ইমাম তাকবীর ছেড়ে দিয়েছে। যেমন ইমামের মসজিদ হতে বের হয়ে যাওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে উযূ ভঙ্গ করা এবং কথাবার্তা বলা ইত্যাদি (তাবয়ীন)। সালামের পর তাকবীর বলার পূর্বে যদি ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ অবস্থায়ই তাকবীর বলবে। উযূ করার জন্য বাইরে বের হবে না (খুলাসা)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ নামাযের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নাত (যখীরা)। ফকীহ্দের সর্বসম্মত মত হল, এ নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হবে। তবে কেমন করে আদায় করবে এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। আমাদের মাযহাবের আলিমগণ বলেন, সূর্যগ্রহণের অবস্থায় দুই রাকআত নামায আদায় করবে এবং অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযেও এক রুকূ এবং দুই সিজদা করবে।

প্রত্যেক রাকআতে নিজের ইচ্ছামত কিরাআত পড়বে (মুহীত)। উত্তম হল, উভয় রাকআতে লম্বা কিরাআত পড়া (কাফী)। নামায শেষ করার পর সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কিরাআত লম্বা করা এবং দু'আ খাটো করা অথবা দু'আ লম্বা করা এবং কিরাআত খাটো করবে (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযে ইমামত করবে, সেই ব্যক্তিই এ নামাযের ইমামত করবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, যদি জুমুআ এবং ঈদের ইমাম উপস্থিত না থাকে, তবে মুসল্লীগণ নিজেদের মসজিদে একা একা নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি প্রধান ইমামের পক্ষ হতে মহল্লাহ্র মসজিদের ইমামের প্রতি অনুমতি প্রদান করা হয় তবে তার ইমামতিতেও এ নামায জামাআতের সাথে আদায় করা জাইয হবে।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে জামাআতের সাথে সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করা হলে কিরাআত অনুচ্চ স্বরে পড়বে (মুহীত)। এটাই শুদ্ধ মত (মুযমারাত)। এ নামাযের মধ্যে খুতবা নেই। এটাই আমাদের মাযহাব (মুহীত)। সূর্যগ্রহণের নামায ঈদগাহে অথবা জামে মসজিদে আদায় করা হবে। এ ছাড়া অন্য জায়গায় পড়লেও তা জাইয হবে। তবে প্রথমোক্ত স্থানদ্বয়ে আদায় করাই উত্তম। যদি প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে নিজ গৃহে এ নামায আদায় করে, তবে তাও জাইয হবে। আর যদি লোকজন একত্রিত হয়ে নামায না পড়ে শুধু দু'আ করে, তবে তাও জাইয হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৪. মাসআলা ঃ দু'আ করার জন্য ইমাম মিম্বরের উপর আরোহণ করবে না (তাতারখানিয়্যা)। এ দু'আ করার সময় ইমাম ইচ্ছা করলে কিবলামুখী হয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে অথবা মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে যেভাবে ইচ্ছা দু'আ করতে পারবে। এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইমাম দু'আ করবে এবং উপস্থিত মুসল্লীগণ শুধু আমীন আমীন বলবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) বলেন, এভাবে দু'আ করাই উত্তম। ইমাম যদি নিজের লাঠি অথবা দেয়ালের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করে, তবে তাও ভাল (মুহীত)।

৫. মাসআলার ঃ যদি সূর্যগ্রহণের সময় নামায না পড়া হয়, তবে গ্রহণ ছেড়ে যাওয়ার পর এ নামায পড়ার আর কোন আবশ্যকতা নেই। অবশ্য গ্রহণ আংশিক ছেড়ে যাওয়ার পর নামায আরম্ভ করা জাইয আছে। যদি সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যকে মেঘ আচ্ছন্ন করে রাখে, তবু এ নামায আদায় করবে। যদি সূর্যগ্রহণ অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, তবে দু'আ করা বন্ধ করে মাগরিবের নামায আদায় করবে।

৬. মাসআলা ঃ "সূর্যগ্রহণের" নামায আদায় করার প্রক্কালে জানাযা উপস্থিত হলে প্রথমে জানাযার নামায আদায় করবে এবং পরে সূর্যগ্রহণের নামায পড়বে। যখন নামায পড়া নিষিদ্ধ এমন সময় সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হলে এ সময় সূর্যগ্রহণের নামায পড়বে না (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চন্দ্রগ্রহণ নামাযের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ চন্দ্রগ্রহণের সময়ও পৃথক পৃথক ভাবে দুই রাকআত নামায আদায় করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। অনুরূপভাবে যখন ঝড়–তুফান এবং ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়, অনবরত শিলাবৃষ্টি হতে থাকে, আসমান লাল বর্ণ ধারণ করে, দিবাভাগে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায় অথবা দেশে ভয়াবহ মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখনও দুই রাকআত নামায আদায় করবে (সিরাজিয়্যা)। এমনিভাবে ভূমিকম্প আরম্ভ হলে, আকাশ প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে শুরু করলে, আসমান হতে নক্ষত্র ছুটে পড়তে থাকলে, রাত্রিকালে ভীতিব্যঞ্জক তীব্র আলোকরশ্মির উদ্ভব হলে, শত্রু কর্তৃক আশংকা দেখা দিলে অথবা অনুরূপ মারাত্মক কোন অবস্থা সৃষ্টি হলেও দুই রাকআত নামায আদায় করবে (তাবয়ীন)। বাদাই' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ নামায প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে পৃথক পৃথকভাবে আদায় করবে (আল্‌বাহ্‌রুর রাইক)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিস্‌কার নামাযের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে ইস্‌তিস্‌কার নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাত নয় (হিদায়া)। এর মধ্যে কোন খুতবা নেই। এ হচ্ছে দু'আ ও ইস্‌তিগফার। লোকেরা যদি পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই (যখীরা)। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে এর মধ্যে চাদর উল্টিয়ে পরার কোন বিধান নেই (তাবয়ীন)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে ইমাম এ নামাযের জন্য বের হয়ে মুসল্লীদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করবে এবং উভয় রাকআতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়বে (মুযমারাত)। উত্তম হল, প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং দ্বিতীয় রাকআতে هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ সূরা দুইটি পাঠ করা (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ)। নামাযান্তে ইমাম মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'টি খুতবা পাঠ করবে। যমীনের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করবে। মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে নয়। উভয় খুতবার মধ্যে একবার বসবে। ইমাম ইচ্ছা করলে এক খুতবাও পাঠ করতে পারবে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে ডাকবে, তাসবীহ–তাহ্‌লীল পাঠ করবে এবং মু'মিন নর–নারী সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। খুতবা পাঠের সময় নিজের কামানের উপর ভর করে দাঁড়াবে। খুতবার কিছু অংশ পাঠের পর স্বীয় চাদর উল্টিয়ে দিবে (মুযমারাত)। চাদর উল্টানোর নিয়ম হল, চাদর যদি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হয়, তবে এর উপরের অংশ নীচের দিকে এবং নীচের অংশ উপরের দিকে উল্টিয়ে দিবে। আর চাদর যদি গোলাকার হয়, তবে এর ডান অংশটি বামদিকে এবং বাম অংশটি ডান দিকে ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু ইমাম ব্যতীত উপস্থিত মুসল্লীদের কেউ চাদর উল্টাবে না। (কাফী, মুহীত ও আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২. মাসআলা ঃ "তুহ্‌ফা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, খুতবা শেষে ইমাম মুসল্লীদেরকে পেছনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর চাদর উল্টাবে। এরপর দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে থাকবে। মুসল্লীগণ খুতবা পাঠ ও দু'আ করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসে থাকবে। অতঃপর ইমাম আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতে থাকবে এবং মু'মিন নর–নারী সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। এ সময় মুসল্লীগণ তাওবা ও ইস্‌তিগ্‌ফার করতে থাকবে। দু'আ করার সময় ইমাম যদি উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে দু'আ করে, তবে ভাল। হাত না উঠিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করাও ভাল। ইমামের মত সমবেত মুসল্লীগণও হাত উঠিয়ে দু'আ করবে। কেননা, দু'আর সময় হস্ত উত্তোলন করে দু'আ করা সুন্নাত (মুযমারাত)।

৩. মাসআলা ঃ খুতবার সময় সকলে চুপ করে তা শুনবে (মুহীত)। মুস্তাহাব হল, ইমাম ইস্‌তিস্‌কার উদ্দেশ্যে তিন দিন একাধারে মুসল্লীদেরকে নিয়ে ময়দানে যাবে (যাদ)। তিন দিনের অধিক যাওয়ার কথা কোন কিতাবে উল্লেখ নেই। মাঠে মিম্বর নিয়ে যাবে না। মুসল্লীগণ পুরাতন

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাপড় অথবা ধৌত কাপড় অথবা তালি লাগানো কাপড় পরিধান করে পায়ে হেঁটে ময়দানে যাবে। সকলেই বিনয় ও নম্রতা এবং কাকুতি-মিনতির সাথে অবনত মস্তকে ময়দানে যাবে। প্রত্যহ ইস্তিস্কার নামাযে যাওয়ার আগে কিছু সাদাকা-খায়রাত করে ময়দানে যাবে (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ "তাজরীদ" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ইস্তিসকার নামায আদায় করার জন্য ইমাম যদি ময়দানে না যায়, তবে সে অন্য লোকদেরকে ময়দানে গিয়ে নামায আদায় করার হুকুম করবে। যদি লোকজন ইমামের হুকুম ছাড়াই নামায পড়ার জন্য ময়দানে চলে যায়, তবু জাইয হবে। ইস্তিস্কার নামায আদায় করার জন্য মুসলমানদের সাথে কোন যিম্মী লোক ময়দানে যেতে পারবে না (তাতারখানিয়্যা)। অবশ্য তারা যদি তাদের গির্জা বা ইবাদতখানা অথবা ময়দানে গিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে নিষেধ করা যাবে না (আয়নী ঃ হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ) যে স্থানে নদী-নালা, হাউয এবং এমন কূপ নেই, যা থেকে পানি পান করা যায় অথবা জানোয়ারকে পানি পান করানো যায় অথবা যমীনে পানি সিঞ্চন করা যায় অথবা এমন সামান্য পরিমাণ পানি আছে যা যথেষ্ট নয় এমন স্থানে ইস্তিস্কার নামায আদায় করা হবে। আর যে স্থানে নদী-নালা এবং কূপ আছে ঐ স্থানের লোকেরা ইস্তিস্কার নামায আদায় করার জন্য মাঠে-ময়দানে যাবে না। কেননা, চরম সংকটময় মুহূর্তেই এ নামায পড়া হয়ে থাকে (মুহীত)।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ভয়কালীন নামাযের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় এ নামায প্রচলিত ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এখনও ঐ হুকুম বাকী আছে। এটাই সহীহ্ মত (যাদ)। মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থায় (সমস্ত লোকজন যদি এক ইমামের পেছনে নামায আদায় করতে চায়, তখন) ইমাম উপস্থিত লোকদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে। অতঃপর একভাগ শত্রুর মোকাবিলায় থাকবে এবং অন্য ভাগ ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে (কুদূরী)। "মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থার" মানে হল, শত্রু এত নিকটে যে, শত্রু সেনারা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। এ মুহূর্তে মুসলমান সৈন্যরা যদি সকলেই নামাযে মশগুল হয়, তবে শত্রুরা তাদের উপর এখনই আক্রমণ করে বসবে (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২. মাসআলা ঃ কালো কিছু দেখার পর যদি একে শত্রুসেনা বলে মনে হয় এবং সালাতুল খাওফ আদায় করা হয় অতঃপর ধারণা যদি সত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ এ যদি বাস্তবিক ভাবেই শত্রুসেনা হয়ে থাকে, তবে আদায়কৃত নামায জাইয হবে। আর যদি ধারণা মিথ্যা হয়, তবে নামায জাইয হবে না। কিন্তু নিজেদের পালার নামায আদায় করার পর কাতার অতিক্রম করার পূর্বে যদি এতথ্যটি কোন দলের নিকট প্রকাশিত হয়, তবে তাদের নামায সহীহ্ হবে এবং নামাযের উপর অবশিষ্ট নামাযের "বিনা" করাও সহীহ্ হবে। এ কথাটি استحسان এর ভিত্তিতে প্রমাণিত (ফাতহুল কাদীর)। উপরোক্ত হুকুম মুসল্লীদের জন্য প্রযোজ্য হবে-ইমামের জন্য নয়। বরং ইমামের নামায সর্বাবস্থায়ই জাইয হবে। কেননা, নামায নষ্ট করার মত কোন কাজ তার থেকে পাওয়া যায়নি (আল্‌বাহ্‌রুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম ও মুসল্লী সকলেই যদি মুসাফির হয় (এবং মুসল্লীগণ যদি সকলেই এ ইমামের পেছনে নামায পড়তে আগ্রহী হয়) তবেই উক্ত নামায আদায় করা যাবে। যদি উপস্থিত সকল মুসল্লী এ ইমামের পেছনে নামায পড়ার জন্য বিবাদে লিপ্ত না হয়, তবে ইমামের জন্য উত্তম হল, উপস্থিত লোকদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে একদলকে বলবে, তারা যেন শত্রুর মোকাবিলায় চলে যায়। অতঃপর ইমাম সাহেব অন্য দলটি নিয়ে পূর্ণ নামায আদায় করবে। এরপর তিনি যারা শত্রুর মোকাবিলায় ছিল, তাদের কোন একজনকে বলবে, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে পূর্ণ নামায আদায় করে নেয়। আর যদি প্রত্যেকেই উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়ার জন্য ঝগড়া করে, তবে ইমাম উপস্থিত লোকদেরকে দুই দলে বিভক্ত করবে। একদল শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং অন্য দলকে নিয়ে সে এক রাকআত নামায আদায় করবে। এরপর এক রাকআত আদায়কারী দল গিয়ে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াবে এবং মোকাবিলায় দাঁড়ানো দল ইমামের নিকট চলে আসবে। ইমামের নিকট তাদের এসে পৌছা পর্যন্ত ইমাম তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতঃপর সে তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করবে। তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। কিন্তু মুসল্লীগণ সালাম ফিরাবে না। বরং তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর প্রথম দল নিজেদের নামাযের স্থানে এসে বাকী এক রাকআত নামায কিরাআত ব্যতীত আদায় করবে। এ এক রাকআত আদায় করার পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে সালাম ফিরাবে। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে। এরপর দ্বিতীয় দল পুনরায় নিজেদের নামাযের স্থানে এসে কিরাআতসহ বাকী এক রাকআত নামায আদায় করবে। যদি ইমাম-মুক্তাদী উভয়ই মুকীম হয় এবং নামায চার রাক'আত বিশিষ্ট হয়, তবে একদল শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াবে এবং অপর দল নিয়ে ইমাম দুই রাকআত নামায আদায় করে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। এরপর তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে আর যারা শত্রুর মোকবেলায় ছিল, তারা ইমামের নিকট আসবে। এ সময় ইমাম তাদের আগমনের অপেক্ষা করবে। তারা এসে পৌছলে সে তাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়বে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু দ্বিতীয় দলের মুসল্লীগণ সালাম ফিরাবে না। বরং তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর প্রথম দল এসে কিরাআত ছাড়া বাকী দুই রাকআত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। নামায শেষে তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল এসে নিজেদের বাকী দুই রাকআত নামায কিরাআতসহ আদায় করবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুকীম হয় এবং মুক্তাদী মুসাফির অথবা কিছু মুকীম এবং কিছু মুসাফির হয়, তবে সমস্ত লোক মুকীম হলে যে হুকুম হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ হুকুমই হবে। ইমাম যদি মুসাফির হয় এবং মুক্তাদী মুকীম, তবে সে প্রথম দল নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করবে। অতঃপর তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে। এরপর ইমাম দ্বিতীয় দল নিয়ে পুনরায় এক রাকআত নামায আদায় করবে। এরপর প্রথম দল নিজেদের নামাযের জায়গায় এসে কিরাআত ব্যতীত তিন রাকআত নামায আদায় করবে। কেননা, প্রথম হতেই তারা নামাযে শরীক ছিল। তাদের নামায পুরা হলে তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল তাদের নামাযের স্থানে এসে বাকী তিন রাকআত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পাঠ করবে। কেননা, তারা হচ্ছে মাসবূক। অবশ্য শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে না।

যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং কিছু মুসল্লী মুকীম ও কিছু মুসল্লী মুসাফির, তবে ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাকআত আদায় করবে। অতঃপর তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদের নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করবে, ইমামের পেছনে যারা মুসাফির ছিল তাদের এক রাকআত বাকী থাকল এবং যারা মুকীম ছিল, তাদের তিন রাকআত বাকী থাকল। এরপর দ্বিতীয় দলটি শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে এবং প্রথম দলটি ইমামের নিকট চলে আসবে। অতঃপর মুসাফির ব্যক্তি কিরাআত ছাড়া এক রাকআত নামায আদায় করবে। কেননা, প্রথম হতেই সে নামাযে শরীক ছিল। আর যারা মুকীম ছিল যাহিরুর রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে তারা কিরাআত ব্যতীত তিন রাকআত আদায় করবে। প্রথম দল

তাদের নামায শেষ করে শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল তাদের নামাযের স্থানে আসবে। যারা মুসাফির, তারা কিরাআতসহ এক রাকআত আদায় করবে। কেননা, তারা তো মাসবূক। আর যারা মুকীম, তারা তিন রাকআত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে হবে। কেননা, সে তো মাসবূক । আর শেষের দুই রাকআতে সকল বর্ণনা মতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। শত্রু সামনের দিক থাক বা পেছনের দিকে থাক এতে কোন ব্যবধান নেই (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি প্রথম দলের সাথে এক রাকআত আদায় করার পর তারা চলে যায়, অতঃপর দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকআত পড়ার পর তারাও যদি চলে যায় এরপর পুনরায় প্রথম দলের সাথে এক রাকআত আদায় করার পর তারা যদি চলে যায় অতঃপর দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকআত আদায় করার পর তারাও যদি চলে যায়, তবে সকলের নামাযই ফাসিদ হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে মূলনীতি হল, অসময়ে নামায হতে ফিরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। অবশ্য সময় মত নামায ছাড়লে নামায ভঙ্গ হয় না। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম যদি উপস্থিত লোকদেরকে চার ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকআত করে আদায় করে, তবে প্রথম ও তৃতীয় দলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ দলের নামায সহীহ্ হবে। যদি দ্বিতীয় দলের লোকেরা ফিরে আসে, তবে তারা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত কিরাআত ব্যতীত আদায় করবে এবং প্রথম রাকআত আদায় করবে কিরাআতসহ। তারপর চতুর্থ দল ফিরে এলে তারা কিরাআতের সাথে তিন রাকআত আদায় করবে । এক রাকআত সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলিয়ে পড়ে বসবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলিয়ে পড়বে। কিন্তু বসবে না। এরপর শুধু ফাতিহা দিয়ে এক রাকআত আদায় করবে। এরপর বসবে এবং সালাম ফিরাবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ এক দলের লোক যদি অন্য দলে প্রবেশ করে, তবে যে দলে প্রবেশ করা হয়েছে, তাদের যে হুকুম এ হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য নিজে যে দলে আছে, সে দলের নামায আদায় করার পর কেউ যদি অন্য দলে প্রবেশ করে, তবে তাদের হুকুম এক হবে না, ভিন্ন ভিন্ন হবে।

ইমাম প্রথম দল নিয়ে যুহরের দুই রাকআত নামায আদায় করার পর একজন ব্যতীত তারা যদি সকলে চলে যায়। অতঃপর সে যদি আরো তিন রাকআত আদায় করে নেয়, তবে তার নামায পুরা হয়ে যাবে। কেননা, যদিও সে দ্বিতীয় দলের সাথে শরীক হয়েছে, কিন্তু সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বরং সে নিজের যিম্মার নামায হতে ফারিগ হয়েছে মাত্র। সুতরাং তার নামায পুরা হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ মাগরিবের নামাযের মধ্যে ইমাম প্রথম দলের সাথে দুই রাকআত এবং দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকআত আদায় করবে। ভুলক্রমে ইমাম যদি প্রথম দলকে নিয়ে এক রাকআত আদায় করে, অতঃপর চলে যায় এবং পরে দ্বিতীয় দলকে নিয়ে দুই রাকআত আদায় করে, তবে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি প্রথম দলকে নিয়ে এক রাকআত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদায় করার পর তারা চলে যায়, এরপর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে এক রাকআত আদায় করার পর তারাও যদি চলে যায়, এরপর প্রথম দলকে নিয়ে যদি তৃতীয় রাকআত আদায় করা হয়, তবে প্রথম দলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় দলের নামায জাইয হবে। তারা আরো দুই রাকআত আদায় করে নিবে। প্রথম রাকআত কিরাআত ছাড়া আদায় করবে এবং দ্বিতীয় রাকআত কিরাআতসহ আদায় করবে। যদি ইমাম সাহেব মুসল্লীদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকআত করে আদায় করে, তবে প্রথম দলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের নামায সহীহ্ হবে। দ্বিতীয় দল আরো দুই রাকআত পড়ে নিবে এবং দ্বিতীয় রাকআত কিরাআত ব্যতীত পড়বে। আর তৃতীয় দল দুই রাকআত পড়বে কিরাআত সহ (আল্জাওহারাতুন্ নায়্যারা)।

৮. মাসআলা ঃ শত্রুর ভয় এবং হিংস্র প্রাণীর ভয় অর্থাৎ সকল প্রকার ভয়ের হুকুম একই। ভয়ের অবস্থায় নামায কসর পড়া যাবে না। কিন্তু নামাযে হাঁটা-চলা করা জাইয হবে (মুযমারাত)। নামাযের অবস্থায় শত্রুর সাথে লড়াই করা যাবে না। লড়াই করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, লড়াই করা নামাযের মধ্যকার কাজ নয়। অনুরূপভাবে ফেরার সময় কেউ যদি সওয়ারীতে আরোহণ করে, তবে তার নামাযও ফাসিদ হয়ে যাবে (আল্জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। এই ফেরা কিবলার দিক হতে শত্রুর দিকে হোক অথবা শত্রুর দিক হতে কিবলার দিক হোক, সবই সমান। সমুদ্রে সাঁতার কাটা অবস্থায় এবং পায়চারি করা অবস্থায় নামায পড়া যাবে না (মুযমারাত)। শত্রুর ভয়ে পায়ে হেঁটে পলায়ন করা অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হলে কোথাও থেমে নামায পড়া সম্ভব না হলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী এ সময় নামায পড়বে না। বরং পরে পড়বে। সালাতুল খওফে ভুল হলে সাহ্-সিজদা ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ শত্রুর ভয় চরম পর্যায়ের হলে লোকজন পৃথক পৃথকভাবে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নামায আদায় করবে, রুকূ-সিজদা ইশারা করে আদায় করবে এবং যদি কিবলার দিকে মুখ করা সম্ভব না হয়, তবে যে দিকে সম্ভব মুখ করে নামায আদায় করবে (হিদায়া)।

"শত্রুর ভয় চরম পর্যায়ের" হওয়ার মর্ম হল, সওয়ারী হতে অবতরণ করে নামায আদায়ে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত থাকা (আল্জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় জামাআতের নামাযে শরীক হওয়া জাইয নেই। কিন্তু ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ই যদি আরোহণ অবস্থায় থাকে, তবে এরূপ ইমামের পেছনে উপরোক্ত লোকদের ইকতেদা সহীহ্ হবে। ওযরের কারণে ইশারা করে নামায আদায় করার পর উক্ত ওযর ওয়াক্তের মধ্যে বা ওয়াক্তের বাইরে বিদূরিত হলে কোন অবস্থাতেই এ নামায পুনরায় দুহ্রিয়ে পড়া আবশ্যক হবে না। পায়দল চলা ব্যক্তি যদি রুকূ সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষম না হয়, তবে ইশারা করে নামায আদায় করবে। সওয়ারীতে আরোহণকারী ব্যক্তি যদি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে এ অবস্থায় সে নামায আদায় করবে না আর যদি শত্রু তার পেছনে ধাওয়া করে তবে এমতাবস্থায় সওয়ারীর উপর নামায পড়াতে কোন অসুবিধা নেই (মুহীত)। সওয়ারী হতে অবতরণ করে নামায

পড়তে সক্ষম ব্যক্তি সওয়ারীর উপর নামায আদায় করলে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (মুযমারাত)।

১০. মাসআলা ঃ নামায পড়া অবস্থায় যদি ভয়-ভীতি খতম হয়ে যায়, যেমন শত্রু চলে গেল। এমতাবস্থায় "সালাতুল খাওফ" পুরা করা আর জাইয হবে না। বরং অবশিষ্ট নামায শান্তভাবে যথানিয়মে আদায় করবে। দুশমন চলে যাওয়ার পর কেউ যদি কিবলার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অবশ্য শত্রু চলে যাওয়ার আগে নামাযের উদ্দেশ্যে মুখ ফিরালে (এতে নামায ফাসিদ হবে না) এ নামাযের উপর বাকী নামাযের "বিনা" করা সহীহ্ হবে (তাতারখানিয়্যা)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) "যিয়াদাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যুহরের নামাযে ইমাম যদি মুকীম মুসল্লীদেরকে নিয়ে "সালাতুল খাওফ" আদায় করে এবং এক দলকে নিয়ে দুই রাকআত আদায় করার পর একজন ব্যতীত তারা সকলে চলে যায়, তবে ঐ ব্যক্তির নামায ফাসিদ হবে না। কিন্তু এরূপ করা ভাল নয়। যদি ইমামের সাথে তৃতীয় রাকআত আদায় করার পর সে জানতে পারে যে, সে ঠিক করেনি, তাই তৃতীয় রাকআতের পর অথবা চতুর্থ রাকআতে ইমামের তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার আগে সে যদি চলে যায়, তাহলে তার নামায পরিপূর্ণ হবে।

ইমাম যদি মুসাফির মুসল্লীদেরকে নিয়ে যুহরের নামায আরম্ভ করে এবং এক রাকআত আদায় করার পর হঠাৎ শত্রু এসে যায় এমতাবস্থায় একদল মুসল্লী যদি শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং একদল ইমামের সাথে থেকে নিজেদের নামায পুরা করে, তবে তাদের নামায পরিপূর্ণ হবে। যে দল ইমামের সাথে থেকে নামায পুরা করেছে, তাদের নামায পুরা হওয়া তো প্রকাশ্য কথা ও স্বাভাবিক ব্যাপার। আর যে দল নামায ছেড়ে দিয়ে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল, তাদের নামায এজন্য হয়ে যাবে যে, তারা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই এরূপ করেছে। সুতরাং তাদের নামাযও হয়ে যাবে।

আর ইমাম যদি মুকীম লোকদেরকে নিয়ে যুহরের নামায আরম্ভ করে, অতঃপর শত্রু এসে যায়। এমতাবস্থায় ইমাম দুই রাকআত আদায় করার পর একদল মুসল্লী যদি নামায ছেড়ে শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবে তাদের নামায ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি এক রাকআত আদায় করার পর একদল মুসল্লী নামায ছেড়ে শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবে তাদের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

যুহরের নামায তিন রাকআত আদায় করার পর যদি শত্রু এসে যায় এবং একদল মুসল্লী নামায ছেড়ে যদি শত্রুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে তাদের হুকুম কি হবে? এ মাসআলার বিবরণ কিতাবে উল্লেখ নেই। বরং এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্র মতে তাদের নামায ফাসিদ হবে না। কেননা, নামাযের এক অংশ আদায় করার পর হতে ইমামের নামায শেষ করা পর্যন্ত সময়টি হল, প্রথম দলের লোকদের নামায ছেড়ে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানোর সময়। তাই তাদের নামায ছেড়ে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে তাদের নামায ফাসিদ হবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ জুমুআ এবং দুই ঈদের নামাযের মধ্যেও "সালাতুল খাওফ" আদায় করা জ াইয (সিরাজিয়্যা)। ঈদের দিন শহরে ইমাম যদি শত্রুর কবলে পতিত হয় এবং তিনি যদি লোকদেরকে নিয়ে "সালাতুল খাওফ" আদায় করতে চান, তবে ইমাম লোকদেরকে দুই দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকআত করে নামায আদায় করবেন। ইমাম যদি হযরত' ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মতের অনুসারী হন, তবে প্রথম দল প্রথম রাকআতে ইমামের অনুসরণ করবে এবং দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাকআতে ইমামের অনুসরণ করবে। যদি উভয় দলের মাযহাব ঈদের নামাযের ব্যাপারে ইমামের মাযহাবের বিপরীত হয়, তথাপি এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি ইমামের মাযহাব ভুল হয় এবং সাহাবাদের কেউ এরূপ মতামত ব্যক্ত না করে থাকেন, তবে এ ইমামের অনুসরণ করা যাবে না।

ইমাম যখন নামায হতে ফারিগ হবেন এবং দ্বিতীয় দল শত্রুর মোকাবিলায় ফিরে যাবে আর প্রথম দল নিজেদের নামাযের স্থানে আসবে, তখন তারা তাদের অবশিষ্ট এক রাকআত নামায কিরাআত ব্যতীত আদায় করবে এবং তারা ইমামের কিরাআতের সমপরিমাণ সময় অথবা এর থেকে কিছু কম বা বেশী সময় দাঁড়ানোর পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। যেমন ইমাম করেছে। নামায শেষ হলে তারা শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল আবার নিজেদের নামাযের স্থানে চলে আসবে। অতঃপর তারা তাদের বাকী প্রথম রাকআত কিরাআতসহ আদায় করবে। প্রথমে কিরাআত পড়বে এরপর অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। "যিয়াদাত", জামি', 'আস্-সিয়ারুল কবীর এবং নাওয়াদিরের দুই বর্ণনার এক বর্ণনায় অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। ইসতিহ্‌সান তথা قياس خفى এর মর্মও তাই (মুহীত)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ জানাযা নামাযের বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তি সম্পর্কীয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ডান কাত করে শোয়ায়ে কিবলামুখী করে দিবে। এরূপ করা সুন্নাত (হিদায়া)। কষ্ট না হলে এরূপ করবে। কিন্তু কষ্ট হলে নিজ অবস্থায় রেখে দিবে (যাহিদী)। মরণাপন্ন হওয়ার নিদর্শন হল, উভয় পা এমনভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া যে, এতে ভর করে দাঁড়ানো সম্ভব হয় না। নাক বাঁকা হয়ে যাওয়া, কানপট্টিদ্বয় ভেঙ্গে পড়া এবং গায়ের চামড়া ঢিলা বা শিথিল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি (তাবয়ীন)। মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া এবং তাতে কোনরূপ নম্রতা অনুভূত না হওয়া (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২. মাসআলা ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করবে। তালকীনের নিয়ম হল ঃ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হওয়ার পূর্বে খিঁচুনী শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার নিকট বসে উচ্চস্বরে যাতে সে শুনতে পায় এরূপ কালেমায়ে শাহাদাত اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল) পাঠ করা। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা পড়তে বলবে না এবং কালেমা পড়ার জন্য তাকে তাকীদও করবে না। কেননা, এরূপ করলে সে বিরক্তির সাথে অস্বীকৃতিও প্রকাশ করতে পারে। একবার কালেমা পাঠ করার পর পুনরায় তাকে পাঠ করানোর জন্য চেষ্টা করবে না। কিন্তু একবার কালেমা পাঠ করার পর যদি সে অন্য কোন কথা বলে ফেলে, তবে পুনরায় তাকে তালকীন করবে[১] (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। ইমামগণের ঐকমত্যে এ সময় তালকীন করা মুস্তাহাব। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে মৃত্যুর পর তালকীন করার কোন নিয়ম আমাদের মাযহাবে নেই (আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া ও মি'রাজুদ দিরায়া)। মৃত্যু ও দাফন করা উভয় অবস্থায় আমরা কলেমায়ে শাহাদাতের তালকীনের উপর আমল করে থাকি (মুযমারাত)।

৩. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হয়েছে এরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তি দ্বারা তালকীন না করানোই শ্রেয়। তালকীনকারী ব্যক্তিকে এমন হতে হবে যে, মরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি সুধারণা পোষণ করে (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)। ফকীহ্‌গণ বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি এমন কথা বলে যার ফলে কুফরী অপরিহার্য হয়, তথাপি তার উপর কুফরীর ফাতওয়া দিবে না। বরং একজন মুসলমান মৃতের ন্যায় তার সাথে ব্যবহার করতে হবে (ফাতহুল কাদীর)। মৃত্যুর সময় পুণ্যবান নেককার লোকদের নিকটে উপস্থিত থাকা উত্তম। এ সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বসে সূরা ইয়াসীন

১. যাতে তার জীবনের শেষ কথা কালেমায়ে শাহাদাত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব (শরহ মুনিয়াতুল মুসাল্লী ঃ ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ)। মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট সুগন্ধি রাখা মুস্তাহাব (যাহিদী)। মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট হায়েযা ও জুনুবী ব্যক্তির উপস্থিত থাকাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার থুতনিদ্বয় বেঁধে দিবে এবং তার চক্ষু বন্ধ করে দিবে। এ কাজ এমন ব্যক্তি করবে যে মৃত ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, পরম স্নেহের পাত্র এবং একান্ত হিতাকাংক্ষী আর ধীরস্থিরভাবে দয়া ও মমতার সাথে এ কাজগুলো সম্পাদন করবে। একটি চওড়া পট্টি দ্বারা মৃত ব্যক্তির থুতনি বেঁধে দিবে এবং মাথার উপর নিয়ে তা গিরা দিয়ে দিবে (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)।

যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করবে, সে পড়বে ;

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَابَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিল্লাতের উপর আমি তার চক্ষু বন্ধ করছি। হে আল্লাহ্! আপনি তার বিষয়টিকে সহজ করে দিন, তার পরবর্তী জীবনকে আরামদায়ক শান্তিময় করে দিন, আপনার দীদারের দ্বারা তাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন এবং তার পদার্পণকৃত জগতকে ফেলে আসা জগতের তুলনায় আরো কল্যাণময় করে দিন (তাবয়ীন)। তারপর শরীরের জোড়াগুলো নরম করে দিবে, উভয় বাহু বাজুর সাথে মিলিয়ে দিয়ে তা পূর্ণাঙ্গভাবে সোজা-সটান করে দিবে, হাতের আঙ্গুলগুলো হাতের তালুর দিকে মুড়িয়ে দিয়ে সোজা করে দিবে এবং উরু পেটের দিকে ও পায়ের নলা উরুর দিকে টেনে এনে তা সোজা করে দিবে (আলজাওহারাতুন নায়্যারা)।

৫. মাসআলা ঃ যে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় কারো মৃত্যু হয় ঐ কাপড় খুলে অন্য কাপড় পরিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। আরো মুস্তাহাব হল, মৃত ব্যক্তিতে একটি বড় কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া এবং তাকে উঁচু জায়গায় কোন তখতী বা খাটের উপর রাখা যেন মাটির উষ্ণতায় মৃত ব্যক্তির দেহের গন্ধে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে। তারপর মৃত ব্যক্তির পেটের উপর কোন লোহাখণ্ড অথবা ভিজা মাটি রেখে দিবে। তাহলে তার পেট ফুলে উঠতে পারবে না (আসসিরাজুল ওয়াহহাজ)। মুস্তাহাব হল, মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী এবং তার বন্ধু-বান্ধবদেরকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া, যাতে তারা তার জানাযার নামায আদায় করে এবং দু'আ করে তার হক আদায় করতে পারে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। মৃত্যু সংবাদ বাজারে ঘোষণা করাকে কেউ কেউ মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতানুসারে এতে কোন দোষ নেই (মুহীত ঃ সুরুখসী)। মুস্তাহাব হল, মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হলে তা বিলম্ব না করে ত্বরিত ভাবে আদায় করে দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করে দেয়া এবং ত্বরিতভাবে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা। বিলম্ব না করা। যদি কেউ আকস্মিকভাবে

মারা যায়, তবে তার মওতের ব্যাপারে মানুষের ইয়াকীন হওয়া পর্যন্ত দাফন-কাফনে বিলম্ব করবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৬. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল না দেয়া পর্যন্ত তার নিকটে বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মাকরূহ (তাবয়ীন)। যদি কোন মহিলা মারা যায় এবং দেখা যায় যে, তার পেটের ভিতর বাচ্চা নড়াচড়া করছে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার পেট কেটে বাচ্চা বের করা হবে। কেননা, এ ছাড়া কোন উপায় নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া জীবিত মানুষের উপর ওয়াজিব। এ বিষয়টি হাদীছ এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত (নিহায়া)। কিছু লোক এই কাজ সমাধা করলে তা অন্য লোকের দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যায় (কাফী)। কেবলমাত্র একবার ধৌত করা ওয়াজিব। একাধিকবার ধৌত করানো সুন্নাত। সুতরাং যদি একবার ধৌত করানো হয় অথবা প্রবাহিত পানিতে একবার ডুবিয়ে দেয়া হয়, তবু জাইয আছে। (বাদাই')। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর সময় তার পরিধানের কাপড় সরিয়ে নিবে। এটাই আমাদের মাযহাব[১]। (যহীরিয়া)। মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখার পূর্বে খাটিয়াটি বে-জোড় সংখ্যক বার সুগন্ধি দ্বারা ধুনি দিবে। এর নিয়ম হল এই যে, খাটিয়ার চতুষ্পার্শে সুগন্ধি দ্রব্য একবার, তিনবার অথবা পাঁচবার ধুনি দিবে। এর বেশী করবে না। (তাবয়ীন, আয়নী ঃ কান্‌য-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।

২. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখার তরীকা হল ঃ কোন কোন ফকীহ্‌র মতে, তাকে এমন ভাবে লম্বা করে চিৎ অবস্থায় শয়ন করাবে যেমন রোগের অবস্থায় ইশারায় নামায পড়ার জন্য চিৎ করে শোয়ায়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন, তাকে যেভাবে কবরে রাখা হয়, ঐভাবে রাখবে। এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধতম মত হল, যেভাবে রাখা সহজ এবং সম্ভব ঐভাবেই রাখবে (যহীরিয়া)। যে স্থানে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হবে ঐ স্থানটি কাপড় দ্বারা আবৃত করে নেওয়া মুস্তাহাব। যাতে গোসলদাতা এবং তার সহযোগী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তাকে দেখতে না পারে (আসসিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। মৃত ব্যক্তির নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিবে। (মুহীত ঃ সুরুখসী)। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)। যাহিরী মাযহাব হল ঃ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করে নিবে। উভয় উরু আবৃত করা আবশ্যক নয় (খুলাসা)। এটাই সহীহ্ মত (হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে গোসলের সময় ইস্‌তিন্‌জা করিয়ে নিবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। ইস্‌তিন্‌জার নিয়ম হল ঃ গোসলদাতা ব্যক্তি তার উভয় হাতে কাপড় পেঁচিয়ে নিবে, এরপর তার মলদ্বার ধুয়ে দিবে। কেননা, সতর দেখা যেমন হারাম, তেমনি তা স্পর্শ করাও হারাম (আল্‌জাওহারাতুন নায়্যারা)। গোসল করানোর সময় পুরুষ ব্যক্তি পুরুষ ব্যক্তির উরুর প্রতি নযর করবে না। এমনি ভাবে মহিলা মহিলার উরুর প্রতি নযর করবে না (তাতারখানিয়া)। তারপর নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করাবে। কিন্তু মৃত যদি এমন বাচ্চা হয় যে,

১. মৃত্যুর সময় পরিহিত কাপড় সরিয়ে তদস্থলে অন্য পাক চাদর ইত্যাদি দিয়ে আবৃত করে নেবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামায পড়ত না, তবে তাকে উযূ করানো হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। প্রথমে মুখমণ্ডল ধোয়াবে। হাতদ্বয় নয় (মুহীত)। ডান দিক থেকে উযূ করাবে। যেমন সে জীবিত অবস্থায় উযূ করলে ডান দিক থেকে শুরু করত। উযূ করানোর সময় মৃত ব্যক্তিকে কুলি করাবে না এবং তার নাকেও পানি দিবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন কোন আলিম বলেন, গোসলদাতা ব্যক্তি তার হাতে চিকন কাপড় পেঁচিয়ে তা মৃত ব্যক্তির মুখে ঢুকাবে এবং তা দ্বারা তার দাঁত, ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি ও জিহবার তালু পরিষ্কার করে দিবে। এমনিভাবে আঙ্গুল নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়ে নাকের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করবে (যহীরিয়্যা)। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, বর্তমানকালে মানুষ অনুরূপ আমলই করে থাকেন। মাথা মাসেহ্ করানোর ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে মাথা মাসেহ্ করানো হবে। পা দু'খানি ধুইতে বিলম্ব করবে না (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবে গরম পানি দ্বারা গোসল করানো উত্তম (মুহীত)। পানি বরই পাতা অথবা উশনান পাতা দ্বারা গরম করবে। যদি ঐ পাতা পাওয়া না যায়, তবে বিশুদ্ধ পানিই যথেষ্ট হবে (হিদায়া)। মাথা এবং দাড়ি খিতমী দ্বারা ধুইবে। খিতমী না পাওয়া গেলে সাবান ইত্যাদি দ্বারাও ধুইতে পারবে। কেননা, সাবানের দ্বারাও এই কাজ হয়ে থাকে। মাথায় চুল থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা, জীবিত অবস্থায়ও সে এরূপ করত (তাবয়ীন)। এসব কিছু না পাওয়া গেলে বিশুদ্ধ পানিই যথেষ্ট হবে (শরহুত তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ এরপর মৃত ব্যক্তিকে বাম কাত করে শোয়াবে এবং বরই পাতা দ্বারা গরমকৃত পানি দিয়ে তার শরীরের ডান দিক ধুইয়ে দিবে। পানি এমনভাবে ঢালবে যেন ধারণা হয় যে পানি তার শরীরের সর্বস্থানে পৌঁছে গেছে, যা খাটিয়ার সাথে মিলানো আছে। তারপর তাকে ডান কাত করে শোয়াবে এবং বরই পাতা দ্বারা গরমকৃত পানি দিয়ে তার শরীরের বাঁ দিক ধুইয়ে দিবে। পানি এমনভাবে ঢালবে যেন মনে হয় যে, পানি তার শরীরের সর্বস্থানে পৌঁছে গেছে যা খাটিয়ার সাথে মিলানো আছে। কেননা, ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা সুন্নাত। তারপর তাকে গোসলদাতার গায়ের সাথে হেলান দিয়ে বসাবে এবং হালকাভাবে তার পেট মর্দন করবে। যেন নাপাকী থাকলে তা বের হয়ে যায় যাতে কাফনের কাপড় নাপাক না হয়। এ মর্দনের কারণে কোন কিছু বের হলে তা ধুয়ে ফেলবে। পুনরায় গোসল করানোর প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ভাবে পুনরায় উযূ করানোও আবশ্যক হবে না। তারপর মৃত ব্যক্তির শরীরটি কোন কাপড় দ্বারা মুছে নিবে যাতে তার কাফনের কাপড়টি ভিজে না যায়। মৃত ব্যক্তির মাথার চুল এবং দাড়ি চিরুনি করবে না, এবং তার নখ ও মাথার চুল কাটতেও হবে না (হিদায়া)। মৃত ব্যক্তির গোঁফ কাটবে না, বগল এবং নাভির নীচের পশম কাটতে, মুণ্ডাতে অথবা উপড়াতে হবে না। বরং যেভাবে আছে ঐভাবেই দাফন করে দিবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। ভাংগা নখ কেটে ফেলাতে কোন দোষ নেই (মুহীত)। মুখমণ্ডলের উপর তুলা রেখে দেওয়া এবং মুখ গহবর, কানের ছিদ্র ও পেশাব-পায়খানার ছিদ্রে তুলা এটে দেওয়াতেও কোন দোষ নেই (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ মৃতের লাশ পানিতে পাওয়া গেলে তাকেও গোসল দিতে হবে। কেননা, জীবিত মানুষের প্রতি গোসল দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর এ কাজের বাস্তবায়ন তাদের

থেকে পাওয়া যায়নি। অবশ্য পানি থেকে উঠানোর সময় গোসলের নিয়তে নাড়াচাড়া দিয়ে নিলে তাতে গোসল হয়ে যাবে (তজনীস, বাদাই', মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি লাশ এমনভাবে ফুলে যায় যা স্পর্শ করা না যায়, তবে তার শরীরের উপর পানি ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে (তাতারখানিয়া ঃ ইতারিয়ার সূত্রে)। গোসলের বিষয়ে মহিলাদের হুকুমও পুরুষ মানুষের মতই। তবে তাদের চুল পিঠের উপর রেখে দিবে না। (বরং চুল দুই ভাগ করে বুকের উপর রাখবে।) (তাতারখানিয়া ঃ শরহুত তাহাবীর সূত্রে)।

৭. মাসআলা ঃ জন্মের পর কোন বাচ্চা যদি আওয়াজ করে, তবে তার নাম রাখবে, গোসল দিবে এবং তার জানাযার নামায পড়বে। আর যদি বাচ্চা জন্মের পর কোন আওয়ায না করে এবং এ অবস্থায় মারা যায়, তবে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে তাকে দাফন করে দিবে। তার জন্য জানাযার নামায পড়তে হবে না। যাহিরী রিওয়ায়েত ছাড়া অন্য রিওয়ায়ে মতে তাকেও গোসল করানো হবে। এটাই পসন্দনীয় মত (হিদায়া)। কিতাবে যে استهلال (আওয়ায করা)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর মানে হল, আওয়ায বা নড়াচড়া করা, যার দ্বারা বাচ্চা জীবিত আছে বলে বুঝা যায়। যদি দাই বা সন্তানের মা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, জন্মের পর বাচ্চা আওয়ায করেছে তবে নামায জাইয হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (মুযমারাত)। যদি গর্ভপাত ঘটে এবং বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পূর্ণ না হয়, তবে সকল বর্ণনা মতে তার জানাযার নামায পড়া হবে না। পসন্দনীয় মতানুসারে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং কোন কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ যদি মৃত লাশের মাথার সাথে অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশীর ভাগ শরীর পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাযার নামাযও পড়া হবে (মুযমারাত)। অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশির ভাগ অংশের উপর জানাযার নামায পড়ার পর বাকী অংশ পাওয়া গেলে তার উপর আর জানাযা পড়তে হবে না (ঈযাহ)। যদি মাথাহীন অবস্থায় অর্ধেক শরীর পাওয়া যায় অথবা যদি অর্ধেক শরীর লম্বাভাবে চিরা থাকে, তবে তাকে গোসল দিতে হবে না এবং তার উপর জানাযার নামাযও পড়তে হবে না। বরং একে কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে (মুযমারাত)। লাশটি মুসলমানের না কাফিরের একথা যদি জানা না থাকে, তবে তার শরীরে যদি মুসলমান হওয়ার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় অথবা যদি তাকে কোন মুসলমান দেশে পাওয়া যায় তাহলে তাকে গোসল দেওয়া হবে। অন্যথায় গোসল দেওয়া হবে না (মি'রাজুদ দিরায়া)।

৯. মাসআলা ঃ যদি মুসলমানের মৃত লাশ কাফিরের মৃত লাশের সাথে অথবা যদি মুসলমান ও কাফিরের নিহত লাশ একত্রে মিলিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে যদি কোন চিহ্ন দ্বারা মুসলমানের লাশ শনাক্ত করা যায়, তবে তার উপর জানাযার নামায আদায় করা হবে। মুসলমানের আলামত বা নিদর্শন হল খতনা, দাড়ির খেযাব, কালো কাপড় পরিহিত থাকা ইত্যাদি। এরূপ নিদর্শন পাওয়া গেলে তার জানাযার নামায পড়া হবে। আর নিদর্শন না থাকলে লাশের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হলে সকলের উপরই জানাযার নামায পড়া হবে। নামায আদায়ের সময় মুসলমানদের জন্য দু'আর নিয়্যাত করবে এবং তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি মুশরিকদের সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে কারো জানাযার নামাযই পড়া হবে না। তবে তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে এবং কাফনও পরানো হবে। কিন্তু এ গোসল ও কাফন মুসলমানদের গোসল এবং কাফনের অনুরূপ হবে না। আর তাদেরকে মুশরিকদের কবরস্তানে সমাধিস্থ করা হবে। যদি মুসলমান এবং কাফিরের সংখ্যা সমান সমান হয়, তবে এ অবস্থায়ও তাদের কারো জানাযা পড়া হবে না। দাফন করা হবে কিনা? এ বিষয়ে মাশায়িখে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে মুশরিকদের কবরস্তানে সমাধিস্থ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন করা হবে। আর কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তাদের জন্য ভিন্ন কবরস্তান তৈরী করা হবে (মুযমারাত)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন শিশুকে তার মাতা-পিতা কোন একজনের সাথে বন্দী করে আনা হয় অথবা তাদের পরবর্তীতে বন্দী করে আনা হয়, তারপর সে মারা যায়, তাহলে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কিন্তু যদি সে ভাল-মন্দ বুঝতে সক্ষম হয় এবং ইসলামের কথা স্বীকার করে থাকে অথবা তার পিতা-মাতার কেউ যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করানো হবে। অবশ্য দাদা-দাদী মুসলমান হলে তাদের নাতী-নাতনীর কি হুকুম হবে এ সম্বন্ধে ফকীহ্-গণের মতভেদ রয়েছে। যদি কোন নাবালিগ শিশুকে একা বন্দী করে আনা হয়, তারপর সে মারা যায়, তবে তাকে গোসল করানো হবে এবং তার জন্য জানাযার নামাযও পড়া হবে (যাহিদী)। কোন ব্যক্তি যদি নৌকায় মারা যায়। তবে তাকে গোসল করাবে এবং কাফন পরাবে (মুযমারাত)। তারপর জানাযার নামায পড়বে এবং কোন ভারী বস্তু তার শরীরে বেঁধে তাকে নদীতে ফেলে দিবে (মি'রাজুদ দিরায়া)।

১১. মাসআলা ঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাহাজানির কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদেরকে গোসল করানো হবে না এবং তাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হবে না। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, লড়াই অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পূর্বে তারা নিহত হলে তাদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের বিজয়ের পর তারা নিহত হলে তাদেরকে গোসল করানো হবে এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়া হবে। এটিই উত্তম মত। বড় বড় মাশায়িখে কেরাম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। যে ব্যক্তি লোকদেরকে গলা টিপে হত্যা করে, সে মারা গেলে তাকে গোসল করাবে না এবং তার জানাযার নামাযও পড়াবে না। আমাদের মাশায়িখে কেরাম গোত্রীয় দাঙ্গায় নিহত লোকদেরকে বিদ্রোহীদের অনুরূপ বলে হুকুম প্রদান করেছেন (মুহীতঃ সুরুখসী)। যারা শহরে রাতের বেলায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুটতরাজ করে, তারাও ডাকাতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (যখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ গোসলদাতা ব্যক্তির জন্য বাঞ্ছনীয় হল, পাক-পবিত্র অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) গোসলদাতা ব্যক্তি যদি জুনুবী, ঋতুমতী অথবা কাফির হয়, তবে জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে (মি'রাজুদ দিরায়া)। গোসলদাতা ব্যক্তি উযূহীন হলে কারো মতেই মাকরূহ্ হবে না (কিনয়া)। যারা মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তারা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাব এটাই হল মুস্তাহাব। তারা গোসল করাতে না জানলে আমানতদার পরহিযগার ব্যক্তি

তাকে গোসল করাবে (যাহিদী)। মুস্তাহাব হল, কোন আস্থাবান ব্যক্তি গোসল করাবে-যে পূর্ণাঙ্গ ভাবে গোসল করাতে সক্ষম। গোসলের অবস্থায় কোন খারাপ কিছু পরিলক্ষিত হলে তা গোপন রাখবে এবং ভাল কিছু দেখলে তা প্রকাশ করবে। অতএব, পসন্দনীয় কোন ভাল লক্ষণ দেখা গেলে যেমন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হওয়া, সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হওয়া ইত্যাদি, তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা মুস্তাহাব। আর যদি অপসন্দনীয় কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়, যেমন মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যাওয়া, দুর্গন্ধ বের হওয়া, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়া ইত্যাদি, তবে তা কারো নিকট প্রকাশ করা জাইয নেই (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। অবশ্য মৃত ব্যক্তি বিদআতী হলে অর্থাৎ সে যদি এমন মানুষ হয় যে, প্রকাশ্যে বিদআত করে বেড়াত, এরূপ ব্যক্তির থেকে অপসন্দনীয় কোন অবস্থা পরিলক্ষিত হলে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই। এতে মানুষ বিদ'আত সম্পর্কে সতর্ক হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ মুস্তাহাব হল, গোসলদাতা ব্যক্তির নিকটে সুগন্ধির কোন পাত্র থাকা যেন মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কোন দুর্গন্ধ বের হওয়ার কারণে গোসলদাতা এবং তাকে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ না হয়ে পড়ে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। উত্তম হল, কোনরূপ পারিশ্রমিক ছাড়াই মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো। গোসলদাতা যদি এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক চায় এবং সেখানে অন্য গোসলদাতা উপস্থিত থাকলে পারিশ্রমিক নেওয়া জাইয হবে। অন্যথায় জাইয হবে না (যহীরিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে গোসল দিবে। পুরুষ মহিলাকে এবং মহিলা পুরুষকে গোসল করাবে না। যদি মৃত ব্যক্তি এমন বালক হয় যার প্রতি কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না, তাকে মহিলাও গোসল করাতে পারবে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তি যদি এমন কম বয়স্ক না-বালিগা কন্যা হয়, যার প্রতি কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না, তবে পুরুষ ব্যক্তিও তাকে গোসল করাতে পারবে। এ ক্ষেত্রে জননেন্দ্রিয় এবং অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তিও পুরুষের মধ্যে শামিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি এমন কোন কাজ না করে যার ফলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, যেমন স্বামীর পুত্র বা পিতাকে চুম্বন করা, তাহলে সে তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে গোসল করাতে পারবে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ঐ জাতীয় কোন কাজ করে থাকলে সে তার স্বামীকে গোসল করাতে পারবে না। আর আমাদের মাযহাব অনুসারে স্বামী তার স্ত্রীকে কোন অবস্থাতেই গোসল করানো জাইয নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৫. মাসআলা ঃ কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে রাজঈ তালাক দেয় এবং স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে সে যদি মারা যায়, তাহলে স্ত্রী তাকে গোসল করাতে পারবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি ইদ্দতের শেষ প্রান্তে কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে মারা যায় এবং তার মারা যাওয়ার পর ইদ্দত খতম হয় এ অবস্থায়ও স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাতে পারে। এরূপ না হলে পারবে না (শরহুত তাহাবী)। এ সম্বন্ধে মূলনীতি হল ঃ জীবিত থাকলে বিবাহের ভিত্তিতে যে মহিলার সাথে সহবাস তার জন্য বৈধ ঐ মহিলার জন্য জাইয আছে, তার ঐ স্বামীকে গোসল করানো। আর যার সাথে সহবাস বৈধ নয়, তার জন্য তার স্বামীকে গোসল করানোও বৈধ নয় (তাতারখানিয়্যা ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইত্তাবিয়্যার সূত্রে) ইয়াহূদী ও খৃষ্টান স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলার মতই। তবে এ জাতীয় মহিলা কর্তৃক তার মুসলিম স্বামীকে গোসল করানো ভাল নয় (যাহিদী)। পুরুষ ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে গোসল করায় এবং সে যদি তার মাহরাম হয়, তাহলে সে হাত দ্বারা তাকে স্পর্শ করতে পারবে। আর যদি মাহরাম না হয়, তবে হাতে কাপড় পেঁচিয়ে তাকে গোসল করাবে এবং তার বাহুতে নজর পড়ার সময় চোখ বন্ধ করে নিবে। পুরুষ তার স্ত্রীকে গোসল করানোর সময়ও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে চোখ বন্ধ করতে হবে না। এ পর্যায়ে যুবতী ও বৃদ্ধ মহিলার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন পুরুষ ব্যক্তি যদি মহিলাদের মধ্যে মারা যায়, তবে তার মাহরাম মহিলা, তার স্ত্রী অথবা বাঁদী হাতে কাপড় পেঁচানো ছাড়াই তাকে তায়াম্মুম করাবে। আর অন্য মহিলাগণ হাতে কাপড় পেঁচিয়ে তাকে তায়াম্মুম করাবে (মি'রাজুদ দিরায়া)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি সফর অবস্থায় মারা যায় এবং তার সাথে কতিপয় মুসলিম মহিলা এবং একজন কাফির পুরুষ থাকে, তবে মহিলাগণ পুরুষ কাফির লোকটিকে গোসলের তরীকা শিখিয়ে নিজেরা দূরে সরে যাবে। তারপর সে তাকে গোসল করাবে। আর যদি তাদের সাথে কোন পুরুষ লোক না থাকে, কেবল এমন বয়সের একজন বালিকা থাকে যার প্রতি কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না এবং সে মৃত লোকটিকে গোসল করাতে সক্ষম, তাহলে তারা তাকে গোসল শিক্ষা দিয়ে দূরে সরে যাবে এবং সে তাকে গোসল করাবে। যদি কোন মহিলা সফরের অবস্থায় মারা যায় এবং তার সাথে কোন কাফির মহিলা অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক থাকে। যার মধ্যে এখনো কামভাব সৃষ্টি হয়নি, তবে এ ক্ষেত্রেও ঐরূপ আমল করবে, যেরূপ পুরুষের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে (মুযমারাত)। নপুংসক যে বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পদার্পণ করেছে, সে পুরুষ-মহিলা কাউকেই গোসল করাবে না এবং সে মারা গেলে পুরুষ বা মহিলাদের কেউ তাকে গোসল করাবে না। বরং হাতে কাপড় পেচিয়ে তাকে তায়াম্মুম করাবে (যাহিদী)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কোন কাফির মারা যায় এবং তার ওলী মুসলমান হয়, তবে সে তাকে গোসল করাবে এবং দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে। তাকে এমন ভাবে গোসল করাবে যেমন কোন নাপাকীযুক্ত কাপড় ধৌত করা হয়। তারপর তাকে কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে একটি গর্ত খনন করে তাতে ফেলে দিবে। কাফন-দাফনের সুন্নাত তরীকা মত তাকে দাফন-কাফন করবে না। আর তাকে কবরে সুন্নাত তরীকা মত রাখবেও না। বরং গর্তে ফেলে দিবে (হিদায়া)। কাফির পিতার যদি মুসলমান ছেলে মারা যায় তবে পিতাকে তার ছেলের গোসলের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করবে না। বরং মুসলমানগণ এই নেক কাজ সমাধা করবে (নিহায়া ঃ জানাযা নামায অনুচ্ছেদ)। কোন ব্যক্তি যদি সফরের অবস্থায় মারা যায় এবং সেখানে কোন প্রকার পাক পানি না থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করিয়ে তার জানাযা পড়বে (মুহীত), কেউ যদি এমন স্থানে মারা যায়, যেখানে পানি নেই, তবে তাকে তায়াম্মুম করাবে এবং তার জানাযা পড়বে। জানাযার পর পানি পাওয়া গেলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গোসল করিয়ে পুনরায় তার জানাযা পড়বে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফনের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানো ফরযে কিফায়া (ফাতহুল কাদীর)। পুরুষের সুন্নাত কাফন তিনটি। ১. ইযার, ২. কামীস ও ৩. লেফাফা (চাদর)। পুরুষের কাফনে কিফায়েত[১] হল ১. ইযার ২. লেফাফা। আর কাফনে যরুরত[২] হল, যে পরিমাণ পাওয়া যায় (কানয)।

ইযার ঃ ইযার হবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। লেফাফা ঃ লেফাফা ইযারের অনুরূপই হবে।

কামীস ঃ কামীস ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত হবে (হিদায়া)।

কামীসের মধ্যে পকেট, কল্লি এবং আস্তীন হবে না (কাফী)। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে কাফনের মধ্যে পাগড়ী নেই। কিন্তু ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পরবর্তী কালের ফকীহ্গণ المتاخرين। মৃত আলিমের মাথায় পাগড়ী বাঁধাকে পসন্দ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, পাগড়ী বেঁধে এর শিমলা মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিবে। এ অবস্থাটি জীবিত অবস্থায় শিমলা রাখার পরিপন্থী[৩] (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২. মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য সুন্নাত কাফন হচ্ছে পাঁচ কাপড়। ১. কামীস, ২. ইযার, ৩. উড়না, ৪. লেফাফা ও ৫. সীনাবন্দ-এর দ্বারা স্তন বেঁধে রাখবে। আর তাদের কাফনে কিফায়েত হচ্ছে তিনটি। ১. ইযার, ২. লেফাফা ও ৩. উড়না (কানয)। সীনাবন্দ স্তন থেকে নাভি পর্যন্ত হবে (আয়নী ঃ শরহুল কানয ও তাবয়ীন)। অবশ্য সীনাবন্দ স্তন থেকে উরু পর্যন্ত হওয়া উত্তম (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। মহিলাকে দুই কাপড়ের দ্বারা এবং পুরুষকে এক কাপড়ের দ্বারা কাফন দেওয়া মাকরূহ্। অবশ্য অনন্যোপায় হলে মাকরূহ্ হবে না (আয়নী ঃ শরহুল কানয)। বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের বালক ও বালিকা কাফনের ক্ষেত্রে বালিগ পুরুষ ও মহিলার হুকুমের মতই। নাবালিগ বালকের কাফনের জন্য ন্যূনতমপক্ষে এক কাপড় এবং না বালিগা কন্যার কাফনের জন্য ন্যূনতমপক্ষে দুই কাপড় আবশ্যক (তাবয়ীন)। সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে হিজড়া ব্যক্তিকে মহিলাদের কাফন দিবে। পুরুষের কাফনের ক্ষেত্রে রেশমী কাপড় এবং কুসুম ও জাফরানী রংগের কাপড় ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৩. মাসআলা ঃ পুরুষকে এমন ধরনের কাপড়ের দ্বারা কাফন দেওয়া আবশ্যক, যা সে জীবিতাবস্থায় পরিধান করে দুই ঈদের নামায আদায় করত। আর মহিলাদেরকে এমন ধরনের কাপড়ের দ্বারা কাফন দেওয়া আবশ্যক, যে ধরনের কাপড় পরিধান করে সে তার জীবদ্দশায় নিজ বাপের বাড়ী বেড়াতে যেত (যাহিদী)। মহিলাদের বারূদ, কাত্তান এবং কাসাব[৪] কাপড় দ্বারা কাফন

১. যে পরিমাণ কাপড় হলে কোন রকমে কাফন দেওয়া যায়।
২. অনন্যোপায় অবস্থায়।
৩. মুহীত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে পাগড়ী বাঁধা সকলের জন্যই মাকরূহ্। যাহিদী (র) এমতটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (আলমগীরী উর্দূ, পৃঃ ২৫৪)।
৪. রেশমী কাপড়ের প্রকারভেদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওয়াতে কোন দোষ নেই। মহিলাদেরকে রেশমী কাপড় এবং কুসুম ওই জাফরানী রঙের কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া জাইয আছে। অবশ্য এ জাতীয় কাপড় দ্বারা পুরুষ লোকদেরকে কাফন দেওয়া মাকরূহ্। পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্যই সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া উত্তম (নিহায়া)। পুরুষের কাফনের ক্ষেত্রে পুরাতন এবং নতুন কাপড় উভয়ই সমান (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। পুরুষের জন্য জীবিত থাকা অবস্থায় যে সব কাপড় ব্যবহার করা জাইয, ইন্তিকালের পর ঐসব কাপড় দ্বারা তার কাফন দেওয়া জাইয। আর জীবিত অবস্থায় তার জন্য যে সব কাপড় ব্যবহার না-জাইয ঐসব কাপড় দ্বারা তাকে কাফন দেওয়াও না-জাইয (শরহুত তাহ্বী)।

৪. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যদি বেশী হয় এবং ওয়ারিছগণের সংখ্যা কম হয়, তবে তাকে সুন্নাত কাফন দেওয়া উত্তম। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে কাফনে কিফায়েত দেওয়া উত্তম (যহীরিয়া)। যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কাফন দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ হয়, কেউ বলে দুই কাপড়ের কথা, আবার কেউ বলে তিন কাপড়ের কথা, এ অবস্থায় তাকে তিন কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হবে। কেননা, তিন কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়াই সুন্নাত (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। কাফন পরিধান করানোর নিয়ম হল এই যে, পুরুষের জন্য প্রথমে লেফাফা বিছাবে, তার উপর ইযার বিছাবে। তারপর কামীস (জামা) রাখবে। এর উপর লাশ রেখে তাকে কাফন পরাবে। মৃত ব্যক্তির মাথায়, দাড়িতে এবং সমস্ত শরীরে হানূত (সুগন্ধি) লাগিয়ে দিবে (মুহীত)। পুরুষের ক্ষেত্রে জাফরান এবং গোলাপ ছাড়া যে কোন ধরনের সুগন্ধি লাগানো জাইয আছে (ঈযাহ)। পুরুষ মৃত ব্যক্তির কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ে কর্পূর লাগিয়ে দিবে। ইযার বাঁ দিক থেকে তার শরীরে জড়িয়ে দিবে। এরপর ডান দিক থেকে উঠিয়ে তা শরীরের সাথে জড়িয়ে দিবে। তারপর অনুরূপ নিয়মে লেফাফা পরিধান করাবে (মুহীত)। যদি কাফন খুলে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে তা কোন কিছু দ্বারা বেঁধে দিবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৫. মাসআলা ঃ মহিলাদেরকে কাফন পরিধান করানোর নিয়ম হল, প্রথমে সীনাবন্দ বিছাবে। তারপর পুরুষের কাফন বিছানোর ন্যায় মহিলার ক্ষেত্রেও লেফাফা বিছাবে। এরপর ইযার বিছাবে। ইযারের উপর কামীস রাখবে। শিয়রে উড়না রেখে দিবে। তারপর লাশ কাফনের উপর রেখে প্রথমে তাকে কামীস পরিধান করাবে। অতঃপর মাথার চুল দুই ভাগ করে তা তার সীনার তথা জামার উপর রাখবে। এরপর উড়না রাখবে। তারপর পূর্ব বর্ণিত নিয়মে লেফাফা ও ইযার তাকে পরিধান করাবে। কাফনের সমস্ত কাপড়ের উপর সীনাবন্দ থাকবে। আর সীনাবন্দ স্তনের উপর রাখবে (মুহীত)। মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানোর পূর্বে তার কাফনের কাপড়টি একবার, তিনবার অথবা পাঁচবার অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যক বার সুগন্ধি দ্বারা ধুনা দিবে। এর চেয়ে বেশী দিবে না (আয়নী ঃ শরহুল কান্য)। সর্বমোট মৃত ব্যক্তির নিকট সুগন্ধি দ্বারা তিনবার ধুনা দিবে। প্রথমে রূহ বের হওয়ার সময়। এ সময় ধুনা দিবে দুর্গন্ধ দূরীভূত করার লক্ষ্যে। তারপর গোসলের সময়। তারপর কাফন পরিধান করানোর সময়। এরপর আর ধুনা দিবে না (তাবয়ীন)। এ ক্ষেত্রে মুহরিম এবং গায়রে মুহরিম উভয়ই সমান। সুগন্ধি দ্বারা ধুনা দেওয়ার পর মৃত ব্যক্তির

মুখমণ্ডল এবং মাথা কাফন দ্বারা ঢেকে দিবে। বাঁদীর ক্ষেত্রেও ধুনা দেওয়া হবে, যেমন আযাদ মহিলার ক্ষেত্রে দেওয়া হয় (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য মাল থাকলে কাফন তার মাল দ্বারা দিবে। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ এবং তার ওসিয়ত বাস্তবায়িত করা এবং ওয়ারিছদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের আগে কাফনের বিষয়টি সমাধা করা হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এ মালের সাথে অন্যের হক সংশ্লিষ্ট না থাকে। যেমন রাহন (বন্ধকী মাল), বিক্রীত মাল-যা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়নি অথবা এমন গোলাম যে কোন অপরাধ করেছে (তাবয়ীন)। আর যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে তার কাফনের ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তিদের করা ওয়াজিব, যাদের উপর তার খোরপোশের দায়িত্ব ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্বামীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কাফনের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে স্ত্রীর কাফনের ব্যবস্থা স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী বহু মাল-সম্পদ রেখে গেলেও। ফাতওয়া এর উপরই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ যদি স্বামী মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত কোন মাল না থাকে, তবে তার স্ত্রী বিত্তশালী হলেও স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয় স্বামীর কাফনের ব্যবস্থা করা। এটাই হচ্ছে ফকীহ্গণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (মুহীত)। একজন মানুষ মারা গেছে, তার এমন কোন মানুষ নেই, যার উপর তার খোরপোশ ওয়াজিব, এ অবস্থায় বায়তুল মালের পক্ষ হতে তার কাফনের ব্যবস্থা করা হবে, যদি বায়তুল মাল না থাকে, তবে মুসলিম জনসাধারণ তার কাফনের ব্যবস্থা করবে। এতে তারা যদি সক্ষম না হয় তাহলে মানুষের নিকট পয়সা চেয়ে হলেও তার কাফনের কাজ সমাধা করতে হবে (যাহিদী)। ইতাবিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, এগুলো না পাওয়া গেলে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে, তার শরীরে ইযখির (ঘাস)[১] দিয়ে দিবে, তারপর দাফন করে দিবে। এরপর লাশ কবরে থাকা অবস্থায় জানাযার নামায পড়বে (তাতারখানিয়া)। এক ব্যক্তি কোন এক কওমের মসজিদে মারা যাওয়ার পর এক ব্যক্তি তার কাফনের সমুদয় টাকার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর দেখা গেল যে, সে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে এর থেকে কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে, তাহলে ঐ ব্যক্তি চিনা থাকলে উদ্বৃত্ত টাকা তার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি পরিচিত না হয়, তবে এ টাকা অন্য কোন গরীব ব্যক্তির কাফনের কাজে লাগিয়ে দিবে। আর যদি তাও না করতে পারে, তবে তা কোন মিসকীনকে সাদাকা করে দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ কাফন পরিধান করিয়ে দাফন করার পর যদি কারো কাফন চুরি হয়ে যায়, তবে সদ্য কাফন দিয়ে থাকলে তাকে পুনরায় কাফন দেওয়া হবে তার মাল থেকে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল বন্টন হয়ে গিয়ে থাকলে ওয়ারিছদের উপর ওয়াজিব হবে তার কাফনের ব্যবস্থা করা। পাওনাদার এবং ওসিয়তওয়ালাদের উপর একাজ করা ওয়াজিব হবে না। পরিত্যক্ত সম্পত্তির দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার পর যদি কিছু মাল অতিরিক্ত না থাকে এ অবস্থায় ঋণদাতাগণ যদি তাদের পাওনা না নিয়ে থাকে তাহলে প্রথমে কাফনের কাজ সমাধা করবে। আর তারা তাদের

১. গোলপাতা, বাঁশ জাতীয় চওড়া পাতা বিশিষ্ট ঘাস, যা আরবে তৎকালে জন্মাতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওনা পরিশোধ করে নিয়ে থাকলে তাদের থেকে ফেরত নেওয়া হবে না। মৃত ব্যক্তি পচে ফুলে গেলে এক কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। লাশ যদি কোন হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলে এবং কাফনের কাপড় এমনি পড়ে থাকে, তবে এ কাপড় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে। মৃত ব্যক্তিকে কোন অপরিচিত ব্যক্তি কাফন দিয়ে থাকলে অথবা আত্মীয়-স্বজন নিজেদের মাল দ্বারা কাফন দিয়ে থাকলে যারা যারা কাফনের ব্যবস্থা করেছে, তারাই এ মালের মালিক হবে (মি' রাজুদ দিরায়া)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা বহন করার মাসাইল

১. মাসআলা ঃ চারজন পুরুষ জানাযার খাটিয়া বহন করা সুন্নাত (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)। লাশ খাটিয়ায় উঠানোর পর চার ব্যক্তি খাটিয়ার পায়া ধরে তা বহন করবে। এভাবে উঠানোই সুন্নাত (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। খাটিয়া বহন করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. মূল সুন্নাত, ২. কামালে সুন্নাত অর্থাৎ সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ বিধান। ১. মূল সুন্নাত হল ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি খাটিয়ার চার পায়া এভাবে ক্রমান্বয়ে চারবার বহন করবে যাতে এক এক পায়া ধরে দশ কদম হাঁটা হয়ে যায়। আর এমনটি উপরোক্ত চার জনের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ২. আর কামালে সুন্নাতমাত্র এক ব্যক্তি আদায় করতে সক্ষম হবে। তা হলো ঃ খাটিয়া বহনকারী ব্যক্তি প্রথমে খাটিয়ার মাথার দিকের ডান পায়া ধরবে এবং তা নিজের ডান কাঁধের উপর রাখবে (তাতারখানিয়া)। তারপর পায়ের দিকের ডান পায়া ডান কাঁধের উপর রাখবে তারপর মাথার দিকের বাম পায়া বাম কাঁধের উপর রাখবে এবং এরপর পায়ের দিকের বাম পায়া বাম কাঁধের উপর রাখবে (তাবয়ীন)। খাটিয়া দুই কাঠের উপর রেখে এর অগ্রভাগ একজন এবং পেছনের ভাগ অপর জনে উঠানো মাকরূহ্। অবশ্য অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ করা জাইয। যেমন জায়গার সংকীর্ণতা অথবা এ জাতীয় অন্য কোন ওযর পেশ আসা। খাটিয়া হাতে রাখা অথবা কাঁধে রাখাতে কোন দোষ নেই। তবে অর্ধেক কাঁধে এবং অর্ধেক ঘাড়ে রাখা মাকরূহ্ (শরহুত তাহাবী)।

২. মাসআলা ঃ ফকীহ্ ইসবীজাবী (র) বলেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা যাকে কেবলমাত্র স্তন্যদান বন্ধ করা হয়েছে অথবা এর থেকে বয়সে সামান্য বড় শিশুর লাশ এক ব্যক্তি হাতে বহন করে নিতে পারবে। এতে কোন দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে হাত বদলিয়ে একাধিক ব্যক্তিও তা বহন করতে পারবে। সওয়ারীর উপর আরোহী কোন ব্যক্তি তাকে হাতে করে নিলে তাতেও কোন দোষ নেই। অবশ্য মৃত ব্যক্তি বয়স্ক হলে তাকে খাটিয়ায় করে নিবে (আল্-বাহরুর রাইক)। মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলবে। তবে একেবারে দৌড়াবার মত চলবে না। দ্রুত চলার সীমা হল ঃ এমন ভাবে দ্রুত চলবে, যাতে শবদেহ খাটের উপর নড়াচড়া না করে (তাবয়ীন)। যারা শবদেহের সাথে যাবে তাদের জন্য উত্তম হল, শবদেহের পেছনে পেছনে যাওয়া। অবশ্য সামনে দিয়ে চলাও জাইয। তবে এ ক্ষেত্রে একটু দূর দিয়ে চলবে। কিন্তু সঙ্গীয় সকল লোকের আগে আগে চলা মাকরূহ্। শবদেহের বরাবর ডানে-বামে চলবে না (ফাতহুল কাদীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ জানাযা নিয়ে চলবার সময় লাশের মাথা আগে চলবে (মুযমরাত)। জানাযা যদি কোন প্রতিবেশীর হয় অথবা আত্মীয়-স্বজনের অথবা অন্য কোন নেককার মানুষের হয়, তবে তার জানাযার সাথে সাথে চলা নফল নামায আদায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে উত্তম (আল-বাহরুর রাইক)। সওয়ার হয়ে জানাযার সাথে যাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তবে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম। সওয়ার হয়ে জানাযার আগে আগে যাওয়া মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জানাযার সাথে যাওয়ার সময় অথবা মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে আওয়ায করে কান্নাকাটি করা, হাউমাউ করে কাঁদা এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা মাকরূহ[১]। আওয়ায না করে ক্রন্দন করাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য এ অবস্থায়ও সবর-ধৈর্য ধারণ করা উত্তম (তাতারখানিয়া)। মশাল কিংবা মোমবাতি জ্বালিয়ে জানাযার সাথে নিবে না (আল-বাহরুর রাইক)। জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া সমীচীন নয়। জানাযার সাথে যদি ক্রন্দনকারী ও চীৎকারকারিনী মহিলারাও রওয়ানা করে, তবে তাদেরকে নিষেধ করা হবে। এতদসত্ত্বেও তারা যদি যায়, তবে তাতে অন্যের কোন গুনাহ্ হবে না। কেননা, জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া সুন্নাত। কাজেই অন্যের কোন বিদ'আতী কর্মের কারণে তা তরক করা হবে না। জানাযা দেখলে উঠে দাঁড়াবে না[২]। অবশ্য যদি জানাযার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে দাঁড়াতে পারবে (ঈযাহ)। অনুরূপভাবে কোন সম্প্রদায় যদি ঈদগাহে থাকে এবং এ সময় জানাযা আসে, তখন জানাযা বহনকারী ব্যক্তিগণ ঘাড় থেকে জানাযা নামানোর আগে তারা তা দেখা মাত্রই দাঁড়াবে না। এটাই সহীহ্ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ যারা জানাযার পেছনে পেছনে গমন করবে তারা নীরব নিস্তব্ধভাবে চলবে। উচ্চ আওয়াযে যিকির করা এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মাকরূহ্ (শরহুত তাহাবী)। যিকির করতে ইচ্ছা করলে মনে মনে যিকির করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কবরের পাশে জানাযা রাখার পর বসলে কোন দোষ নেই। অবশ্য বহনকারীদের ঘাড় থেকে লাশ মাটিতে রাখার পূর্বে বসা মাকরূহ্ (খুলাসা)। উত্তম হল, লাশ কবরে দাফন করার পর কবরের উপরে মাটি সমান করে দেওয়ার পর বসা (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যখন লাশ জানাযার জন্য রাখবে, তখন তা কিবলার দিকে আড়াআড়িভাবে রাখবে। লম্বা করে নয় (তাতারখানিয়া)। জানাযা বহন করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা জাইয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া। কিছু লোক তা আদায় করলে তা একজন হোক অথবা এক জামাআত পুরুষ হোক অথবা মহিলা, তাহলে অবশিষ্ট লোকেরা এর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কেউই আদায় না করে, তবে সকলেই গুনাহ্গার হয়ে যাবে (তাতারখানিয়া)। জানাযার নামায শুধু ইমাম আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যায়। কেননা, জানাযার নামাযের জন্য জামাআত শর্ত নয় (নিহায়া)। এই নামাযের জন্য শর্ত হল ঃ মৃত

---

১. মাকরূহ তাহরীমী

২. বুখারী শরীফের হাদীছে জানাযা দেখে দাঁড়ানোর আদেশ আছে, কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

ব্যক্তি মুসলমান হওয়া এবং তার পাক- পবিত্র হওয়া--যদি তাকে গোসল করানো সম্ভব হয়। আর যদি গোসল করানো সম্ভব না হয়, যেমন গোসল দেওয়া ব্যতিরেকে লাশ দাফন করা হয়েছে। এখন কবর খনন করা ব্যতীত লাশ বের করার কোন উপায় নেই। এ অবস্থায় যরুরতের কারণে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জানাযার নামায জাইয হবে। যদি গোসল করানো ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামায পড়ে দাফন করে দেওয়া হয়, তবে তার কবরের উপর জানাযার নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, প্রথম বারের আদায়কৃত নামায ফাসিদ হয়ে গেছে (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির লাশ রাখার জায়গা পবিত্র হওয়া শর্ত নয় (মুযমারাত)। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে। মুসলিম মৃত ব্যক্তি ছোট হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা মহিলা এবং আযাদ হোক বা ক্রীতদাস, তার জানাযার নামায পড়তে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহী (ইসলামী রাষ্ট্র হলে), ছিনতাইকারী এবং এ জাতীয় লোকদের জানাযা পড়া হবে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কোন শিশু মারা গেলে যদি তার শরীরের অর্ধেকের বেশী অংশ বের হয়ে থাকে, তবে তার জানাযা পড়া হবে। আর কম অংশ বের হয়ে থাকলে তার জানাযা পড়া হবে না। যদি অর্ধেক পরিমাণ অংশ বের হয়, তাহলে এ সম্বন্ধে কিতাবে কোন কিছু উল্লেখ নেই। অবশ্য "মৃত লাশের অর্ধেক পাওয়া গেলে তার জানাযা পড়া হবে" এ মাসআলার উপর আলোচ্য মাসআলাটিকে কিয়াস করা যায় এবং এ ভিত্তিতে তার জানাযা পড়ার হুকুম দেওয়া যায় (বাদাই')। যদি দারুল হরবে শত্রু পক্ষীয় কোন বালক একা মুসলিম সৈন্যদের হস্তগত হয় এবং মারা যায়, তবে যেহেতু তাকে মুসলিম সৈন্যগণ গ্রহণ করেছে তাই তার জানাযার নামায পড়া হবে (মুহীত)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারো মাল আত্মসাৎ করে এবং সে প্রেক্ষিতে তাকে হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীর জানাযার নামায পড়া হবে না (ঈযাহ)। কেউ যদি তার পিতা-মাতার কোন একজন হত্যা করে তবে তার প্রতি হেয়তা প্রদর্শনের লক্ষ্যে তার জানাযা পড়া হবে না (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি ভুলে خطأ নিজেকে হত্যা করে ফেলে যেমন সে কাউকে হত্যা করার জন্য তরবারি উঁচিয়ে ধরল, আকস্মিকভাবে ঐ তরবারি তার গায়ে বিদ্ধ হয়ে গেল এবং এতে সে মারা গেল, তবে তাকে গোসল করানো হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই (যখীরা)। কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে আত্মহত্যা করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার জানাযা পড়া হবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (তাবয়ীন)। যদি কোন ব্যক্তিকে কঠিন কোন অপরাধের শাস্তি হিসাবে অস্ত্র দ্বারা অথবা কিছু দ্বারা হত্যা করা হয়, যেমন কাউকে কিসাস তথা মৃত্যুদণ্ড অথবা প্রস্তরাঘাতে[1] হত্যা করা হল, তবে তাকে গোসল করানো হবে, তার জানাযা পড়া হবে এবং অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়, তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হবে (যখীরা)। রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক যাকে

১. বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে এবং সে ব্যভিচারকারী কাযীর নিকট শরীআতসম্মত ভাবে প্রমাণিত হলে শরীআতে তাকে অর্ধাংশ গর্তে নামিয়ে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান। একে রজম বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শূলিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, তার সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। ফকীহ্ আবূ সুলায়মান (র) ইমাম আবূ হানিফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তার জানাযার নামায পড়া হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার হলেন, বাদশাহ্। যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। বাদশাহ উপস্থিত না থাকলে কাযী (বিচারক)। এরপর মহল্লার ইমাম। এরপর ওলী (মুতূন)। ইমাম হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিতাবে الامام الاعظم বলে রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফাকে বুঝানো হয়েছে। যদি তিনি উপস্থিত থাকেন, তাহলে জানাযা পড়ানোর ব্যাপারে তিনিই অধিক হকদার। খলীফা উপস্থিত না থাকলে শহরের ইমাম অধিক হকদার। শহরের ইমাম অনুপস্থিত থাকলে কাযী (বিচারপতি) অধিক হকদার। কাযী উপস্থিত না থাকলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মকর্তা (যদি তিনি নামায পড়াতে সক্ষম হন)। তার অনুপস্থিতিতে মহল্লার ইমাম অধিক হকদার। তিনিও যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার। এ অভিমতটি আমাদের অধিকাংশ মাশায়িখে কেরাম গ্রহণ করেছেন (কিফায়া, নিহায়া, মি'রাজুদ দিরায়া 'ইনায়া)। মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিছগণের মধ্যে জানাযা পড়ানোর ক্ষেত্রে "আসাবাত"[1]-এর তারতীব (ক্রমধারা) বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ আসাবাদের মধ্যে যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী হবে, সে অধিক হকদার হবে। অনুরূপ নিয়মে এ ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পিতার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, তাকে মৃত ব্যক্তির পুত্রের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। ফকীহ্গণ বলেন, এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে পিতার তুলনায় পুত্র উত্তম। বিশুদ্ধ মতে এটাই সকলের অভিমত (তাবয়ীন)। গিয়াছিয়্যা ও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৫. মাসআলা ঃ মহিলা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে কোন হক নেই। নিকটবর্তী ওলী ইচ্ছা করলে কোন দূরবর্তী আত্মীয়কে জানাযা পড়ানোর জন্য অগ্রাধিকার দিতে পারেন। নিকটবর্তী আত্মীয় দূরে থাকলে এবং তার আসতে আসতে যদি জানাযা ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে দূরবর্তী আত্মীয় জানাযা পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। যদি অনুপস্থিত নিকট-আত্মীয় ব্যক্তি পত্রের মাধ্যমে অন্য কাউকে নামায পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়, তবে দূরবর্তী আত্মীয় তাকে নামায পড়ানোর ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে; শহরে অবস্থানরত অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির মতই। সে যাকে ইচ্ছা অগ্রগামী করে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে দূরবর্তী আত্মীয় তাকে বাধা দিতে পারবে না। যদি দুইজন ওলী অধিকারের দিক থেকে সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যার বয়স বেশী সে নামায পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার হবে। তাদের কোন একজনের জন্য তৃতীয় অপর কাউকে নামায

১. মৃত ব্যক্তির ঐ পুরুষ আত্মীয়, যাকে মৃত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করতে কোন মহিলা মধ্যখানে অন্তরায় হয় না। যেমন চাচা, ব্যতিক্রম মামা। (ফাওয়ায়িদুল ফিক্হ পৃঃ ৩৮১)।

পাড়ানোর জন্য অগ্রসরমান করে দেওয়া জাইয নেই। অবশ্য অনুমতি সাপেক্ষে জাইয হবে। যদি ওলীদ্বয়ের প্রত্যেকেই একজন করে নামায পড়ানোর জন্য নির্ধারিত করে দেয়, তবে তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তার মনোনীত ব্যক্তিই নামায পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে (আলজাওহারাতুন নায়্যারা)। "কুবরা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে তার জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে ওসিয়ত করে যায় যে, অমুক মামার জানাযা পড়াবে তবে তার এ ওসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)।

৬. মাসআলা ঃ কোন ক্রীতদাস মারা যাওয়ার পর যদি তার জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে তার মুনীব, তার পিতা ও তার পুত্রের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, উল্লেখ্য যে, তার পিতা ও পুত্র উভয়ই আযাদ, তবে এ ক্ষেত্রে মুনীবই তার জানাযা পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার (মুহীত)। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। আমাদের মাযহাবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার উপর স্বামীর কোন বিলায়েত (অধিকার) থাকবে না। কারণ, মৃত্যুর কারণে তাদের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে (জামে' উস্ সগীর ঃ কাযীখান)। তবে মৃত স্ত্রীর কোন ওলী না থাকলে স্বামীই তার নামায পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তারপর অপরিচিত ব্যক্তির তুলনায় প্রতিবেশী অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে (তাবয়ীন)। কোন মহিলা মারা যাওয়ার পর তার স্বামী এবং জ্ঞানবান বালিগ পুত্র যদি বিদ্যমান থাকে, তবে পুত্র ওলী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। স্বামী নয়। তবে পুত্রের জন্য মাকরূহ্ পিতার অগ্রে গিয়ে নামায ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করা। বরং তার জন্য সমীচীন হল, পিতাকে আগে বাড়িয়ে দেওয়া। মৃত মহিলার অন্য স্বামীর সন্তান হলে অর্থাৎ যদি পুত্র ঐ স্বামীর ঔরসজাত না হয়, তবে তার অগ্রবর্তী হওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা, সেই ওলী। আর মায়ের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তার উপর ওয়াজিব নয় (বাদাঈ')।

৭. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য শুধু একবারই জানাযা পড়বে। একাধিক বার নয়। কেননা, জানাযার নামায নফল হিসাবে আদায় করার স্বীকৃতি শরীআতে নেই। (ঈযাহ)। কেননা, জানাযার নামায নফল হিসাবে আদায় করার স্বীকৃতি শরীআতে নেই। কাযী অথবা মহল্লার ইমাম একবার জানাযা পড়ে নেওয়ার পর ওলী রাষ্ট্রপ্রধান, বাদশাহ, গভর্নর, কাযী অথবা মহল্লার ইমাম একবার জানাযা পড়ে নেওয়ার পর ওলী পুনরায় জানাযা পড়বে না। কেননা, তারা ওলীর থেকেও অধিক হকদার। অবশ্য উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ জানাযা পড়ালে ওলী পুনরায় জানাযার নামায পড়তে, পারবে (খুলাসা)। ওলী জানাযার নামায পড়ে নেওয়ার পর আর কারো জন্য জানাযা পড়ার ইখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য এরপর বাদশাহ্ যদি জানাযার নামায পড়তে চায়, তবে সে পড়তে পারবে। কেননা, বাদশাহ্র হক ওলীর থেকেও অধিক। যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক সমপর্যায়ের ওলী থাকে, এমতাবস্থায় কোন একজন তার জানাযা পড়ে নিলে বাকীদের জন্য পুনরায় জানাযা পড়া জাইয হবে না (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। ওলী এবং বাদশাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ালে ওলী ইচ্ছা করলে পুনরায় নামায পড়তে পারবে (হিদায়া)।

৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়াল। তখন ওলী তার পেছনে ছিল। কিন্তু ওলী এতে রাযী ছিল না। এ ক্ষেত্রে ওলী উক্ত ইমামের অনুকরণ করে জানাযা পড়ে থাকলে নামায জাইয হবে। সে আর এ নামায পুনরায় আদায় করবে না। যদি ইমাম উযূহীন অবস্থায় থাকে,

তবে এ নামায দুহরিয়ে পড়তে হবে। আর যদি ইমাম উযূর অবস্থায় এবং মুসল্লীগণ উযূহীন অবস্থায় নামায আদায় করে থাকে, তাহলে ইমামের নামায সহীহ্ হবে এবং এ নামায আর পুনরায় আদায় করতে হবে না। (খুলাসা)। যদি ওলী রোগী হয় এবং বসে জানাযার নামায আদায় করে আর মুক্তাদীগণ তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, তবে নামায জাইয হবে। কোন ব্যক্তি যদি নিজ শহর ছাড়া অন্য শহরে মারা যায় এবং আত্মীয় স্বজনগণ এসে তার লাশ বাড়ীতে নিয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে বাদশাহ্ বা কাযীর হুকুমে তার জানাযার নামায আদায় হয়ে থাকলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ মাগরিবের নামাযের সময় জানাযা এসে উপস্থিত হলে জানাযার নামায মাগরিবের ফরযের পর সুন্নাতের আগে আদায় করবে (কিনয়া)। সওয়ার অবস্থায় জানাযার নামায পড়া জাইয নেই (মুহীত)। অন্যান্য নামায সহীহ্ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, যেমন তাহারাতে হাকীকী ও হুকমী; কিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা, নিয়্যাত করা, জানাযার নামায সহীহ্ হওয়ার জন্যও এসব শর্ত ধর্তব্য হবে (বাদাই')। ইমাম জানাযার নিয়্যাত করবে এবং মুক্তাদীগণও নিয়্যাত করবে। নিয়্যাত এ ভাবে করবে ঃ

نَوَيْتُ اَدَاءَ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ عِبَادَةً لِّلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ مُقْتَدِيًا بِالْاِمَامِ

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র ইবাদতের লক্ষ্যে এই ফরয আদায়ের জন্য কিবলামুখী হয়ে ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায আদায় করছি।)

যদি ইমাম মনে মনে নিয়্যাত করে যে, সে জানাযার নামায আদায় করছে, তবু নামায সহীহ্ হবে। যদি মুক্তাদী বলে "আমি ইমামের পেছনে ইকতেদা করলাম" তবে জাইয আছে (মুযমারাত)।

১০. মাসআলা ঃ জানাযার নামায সহীহ্ হওয়ার শর্ত হল ঃ

১. মৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত থাকা।

২. লাশ যমীনের উপর রাখা।

৩. লাশ মুসল্লীদের সামনে থাকা।

সুতরাং লাশ যদি হাযির না থাকে, অথবা কোন জানোয়ার বা বাহনের উপর থাকে অথবা লাশ যদি মুসল্লীদের পেছনে থাকে, তাহলে নামায সহীহ্ হবে না (আল্-নাহরুল ফায়িক)। যে সব কারণে অন্যান্য নামায ফাসিদ হয়ে যায়, জানাযার নামাযও ঐসব কারণে ফাসিদ হয়ে যাবে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, মহিলা পুরুষের বরাবর হয়ে দাঁড়ালে জানাযার নামায ফাসিদ হবে না (যাহিদী)।

১১. মাসআলা ঃ জানাযার জামাআতে মুসল্লী সংখ্যা সাতজন হলে তিন কাতার করবে। একজন সামনে দাঁড়াবে। তার পেছনের কাতারে তিনজন, পরবর্তী কাতারে দুইজন এবং সর্বশেষ কাতারে একজন দাঁড়াবে (তাতারখানিয়্যা)। মায়্যিত পুরুষ হোক বা মহিলা ইমাম তার সীনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বরাবর দাঁড়াবে। মায়্যিতের এই সোজা দাঁড়ানোই ইমামের জন্য উত্তম। যদি ইমাম অন্যত্র দাঁড়ায়, তবু নামায জাইয হবে।

১২. মাসআলা ঃ জানাযার নামাযে চার তাকবীর। এর কোন একটি ছেড়ে দিলে নামায জাইয হবে না (কাফী)। প্রথমে নামায আরম্ভ করার তাকবীর বলবে। তারপর

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

তারপর দ্বিতীয় তাকবীর বলবে। দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর বলবে। এরপর মায়্যিত এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন দু'আ পড়া আবশ্যক নয়। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সময় তিনি নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

মায়্যিত না বালিগ হলে নিম্নের দু'আটি ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاَجْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

উত্তম রূপে দু'আ পাঠ করতে পারলে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কেউ উত্তমরূপে দু'আ পড়তে না পারলে যে দু'আ ইচ্ছা পাঠ করবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে দুই দিকে সালাম ফিরাবে। চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানোর আগে কোন দু'আ পড়ার বিধান শরীআতে নেই (শরহু জামি'উস্ সগীর ঃ কাযীখান)। এটাই যাহিরী মাযহাব (কাফী)। এ নামাযে তাকবীর ছাড়া সমস্ত দু'আ দুরূদ চুপে চুপে পড়বে (ইমাম হলে)[১]।

১৩. মাসআলা ঃ এ নামাযে কুরআন শরীফের কোন সূরা-কিরাআত পাঠ করবে না। সূরা ফাতিহা দু'আর নিয়্যাতে পাঠ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু কিরাআতের নিয়্যাতে পাঠ করা জাইয নেই। কেননা, এটি কিরাআতের ক্ষেত্র নয়। বরং দু'আর ক্ষেত্র (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে জানাযার নামাযে কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাবে (আয়নী ঃ শরহুল কান্য)। এ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই সমান। (কাফী)। ডানে-বামে সালাম ফিরানোর সময় মায়্যিতের নিয়্যাত করবে না। বরং ডানে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের মুসল্লীদের এবং বামে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের মুসল্লীদের নিয়্যাত করবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, যহীরিয়্যা)। ইমাম যদি জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলে, তবে মুক্তাদীগণ তার অনুসরণ করবে না। কিন্তু তারা কি করবে এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা

১. আর ইমাম না হলে তাকবীরসহ সমস্ত দু'আ দুরূদই চুপে চুপে পড়বে।

(র)-এর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তারা থেমে থাকবে এবং পরে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইমামের প্রথম তাকবীর বলার পর নামাযে হাযির হয়, পূর্বে সে সেখানে উপস্থিত ছিল না, তাহলে সে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলার অপেক্ষা করবে। ইমাম যখন দ্বিতীয় তাকবীর বলবে, তখন সেও তাকবীর বলবে (এবং নামাযে শরীক হয়ে যাবে) তারপর ইমাম যখন নামায থেকে ফারিগ হবে, তখন মাসবূক মুসল্লী জানাযা উঠাবার আগে তার ছুটে যাওয়া তাকবীর বলে নামায শেষ করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। দুই বা তিন তাকবীর হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ নামাযে শরীক হয়, তবে তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে[১] (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কোন ব্যক্তি চতুর্থ তাকবীর বলার পর সালামের আগে নামাযের স্থানে আসে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এক বর্ণনা মতে সে নামাযে শরীক হবে না। তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে নামাযে শরীক হবে। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। জানাযা উঠানোর আগে ধারাবাহিকভাবে তিন তাকবীর বলবে। এর মধ্যে কোন দু'আ-দুরূদ পড়বে না (খুলাসা, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি খাটিয়া হাতে তুলে নেওয়া হয় এখনো কাঁধে উঠানো হয়নি, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এ সময় আর তাকবীর বলবে না (যাহীরিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ কোন মুক্তাদী নামাযে ইমামের সাথেই ছিল কিন্তু গাফিল (উদাসীন) ছিল, যার ফলে সে ইমামের সাথে তাকবীর বলতে পারেনি অথবা নিয়্যাত করছিল তাই তাকবীর বলতে বিলম্ব হয়ে গেছে, তাহলে সে গাফলত কেটে যেতেই অথবা নিয়্যাত করা শেস হতেই তাকবীর বলে নামাযে শরীক হবে। ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষা করবে না। এটাই ফকীহ্গণের সম্মিলিত অভিমত। কেননা, সে নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিল। কাজেই তার এ প্রস্তুতিকে নামাযে শরীক বলে ধরে নেওয়া হবে। (শরহু জামিউস সগীর, কাযীখান)। যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর বলে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীর না বলে তবে সে এই দুই তাকবীর বলে নিবে। এরপর ইমামের সাথে চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি ইমাম ভুলে তৃতীয় তাকবীর বলে সালাম ফিরায়, তবে সাথে সাথে চতুর্থ তাকবীর বলে পুনরায় সালাম ফিরাবে (তাতারখানিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি একাধিক জানাযা একত্রিত হয় তবে ইমাম ইচ্ছা করলে প্রত্যেকের জানাযার নামায পৃথক পৃথক ভাবে পড়বে অথবা সকলের জানাযা পড়ার নিয়্যাত করে একবারেই তা সম্পন্ন করবে। (মি'রাজুদ দিরায়া)এ সকল জানাযা রাখার ব্যাপারে ইমাম স্বাধীন। ইমাম তাদেরকে একই কাতারে লম্বালম্বিভাবে রেখে তাদের উত্তম ব্যক্তির সীনা বরাবর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তাদেরকে কিবলার দিকে একের পর এক রেখেও নামায আদায় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে জীবিত অবস্থায় ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় যে

১. অর্থাৎ, যার দুই তাকবীর ছুটে গেছে, সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর জানাযা উঠানোর আগে তার ছুটে যাওয়া দুই তাকবীর বলে নামায শেষ করবে। অনুরূপভাবে যার তিন তাকবীর ছুটে গেছে, সেও তাই করবে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রমধারা অনুসরণ করা হত, এখানেও ঐ ক্রমধারার অনুসরণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তির লাশ ইমামের নিকটে থাকবে। তারপর প্রথম ব্যক্তির তুলনায় মর্যাদার দিক থেকে যে নিম্নতর, তার লাশ থাকবে। কাজেই প্রথমে পুরুষ ব্যক্তির লাশ, তারপর নাবালিগ সন্তানের লাশ, তারপর হিজড়ার লাশ, তারপর মহিলার লাশ এবং এরপর বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে এমন কন্যার লাশ রাখবে। একাধিক পুরুষ মানুষের জানাযা একত্রিত হলে ইমাম হাসান ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে উত্তম ও বয়োজ্যেষ্ঠ, তার লাশ ইমামের নিকট রাখবে। যদি আযাদ এবং ক্রীতদাসের জানাযা একত্রিত হয়, তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে সর্বাবস্থায় আযাদ ব্যক্তির লাশ ইমামের নিকটে রাখবে (ফাতহুল কাদীর)।

১৭. মাসআলা ঃ ইমাম জানাযার নামাযের তাকবীর বলে নামায আরম্ভ করার পর যদি অপর একটি জানাযা এসে হাযির হয়, তাহলে প্রথম ব্যক্তির জানাযার নামায শেষ করবে। তারপর নতুন ভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জানাযা পড়বে। যদি (দ্বিতীয় জানাযা) রাখার পর ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর বলে এবং এতে উভয়ের জানাযার নিয়্যাত করে, তবে এ তাকবীর প্রথম জনের বলে ধর্তব্য হবে। দ্বিতীয় জনের হবে না। আর যদি দ্বিতীয় তাকবীর বলার সময় শুধু দ্বিতীয় জনের নিয়্যাত করে, তবে এ তাকবীর দ্বিতীয় জনের বলে ধর্তব্য হবে। এ অবস্থায় ইমাম প্রথম জনের জানাযা থেকে খারিজ হয়ে যাবে। সুতরাং দ্বিতীয় জনের জানাযা থেকে ফারিগ হওয়ার পর পুনরায় প্রথম জনের জানাযা আদায় করতে হবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। জানাযা পড়া অবস্থায় ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে নামায পড়ানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দেয় তবে তা জাইয আছে। এটা সহীহ্ মত (যহীরিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামাযের পূর্বে অথবা গোসলের পূর্বে দাফন করে দেওয়া হয়, তবে তিন দিন পর্যন্ত তার কবরের উপর জানাযা পড়া জাইয আছে। সহীহ্ মত হল ঃ তিন দিনের এ সময় অপরিহার্য নয়। বরং মৃত ব্যক্তির লাশ ফুলে ও ফেটে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া যাবে (সিরাজিয়্যা)। ঈদগাহে এবং বাড়ীতে জানাযার নামায পড়ার হুকুম একই (মুহীত)। যে মসজিদে জামাআত হয় এরূপ মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ্। চাই মায়্যিত ও মুসল্লী সকলেই মসজিদে হোক অথবা মায়্যিত মসজিদের বাইরে এবং মুসল্লী মসজিদের ভিতরে অথবা ইমাম কতিপয় মুসল্লীসহ মসজিদের বাইরে এবং অবশিষ্ট লোক মসজিদের ভিতরে অথবা মায়্যিত মসজিদের ভিতরে কিন্তু ইমাম ও সমস্ত মুসল্লী মসজিদের বাইরে। এটাই পসন্দনীয় মত (খুলাসা)। বৃষ্টি বা এ জাতীয় কোন ওযরের কারণে হলে মাকরূহ্ হবে না (কাফী)। রাস্তায় বা অন্য মানুষের যমীনে জানাযা পড়া মাকরূহ (মুযমারাত)। যে মসজিদ জানাযার নামায পড়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে, তাতে জানাযা পড়া মাকরূহ নয় (তাবয়ীন)। জানাযার নামায না পড়া পর্যন্ত উপস্থিত লোকদের চলে যাওয়া উচিত নয়। জানাযার নামায আদায় করার পর দাফনের পূর্বে যেতে হলে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি নিয়ে যাবে। আর দাফনের পর অনুমতি ব্যতীতও যাওয়া যাবে (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ কবর, দাফন এবং মৃত ব্যক্তির লাশ একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কিফায়া (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। লাহ্দ কবর করা সুন্নাত। শক[১] কবর করা সুন্নাত নয় (মুহীত ঃ সুরুখসী)। লাহ্দ কবর করার নিয়ম হল ঃ কবর পূর্ণভাবে খনন করে কিবলার পার্শ্বে গর্ত করে ঐ গর্তে মৃত ব্যক্তির লাশ রাখবে (মুহীত)। পরে একে ছাদ বিশিষ্ট একটি কামরার ন্যায় বানিয়ে দিবে (আল্ বাহ্রুর রায়িক)। মাটি নরম হলে শক কবর করাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শক কবর খনন করার নিয়ম হল ঃ খালের ন্যায় একটি গর্ত খনন করে এর উভয় পার্শ্ব কাঁচা ইট বা অন্য কিছু দ্বারা মযবুত করে দিবে এবং পরে লাশ রেখে এর উপর মাটি দিয়ে তা ছাদের মত বানিয়ে দিবে (মি'রাজুদ দিরায়া)। কবরের গভীরতা মধ্যমাকৃতি মানুষের সীনা সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। গভীরতা যত বেশী হয়, ততই ভাল (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কবর এক মানুষের দৈর্ঘের সমান দৈর্ঘ এবং এর অর্ধেকের সমপরিমাণ প্রস্থ হওয়া আবশ্যক (মুযমারাত)। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, আমাদের দেশের মাটি যেহেতু নরম, তাই লাশ রাখার জন্য বাক্স তৈরী করে তাতে লাশ রেখে দাফন করা জাইয। লোহার বাক্স বানালে তাতেও কোন দোষ নেই। তবে লোহার বাক্স তৈরী করলে তাতে মাটি বিছিয়ে দিবে এবং এর উপরিভাগ যা মৃত লাশের দেহের সাথে মিলে থাকবে, এর উপরও মাটির প্রলেপ দিয়ে দিবে। আর মৃত ব্যক্তির ডানে এবং বামে কাঁচা ইট রেখে দিবে। যাতে লোহার বাক্সটি লাহ্দের অনুরূপ হয়ে যায়। লাহ্দ কবরে লাশের গায়ের সাথে মিশিয়ে পাকা ইট লাগানো মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যে স্থান দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, এমন স্থানে লাশ দাফন করা মাকরূহ্ (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ লাশ দাফন করার জন্য যারা কবরে অবতরণ করবে, তাদের সংখ্যা জোড় বা বে-জোড় হওয়া উভয়ই সমান (কাফী)। তবে আমানতদার ও নেককার লোকদের কবরে অবতরণ করা মুস্তাহাব (তাতারখানিয়্যা)। মহিলার লাশ কবরে রাখার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী মাহরাম আত্মীয় অন্যদের তুলনায় উত্তম (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। অনুরূপভাবে নিকটবর্তী গায়রে মাহরাম আত্মীয়-অনাত্মীয় ব্যক্তির তুলনায় উত্তম। আত্মীয় না থাকলে অনাত্মীয় ব্যক্তি কর্তৃক মৃত মহিলাকে কবরে রাখাতে কোন দোষ নেই (আল্ বাহ্রুর রায়িক)। লাশ কবরে রাখার জন্য কোন মহিলা কবরে অবতরণ করবে না (মুহীত) ঃ সুরুখসী)।

৩. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামাবে। এর জন্য নিয়ম হল ঃ মৃত ব্যক্তিকে এনে কবরের পার্শ্বে কিবলার দিকে রাখবে এবং সেখান থেকে উঠিয়ে তাকে লাহ্দ কবরে রাখবে। এ নিয়ম অনুসরণ করলে লাশ গ্রহণকালে গ্রহণকারীদের চেহারা কিবলামুখী থাকবে (ফাতহুল কাদীর)। যারা লাশ কবরে রাখবে তারা পড়বে بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ। (মুতূন)। লাশ কবরে ডান পার্শ্বদেশে কিবলামুখী করে রাখবে (খুলাসা)। তারপর কাফনের

১. আমাদের দেশে প্রচলিত কবর।

গিরা খুলে দিবে। এরপর কাঁচা ইট বা বাঁশ দিয়ে (কবরের উপর মাটি দিয়ে) দিবে। পাকা ইট এবং কাঠ দিবে না। মহিলা কবরস্থ করার সময় তার কবরের উপর পর্দা টানিয়ে নিবে। পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ করবে না। তারপর কবরের উপর মাটি দিবে (মুতূন)। হাত, কোদাল কিংবা অন্য যে কোন কিছু দিয়ে সম্ভব মাটি দিবে। এতে কোন দোষ নেই (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। কবর থেকে যে পরিমাণ মাটি বের হয়েছে, এর থেকে বেশী মাটি কবরে দেওয়া মাকরূহ্ (আয়নী ঃ শরহুল কানয)।

৪. মাসআলা ঃ দাফন কার্যে উপস্থিত লোকদের জন্য মুস্তাহাব হল, নিজের উভয় হাত দ্বারা তিন বার মাটি নিয়ে তা কবরের উপর দেওয়া। মাটি মাথার দিক থেকে দিবে। প্রথম বার মাটি দেওয়ার সময় مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয় বার মাটি দেওয়ার সময় وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং তৃতীয় বার মাটি দেওয়ার সময় وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى পাঠ করবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। মৃত ব্যক্তিকে রাতে দাফন করাতে কোন দোষ নেই। তবে দিবা ভাগে দাফনের কাজ করা সহজ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কবর উটের চুটের ন্যায় এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করবে। কবরকে চারকোণ বিশিষ্ট বানাবে না। কবর পাকা করবে না। কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

৫. মাসআলা ঃ কবরের উপর দালান-কোঠা নির্মাণ করা, কবরের উপর বসা, ঘুম যাওয়া, কবর মর্দন করা, কবরের উপর পেশাব-পায়খানা করা অথবা কোন লেখা বা অন্য কোন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে মানুষের নিকট পরিচয় করানো মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। কবর নষ্ট হয়ে গেলে তাতে নতুন করে প্রলেপ দেওয়াতে কোন দোষ নেই (তাতারখানিয়্যা)। এটাই বিশুদ্ধতম মত। এর উপরই ফাতওয়া (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে নিজের জন্য কবর খনন করে রাখে, এতে কোন ক্ষতি নেই। বরং এতে সে ছওয়াবের ভাগী হবে (তাতারখানিয়্যা)। কোন ব্যক্তি নিজের জন্য কবর খনন করল, এতে যদি অন্য মানুষ অপর কোন মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করতে চায়, তবে কবরস্তান প্রশস্ত হলে এরূপ করা মাকরূহ্ হবে। আর কবরস্তান সংকীর্ণ হলে জাইয হবে। তবে কবর খননকারী ব্যক্তির কবর খনন করতে যা খরচ হয়েছে, তা আদায় করে দিতে হবে (মুযমারাত)।

৬. মাসআলা ঃ যে কবরস্তানে নেককার পুণ্যবান লোকদেরকে দাফন করা হয়েছে সেখানে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করা উত্তম। মুস্তাহাব হল, দাফনকার্য সমাধা করার পর কবরের নিকট এ পরিমাণ সময় বসে থাকা, যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে একটি উট যবাহ্ করে তার গোশ্ত মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যায়। এ সময় কবরের নিকট বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কবরের নিকট বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মাকরূহ নয়। আমাদের মাশায়িখে কেরাম ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতটি গ্রহণ করেছেন। পসন্দনীয় মতানুসারে এতে মৃত ব্যক্তির উপকার হয় (মুযমারাত)।

৭. মাসআলা ঃ কবরের উপর মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা মাকরূহ্ (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যে কাজ সুন্নাত নয় এমন কাজ কবরের নিকট করা মাকরূহ্। সুন্নাতের মধ্যে কবর যিয়ারত করা এবং কবরের নিকট দাঁড়িয়ে দু'আ করা ব্যতীত আর কিছুই নেই (আল-বাহ্রুর রায়িক)। দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করবে না। অবশ্য প্রয়োজন হলে করতে পারবে। এরূপ করতে হলে সে ক্ষেত্রে কিবলার দিকে পুরুষ ব্যক্তিকে রাখবে। তারপর বালক, তারপর হিজ্ড়া এবং এরপর মহিলার লাশ রাখবে। আর এ অবস্থায় দুই মায়্যিতের মধ্যে মাটি দিয়ে আড় সৃষ্টি করে দিবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। দুইজন পুরুষ ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করতে হলে তাদের মধ্যে উত্তম জনকে প্রথমে কবরে রাখবে (মুহীত)। দুইজন মহিলার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (তাতারখানিয়্যা)।

৮. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির লাশ পচে-গলে মাটি হয়ে যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তির কবরে অন্য লাশ দাফন করা অথবা এর ক্ষেত করা অথবা ঘর-বাড়ি তৈরী করা জাইয আছে (তাবয়ীন)। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, যে ব্যক্তি যে স্থানে মারা যাবে, তাকে ঐ এলাকার লোকদের কবরস্তানে দাফন করা। অবশ্য দাফনের আগে যদি এক বা দুই মাইল দূরে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই (খুলাসা)। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি নিজ শহর ছাড়া অন্য শহরে মারা যায়, তবে তাকে ঐ স্থানে দাফন করাই মুস্তাহাব। অবশ্য অন্য শহরে স্থানান্তরিত করলে তাতে কোন পাপ নেই। দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা সমীচীন নয়। কিন্তু দাফনকৃত যমীন জবর দখলকৃত ভূমি হলে অথবা এ যমীনে কেউ হক্কে শুফ'আর দাবী করলে মৃত ব্যক্তির লাশ ঐ কবর থেকে উঠিয়ে অন্য কবরে দাফন করা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি অন্যের যমীনে মালিকের অনুমতি ছাড়া কাউকে দাফন করা হয়, তবে উক্ত মালিকের যা ইচ্ছা সে করতে পারবে। সে ইচ্ছা করলে মৃত ব্যক্তির লাশ কবর থেকে উঠিয়ে নেওয়ার হুকুম দিতে পারবে। ইচ্ছা করলে কবরের যমীন সমান করে তার উপর ফসলও বপন করতে পারবে (তাজনীস)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কারো লাশ কিবলামুখী করে না শোয়ান হয়ে থাকে অথবা বাম কাত করে শোয়ান হয়ে থাকে অথবা মাথা পায়ের দিকে এবং পা মাথার দিকে রাখা হয়ে থাকে এবং এ অবস্থায় মাটি দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কবর খুঁড়ে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা হবে না। কিন্তু যদি শুধু কাঁচা ইট দেওয়া হয়ে থাকে এবং মাটি দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে লাশ বের করে সুন্নাত অনুযায়ী রাখবে (তাবয়ীন)। যদি কবরে কোন মাল-সামান পড়ে যায় এবং মাটি দেওয়ার পর তা জানা যায়, তবে কবর খনন করে ঐ সামান বের করে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ্গণ বলেন, এক দিরহাম পরিমাণ মাল হলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আল-বাহ্রুর রায়িক)। কবরস্তানের কাষ্ঠ (গাছ) ও ঘাস কাটা মাকরূহ্। তবে শুকনা হলে কাটাতে কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের মাযহাবে কবরস্তানের উপর দিয়ে জুতা পায়ে হাঁটা মাকরূহ্ নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আনুষঙ্গিক আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ শোক-সন্তপ্ত পরিবারের লোকদের প্রতি তা'যিয়াত তথা সমবেদনা প্রকাশ করা ভাল (যহীরিয়্যা)। হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, শোকাহত লোকদের প্রতি একবার সমবেদনা প্রকাশ করার পর পুনরায় তা প্রকাশ করা সমীচীন নয় (মুযমারাত)। তাযিয়াত তথা সান্ত্বনা দেওয়ার সময় হল মৃত্যুর দিন হতে তিন দিন পর্যন্ত। এরপর তাযিয়াত প্রকাশ করা মাকরূহ্। অবশ্য সান্ত্বনা দানকারী অথবা যাকে সান্ত্বনা দেওয়া হবে, সে যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে ঐ তিন দিনের পরেও সান্ত্বনা দিতে পারবে। এতে কোন দোষ নেই। দাফনের পূর্বে সান্ত্বনা দেওয়া অপেক্ষা দাফনের পর সান্ত্বনা দেওয়া উত্তম। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিপদগ্রস্ত লোকদের মধ্যে চরম হা-হুতাশ পরিলক্ষিত না হয়। অবশ্য তাদের মধ্যে চরম হা-হুতাশ পরিলক্ষিত হলে দাফনের পূর্বেই সান্ত্বনা দিবে। মৃত ব্যক্তির যে কোন আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেওয়া মুস্তাহাব। এমনকি বড়, ছোট, পুরুষ, মহিলা সকলকে সান্ত্বনা দিবে। কিন্তু শোকাহত লোকটি যুবতী মহিলা হলে কেবল মাহরাম ব্যক্তিই তাকে সান্ত্বনা দিবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলাঃ শোক-সন্তপ্ত লোকদেরকে নিম্নোক্ত বাক্যে সান্ত্বনা দেওয়া মুস্তাহাব।

غَفَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَيِّتِكَ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ وَتَغَمَّدَهُ بِرَحْمَتِهِ وَرَزَقَكَ الصَّبْرَ عَلَى الْمُصِيْبَةِ وَاٰجَرَكَ عَلٰى مَوْتِهِ –

(মুযমারাত ঃ হুজ্জাত-এর সূত্রে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বাক্যে সান্ত্বনা দিতেন, তা হল নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى

কাফির কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিলে বলবে।

اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ عَزَاءَكَ

আর মুসলমান কোন কাফিরকে সান্ত্বনা দিলে বলবে,

اَحْسَنَ اللّٰهُ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ

এ ক্ষেত্রে সে اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ বলবে না। আর কাফির কাফিরকে সান্ত্বনা দানকালে বলবে,

اَخْلَفَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَلَا نَقَصَ عَدَدَكَ (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)

৩. মাসআলা ঃ বিপদগ্রস্ত এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের লোকদের জন্য তিন দিন পর্যন্ত ঘরে বা মসজিদে বসে থাকা দোষণীয় নয়। তাহলে লোকেরা তাদের নিকট আসবে এবং তাদেরকে

সান্ত্বনা প্রদান করবে। ঘরের দরজায় বসে থাকা মাকরূহ্। কোন আপন জনের মৃত্যুর পর অনারব দেশের লোকেরা যা করে অর্থাৎ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিছানা বিছিয়ে রাখা এবং রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত খারাপ (যহীরিয়্যা)। "খাযানাতুল ফাতাওয়া" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বিপদের কারণে তিন দিন পর্যন্ত ঘরে বসে থাকার অনুমতি রয়েছে। তবে এরূপ না করাই উত্তম (মি'রাজুদ দিরায়া)।

৪. মাসআলা ঃ কারো মওতের কারণে উচ্চস্বরে আওয়ায করে কান্নাকাটি করা জাইয নেই। অবশ্য হৃদয়ের ব্যথার কারণে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলে তাতে কোন দোষ নেই। শোক প্রকাশের নিমিত্তে পুরুষের জন্য কালো রংগের পোশাক পরিধান করা মাকরূহ্। এমনিভাবে জামা-কাপড় ছিঁড়াছিড়ি করাও মাকরূহ্। অবশ্য মহিলাদের জন্য শোক প্রকাশের নিমিত্তে কালো পোশাক পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, শোক প্রকাশের লক্ষ্যে গণ্ডদেশ এবং হাতে কালো রং লাগানো, জামা-কাপড় ফাড়া, মুখমণ্ডলে খামচি দেওয়া, মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলা, মাথায় মাটি মারা, উরু এবং বুকে থাপ্পড় মারা, কবরে বাতি জ্বালানো ইত্যাদি জাহিলী রুসুম, বাতিল তরীকা এবং ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয় (মুযমারাত)। মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের জন্য খানা তৈরী করে প্রেরণ করা দোষের কিছু নয় (তাবয়ীন)। কারো মারা যাওয়ার তৃতীয় দিন যিয়াফত করে খানাপিনার ইন্তেজাম করা জাইয নয় (তাতারখানিয়্যা)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ শহীদ-এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ শরীআতের পরিভাষায় শহীদ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে কাফির, রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা সন্ত্রাসীরা হত্যা করে অথবা যাকে জিহাদের ময়দানে পাওয়া যায় এবং তার শরীরে আঘাতের চিহ্নও বিদ্যমান থাকে অথবা যার চোখ, কান বা পেট থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় কিংবা যার শরীরে অগ্নিদহনের চিহ্ন বিদ্যমান থাকে অথবা যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের কোন জন্তুর পায়ে নিষ্পেষিত হয়ে মারা যায় এবং তখন ঐ শত্রু এর উপর সওয়ার ছিল বা তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা যাকে শত্রুপক্ষের কোন জন্তু হাত-পা দ্বারা দলিত করে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তে রঞ্জিত করে দেয় অথবা শত্রুপক্ষের কোন ব্যক্তি স্বীয় জন্তুকে এমনভাবে প্রহার বা উত্তেজিত করে দেয় যে, ঐ জন্তু দৌড়িয়ে গিয়ে তাকে নিষ্পেষিত করে মেরে ফেলে অথবা যাকে শত্রু আক্রমণ করে পানিতে কিংবা আগুনে ফেলে দেয় অথবা যাকে কোন প্রাচীর থেকে ফেলে মেরে ফেলা হয় অথবা কোন প্রাচীর ফেলে যাকে হত্যা করা হয় অথবা মুসলিম সৈন্যদের প্রতি যদি আগুন নিক্ষেপ করা হয় কিংবা ঐ নিক্ষিপ্ত আগুন যদি বাতাসে উড়িয়ে মুসলিম সৈন্যদের শিবিরে এনে ফেলে অথবা শত্রু সৈন্যরা যদি কোন কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যার একটি অংশ মুসলমানদের তাঁবুর সাথে লাগান আছে অথবা কাফির সৈন্যরা মুসলমানদের প্রতি এমনভাবে পানি ছাড়ল যে এতে মুসলমান জলে, ডুবে মারা গেল অথবা যাকে অন্য কোন মুসলমান জুলুম করে হত্যা করে এবং এতে হত্যাকারীর উপর দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব না হয় । উপরোক্ত সকলেই শহীদ হিসাবে গণ্য হবে (কাফী)। যিম্মী অথবা আমানপ্রাপ্ত লোকেরা যদি কাউকে হত্যা করে, তবে সেও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া)। সন্ধির ভিত্তিতে অথবা পিতা পুত্রকে[১] হত্যা করার কারণে দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়াতে শহীদ হওয়া থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। কেননা, উল্লিখিত অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয়েছিল, কিন্তু কিসাসের হুকুম সন্ধি অথবা সন্দেহজনিত হত্যার কারণে রহিত হয়ে গিয়েছে (আয়নী ঃ শরহুল কান্‌য)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের জান–মাল হিফাযত করতে গিয়ে অথবা মুসলমান কিংবা কোন যিম্মীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, লোহা, পাথর কিংবা কাঠ যে কোন, কিছুর আঘাতেই সে নিহত হোক শহীদ হিসাবে গণ্য হবে (মুহীতঃ সুরুখ্‌সী)। যদি মুসলমান কোন নৌকায় থাকে এবং শত্রুরা ঐ নৌকার প্রতি আগুন নিক্ষেপ করে এবং এতে যদি নৌকায় আগুন লেগে যায় আর সকলেই মারা যায়, তারপর এই নৌকার আগুন যদি অন্য নৌকায় লাগে এবং এতে ঐ নৌকার মুসলমানগণও মারা যায়, তবে তারা সকলেই শহীদ বলে গণ্য হবে (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ শহীদের হুকুম হল ঃ তাকে গোসল করানো হবে না। কিন্তু তার জানাযার নামায পড়া হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। তাকে তার পরিধানের কাপড় এবং রক্তসহ দাফন করা হবে (কাফী)। যদি শহীদের কাপড়ে নাপাকী লেগে থাকে, তবে তা ধুয়ে দেওয়া হবে (ইতাবিয়্যা)। শহীদ ব্যক্তির গায়ে যদি এমন বস্ত্র থাকে যা কাফন জাতীয় নয় যেমন হাতিয়ার, চামড়ার পোশাক, চামড়ার মোজা, টুপি ও পায়জামা, তাহলে তা খুলে ফেলা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) কেবল "সিয়ার গ্রন্থে" পায়জামার কথা উল্লেখ করেছেন। শায়খ আবূ জা'ফর হিন্দাওয়ানী (র) বলেন, পায়জামা না খোলাই উত্তম। অধিকাংশ মাশায়িখে কেরাম তাঁর এ মতটি সমর্থন করেছেন (মুহীত)। যদি তার কাফন অর্থাৎ পরিহিত কাপড় সামান্য হয়, তবে বাড়িয়ে তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে। আর যদি সুন্নাত কাফন হতে বেশী হয়, তাহলে তা কমিয়ে দেওয়া হবে (কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ অন্যান্য মৃত ব্যক্তির শরীরে যেমন হানূত (সুগন্ধি) লাগানো হয় শহীদ ব্যক্তির গায়েও অনুরূপভাবে তা লাগানো হবে (আল্‌বাহরুর রায়িক)। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে শহীদ ব্যক্তি যদি জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয এমন ব্যক্তি) অথবা না–বালিগ বা পাগল হয়, তবে তাকে গোসল করানো হবে (তাবয়ীন)। অনুরূপভাবে যদি হায়েয বা নিফাসওয়ালী মহিলা নিহত হয়, তবে সে পবিত্র হয়ে গিয়ে থাকলে এবং তার ঋতু আসা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে গোসল দেওয়া হবে। আর ঋতু আসা বন্ধ না হয়ে থাকলে যদি কিছু দেখা যায় এবং তা যদি হায়েযের রক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাকে গোসল দেওয়া হবে (কাফী)। যদি এক দিন বা দুই দিন রক্ত আসার পর সে নিহত হয়ে থাকে–তবে ফকীহ্‌গণের সম্মিলিত মতে তাকে গোসল করানো হবে না (আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ মুরতাছ ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিছুক্ষণ জীবিত থাকার দরুন শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়নি, তাকে গোসল করানো হবে। যেমন সে পানাহার করল, শয়ন

১. কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা হয় এমন অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলে কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার বিধান, কিন্তু শরীআতে পিতা এরূপ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের পর্যায়ে অর্থাৎ পিতা পুত্রকে এরূপ অস্ত্র দ্বারা হত্যা করলে কিসাসের পরিবর্তে দিয়্যাত বা রক্তপণ পিতার উপর ওয়াজিব হবে।

করল অথবা ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করল কিংবা তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে জীবিত অবস্থায় বাড়ীতে বা তাঁবুতে আনা হয়েছে। তবে ঘোড়ায় যাতে পদদলিত না করে এ জন্য যাকে ময়দান থেকে উঠিয়ে আনা হয়, তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যদি যুদ্ধের পর কাউকে জীবিত অবস্থায় তাঁবুতে নিয়ে আসা হয়, অথবা যুদ্ধের পর কেউ যদি জীবিত থাকে এবং এ অবস্থায় এক নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায় আর জ্ঞান–বুঝও তার ঠিক থাকে, তাহলে তাকে মুরতাছ مرتث বলা হবে (হিদায়া)। যুদ্ধের পর বেচা–কেনা ও অধিক কথা বলা ইত্যাদি ইরতিছাছ ارتثاث হিসাবে গণ্য হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এ অবস্থাগুলো পাওয়া গেলে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এ অবস্থাগুলো পাওয়া গেলে তাকে মুরতাছ বলা হবে না (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ আহত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি যদি কাউকে দুনিয়াবী বিষয়ে ওসিয়ত করে অথবা কেউ যদি শহরে নিহত হয় এবং এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তাকে জুলুম করে লৌহ জাতীয় কোন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে তাদেরকে গোসল করানো হবে (আয়নী ঃ শরহুল কান্‌য)। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি আহত হওয়ার পর নিজ স্থান থেকে দাঁড়াতে পারে অথবা জায়গা পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যায়, তবে তাকেও গোসল কারানো হবে (খুলাসা)। যদি কোন মুশরিক ব্যক্তির ঘোড়া ছুটে গিয়ে কোন মুসলমানকে পিষে ফেলে এবং ঘোড়ার পিঠে যদি কোন আরোহী না থাকে অথবা কোন মুসলমান কোন মুশরিকের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার পর তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অপর মুসলমানের গায়ে বিদ্ধ হলে অথবা কোন মুশরিক ব্যক্তির ঘোড়া কর্তৃক তাড়িত হয়ে কোন মুসলমানের ঘোড়া তার আরোহীকে ভূপাতিত করে দিলে অথবা মুসলিম ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার সময় কোন কাফির তাকে তাড়া করে তাকে আগুনে কিংবা গর্তে পতিত হতে বাধ্য করলে অথবা মুসলমানগণ নিজেরা তাদের চার পাশে কাঁটা বিছিয়ে রাখলে এবং সে কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে কেউ মারা গেলে, তাদের সকলকেই গোসল করানো হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি যুদ্ধের সময় মস মানের সওয়ারীর জন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে তার আরোহীকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং এতে [illegible]রা যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে তাকে গোসল দিতে হবে। যদি মুসলমানদের সওয়ারীর জন্তু মুশরিকদের পতাকা দেখে তাদের তাড়ানো ব্যতিরেকেই পালাতে আরম্ভ করে এবং এতে মুসলিম সওয়ারী ব্যক্তি মাটিতে পড়ে মারা যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে তাকেও গোসল দেওয়া হবে। এমনিভাবে যদি মুশরিক সৈন্যরা কোন শহরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মুসলমানগণ ঐ শহরের সীমান্ত প্রাচীরে আরোহণ করে আর সেখান থেকে কারো পা পিছলিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে সে যদি মারা যায়, তবে শায়খায়নের মতে তাকেও গোসল দিতে হবে। পরাজিত হয়ে পলায়নকালে মুসলমানদের সওয়ারীর জন্তু যদি অন্য কোন মুসলমানকে দলিত করে মেরে ফেলে এবং ঐ সওয়ারীর সাথে যদি আরোহী এবং চালকও থাকে, তবু নিহত ব্যক্তিকে গোসল দিতে হবে। এভাবে মুসলমান সৈন্যরা কোন প্রাচীর ছিদ্র করার সময় যদি ঐ প্রাচীর ধসে কারো গায়ে পড়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং এতে সে মারা যায়, তবে তাকে গোসল করানো হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন (মুহীত)। কেউ শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলে তার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (বাদাই')।

৮. মাসআলা ঃ যদি মুসলমান এবং কাফির সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি হয় এবং তাদের মধ্যে কোন মুকাবিলা না হয়, এ অবস্থায় কাউকে মৃত পাওয়া গেলে তাকে গোসল দিতে হবে। অবশ্য যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তাকে জুলুম করে লৌহ জাতীয় অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে গোসল দিতে হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কাউকে যদি যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায় এবং তার শরীরে হত্যার কোন নিদর্শন যেমন ক্ষত, শ্বাস রোধকরণ, প্রহারের দাগ ইত্যাদি না থাকে কিংবা তার শরীর থেকে যদি রক্তও প্রবাহিত না হয়, তাহলে তাকে শহীদ হিসাবে গণ্য করা হবে না। যদি রক্ত এমন কোন স্থান থেকে বের হয়, যা কোন অভ্যন্তরীণ রোগের কারণেও নির্গত হতে পারে, যেমন নাক, লিঙ্গ বা বাহ্যদ্বার ইত্যাদি, তবে তাকে শহীদ গণ্য করা হবে না। এমনিভাবে মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে যদি তা মুখ দিয়ে নির্গত হয়, তবে এতেও কেউ শহীদ হবে না (বাদাই')। এ বিষয়ে মূলনীতি হলঃ যে ব্যক্তি কাফির, রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা সন্ত্রাসীর সাথে যুদ্ধকালে তাদের দ্বারা অর্থাৎ শত্রু কর্তৃক নিহত হবে অথবা যার হত্যার কারণ শত্রু দ্বারা সংঘটিত হবে, তাকে শহীদ হিসাবে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি শত্রু কর্তৃক নিহত না হয়, তবে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে না (মুহীত)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ সিজদা সম্পর্কিত মাসাইলের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সিজদার মাসআলাসমূহ কতগুলো মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। নিম্নে তা প্রদত্ত হল ঃ

(১) সিজদা যদি যথাস্থানে আদায় করা হয়, তবে তা নিয়্যাত ছাড়াও সহীহ্ হবে। আর যদি তা যথাস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে তা নিয়্যাত ছাড়া আদায় করা সহীহ্ হবে না। যদি আদায়কৃত সিজদা এবং তার যথাযথ স্থান-এর মধ্যে এক রাকআত পরিমাণ ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন এ সিজদাকে ফওত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। (২) দ্বিতীয় মূলনীতি হল, কোন রাকআত বা কোন সিজদা তরক করার ব্যাপারে সন্দেহ হলে উভয়টি আদায় করবে। এতে যা ছুটেছে তা নিশ্চিতরূপে আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সিজদা রাকআতের আগে আদায় করবে। সিজদার আগে রাকআত আদায় করা হলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (৩) তৃতীয় মূলনীতি হল ঃ যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, এ কাজটি ওয়াজিব না বিদআত, তবে সতর্কতার লক্ষ্যে কাজটি সম্পন্ন করে নিবে। আর যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, একাজটি বিদআত না সুন্নাত, তবে তা বর্জন করবে। (৪) চতুর্থ মূলনীতি হল ঃ সিজদা ছুটে গেলে চিন্তা করে দেখবে, যে পরিমাণ সিজদা ছুটে গিয়েছে এবং যে পরিমাণ সিজদা আদায় করা হয়েছে এর মধ্যে কোন্‌টির সংখ্যা কম ? যে সংখ্যাটি কম, সে সংখ্যার থেকে হিসাব ধর্তব্য হবে। কেননা, কম সংখ্যা থেকে হিসাব করা সহজ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী, যহীরিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করছিল, নামাযের শেষ পর্যায়ে সালামের আগে বা পরে তার স্মরণ হল যে, তার একটি সিজদা ছুটে গিয়েছে, তাহলে সে প্রথমে সিজদা আদায় করবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিবে। যদি ইয়াকীন হয় যে, এটি প্রথম রাকআতের সিজদা ছিল এবং এ ব্যাপারে ধারণা প্রবল হয়, তা[illegible]কাযার নিয়ত করবে। আর এটি প্রথম না দ্বিতীয় রাক'আতের সিজদা ছিল, তা যদি মনে না থাকে এবং চিন্তা-ভাবনা করার পর কোন প্রবল ধারণাও সৃষ্টি না হয়, তাহলেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর এটি দ্বিতীয় রাক'আতের সিজদা ছিল বলে প্রবল ধারণা হলে সিজদা করার সময় কাযার নিয়্যাত করবে না।

৩. মাসআলা ঃ নামাযের শেষ পর্যায়ে যদি মনে পড়ে যে, দুই সিজদা ছুটে গিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে মনে যদি এ কথা নিশ্চিত থাকে যে, দুই রাকআত থেকে এই দুই সিজদা ছুটেছে অথবা শেষ রাকআত থেকে ছুটেছে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে এই দুই সিজদা করে নেওয়া। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে। আর যদি মুসল্লীর মনে এ মর্মে নিশ্চিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বাস থাকে যে, এ দুটো সিজদা প্রথম রাকআত থেকেই ছুটেছে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে এর সাথে অপর এক রাকআত মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু এ সিজদা কিভাবে, কোত্থেকে ছুটেছে, এ সম্পর্কে তার যদি নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টি না হয়, তবে প্রথম রাকআতের দুই সিজদার নিয়্যাতে তা কাযা করবে এবং পরে এর সাথে এক রাকআত নামায পড়ে নিবে। কেউ যদি দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ পায়, তবে সে এ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। কেননা, সিজদা দুটো প্রথম রাকআতের রুকূর সাথে মিলিত হয় । এ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এটি একটি বর্ণনা। অপর বর্ণনা মতে দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর সাথেও সিজদাদ্বয় মিলিত হয়। এ বর্ণনা মুতাবিক উক্ত ব্যক্তি রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। এই দুই সিজদা কোন্ রাকআত থেকে ছুটেছে এ কথা জানা না থাকলে প্রথমে দুই সিজদা করবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে না। বরং দাঁড়িয়ে আরো এক রাকআত আদায় করে পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে সালাম ফিরাবে এবং এরপর সাহু সিজদা করবে।

৪. মাসআলা ঃ যদি কারো মনে পড়ে যে, তার তিনটি সিজদা ছুটেছে, তাহলে সে এক সিজদা দিয়ে আরো এক রাকআত নামায আদায় করবে। এরপর আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। সিজদা করার সময় কাযার নিয়্যাত করবে না। আর যদি এ কথা মনে পড়ে যে, তার চারটি সিজদা ছুটে গিয়েছে তাহলে এক বর্ণনা মতে সে দুই সিজদা আদায় করবে এবং তা প্রথম রুকূর সাথে মিলিয়ে, আদায় করে নিবে। অপর এক বর্ণনা মতে দ্বিতীয় রুকূর সাথে মিলিয়ে এই দুই সিজদা আদায় করবে এবং এর সাথে আরো এক রাকআত আদায় করে নিবে (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ যদি কারো মাগরিবের নামাযে এক সিজদা ছুটে যায়, তবে সে শুধু ঐ সিজদাই আদায় করবে এবং যা তার ছুটে গেছে তা আদায়ের নিয়্যাত করবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সাহু সিজদা করবে। যদি মাগরিবের নামাযে দুই সিজদা ছুটে যায় এবং এ দুই সিজদা উভয় রাকআত থেকে ছুটেছে, না এক রাকআত থেকে ছুটেছে, তা জানা না থাকে, তবে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে। যদি চিন্তা-ভাবনা করার পর কোন সিদ্ধান্তে না পৌছতে পারে, তবে সতর্কতার উপর আমল করবে। ছুটে যাওয়া সিজদা দুটো আদায় করবে। এ সময় যা ফওত হয়েছে এর নিয়্যাত করবে অথবা কাযার নিয়্যাত করবে। এরপর আত্তাহিয়্যাতু .ড় এর সাথে আরো এক রাকআত মিলিয়ে নিবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সাহু সিজদা করবে। এরপর পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে। যদি তিন সিজদা ছুটে যায়, তবে পূর্ব বর্ণিত নিয়মে চিন্তা-ভাবনা করার হুকুম করা হবে। যদি চিন্তা-ভাবনা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারে, তবে তিন সিজদা আদায় করবে। এবং এরপর বসবে। না বসলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। এরপর উঠে আরেক রাকআত নামায আদায় করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে এবং পরে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা আদায় করবে। চার সিজদা ছুটে গিয়ে থাকলে এবং তা কিভাবে ছুটেছে দুই রাকআত থেকে না তিন রাকআত থেকে একথা মুসল্লীর জানা না থাকলে দুই সিজদা আদায় করবে এবং পরে বসবে। এ বসা ওয়াজিব। তারপর উঠে আরো এক রাকআত আদায় করে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। অতঃপর আরেক রাকআত আদায়

করে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সাহু সিজদা করবে। যদি পাঁচ সিজদা ছুটে যায়, তবে আদায়কৃত এক সিজদার সাথে আরো একটি সিজদা করবে। এতে এক রাকআত পুরা হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। এরপর তৃতীয় রাকআত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। তারপর সাহু সিজদা করবে। শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) বলেন, এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ঐ সিজদার মধ্যে এই নিয়্যাত করবে যে, এই সিজদা ঐ রাকআতের অন্তর্ভুক্ত, যে রাকআতে একটি সিজদা আদায় করা হয়েছে। তাহলে এ সিজদা ঐ রুকূর সাথে মিলে যাবে না যে রুকূ এই রাকআতের পর আদায় করা হবে। যদি নিয়্যাত ছাড়া সিজদা করা হয়, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রেও দুই বা তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযের হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি তাতে এক, দুই বা তিনটি সিজদা ছুটে যায় (যহীরিয়্যা) ।

৬. মাসআলা ঃ যদি চারটি সিজদা ছুটে যায় এবং তা কিভাবে ছুটেছে এ কথা জানা না থাকে, তাহলে প্রথমে চার সিজদা করবে, তারপর বসবে। এ বসা ওয়াজিব। যদি না বসে, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তারপর এক রাকআত পড়ে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। এরপর দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত আদায় করে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সাহু সিজদা আদায় করবে। পাঁচ সিজদা ছুটে গিয়ে থাকলে প্রথমে তিন সিজদা আদায় করবে। কিন্তু বসবে না। এরপর আরো দুই রাকআত নামায আদায় করবে এবং সতর্কতার লক্ষ্যে মধ্যখানে বসবে। যদি ছয় সিজদা ছুটে যায়, তবে প্রথমে দুই সিজদা করবে এবং এরপর বসবে না। তারপর দুই রাকআত নামায আদায় করে বসবে এবং পরে আরো এক রাকআত আদায় করবে। যদি সাত সিজদা ছুটে যায়, তবে প্রথমে এক সিজদা করবে, তারপর তিন রাকআত নামায আদায় করবে। ফকীহ্গণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ঐ এক সিজদা আদায় করার সময় ঐ রাকআতের নিয়্যাত করে, যে রাকআতে সে এ সিজদা করেছে। যদি ভুলে নিয়্যাত ছাড়া সিজদা করে, তবে স্মরণ হওয়ার পর দুই সিজদা আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে এই দুই সিজদার মধ্যে কোন এক সিজদার সময় সে কোন্ সিজদা আদায় করছে এর নিয়্যাত করবে। তবেই এই সিজদা প্রথম রাকআতের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয় সিজদা দ্বিতীয় রাকআতের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য হবে। এভাবে তার দুই রাকআত নামায আদায় হয়ে যাবে। এরপর আরো তিন রাকআত আদায় করলে এবং এ তিনের দ্বিতীয় রাকআতে বসে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করলে তারপর চতুর্থ রাকআত আদায় করলে তার নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। যদি আট সিজদা ছুটে যায়, তবে প্রথমে দুই সিজদা আদায় করবে। তারপর তিন রাকআত নামায আদায় করবে।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি ফজরের নামায তিন রাকআত আদায় করে এবং দ্বিতীয় রাকআতের পর না বসে অথবা বসে কিন্তু এক সিজদা ছুটে যায় অথচ তার জানা নেই যে, এ সিজদা কি ভাবে ছুটেছে, তাহলে এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তির নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি দুই সিজদা ছুটে যায়, তবে এ বিষয়ে দুই ধরনের অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তিন সিজদা ছুটে গেলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য চার সিজদা ছুটে

pdf By Syed Mostofa Sakib

গেলে নামায ফাসিদ হবে না। বরং প্রথমে দুই সিজদা করে বসবে। তারপর আরো এক রাকআত নামায আদায় করে নিবে। কেউ যদি যুহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়ে এবং এক সিজদা তার ছুটে যায়, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। বিশুদ্ধতম মতে দুই সিজদা তরক করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে তিন সিজদা, চার সিজদা এবং পাঁচ সিজদা তরক করলেও এ হুকুম হবে।

৮. মাসআলা ঃ ছয় সিজদা তরক করলে তার নামায ফাসিদ হবে না। এ মাসআলাটি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে যুহরের নামায আদায় করল কিন্তু চার সিজদা ছেড়ে দিল। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সাত সিজদা ছেড়ে দিলে নামায ফাসিদ হবে না। তবে এ অবস্থায় প্রথমে তিন সিজদা আদায় করে পরে দুই রাকআত নামায আদায় করে নিবে। যদি আট সিজদা ছুটে যায়, তাহলে প্রথমে দুই সিজদা আদায় করবে। তারপর তিন রাকআত নামায পড়ে নিবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি নয়[১] সিজদা ছেড়ে দেয়, তাহলে সে প্রথমে এক সিজদা আদায় করবে। তারপর এক রাকআত নামায আদায় করে বসবে। এ বসা সুন্নাত। এরপর দুই রাকআত নামায আদায় করে পুনরায় বসবে। এ বসা ওয়াজিব। যদি দশ সিজদা ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রথমে দুই সিজদা আদায় করবে। তারপর তিন রাকআত নামায আদায় করে অবশেষে সাহু সিজদা করবে (যহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি মাগরিবের নামায চার রাকআত আদায় করে ফেলে, তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি দুই সিজদা তরক করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের অভিমত রয়েছে। তিন বা চার সিজদা তরক করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পাঁচ সিজদা তরক করলে নামায ফাসিদ হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমে তিন সিজদা আদায় করবে। তারপর এক রাকআত নামায আদায় করে নিবে। যদি ছয় সিজদা ছেড়ে দেয় তবে প্রথমে দুই সিজদা আদায় করবে। তারপর দুই রাকআত আদায় করে নিবে। যেমন কেউ মাগরিবের তিন রাকআত নামায আদায় করলে এবং দুই সিজদা ছেড়ে দিলে হুকুম দেওয়া হয়ে থাকে। (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)

১. নয় সিজদা ছুটে যাওয়া নফল নামায হতে পারে।

كِتَابُ الزَّكَاةِ
অধ্যায় ঃ যাকাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ যাকাত

[এই অধ্যায়ে আটটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ যাকাতের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, হুকুম এবং এর শর্তাবলীর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যাকাতের সংজ্ঞা ঃ শরীআতর পরিভাষায় যাকাতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ,

هى عليك المال من فقير مسلم غير هاشمى ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه الله تعالى

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে রাযী করার উদ্দেশ্যে হাশেমী নয় এবং তাঁদের আযাদকৃত গোলামও নয় এমন কোন গরীব মুসলিম ব্যক্তিকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া । এই শর্তে যে, এতে দাতা পার্থিব কোনরূপ লাভ বা উপকার লাভ করতে পারবে না[১] (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ যাকাতের হুকুম অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই কেউ যদি যাকাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে এবং যদি কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে হত্যা[২] করা হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

এক বছর পুরা হওয়ার পরপরই বিলম্ব না করে, যাকাত আদায় করা ফরয। সুতরাং ওযর ব্যতীত যাকাত আদায়ে বিলম্ব করলে গুনাহ্ হবে। রাযী (র)-এর বর্ণনা মতে বছর পূর্ণ হওয়ার পরপরই যাকাত আদায় করা জরুরী হয় না। বরং তা বিলম্বেও আদায় করা যায়। না দিলে মওতের সময় গুনাহ্গার হবে (এর আগে নয়।)। তবে প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধতম। (তাহ্যীব)

৩. মাসআলা ঃ যাকাত আদায়ের শর্ত হল যাকাত প্রদানের সময় অথবা যাকাতের মাল পৃথক করার সময় যাকাত দেওয়ার নিয়্যাত করতে হবে (কান্‌য)। কেউ যদি যাকাত আদায়ের নিয়্যাত করে কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু আদায় না করে এবং পরে পুরা বছর কিছু কিছু করে আদায় করতে থাকে, কিন্তু কোন প্রকার নিয়্যাত না করে, তাহলে এতে যাকাত আদায় হবে না (তাবয়ীন)। যাকাত দেওয়ার সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কি দিচ্ছ? জবাবে সে দ্বিধাহীন চিত্তে বলল যে, যাকাত দিচ্ছি, তবে এও নিয়্যাতের মধ্যে গণ্য হবে। যদি কেউ একথা বলে যে, বছরের শেষ পর্যন্ত যা দিব সবই যাকাত হিসাবে গণ্য হবে তবে এতে যাকাত আদায় হবে না [৩] (সিরাজিয়্যা)।

---

১. যাকাত কোন দান নয়। বরং এ কোন মালের ইবাদত, যাকাত গ্রহীতা অপেক্ষা দাতা যাকাত প্রদানের আধিক মুখাপেক্ষী।

২. মূলে হত্যার আরবী আছে। কিন্তু হাদীছ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বছরপূর্তির সাথে সাথে যাকাতের পরিমাণ নিজের মাল হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে রাখে এবং পরের বছরেরও পুরা হিসাব করে যাকাত দেয়, তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাকাত আদায়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা হলে উকীলকে যাকাতের মালামাল প্রদানের সময় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় সহীহ্ হবে। যদি ঐ সময় নিয়ত না করে বরং উকীল যখন যাকাতের মাল প্রদান করে, তখন নিয়্যাত করলেও তা জাইয হবে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মুআক্কিলের (যাকাতদাতার) নিয়্যাতই ধর্তব্য হবে। উকীলের নিয়্যাত ধর্তব্য হবে না। (মি'রাজুদ দিরায়া) কেউ যদি যাকাতের মাল কারো হাওয়ালা করে বলে যে, এ মাল গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও এবং তারপরে উক্ত ব্যক্তি যদি এ মাল বন্টন করে দেয় কিন্তু গরীবদেরকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়্যাত না করে, তবু যাকাত আদায় হবে। অনুরূপভাবে গরীবদের মধ্যে যাকাতের মাল বন্টন করার জন্য তা যদি কোন যিম্মীর হাওয়ালা করা হয়, তবে এ অবস্থায়ও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে আদেশদাতার মধ্যে যাকাত আদায়ের নিয়্যাত পাওয়া গিয়েছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ উকীলের নিকট যাকাতের মাল প্রদান করার পর যদি মুআক্কিলের নিয়্যাত বদলিয়ে যায় অথচ তখনো পর্যন্ত উকীল যাকাতের এ মাল গরীবদের মধ্যে বন্টন করেনি, তবে তার শেষের নিয়্যাত অনুসারেই তা আদায় হবে, যেমন কেউ যাকাত দেওয়ার জন্য উকীল ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম প্রদান করল। উকীল তখনো গরীবদের মধ্যে ঐ দিরহাম বন্টন করেনি। এমতাবস্থায় যদি যাকাতদাতা মানতের নিয়্যাত করে, তবে তার মানত আদায় হবে। যাকাত আদায় হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কেউ বলে, আমি যদি এ বাড়ীতে প্রবেশ করি, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর একশত দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব। এরপর সে যদি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় এ মর্মে নিয়্যাত করে যে, এসব দিরহাম আমি যাকাত হিসাবে আদায় করছি, তাহলে এতে তার যাকাত আদায় হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি আমানতের মাল আমানতদার ব্যক্তির নিকট থেকে নষ্ট হয়ে যায় এবং আমানতকারী ব্যক্তি গরীব হয় এ অবস্থায় ঝগড়া এড়ানোর জন্য আমানতদার ব্যক্তি যদি যাকাতের নিয়্যাতে এর মূল্য তাকে প্রদান করে, তবে এতে যাকাত আদায় হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ যাকাত আদায় অনুচ্ছেদ)। কেউ যদি বিনা নিয়্যাতে কিছু মাল গরীব ব্যক্তিকে প্রদান করে, এরপর যাকাতের নিয়্যাত করে, তবে নিয়্যাতের সময় এ মাল গরীব ব্যক্তির নিকট হুবহু বিদ্যমান থাকলে যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় হবে না (মি'রাজুদ দিরায়া, যাহিদী, আল্-বাহ্রুর রায়িক, আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষ হতে তার মাল থেকে যাকাত পরিশোধ করে, তারপর সে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তাহলে মাল যদি গরীব ব্যক্তির হাতে বর্তমান থাকে, তবে তার যাকাত আদায় হবে। নতুবা আদায় হবে না (সিরাজিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যাকাত আদায়ের নিয়্যাত না করে তার নিসাবের পূর্ণ মাল সাদাকা করে দিলে তার উপর থেকে যাকাতের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যাবে। এটা ইস্‌তিহ্‌সানের কথা (যহিদী)। এ মাল দান করার সময় নফল সাদাকার নিয়্যাত করা বা না করাতে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি তার নিজের সমস্ত মাল মানতের নিয়্যাতে অথবা অন্য কোন ওয়াজিব আদায়ের নিয়্যাতে কোন ফকীর ব্যক্তিকে সাদাকা করে দেয়, তাহলে সে যা নিয়্যাত করবে তাই আদায় হবে। কিন্তু ফরয যাকাত তার যিম্মায় অনাদায় অবস্থায় থেকে যাবে। আর কেউ যদি তার কিছু মাল কোন ফকীর ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, তবে এই পরিমাণ মালের যাকাত তার যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (তাবয়ীন)। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এটাই উত্তম কথা (যাহিদী)। কোন ফকীর ব্যক্তির নিকট যদি টাকা পাওনা থাকে আর ঐ টাকা যদি মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে এ পরিমাণ মালের যাকাত তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে চাই সে যাকাতের নিয়ত করুক, বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, এ মাল ক্ষয় হয়ে যাওয়া মালের মত। আর যদি ঋণ থেকে কিছু পরিমাণ মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে যে পরিমাণ মাফ করা হয়েছে এ পরিমাণের যাকাত তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। বাকী মালের যাকাত রহিত হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যদিও সে এর দ্বারা বাকী মালের যাকাত আদায়ের নিয়্যাত করে থাকে (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ যদি ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি বিত্তশালী হয় এবং মালিক যদি বছরান্তে তাকে ঐ মাল হিবা করে দেয়, তবে জামি 'এর বর্ণনা মতে যাকাত পরিমাণ মালের তাকে জরিমানা দিতে হবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কেউ কোন গরীব ব্যক্তিকে হুকুম করে যে, অমুকের কাছে আমার যে পাওনা আছে, তুমি তা উসূল করে নাও এবং এতে সে যদি যাকাতের নিয়্যাত করে, তবে জাইয আছে (আল্-বাহ্রুর রায়িক)। কেউ যদি তার পাওনা টাকা কোন গরীব ব্যক্তিকে হেবা করে দেয় এবং এর দ্বারা ঐ টাকার যাকাত আদায়ের নিয়্যাত করে, যা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট পাবে অথবা তার নিকট যে টাকা মওজুদ আছে এর যাকাত আদায়ের নিয়্যাত করে, তবে তা সহীহ্ হবে না (কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ নগদ ও করযের যাকাত নগদ মাল দ্বারা আদায় করা জাইয। কিন্তু নগদ মালের যাকাত করযের দ্বারা আদায় করা জাইয নেই। অনুরূপভাবে যে করযের মাল আদায় হবে, তার যাকাতও কর্জের দ্বারা আদায় করা জাইয হবে না। অবশ্য যে ঋণ আদায় হবার মত নয় এর যাকাত করযের দ্বারা আদায় করা জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কোন ব্যক্তি যাকাত আদায় করার ইচ্ছা করে, তবে তার জন্য উত্তম হল, ঘোষণা করে প্রকাশ্যে যাকাত প্রদান করার। অবশ্য নফল সাদাকাতের ক্ষেত্রে উত্তম গোপনে এবং চুপে চুপে প্রদান করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি কোন গরীবকে ঋণ বা হেবা হিসাবে কোন মাল প্রদান করে যাকাতের নিয়্যাত করে, তবে এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে (আল্-বাহ্রুর রায়িক-মুবতাগী ও কিনয়ার সূত্রে)।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

১. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়র জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটি শর্ত হল, আযাদ হওয়া। সুতরাং ক্রীতদাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও সে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মুদাববার, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুকাতাব গোলামের উপরও যাকাত ওয়াজিব হয় না। মুকাতাব গোলাম, যে বদলে কিতাবাত আদায়ের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাপারে প্রচেষ্টারত, তার হুকুমও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুকাতাব গোলামের অনুরূপ (বাদায়ে)।

২. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, মুসলমান হওয়া। সুতরাং কাফিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয় (বাদাই)। আমাদের মাযহাবে মুসলমান হওয়া যেমন যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, তেমনি ইসলামের উপর বহাল থাকাও যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত। অতএব, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তবে যাকাত তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। যেমন মৃত্যুর পর রহিত হয়ে যায়। যদি কয়েক বছর পর্যন্ত মুরতাদ থাকার পরে আবার মুসলমান হয়, তবে ঐ বছরগুলোর জন্য তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (মি'রাজুদ দিরায়া)। সায়াদী) (র) বলেন, দারুল হরবে কোন কাফির যদি মুসলমান হয় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। এরপর দারুল ইসলামে আসে, তবে রাষ্ট্র প্রধানের জন্য ঐ ব্যক্তি থেকে অতীত সময়গুলোর যাকাত গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। কেননা, ঐ সময়ে সে তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইলম থাকলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফাতওয়া হল, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা জানা না থাকলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যিম্মীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কোন যিম্মী ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে—সে এ ব্যাপারে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় শর্ত হল, বুঝমান ও বালিগ হওয়া। সুতরাং না-বালিগ বালক-এর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে পাগলের উপরও যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি তা পূর্ণ বছর পরিব্যাপ্ত হয় (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর যদি বছরের শুরু অথবা শেষে কিছু দিন সুস্থ মস্তিষ্ক থাকে, এর পরিমাণ কম হোক, বা বেশী হোক তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে (আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া)। এটাই যাহিরী রিওয়ায়েত (কাফী)। সদরুল ইসলাম আবুল ইউসুর (র) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)। আরযী পাগলের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি বালিগ হওয়ার পর পাগল হয়, তবে তার জন্য এ মাসআলা। আর আসল পাগল তথা কেউ যদি পাগল অবস্থায় বালিগ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সুস্থ হওয়ার পর হতে তার বছর গণনা ধর্তব্য হবে (কাফী)। অনুরূপভাবে কোন বালক যদি বালিগ হয়, তাহলে বালিগ হওয়ার সময় হতে তার বছর ধর্তব্য হবে । (তাবয়ীন) বেহুশ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এই বেহুশী পূর্ণ বছর পরিব্যাপ্ত থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ মাল নিসাব পরিমাণ হওয়া। সুতরাং নিসাবের কম পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব নয় (আয়নী) ঃ শরহুল কান্য)। কোন ব্যক্তির নিকট দুইশত দিরহাম এক বছর থাকার পর সে যদি এর থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসাবে কোন ফকীর অথবা উকীলের নিকট প্রদান করে, এরপর এর মধ্যে এক দিরহাম অচল পাওয়া যায়, তাহলে আদায়কৃত ঐ পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা, তার মাল নিসাব পরিমাণ হয়নি। যদি এ পাঁচ দিরহাম কোন

ফকীর ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে তা আর ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু উকীল ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়ে থাকলে এবং সে তা সাদাকা করে না থাকলে তা সে ফেরত নিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হল নিরংকুশভাবে মালের মালিক হওয়া। অর্থাৎ মালের মালিক হওয়া এবং ঐ মাল তার হাতে থাকা উভয়টিই আবশ্যক। যদি মালিকানা পাওয়া যায়, কিন্তু মাল আয়ত্তাধীন না থাকে, যেমন মহরের টাকা যা এখনো হাতে আসেনি অথবা মাল আয়ত্তাধীন তো আছে কিন্তু এতে তার মালিকানা নেই। যেমন মুকাতাব গোলাম এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মালিকানা, এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। খরীদকৃত মাল যা এখনো হাতে আসেনি এর ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এ মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না। বিশুদ্ধ মতে এ মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। ব্যবসার জন্য খরীদকৃত গোলাম যদি পালিয়ে যায়, তবে মালিকের উপর ঐ গোলামের যাকাত ওয়াজিব হবে না (শরহুল মাজমা ঃ ইবনুল মালিক)। কোন পুরুষ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে এবং কয়েক বছর পর্যন্ত তা তার হস্তগত না হয়, তা হলে স্বামীর উপর ঐ মালের যাকাত ওয়াজিব হবে না (মুযমারাত)। অনুরূপভাবে বন্ধকের মাল যদি গ্রহীতার নিকট থাকে, তবে বন্ধকতাদার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না (আল্‌বাহ্‌রুর রায়িক)। যে গোলামকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, সে যদি এমন ঋণী হয় যে, ঋণ তার পুরা উপার্জন পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ ঋণ আর কামাই উভয় সমান, তবে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি গোলামের উপর কোন ঋণ না থাকে, তবে মালিক তার উপার্জনের মালিক হবে এবং বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মুনীবের উপর তার যাকাত ওয়াজিব হবে (মি'রাজুদ দিরায়া)। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, গোলামের কামাই মালিকের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই তার যাকাত আদায় করে দেওয়া সমীচীন। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে গোলামের কামাই মালিকের হস্তগত হওয়ার পূর্বে তার যাকাত পরিশোধ করা মালিকের জন্য অপরিহার্য নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। মুসাফিরের উপর তার মালের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। কেননা, সে তার স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ঐ মাল ব্যয় করতে সক্ষম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসার মাল) ।

৬. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অপর একটি শর্ত হল, এ মাল আবশ্যকীয় খরচাদি থেকে অতিরিক্ত হতে হবে। সুতরাং বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র, সওয়ারের জানোয়ার, খিদমতের গোলাম এবং ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্রের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে পরিবার-পরিজনের জন্য রক্ষিত খাদ্য-দ্রব্যের উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। গৃহে রক্ষিত আসবাবপাত্রের উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি এগুলো স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত না হয়। অনুরূপভাবে মূল্যবান ধাতবদ্রব্য যেমন মোতি, ইয়াকূত, জমরূদ ইত্যাদি যদি ববসার জন্য না হয়, তবে এগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। খরচ করার জন্য খরীদকৃত পয়সার উপরও যাকাত ওয়াজিব হয় না। (আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া)। আলিম ব্যক্তির কিতাব এবং কারখানার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মেশিনারীর উপরও যাকাত ওয়াজিব নয় (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। উপরোক্ত হুকুম ঐ সব যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা কাজে ব্যবহার করা হয় কিন্তু কর্মের মধ্যে এর বাহ্যিক কোন চিহ্ন বাকী থাকে না। যদি চিহ্ন বাকী থাকে যেমন রঙ্গের কাজ করে এমন কোন ব্যক্তি যদি কুসুম বা জাফরানী রং খরীদ করল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রঙগের কাজ করার জন্য, এ অবস্থায় যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে নিসাব পরিমাণ মাল হলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে কোন কাজের উদ্দেশ্যে খরীদ করা বস্তুর যদি ঐ কাজের মধ্যে চিহ্ন বাকী থাকে, চামড়া দাবাগত করার উদ্দেশ্যে খরীদকৃত তুলা ও তৈল–যদি এগুলো এক বছর পর্যন্ত থাকে এবং নিসাব পারিমাণ হয়, তাঁহলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি কর্মের মধ্যে উক্ত বস্তুর কোন চিহ্ন বাকী না থাকে, যেমন সাবান, উশনান ইত্যাদি এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (কিফায়া)।

৭. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওযার অপর একটি শর্ত হল, মাল দেনামুক্ত হওয়া। আমাদের ইমামগণ বলেন, মানুষের পক্ষ হতে যে ঋণ পরিশোধের তাগাদা থাকে, তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। চাই সে ঋণ কোন মানুষের হোক যেমন কর্জ বা খরীদকৃত কোন মালের মূল্য হোক কিংবা কোন নষ্ট বা ক্ষতিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ হোক বা কাউকে যখম করার জরিমানার টাকা হোক এবং চাই সে দেনা টাকা বাবত হোক বা কোন মাল বাবত হোক কিংবা কাপড় বাবত হোক বা কোন জীব–জানোয়ার বাবত হোক অথবা খুলা বাবত হোক বা ইচ্ছাকৃত হত্যার আপোস মীমাংসার জরিমানার টাকা বাবত হোক, নগদ আদায়যোগ্য হোক বা বাকী ঋণ হোক, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার উপর আরোপিত ঋণ হোক, যেমন যাকাতের দেনা–সব অবস্থাতে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যে সব জানোয়ার পূর্ণ বছর বিচরণ করে খায়, এগুলোর যাকাত বাকী থাকলে আমাদের ইমামগণের মতে এটি প্রতিবন্ধক হিসাবে ধর্তব্য হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। চাই এ যাকাত মালের যাকাত হোক, যদি মাল হুবহু বিদ্যমান থাকে অথবা যিম্মায় ওয়াজিব যাকাত হোক, যেমন যাকাতের মাল নষ্ট হয়ে গেলে হয়ে থাকে। যদি স্বর্ণ–রৌপ্য অথবা ব্যবসায়ের মালে যাকাত অনাদায় অবস্থায় থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে এ ক্ষেত্রেও سوائم (পূর্ণ বছর বিচরণ করে খায় এমন জানোয়ার)–এর হুকুম প্রযোজ্য হবে। ভূমির খারাজ জাতীয় ঋণ হলে এই পরিমাণ ঋণের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এই খারাজী ঋণ প্রতিবন্ধক হবে। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি খারাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় হয় এবং ফসল কাটার পর বছর পূর্ণ হয়। আর যদি ফসল কাটার আগে বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এ খারাজ প্রতিবন্ধক হিসাবে ধর্তব্য হবে না। অনুরূপভাবে খারাজ যদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ খারাজও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। যদি তা বছর পুরা হওয়ার পূর্বে উসূল না করা হয়ে থাকে। উশরী জমির হুকুমও অনুরূপই। অর্থাৎ উশরী জমিতে ফসল উৎপাদিত হওয়ার পর যমীর মালিক যদি তা নষ্ট করে দেয়, তাহলে এ পরিমাণ তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে এবং তাকে এর জরিমানা আদায় করতে হবে। এ হুকুম দিরহামের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার

পূর্বেই আপতিত হয়ে যায়। তবে বছর পূর্ণ হওয়ার পর ঐ দিরহাম যদি বাকী থাকে, তাহলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না (তাতারখানিয়া)। মহর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ মহর যিম্মায় থাকা অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। চাই তা নগদ মহর হোক বা বাকী মহর হোক। কেননা, এর তাগাদাকারী রয়েছে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত যাহিরী মাযহাব অনুসারে। আল্লামা বাযদুবী (র) জামি' কবীরের মধ্যে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মাশায়িখে কেরামের মতে যদি কারো উপর স্ত্রীর নগদ আদায়যোগ্য মহর مهر مؤجل বাকী থাকে এবং এ মহর আদায় করার তার ইচ্ছা না থাকে, তবে এ মহর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, রিওয়াজ মতে এ জাতীয় মহর চাওয়া হয় না। এ মতটি উত্তম (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া)।

৮. মাসআলা ঃ স্ত্রীর খরচাদি যা কাযী (বিচারক) কর্তৃক নির্ধারিত অথবা পরস্পর সম্মতিতে নির্ধারিত, তা যদি স্বামীর উপর ঋণ হিসাবে সাব্যস্ত না হয়, তাহলে এই খরচাদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিন্ধক হবে না। অবশ্য যদি স্ত্রীর খোরপোশ কাযী কর্তৃক বা পরস্পর সম্মতিতে নির্ধারিত না হয়, তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কাযী যদি মাহরাম আত্মীয়–স্বজনের জন্য খোরপোশ নির্ধারণ করে দেন এবং তা কম সময়ের জন্য হয় যেমন এ মাসের কম সময়, তবে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য হয় তবে এ খোরপোশ ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে না। বরং তা রহিত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে (যাবদাই')। উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে এগুলো কারো যিম্মায় ঋণ হিসাবে বর্তিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি এসব ঋণ কারো উপর বর্তায়, তবে এতে যাকাত রহিত হবে না (আলজাওহারাতুন নায়্যারা)। যদি বছরের মাঝে কোন ঋণ কারো উপর বর্তায়, তবে 'উসূল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে এ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে এ ঋণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না, অর্থাৎ এ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। কারো নিকট ব্যবসার গোলাম আছে এবং এ গোলামের উপর কিছু ঋণও আছে, তবে ঋণ পরিমাণের যাকাত তার উপর ওয়াজিব হবে না।

৯.মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে। এমতাবস্থায় ঋণ গৃহীতা ব্যক্তির হুকুমে অথবা তার হুকুম ছাড়াই তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেয়, এ ক্ষেত্রে জামিনদার এবং ঋণগৃহীতা উভয় ব্যক্তির নিকট যদি এক হাজার দিরহাম এক বছর পর্যন্ত থাকে তাহলে তাদের কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি কারো থেকে এক হাজার দিরহাম ছিনিয়ে আনে এবং পরে আরেক ব্যক্তি এ দিরহাম তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ও তা নষ্ট করে ফেলে, এ অবস্থায় যারা ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের নিকট যদি এক হাজার দিরহাম থাকে এবং বছর পর্যন্ত তাদের নিকট থাকে তাহরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর যাকাত–ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন ব্যক্তির মালিকানা এক হাজার দিরহাম আছে এবং এক হাজার দিরহাম তার ঋণও আছে, এদিকে এ ব্যক্তির বাড়ী গোলাম ইত্যাদি আছে তবে এগুলো ব্যবসার জন্য নয়, বরং ব্যবহারের জন্য, এ সমস্ত ব্যবহার্য বস্তুর মূল্য সর্বসাকুল্যে দশ হাজার টাকা, তাহলে এ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা তার হাতে যে দিরহাম রয়েছে, তা এবং ঋণ উভয়ই সমান সমান। আর বাড়ী ও খাদিম তো হল ব্যবহার্যবস্তু। কাজেই এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। বাড়ী ও খাদিমের মালিক ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ করা হারাম নয়। কেননা, এ গুলোর দ্বারা প্রয়োজন নিবারণ হয় না। বরং তা আরো বাড়ে। একারণেই হাসান বসরী (র) বলেছেন, দশ হাজার দিরহাম মুদ্রার মালিকের জন্য সাদাকা গ্রহণ করা হালাল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এটা আবার কেমন করে? জবাবে তিনি বললেন, এক ব্যক্তির বাড়ীও আছে, খাদিমও আছে এবং হাতিয়ারও আছে (যার মোটামুটি মূল্য দশ হাজার দিরহাম)। কিন্তু এগুলো বিক্রি করতে বাধাও আছে। (কাজেই তার জন্য সাদাকা গ্রহণ করা বৈধ।) এর উপর ভিত্তি করে আমাদের মাশায়িখে কেরাম বলেছেন, কোন ফকীহ ব্যক্তির নিকট যদি অনেক কিতাবাদি থাকে, যার মূল্য অনেক, কিন্তু এগুলো তার খুবই প্রয়োজনীয়, তাহলে তার জন্য সাদাকা গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু কিতাবের পরিমাণ যদি এত বেশী হয় যে, এগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং এর মূল্য দুইশত দিরহামের বরাবর, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে (শরহুল মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))। কোন কিতাবের যদি দুই কপি থাকে, তবে একে অতিরিক্ত বলে গণ্য করা হবে। কারো কারো মতে তিন কপি থাকলে তাকে অতিরিক্ত বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধ (ফতহুল কাদীর)।

১০. মাসআলা ঃ ঋণ মাফ করে দেওয়া হলে মাফ করার পর হতে বছর গণনা শুরু হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রথম বছর পুরা হওয়ার পরই যাকাত ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর, কাফী)। বান্দার পক্ষ থেকে যে সব ঋণের তাগাদা নেই। যেমন আল্লাহ্ কর্তৃক ধার্যকৃত ঋণ যথা মানত, কাফ্ফারা, সাদাকাতুল ফিত্র এবং হজ্জ ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। পতিত কোন বস্তু উঠিয়ে নওয়ার জামানতও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। অনুরূপভবে কোন ব্যক্তির নিকট যদি কোন মাল থাকে-যার হকদার অন্য লোক। কিন্তু সে লোক প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত এ মাল যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না (তাতারখানিয়া)। ফকীহ্গণ বলেন, বিক্রীত মালের উপর নিয়ন্ত্রণ বাকী রাখার ব্যাপারে কেউ যদি জামিন হয়, অতঃপর এ মালের হকদার বেরিয়ে আসলে এবং তা বছরের মাঝখানে ঘটলে এ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি বছর শেষ হওয়ার পর এমনটি হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে (বাদাই)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি একাধিক নিসাবের মালিক হয়, যেমন কারো দিরহাম, দীনার, ব্যবসার মাল এবং সায়িমা পশু নিসাব পরিমাণ রয়েছে এবং তার উপর করযও রয়েছে, তবে প্রথমে দিরহাম ও দীনার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণের পরিমাণ এর থেকেও বেশী 'হলে তা ব্যবসার মালের দ্বারা আদায় করা হবে। ঋণের পরিমাণ এর চেয়েও অধিক হলে সায়িমা পশুর দ্বারা তা আদায় করা হবে। যদি বিভিন্ন প্রকারের সায়িমা জানোয়ার থাকে তবে যে প্রকারের

মূল্য কম প্রথমে তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যদি সবগুলোর দাম সমান সমান হয়, তবে যে কোন প্রকারের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যাবে (তাবয়ীন)। এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত উসূলকারী আসে। যদি যাকাত উসূলকারী না আসে, তবে মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সে যে কোন মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। সে ইচ্ছা করলে সায়িমা পশু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে এবং দিরহামের যাকাত আদায় করবে। কেননা, সব মালই মালিকের নিকট সমান। তবে যাকাত উসূলকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব মাল সমপর্যায়ের নয়। কেননা, সরকারী যাকাত উসূলকারী ব্যক্তির জন্য সায়িমা পশু থেকে যাকাত উসূল করার ইখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু দিরহাম থেকে যাকাত উসূল করার ইখতিয়ার নেই। তাই যাকাত উসূলকারী হাযির হলে দিরহাম দ্বারা ঋণ আদায় করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি সায়িমা পশু থেকে যাকাত উসূল করবে (শরহুল মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখ্সী (র))।

১২. মাসআলা ঃ যদি কারো নিকট দুই শত দিরহাম থাকে এবং খিদমতের গোলামও থাকে, এ ধরনের কোন ব্যক্তি যদি অনুরূপ কোন গোলামকে মহর ধার্য করে বিবাহ করে আর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিছু গম ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে এবং এ সব জিনিস যদি তার নিকট এক বছর পর্যন্ত থাকে, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, ঋণ নগদ টাকা এবং অতিরিক্ত মালের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, যে জাতীয় ঋণ তা পরিশোধ করতেও হবে ঐজাতীয় বস্তু দ্বারাই (কাফী)।

১৩. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অপর একটি শর্ত হল, নিসাবের মাল বর্ধিষ্ণু মাল হতে হবে। তা বাহ্যিক বর্ধিষ্ণু হোক যেমন জন্মের দ্বারা জীব-জানোয়ার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বা ব্যবসার মাধ্যমে মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া অথবা বাহ্যিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়া কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ততা এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা। যেমন মাল মালিকের নিজের হাতে আছে কিংবা তার প্রতিনিধির হাতে আছে। উপরোক্ত উভয় ধরনের মাল আবার দুই ধরনের হতে পারে। (১) خلقى -(কুদরতীভাবে সৃষ্ট) (২) فعلى (কুদরতীভাবে সৃষ্ট নয়) (তাবয়ীন)। خلقى (খালকী) যেমন সোনা ও রূপা। কেননা, হবহু সোনা-রূপা দ্বারা নিজের প্রয়োজন নিবারণ করা যায় না। সুতরাং এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই এর দ্বারা ব্যবসার নিয়্যাত করুক বা না করুক, কিংবা খরচ করার নিয়্যাত করুক বা না করুক। فعلى সোনা-রূপা ছাড়া সমস্ত মালামালই হচ্ছে فعلى মাল। এ জাতীয় মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলে তখনই ধর্তব্য হবে যদি এতে ব্যবসা বা জানোয়ারের ক্ষেত্রে চরানোর নিয়্যাত করা হয়। আর ব্যবসা ও চরানোর নিয়্যাত ব্যবসা ও চরানো শুরু করার মাধ্যমেই প্রতীয়মান হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যবসার নিয়্যাত স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে হতে পারে এবং ইশারা-ইংগিতের দ্বারাও হতে পারে। স্পষ্ট ব্যবসার নিয়্যাত করার মর্ম হল, ব্যবসা শুরু করার সময় এ মর্মে নিয়্যাত করা যে, এ মাল দ্বারা ব্যবসা করা হবে। ব্যবসার বিষয়টি ব্যাপক। এটি খরীদদারী হতে পারে এবং লগ্নি দেওয়াও হতে পারে। এমনিভাবে মূল্য নগদ টাকা-পয়সাও হতে পারে এবং মাল-সামান ও জাতীয় বস্তুও হতে পারে। ইশারা-ইংগিতে ব্যবসার নিয়্যাত করার মর্ম হল, ব্যবসার পণ্য দ্বারা কোন বস্তু খরীদ করা অথবা পণ্য সামগ্রীর বিনিময়ে কোন বাড়ীভাড়া প্রদান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা। উপরোক্ত ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ব্যবসার নিয়্যাত না করা সত্ত্বেও এ পণ্য সামগ্রী ব্যবসার পণ্য হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু বাদাই' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ব্যবসার মালের লভ্যাংশের বিনিময়ে যে মাল হাসিল করা হয় এর ব্যাপারে "আসল" নামক গ্রন্থের যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এ মাল নিয়্যাত করা ছাড়াই ব্যবসার মাল হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু জামি' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ বিষয়টি নিয়্যাতের উপর নির্ভর করবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ মাসআলার ক্ষেত্রে মাশায়িখে কিরামের দুই ধরনের মতামত রয়েছে। বলখের মাশায়িখে কিরাম জামি' গ্রন্থের মতটিকে বিশুদ্ধ বলে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৪. মাসআলা ঃ যে মাল বিনিময় ব্যতীত মালিকানায় আসে যেমন, হিবা, ওসিয়ত এবং সাদাকা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত মাল অথবা আর্থিক বিনিময় না হয়ে অন্য কিছুর বিনিময়ে মালিকানায় আসে যেমন মহরের টাকা, খুলার বদলা, ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ এবং ইতক (আযাদ হওয়া)-এর বিনিময়ে অর্জিত মাল, এগুলোতে ব্যবসার নিয়্যাত করা সহীহ্ নয়। এটাই বিশুদ্ধতম মত (আল-বাহরুর রায়িক)। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মালে ব্যবসার নিয়্যাত করা সহীহ্ নয় (তাবয়ীন) । مورث (মূরিস ঃ তার থেকে উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্ত হল) এর মৃত্যুর পর ওয়ারিছগণ যদি সায়িমা পশুতে পূর্ণ বছর এভাবে প্রতি পালন করা এবং ব্যবসার মালের ব্যবসা অব্যাহত রাখার নিয়ত করে, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনরূপ নিয়্যাত না করে, তাহলে কারো কারো মতে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। আবার কারো কারো মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি ব্যবসার জন্য কোন দাসী খরীদ করে পরে খিদমতের নিয়্যাত করে, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (যাহিদী)।

১৫. মাসআলা ঃ মাল বর্ধিষ্ণু হওয়ার জন্য শর্ত হল, এ মাল তার নিজের হাতে বা তার প্রতিনিধির হাতে থাকতে হবে। মালিক যদি মাল বাড়াতে সক্ষম না হয়, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন মালে যিমার (তাবয়ীন)। মালে যিমার ঐ মাল যে মালে তার মালিকানা আছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তা তার আয়ত্তে আসবে বলেও আশা করা যায় না (মুহীত)। ঋণগৃহীতা ব্যক্তি যদি ঋণের কথা অস্বীকার করে, তবে তা এবং ছিনিয়ে আনা মাল এগুলোও মালে যিমারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি এ বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকে। অবশ্য প্রমাণ থাকলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অবশ্য ছিনিয়ে আনা সায়িমা জানোয়ারের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এ মালের মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদিও ছিনতাইকারী ব্যক্তি উক্ত মালের কথা স্বীকার করে। হারানো মাল, পলায়নকারী গোলাম, ধমক দিয়ে নিয়ে যাওয়া মাল, সমুদ্র গর্ভে বিলীন সম্পদ এবং মাঠে-ময়দানে অন্তর্হিত মাল যার স্থান কোন্টি মনে নেই এ জাতীয় সমস্ত মাল মালে যিমারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য পুঁতে রাখা মাল যদি সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়ে থাকে, যদিও তা অন্যের বাড়ীতে হয়, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর স্থানের কথা ভুলে যায়, তবে এ মাল মালে যিমারের অন্তর্ভুক্ত হবে না (আল্-বাহরুর রায়িক)। কোন মাল যদি ভূমিতে বা আঙ্গুরের বাগানে পুঁতে রাখা হয়, তবে কেউ বলেছেন, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, নিজের মালিকানাধীন পূর্ণ জমি খনন করা সম্ভব। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা,

সমস্ত জমি খনন করা কষ্টসাধ্য কাজ। তবে ঘর-বাড়ীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কাজেই বাড়ী যদি বড় হয় তবে এ মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না। যদি কারো নিকট টাকা-পয়সা পাওনা থাকে। এবং সে তা অস্বীকার করে আর এ ক্ষেত্রে যদি সাক্ষী থাকে এবং সাক্ষী ন্যায়বান না হয়, তবে কারো কারো মতে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে যাকাত ওয়াজিব হবে (কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি ঋণগৃহীতা ব্যক্তি ঋণের কথা অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রমাণাদি না থাকে এ অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যদি ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সাক্ষী-প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন ঋণ গৃহীতা ব্যক্তি লোকদের কাছে ঋণের কথা স্বীকার করল, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। যদি কাযীর (বিচারকের) ঋণের কথা জানা থাকে, তাহলে মালিক ব্যক্তিকে অতীত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে। ঋণগৃহীতা ব্যক্তি যদি ঋণের কথা স্বীকার করে, তাহলে চাই সে ধনী হোক বা গরীব হোক (কাফী)। কাযী যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে এমন ব্যক্তির নিকট পাওনা থাকলে সে যদি কয়েক বছর পরে এ ঋণ পরিশোধ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অতীত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে (জামেউস সগীর ঃ কাযীখান)। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের কথা গোপনে স্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তবে এ ঋণ নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না। যদি ঋণগৃহীতা ব্যক্তি ঋণের কথা স্বীকার করে কিন্তু কাযীর নিকট প্রত্যানীত হওয়ার পর তা অস্বীকার করে, তারপর বাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং সাক্ষীর সত্যতা প্রমাণে যদি কিছু দিন কেটে যায়, তারপর সাক্ষীর সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে যে দিন কাযীর নিকট ঋণের কথা অস্বীকার করা হয়েছে, সেদিন থেকে সাক্ষীর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের যাকাত দিতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি ঋণগৃহীতা ব্যক্তি পালিয়ে যায় এবং মালিক নিজে অথবা উকীল দ্বারা তাকে তালাশ করাতে সক্ষম হয়, তাহলে ঋণদাতার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি সে তাকে তালাশ করতে সক্ষম না হয়, তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ঋণগৃহীতা ব্যক্তি যে ঋণের কথা স্বীকার করে ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর মতে ঐ ঋণ তিন প্রকার।১. دين ضعيف (দায়নে যঈফ) ঃ দুর্বল ঋণ। প্রকৃতপক্ষে তা এমন ঋণ যা নিজের শ্রম ব্যতিরেকে এবং কোন বিনিময় ব্যতীত মালিক হওয়া যায়। যেমন উত্তরাধিকার সম্পদ অথবা যা নিজের শ্রমের বিনিময়ে কিন্তু কোন বিনিময় ব্যতীত মালিক হওয়া যায় যেমন ওসিয়ত অথবা যা নিজের শ্রম এবং এমন বস্তুর বিনিময়ে মালিক হওয়া যায় যা মাল নয়, যেমন মহর, খুলার বিনিময়, ইচ্ছাকৃত হত্যার জরিমানা কিংবা মুকাতাব গোলামের বদলে কিতাবাত ইত্যাদি। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এসব মালে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এ সব মাল হস্তগত হলে এবং তা নিসাব পরিমাণ হলে ও এক বছর পুরা হলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। (২) دين وسط (দায়নে ওয়াসাত) মধ্যম ধরনের ঋণ ঃ তা ঐ ঋণ যা এমন মালের পরিবর্তে ওয়াজিব হয়, যা ব্যবসার পণ্য নয়। যেমন খিদমতের গোলাম এবং ব্যবহারিক কাপড় ইত্যাদি। "আসল"-এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনা মতে দুইশত দিরহাম হাতে আসার পর অতীত বছরসমূহের যাকাত প্রদান করতে হবে।৩. دين كبهى (দায়নে কভী) মযবুত ঋণ ঃ তা এমন ঋণ যা-ব্যবসার পণ্যের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়। যখন এর চল্লিশ দিরহাম হাতে আসবে, তখন অতীত বছরগুলোর যাকাত দিবে (যাহিদী)।

১৮. মাসআলা ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্য একটি শর্ত হল, নিসাবের মাল এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। এ ক্ষেত্রে চান্দ্র বছরের হিসাব ধর্তব্য হবে (কিনয়া)। যদি নিসাব পরিমাণ মাল বছরের শুরু ও শেষ উভয় অংশে থাকে কিন্তু মাঝখানে না থাকে, তবে এতে যাকাত রহিত হবে না (হিদায়া)।। যদি ব্যবসায়িক পণ্য কিংবা সোনা-রূপা ঐ জাতীয় অথবা অন্য জাতীয় কোন মাল দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, তাহলে এতে বছর গণনার হুকুম অব্যাহত থাকবে। নতুনভাবে এর গণনা শুরু করতে হবে না। কিন্তু যদি সায়িমা[1] (রাখালের মাধ্যমে বিচরণ করে আহার করে এমন) পশু এ জাতীয় কিংবা অন্য জাতীয় পশু দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, তাহলে নতুনভাবে বছর গণনা শুরু করতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তির নিকট নিসাব পরিমাণ মাল ছিল, তারপর সে বছরের মাঝখানে ঐ জাতীয় আরো মাল লাভ করল, এ ক্ষেত্রে এ সব মাল পূর্বের মালের সাথে মিলিয়ে সবগুলোর যাকাত একত্রে আদায় করবে। চাই এ মাল তার আগের মাল থেকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক বা অন্য কোন উপায়ে তার হস্তগত হোক। পূর্বের মালের সাথে মিলিয়ে সবগুলোর যাকাত একত্রে আদায় করবে। মীরাছ, হিবা কিংবা অন্য কোন সূত্রে এ মাল তার হস্তগত হোক এতে হুকুমের মধ্যে কোন তারতম্য হবে না। যদি অন্য জাতীয় বস্তু হয় যেমন উটের সাথে বকরী মিলিত হল, তাহলে তা পূর্বের মালের সাথে মিলাতে হবে না (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যদি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত মাল অর্জিত হয়, তবে তা আগের মালের সাথে মিলানো হবে না। বরং এর জন্য নতুনভাবে বছর গণনা করতে হবে। এতে ইমামগণ সকলেই একমত (শরহুত তাহাবী)। আমাদের মাযহাবে যে মাল পরে অর্জিত হয় তা মূল মালের সাথে তখনই যোগ করা হবে যদি আগের মাল নিসাব পরিমাণ থাকে। মাল নিসাবের কম হলে পরে অর্জিত মাল এর সাথে যোগ করা হবে না। যদিও আগের মাল এবং পরে অর্জিত মাল একত্রে যোগ করলে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তথাপি একত্রে যোগ করবে না। অবশ্য পরবর্তীতে উভয় প্রকার মাল একত্রে মিলানোর পর নিসাব পূর্ণ হলে এবং এ অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলে এ মালে যাকাত ওয়াজিব হবে (বাদাই')।

১৯. মাসআলা ঃ যদি কারো নিকট সায়িমা জানোয়ার নিসাব পরিমাণ থাকে এবং বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সে এর যাকাত আদায় করে দেয়, তারপর সে ঐ সায়িমা জানোয়ারসমূহ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, অপরদিকে তার নিকট নিসাব পরিমাণ আরো কিছু দিরহাম থাকে এবং এ অবস্থায় যদি ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিক্রীত সায়িমা জানোয়ারের মূল্য এ দিরহামের সাথে যোগ করা হবে না। বরং এর জন্য

১. এ শব্দটি বারবার আসছে এর অর্থ বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পশু পালন। আরবে তৎকালীন বকরী, উট ইত্যাদির এভাবে পশু পালনের রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া ও আরো অনেক দেশে এভাবে মেষ পালনের পেশা চালু আছে। এতে যাকাত ফরয হয়।

বছরের পরিসংখ্যান নতুনভাবে করতে হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সায়িমা পশুর মূল্য পূর্বের দিরহামের সাথে যোগ করে সবগুলোর যাকাত একত্রে আদায় করবে। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিক্রীত সায়িমা পশুর মূল্য এককভাবে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়। অবশ্য পশুর মূল্য নিসাব পরিমাণ না হলে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তা পূর্বের মালের সাথে যোগ করা হবে (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। উশর আদায়কৃত শস্যের মূল্য এবং যে গোলামের সাদাকায়ে ফিত্র আদায় করা হয়েছে এর মূল্য একত্রিত করা হবে। যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাতের পশু দিরহামের বিনিময়ে অথবা পশুর বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবে ইমামগণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুসারে বিক্রীত বস্তুর মূল্য তার সমজাতীয় বস্তুর সাথে যোগ করা হবে। অর্থাৎ দিরহামকে দিরহামের সাথে এবং জানোয়ারকে জানোয়ারের সাথে যোগ করা হবে। পূর্ণ বছর মাঠে বিচরণ করে যে সব জানোয়ার আহার করে এ জাতীয় পশুর যাকাত আদায় করার পর যদি মালিকের তত্ত্বাবধানে এগুলোর আহারের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে তা আবার বিক্রি করে দেওয়া হয়, তবে এসব পশুর মূল্য পূর্বের দিরহামের সাথে যোগ করা হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি যমীনের খাযনা আদায় করার পর তা বিক্রি করে দেয়, তবে যমীনের এ মূল্য পূর্বের নিসাবের সাথে যোগ করা হবে (বাদাই')। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যদি দিরহামের যাকাত আদায় করার পর তা দ্বারা সায়িমা পশু খরীদ করা হয়, এ অবস্থায় যদি ক্রেতার নিকট আরো এ জাতীয় পশু থাকে, তবে খরীদকৃত পশুকে পূর্বের পশুর সাথে মিলানো হবে না। কেননা,, এগুলো যাকাত আদায়কৃত মালের বিনিময়ে তার হস্তগত হয়েছে। কেউ যদি কাউকে এক হাজার দিরহাম হিবা করে এবং সে এর দ্বারা ব্যবসা করে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আরো এক হাজার দিরহাম লাভ করে, এরপর হিবাকারী ব্যক্তি যদি বিচারকের রায় সাপেক্ষে হিবাকৃত বস্তু ফেরত নিয়ে যায়, তাহলে মুনাফার এক হাজার দিরহামের এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা,, মূল দিরহাম যা হিবা করা হয়েছিল এর বছর বাতিল হয়ে গিয়েছে। কাজেই এর মাধ্যমে অর্জিত এক হাজার দিরহামের বছরও বাতিল হয়ে যাবে।

২১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির নিকট দুইশত দিরহাম ছিল এবং এর উপর এক দিন কম তিন বছর অতিক্রান্ত হল এবং এ অবস্থায় সে আরো পাঁচ দিরহাম লাভ করল, তাহলে উক্ত ব্যক্তি প্রথম বছরের জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসাবে আদায় করবে। এর চেয়ে বেশী কিছু আদায় করবে না। কেননা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর যাকাত ফরয হওয়ার নিসাব কম হয়ে গিয়েছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তির নিকট দুইশত দিরহাম মূল্যের ব্যবসার বকরী ছিল। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এ বকরীগুলো মরে গেল। তারপর মালিক এর চামড়া খসিয়ে দাবাগাত করানোর পর এর মূল্য নিসাব পরিমাণ হল। এ অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে রক্ষিত আঙ্গুরের শীরা যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মদে পরিণত হয়, এরপর তা আবার সিরকায় রূপান্তরিত হয় এবং এর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় আর এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থায় বছর পূর্ণ হয়, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, ফকীহ্গণ বলেন, প্রথমোক্ত মাসআলায় বকরীর শরীরে যে পশম ছিল, তার মূল্য ধর্তব্য ছিল। অতএব, তা যেহেতু বাকী ছিল, এ কারণে বছরও বাকী আছে বলে ধর্তব্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাসআলার মধ্যে সমস্ত মাল[1] বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এ ক্ষেত্রে বছরের হুকুম বাতিল হয়ে গিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর সময় হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা জাইয আছে। অবশ্য নিসাবের মালিক হওয়ার আগে যাকাত দেওয়া জাইয নেই (খুলাসা)। সময়ের পূর্বে যাকাত দেওয়া তিন শর্ত সাপেক্ষে জাইয। (১) যাকাত প্রদান করার সময়টি চলমান বছরের মধ্যে হওয়া। (২) যে নিসাবের যাকাত দেওয়া হবে, তা বছরের শেষ পর্যন্ত বাকী থাকা। (৩) বছরের মধ্যখানে মূল নিসাব খতম না হওয়া। যেমন কারো নিকট স্বর্ণ–রৌপ্য অথবা ব্যবসার মাল দুইশত দিরহামের কম ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মালিক এ মালের যাকাত দিয়ে দিল, এরপর এর নিসাব পূর্ণ হল। অথবা কারো নিকট দুইশত দিরহাম ছিল কিংবা দুইশত দিরহাম মূল্যের ব্যবসার পণ্য ছিল। মালিক এ মাল থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসাবে দিয়ে দিল। এতে নিসাবের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে গেল। এমনকি, এ হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় বছর শেষ হল। অথবা অগ্রে যাকাত প্রদানের সময় নিসাব পূর্ণাঙ্গ ছিল। তারপর সমস্ত মাল নষ্ট হয়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে অগ্রে যা প্রদত্ত হয়েছে, তা নফল সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে (শরহুত তাহাবী)। এক নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর সময়ের আগে যেমনিভাবে যাকাত দেওয়া জাইয, অনুরূপভাবে বহু নিসাবের মালিক হওয়ার পরও সময়ের পূর্বে যাকাত দেওয়া জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ দুইশত দিরহামের মালিক হয় এ অবস্থায় সে যদি এক হাজার দিরহামের যাকাত দিয়ে দেয়। এরপর সে যদি আরো কিছু মাল পায় অথবা মুনাফা হয় এবং এতে এক হাজার দিরহাম পুরা হয়ে যায়। তারপর যখন বছর পূর্ণ হয়, তখন তার নিকট এক হাজার দিরহাম ছিল, এরূপ অবস্থায় অগ্রে যাকাত প্রদান করা জাইয এবং এক হাজার দিরহামের যাকাত যা পূর্বে প্রদান করা হয়েছে, তার থেকে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং এ সময়ের ভেতর কোন মাল তার হস্তগত না হয় কিন্তু বছর, পুরা হয়ে যাওয়ার পর হস্তগত হয়, তাহলে অগ্রে যা প্রদান করা হয়েছে তাতে যাকাত আদায় হবে না। অবশ্য মাল অর্জিত হওয়ার পর যদি বছর পূর্ণ হয়, তবে এ মালের যাকাত প্রদান করা তার জন্য জরুরী হবে (আল্–বাহ্রুর রায়িক)।

২৪. মাসআলা ঃ এক বছরের চেয়ে অধিক সময়ের যাকাত দেওয়াও জাইয আছে। কেননা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে (হিদায়া)।। যদি কেউ দুই হাজার দিরহামের যাকাত দিয়ে দেয় অথচ তার নিকট এক হাজার দিরহাম রয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি বলে, "যদি এ বছরই আমি আরো এক হাজার দিরহাম পেয়ে যাই, তাহলে এই যাকাত এই দুই হাজার দিরহামের যাকাত হবে। অন্যথায় এই যাকাত এই এক হাজারের আগামী বছরের যাকাত হিসাবে

১. মাঝে মদে রূপান্তরিত হবার কারণে

গণ্য হবে, তবে তা জাইয আছে। কোন ব্যক্তির নিকট চারশত দিরহাম ছিল। সে মনে করল যে, তার নিকট পাঁচশত দিরহাম রয়েছে, এ ধারণায় সে পাঁচশত দিরহামের যাকাত আদায় করে দিল। তারপর সে জানতে পারল যে, তার নিকট চারশত দিরহাম আছে, তবে তার জন্য জাইয আছে, অতিরিক্ত যাকাত পরবর্তী বছরের যাকাত হিসাবে ধরে নেওয়া (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কারো নিকট দুই নিসাব মাল থাকে (১) স্বর্ণের, (২) রৌপ্যের, এ অবস্থায় সে যদি কোন একটির যাকাত অগ্রে আদায় করে দেয়, তবে উভয় নিসাবের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এক জাতীয় বস্তুতে নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। এক জাতীয় বস্তু হওয়ার প্রমাণ হল এই যে, যাকাতের হিসাবের ক্ষেত্রে স্বর্ণ–রৌপ্য উভয়বিধ বস্তুকে একত্রিত করে হিসাব করা হয়ে থাকে। যদি এই দুই নিসাবের এক নিসাব নষ্ট হয়ে যায়, তবে অপরটি এমনিই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে (কাফী)। যদি কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের পশুর একাধিক নিসাবের মালিক হয় এবং এর মধ্য হতে কোন কোনটির যাকাত সময় আসার পূর্বে সে আদায় করে দেয়, এরপর যদি যাকাত দেওয়া মাল নষ্ট হয়ে, যায় তাহলে আদায়কৃত যাকাত অবশিষ্ট মালের যাকাত হিসাবে গণ্য হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি যাকাত আদায়ের সময় হওয়ার পূর্বে কোন গরীব ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া হয় এবং বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে যদি বিত্তশালী হয়ে যায় অথবা মরে যায় কিংবা মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তাকে যে টাকা প্রদান করা হয়েছে, তা যাকাত হিসাবেই গণ্য হবে (আস্–সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আমাদের মাযহাবের ফকীহ্গণের মতে, যে ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি মারা যায়, তাহলে মৃত্যুর কারণে ওয়াজিব যাকাত তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (মুহীত)।

pdf By Syed Mostofa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমা পশুর যাকাতের বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা

১. মাসআলা ঃ সায়িমা পশু নর হোক বা মাদী কিংবা নর-মাদী মিশ্রিত হোক, নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সায়িমা পশু বলতে এমন পশুকে বুঝানো হয়েছে, যা দুধপ্রাপ্তির জন্য, বাচ্চা লাভের জন্য, মোটা-তাজা করার জন্য কিংবা অধিক মূল্য লাভ করার জন্য মাঠে-ময়দানে চরানো হয়। আর যে পশু দুধ বা বাচ্চা লাভের জন্য নয় বরং বোঝা বহন কিংবা সওয়ার হওয়ার জন্য চরানো হয়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি গোশত লাভের উদ্দেশ্যে চরানো হয়, তবে তাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যে সব পশু ব্যবসার জন্য চরানো হয়, তাতে ব্যবসার পণ্য হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে। সায়িমা পশু হিসাবে নয় (বাদাই')। যদি বছরের কিছু দিন মাঠে-ময়দানে চরানো হয় এবং কিছু দিন মালিক নিজে ঘাস-পানি দিয়ে প্রতিপালন করে, তবে বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ময়দানে চরানো হলে তা সায়িমা হিসাবে গণ্য হবে। অন্যথায় সায়িমা হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। সুতরাং কোন পশু বছরের অর্ধেক সময় মাঠে-ময়দানে চরানো হলে তা সায়িমা হিসাবে গণ্য হবে না এবং এতে যাকাতও ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। ব্যবসার পশু যদি ছয় বা ততোধিক মাস মাঠে-ময়দানে চরানো হয়, তাহলে তা সায়িমা হবে না। অবশ্য যদি ব্যবসার নিয়্যাত পরিবর্তন করে চরানোর নিয়্যাত করা হয়, তবে তা সায়িমা হিসাবে গণ্য হবে। যেমনটি ব্যবসার গোলামের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কেউ যদি ব্যবসার গোলামকে নিজের খিদমতের কাজে রাখার ইচ্ছা করে, তবে সে এ অবস্থায়ও ব্যবসার গোলাম হিসাবেই থাকবে। কিন্তু যদি তাকে ব্যবসার মাল থেকে বের করে খিদমতে নিয়োগ করার নিয়্যাত করে, তাহলে তখন থেকে সে আর ব্যবসার মালরূপে গণ্য হবে না (খুলাসা)। যে সব পশু মাঠে-ময়দানে চরে-ফিরে খায়, এর মালিক যদি এগুলোকে কাজে লাগানোর কিংবা নিজ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য সরবরাহ করার সংকল্প করে কিন্তু বাস্তবে তা না করে, এমনি করে যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এতে সায়িমা পশুর যাকাত ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ব্যবসার জন্য খরীদকৃত পশু যদি সায়িমা বানানো হয়, তবে যে সময় থেকে একে সায়িমা বানানো হয়েছে, তখন থেকে এর নতুন বছরের গণনা আরম্ভ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ পাঁচের কম সংখ্যক উটে যাকাত ওয়াজিব হয় না (হিদায়া)। পঁচিশের কম সংখ্যক উটের প্রতি পাঁচটিতে একটি করে বকরী ওয়াজিব (আয়নী ঃ শরহুল কান্য)। এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করলে সেই বকরী দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। উটের সংখ্যা পঁচিশ হয়ে গেলে তাতে একটি "বিন্তে মাখায" ওয়াজিব হবে। "বিন্তে মাখায" উটনীর এমন বাচ্চা, যা এক বছর হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। পঁয়ত্রিশটি হওয়া পর্যন্ত এ হুকুম বলবৎ থাকবে। ছত্রিশটি সংখ্যা হলে এতে একটি "বিন্তে লাবূন" ওয়াজিব হবে। "বিন্তে লাবূন" মানে উটনীর ঐ বাচ্চা যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। এ হুকুম পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বাকী থাকবে। ছেচল্লিশটি উটে একটি হিক্কা ওয়াজিব। হিক্কা মানে চার বছরে পদার্পণ করছে এমন উট। ষাট পর্যন্ত এ হুকুম বাকী থাকবে। উটের সংখ্যা একষট্টি হলে তাতে একটি জিয্আ ওয়াজিব হবে। জিয্আ মানে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে এমন উট। উক্ত হুকুম পঁচাত্তর পর্যন্ত থাকবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তরে পৌছলে তাতে দু'টি বিন্তে লাবূন ওয়াজিব হবে। নব্বই পর্যন্ত এ হুকুম চলবে। সংখ্যা একানব্বই পূর্ণ হলে দুই হিক্কা ওয়াজিব হবে। একশত বিশ পর্যন্ত এ হুকুম বলবৎ থাকবে (হিদায়া)। একশত বিশের পর প্রতি পাঁচ উটে একটি করে বকরী ওয়াজিব হবে।[১] একশত পঁয়তাল্লিশের পূর্ব পর্যন্ত এ হুকুম চলবে। উটের সংখ্যা একশত পঁয়তাল্লিশে পৌছলে দুই হিক্কা ও একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। একশত পঞ্চাশটি হলে তিন হিক্কা ওয়াজিব হবে। একশত পঞ্চাশের পর প্রতি পাঁচে একটি করে বকরী ওয়াজিব হবে।[২] একশত পঁচাত্তর পর্যন্ত এ হুকুম চলবে। উটের সংখ্যা একশত পঁচাত্তর হলে এতে তিন হিক্কা ও একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। সংখ্যা একশত ছিয়াশিতে পৌছলে তিন হিক্কা ও একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। উটের সংখ্যা একশত ছিয়ানব্বই হলে এতে চার হিক্কা ওয়াজিব হবে। এ হুকুম দুইশত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে (আয়নী ঃ শরহুল হিদায়া)। দুইশতের সংখ্যায় পৌছলে ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে প্রত্যেক পঞ্চাশে এক হিক্কা প্রদান করবে কিংবা ইচ্ছা করলে প্রতি চল্লিশে এক বিনতে লাবূন-এই হিসাবে পাঁচটি বিনতে লাবূন প্রদান করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ দুই শতের অধিক হলে একশত পঞ্চাশের পরবর্তী পঞ্চাশে যেমন নতুনভাবে হিসাব করা হয়েছে অনুরূপভাবে প্রতি হিসাব নবায়ন হতে থাকবে। এটাই আমাদের মাযহাব। এ ক্ষেত্রে বুখতী ও আরবী উটের হুকুম একই (হিদায়া)। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সায়িমা উটের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ন্যূনতম পক্ষে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন বয়সের হওয়া আবশ্যক (শরহুত তাহাবী)। ছোট এবং অন্ধ উটও হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য হবে। কিন্তু এগুলোর দ্বারা যাকাত দেওয়া যাবে না। বাচ্চা প্রতিপালন করে এমন উষ্ট্রী, গোশতের জন্য যে উট মোটা-তাজা করা হচ্ছে তা, বোঝা বহনের উট, প্রজনন কর্মে নিয়োজিত উট এবং সায়িমা উটের উত্তম উষ্ট্র-উষ্ট্রী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। বরং মধ্যম

১. একশত বিশের পরিমাণে দুই 'হিক্কা' এর সাথে অতিরিক্ত।
২. তিন হিক্কার সাথে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধরনের উট গ্রহণ করা হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। মুসিন্ন (তিন বছর বয়সী) ওয়াজিব হলে যদি তা না পাওয়া যায়, তবে এর থেকে উন্নতমানের প্রাণী যাকাত হিসাবে প্রদান করবে এবং অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। আর কম মূল্যের পশু প্রদান করলে অবশিষ্টাংশও আদায় করবে কিংবা অনুরূপ পরিমাণ মূল্য আদায় করবে। অবশ্য প্রথমোক্ত অবস্থায় যাকাত উসুলকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত মূল্যের উট গ্রহণ না করে যা ওয়াজিব হয়েছে তা চাইবে অথবা এর মূল্য কামনা করবে। কেননা, এটা বিক্রয়ের অনুরূপ। আর ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি চলে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় বল প্রয়োগ করা যাবে। সুতরাং মালের মালিক যদি মালের উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নেয়, তাহলে যাকাত উসূলকারী ব্যক্তিকে এ মালের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী বলে গণ্য করা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে কোনরূপ বেচা-কেনা নেই, বরং এ হচ্ছে মূল্য হস্তান্তর করা মাত্র (কাফী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ত্রিশের কম সংখ্যক গরুর যাকাত নেই। রাখালের নিয়ন্ত্রণে নিজে নিজে মাঠে-ময়দানে বিচরণ করে খায় এরূপ গরু ত্রিশটি হলে তাতে একটি তাবী' অথবা তাবী'আ ওয়াজিব হবে। তাবী' বা তাবী'আ গরুর বাছুর যা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে (হিদায়া)। এরপর চল্লিশের সংখ্যা পুরা না হওয়া পর্যন্ত ত্রিশের অধিক সংখ্যায় কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (শরহুত তাহাবী)। গরুর সংখ্যা চল্লিশে পৌছলে একটি মুসিন্ন বা মুসিন্না ওয়াজিব হবে। মুসিন্ন বা মুসিন্না বলে গরুর ঐ বাছুরকে যা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। গরুর সংখ্যা চল্লিশের অধিক হলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নির্ধারিত হিসাব মত যাকাত ওয়াজিব হতে থাকবে। এ হুকুম ষাট পর্যন্ত চলতে থাকবে। চল্লিশের উপর একটি অতিরিক্ত হলে মুসিন্নাসহ মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে ওয়াজিব হবে। আর দুটি অতিরিক্ত হলে একটি মুসিন্নার বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। এটা "আসল" গ্রন্থের বর্ণনা। গরুর সংখ্যা ষাটে পৌছলে দু'টি তাবী' অথবা তাবী'আ ওয়াজিব হবে (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ ষাটের পর চল্লিশ চল্লিশ এবং ত্রিশ ত্রিশ হিসাব করতে হবে। প্রত্যেক চল্লিশে একটি মুসিন্ন বা মুসিন্না ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেক ত্রিশে একটি তাবী' বা তাবী'আ ওয়াজিব হবে। গরুর সংখ্যা সত্তরে পৌছলে একটি মুসিন্ন ও একটি তাবী' ওয়াজিব হবে। আর আশিতে পৌছলে দু'টি মুসিন্ন ওয়াজিব হবে। গরুর সংখ্যা নব্বাইটি হলে তিনটি তাবী' ওয়াজিব হবে। একশত হলে একটি মুসিন্ন ও দুইটি তাবী' ওয়াজিব হবে (তাহাবী)। যদি অবস্থা এমন হয় যে, মুসিন্ন অথবা তাবী' যে কোনটি দিয়েই যাকাত আদায় করা যায়, যেমন একশত বিশের সংখ্যা, এ ক্ষেত্রে যাকাতদাতা ব্যক্তি তিন মুসিন্ন অথবা চারটি তাবী' দিয়ে যাকাত আদায় করতে পারবে (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ মহিষের যাকাতের হুকমও গরুর যাকাতের ন্যায়। গরু-মহিষ একত্রে থাকলে নিসাব পূর্ণ করার লক্ষ্যে গরুর সাথে মহিষেরও হিসাব করবে। তারপর এতদুভয়ের মধ্যে

যেটির সংখ্যা বেশী, তা থেকে যাকাত আদায় করবে। আর যদি বেশ-কম না হয়, তাহলে উত্তমটি থেকে নিম্নমানের এবং নিম্নমানেরটি থেকে উত্তম তথা মধ্যম ধরনের পশু দ্বারা যাকাত আদায় করবে (আল্-বাহ্রুর রাইক)। "মানাফি'" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে নর-মাদী উভয়ের হুকম একই। "ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়্যা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নর গরুর যাকাতের মধ্যে তাবী' এবং মাদী গরুর যাকাতের মধ্যে তাবীআ প্রদান করা উত্তম (তাতারখানিয়্যা)। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে গরুর উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ন্যূনতমপক্ষে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করা আবশ্যক (শরহুত্ তাহাবী)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ রাখালের নিয়ন্ত্রণে বিচরণ করে আহার করে এরূপ বকরীর সংখ্যা চল্লিশটি না হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এ ধরনের বকরীর সংখ্যা চল্লিশটি হলে তাতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। এ হুকুম একশত বিশ পর্যন্ত চলবে। এর থেকে একটিও বেশী হলে দু'টি বকরী ওয়াজিব হবে। দুইশত পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকবে। দুইশত থেকে বেশী হলে তাতে তিন বকরী ওয়াজিব হবে। তারপর চারশত পূর্ণ হলে তাতে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি একশতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রেরিত পত্রে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পত্রে অনুরূপ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু এর উপর উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। বকরীর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য অন্তত এক বছর বয়সী হওয়া আবশ্যক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (শরহুত তাহাবী)। বকরী ও হরিণ এতদুভয়ের প্রজননে যে বাচ্চা পয়দা হয়, তাতে মায়ের হুকুম বিবেচিত হবে। মা যদি বকরী হয়, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং এর দ্বারা যাকাতের নিসাবের পূর্ণতা বিধান করা যাবে। এরূপ না হলে করা যাবে না। অনুরূপভাবে বন্য ও গৃহপালিত গরুর মিলনে যে বাচ্চা পয়দা হয়, তার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ যে যে পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। এই অভিমতটি ফাতওয়ার জন্য অধিক পসন্দনীয়। তবে ব্যবসার ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে (কাফী)। সুতরাং ব্যবসার ঘোড়ার হুকুম ব্যবসার পণ্যের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ এর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই তা মাঠে-ময়দানে বিচরণ করে আহার করুক কিংবা মালিক নিজে এর আহারের ব্যবস্থা করুক (মুযমারাত)। গাধা, খচ্চর, চিতা এবং শিকারী কুকুর ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে (সিরাজিয়্যা)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বকরী, উট এবং গাভীর বাচ্চার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এটা তাঁর সর্বশেষ অভিমত। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এরও রায়। যদি এর মধ্যে একটি পূর্ণ বয়স্ক হয়, তবে নিসাব হিসাবের মধ্যে সব এর অধীন হবে। কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর দ্বারা যাকাত আদায় করা যাবে না (হিদায়া)। যদি উনচল্লিশটি বাচ্চা হয় আর একটি বয়স্ক বকরী হয়, তবে এর উপর মধ্যম ধরনের একটি বকরী ওয়াজিব হবে। যদি বয়স্ক বকরীটিই মধ্যম ধরনের হয় অথবা এর চেয়ে কম বয়সের হয়, তবে সেটিই যাকাত হিসাবে উসূল করা হবে।

২. মাসআলা ঃ যদি এক বছর পর তা নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সাহেবায়নের মতে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কারো নিকট উনপঞ্চাশটি উটের বাচ্চা থাকে এবং একটি হিক্কা থাকে, তবে এটিই যাকাত হিসাবে ওয়াজিব হবে। যদি এসব বাচ্চার অর্ধেক মরে যায়, তবে অর্ধ হিক্কার যাকাত রহিত হয়ে যাবে এবং অর্ধেক বাকী থাকবে (কাফী)। উটনীর কোন বাচ্চা যাকাত হিসাবে নেওয়া জাইয নেই (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যে সব পশু কর্ষণের কাজে এবং যে সব পশু বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার করা হয় কিংবা যে সব পশুকে মালিক নিজ তত্ত্বাবধানে দানা-পানির ব্যবস্থা করে থাকে এগুলোর যাকাত ওয়াজিব হয় না (হিদায়া)।।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ-রৌপ্য ও আসবাবপত্রের যাকাত

[এই পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হয়। বিশ মিছকাল স্বর্ণে অর্ধ মিছকাল যাকাত ওয়াজিব হয়।[১] চাই তা মুদ্রা হোক অথবা না হোক কিংবা অলংকার জাতীয় স্বর্ণ হোক সব ক্ষেত্রেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে চাই তা পুরুষের হোক বা মহিলার হোক, কাঁচা স্বর্ণ হোক কিংবা পাকা স্বর্ণ হোক, সব অবস্থায় আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যে জিনিসের যাকাত দেওয়া হবে, তা ওযনের দিক থেকে নিসাব পরিমাণ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূল্য ধর্তব্য নয়। কাজেই যদি পাঁচটি খাঁটি দিরহামের বদলে পাঁচটি মেকি দিরহাম প্রদান করা হয় যার মূল্য চারটি খাঁটি দিরহামের সমান, তবে সাহেবায়নের মতে জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। অবশ্য যদি কেউ পাঁচটি মেকি দিরহামের বদলায় চারটি খাঁটি দিরহাম দান করে, যার মূল্য পাঁচটি দিরহামের সমান, তবে তা জাইয হবে না। যদি কারো নিকট রূপার কোন লোটা বা কেতলি থাকে, যার ওযন দুইশত দিরহামের সমান, কিন্তু তা তৈরী করতে তিনশত দিরহামের মত খরচ পড়েছে, এ জাতীয় কোন বস্তুর যাকাত যদি রৌপ্যের দ্বারা প্রদান করা হয়, তাহলে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তথা এমন পাঁচ দিরহাম দ্বারা যাকাত আদায় করবে যার মূল্য হবে সাড়ে সাত দিরহাম। আর যদি এমন পাঁচ দিরহাম দ্বারা যাকাত আদায় করা হয়, যার মূল্য পাঁচ দিরহামই, তবে তাও জাইয আছে। যদি অন্য জাতীয় বস্তুর দ্বারা এর যাকাত আদায় করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে মূল্য ধর্তব্য হবে। এতে ফকীহ্গণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে (তাবয়ীন)। যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলিয়ে নিসাব হিসাব করা হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এতদুভয়ের ওযনের বিষয়টি ধর্তব্য হবে এবং এ হিসাবে নিসাব নিরূপিত হবে। ইজমার সিদ্ধান্ত মতে এ ক্ষেত্রে মূল্য ধর্তব্য হবে না। সুতরাং যদি কারো নিকট রৌপ্যের কোন লোটা-ঘটি থাকে, যার ওযন হল একশত পঞ্চাশ দিরহাম কিন্তু মূল্য হচ্ছে দুইশত দিরহামের সমান, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না[২] (আয়নী ঃ শরহুল কান্‌য)। "ইয়ানাবি'" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সংখ্যার দিক থেকে যদি দুইশত হয় এবং ওযনের দিক থেকে কম হয়, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদিও কমের পরিমাণ খুবই নগণ্য হয় না কেন (তাতারখানিয়্যা)।

১. দুইশত দিরহাম হল, ৫২।। তোলা রৌপ্যের সমান। আর বিশ মিছকাল হল ৭।। ভরি স্বর্ণের সমান।

২. শুধু এই জিনিসটিই আছে, অন্য কোন রূপার জিনিস বা টাকা নাই, সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ স্বর্ণের মধ্যে মিছকালের ওযন এবং দিরহামের মধ্যে "ওযনে সাব'আ" ধর্তব্য হবে। "ওযনে সাব'আ"-এর ব্যাখ্যা হল, দশ দিরহাম সাত মিছকালের সমান হওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মিছকাল এমন দীনার যা বিশ কীরাতের সমান এবং দিরহাম হল চৌদ্দ কীরাতের সমান। আর এক কীরাত পাঁচ যবের সমান হয়ে থাকে (তাবয়ীন)। দিরহামের সাথে খাদ মিশ্রিত থাকলে এবং রৌপ্যের পরিমাণ বেশী হলে এ দিরহাম খাঁটি দিরহাম হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি খাদের পরিমাণ বেশী হয়, তাহলে এটি রৌপ্যের ন্যায় হবে না। যেমন জাল দিরহাম। যদি এর প্রচলন থাকে এবং এতে ব্যবসার নিয়্যাত করা হয়, তাহলে এর মূল্য ধর্তব্য হবে। যদি এর মূল্য নিম্নমূল্যের দিরহামের নিসাব-এর সমপরিমাণ হয়, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি এ দিরহামের প্রচলন না থাকে এবং এতে ব্যবসার নিয়্যাতও না করা হয়, তাহলে এ দিরহামের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। খাদ মিশ্রিত দিরহামের মধ্যে যদি খাদের পরিমাণ বেশী হয় কিন্তু এতে যে পরিমাণ রৌপ্য আছে তার মূল্য যদি দুইশত দিরহামের সমপরিমাণ হয় এবং খাদ থেকে এগুলোকে পৃথক করা সম্ভব হয়, তবে এ দিরহামের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এগুলোকে খাদ থেকে পৃথক না করা যায়, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, বহু কিতাবে অনুরূপ উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে। খাদ মিশ্রিত স্বর্ণের হুকুমও খাদমিশ্রিত রৌপ্যের অনুরূপ। অবশ্য স্বর্ণ ও খাদের পরিমাণ যদি সমান সমান হয়, তবে এতে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। "খানিয়া এবং খুলাসা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সতর্কতা হেতু এতে যাকাত ওয়াজিব হবে (আল্-বাহ্রুর রাইক)।

৩. মাসআলা ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত অবস্থায় যদি স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে স্বর্ণের নিসাব হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি রৌপ্যও নিসাব পরিমাণ হয়, তবে রৌপ্যের নিসাব অনুসারেও যাকাত ওয়াজিব হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি রৌপ্যের পরিমাণ বেশী হয়। কিন্তু যদি রৌপ্যের পরিমাণ কম হয়, তবে সবই স্বর্ণ হিসাবে ধর্তব্য হবে। কেননা, স্বর্ণের দাম রূপার তুলনায় বেশী (তাবয়ীন)। মুদ্রা ব্যবসার জন্য না হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি ব্যবসার জন্য হয় এবং দুইশত দিরহামের সমপরিমাণ হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে (মুহীত)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে রৌপ্য দুইশত দিরহামের অধিক হলে অতিরিক্ত দিরহামের পরিমাণ চল্লিশ না হলে অতিরিক্ত দিরহামের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। চল্লিশ দিরহাম হলে তাতে এক দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ স্বর্ণের পরিমাণ বিশ মিছকালের অধিক হলে অতিরিক্ত স্বর্ণের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যতক্ষণ না অতিরিক্তের পরিমাণ চার মিছকাল হবে। প্রতি চার মিছকালে দুই কীরাত যাকাত ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, হিদায়া)। মাল-সামানের মূল্য সোনা-রূপার সাথে মিলানো হবে। এমনিভাবে মূল্য হিসাবে স্বর্ণকেও রৌপ্যের সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করতে হবে (কান্‌য)। সুতরাং কেউ যদি একশত দিরহাম এবং এমন পাঁচ দীনারের মালিক হয়, যার মূল্য একশত দিরহামের সমান, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু সাহেবায়ন এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেউ যদি একশত দিরহাম এবং দশ দীনার অথবা একশত পঞ্চাশ দিরহাম ও পাঁচ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দীনার অথবা পনের দীনার ও পঞ্চাশ দিরহামের মালিক হয়, তবে এগুলোকে একত্রিত করে হিসাব করে যাকাত প্রদান করা হবে। এতে ইমামগণ সকলেই একমত (কাফী)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি একশত দিরহাম ও এমন দশ দীনারের মালিক হয়, যার মূল্য একশত দিরহাম থেকে কম, তাহলে সাহেবায়নের মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে যাকাত ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কারো নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভিন্ন ভিন্ন দুই নিসাব থাকে এবং তার নিকট স্বর্ণের নিসাবের অতিরিক্ত চার মিছকাল থেকে কম স্বর্ণ থাকে, এমনিভাবে রৌপ্যের নিসাবের ক্ষেত্রে নিসাবের অতিরিক্ত চল্লিশ দিরহাম থেকে কম দিরহাম থাকে, তাহলে অতিরিক্ত দিরহাম ও মিছকালসমূহ একত্রে মিলানো হবে, যাতে চল্লিশ দিরহাম অথবা চার মিছকালের হিসাবে পূর্ণ হয় (মুযমারাত)। যদি কেউ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুই নিসাবকে একত্রিত করে ফেলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্যে, তবে এতে কোন দোষ নেই। তবে ওয়াজিব হল, যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে গরীব মানুষের উপকার বেশী হয়, তা করা। এরূপ করতে না পারলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রত্যেকটি থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করবে। (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল যে প্রকারেরই হোক, যদি এর মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবের সমান হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা দ্বারা হিসাব করবে (তাবয়ীন)। যদি বছরের প্রথম মালের মূল্য এমন দুইশত দিরহাম-এর সমান হয়, যার মধ্যে রৌপ্যের পরিমাণ বেশী, তবে এর মূল্য বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ধর্তব্য হবে (মুযমারাত)। ব্যবসার পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মালিকের ইখতিয়ার রয়েছে, দিরহাম বা দীনার যে কোন একটির ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। অবশ্য যদি এতদুভয়ের কোন একটি নিসাব পূর্ণ না হয়, তবে যেটির নিসাব পূর্ণ হবে, তা দিয়েই হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে (আল্ বাহ্রুর রাইক)। যদি কারো নিকট দুইশত দিরহাম মূল্যের দুইশত কাফীয (قفيز) গম থাকে—এমতাবস্থায় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি এর মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, তাহলে গম দিয়ে যাকাত আদায় করলে পাঁচ কাফীয আদায় করতে হবে। আর যদি মূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করা হয়, তবে যে দিন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে ঐদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, যে মালে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, তা অথবা এর মূল্য এতদুভয়ের কোন একটি দ্বারা যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। উভয়টি ওয়াজিব নয়। এ কারণেই যাকাত উসূলকারী ব্যক্তিকে তা গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু সাহেবায়নের মতে যে দিন যাকাত আদায় করা হবে ঐ দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। এই হুকুম ঐ সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যা মাপা যায়, ওযন করা যায় এবং গণনা করে লেন-দেন করা হয়। বস্তুর ভিতরগত যাতী কোন কারণে এর মূল্য বৃদ্ধি পেলে, যেমন কোন বস্তুর আর্দ্রতা শুকিয়ে যাওয়া, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এ

মালের উপর যেদিন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, বছরের পর যা লাভ হয়, তা মূল মালের সাথে ধর্তব্য হয় না। আর যদি মূল বস্তুর মধ্যে ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়, যেমন মাল শুকনা ছিল কিন্তু ভিজে গেছে, তাহলে সকলের মতেই যেদিন যাকাত আদায় করা হবে ঐদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে (কাফী)।

২. মাসআলা ঃ মাল যে জায়গায় আছে, ঐ জায়গার দর অনুসারে মালিক মালের মূল্য নির্ধারণ করবে। সুতরাং মালিক যদি তার ক্রীতদাসকে কোন শহরে প্রেরণ করে এবং তথায় তার এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে ঐ শহরের দর ধর্তব্য হবে। আর কোন গোলাম যদি মাঠে-ময়দানে অবস্থান করে, তবে এ স্থানের নিকটবর্তী শহরে সাধারণত এর যা মূল্য হবে তাই মূল্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে (ফাতহুল কাদীর ঃ ফাতাওয়ার সূত্রে)। যদি ব্যবসার মাল বিভিন্ন প্রকারের হয়, তবে এক প্রকার মালের সাথে অন্য মাল মিলিয়ে যাকাত আদায় করবে। ইয়াকৃত, মোতি এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ অলংকার হলেও এর উপর যাকাত নেই। কিন্তু যদি ব্যবসার জন্য হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। কেউ যদি তামা বা কাঁসার ডেগ খরীদ করে তা ভাড়া দেয়, তবে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমনিভাবে ভাড়া দেওয়া ঘরের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। কেউ যদি যমীন হতে নিসাব পরিমাণ মূল্যের উৎপন্ন শস্য পায় এবং তা রেখে দেওয়া বা বিক্রি করার নিয়্যাতে ঘরে সঞ্চয় করে রাখে এবং এ অবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি ব্যবসায়ী ব্যক্তি কোন জন্তু খরীদ করে এবং এর গলায় দেওয়ার জন্য ঘুঙুর, চাপাদরি অথবা মাথায় ঝুলানোর জন্য রুমাল খরীদ করে আর ঐ পশু বিক্রি করার সময় এগুলোও বিক্রি করে দেয়, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এসব বস্তু পশুর হিফাযতের জন্য খরীদ করা হয় তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (যখীরা)। অনুরূপভাবে আতর বিক্রেতা ব্যক্তি যদি শিশি খরীদ করে, তবে এর হুকুমও অনুরূপই। যদি কোন ব্যক্তি শস্য রাখার বস্তা বা ঝাঁকা মানুষের নিকট ভাড়া দেওয়ার জন্য খরীদ করে, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এগুলো সে শস্য সংরক্ষণ করার জন্য খরীদ করেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খরীদ করেনি (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। রুটি তৈরীকারী বাবুর্চি যদি রুটি তৈরী করার জন্য কাঠ বা লবণ খরীদ করে, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। রুটিতে যে তৈল ব্যবহার করা হয়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে (যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি ব্যবসায়ী (مضارب) ব্যক্তি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার জন্য কাপড় অথবা বোঝা উঠানোর জন্য গদী ইত্যাদি খরীদ করে, তবে সব কিছুরই যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু মালের মালিকের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। সে এ সব জিনিস খরীদ করলে তাকে এ সবের যাকাত দিতে হবে না। কেননা, ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যেও সে এগুলো খরীদ করার ক্ষমতা রাখে (কাফী)। যদি (مضارب) ব্যবসায়ী ব্যক্তি ব্যবসার গোলামের আহারের জন্য খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে এবং এর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু মালিক ব্যবসায়ের গোলামের আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী খরীদ করলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যে মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় এর যাকাত অন্য মাল দ্বারা আদায় করলে ওয়াজিব পরিমাণের মূল্য সাব্যস্ত করে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আর একই মাল দ্বারা যাকাত আদায় করলে ঐ মাল যদি এমন মাল না হয় যাতে রিবা (সূদ) হয়, তবু এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি ঐ মাল রিবা (সূদ) সংশ্লিষ্ট মাল হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে মূল্য ধর্তব্য হবে না। বরং পরিমাণ ধর্তব্য হবে (শরহুত তাহ্বী)।

বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ যদি যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এরূপ সন্দেহ হয় যে, যাকাত দিয়েছে অথবা দেয়নি, তবে সতর্কতার লক্ষ্যে পুনরায় যাকাত প্রদান করবে। (মুহীত, সিরাজিয়্যা, আল-বাহ্রুর রাইক, ওয়াকি'আত-এর সূত্রে) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যাকাত নিসাবের মধ্যে ওয়াজিব হয়। আফ্ব عفو ঃ নিসাব অতিরিক্ত এমন মাল যা পরবর্তী নিসাব পর্যন্তও পৌঁছে না)-এর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না। সুতরাং আফ্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং মূল নিসাব বাকী থাকে, তবে যাকাত যা ওয়াজিব হয়েছে তা পুরাপুরিভাবেই আদায় করতে হবে। কেননা, আফ্ব (عفو) তো মূল নিসাবের অধীন (تابع)। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যাকাতের কোন মাল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে আফ্ব (عفو) এর পূর্ববর্তী নিসাব থেকে এটিকে কর্তন করা হবে। ঐ নিসাব যদি ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পূর্ণ না করে, তাহলে এর আগের নিসাব থেকে তা কর্তিত হবে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি যাকাতের পূর্ণ মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। যদি সামান্য কিছু নষ্ট হয়ে যায়, তবে ঐ পরিমাণ মালের যাকাত রহিত হয়ে যাবে (হিদায়া)। যদি মালিক নিজে যাকাতের মাল নষ্ট করে দেয়, তবে যাকাত রহিত হবে না (সিরাজিয়্যা)। ব্যবসার মাল পরস্পর পরিবর্তন করা যাকাতের মাল নষ্ট করার মধ্যে শামিল নয়। এতে কারো দ্বিমত নেই। চাই এক জাতীয় মাল দ্বারা পরিবর্তন করা হোক অথবা ভিন্ন জাতীয় মাল দ্বারা পরিবর্তন করা হোক। অবশ্য যদি এ পরিবর্তনের পরিমাণ মাল ছেড়ে দেয়, যে পরিমাণ মাল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাধারণত মানুষ ধোঁকা খায় না, তবে এ ছেড়ে দেওয়া মালের যাকাত তাকে আদায় করতে হবে। বছরের শেষে নিসাবের মাল ঋণ দেওয়া মাল নষ্টের মধ্যে শামিল নয়। যদিও ঋণ গৃহীতা ব্যক্তির নিকট মাল হালাক হয়ে যায় (আল্-বাহ্রুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ যদি সায়িমা পশুকে ঘাস-পানি না দেওয়া হয় এবং এতে তা ধ্বংস হয়ে যায়, বা মরে যায় তবে কারো কারো মতে এটা ধ্বংস করার শামিল। কাজেই এর যাকাত দিতে হবে। আর কারো কারো মতে এর যাকাত দিতে হবে না। বছর পূর্ণ হওয়ার পর যদি বিনিময় ছাড়াই মাল নিজের মালিকানা হতে বের করে দেওয়া হয়, যেমন হিবা করে দেওয়া অথবা এমন বস্তুর বিনিময়ে মাল নিজের মালিকানা থেকে বের করে দেওয়া যা মাল নয়, যেমন মহর দেওয়া,

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা এমন মালের বিনিময়ে মাল নিজের মালিকানা থেকে বের করে দেওয়া যাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না যেমন খিদমতের গোলাম ক্রয় করা ইত্যাদি মাল ধ্বংসের শামিল। কাজেই এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই বিনিময়ের বস্তু তার হাতে থাকুক, বা না থাকুক। কেউ যদি কাযী (বিচারক)-এর হুকুমে হিবাকৃত মাল ফিরিয়ে নেয় এবং তা নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, তবে এতে যাকাতের যামানাত ওয়াজিব হবে না। কাযীর ফায়সালা ছাড়া এরূপ করলেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (যাহিদী)।

৩. মাসআলা ঃ বনূ তাগলিব-এর সায়িমা পশুর যাকাত সাধারণ মুসলমানদের থেকে যা নেওয়া হয়, এর দ্বিগুণ নেওয়া হবে। কিন্তু তাদের গরীব এবং ক্রীতদাসদের থেকে কিছু নেওয়া হবে না। অবশ্য জিযিয়া (কর) গ্রহণ করা হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। বনূ তাগলিব-এর বাচ্চাদের সায়িমা পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তাদের পুরুষ লোকদের উপর যা ওয়াজিব, মহিলাদের উপরও তা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। কিতাবে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, যাকাত দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে একত্রিত মালকে পৃথক করা যাবে না এবং পৃথক মালকেও একত্রিত করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কারো আশিটি বকরী থাকে, তবে তার উপর একটিমাত্র বকরী ওয়াজিব হবে। এগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এমনভাবে পৃথক করে হিসাব করা যাবে না যে, এগুলো যেন দুই ব্যক্তির বকরী। কাজেই এখান থেকে দুটো যাকাত হিসাবে উসূল করা হবে। (এমন করা জাইয নেই) আর যদি দুই ব্যক্তি আশিটি বকরীর মালিক হয়, তবে তাদের উপর দু'টি বকরী ওয়াজিব হবে। এই দুই মালিকের আশিটি বকরী এই হিসাবে একত্রিত করা যাবে না যেন এগুলো এক ব্যক্তিরই বকরী।[১] কাজেই এ থেকে একটি বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হোক (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। দুই ব্যক্তি যদি কোন জানোয়ারের মধ্যে শরীক থাকে, তবে এ থেকে এমনভাবে যাকাত উসূল করা হবে যেমন কোন শরীক না থাকা অবস্থায় উসূল করা হয়ে থাকে। অতএব, যদি প্রত্যেকেই নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। তা না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। চাই তাদের উভয়ের শরীকানা "শিরকাতে 'ইনান", (شركة عنان) শিরকাতে মুফাওয়াযা (شركة مفاوضة) কিংবা ওয়ারিছ সূত্রে শিরকাতে মিল্ক (شركة ملك) অথবা মালিকানার অন্য কোন প্রক্রিয়ায় হোক। অনুরূপভাবে চাই তা একই চারণভূমিতে হোক অথবা একাধিক চারণভূমিতে হোক। যদি একজনের অংশ নিসাব পরিমাণ হয় এবং অপরজনের অংশ নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যজনের উপর ওয়াজিব হবে না। যদি দুই শরীকের একজনের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, আর অপর জনের উপর যাকাত ওয়াজিব না হয়, তবে যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, তার অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি

---

১. শিরকতে ইনান অসম অংশীদারী কারবার। অর্থাৎ দুই পক্ষ যদি একত্রিত হয়ে যৌথ ব্যবসা করে এবং উভয়ের বিনিয়োগকৃত মূলধন যদি কম-বেশী হয়, কিন্তু কারবারি শ্রম উভয়েই মিলিতভাবে সম্পন্ন করে এরূপ শরীকানা ব্যবসাকে শিরকতে ইনান বলে। শিরকতে মুফাওয়াযাঃ সম-অংশীদারী কারবার। অর্থাৎ দুই ব্যক্তির মূলধন যদি সমপরিমাণ হয়, কাজও সমপরিমাণ হয় এবং অধিকারও সমপর্যায়ের থাকে, এরূপ শরীকানা ব্যবসাকে শিরকতে মুফাওয়াযা বলা হয় (হিদায়া ঃ ৩য় খণ্ড)।

আশিটি বকরীর প্রত্যেকটির অর্ধেকের মালিক হয়, আর অপর আশিজন মানুষ প্রত্যেকে তার সাথে এক একটির অর্ধেকের মালিক হয়, তাহলে প্রকারান্তরে সে চল্লিশটি বকরীর মালিক হল, এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে ষাটটি বকরীর এক ব্যক্তি প্রত্যেকটির অর্ধেক এবং আরো ষাট ব্যক্তির প্রত্যেকেই যদি এক একটি বকরীর অর্ধেকের মালিক হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর শরীক থাকে এবং তাদের যৌথ মালিকানাধীন পশু থেকে যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি যাকাত আদায় করে নেয়, তাহলে তারা একজন অপরজন থেকে সমান সমান হারে তা নিয়ে নিবে। যেমন দুই ব্যক্তি একষট্টিটি উটের মালিক। একজন ছয়ত্রিশটির এবং অপরজন পঁচিশটির মালিক। এমতাবস্থায় যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি যদি তাদের নিকট থেকে একটি বিনতে মাখায ও একটি বিনতে লাবূন আদায় করে নিয়ে যায়, তাহলে তাদের প্রত্যেক শরীক নিজ নিজ হিস্স্যা অনুসারে নিজ নিজ পাওনা অন্য শরীক থেকে বুঝে নিয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কারো অনেকগুলো সায়িমা পশু আছে, এগুলোর যাকাত উসূল করার জন্য যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি যখন তার নিকট আসল, তখন সে বলল, এগুলো আমার নয়, এমতাবস্থায় কসমের সাথে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে (শরহুত তাহাবী)। রাষ্ট্র প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি যাকাত চাওয়ার পর যাকাতদাতা ব্যক্তি যদি তা দিতে অস্বীকার করে, এরপর যাকাতের মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এ যাকাতের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। অধিকাংশ আলিম এমতই পোষণ করেন (তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ যদি খারিজী[১] লোকেরা ট্যাক্স ও সায়িমা পশুর যাকাত নিয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় বার এর যাকাত দিতে হবে না (হিদায়া)। "তুহ্ফা" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, উটের যাকাতের মধ্যে মাদী উট প্রদান করা ওয়াজিব। অতএব, মাদী উট ব্যতীত অন্য কোন উট দেওয়া জাইয নেই। অবশ্য মূল্য হিসাবে নর উট দেওয়াও জাইয আছে (তাতারখানিয়্যা)। বকরীর যাকাতের ক্ষেত্রে নর-মাদী উভয়ই গ্রহণ করা জাইয আছে। কেননা, شاة (শাত) শব্দটি নর-মাদী উভয়ের অর্থ পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ابل (ইবিল)-এর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। ইবিল-এর অর্থ খাস। এর মধ্যে বিন্তে মাখায ও বিন্তে লাবূন উভয়ই রয়েছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আমাদের মাযহাবে যাকাতের মধ্যে মূল্য প্রদান করাও জাইয আছে। কাফ্ফারা, সাদাকাতুল ফিত্র, 'উশর ও মান্নতের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (হিদায়া)। যদি কেউ চারটি মধ্যম ধরনের উটনীর পরিবর্তে তিনটি মোটা উটনী অথবা বিনতে মাখাযের পরিবর্তে বিনতে লাবূনের কিয়দংশ প্রদান করে, তবে তা জাইয আছে (ফাতহুল কাদীর)। যদি কোন ব্যক্তি দুইশত কাফীয গমের মালিক হয়, যার মূল্য দুইশত দিরহামের সমান, তাহলে উক্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে এই গম থেকেই পাঁচ কাফীয গম অথবা এর মূল্য প্রদান করতে পারবে (শরহুত্ তাহাবী)। সায়িমা পশু বিক্রয়কালে যদি যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তাহলে ওয়াজিব

---

১. খারিজী অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিমাণ মূল্য সে বিক্রেতার নিকট থেকে উসূল করে নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বেচা-কেনা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে প্রথমে বিক্রি করা জানোয়ার হতে যাকাতের জন্য বের করে নিবে। এ ক্ষেত্রে যাকাত হিসাবে যা উসূল করা হয়েছে এর লেনদেন বাতিল বলে পরিগণিত হবে। বেচা-কেনার সময় যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে এবং লেনদেনের বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর উপস্থিত হলে সে খরীদদার থেকে যাকাত উসূল করবে না বরং বিক্রেতার নিকট থেকে ওয়াজিব পরিমাণ মূল্য উসূল করে নিবে। কেউ যদি এমন খাদ্যশস্য বিক্রি করে যাতে 'উশর ওয়াজিব ছিল, তাহলে যাকাত উসূলকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে বিক্রেতা থেকে যাকাত আদায় করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে ক্রেতা থেকেও যাকাত আদায় করতে পারবে। চাই সে বিক্রয়ের সময় উপস্থিত হোক কিংবা পরে উপস্থিত হোক (আল্-বাহ্রুর রাইক, শরহুত্ তাহাবী)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার যমীন তিন বছরের জন্য ইজারা দেয় এবং প্রতি বছর তিনশত দিরহাম করে সাব্যস্ত করে, এমতাবস্থায় আট মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যমীনের মালিক যদি দুইশত দিরহামের মালিক হয়ে যায়, তাহলে এ সময় থেকে বছর গণনা আরম্ভ হবে। বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পাঁচশত দিরহামের যাকাত ওয়াজিব হবে। এরপর যখন দ্বিতীয় বছর অতিবাহিত হবে, তখন আটশত দিরহামের যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু যে পরিমাণ যাকাত ঐ পাঁচশত দিরহামের উপর ওয়াজিব হয়েছিল তা কমে যাবে। কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম ছিল, এ ছাড়া কোন মাল তার নিকট ছিল না। এই এক হাজার দিরহাম দিয়ে সে একটি বাড়ী দশ বছরের জন্য ভাড়া করল এবং প্রতিবছর একশত দিরহাম সাব্যস্ত করে পুরা এক হাজার দিরহাম মালিককে দিয়ে দিল। কিন্তু ঐ বাড়ীতে সে এক দিনও বাস করল না। এমনি করে সমস্ত বছর কেটে গেল এবং বাড়ীও মালিকের দখলে রয়ে গেল, তাহলে বাড়ীর মালিক প্রথম বছর নয়শত দিরহামের যাকাত দিবে, দ্বিতীয় বছর আটশত দিরহামের যাকাত দিবে। তবে প্রথম বছরের আদায়কৃত যাকাতের পরিমাণ উক্ত পরিমাণ থেকে কমে যাবে। তাপর প্রতি বছর একশত দিরহাম এবং যাকাত পরিমাণ দিরহাম কমে যাবে। কিন্তু ভাড়া গ্রহণকারীর উপর প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় বছর সে নিসাবের মালিক হয়নি। তৃতীয় বছর সে তিনশত দিরহামের যাকাত দিবে। তারপর প্রতিবছর একশত দিরহাম করে বাড়বে। কিন্তু অতীত বছরসমূহের যাকাত তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেউ যদি নিজের ঘর ব্যবসার বাঁদীর বিনিময়ে ভাড়া দেয় এবং এ বাঁদীর মূল্য এক হাজার দিরহাম হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কাজেই ভাড়াদাতা ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে বাদীর উপর মালিক হয়ে গেছে। আর মালিক হয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতই। অবশ্য যে ব্যক্তি ভাড়া নিয়েছে, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যে সব বস্তু মেপে বা ওযন করে বিক্রি করা হয়, তা যদি বিনিময় সাব্যস্ত করা হয় এবং অনির্দিষ্টভাবে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে এগুলোও দিরহামের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি নির্দিষ্ট হয়, তবে তা বাঁদী-দাসীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি বিনিময় ছাড়াই কোন বাড়ী ভাড়াটিয়া ব্যক্তির

নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। অথাৎ ভাড়াটিয়া ব্যক্তির হুকুম ভাড়াদাতার হুকুমের মত আর ভাড়াদাতার হুকুম ভাড়াটিয়ার হুকুমের অনুরূপ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি দুইশত দিরহাম মূল্যের গোলাম দুইশত দিরহামের বিনিময়ে খরীদ করে এর মূল্য বিক্রেতার হাতে দিয়ে দেয় কিন্তু গোলাম নিজের হাতে না আনে, এমনিভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় এবং বিক্রেতার নিকটই গোলাম মরে যায়, তাহলে বিক্রেতার উপর দুইশত দিরহামের যাকাত ওয়াজিব হবে অনুরূপভাবে খরীদকারীর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি গোলামের মূল্য একশত দিরহাম হয়, তাহলে বিক্রেতার উপর দুইশত দিরহামের যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু খরীদকারীর উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি খিদমতের গোলাম এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল এবং এর মূল্য এক বছর পর্যন্ত তার নিকট থাকল, তারপর কোন ত্রুটির কারণে কাযীর নির্দেশে অথবা পরস্পরের সম্মতিতে ক্রেতা ব্যক্তি বিক্রেতার নিকট ফেরত দিল, তাহলে এই মূল্যের যাকাত দিতে হবে। কিন্তু ব্যবসার পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা অবস্থায় বিক্রীত বস্তু যদি এক বছর পর কোন ত্রুটির কারণে কাযীর নির্দেশে ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রেতার উপর গোলাম এবং পণ্য কোনটার যাকাতই ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে ক্রেতাকেও পণ্যের যাকাত প্রদান করতে হবে না। অবশ্য কাযীর ফায়সালা ব্যতিরেকে ফেরত দিয়ে থাকলে ক্রেতার উপর পণ্যের যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এটি নতুন বেচা-কেনার মতই। যদি গোলাম দ্বারা খিদমত গ্রহণের নিয়্যাত করে নেয়, তাহলে সে পণ্যের যাকাতের যামিন হবে। কেননা, সে তা বিনষ্ট করেছে (কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি যাকাত আদায়ে বিলম্ব করতে করতে এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে সে গোপনে ওয়ারিছদের নিকট যাকাত দিয়ে দিবে। যদি তার নিকট কোন মাল না থাকে এবং যাকাত আদায়ের নিমিত্তে ঋণ নেওয়ার ইচ্ছা করে আর তার প্রবল ধারণা এমন থাকে যে, সে ঋণ নিয়ে যাকাত আদায়ের পর চেষ্টা করলে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে পারবে, তাহলে তার জন্য উত্তম হল ঋণ নিয়ে যাকাত পরিশোধ করা। যদি ঋণ নিয়ে যাকাত আদায়ের পর সে ঋণ পরিশোধের আগেই মারা যায়, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। আর যদি তার প্রবল ধারণা এরূপ হয় যে, ঋণ নিয়ে যাকাত আদায় করলে সে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে না, তবে তার জন্য উত্তম হল যাকাত আদায়ের ঋণ গ্রহণ না করা। কেননা, ঋণদাতার দাবী এর থেকেও মারাত্মক (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম মহর দিয়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং মহরের টাকা পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু সে একথা জানত না যে, এ মহিলা একজন ক্রীতদাসী। এমনিভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর সে জানতে পারল যে, এ মহিলা একজন ক্রীতদাসী এবং সে তার মুনীবের অনুমতি ছাড়াই তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থা জানাজানি হওয়ার পর মহিলা তার স্বামীর নিকট এক হাজার দিরহাম ফেরত দিয়ে দিল, এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ কারো দাড়ি কামিয়ে ফেলে এবং কাযী তার উপর জরিমানা স্বরূপ দিয়াতের হুকুম দেয়, তারপর সে সাথে সাথে ঐ দিয়াত পরিশোধও করে দেয়, আর এ অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপর তার মুখে আবার দাড়ি গজিয়ে উঠে এবং সে ঐ জরিমানার টাকা ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি স্বীকার করে যে, অমুকের এক হাজার দিরহাম করয আমার নিকট পাওনা আছে, এই বলে সে যদি তা তার নিকট আদায় করে দেয়। এক বছর পর তারা পরস্পর স্থির করল যে, তার উপর কোন করয বা ঋণ নেই, তাহলে তাদের কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ কাউকে এক হাজার দিরহাম হিবা করে, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কাযীর নির্দেশে বা নির্দেশ ছাড়াই যদি হিবা গৃহীতা হিবার মাল ফেরত দেয় এবং হিবাকারী তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদের কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ কারো উপর দুইশত দিরহামের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সে যদি তার নিজের মাল থেকে পাঁচ দিরহাম পৃথক করে রেখে দেয়, এমতাবস্থায় ঐ টাকা যদি তার নিকট থেকে হারিয়ে যায় এতে তার যাকাত রহিত হবে না। যাকাতের মাল পৃথক করার পর যদি মালের মালিক মারা যায়, তাহলে এই পাঁচ দিরহাম উত্তরাধিকার সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে (তাতার-খানিয়্যা ঃ যহীরিয়্যার সূত্রে)। যদি কেউ চল্লিশটি সায়িমা পশুর বিনিময়ে কাউকে বিবাহ করে এবং মহিলা তা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয় এবং এ মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে অবশিষ্ট অর্ধেক মালের যাকাত তার উপর ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ ব্যবসার মাল অনুচ্ছেদ)।

১১. মাসআলা ঃ কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সে যদি তা আদায় না করে, তাহলে তাকে না জানিয়ে তার থেকে যাকাতের মাল নিয়ে যাওয়া গরীব লোকদের জন্য জাইয নেই। যদি নিয়ে যায় এবং এই মাল তার নিকট বাকী থাকে, তবে মালিক এই মাল তার নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে উক্ত গরীব ব্যক্তি এই মালের জরিমানা আদায় করতে বাধ্য থাকবে (তাতারখানিয়্যা)। যদি রাষ্ট্র প্রধান কারো নিকট থেকে খারাজ হিসাবে অথবা জোরপূর্বক কোন মাল নিয়ে যায় এবং মালিক তা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়্যাত করে, তবে এতে যাকাত আদায় হবে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধমতে তার থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। ইমাম সুরুখসী (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন (মুযমারাত)। কোন জিনিসের বদলায় যদি অন্য কোন জিনিস লওয়া হয়, তবে বিনিময়ের উভয় দ্রব্যের হুকুম একই হবে। সুতরাং কেউ যদি এক গোলামের বদলায় অন্য গোলাম গ্রহণ করে এবং কোন কিছুর নিয়্যাত না করে, তবে এ গোলাম ব্যবসার গোলাম হয়ে থাকলে বখেনো তা ব্যবসার গোলাম হিসাবেই গণ্য হবে। আর খিদমতের হয়ে থাকলে এখনো তা খিদমতের গোলাম হিসাবেই গণ্য হবে। যদি একটি খিদমতের আর অপরটি ব্যবসার হয়ে থাকে, তবে খিদমতের গোলামের বিনিময়ে যেটি আসছে, তা খিদমতের গোলাম হিসাবে গণ্য হবে এবং ব্যবসার গোলামের বদলায় যা আসছে, তা ব্যবসার গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। অর্ধ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর এক গোলামকে অন্য গোলামের সাথে পরিবর্তন করে এবং তারা যদি উভয়ই ব্যবসার মাল হয়ে থাকে এবং এক গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম ও অন্য গোলামের মূল্য দুইশত দিরহাম হয়। অতঃপর তাদের বছর পুরা হওয়ার পর যদি কম মূল্যের গোলামের মধ্যে এমন দোষ প্রকাশিত হয়, যার ফলে এর মূল্য একশত দিরহাম কমে যায়, তবে তাদের কারো উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, বছরের দুই প্রান্তে তাদের নিসাব পূর্ণ ছিল না। গোলাম খরীদ করার পর হতে যদি বছর পূর্ণ হয়ে যায়, তবে অধিক মূল্যের গোলামের মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এক হাজার দিরহাম মূল্যের গোলাম পুরা বছরই তার হাতে বাকী ছিল। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, তার নিসাব পূর্ণ হয়নি। যদি দোষী গোলামকে ক্রেতা ব্যক্তি কাযীর সিদ্ধান্ত ছাড়াই ফেরত দেয়, তবে ফেরতদাতা ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদিও গোলাম খরীদের পর এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। অবশ্য যার নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে, সে এক হাজার দিরহামের যাকাত আদায় করবে। কেননা, তার ক্ষেত্রে এটা নতুন লেন-দেন হিসাবে গণ্য হবে। যেন সে উক্ত মাল নষ্ট করে দিয়েছে। এ অবস্থায় যেমনিভাবে যাকাত ওয়াজিব হয় না, এ অবস্থায়ও যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি কাযীর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ক্রেতা তা ফেরত দেয়, তবে যার নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে, সে এর যাকাত প্রদান করবে। যদি বেশী দামী গোলামের মধ্যে এমন দোষ প্রকাশিত হয়, যার ফলে এর মূল্য খরীদের সময় থেকে অর্ধ মাস পর দুইশত দিরহাম পরিমাণ কমে যায় কিন্তু অপর গোলামের মধ্যে কোনরূপ দোষ প্রকাশিত না হয়, এমতাবস্থায় পরিবর্তনকারী ব্যক্তি যদি দোষী গোলামকে কাযীর নির্দেশে অথবা পরস্পর সম্মতিতে ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে ফেরতদাতা ব্যক্তি যার নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে যাকাত প্রদান করবে এবং যার নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে, সে যার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে যাকাত প্রদান করবে (কাফী)।

১২. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি তাদের মালের যাকাত আদায় করার জন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করে মালও বুঝিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি তাদের উভয়ের মাল একত্রিত করে ফেলে এবং এরপর গরীবদেরকে দান করে, তাহলে সে ঐ দুইজনের মালের যিম্মাদার হবে এবং ঐ সাদাকা তার পক্ষ হতে আদায় হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি মালিক যাকাতের মাল তার নিজের তত্ত্বাবধানে রাখে এবং গরীব লোকেরা তার হাত থেকে লুট করে নিয়ে যায়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি যাকাতের মাল মালিকের হাত থেকে যমীনে পড়ে যায় এবং কোন গরীব ব্যক্তি তা উঠিয়ে নিয়ে যায়, তাতে মালিক যদি রাযী থাকে, তবে মালিক যদি তার মাল চিনে থাকে এবং মালও মওজুদ থাকে, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'আশির তথা 'উশর আদায়কারী ব্যক্তির নিকট দিয়ে যারা পথ অতিক্রম করে, তাদের বিবরণ

(বর্তমান পরিভাষায় ট্যাক্স আদায়কারী)

১. মাসআলা ঃ 'আশির এমন ব্যক্তিকে বলে, যাকে রাষ্ট্রপ্রধান রাস্তায় নিয়োগ করে সাদাকা উসূল করার জন্য। সে এ স্থানে বসে সাদাকা উসূল করে এবং এর বিনিময়ে ব্যবসায়ীদেরকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে রক্ষা করে। 'আশির যেমনিভাবে اموال ظاهره প্রকাশ্য মালের[১] সাদাকা উসূল করে, তেমনিভাবে সে اموال باطنه তথা ঐ মালের সাদাকাও উসূল করবে, যা ব্যবসায়ীর নিকট অপ্রকাশ্যভাবে আছে (কাফী)। যাকে 'আশির নিয়োগ করা হবে, তার জন্য আযাদ এবং এমন মুসলমান হওয়া শর্ত, যে হাশিমী বংশোদ্ভব নয় (আল্-বাহ্রুর রাইক ঃ গায়া গ্রন্থের সূত্রে)। 'আশিরের নিকট দিয়ে কোন মুসলমান ব্যবসার মাল নিয়ে গেলে সে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ নিসাব পূর্ণ হলে এবং বছর অতিক্রান্ত হলে উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে উসূল করবে। অতঃপর সে এ মাল যাকাতের খাতে ব্যয় করবে। আর কোন যিম্মী (কর দেয় এমন কোন অমুসলিম) ব্যক্তি তার নিকট দিয়ে গেলে উক্ত শর্ত সাপেক্ষে সে তার নিকট থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করবে এবং এ মাল খারাজ ও জিযয়ার খাতে জমা করবে। এতে ঐ যিম্মীর উপর বাৎসরিকভাবে যে জিযয়া ওয়াজিব হয়, তা রহিত হবে না। কোন যিম্মী থেকে বছরে এক বারের অধিক জিযয়া উসূল করবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ 'আশিরের নিকট দিয়ে যদি কেউ দুইশত দিরহামের কম মাল নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে, তবে সে মুসলমান হোক বা যিম্মী হোক অথবা হরবী হোক এবং তার বাড়ীতে এ ছাড়াও আরো মাল আছে এ কথা জানা থাকুক বা না থাকুক, তার থেকে কোন কিছু উসূল করা যাবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কেউ 'আশিরের নিকট দিয়ে মাল নিয়ে যাওয়ার কালে বলে যে, এ মালের বছর পুরা হয়নি এবং এ ছাড়া বছর পুরা হয়েছে এ জাতীয় এমন কোন মালও তার হাতে নেই অথবা এরূপ বলে যে, আমার নিকট মানুষের পাওনা রয়েছে, কিংবা এ কথা বলে যে, আমি সফরে বের হওয়ার পূর্বে গরীবদেরকে সাদাকা দিয়ে এসেছি কিংবা বলে যে, অন্য 'আশিরের নিকট আমি যাকাত আদায় করেছি এবং হলফ করে বলে আর ঐ বছর সরকার কর্তৃক অপর একজন 'আশিরও নিয়োজিত ছিল, তাহলে তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করা হবে। জামি' সগীর

১. اموال ظاهره বা প্রকাশ্য মাল বলতে জীব-জানোয়ার, উৎপন্ন ফসল, জমি-বাড়ী ইত্যাদিকে বুঝায়, اموال باطنه বা অপ্রকাশ্য মাল বলতে টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ের মালকে সাধারণত বুঝায়।

গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে অন্য 'আশিরের নিকট প্রদত্ত যাকাতের রসিদ দেখানো তার উপর শর্ত নয়। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। যদি ঐ বছর সরকার কর্তৃক অন্য কোন 'আশির নিয়োজিত না থাকে, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। এমনিভাবে সফরে বের হওয়ার পর অন্য কোন ফকীরকে যাকাত দিয়ে দিয়েছে বলে দাবী করলেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (কাফী)। যদি সে যাকাত উসূলকারী ব্যক্তির নামের বিপরীত রসিদ দেখায়, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে শপথ এর ভিত্তিতে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, রসিদ দেখানো শর্ত নয় (বাদাই')।

৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ মিথ্যা হলফ করে বলে যে, সে অন্য তহসীলদারের নিকট যাকাত প্রদান করেছে এবং কয়েক বছর পরে তার এ বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হল, তবে তার থেকে অতীত বছরের যাকাত উসূল করা হবে (তাতারখানিয়্যা ঃ জামিউল জাওয়ামি')। যে যে ক্ষেত্রে মুসলমানকে বিশ্বাস করা হয়, সে সে ক্ষেত্রে যিম্মী ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করা হবে (কান্য)। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এ কথা ঠিক নয়। কেননা, কোথাও এর বিপরীত হতেও দেখা যায়। কারণ, যিম্মী থেকে যা আদায় করা হয়, তা হচ্ছে জিযয়া। আর জিযয়ার ক্ষেত্রে যিম্মীর কথা বিশ্বাস করা যায় না। যদি সে বলে যে, আমি গরীবদেরকে তা দিয়ে দিয়েছি, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, যিম্মী গরীব লোকেরা এর مصرف (খাত) নয় এবং এ সম্পদ তার যথাযথ খাতে ব্যয় করার ইখতিয়ারও তাদের নেই। প্রকৃতপক্ষে এ সব সম্পদ ব্যয় করার খাত হল জনকল্যাণ খাত। কোন যিম্মী যদি সায়িমা পশুর ক্ষেত্রে বলে যে, আমি শহরে থাকতেই এসব পশুর যাকাত গরীবদেরকে দিয়ে এসেছি, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। বরং তার থেকে পুনরায় যাকাত উসূল করা হবে। যদিও রাষ্ট্রপ্রধান তার সাদাকা আদায় করা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে। সে দ্বিতীয় বার যা প্রদান করবে, তাই যাকাত হিসাবে গণ্য হবে এবং প্রথমবারে যা আদায় করেছে, তা নফল সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। এটাই সহীহ্ মত (তাবয়ীন)। "জামিয়ে আবিল ইউস্র" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি রাষ্ট্রপ্রধান তার এ দানকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য যেমনিভাবে প্রথমেই গরীব লোকদেরকে সাদাকা প্রদানের অনুমতি দেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে, অনুরূপভাবে গরীব লোকদেরকে দিয়ে দেওয়ার পর এর বৈধতার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানেরও ইখতিয়ার রয়েছে (আল্-বাহ্রুর রাইক)। কোন ব্যক্তি যদি সায়িমা পশু অথবা নগদ টাকা-পয়সাসহ 'আশিরের নিকট দিয়ে যায় এবং বলে, এগুলো আমার নয়, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি ব্যবসার পণ্য-সামগ্রীসহ 'আশিরের নিকট দিয়ে যায় এবং বলে, এগুলো ব্যবসার মাল নয়, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (শরহুত্ তাহাবী)। কেউ যদি শরীকী দুইশত দিরহাম নিয়ে 'আশিরের নিকট দিয়ে যায়, তবে তার থেকে 'উশর নেওয়া হবে না। অনুরূপভাবে মুযারাবাত (অংশীদারী ব্যবসা)-এর মাল নিয়ে 'আশিরের নিকট দিয়ে গেলে তার থেকেও 'উশর নেওয়া হবে না। কিন্তু যদি ঐ মালের লভ্যাংশের পরিমাণ নিসাবের সমান হয়, তবে এর থেকে 'উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে এই মালের মালিক (হিদায়া)। এই ব্যবসার

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি মাল নিয়ে আদায়কারীর নিকটে যায়, তবে তার থেকে যাকাত আদায় করা হবে না। মুনীবের মাল হলেও যাকাত আদায় করা হবে না। এমনিভাবে তার কামাই হলেও সহীহ্ মতে তার থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য মুনীব যদি তার সাথে থাকে, তবে তার থেকে সাদাকাত গ্রহণ করা হবে। কিন্তু গোলামের উপর যদি এমন ঋণ থাকে, যা তার যাবতীয় মাল পরিব্যাপ্ত, তবে এ অবস্থায় তার থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে না (কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ যদি যিম্মী ব্যক্তি ব্যবসার মদ ও শূকর সাথে নিয়ে আদায়কারীর নিকট দিয়ে যায় এবং উভয়ের মূল্য দুইশত দিরহাম বা ততোধিক হয়, তবে মদের মূল্যের 'উশর আদায় করবে। কিন্তু শূকরের মূল্যের 'উশর রাখবে না। এটা যাহিরী রিওয়ায়েত এবং এটাই ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। তবে যিম্মী ব্যক্তি মৃত জানোয়ারের চামড়া নিয়ে আদায়কারীর নিকট দিয়ে গেলে তার হুকুম কি হবে, এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে কোন ফাতওয়া উল্লেখ নেই। কিন্তু ফকীহ্গণ বলেন, তার থেকেও আদায়কারী 'উশর উসূল করবে (মুহীত)। হরবী থেকে 'উশর গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যে পরিমাণ আদায় করে, তাদের থেকেও সে পরিমাণ আদায় করা হবে। আর তারা যদি আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে কিছু না নেয়, তবে বিনিময় স্বরূপ আমরাও তাদের থেকে কিছু উসূল করবো না। তারা যদি আমাদের ব্যবসায়ীদের সমস্ত মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে আমরাও তাদের সমস্ত মালামাল নিয়ে যাব। তবে এর থেকে এই পরিমাণ মাল দিয়ে দিব যদ্দারা তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে। হরবী লোকদের মুকাতাব গোলাম এবং তাদের বালকদের নিকট থেকে কোন কিছু আদায় করা হবে না। অবশ্য তারা আমাদের বালক এবং আমাদের মুকাতাব গোলামদের থেকে 'উশর নিলে আমরাও তাদের থেকে উসূল করব (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৬. মাসআলা ঃ হরবীদের কোন কথা বিশ্বাস করা হবে না। তবে তারা যদি দাসীদেরকে উম্মে ওয়ালাদ এবং গোলামদেরকে নিজেদের সন্তান বলে দাবী করে, তবে তাদের কথা বিশ্বাস করা হবে। কেননা, বংশ ও উম্মে ওয়ালাদ হওয়া সম্বন্ধে তাদের স্বীকারোক্তি সহীহ্। কাজেই উক্ত অবস্থাতে গোলাম বা দাসী মাল হিসাবে গণ্য হবে না। যদি তারা তাদেরকে মুদাববার বলে দাবী করে, তবে তাদের কথা বিশ্বাস করা হবে না। কেননা, হরবী কর্তৃক কাউকে মুদাববার বানানো সহীহ্ নয়। কোন হরবী ব্যক্তি যদি পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে আদায়কারীর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তাহলে তার থেকে কিছু আদায় করা হবে না। কিন্তু তারা যদি আমাদের বণিকদের এ পরিমাণ ,মাল থেকে কিছু গ্রহণ করে, তবে আমরাও গ্রহণ করব। তারা আমাদের মুসলমানদের থেকে 'উশর গ্রহণ করে কিনা, তা যদি জানা না থাকে অথবা জানা আছে, কিন্তু কত গ্রহণ করে এর পরিমাণ জানা নেই, তবে এই অবস্থায়ও আমরা তাদের থেকে 'উশর গ্রহণ করব (আস্ সিরা-জুল ওয়াহ্হাজ)। হরবী যদি 'উশর আদায়কারীর নিকট দিয়ে যায় এবং আদায়কারী তার নিকট থেকে 'উশর আদায় করে রাখে, তাহলে ঐ বছর সে পুনরায় ঐ স্থানে আসলে তার থেকে পুনরায় 'উশর গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তার থেকে 'উশর গ্রহণ করা

হবে। অবশ্য যদি 'উশর প্রদানের পর পরই সে নিজ দেশ দারুল হরবে চলে যায় এবং আবার ঐ দিনই দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তবে তার নিকট থেকে পুনরায় 'উশর গ্রহণ করা হবে (হিদায়া)। যদি হরবী 'আশিরের নিকট দিয়ে যায় এবং 'আশির তা না জানে, এমনকি সে বের হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তবে অতীত বছরের জন্য তার থেকে 'উশর গ্রহণ করা হবে না (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ যদি মুসলিম ও যিম্মী 'আশিরের নিকট দিয়ে যায় কিন্তু 'আশির তাদের সম্বন্ধে না জানে কিন্তু পরবর্তী বছর জানতে পারল, তবে তাদের থেকে 'উশর আদায় করা হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী, আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কেউ চল্লিশটি বকরী নিয়ে 'আশিরের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং এগুলোর উপর দুই বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এর প্রথম বছরের যাকাত গ্রহণ করবে, দ্বিতীয় বছরের নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বনূ তাগলিবের লোকদের থেকে সম্পদের বিশ ভাগের এক ভাগ উসূল করা হবে। আর তাদের থেকে গৃহীত টাকা-পয়সা জিয্য়ার বিনিময় হিসাবে গণ্য হবে। যদি বনূ তাগলিবের কোন বালক বা মহিলা মালামাল সহকারে 'আশিরের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হয়, তবে বালকের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে পুরুষের উপর যা ওয়াজিব হয়, মহিলার উপরও তা ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি খারিজী সম্প্রদায়ের 'আশিরের নিকট দিয়ে যায় এবং তারা তার থেকে 'উশর আদায় করে নেয়, এরপর সে যদি ন্যায়পরায়ণ 'আশিরের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তবে সে তার থেকে দ্বিতীয় বার 'উশর আদায় করবে। অবশ্য খারিজীগণ যদি কোন শহরের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় এবং জোরপূর্বক তারা তথাকার লোকদের সায়িমা পশুর যাকাত নিয়ে যায়, তবে তাদের উপর দ্বিতীয় বার এ পশুর যাকাত ওয়াজিব হবে না (কাফী)। কেউ যদি 'আশিরের নিকট এমন দ্রব্য নিয়ে যায় যা দ্রুত খারাপ বা নষ্ট হয়ে যায়, যেমন ফল, কাঁচা খেজুর, শাক-সবজিবা দুধ এবং যার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এর থেকে 'উশর নেওয়া হবে না। সাহিবায়নের মতে 'উশর উসূল করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ, মুহীত ঃ সুরুখ্সী, কাফী)। যদি কেউ নিসাব থেকে কম সায়িমা পশু নিয়ে 'আশিরের নিকট যায় এবং তার বাড়ীতে নিসাব পূর্ণ হয় পরিমাণ পশু থাকে, তবে 'আশির তার থেকে ওয়াজিব পরিমাণ আদায় করে নিবে। কেননা, সমস্ত মাল তার অধীনেই রয়েছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ খনিজ পদার্থের যাকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ খনিজ পদার্থ তিন প্রকার। (১) منطبع بالنار অর্থাৎ এমন দ্রব্য যা আগুনের তাপে গলে যায়। (২) مائع তরল পদার্থ। (৩) ماليس بمائع ولامنطبع এমন দ্রব্য যা আগুনের তাপে গলে না এবং যা প্রবাহিতও হয় না।

যে সব খনিজ দ্রব্য আগুনের তাপে গলে যায়, যেমন সোনা, রূপা, লোহা, রাং, তামা, কাঁসা ইত্যাদিতে খুমুস তথা পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব (তাহযীব)। যে কেউ তা যমীন থেকে বের করুক, সে আযাদ পুরুষ হোক কিংবা ক্রীতদাস, যিম্মী হোক কিংবা বালক বা মহিলা হোক। এক-পঞ্চমাংশ আদায় করার পর যা বাকী থাকবে, তা উত্তোলনকারী পাবে। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কোন হরবী ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করে, তবে সে কিছুই পাবে না। অবশ্য রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে যদি তা উত্তোলন করে, তাহলে শর্ত মুতাবিক পাবে। চাই তা উশরী ভূমি থেকে উত্তোলন করা হোক বা খারাজী ভূমি থেকে উত্তোলন করা হোক (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি দুই ব্যক্তি খনিজদ্রব্য অনুসন্ধান করে এবং এক জনে তা পায়, তবে যে পেল সেই এর দাবীদার হবে। যদি কোন ব্যক্তি খনি খনন করার জন্য যমীন ইজারা নেয়, তবে সে যা পাবে তা তারই হক (আলবাহরুর রায়িক)।

২. মাসআলা ঃ প্রবাহিত খনিজদ্রব্য যেমন আলকাতরা, তৈল জাতীয় পদার্থ, লবণ এবং এমন খনিজদ্রব্য যা আগুনের তাপে গলে না, প্রবাহিতও হয় না, যেমন চুনা, জাওহার, ইয়াকূত ইত্যাদিতে কোন কিছু ওয়াজিব নয় (তাহযীব)। পারদের মধ্যে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ওয়াজিব (মুহীত ঃ সুরুখসী)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি কারো ঘরে বা যমীনে খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়, তবে তাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সাহিবায়নের মতে এতেও খুমুস ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। যদি কেউ দারুল ইসলামে মালিকানাহীন ভূমিতে খনিজদ্রব্য পায়, যেমন মাঠে-ময়দানে পেল এবং এতে যদি ইসলামের কোন নিদর্শন থাকে, যেমন এতে কালেমায়ে শাহাদাত লেখা আছে ইত্যাদি। এ অবস্থায় এ মাল পড়ে পাওয়া মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি এতে কুফরীর নিদর্শন থাকে, যেমন দিরহামে ক্রুশ অথবা মূর্তি অংকিত আছে, তবে এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করতে হবে এবং বাকী চার-পঞ্চমাংশের মালিক যে পেয়েছে সে হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি কোন মুদ্রার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, যেমন তাতে কোন নিদর্শন নেই, তবে যাহিরী মাযহাব অনুসারে একে কাফিরদের মাল বলে সাব্যস্ত করা হবে (কাফী)। প্রাপক ছোট হোক কিংবা বড়, আযাদ হোক কিংবা গোলাম, মুসলমান হোক কিংবা যিম্মী সকলের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য প্রাপক যদি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কোন হরবী হয়, তবে তাকে কিছুই প্রদান করা

হবে না। কিন্তু হরবী যদি রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুমে তা উত্তোলন করে এবং শর্ত করে কথা চুকিয়ে এরূপ কাজ করে, তবে তার জন্য ঐ শর্ত পুরা করা আবশ্যক (মুহীত)। কেউ যদি এরূপ খনিজদ্রব্য মালিকানাধীন ভূমিতে পায়, তবে ইমামগণ সকলেই একমত যে, এতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। অবশ্য বাকী চার-পঞ্চমাংশের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যমীনের মূল মালিক এর প্রাপক হবে (শরহুত তাহাবী)।

৩. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে 'ইতাবিয়্যা'তে উল্লেখ রয়েছে, যমীনের মালিক যদি যিম্মী হয়, তাহলে সে কিছুই পাবেনা। যমীনের প্রথম মালিক অথবা তার ওয়ারিছগণের পরিচয় না পাওয়া গেলে জানা মতে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম যে এর মালিক হয়েছিল, সে এর প্রাপক হবে (তাতারখানিয়া)। অথবা তার ওয়ারিছগণ এর মালিক হবে। (আল-বাহরুর রায়িক ঃ বাদাই-এর সূত্রে, শরহুত তাহাবী) মালিক কিংবা মালিকের ওয়ারিছ না পাওয়া গেলে বায়তুল মালে তা জমা দিয়ে দিতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। দারুল হরবের মালিকানাহীন ভূমিতে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ركاز (রিকায) বা معدن (মা'দিন) অর্থাৎ খনিজদ্রব্য পায়, তবে প্রাপক এর মালিক হবে এবং এতে খুমুস ওয়াজিব হবে না। যদি এমন ভূমিতে পায়, যার কোন মালিক আছে এবং সে যদি আমান ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে থাকে, তবে এসব মাল মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। যদি ফেরত না দিয়ে তা দারুল ইসলামে নিয়ে চলে আসে, তবে সেই এই মালের মালিক হয়ে যাবে। তবে এ মাল তার জন্য হালাল হবে না। কিন্তু বিক্রি করলে বিক্রি জাইয হবে। কিন্তু ক্রেতার জন্য খাওয়া হালাল হবে না (শরহুত তাহাবী)। এর জন্য উত্তম তরীকা হল, সাদাকা করে দেওয়া (আল্-বাহরুর রায়িক)। যদি উক্ত ব্যক্তি আমান ও নিরাপত্তা ছাড়াই দারুল হরবে প্রবেশ করে, তবে তা প্রাপকের হক। এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে না। (মুহীত ঃ সুরুখসী। প্রোথিত সম্পদের মধ্যে হাতিয়ার, বাড়ী-ঘরের দ্রব্যাদি, কাপড় বা আংটি ইত্যাদি পাওয়া গেলে তা কানয (খনিজদ্রব্য)। এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং এগুলো থেকেও এক- পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে (তাবয়ীন)। যে সব জিনিস সমুদ্র থেকে উত্তোলন করা হয়, যেমন আম্বর, মোতি, মাছ ইত্যাদিতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, খুলাসা)। সমুদ্র থেকে সোনা-রূপা পাওয়া গেলে তাতেও কিছু ওয়াজিব হবে না (তাহযীব)। পাহাড়-পর্বতে ফীরুযা পাথর পাওয়া গেলে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে (হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শস্য এবং ফল–ফলাদির যাকাত

১. মাসআলা ঃ শস্য এবং ফল–ফলাদির যাকাত দেওয়া ফরয। এর ফরয হওয়ার কারণ ভূমির উৎপন্ন ফসল দ্বারা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হওয়া যায়। খারাজের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, খারাজ ফরয হওয়ার কারণ হল, যমীন এমন হওয়া যার উৎপাদিত ফসল দ্বারা حقيقة বা تقديرا অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কিংবা অভ্যন্তরীণ ভাবে উপকৃত হওয়া যায় এবং মালিক এ ব্যাপারে সক্ষম। যদি মালিক যমীন থেকে উপকার লাভ করতে সক্ষম হয় কিন্তু সে এতে চাষাবাদ না করে, তবে এ ক্ষেত্রে খারাজ ওয়াজিব হবে। কিন্তু উশর ওয়াজিব হবে না। জমি এবং যমীনের ফসল দুর্যোগ আক্রান্ত হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. মাসআলা ঃ ফসল এবং ফল–ফলাদির যাকাতের রুকন হল, তামলীক অর্থাৎ কাউকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া। এর যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ঠিক তদ্রূপ যা যাকাতের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। উপরোক্ত ফসল ও ফল–ফলাদির যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দুই ধরনের। এতদুভয় শর্তের মধ্যে প্রথম শর্ত হল আহলিয়াত اهلية অর্থাৎ যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হওয়া। যেমন মুসলমান হওয়া। এটা উশর ওয়াজিব হওয়ার প্রথম শর্ত। এ কারণেই ইমামগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, উশর কেবল মুসলমানের উপরই ওয়াজিব। মুসলমান ছাড়া অন্য কারো উপর 'উশর ওয়াজিব হয় না। 'উশর ফরয হওয়ার ইল্ম থাকাও এর ফরযিয়াতের অন্যতম শর্ত। অবশ্য আকল (জ্ঞান) ও বালিগ হওয়া উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কাজেই বালক এবং পাগলের ভূমিতে 'উশর ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে 'উশর হচ্ছে যমীনের মূল্য। এ কারণেই রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জাইয আছে জোরপূর্বক 'উশর উসূল করা। এ অবস্থায় ভূমির মালিক দায়িত্বমুক্ত হলেও সে কোন সওয়াব পাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির উপর 'উশর ওয়াজিব, সে যদি মারা যায় এবং খাদ্যশস্য যদি মওজুদ থাকে, তবে এ শস্য থেকে 'উশর উসূল করা হবে। যাকাতের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। এমনিভাবে 'উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ভূমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। কেননা, ওয়াকফের ভূমিতেও 'উশর ওয়াজিব হয়। ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম এবং মুকাতাব গোলামের যমীনেও 'উশর ওয়াজিব হয়।

২. মাসআলা ঃ 'উশর ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে মহল্লিয়াত محلية অর্থাৎ ভূমি 'উশর ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ যমীন 'উশরী হওয়া। সুতরাং খারাজী ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলে 'উশর ওয়াজিব নয়। 'উশর ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি শর্ত হল, যমীন উৎপাদনশীল হওয়া এবং এমন ফসল উৎপন্ন হওয়া যদ্দারা ভূমির প্রবৃদ্ধি প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে থাকে (আল্ বাহরুর রায়িক)। কাজেই কাঠ, ঘাস, বাঁশ, ঝাউগাছ এবং খেজুর গাছের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে না। কেননা, এগুলোর দ্বারা যমীনের মূল্য প্রবৃদ্ধি লাভ করে না। বরং এতে ভূমি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য যদি বরই গাছ, ঘাস, বাঁশ, খেজুরের ডাল ইত্যাদি কোন ভূমিতে থাকে এবং তা কেটে বেচা–কেনা করা যায় তাহলে এতে 'উশর ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে যমীন থেকে উৎপন্ন গম, যব, ছোলা, চাউল, রকমারি শস্য, শাক–সবজি, ফুল, খুরমা, খেজুর, আখ, তরমুজ, কাঁকুড়, খিরা, বেগুন, কুসুম এবং এ জাতীয় ফসল বা ফল–ফলাদি যা সঞ্চয় করে রাখা যায় বা যায় না, কম হোক বা বেশী হোক, এতে 'উশর ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। চাই বৃষ্টির পানি তাতে সিঞ্চন করা হোক কিংবা খালের পানি। অনুরূপ ভাবে তা এক ওয়াসাক (وسق) অর্থাৎ ষাট সা[1] পরিমাণ হোক বা না হোক (শরহুত তাহাবী)। কাত্তান কাপড় এবং এর বীজে 'উশর ওয়াজিব হবে। কেননা, এসব বস্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই মানুষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে থাকে (শরহুন মাজমা)। বাদাম, আখরোট, যিরা এবং ধনিয়াতেও 'উশর ওয়াজিব হবে (মুযমারাত)। 'উশরী ভূমির মধুর উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি কারো কাঁটাদার বৃক্ষে মান্ন জমে, তবে তাতে 'উশর ওয়াজিব হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। আর মালিকানাহীন ভূমির কোন বৃক্ষে যেমন পাহাড়ী গাছ ইত্যাদির ফল–ফলাদি যদি সংগ্রহ করা হয়, তাহলে এতে 'উশর ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ যে সব জিনিস যমীনের (تابع) অধীন যেমন খেজুর গাছ বা অন্যান্য বৃক্ষ, এমনিভাবে গাছ থেকে যা বের হয় যেমন আঠাল বস্তু অথবা তুলা এগুলোতে 'উশর ওয়াজিব নয়। কেননা, এ সবের দ্বারা উপকৃত হওয়া মুখ্য নয় (আল্–বাহরুর রায়িক)। যে সব বস্তু বপন বা ঔষধের কাজে ব্যবহৃত হয় তরমুজের বীজ, কালি জিরা ইত্যাদি, এতে 'উশর ওয়াজিব নয় (মযুমারাত)। বাং, দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ, তুলাগাছ, বেগুন, কলা এবং আনজীর ইত্যাদিতে 'উশর ওয়াজিব নয় (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কারো বাড়ীতে যদি ফলবান বৃক্ষ থাকে, তবে তাতে 'উশর ওয়াজিব হবে না (শরহুল মাজমা ইবনুল মালিক)। যে সব যমীনে চরখা বা সেচযন্ত্র দিয়ে পানি সিঞ্চন করা হয়, তাতে 'উশরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যে যমীন নহরের পানি দিয়ে এবং কখনো বালতি দিয়ে পানি সিঞ্চন করা হয়, সে যমীনের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। যদি উভয় প্রক্রিয়া সমান হয়, তবে তাতে অর্ধ 'উশর ওয়াজিব হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে ফসল বের হয়ে ফল পূর্ণরূপে প্রকাশমান হওয়ার পর হতে 'উশর ওয়াজিব হওয়ার সময় আরম্ভ হয়। (আল্ বাহরুর রায়িক)। ফসল বপন করার আগে 'উশর আদায় করলে তা জাইয হবে না। ফসল বপন করা এবং তা উদগত হওয়ার পর 'উশর আদায় করলে তা জাইয হবে। ফসল বপন করার পর উদগত হওয়ার আগে 'উশর আদায় করলে বিশুদ্ধতম মতে তা জাইয হবে না। যদি ফল–ফলাদির 'উশর অগ্রে আদায় করে, তাহলে ফল বের হওয়ার পর আদায় করলে জাইয হবে। আর বের হওয়ার আগে আদায় করলে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে জাইয হবে না (শরহুত তাহাবী)। উৎপন্ন ফসল মালিকের হস্তক্ষেপ ছাড়া নষ্ট হয়ে গেলে তা থেকে 'উশর রহিত হয়ে যাবে। কিছু নষ্ট হলে যে পরিমাণ নষ্ট হয়েছে ঐ

১. সাড়ে তিন সেরে এক সা' – অনুবাদক

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিমাণের 'উশর রহিত হয়ে যাবে। মালিক ব্যতীত অন্য কেউ ফসল নষ্ট করে ফেললে মালিক তার নিকট থেকে যমান (জরিমানা) নিয়ে 'উশর আদায় করবে। আর যদি মালিক নিজেই তা নষ্ট করে ফেলে তাহলে সে নিজেই এর যামিন হবে এবং এটা তার উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। এই ঋণ মালিকের মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং ওসিয়ত ছাড়া মালিকের মারা যাওয়ার কারণে ঐ ঋণ রহিত হয়ে যাবে। যদি সে নিজে তা নষ্ট করে থাকে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

৫. মাসআলা ঃ বনূ তাগলিবের কোন ব্যক্তির যদি 'উশরী যমীন থাকে, তবে তার উপর দ্বিগুণ 'উশর ওয়াজিব হবে। যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি তাগলিবীদের নিকট থেকে যমীন খরীদ করে, তবে সে যমীন ঐ অবস্থায়ই থাকবে। অনুরূপভাবে তাগলিবীদের নিকট থেকে কোন মুসলমান যমীন খরীদ করলে তাও ঐ হুকুমে বাকী থাকবে। এমনিভাবে তাগলিবী মুসলমান হয়ে গেলেও এই হুকুম হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। চাই এই দ্বিগুণ 'উশর ওয়াজিব হওয়া মূলগত আসল হোক বা পরবর্তীতে উদ্ভাবিত হোক। কোন মুসলমানের যমীন সে যদি তাগলিবী ছাড়া অন্য কোন যিম্মী ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে এবং তা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ব্যক্তির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। পরবর্তীতে এ যমীন যদি কোন মুসলমান শুফ'আর ভিত্তিতে নিয়ে নেয় অথবা বেচা-কেনা ফাসিদ হয়ে যাওয়ার কারণে তা যদি পুনরায় মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়, তবে ঐ জমি পূর্ববৎ 'উশরী যমীনে পরিণত হয়ে যাবে। তাগলিবী পুরুষের যমীনে যা ওয়াজিব হয়, তাগলিবী বালক এবং মহিলার যমীনেও তা ওয়াজিব হবে। অগ্নিপূজকের যমীনের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলমান তার বাড়ীকে বাগানে পরিণত করে, তবে এর কর কি হবে এ বিষয়টি এর পানির উপর নির্ভরশীল। যদি 'উশরী পানি দ্বারা তা আবাদ করা হয়, তবে এ বাগান উশরী বাগান হিসাবে গণ্য হবে। আর খারাজী পানি দ্বারা তা আবাদ করা হলে এ বাগান খারাজী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু কোন যিম্মী ব্যক্তি যদি তার বাড়ীকে বাগানে পরিণত করে, তাতে পানি যেভাবেই দেওয়া হোক খারাজ ওয়াজিব হবে। আর তার ঘরের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)।কবরস্তানের হুকুমও অনুরূপই (আল্-বাহ্‌রুর রায়িক)। যদি মুসলমান বা যিম্মী ব্যক্তি একবার 'উশরী পানি, আরেক বার খারাজী পানি যমীনে সিঞ্চন করে, তবে মুসলমান থেকে 'উশর উসূল করা হবে। আর যিম্মী থেকে খারাজ উসূল করা হবে (মি'রাজুদ দিরায়া)। 'উশরী পানি হল ঐ কূপের পানি, যা 'উশরী ভূমিতে খনন করা হয়েছে। অথবা এ ঝর্ণার পানি, যা 'উশর ভূমিতে প্রকাশমান হয়েছে। অনুরূপভাবে বৃষ্টির পানি এবং বড় নদীর পানিও 'উশরী পানি হিসাবে গণ্য (মুহীত)। আর আজমী (অনারব) লোকদের খননকৃত নহরের পানি এবং খারাজী যমীনে খননকৃত কূপের পানি খারাজী পানি হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সায়হুন, দজলা ও ফুরাতের পানি খারাজী পানি (কাফী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি 'উশরী যমীন ইজারা দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইজারাদাতার উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ভাড়াটিয়ার উপর 'উশর ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। যদি উৎপন্ন ফসল কাটার আগেই নষ্ট হয়ে

যায়, তবে ইজারাদাতার উপর 'উশর ওয়াজিব হবে না। আর যদি কাটার পর নষ্ট হয়, তবে তার থেকে 'উশর রহিত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যদি কাটার আগে বা পরে ফসল নষ্ট হয়, তবে উভয় অবস্থাতেই 'উশর রহিত হয়ে যাবে (শরহুত তাহাবী)। কোন মুসলমান থেকে যমীন আরিয়াত[১] নিয়ে তা চাষ করলে আরিয়াত গ্রহণকারীর উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। আর কাফিরের নিকট থেকে যমীন আরিয়াত নিলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আরিয়াতদাতার উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। আর সাহিবায়নের মতে কাফিরের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এক 'উশর ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দুই 'উশর ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৮. মাসআলা ঃ বর্গাচাষের যমীনে সাহিবায়নের মতে উভয় শরীকের উপর তাদের অংশানুযায়ী 'উশর ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যমীনের মালিকের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। তবে মালিকের অংশে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। আর বর্গাচাষীর অংশের বিষয়টি মালিকের উপর ঋণ হিসাবে পরিগণিত হবে (আল্-বাহ্‌রুর রায়িক)। যদি উৎপন্ন শস্য নষ্ট হয়ে যায়, তবে সাহিবায়নের মতে চাষী এবং মালিক উভয়ের উপর থেকে 'উশর রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ফসল কাটার আগে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। ফসল কাটার পর চাষীর অংশের 'উশর তার থেকে রহিত হবে না। কিন্তু তার নিজের অংশের উশর রহিত হয়ে যাবে। ফসল পাকার পর কাটার আগে কোন ব্যক্তি যদি তা নষ্ট করে ফেলে অথবা চুরি করে নিয়ে যায়, তবে এতে 'উশর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু নষ্টকারী ব্যক্তি থেকে জরিমানা আদায় করার পর এ থেকে 'উশর আদায় করা যমীনের মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। আর সাহিবায়নের মতে উভয়ের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ জোরপূর্বক 'উশরী ভূমি চাষ করলে তাতে ফসলের কোন ক্ষতি না হলে যমীনের মালিকের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে না। আর ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকলে যমীনের মালিকের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। যদি 'উশরী ভূমির মালিক পাকা ফসলসহ তা বিক্রি করে অথবা শুধু পাকা ফসল বিক্রি করে, তবে বিক্রয়কারীর উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। ক্রেতার উপর নয়। যদি ভূমির মালিক ফসল পাকার আগেই ফসল বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা যদি তখনই এ ফসল কেটে নিয়ে যায় তাহলে বিক্রেতার উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। আর যদি পাকা পর্যন্ত সে ফসল গাছেই রেখে দেয় তবে 'উশর ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে (শরহুত তাহাবী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কেউ 'উশরী শস্য বিক্রি করে, তবে সাদাকা আদায়কারী ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকে 'উশর উসূল করবে যদিও ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর সে ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকেও তা উসূল করতে পারবে। যদি 'উশরের ফসল যথাযথ মূল্যের চেয়েও বেশী দামে বিক্রি করে এবং ক্রেতা তা এখনো নিজ হাতে না নেয়, তবে আদায়কারী ফসল থেকেও 'উশর নিতে পারবে। অথবা বিক্রীত শস্যের মূল্য থেকেও 'উশর উসূল করতে পারবে। যদি বিক্রেতা ধোকা খেয়ে এত কম দামে তা বিক্রি করে যে এমন

১. বিনিময় ছাড়া ব্যবহারের জন্য চেয়ে নেয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাবে কেউ ধোঁকা খায় না। তাহলে আদায়কারী কেবল ফসলের 'উশর গ্রহণ করতে পারবে। আর সে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে শস্য নষ্ট করে দেয়, তবে বিক্রেতার নিকট থেকে অনুরূপ শস্য হতে 'উশর উসূল করে নিবে। কিন্তু সে যদি এর মূল্য থেকে 'উশর পরিমাণ টাকা-পয়সা আদায় করে দেয়, তাহলে শস্য থেকে 'উশর আদায় করতে হবে না। আর ক্রেতা যদি ফসল নষ্ট করে দেয়, তাহলে 'উশর আদায়কারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে বিক্রেতার নিকট থেকে এর পরিমাণ উসূল করবে অথবা ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকে অনুরূপ পরিমাণ 'উশর উসূল করবে। কেননা, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ নষ্ট করেছে।

১১. মাসআলা ঃ যদি আঙ্গুর বিক্রি করে, তবে এর মূল্য থেকে 'উশর উসূল করবে। অনুরূপভাবে আঙ্গুরের রস বিক্রি করলে এর মূল্যের উপর 'উশর ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। শ্রমিকের মজুরী, গরু-বাছুরের দ্বারা হাল চালানোর ব্যয়, নহর খনন করার খরচা, পাহারাদার ইত্যাদির খরচা ইত্যাদি হিসাব করা হবে না। যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে এর 'উশর বা 'উশরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে (আল্-বাহরুর রায়িক)। 'উশর আদায় না করা পর্যন্ত এর সংশ্লিষ্ট শস্য থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না (যহীরিয়্যা)। 'উশরের শস্য পৃথক করার পর বাকী শস্য খাওয়া জাইয হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যে পরিমাণ ফল-ফলাদি ভক্ষণ করবে অথবা অন্য কাউকে আহার করাবে এর 'উশর পরিমাণের যামানত দিতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ব্যয়ের খাত

১. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ ব্যয় করার বিভিন্ন খাত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম খাত হচ্ছে ফকীর। ফকীর এমন ব্যক্তি যার কিছু মাল আছে, তবে তা নিসাব পরিমাণ থেকে কম অথবা নিসাব পরিমাণ বটে কিন্তু বর্ধিষ্ণু মাল নয় অথবা প্রয়োজন অতিরিক্তও নয়। সুতরাং কেউ যদি একাধিক নিসাবের মালিক হয় কিন্তু তা বর্ধিষ্ণু না হয় অর্থাৎ প্রয়োজন পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে এ পরিমাণ মালের মালিক হওয়া ব্যক্তিকে ফকীর হওয়ার সীমা থেকে বের করবে না। বরং সে ফকীর হিসাবেই গণ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর)। মূর্খ ফকীরকে সাদাকা করা অপেক্ষা গরীব আলিমকে সাদাকা করা উত্তম (যাহিদী)।

২. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় খাত হল মিসকীন। মিসকীন এমন ব্যক্তি যার কিছুই নেই এবং যে খাওয়া-পরার জন্য অন্যের নিকট যাচঞা করতে বাধ্য। আর তার জন্য হাত পাতা বৈধও বটে। কিন্তু ফকীরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। ফকীরের জন্য সওয়াল করা জাইয নেই। কেননা, যার পরিধানে কাপড় আছে তার জন্য এক দিনের খোরাক থাকা অবস্থায় অন্যের নিকট হাত পাতা জাইয নেই (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের **তৃতীয় খাত হচ্ছে আমিল।** অর্থাৎ সাদাকাত ও 'উশর উসূল করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিকে আমিল বলা হয় (কাফী)। "আমিলকে" এ পরিমাণ সাদাকা দিবে যেন তা তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের জন্য আসা-যাওয়ার সময় পর্যন্ত মধ্যমভাবে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তবে তাদের যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ দিতে গেলে যদি যাকাতের পুরা মালই শেষ হয়ে যায়, তাহলে অর্ধেকের বেশী দিবে না (আল্-বাহরুর রায়িক)। কোন ব্যক্তি নিজের যাকাত নিজে বহন করে রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিলে এতে আমিলের কোন হক থাকবে না (ইয়ানাবি' -মুহীত ঃ সুরুখসী)। আমিল যদি হাশিমী বংশের লোক হয়, তবে তার জন্য যাকাত খাওয়া জাইয হবে না। এতে উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনদেরকে (যাকাতের) ময়লা ভক্ষণ করা থেকে রক্ষা করা। অবশ্য আমিল বিত্তশালী হলেও তার জন্য এ মাল ভক্ষণ করা বৈধ (তাবয়ীন)। হাশিমী 'আমিল যদি যাকাত উসূলের জন্য কাজ করে এবং তাকে অন্য ফাণ্ড থেকে বেতন দেওয়া হয়, তবে এতে কোন দোষ নেই (খুলাসা)। যদি যাকাতের মাল আমিল ব্যক্তির হাতে নষ্ট হয়ে যায় অথবা মাল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, তবে 'আমিলের হক বাতিল হয়ে যাবে। তবে যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে (আসসিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যাকাত উসূলকারী ব্যক্তির হক ওয়াজিব (সাব্যস্ত) হওয়ায় পূর্বে সে যদি তার মজুরী নিয়ে নেয় তবে তা জাইয হবে। তবে না নেওয়াই উত্তম (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ ব্যয় করার চতুর্থ খাত হচ্ছে গোলাম আযাদ করে দেওয়া। অর্থাৎ মুকাতাব গোলাম আযাদ করার কাজে সহায়তা করা (মুহীত ঃ সুরুখসী)। মুকাতাব গোলাম যদি ধনী হয়, তবে তাকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা জাইয আছে। এ সম্পর্কে জানা থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য নেই (খুলাসা, মুহীত ঃ সুরুখসী)। হাশিমী বংশীয় কোন ব্যক্তির মুকাতাব গোলামকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয নেই। কেননা, তাকে যাকাত দেওয়া মালিককে যাকাত দেওয়ার মতই। কাজেই তাকে যাকাত দেওয়া জাইয নয়। (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৫. মাসআলা ঃ পঞ্চম খাত হল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা। ঋণগ্রস্ত বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে এমন নিসাবের মালিক নয় যা ঋণের অতিরিক্ত অথবা অন্য লোকের নিকট তার মাল আছে, কিন্তু সে তা আদায় করতে পারছে না (তাবয়ীন)। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করা সাধারণ ফকীর ব্যক্তিকে দান করা থেকে উত্তম (মুযমারাত)।

৬. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ ব্যয় করার ষষ্ঠ খাত হচ্ছে ফী সাবীলিল্লাহ খাতে যাকাত প্রদান করা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা দরিদ্রতার কারণে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যারা দরিদ্রতার কারণে হজ্জে যেতে পারছে না, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে (তাবয়ীন)। এতদুভয় অভিমতের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ (মুযমারাত)।

৭. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সপ্তম খাত হচ্ছে মুসাফির লোকদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা। মুসাফির মানে এমন পরদেশী প্রবাসী ব্যক্তি যে নিজের ধন-সম্পদ থেকে দূরে (বাদাই')। এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন পরিমাণ যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা জাইয। প্রয়োজন অতিরিক্ত গ্রহণ করা জাইয নেই। ঐ ব্যক্তিও মুসাফিরের হুকুমের মধ্যে শামিল, যে নিজ শহরে থেকে মাল থেকে দূরে। কেননা, যাকাত গ্রহণ করা জাইয হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের বিষয়টিই ধর্তব্য হয়ে থাকে[১]। যদি মুসাফির ব্যক্তির নিজস্ব মাল হাতে আসার পর যাকাতের কিছু অর্থ তার নিকট অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তা সাদাকা করে দেওয়া আবশ্যক নয়। যেমন ফকীর-মুখাপেক্ষী ব্যক্তি অনপেক্ষ হওয়ার পর তাকে গৃহীত মাল ফেরত দিতে হয় না (তাবয়ীন)। মুসাফির ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ করার তুলনায় ঋণ গ্রহণ করা উত্তম (যহীরিয়া)।

৮. মাসআলা ঃ উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার খাত। তবে মালিকের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে তাদের প্রত্যেকে কিছু কিছু করে যাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে এক খাতেই যাকাতের সমস্ত অর্থ দিয়ে দিতে পারবে (হিদায়া)। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তিকেও যাকাতের সমস্ত অর্থ দিয়ে দেওয়া জাইয আছে (ফাতহুল কাদীর)। এক ব্যক্তিকে দেওয়া উত্তম। যদি প্রদত্ত মাল নিসাব পরিমাণ না হয় (যাহিদী)। এক ব্যক্তিকে দুইশত দিরহাম বা এর চেয়ে বেশী দিরহাম প্রদান করা মাকরূহ্। তবে দিলে জাইয হবে (হিদায়া)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ফকীর ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত না হয়। যদি

১. কাজেই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তার জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জাইয আছে। -অনুবাদক

ঋণগ্রস্ত হয় এবং তাকে এই পরিমাণ প্রদান করা হয় যে, ঋণ পরিশোধের পর তার নিকট আর কিছুই বাকী থাকে না অথবা দুইশত দিরহামের কম বাকী থাকে, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তির বহু সন্তান-সন্তুতি থাকে, তবে তাকে এ পরিমাণ দেওয়া জাইয যে, যদি এ মাল তার সন্তানদের মধ্যে বন্টন করা হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকের ভাগে দুই শতের কম পৌছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। একদিনের খোরাকীর ব্যাপারে একজন ফকীরকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেওয়া মুস্তাহাব (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ যিম্মী লোকদেরকে প্রদান করা জাইয নেই। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। অবশ্য নফল সাদাকা যিম্মীদেরকে প্রদান করা জাইয। সাদাকাতুল ফিত্‌র, মানত এবং কাফ্‌ফারার ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয আছে। তবে আমাদের মতে মুসলমান ফকীরদেরকে প্রদান করা উত্তম (শরহুত তাহাবী)। আমানপ্রাপ্ত হরবীকে যাকাত এবং ওয়াজিব সাদাকা প্রদান করা জাইয নেই। এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে নফল সাদাকা দেওয়া জাইয (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ বানানো জাইয নেই। অনুরূপভাবে পুল ও সরাইখানা তৈরী করা, রাস্তা মেরামত করা, খাল খনন করা, হজ্জ ও জিহাদ করা এবং এমন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা, যার মধ্যে কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না জাইয নেই। যাকাতের অর্থ দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন দেওয়া জাইয নেই এবং এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করাও জাইয নেই (তাবয়ীন)। আযাদ করার জন্য যাকাতের মাল দ্বারা গোলাম খরীদ করা জাইয নেই।

১০. মাসআলা ঃ যাকাতের অর্থ নিজের আসল তথা পিতা-মাতা ও তদূর্ধ লোকদেরকে এবং নিজের সন্তান-সন্তুতি ও তদনিম্ন লোকদেরকে প্রদান করা জাইয নেই (কাফী)। অনুরূপভাবে যে পুত্রের নসব অস্বীকৃত, তাকে এবং যিনার মাধ্যমে জন্মলাভ করা সন্তানকেও প্রদান করা জাইয নেই (তামারতাশী)। নিজের স্ত্রীকেও যাকাত দেওয়া জাইয নেই। কেননা, স্ত্রী স্বভাবতই স্বামীর লাভালাভে শরীক থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীও স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না (হিদায়া)। নিজের গোলাম, মুকাতাব, মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদকে যাকাত দেওয়া জাইয নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী আংশিক আযাদকৃত গোলামকেও যাকাত দেওয়া জাইয নেই। যেমন এক ব্যক্তি একটি গোলামের মালিক ছিল। অতঃপর সে এর অনির্দিষ্ট কোন অংশ আযাদ করে দিল অথবা কোন গোলামের মালিকানায় দুই ব্যক্তি শরীক ছিল। অতঃপর একজন তার অংশ আযাদ করে দিল এবং অপর শরীক তার অংশের পাওনা আদায়ের জন্য ঐ গোলামের কামাইয়ের টাকা উসূল করে নিতে লাগল। এ অবস্থায় উক্ত গোলাম মুকাতাব গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অংশ আযাদ করেনি সে যদি আযাদকারী ব্যক্তি থেকে জরিমানা আদায় করে নেয় অথবা যাকাতদাতা যদি অপরিচিত কোন ব্যক্তি হয়, তবে এই গোলামকে যাকাত প্রদান করা জাইয হবে। কেননা, সে অন্যের মুকাতাব গোলামের অনুরূপ হয়ে গিয়েছে (তাবয়ীন)।

১১. মাসআলা ঃ দিরহাম, দীনার, সায়িমা পশু, ব্যবসার পণ্য অথবা অন্য কোন পণ্যের

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ যদি নিসাব পরিমাণের মালিক হয়, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা যদি এক বছর পর্যন্ত তার নিকট থাকে, তবে এ জাতীয় ব্যক্তিকেও যাকাত দেওয়া জাইয নেই (যাহিদী)। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল, নিসাব পরিমাণের এ মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলতে এখানে বাসস্থান, বাসস্থানের আসবাবপত্র, ব্যবহারের কাপড়, খাদিম, সওয়ারী এবং হাতিয়ার ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। কেননা, এটা তো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। যাকাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য শর্ত নয় (কাফী)। নিসাবের কম মালের মালিক ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জাইয আছে। যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনকারী হয় (যাহিদী)। ধনী লোকের গোলাম যদি মুকাতাব না হয়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয নেই (মি'রাজুদ দিরায়া)। ধনী লোকের না বালিগ ছেলেমেয়েকে যাকাত দেওয়া জাইয নেই (তাবয়ীন)। যদি সন্তান বালিগ হয় এবং গরীব হয়, তবে জাইয হবে। কোন বিত্তবান লোকের স্ত্রী যদি গরীব হয়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয আছে। এইভাবে যদি পিতা ধনী হয় এবং তার বালিগা কন্যা গরীব হয়, তবে তাকেও যাকাত দেওয়া জাইয আছে। কেননা, খরচা পরিমাণ টাকা-পয়সা দ্বারা সে বিত্তবান বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে পিতা ও স্বামী ধনী হওয়ার কারণেও কন্যাকে ধনী বলে গণ্য করা হবে না (কাফী)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন ধনী ব্যক্তির পিতা গরীব থাকে, তবে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জাইয হবে (শরহুত তাহাবী)। যার জন্য ভিক্ষা করা হালাল হয়, তাকে যাকাত দেওয়া জাইয যদি সে নিসাবের মালিক না হয়ে থাকে। যদি কারো নিকট দুইশত দিরহাম মূল্যের এমন কিতাব থাকে, যা তার সবক পড়ানোর জন্য, দীনের সংরক্ষণের জন্য অথবা সম্পাদনার কাজ করার জন্য আবশ্যক, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কারো নিকট কুরআন মজীদ এবং হাদীসের কিতাব থাকে, যা তার খুবই প্রয়োজন, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয। আর যদি প্রয়োজনীয় না হয় এবং এর মূল্য যদি দুইশত দিরহামের সমান হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয হবে না এবং যাকাত গ্রহণ করাও তার জন্য জাইয হবে না। যদি কারো কতগুলো দোকান থাকে অথবা এমন বাড়ী থাকে যার ভাড়া তিন হাজার দিরহাম, কিন্তু এর উৎপন্ন আয় দ্বারা তার এবং তার পরিবারের ব্যয় নির্বাহ যথেষ্ট হয় না, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাকেও যাকাত দেওয়া জাইয। যদি কারো যমীন থাকে, যার মূল্য তিন হাজার দিরহাম কিন্তু এর উৎপন্ন ফসল দ্বারা তার এবং তার পরিবারের ভরণ-পোষণ পুরা হয় না, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)-এর মতে তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জাইয হবে।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কারো বাড়ীর ভিতর বাগান থাকে এবং বাগানের মূল্য দুইশত দিরহামের সমপরিমাণ হয়, তবে ফকীহ্‌গণের মতে এ বাগানের মধ্যে বাড়ীর প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন বাবুর্চিখানা, গোসলখানা ইত্যাদি না থাকলে তাকে যাকাত দেওয়া জাইয নেই। কেননা, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার আসবাবপত্র এবং টাকা পয়সা আছে। যদি কারো অন্য কোন ব্যক্তির নিকট টাকা পাওনা থাকে এবং পরে তা পরিশোধ করা হবে বলে কথা থাকে, তাহলে ঋণদাতা ব্যক্তির

জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে প্রয়োজন দেখা দিলে আবশ্যক পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করা জাইয হবে। ঋণ যদি দীর্ঘ মেয়াদী না হয় এবং ঋণ গৃহীতা গরীব হয়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে ঋণদাতা ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জাইয আছে। কেননা, সে ইব্‌ন সাবীলের মত। আর ঋণগৃহীতা ব্যক্তি যদি ধনী হয় এবং ঋণের কথা স্বীকার করে, তবে ঋণদাতার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জাইয নেই। অনুরূপভাবে ঋণ গৃহীতা যদি ঋণের কথা অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে ঋণদাতা ব্যক্তির যদি ন্যায়বান সাক্ষী থাকে, তাহলে এ অবস্থায়ও তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জাইয নেই। আর যদি কোন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী না থাকে, তাহলে বিচারকের নিকট এর মুকাদ্দমা দায়ের না করা পর্যন্ত যাকাত গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করার পর সে তার হলফ দিবে। হলফ করার পর যাকাত গ্রহণ করা তার জন্য জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির থাকার ঘর থাকে, যদিও সে পূর্ণ ঘরে না থাকে, তবু তার জন্য সাদাকা গ্রহণ করা জাইয আছে। এটাই সহীহ্ মত (যাহিদী)। বনী হাশিমকে যাকাত দেওয়া জাইয নেই। তারা হলেন, হযরত 'আলী, হযরত 'আব্বাস, হযরত জা'ফর, হযরত আকীল এবং হারিছ ইবন 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ (হিদায়া)। এ ছাড়া বনী হাশিমের অন্যান্য লোক যেমন আবূ লাহাবের বংশধরদেরকে যাকাত দেওয়া জাইয। কেননা, তারা নবী করীম (সা)-কে কোনরূপ সাহায্য করেনি (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এই হুকুম ফরয যাকাত ও সাদাকাত সম্পর্কীয়। যেমন যাকাত, মানত, উশর ও কাফ্‌ফারা ইত্যাদি। অবশ্য তাদেরকে নফল সাদাকা দেওয়া জাইয আছে (কাফী)। অনুরূপভাবে তাদের গোলামকেও যাকাত দেওয়া জাইয নেই (আয়নী ঃ শরহুল কানয)। বনী হাশিমের গরীব লোকদেরকে রিকায ও মা'দিন অর্থাৎ খনিজদ্রব্য প্রদান করা জাইয আছে (আল্-জাওহারাতুন নায়্যারা)।

১৫. মাসআলা ঃ যাকাত প্রদানের জন্য নিয়োজিত উকীল ব্যক্তি যদি যাকাতের অর্থ নিজের সন্তানকে প্রদান করে চাই সে বড় হোক বা ছোট হোক অথবা নিজের স্ত্রীকে প্রদান করে এবং তারা যদি মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে জাইয হবে। উকীল নিজে কিছু রাখতে পারবে না (খুলাসা)। যদি কোন ব্যক্তির সাদাকা গ্রহণের উপযুক্ততার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা করার পর প্রবল ধারণা হয় যে, সে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত এবং তাকে যাকাত প্রদান করে কিংবা জিজ্ঞাসা করে যাকাত প্রদান করা হয় অথবা ফকীরদের মধ্যে দেখে কাউকে যাকাত প্রদান করা হয়- এ অবস্থায় পরে যদি একথা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত, তবে ইমামগণের সম্মিলিত রায় অনুসারে তাকে যাকাত দেওয়া সহীহ্ হবে। এমনিভাবে যদি তার অবস্থা প্রকাশিত না হয়, তবু যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পরে একথা প্রকাশ পায় যে, সে বিত্তশালী লোক, অথবা হাশিমী অথবা কাফির অথবা হাশিমীদের গোলাম কিংবা তার সন্তান বা তার পিতা-মাতা অথবা সে যাকাতদাতার স্ত্রী বা স্বামী, তবু ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, সে যাকাতদাতার গোলাম, বা মুদাব্বার বা উম্মে ওয়ালাদ কিংবা মুকাতাব ছিল, তবে যাকাত আদায়

pdf By Syed Mostofa Sakib

হবে না। বরং ইমামগণের সর্ববাদী রায় অনুসারে পুনরায় তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে সে যদি এমন গোলাম হয়, যার আংশিক আযাদ করা হয়েছে এবং বাকী অংশের ঋণ পরিশোধ করার জন্য সে প্রচেষ্টা করছে, তবে তার ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (শরহুত তাহাবী)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ কাউকে যাকাত প্রদান করে এবং তার এ কথা খেয়াল না থাকে যে, সে যাকাত পেতে পারে কিনা, তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যাকাত প্রদানের পর যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, এ লোক যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। কাউকে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে যদি দাতা সন্দিহান হয় এবং এ ব্যাপারে কোন তাহাররী তথা চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা চিন্তা-ভাবনা করে, কিন্তু সে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কিনা এ কথা তার নিকট প্রকাশ না হয় অথবা তার প্রবল ধারণা হয় যে, এই লোকটি যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা জাইয নয়। কিন্তু সে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত বলে, স্পষ্ট হলে তাকে যাকাত প্রদান করা জাইয হবে (তাবয়ীন)। এক শহরের যাকাতের টাকা অন্য শহরে দেওয়া মাকরূহ্। কিন্তু দাতার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অন্য শহরে থাকলে অথবা অন্য শহরের লোক এই শহরের লোক অপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া মাকরূহ্ হবে না। উক্ত কারণ ছাড়াও এক শহরের যাকাতের টাকা অন্য শহরে দিলে যাকাত আদায় হবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। যাকাত প্রদানের সময় হলে এবং বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর এক শহরের টাকা অন্য শহরে দেওয়া মাকরূহ্। কিন্তু এর আগে যদি এভাবে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে মাকরূহ্ হবে না।

১৭. মাসআলা ঃ যাকাত, ফিত্‌রা ও মানতের ক্ষেত্রে উত্তম হল, প্রথমে নিজের ভাই-বোনকে দেওয়া, তারপর তাদের সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া, তারপর চাচা-ফুফুদেরকে দেওয়া, তারপর তাদের সন্তানদেরকে দেওয়া, তারপর মামা-খালাদেরকে দেওয়া, তারপর তাদের সন্তানদেরকে দেওয়া, তারপর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেওয়া, তারপর প্রতিবেশীকে দেওয়া, তারপর সমকারবারী লোকদেরকে দেওয়া, তারপর নিজ শহর ও গ্রামের লোকদেরকে দেওয়া (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যাকাতের মাল যেস্থানে থাকবে ঐ স্থানটিই হিসাবে ধর্তব্য হবে। সুতরাং মাল এক শহরে কিন্তু মালিক অন্য শহরে, তবে মাল যে শহরে ঐ শহরের লোকদের মধ্যেই তা বন্টন করা হবে। আর সাদাকাতুল ফিত্‌রের ক্ষেত্রে দাতার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ দাতা যে স্থানে থাকবে ঐ স্থানেই সাদাকা দিতে হবে। সহীহ্ মতে তার শিশু সন্তান এবং গোলামের অবস্থানের স্থানটি বিবেচিত হবে না (তাবয়ীন)। এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)।

১৮. মাসআলা ঃ বর্তমানকালে আমাদের দেশের অত্যাচারী শাসক কর্তৃক আদায়কৃত সাদাকাত, 'উশর, খারাজ বা কর যা কিছু তারা জোরপূর্বক আদায় করে নেয়, বিশুদ্ধতম মতে এতে মালিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যদি শাসককে প্রদানকালে যাকাত বা সাদাকার নিয়্যাত করে দেওয়া হয় (তাতারখানিয়া)। যদি যাকাতের মাল দ্বারা কোন গরীব ব্যক্তির ঋণ

পরিশোধ করা হয় এবং এ কাজ উক্ত গরীব ব্যক্তির নির্দেশে করা হয়, তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তার নির্দেশ ছাড়া করা হয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। যদি যাকাতের পরিবর্তে কাউকে থাকার ঘর দেওয়া হয় তবে এতে যাকাত আদায় হবে না (যাহিদী)।

১৯. মাসআলা ঃ নিজের কোন নিকট-আত্মীয়ের ছেলেকে, অথবা শুভ সংবাদদাতাকে অথবা নতুন ফল আনয়নকারীকে যা দেওয়া হয়, তাতে যদি যাকাতের নিয়্যাত করা হয় এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। শিক্ষক নিজের প্রতিনিধিকে যা দেয়, যদি প্রতিনিধির কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না থাকে, তবে এতে যদি যাকাতের নিয়্যাত করা হয় এবং প্রতিনিধির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তাকে পারিশ্রমিক না দিলেও সে বাচ্চাদেরকে শিখায়, তাহলে এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর প্রতিনিধির অবস্থা এমন না হলে যাকাত আদায় হবে না। এই ভাবে নিজের চাকর বা চাকরানীকে ঈদ বা অন্যান্য সময় যাকাতের নিয়্যাতে যদি কিছু দেওয়া হয়, তাহলে এতেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে (ম'রাজুদ দিরায়া)। যাকাতের মাল কোন ফকীরকে দিলে ঐ ফকীর অথবা তার কোন ওলী সে মাল গ্রহণ না করা পর্যন্ত যাকাত দেওয়া পূর্ণাঙ্গ হবে না। যেমন পিতা কিংবা ওসী (ওসিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্তব্যক্তি) বালক বা পাগলের পক্ষ থেকে মালামাল কবজা বা গ্রহণ করে থাকে (খুলাসা)। অথবা তার পরিবার বা আত্মীয়দের কোন লোক কিংবা তাকে দেখাশুনা করে এমন কোন অনাত্মীয় ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ঐ মাল গ্রহণ না করা পর্যন্ত যাকাত দেওয়া পূর্ণাঙ্গ হবে না। যদি কোন বাচ্চা রাস্তায় পাওয়া যায়, তবে তার যাকাত ঐ ব্যক্তি গ্রহণ করবে যে তাকে লালন-পালন করে। যদি কেউ যাকাতের অর্থ কোন পাগল বা বিবেকহীন কোন শিশুকে প্রদান করে, অতঃপর সে এ অর্থ নিজের পিতা-মাতা বা ওসীকে দিয়ে দেয়, তাহলে ফকীহ্গণের মতে যাকাত আদায় হবে না, যেমন যাকাতের টাকা দোকানে রাখার পর কোন ফকীর তা নিয়ে গেলে যাকাত আদায় হয় না। এখানকার বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ। যাকাতের টাকা যদি বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী কোন নাবালিগ বাচ্চা গ্রহণ করে, তবে যাকাত আদায় হবে। অনুরূপভাবে কোন বুঝমান বালককে দিলে- যে টাকা -পয়সা ছুঁড়ে মারে না অথবা ধোঁকা দিয়ে তার থেকে কেউ টাকা-পয়সা নিয়ে যেতে পারে না, জাইয আছে। যাকাতের অর্থ মতিভ্রম কোন ফকীরকে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

বায়তুল মাল সম্পর্কিত মাসাইল

১. মাসআলা ঃ বায়তুল মালে চার প্রকারের মালামাল জমা করা হয়ে থাকে। (১) সায়িমা পশুর যাকাত, 'উশর এবং 'আশির মুসলমান ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যা কিছু আদায় করে। এ সব মালামাল খরচের খাত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। (২) গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং মা'দিন ও রিকায-এর এক-পঞ্চমাংশ। এ সব সম্পদ ব্যয় করার খাত বর্তমান কালে তিনটি। (ক) ইয়াতীম (খ) মিসকীন (গ) ইবন সাবীল-মুসাফির। (৩) খারাজ, জিয়য়া-কর এবং ঐ কাপড়ের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোড়া, যার উপর নাজরান গোত্রের লোকদের সাথে সন্ধি হয়েছে এবং ঐ দ্বিগুণ সাদাকা, যা বনী তাগলিব থেকে উসূল করা হয়। এমনিভাবে আশির আমানপ্রাপ্ত লোক এবং যিম্মী ব্যবসায়ীদের থেকে যা কিছু উসূল করে তাও বায়তুল মালে রাখা হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

এই সকল মাল সৈনিকদের ভাতা প্রদান, সীমান্ত রক্ষা করা এবং তথায় সেনাঘাঁটি তৈরী করা, দারুল ইসলামে রাস্তায় এমন ভাবে সেনা ছাউনি তৈরী করা যাতে চোর-ডাকাতদের থেকে নিরাপত্তা হাসিল হয় এবং পুল নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। বড় বড় নদী -যাতে কারো মালিকানা নেই এ জাতীয় নদী খনন করার কাজেও এ টাকা ব্যয় করা হবে। যেমন জায়হন, ফুরাত ও দজলা (শরহুত তাহাবী)। মুসাফিরখানা, মসজিদ নির্মাণ এবং বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজেও এসব টাকা ব্যয় করা জাইয। অনুরূপভাবে দেশের প্রশাসক, তাদের সহকারী, কাযী, বিচারক, মুফতী এবং হিসাব রক্ষকদের বেতন বা ভাতা এ ফাণ্ড থেকে প্রদান করা বৈধ (মুহীত ঃ সুরুখসী)। এর থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ভাতাও প্রদান করবে (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যারা মুসলমানদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত এবং কল্যাণজনক কাজে রত আছেন তাদেরকেও এর থেকে ভাতা প্রদান করা হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। (৪) রাস্তায় পড়ে থাকা মাল (মুহীত ঃ সুরুখসী)। এমন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল যার কোন ওয়ারিছ নেই অথবা শুধু স্বামী বা স্ত্রী যার ওয়ারিছ এ জাতীয় মালও বায়তুল মালে জমা করা হবে। এ সব মার গরীব রোগীদের ঔষধপত্রেও ঐসব মৃত লোকের কাফনের কাজে ব্যয় করবে, যাদের কোন মাল নেই। এই মাল সে বাচ্চাদের জন্যও খরচ করবে, যাদের রাস্তায় পাওয়া যায় এবং তাদের অপরাধের জরিমানা আদায়ে, আর যে সব মানুষ উপার্জনে অক্ষম ও ব্যয় নির্বাহ করার মত যাদের কোন লোক নেই, তাদের আর্থিক সহযোগিতা দানে ইত্যাদি (শরহুত তাহাবী)।

২. মাসআলা ঃ রাষ্ট্র প্রধানের জন্য কর্তব্য হল, চার প্রকার বায়তুল মালের প্রত্যেক প্রকারের জন্য এক একটি ঘর তৈরী করা। কেননা, প্রত্যেক প্রকার মালের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। একটির সাথে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন খাতে মাল মোটেই না থাকে, তবে রাষ্ট্র প্রধানের জন্য অন্য খাত থেকে ধার নেওয়া জাইয। যদি সাদাকার তহবিলের মাল থেকে খারাজী তহবিলে খরচ করার জন্য ঋণ নেয়, তবে খারাজী তহবিলে মাল আসার পর ঐ তহবিলের ঋণ পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু এ মাল কোন গরীব সৈন্যকে দেওয়া হলে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে না। কেননা, সাদাকার মালে তারও অংশ রয়েছে। সুতরাং এ মাল তার জন্য ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে না। যদি খারাজী মালের তহবিল থেকে ঋণ নেয় সাদাকার তহবিলে খরচ করার জন্য এবং গরীব লোকদের মধ্যে তা বন্টন করা হয়, তবে তা ঋণ হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা, খারাজী মালের হুকুম ফায় ও গনীমতের মালের হুকুমের মতই। আর এতে গরীবদেরও অংশ রয়েছে। তবে তাদেরকে এ জন্য দেওয়া হয় না যেহেতু সাদাকার মালই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় (মুহীত ঃ সুরুখসী)। হকদারের নিকট তাদের হক পৌছিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ওয়াজিব। তারা হকদারকে

তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে না। রাষ্ট্র প্রধান ও তাঁর সহকারীদের জন্য এ জাতীয় মাল থেকে কেবল তার এবং তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা প্রয়োজন সে পরিমাণ নিতে পারবে। তারা এ মাল সঞ্চয় করে রাখতে পারবে না। ব্যয় নির্বাহের পর এর থেকে কিছু বেঁচে গেলে তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। এ সব মালামাল বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানগণ কোন রূপ অবহেলা প্রদর্শন করলে এর বিপদ তাদের উপরই আপতিত হবে। রাষ্ট্র প্রধান এবং যাকাত উসূলকারীর জন্য উত্তম হল, যে মাস আসবে ঐ মাসের বেতন নেওয়া, অগ্রিম মাসের বেতন না নেওয়া (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যিম্মীদের বায়তুল মালে কোন অধিকার নেই। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি দেখে যে, কোন যিম্মী খাদ্যাভাবে মারা যায়, তবে তাকে বায়তুল মাল থেকে কিছু দেওয়া জাইয হবে। কেননা, সে দারুল ইসলামেরই এক লোক। তাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপ্রধানেরই দায়িত্ব (মুহীত ঃ সুরুখসী)। বায়তুল মালে যে ব্যক্তির হক আছে, সে যদি কোন মাল পায়, যা বায়তুল মালে পৌছা আবশ্যক ছিল, তবে ঈমানদারীর সাথে এ মাল নেওয়া তার জন্য জাইয আছে। অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এ মাল দেওয়া এবং না দেওয়া উভয়ই জাইয আছে (কিনয়া)।

pdf By Syed Mostofa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ সাদাকায়ে ফিতর–এর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ সাদাকায়ে ফিতর ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে আযাদ, মুসলমান এবং এরূপ নিসাবের মালিক যা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। এ ক্ষেত্রে নিসাব বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। এপরিমাণ নিসাবের মালিক ব্যক্তির উপর কুরবানী এবং আত্মীয়-স্বজনের খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সাদাকায়ে ফিতর চার প্রকার জিনিস দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব। তা হল গম, যব, খেজুর এবং কিশমিশ (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন ও শারহুত্তাহাবী)। গম দ্বারা দিলে অর্ধ সা', যব এবং খেজুর দ্বারা দিলে এক সা' দিতে হবে। গম ও যবের আটা এবং এ গুলোর ছাতু আসল দ্রব্যের হুকুমের মধ্যে গণ্য। রুটি দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা জাইয নয়। মূল্য হিসাবে রুটি দেওয়া জাইয। এটিই বিশুদ্ধতম বর্ণনা। কিশমিশ সম্বন্ধে জামি' সগীরে লেখা আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে অর্ধ সা' দিতে হবে। কারণ তার সবটুকু অংশ খাওয়া যায়। এক রিওয়ায়েত মতে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কিশমিশ হলে এক সা' দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর অভিমত তা-ই। কেউ কেউ বলেন, মূল জিনিসের হিসেবে তা আদায় করা জাইয। কিন্তু অধিক সতর্কতা হল, মূল্যের হিসাবে দেওয়া। (মুহীত ঃ সুরুখসী)। গম দেওয়ার চেয়ে গমের আটা দেওয়া উত্তম এবং আটা দেওয়া থেকে নগদ মুদ্রা দেওয়া উত্তম। কারণ এর দ্বারা সহজে প্রয়োজন নিবারণ করা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য উৎপন্ন শস্য দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা জাইয নয়। কিন্তু মূল্য হিসাবে আদায় করলে তা জাইয হবে। ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নস তথা হাদীছে যেসব বস্তু দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তা না দিয়ে এগুলোর মূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করা উত্তম। এরই উপর ফাতওয়া (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২. মাসআলা ঃ কেউ সাধারণ গমের অর্ধ সা' মূল্যের সমান এক পোয়া সা' উত্তম গম আদায় করল অথবা এমন অর্ধ সা' উত্তম যব আদায় করল, যার মূল্য সাধারণ যবের এক সা' এর সমান, এতে পূর্ণ সাদাকা আদায় হবে না। বরং যে পরিমাণ আদায় করেছে ঐ পরিমাণই আদায় হবে। কাজেই বাকীটুকু তার আদায় করা ওয়াজিব হবে। এক সা' যবের পরিবর্তে পোয়া সা' গম আদায় করা জাইয নয় (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি অর্ধ সা' যব এবং অর্ধ সা' খেজুর, অথবা অর্ধ সা' খেজুর এবং একমণ গম দেয় কিংবা অর্ধ সা' যব এবং পোয়া সা' গম দেয়, তবে আমাদের মাযহাব মতে তা জাইয (আল–বাহরুর রায়িক)।

৩. মাসআলা ঃ বাগদাদী আট রতলে এক সা' হয়। আর বিশ আসতারে বাগদাদী এক রতল

হয় (তাবয়ীন)। সাড়ে চার মিছকালে এক আসতার হয়[১] (শরহে বিকায়া)। সাদাকায়ে ফিতর গম দ্বারা দিলে অর্ধ সা' এবং অন্যান্য জিনিস দ্বারা দিলে এক সা' ওযনে দিতে হবে। এ কথাটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন। কারণ, ফকীহ্ আলিমগণের মতানৈক্য তো একথার মধ্যে যে, কত রতলে এক সা' হয়? এতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ফকীহ্গণের ইজমা' হল, সাদাকা ফিতর আদায়ে ওযনের বিষয়টি ধর্তব্য হবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ সাদাকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর থেকে ওয়াজিব হয়। এ সময়ের পূর্বে যে মৃত্যু বরণ করে তার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় না। ঐ সময়ের পূর্বে যদি কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে অথবা কেউ ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে তাদের উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। এর পরে কেউ জন্ম গ্রহণ করলে অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ উক্ত সময়ের পূর্বে গরীব ব্যক্তি ধনী হলে তার উপরও সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। ধনীলোক উক্ত সময়ের পূর্বে গরীব হয়ে গেলে তার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না। (মুহীত ঃ সুরুখসী) সুবহে সাদিক হওয়ার পর কেউ মৃত্যুবরণ করলে সাদাকায়ে ফিতর তার উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে ফিতরের দিনের পর কেউ গরীব হয়ে গেলে তার উপরও সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। ঈদুল ফিতর দিবসের পূর্বে কেউ সাদাকায়ে ফিতর আদায় করলে তা জাইয আছে। সহীহ্ বর্ণনা মতে এক সময় থেকে অন্য সময়ের কোন ফযীলত নেই। ঈদুল ফিতরে সাদাকা ঈদের দিন আদায় না করে বিলম্ব করলে সাদাকায়ে ফিতর রহিত হবে না। বিলম্বকারীদের উপর পরবর্তীতে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার মত নিসাব পূর্ণ হওয়ার আগে কেউ ফিতরা আদায় করল, তারপর এ নিসাবের মালিক হল, এতে তার পূর্ব আদায় সহীহ্ বলে গণ্য হবে (আল–বাহরুর রায়িক)। তাজনীসুল মুলতাকা নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বয়োবৃদ্ধতাজনিত বা অসুখবশত রামাযানের রোযা মাফ হলেও সাদাকায়ে ফিতর মাফ হবে না (মুযমারাত)। মুস্তাহাব হল, ঈদের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করে দেওয়া (জাওহারাতুন নায়্যারা)। আমাদের ফকীহ্ আলিমগণের মতে গোটা জীবনই হল, সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার সময় (বাদাই')

৫. মাসআলা ঃ সাদাকায়ে ফিতর নিজের এবং নিজের নাবালিগ সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব (কাফী)। মতিভ্রম ও পাগল ব্যক্তি নাবালিগ সন্তানের সমপর্যায়ের। জন্মগত পাগল হোক কিংবা কোন কারণবশত পরবর্তীতে পাগল হোক, উভয় অবস্থাতে হুকুম একই। এটিই যাহিরী মাযহাব (মুহীত)। না–বালিগ শিশু ও পাগলের সম্পদ থাকলে, পিতা বা তার ওসী (ওসিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কিংবা দাদা বা তার ওসী ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে তাদের সম্পদ থেকে তাদের নিজেদের ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে

---

১. যেহেতু এক মিছকাল সাড়ে চার মাশায় হয়। এ হিসাবে এক আসতার হয়, এক তোলা আট মাশা দু'রত্তিতে। এক রতল হয় তেত্রিশ তোলা নয় মাশায়। আর এক সা' যা আট রতলের সমান হয়, তা হল, দুশো সত্তর তোলায়। ফাতাওয়ায়ে আল–সগীরী উর্দু, মাওলানা সায়্যিদ আমীর আলী অনূদিত ১ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিতর আদায় করবে। গর্ভস্থ বাচ্চার ফিতরা আদায় করতে হয় না। কারণ, তার হায়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না (সিরাজুল ওয়াহহাজ)। পিতার মাল থেকে নিজের নাবালিগ সন্তানের গোলামদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা পিতার উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপ ছেলের গোলামদের পক্ষ থেকে পিতার উপর নিজের মাল থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) মতে মস্তিভ্রম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সন্তান যদি গরীব হয় এবং তার পিতা জীবিত থাকে, তবে এ অবস্থায় সন্তানদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা দাদার উপর ওয়াজিব নয়। সন্তানদের পিতা মরে গেলেও যাহিরী রিওয়ায়েত মতে দাদার উপর তাদের ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হয় না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যে শিশু দু'পিতার মাঝে হবে।[১] তাদের উভয়ের উপর পূর্ণ সাদাকা তার পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব (যহীরিয়া)। যদি তাদের দু'জনের একজন ধনী এবং অপরজন গরীব অথবা একজন মরে যায়, তবে অপর জনের উপর পূর্ণ সাদাকা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে এ সন্তানের মায়ের ফিতরা আদায় করা উক্ত দুই মালিকের কারো উপরই ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি তার নাবালিগা মেয়েকে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে তার নিকট সমর্পণ করে দেয়, তবে ঈদুল ফিতরের দিনে পিতার উপর তার পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয় না (তাতারখানিয়া)।

৬. মাসআলা ঃ খিদমতের গোলামদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা মুনীবের উপর ওয়াজিব। গোলাম মুসলমান হোক অথবা কাফির হোক। আমাদের মাযহাব মতে নিজের মুদাব্বার গোলাম ও উম্মে ওয়ালাদের পক্ষ থেকেও সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ইজারা দেওয়া গোলাম ও ব্যবসার অনুমতি দেওয়া গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করাও মুনীবের উপর ওয়াজিব। যদিও গোলাম ঋণে ভারাক্রান্ত হয়। যদি গোলাম কারো খেদমতের জন্য ওসিয়তকৃত হয়, তবে তার সাদাকায়ে ফিতর তার মালিক যিনি হবেন তার উপর ওয়াজিব হবে। ধার নেওয়া গোলাম ও আমানতের গোলামের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। যে গোলাম ভুলক্রমে অথবা ইচ্ছাবশত কারও ক্ষতি করল, তার পক্ষ থেকেও সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা মালিকের উপর ওয়াজিব। কারণ, মালিকের মালিকানা ঐ সময় দূর হবে, যখন মালিক গোলামটিকে ঐ ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করবে যার সে ক্ষতি সাধন করেছে। সোপর্দ করার পূর্বে মালিকের মালিকানা বাকী থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বন্ধকী গোলামের মূল্য যদি ঋণ বাদে নিসাব পরিমাণ হয় তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তার পক্ষ থেকেও ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। এ গোলামের কারণে মালিকের উপরও তার নিজের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে (তাব্য়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ ব্যবসায়ের গোলামসমূহের পক্ষ থেকে আমাদের মাযহাব মতে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। ব্যবসার অনুমতি দেওয়া গোলামের গোলামদের পক্ষ থেকেও সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুকাতাব গোলামের পক্ষ

১. এক বাঁদী দু মুনীবের অধীনে ছিল, তার এক সন্তান হলে উভয় মালিকই এ সন্তানের দাবীদার হলে এতে উভয়েরই বংশ প্রমাণিত হবে। আর দু'জনই তার পিতা সাব্যস্ত হবে। এরূপ সন্তানকে দু'পিতার সন্তান বলা হয়।

থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা মুনীবের উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, এ জাতীয় গোলামের মধ্যে মুনীবের মালিকানা অসম্পূর্ণ। নিজেও তার পক্ষ থেকে ফিতরা দিবে না। কারণ, সে গরীব। মুনীব নিজের মুকাতাব গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা দিবে না। মুকাতাব নিজেও তার গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা দিবে না। অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলাম ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুকাতাব সমপর্যায়ের। মুনীবের উপর তার পক্ষ থেকে সাদাকা আদায় করা জরুরী নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে আযাদ ঋণী ব্যক্তির সমপর্যায়ের। সে ধনী হলে তার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব। অন্যথায় ওয়াজিব নয় (সিরাজুল ওয়াহহাজ)। আযাদ হতে মুকাতাব গোলাম অক্ষম হয়ে পুনরায় পূর্ণ গোলাম হয়ে গেলে মুনীবের উপর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং খিদমতের গোলাম হলেও পূর্ববর্তী বছরগুলোর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দু'ব্যক্তি এক গোলামের মাঝে অংশীদার। এরূপ গোলামের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয় না। পলাতক বন্দী ও ছিনতাইকৃত গোলামসমূহের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা মুনীবের উপর ওয়াজিব নয়। বন্দীদশায় থাকার দরুন তাদের উপর নিজেদের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হয় না (তাবয়ীন)। ঈদুল ফিতর চলে যাওয়ার পর পলাতক গোলাম ফিরে এল অথবা ছিনিয়ে নেয়া গোলামকে ফিরিয়ে দিলে মুনীবের উপর অতীতের সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ কোন গোলামকে বিক্রেতার বা ক্রেতার কিংবা উভয়ের অথবা তৃতীয় অন্য কারো খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে যদি বিক্রয় করা হয়, আর খিয়ারের সময়-সীমার মধ্যে ঈদুল ফিতর চলে যায়, তাহলে সাদাকায়ে ফিতর মওকুফ থাকবে। বিক্রয় পূর্ণ হলে সাদাকায়ে ফিতর ক্রেতার উপর ওয়াজিব আর বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে গেলে বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। ক্রেতা যদি দেখার অথবা দোষের খিয়ারের কারণে বিক্রীত গোলামটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেয়, তবে দেখতে হবে গোলামটিকে ক্রেতা হস্তগত করার পর ফেরত দিয়েছে কি? যদি হস্তগত করার পূর্বে ফেরত দেয়, তবে বিক্রেতার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আর হস্তগত করার পর ফেরত দিলে ক্রেতার উপর ওয়াজিব (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। গোলামটিকে যদি অকাট্য রূপে খরীদ করে, আর তাকে হস্তগত করার পূর্বে ঈদুল ফিতর চলে যায়, তবে ক্রেতা হস্তগত করলে তার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব। গোলামটিকে হস্তগত করার পূর্বে মারা গেলে ক্রেতা-বিক্রেতা কারো উপর ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নয় (আসসিরাজুল ওয়াহহাজ)। গোলামটি যদি ফাসিদ বিক্রয়ের গোলাম হয়, আর ক্রেতা হস্তগত করার পূর্বে ঈদুল ফিতর চলে যায়। তারপর ক্রেতা হস্তগত করে গোলামটিকে আযাদ করে দেয়, তবে সাদাকায়ে ফিতর বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। অনুরূপ ক্রেতার হস্তগত থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতর চলে গেলে আর বিক্রেতা গোলামটিকে ফিরিয়ে নিলে বিক্রেতার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব। বিক্রেতা যদি গোলামটিকে ফিরিয়ে না নেয়, আর ক্রেতা সেটিকে আযাদ করে দেয়, তবে সাদাকায়ে ফিতর ক্রেতার উপর ওয়াজিব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ সাদাকা করার মানসে খরীদা গোলামের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর মুনীবের উপর ওয়াজিব হয় (তাতারখানিয়া)। হুবহু গোলামকে মহর সাব্যস্ত করা হলে, স্ত্রীর উপর গোলামের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। স্ত্রী গোলামটিকে হস্তগত করুক বা না করুক। কারণ, সে আক্‌দের মাধ্যমে গোলামের মালিক হয়ে গেছে। স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে তাকে তালাক দেওয়া হলে মহরের গোলামটি তার হস্তগত না থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতর অতিবাহিত হয়ে গেলে কারো উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়। গোলামটি স্ত্রীর হস্তগত থাকলেও সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে তার উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। হুবহু গোলাম মহর হিসাবে ধার্য না হলে, কারো উপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয় (তাতারখানিয়া)। কেউ তার গোলামকে বলল, ঈদুল ফিতরের দিন এলে তুমি আযাদ। পরে ঈদুল ফিতর যখন আসবে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর আযাদ হওয়ার পূর্ব সময়ের সাদাকা আদায় করা মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। (জাওহারাতুন নায়্যারা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ নিজ স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানাদির পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। তারা তার সাথে যৌথ পরিবারে থাকলেও। সন্তানাদি ও স্ত্রীর আদেশ ব্যতীত তাদের পক্ষ থেকে আদায় করলে ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে তা আদায় হয়ে যাবে (হিদায়া)। এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নিজ পরিবার ভিন্ন অন্যদের পক্ষ থেকে তাদের হুকুম ব্যতীত সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা জাইয নয়। তাদের হুকুমে আদায় করলে জাইয হবে (মুহীত)। দাদা ও দাদী ও যাদেরকে ছওয়াবের আশায় ভরণ-পোষণ করা হয়, তাদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর দেওয়া ওয়াজিব নয় (তাবয়ীন)। নিজের পিতা-মাতার সাথে একই পরিবারে হলেও তাদের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা জরুরী নয়। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের মত তাদের উপর তার কোন অভিভাবকত্ব নেই (জাওহারাতুন নায়্যারা)। নিজের ছোট ছোট ভাই ও আত্মীয়-স্বজন একই পরিবারে হলেও তাদের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি হল, অভিভাবকত্ব ও লালন-পালনের সম্পর্ক। সুতরাং যার উপর অভিভাবকত্ব, লালন-পালন ও খোর-পোষ দেওয়া ওয়াজিব, তার উপর অধীনস্থ লোকের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। অন্যথায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় না (শারহুত্তাহাবী)। এক ব্যক্তির সাদাকায়ে ফিতর একই মিসকীনকে দিবে। দুই বা ততোধিক মিসকীনের মাঝে বন্টন করলে, তা জাইয হয় না। কতক ব্যক্তির উপর যে সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়, তা এক মিসকীনকে দেয়া জাইয (তাবয়ীন)।

১১. মাসআলা ঃ যার উপর যাকাত, ফিতরা, কাফ্ফারা ও মানত আদায় করা ওয়াজিব ছিল, সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সেগুলো আদায় করা যাবে না। অবশ্য যদি ওয়ারিছগণ সেগুলো সাদাকা করে দেয়, তবে তারা তা করতে পারবে। কেননা, তারা সাদাকা করার উপযুক্ত। যদি তারা তা আদায় করতে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। যদি মৃত ব্যক্তি সেগুলোর ওসিয়ত করে, তবে তার ওসিয়ত জাইয হবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হতে আদায় করা হবে (জাওহারাতুন নায়্যারা)।

স্বামী যদি স্ত্রীকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার আদেশ করে, এ অবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর গমের সাথে তার গম মিশিয়ে দরিদ্রকে দিয়ে দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীর ফিতরা আদায় হবে। কিন্তু স্বামীর ফিতরা আদায় হবে না (যহীরিয়্যা)। এক ব্যক্তি তার সন্তানাদি ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার জন্য মাথা হিসাব করে গম মেপে তারপর তাদের ফিতরার নিয়্যাতে সবগুলো একত্র করে দরিদ্রকে দিয়ে দিলে এতে তাদের ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। যে যে ক্ষেত্রে যাকাত দেওয়া জাইয, সে সে ক্ষেত্রে সাদাকায়ে ফিতরও দেওয়া জাইয (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الصِّيَامِ

অধ্যায় ঃ রোযা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ রোযা

[এই অধ্যায়ে রয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রোযার সংজ্ঞা, প্রকার, কারণ, সময় ও শর্তের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ রোযার সংজ্ঞা হল, ছওয়াবের নিয়্যাতে উপযুক্ত ব্যক্তি সুবহে সাদিক হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা (কাফী)। রোযা ফরয, ওয়াজিব ও নফল-এ তিন প্রকারে বিভক্ত। ফরয রোযা দুই প্রকার ঃ নির্দিষ্ট সময়ের রোযা যেমন, রমযানের রোযা। অনির্দিষ্ট সময়ের রোযা, যেমন, কাফ্ফারা ও রমযানের কাযা রোযা। ওয়াজিব রোযা দু' প্রকার ঃ নির্দিষ্ট যেমন, সময় নির্দিষ্ট করে রোযার মান্নত করা। অনির্দিষ্ট যেমন, সময় নির্ধারণ করা ছাড়া রোযার মান্নত করা। সকল প্রকার নফল রোযা একই শ্রেণীভুক্ত (তাবয়ীন)। রোযার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। মান্নতের রোযার কারণ হল, মান্নত করা। কাফ্ফারা ইত্যাদি রোযার কারণ হল, কসম ভঙ্গ করা ও হত্যা করা। রোযা আদায় যে কারণে ওয়াজিব হয়, সে কারণেই কাযাও ওয়াজিব হয় (ফাতহুল কাদীর)। রমযানুল মুবারকের রোযার কারণ সম্পর্কে কাযী, ইমাম আবূ যায়দ ফখরুল ইসলাম ও সদরুল ইসলাম আবুল ইউস্‌র (র) বলেন, রমযান মাসের প্রত্যেক দিনের ঐ প্রথম অংশটুকু যাকে ভাগ করা যায় না (কাশফুল কাবীর)। গায়াতুল বয়ানে বলা হয়েছে, এ অভিমতই আমার কাছে সঠিক। ইমাম আল-হিন্দী একেই শুদ্ধ বলেছেন (আন্‌নাহরুল ফায়িক)।

২. মাসআলা ঃ কেউ রমযান মাসের প্রথম রাত্রে পাগল থেকে সুস্থ হয়ে পুনরায় ভোরে পাগল হয়ে পূর্ণ মাস পাগল অবস্থায় থাকলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেন, তার উপর এই মাসের রোযার কাযা করা ওয়াজিব নয়। এটিই শুদ্ধ অভিমত (আল-বাহরুর রাইক)। এর উপরই ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে। মিরাজুদদিরায়া)। অনুরূপ পাগল ব্যক্তি যদি মাসের ভিতর কোন রাত্রে সুস্থ হয়ে আবার ভোরে পাগল হয়ে যায়, তবে তার উপরও কাযা ওয়াজিব নয় (মুহীত ও আল-বাহরুর রাইক)। সুস্থ এরূপ হওয়া চাই, যাতে তার সম্পূর্ণ পাগলামি দূর হয়ে যায়। দু' চার কথা সস্থ ব্যক্তির ন্যায় বললে এতে সে সুস্থ বলে গণ্য হবে না (যাহিদী)।

৩. মাসআলা ঃ রোযার সময় হল, সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর থেকে যখন আকাশের প্রান্তে প্রভাতের শুভ্রচ্ছটা ছড়িয়ে যায়, তখন হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। সুবহে সাদিকের প্রথম থেকেই রোযার সময় আরম্ভ হয়, না প্রভাতের শুভ্রচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে আরম্ভ হয়, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেন, প্রথম অভিমতে সাবধানতা বেশী আর দ্বিতীয় অভিমতে সময়ের প্রশস্ততা বেশী (মুহীত)। এর প্রতিই অধিকাংশ আলিমের রায় (খাযানাতুল ফাতাওয়া ঃ সালাত অধ্যায়)। বাস্তবে ফজর উদিত হয়ে গেছে, কিন্তু উদিত হয় নাই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধারণায় কেউ যদি সাহরী খায় অথবা সূর্য অস্ত যায় নাই কিন্তু অস্ত যাওয়ার ধারণায় যদি কেউ ইফতার করে এতে ঐ ব্যক্তি এই রোযার কাযা করবে। তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে ইচ্ছাপূর্বক খায়নি (মুহীত ঃ সুরুখসী)। সুবহে সাদিক হয়ে গেছে কিনা, তাতে সন্দেহ হলে, আহার বর্জন করা উত্তম। এ অবস্থায় আহার করলে রোযা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য সুবহে সাদিকের পর আহার করেছে একথার প্রতি বিশ্বাস হলে, ঐ রোযার কাযা আদায় করবে (ফাতহুল কাদীর)। সুবহে সাদিক হওয়ার পর সাহরীর সময় আছে এরূপ ধারণায় সাহরী খেলে প্রবল ধারণার উপর আমল করার দরুন রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। কাযা করার মাঝেই সাবধানতা। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এ রোযার কাযা ওয়াজিব নয় (হিদায়া)। একথাই সহীহ্ (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)। এ হুকুম ঐ সময়, যখন সাহরী গ্রহণকারীর নিকট সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশিত না হয়। যদি তার নিকট প্রমাণিত হয় যে, সে সুবহে সাদিক হওয়ার পর আহার করেছে, তবে তার উপর ঐ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নয় (তাবয়ীন)। দু'ব্যক্তি সাক্ষী দিল সুবহে সাদিক হওয়ার, আর অপর দু'ব্যক্তি সাক্ষী দিল সুবহে সাদিক না হওয়ার, এমতাবস্থায় আহার করার পর যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, তবে এতে তার উপর ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ মতে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। হক্কুল ইবাদের মত ক্ষেত্রে সুবহে সাদিক প্রমাণিত হওয়ার অনুকূলে সাক্ষী গৃহীত হবে। প্রমাণিত না হওয়ার সাক্ষ্য দানের সাথে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না। এক ব্যক্তি সাক্ষী দিল সুবহে সাদিক হওয়ার আর অপর এক ব্যক্তি সাক্ষী দিল সুবহে সাদিক না হওয়ার-এ অবস্থায় কেউ পানাহার করল, তারপর প্রমাণিত হল, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। এতে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে একজনের সাক্ষী পূর্ণ দলীল নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সাহরী খাচ্ছে, এ সময় একদল লোক এসে বলল, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। এতে লোকটি বলল, তাহলে আমি রোযাদার নয়, আমি রোযা ভঙ্গ- কারী হয়ে গেছি। এ কথা বলে সে আরো খেয়ে নিল, তারপর প্রমাণিত হল, প্রথম বারের খাওয়া তার সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে ছিল আর দ্বিতীয় বারের খাওয়া ছিল সুবহে সাদিক হওয়ার পর। এ ব্যাপারে হাকীম আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, সুবহে সাদিক হওয়ার সাক্ষী দানকারিগণ একদল লোক হলে আর তাদেরকে এ ব্যক্তি বিশ্বাস করলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। আর সাক্ষী দানকারী এক ব্যক্তি হলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। সাক্ষী দানকারী লোকটি নিষ্ঠাবান হোক বা না হোক। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে এক লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না (খুলাসা)। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, "সুবহে সাদিক হয়েছে কিনা দেখে এস।" সে দেখে এসে বলল, "সুবহে সাদিক হয়নি।" এ কথা শুনে স্বামী তার সাথে সঙ্গম করল। তারপর প্রমাণিত হল, তখন সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছিল, এ অবস্থায় কোন কোন ফকীহ্ বলেন, স্ত্রীলোকটি নিষ্ঠাবান হলে আর সে সত্য বলে থাকলে স্বামীর উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। শুদ্ধ কথা হল, স্ত্রীলোকটি নিষ্ঠাবান হোক আর সত্য বলুক অথবা নিষ্ঠাবান না হোক আর সত্য না বলুক কোন অবস্থায়ই স্বামীর উপর কাফ্‌ফারা

ওয়াজিব হবে না। সুবহে সাদিক হওয়ার কথা জানা সত্ত্বেও স্ত্রী যদি রোযা ভাঙ্গে, তবে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)। সূর্য অস্ত যাওয়াতে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে ইফতার করা জাইয নয় (কাফী)। কেউ খেয়ে নিল, কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়া-না যাওয়ার ব্যাপারে তার কাছে কোন কিছু প্রমাণিত হল না, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দু' রকমের রিওয়ায়েত আছে (তাবয়ীন)। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) এ ব্যক্তির উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়াকে পসন্দ করেন (ফাতহুল কাদীর)। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে খাওয়া প্রমাণিত হলে, ঐ ব্যক্তির উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব (তাবয়ীন)। সূর্য অস্ত না যাওয়ার প্রবল ধারণা থাকা সত্ত্বেও কেউ ইফতার করলে তার উপর কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কারণ দিন তো বিদ্যমান আছেই, তার সাথে প্রবল ধারণা যোগ হওয়ায় তা বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অস্ত যাওয়ার পূর্বে খেয়েছে তা প্রমাণিত হোক বা আগে-পিছের কথা প্রমাণিত না হোক। তাতে হুকমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (তাবয়ীন)। দু'ব্যক্তি সাক্ষী দিল সূর্য অস্ত যাওয়ার আর অপর দু'ব্যক্তি সাক্ষী দিল অস্ত না যাওয়ার, এ অবস্থায় কেউ ইফতার করল, তারপর প্রমাণিত হল যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি তাহাররী তথা ভেবে-চিন্তে সাহরী খেতে চায়, তবে তারজন্য তা ঐ সময় জাইয, যখন সে নিজে নিজে অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে সুবহে সাদিক সম্পর্কে অবগত হতে না পারে। শায়খ শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী বলেন, যে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সাহরী খেতে চায়, সে যদি এরূপ ব্যক্তি হয়, যার নিকট এ জাতীয় কোন কিছু গোপন থাকে না তবে তাতে কোন দোষ নেই। যদি সে এরূপ ব্যক্তি হয়, যার নিকট কিছু গোপন থাকে, তবে সে আহার বর্জন করবে। সাহরীর সময় যে তবলা বাজে সে আওয়াজে কেউ সাহরী খেতে চাইলে, যদি শহরের প্রত্যেক দিক থেকে প্রচুর আওয়ায শুনা যায়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি একটি মাত্র তবলার আওয়ায শুনা যায় আর তা সঠিক হওয়া সম্পর্ক জানা যায়, তবে এর উপর আস্থা রাখা যাবে। আর যদি এর সম্পর্কে কোন কিছু অবগত না থাকে, তবে সাবধানতা অবলম্বন সাহরী খাওয়া যাবে না। মোরগ ডাকে যদি কেউ সাহরী খেতে চায়, তবে তা কোন কোন আলিম অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি এরূপ বারবার ডাকে এবং প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্ত মতই সে ডাকে, তবে কোন দোষ নেই। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেন, আমাদের মাশায়েখে কিরামের যাহিরী রিওয়ায়েত মতে যাহিরী মাযহাব হল, ভেবে-চিন্তে ইফতার করা জাইয (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ রোযার শর্তাবলী ঃ রোযার শর্ত তিন প্রকার। রোযা ফরয হওয়ার শর্ত হল, মুসলমান হওয়া, আকিল তথা জ্ঞানবান হওয়া ও বালিগ হওয়া। রোযা আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল, সুস্থ থাকা, মুসাফির না হওয়া। রোযা আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল, নিয়্যাত করা, হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকা (কাফী ও নিহায়া)। রোযার নিয়্যাত হল, অন্তর দ্বারা রোযার সংকল্প করা (মুহীত ঃ সুরুখসী ও খুলাসা)। সুন্নাত হল, মুখ দিয়ে রোযার কথা উচ্চারণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা (আন্-নাহরুল ফায়িক)। আমাদের মাযহাব মতে রমযানের প্রতিদিন রোযার নিয়্যাত করা জরুরী (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নাজমুদ্দীন নাসাফী বলেন, রমযানের সাহ্‌রী খেলেই নিয়্যাত হয়ে যায়। অনুরূপ অন্য রোযার জন্য সাহ্‌রী খেলেই নিয়্যাত হয়ে যায়। যদি এ উদ্দেশ্যে সাহ্‌রী খায় যে, ভোরে রোযাদার থাকবে না, তবে এরূপ সাহ্‌রী খাওয়ায় নিয়্যাত হবে না। যদি রাতে রোযার নিয়্যাত করে আর সুবহে সাদিক হওয়ার আগে তা পাল্টিয়ে নেয়, তবে এরূপ নিয়্যাত পাল্টানো সর্বপ্রকার রোযার ক্ষেত্রে শুদ্ধ আছে (আস সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি এরূপ বলে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থাৎ আমি আগামীকাল রোযা রাখার নিয়্যাত করলাম যদি আল্লাহ চান। তবে নিয়্যাত সহীহ্ হবে। এটিই শুদ্ধ কথা (যহীরিয়া)। যদি এরূপ নিয়্যাত করে যে, আগামীকাল কোন দাওয়াত পড়লে রোযা রাখব না, আর দাওয়াত না পড়লে রোযা রাখব, তবে এরূপ নিয়্যাতে রোযাদার হবে না। রমযানে ভোর হয়ে গেছে। রোযা রাখা-না রাখার কোন কিছুরই নিয়্যাত নেই। কিন্তু তার জানা আছে রমযানের দিনের কথা। এরূপ ব্যক্তির রোযাদার হওয়ার ব্যাপারে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী ফকীহ আবূ জা'ফর থেকে আমাদের মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের দু'রকম রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন। সর্বাধিক স্পষ্ট রিওয়ায়েত হল, এরূপ ব্যক্তি রোযাদার হবে না (মুহীত)। রোযাদার শুধু রোযা ভঙ্গের নিয়্যাত করল, নিয়্যাত ছাড়া অন্য কিছু করল না, এতে তার রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে (ইযাহুল কিরমানী)।

৭. মাসআলা ঃ রোযার নিয়্যাতের সময় হল, প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে পরবর্তী দিনের রোযার নিয়্যাত করা সহীহ্ হয় না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে পরবর্তী দিনের রোযার নিয়্যাত করল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল অথবা বেহুশ হয়ে গেল কিংবা বেখবর হয়ে গেল, আর এ অবস্থায় পরবর্তী দিনের দুপুর পার হয়ে গেল। এতে তার নিয়্যাত সহীহ্ হবে না। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর নিয়্যাত করলে আর এরূপ অবস্থা হলে, নিয়্যাত সহীহ্ হবে (খুলাসা)। জামি' সগীরে উল্লেখ আছে, রাত থেকে অর্ধ দিবসের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোযা, নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা ও নফল রোযা ঐ দিনের রোযার নিয়্যাতে অথবা শুধু রোযার নিয়্যাতে কিংবা নফলের নিয়্যাতে রাখলে তা জাইয হয়। ইমাম কুদূরী (র) উল্লেখ করেছেন, রাত এবং দুপুরের মধ্যবর্তী সময়ে নিয়্যাত করতে হয়। জামি' সগীরের বর্ণনা হল সহীহ্। নিয়্যাতের ব্যাপারে মুসাফির ও অমুসাফির, সুস্থ ও অসুস্থের মাঝে কোন তফাৎ নেই (তাবয়ীন)। দুপুর ঢলে যাওয়ার পূর্বে নিয়্যাত করা তখনি জাইয আছে, যদি এরূপ অবস্থায় ফজর থেকে নিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত এমন কোন কাজে লিপ্ত না হয়, যা রোযার পরিপন্থী যেমন, খানা-পিনা ও সহবাস। তা ইচ্ছাপূর্বক করুক বা ভুলবশত করুক। এরূপ কাজে লিপ্ত হলে ফজরের পর নিয়্যাত করা জাইয নয় (শারহুত্তাহাবী)। তাই দিনে রোযার নিয়্যাত করলে দিনের শুরু থেকে সম্পূর্ণ দিনের রোযার নিয়্যাত করতে হবে। কেউ নিয়্যাতের সময় থেকে রোযা রাখছে এরূপ নিয়্যাত করলে সে রোযাদার হবে না (জাওহারাতুন নায়্যারা ও আস সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ রমযানের রাতে কিংবা দিনে কেউ বেহুশ হওয়ার পর যদি দুপুরের পূর্বে তার হুশ ফিরে আসে এবং সে রোযার নিয়্যাত করে, তবে তার রোযা আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ হুকুম পাগল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। কোন ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে মুরতাদ হয়ে গেল, তারপর আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে এল এবং দুপুরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করল, এতে তার ঐ দিনের রোযা সহীহ্ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দিনের যে অংশে নিয়্যাত করা জাইয হয়, তাতে নিয়্যাত করা থেকে রাতে নিয়্যাত করা উত্তম (খুলাসা)। নির্দিষ্ট করে নিয়্যাত করাও উত্তম (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। রমযানের দিনে অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যাত করলে রমযানের রোযাই আদায় হবে। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী মুসাফির ও মুকীম ব্যক্তির মাঝে কোন তফাৎ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)- এর মতে মুসাফির যদি অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যাত করে, তবে সে ওয়াজিবই আদায় হবে। মুসাফির যদি রমযানের দিনে নফল রোযার নিয়্যাত করে, তবে তাতে দুই ধরনের রিওয়ায়েত আছে। সহীহ্ রিওয়ায়েত হল রমযানেরই রোযা আদায় হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। রোগী ব্যক্তির রমযানের রোযা সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে রমযানেরই আদায় হবে (কাফী)। মুসাফির ও রোগী অনির্ধারিত নিয়্যাতে রমযানে রোযা রাখলে রমযানের রোযাই আদায় হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। মান্নতের রোযার নির্দিষ্ট দিনে অন্য ওয়াজিব যেমন, রমযানের কাযা ও কাফ্‌ফারার নিয়্যাতে রোযা রাখলে যে ওয়াজিবের নিয়্যাতে রোযা রেখেছে, তাই আদায় হবে এবং তার উপর ওয়াজিব হবে মান্নতের রোযার কাযা করা (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। একথাই বিশুদ্ধ (আল-বাহরুর রায়িক)। কাযা এবং কাফ্‌ফারার রোযার শর্ত হল, নিয়্যাতে রাতে করবে এবং নিদিষ্ট নিয়্যাত রোযা রাখবে (নিকায়া)। অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযারও অনুরূপ হুকুম (আস সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৯. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি কাফিরদের বন্দীখানায় আটক আছে, সে রমযান মাসের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হলে যদি অনুমানের উপর রোযা রাখে, তবে রমযানের পরে রোযা রাখা হলে এবং রাতে নিয়্যাত করলে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনে রোযা রাখলে রোযা আদায় হবে না। অনুমানপূর্বক রমযানের আগে রোযা রাখেন রমযানের রোযা আদায় হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। এ রোযাগুলোতে কাযার নিয়্যাত করা শর্ত নয়। একথাই সহীহ্। কারণ, সে তার উপর রমযানের যে রোযা ফরয আছে, সে রোযা আদায় করার নিয়্যাতই সে করছে (বাদাই')। ঐ ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাসে রোযা রাখে আর ঐ বছর রমযান ও শাওয়াল মাসদ্বয় ত্রিশ দিনের হয় অথবা মাসদ্বয় উনত্রিশ দিনের হয়, তবে এ ব্যক্তির উপর এক দিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। যদি রমযান মাস ত্রিশ ও শাওয়াল মাস উনত্রিশ দিনের হয়, তবে তার উপর দু'টি রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। রমযান মাস উনত্রিশ দিনের আর শাওয়াল মাস ত্রিশ দিনের হলে তার উপর কোন রোযার কাযা করা জরুরী নয়। যদি ঐব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসে রোযা রাখে আর ঐ বছর রমযান ও যিলহাজ্জ মাসদ্বয় ত্রিশ দিনের বা উনত্রিশের হয়, তবে এ ব্যক্তির উপর চার দিনের রোযার কাযা করা জরুরী হবে। যদি রমযান ত্রিশ দিনের আর যিলহাজ্জ মাস ত্রিশ দিনের হয়, তবে তিন দিনের রোযার কাযা করতে হবে। যদি রমযান ত্রিশ দিনের আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

যিলহাজ্জ মাস উনত্রিশ দিনের হয়, তবে পাঁচ দিনের কাযা করতে হবে। যদি ঐ ব্যক্তি যিলকাদ বা অন্য কোন মাসে রোযা রাখে আর রমযানও এ মাস উভয়ই ত্রিশ দিনের বা উনত্রিশ দিনের হয় অথবা এ মাস শুধু ত্রিশ দিনের হয়, তবে তার উপর কোন রোযার কাযা করা জরুরী নয়। যদি রমযান মাস ত্রিশ দিনের হয় আর ঐ মাস উনত্রিশ দিনের হয়, তবে তার উপর শুধুমাত্র এক দিনের কাযা করা জরুরী (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ)।

১০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দারুল হারবে ছিল এবং তথায় অজান্তে কতক বছর রমযানের পূর্বে রোযা রাখল। এতে ঐ ব্যক্তির প্রথম বছরের রোযা কোন ইমামের মতেই আদায় হবে না। দ্বিতীয় বছরের রোযা প্রথম বছরের কাযা রূপে এবং তৃতীয় বছরের রোযা দ্বিতীয় বছরের কাযা রূপে আদায় হবে কি? এ ব্যাপারে ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি উভয় বছরে নিয়ত করে যে, সে রমযানের রোযা রাখছে, তবে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি নিয়্যাত করে যে, সে দ্বিতীয় বছরের রোযা রাখছে, তবে আদায় হবে না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত ঃ সুরুখসী)। একই রমযানের দু'দিনের কাযা কারও উপর ওয়াজিব হলে, উচিত হল এ রমযানের প্রথম দিনের রোযার কাযার নিয়্যাত করা। যদি প্রথম রোযার কাযা করার নিয়্যাত নির্দিষ্ট কার না করে, তবু প্রথম দিনের রোযার কাযা সহীহ্ হবে। দুই রমযানের দুই দিনের রোযার কাযা করার ব্যাপারেও অনুরূপ হুকুম হবে। এটিই ফকীহ্গণের পসন্দনীয় কথা। যদি সে শুধু কাযার নিয়্যাত করে, অন্য কিছুরই নিয়্যাত না করে, তবু জাইয হবে। যদিও সে দিনের কথা নির্দিষ্ট না করে (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ গরীব ব্যক্তি যদি রমযানে ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভেঙ্গে কাযা ও কাফ্ফারা স্বরূপ একষট্টিটি রোযা রাখে আর তাতে কাযার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট না করে, তবে তা জাইয হবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ এরূপ উল্লেখ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অপরিহার্যতা ও হওয়ার দিক থেকে সমান দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ফরয জিনিসের নিয়্যাত করলে[১] এবং এ দু'টির মাঝে কোনটিরই অপরটির উপর কোন প্রাধান্য নেই, এতে উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে। যদি একটির উপর অপরটির প্রাধান্য থাকে, তবে যেটির প্রাধান্য হবে সেটি আদায় হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি রমযানের কাযার ও মান্নতের রোযার নিয়্যাত করে, তবে কিয়াসের বিপরীত হলেও রমযানের কাযা আদায় হবে। যদি রাতে নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা এবং নফল রোযার নিয়্যাত করে অথবা দিনে নিয়্যাত করে কিংবা নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযার এবং কাফ্ফারার রোযার নিয়্যাত রাতে করে, তবে ইজমা মতে নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা আদায় হবে (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ)। যদি রমযানের কাযা ও যিহারের কাফ্ফারার রোযার নিয়্যাত করে, তবে কিয়াসের বিপরীত হলেও রমযানের কাযা আদায় হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। রমযানের কিছু অংশের কাযার এবং নফলের নিয়্যাত করলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রমযানের কাযা আদায় হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এক রিওয়ায়েতও অনুরূপ রয়েছে (যাখীরা)। যদি যিহার ও হত্যার কাফ্ফারার

১. যেমন যিহারের কাফ্ফারা ও হত্যার কাফ্ফারা রোযার এক সাথে নিয়্যাত করল।

অথবা রমযানের কাযা ও হত্যার কাফ্ফারার নিয়্যাতে রোযা রাখে, তবে ঐক্যবদ্ধ মতে হত্যার কাফ্ফারা আদায় হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি কাফ্ফারা ও নফলের নিয়্যাতে রোযা রাখে, তবে ওয়াজিব কাফ্ফারা আদায় হবে (যাখীরা)।

১২. মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় যদি মহিলা রোযার নিয়্যাত করে, তারপর ফজরের পূর্বে হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে যায়, তবে তার রোযা সহীহ্ হবে (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ)। যদি কাযা রোযা ও কসমের কাফ্ফারার রোযার নিয়্যাত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব থাকায় কোনটিই আদায় হবে না এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিরোধের স্থল হওয়ায় কোনটিই আদায় হবে না। তবে এ রোযাটি নফল হয়ে যাবে (মুহীত)। ফজর উদিত হওয়ার পর কাযা রোযার নিয়্যাত করলে, কাযার নিয়্যাত সহীহ্ হবে না। এতে সে নফল রোযা আরম্ভকারী হয়ে যাবে। যদি নিয়্যাতের পর রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাযা করা জরুরী হবে (যাখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ শা'বান মাসের উনত্রিশতম দিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় লোকদের জন্য ওয়াজিব হল, চাঁদের তালাশ করা। ঐ দিন চাঁদ দেখা গেলে পরবর্তী দিন রোযা রাখবে। আর যদি চাঁদ মেঘ আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তবে শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর রোযা রাখবে (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। অনুরূপ শা'বান মাসের দিন পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে শা'বানের চাঁদ তালাশ করা উচিত। ন্যায়পরায়ণ জ্যোতিষ্কদের কথার উপর এ ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা যায় কি? সহীহ্ কথা হল, তাদের কথা গ্রহণ করা যাবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ)। জ্যোতিষ্কের জন্য তার নিজের হিসাব অনুযায়ী আমল করাও জাইয নয় (মি'রাজুদদিরায়া)। চাঁদ দেখার সময় চাঁদের দিকে ইশারা করা মাকরূহ্ (যহীরিয়্যা)। দুপুরের পূর্বে বা দুপুরের পরে চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখা যাবে না এবং পানাহারও করবে না। এ চাঁদ হবে আগামী রাতের চাঁদ। এটিই ফকীহ্গণের পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)। আকাশে কোন প্রকার মেঘ থাকলে রমযানের চাঁদের জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ ও বালিগ মুসলমানের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যক্তি আযাদ হোক বা গোলাম হোক, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। অনুরূপ এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর অন্য এক ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং যিনার অপবাদে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য তাওবার পর যাহিরী রিওয়ায়েত মতে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা অখ্যাত, যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন, এ ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হবে। একথাই শুদ্ধ (মুহীত)। ইমাম হালওয়ানী একথা গ্রহণ করেছেন (শরহুন নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকারিম)। রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক গোলামের সাক্ষ্যের উপর অপর গোলামের সাক্ষী গৃহীত হবে। অনুরূপ এক মহিলার সাক্ষ্যের উপর অপর মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। বালিগ হওয়ার নিকটতমদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। রমযানের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় শাহাদাত (সাক্ষ্য) শব্দ উচ্চারণ করা সাক্ষীর দাবী করা ও হাকীমের ঘোষণা দেওয়া শর্ত নয়। তাই যদি হাকীমের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অন্য এক ব্যক্তি তা শুনে এবং সাক্ষ্যদাতা লোকটির গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশিত থাকে, তবে শ্রোতা ব্যক্তির উপর রোযা রাখা ওয়াজিব। তার রোযা রাখার জন্য হাকীমের হুকুম দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। চাঁদ দেখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে কি? ইমাম আবূ বকর ইসহাক (র) বলেন, ব্যাখ্যা সহকারে যদি এরূপ বলে যে, "আমি শহরের বাইরে খোলা স্থানে অথবা শহরে খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখেছি", তবে তার কথা গৃহীত হবে। কিন্তু যাহিরী রিওয়ায়েত মতে ব্যাখ্যা ছাড়াই সাক্ষ্য গৃহীত হবে। যদি বাদশাহ বা কাযী একা রমযানের চাঁ

দেখে, তবে ইচ্ছা করলে সে একজনকে নির্দিষ্ট করে দেবে, যে তার নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিবে অথবা নিজেই লোকদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিবে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চাঁদ দেখার ব্যাপারে এরূপ করতে পারবে না (আস-সিরাহুল ওয়াহহাজ)। যদি ন্যায়পরায়ণ এক ব্যক্তি রমযানের চাঁদ দেখে, তবে তার জন্য জরুরী হল রাতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করা। লোকটি আযাদ হোক অথবা গোলাম, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। এমনকি পর্দার অন্তরালের বাঁদীও যদি চাঁদ দেখে, তবে সেও চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বের হবে। এ ক্ষেত্রে মুনীবের অনুমতি প্রয়োজন হবে না। ফাসিক ব্যক্তি একা চাঁদ দেখলে সে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে। কারণ, কাযী কখনো কখনো তার কথা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু কাযীর উচিত তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করা (ওয়াজীয ঃ আলকুরদুরী)। এ হুকম শহরবাসীর জন্য। গ্রামের কেউ রমযানের চাঁদ দেখলে, গ্রামের মসজিদে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেবে। তথায় কোন হাকীম না থাকলে সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তি বিশ্বস্ত হলে তার কথায় সবাই রোযা রাখবে (মুহীত)। এক ব্যক্তি একা রমযানের চাঁদ দেখল এবং চাঁদ দেখার সাক্ষ্যও দিল। এতে তার সাক্ষ্য গৃহীত না হলে, তার উপর ওয়াজিব একা রোযা রাখা। যদি সে ঐদিন রোযা না রাখে, তবে তার উপর এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কাযী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার পূর্বে যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফাসিক ব্যক্তি যদি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর বাদশাহ তা গ্রহণ করে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। আর সে এবং শহরবাসীর অন্য এক লোক রোযা না রাখে। তবে ফকীহ্গণের মতে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। যদি ঐ লোকের রোযা ত্রিশটি পূর্ণ হয়ে যায়, তবে (ইসলামী রাষ্ট্রের) রাষ্ট্র প্রধান রোযা না ভাঙ্গা পর্যন্ত সেও রোযা ভাঙ্গবে না (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে এমন বড় জামাআতের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে, যাদের খবরে ইয়াকীন হাসিল হয়। বড় জামাআতের পরিমাণ কি, তা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। এটাই সহীহ্ কথা (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। রমযান, শাওয়াল ও যিলহাজ্জের চাঁদের ব্যাপারে এ একই হুকুম (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ)। ইমাম তাহাবী উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তির সাক্ষী তখন গৃহীত হবে, যখন সে শহরের দূর থেকে আগমন করবে অথবা সে কোন উঁচু স্থানে হবে (হিদায়া)। ইমাম তাহাবীর কথার উপর ইমাম মুরগীনানী ও আকযিয়া ও ফাতাওয়ায়ে সুগ্রার লেখকদ্বয় আস্থা স্থাপন করেছেন। কিন্তু যাহিরী রিওয়ায়েত মতে শহরের বাহির থেকে আগমনকারী ও ভিতরের দর্শকের মাঝে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কোন তফাৎ নেই (মি'রাজুদ দিরায়া)। শাওয়ালের চাঁদ রমযান মাসের উনত্রিশতম দিনে তালাশ করবে। শাওয়ালের চাঁদ মাত্র এক ব্যক্তি দেখলে ইবাদতে সাবধানতাবশত রোযা ভঙ্গ করবে না। রোযা ভাঙ্গলে শুধু কাযা আদায় করবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। এক ব্যক্তি ঈদের চাঁদ দেখেছে এবং সাক্ষীও দিয়েছে, কিন্তু তার সাক্ষী গৃহীত হয়নি, এ অবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হল রোযা রাখা। যদি সে ঐ দিন রোযা ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর কাযা জরুরী, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি এ ব্যক্তি তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন বন্ধুর সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর বন্ধুটি তার কথা বিশ্বাস করে কোন কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি একা বাদশাহ্ বা কাযী (বিচারক) শাওয়ালের চাঁদ দেখে, তবে ঈদগাহে রওয়ানা দিবে না, লোকদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুমও দিবে না এবং রোযাও গোপনে বা প্রকাশ্যে ভাঙ্গবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আকাশে যদি মেঘ থাকে, তবে ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার কম সংখ্যকের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এ ক্ষেত্রে সাক্ষীগণের আযাদ হওয়া এবং শাহাদাত সাক্ষ্য শব্দ উচ্চারণ করা শর্ত (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে বলে শহরের বাইরে থেকে দুই ব্যক্তি এসে খবর দেয় এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এ অবস্থায় যদি গর্ভর্নর অথবা কাযী না থাকে, তবে গ্রামবাসীর জন্য রোযা ছেড়ে দিতে কোন বাধা নেই (যাহিদী)।

এ দু'ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত (নিকায়া)। অবশ্য দাবী করা শর্ত নয়। যিনার অপবাদ দেওয়ার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাওবা করলেও তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আকাশ যদি পরিষ্কার হয়, তবে রমযানের চাঁদ দেখার হুকুমের মত একদল লোক এই চাঁদ দেখার সাক্ষী না দিলে তা গৃহীত হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন, কাফী)-। শায়খুল ইসলাম (র) উল্লেখ করেছেন যে, অন্য স্থান থেকে এলে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হবে (যাখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ ঈদুল আযহার চাঁদ দেখার হুকুম যাহিরী রিওয়ায়েত মতে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার হুকুমের মতই। এটিই বিশুদ্ধতম কথা (হিদায়া)। এ দু'মাস ছাড়া অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বেলায় অনুরূপ হুকুম হবে। দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা যারা বিশ্বাসযোগ্য, আযাদ এবং যিনার অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত নয়, এরূপ লোক সাক্ষ্য না দিলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক) হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন, যদি এক ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা হয় আর ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও চাঁদ দেখা না যায়, তবে সাবধানতাবশত রোযা ছেড়ে দিবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, রোযা ছেড়ে দিবে (তাবয়ীন)।

গায়াতুল বায়ানে উল্লেখ আছে, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত বিশুদ্ধ (আন্ নাহরুল ফায়িক) শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন,এমতানৈক্য হল, আকাশ পরিষ্কার অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলে অবশ্য আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তবে ঐক্যবদ্ধ মতে রোযা ছেড়ে দিবে (যখীরা)। একথাই অধিক গ্রহণযোগ্য (তাব্য়ীন)। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায়, যদি দু'ব্যক্তি রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এতে ত্রিশ দিন রোযা রাখার পর যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে ঐক্যবদ্ধ মতে পরবর্তী দিন রোযা ছেড়ে দেবে। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে এরূপ রোযা ছেড়ে দেবে (মুহীত)। সাক্ষীগণ যদি রমযানের উনত্রিশতম দিনে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তোমাদের রোযা রাখার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছি, এতে সাক্ষীগণ উক্ত শহরের অধিবাসী হলে বাদশাহ তাদের কথা গ্রহণ করবেন না। কারণ, তারা পুণ্য বর্জনকারী। আর যদি তারা দূর থেকে এসে থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্যদান জাইয হবে। কারণ, তারা অভিযুক্ত নয় (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ যাহিরী রিওয়ায়েত মতে উদয়স্থলসমূহের ভিন্নতা ধর্তব্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র)-এর ফাতওয়া এরই উপর। শামসুল আইম্মা হালওয়ানীও এর উপর ফাতওয়া দিতেন। তিনি বলেন, পশ্চিম এলাকার লোকজনের চাঁদ দেখায় পূর্ব এলাকার লোকের উপর রোযা রাখা ওয়াজিব (খুলাসা)। যারা পরে চাঁদ দেখেছে, তাদের উপর রোযা ঐ সময় ওয়াজিব হবে, যখন তাদের চাঁদ দেখা পূর্ণ মাত্রায় স্থির হয়ে যায়। যদি একদল লোক সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক শহরের অধিবাসিগণ তোমাদের একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছে এবং রোযা রেখেছে, যদি রোযা রাখার হিসাবে এদিন ত্রিশতম দিন হয় আর ঐ লোকেরা চাঁদ না দেখে, তবে পরবর্তী দিন রোযা ভাঙ্গা জাইয হবে না এবং ঐ রাত তারাবীহও ছাড়বে না। কারণ, ঐ লোকেরা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়নি এবং অন্য লোকের সাক্ষ্যের উপরও সাক্ষ্য দেয়নি বরং অন্য লোকের চাঁদ দেখার বিবরণ দিয়েছে। যদি ঐ লোকেরা এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক শহরের কাযীর নিকট অমুক রাতে দু'ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুসারে আদেশ দিয়েছেন, তাহলে ঐ কাযীর জন্য জাইয আছে তাদের সাক্ষ্যের অনুকূলে হুকুম দেওয়া। একারণে যে, কাযীর ফায়সালা দলীল হয়ে থাকে। আর ঐ লোকেরা কাযীর ফায়সালা দানের সাক্ষ্য দিয়েছে (ফাতহুল কাদীর)। যদি কোন শহরের লোকজন চাঁদ না দেখে রমযানের রোযা রাখা শুরু করে এবং আটাইশটি রোযা রাখার পর শাওয়ালের চাঁদ দেখে, এতে যদি তারা শা'বানের চাঁদ দেখে পূর্ণ ত্রিশ দিন গণনা করে আর রমযানের চাঁদ না দেখে, তবে একদিনের রোযার কাযা আদায় করবে। আর রমযানের উনত্রিশটি রোযা রাখার পর যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখে, তবে কোন রোযার কাযাই জরুরী হবে না। শাবানের চাঁদের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর শাবানের চাঁদ না দেখে রোযা রাখলে দু'দিনের কাযা করতে হবে (খুলাসা)। যদি কোন শহরের লোক রমযানের চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে আর তাতে কোন লোক অসুস্থতার দরুন রোযা রাখতে না পারে, তবে তার উপর উনত্রিশের কাযা করা জরুরী। যদি অসুস্থ ব্যক্তিটি জানতে না পারে যে, শহরবাসী কতটি রোযা রেখেছে, তবে সে ত্রিশটি রোযার কাযা করবে, যাতে ইয়াকীনের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রোযাদারের জন্য যা মাকরূহ্ এবং যা মাকরূহ্ নয়

১. মাসআলা ঃ আঠা জাতীয় বস্তু চিবানো রোযাদারের জন্য মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও মুতূন)। আমাদের ফকীহ্গণ বলেন, এ মাসআলাটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আঠা জাতীয় বস্তু যদি মসৃণ না হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি তা মসৃণ হয় আর কালো বর্ণের হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তা সাদা বর্ণের হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু কিতাবে তার বিশ্লেষণ নেই (মুহীত)। বিনা ওযরে কোন কিছুর স্বাদ নেওয়া এবং চিবানো মাকরূহ্ (কান্য)। ওযরসমূহের মধ্যে একটি হল, মহিলার স্বামী বা দাসীর মুনীব বদমিযাজী হওয়ার কারণে পাকানো সুরবার স্বাদ পরীক্ষা করে দেখা। অপর ওযর হল, যদি কেউ হায়েয বা নিফাসওয়ালী কিংবা বে-রোযাদার অন্য এমন কাউকে না পায় যে, তার শিশুকে চিবিয়ে খাবার দিবে আর যদি তার কাছে পাকানো নরম খাবার এবং দুধও না থাকে, এমতাবস্থায় মায়ের জন্য শিশুর খাদ্য চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ্ নয় (আন্ নাহরুল ফায়িক)। তাজনীসে উল্লেখ আছে যে, স্বাদ পরীক্ষা করা ফরয রোযা অবস্থায় মাকরূহ্, নফল রোযায় এরূপ করাতে কোন ক্ষতি নেই (নিহায়া)। মধু এবং তৈল খরীদ করার সময় ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য স্বাদ গ্রহণ করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কেউ বলেন, তা খরীদ করা জরুরী হলে অথবা ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে স্বাদ যাচাইয়ে কোন ক্ষতি নেই (যাহিদী)।

২. মাসআলা ঃ রোযাদারের জন্য ইসতিনজা করার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ঢালা মাকরূহ্ (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। অনুরূপ নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করার সময় সীমাতিরিক্ততাও মাকরূহ্। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ততার অর্থ হল, মুখে বেশী পরিমাণ পানি আটকে রাখা এবং তাতে মুখ ভরে যাওয়া। কুলির সময় গড়গড়া করা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় (মুহীত)। রোযাদার যদি পানিতে মলত্যাগ করে অথবা বায়ু ছাড়ে, তবে এতে রোযা ফাসিদ হবে না।কিন্তু মাকরূহ্ হবে (আল-মিরাজুদ্ দিরায়া)। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, উযূ ব্যতীত রোযাদারের জন্য কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, গোসল করা, মাথায় পানি ঢালা, পানির ভিতর বসা ও ভেজা কাপড় গায়ে চড়ানো মাকরূহ্। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, মাকরূহ্ নয়। তাঁর কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য (মুহীত ঃ সুরুখসী)। রোযাদারের জন্য মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা মাকরূহ্ (যাহীরিয়্যা)। কাঁচা ও শুকনো ডালের মিসওয়াক দ্বারা সকাল-সন্ধ্যায় মিসওয়াক করাতে আমাদের মাযহাবে কোন দোষ নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, পানিতে ভিজানো মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ্। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তাতে কোন দোষ নেই। সবুজ রঙয়ের ভেজা মিসওয়াক দ্বার মিসওয়াক করাতে কারো মতেই কোন দোষ নেই

(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সুরমা লাগানো ও মোচে তৈল দেওয়াতেও কোন দোষ নেই (কান্য)। এ হুকুম ঐ সময় হবে, যখন সুরমা ও তৈল দ্বারা সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়। সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য হলে মাকরূহ্ হবে (আন-নাহরুল ফায়িক)। মাকরূহ্ হওয়ার বেলায় বে-রোযাদার ও রোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুর্বলতার ভয় না হলে রোযাদারের শরীর থেকে সিঙ্গা দ্বারা রক্ত বের করাতে কোন দোষ নেই। আশংকা থাকলে রক্ত বের করা মাকরূহ্। রোযাদারের জন্য উচিত হল, মাগরিবের সময় হলে সিঙ্গা লাগানো। শায়খুল ইসলাম (র) উল্লেখ করেছেন, সিঙ্গা দ্বারা রক্তবের করা মাকরূহ্ ঐ অবস্থায় যখন দুর্বলতার দরুন রোযা ভাঙ্গার আবশ্যকতা দেখা দেয়। রক্ত মোক্ষণ করার হুকুম হল, সিঙ্গা দ্বারা রক্ত বের করার হুকুমের অনুরূপ (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ সহবাসের কামনা ও বীর্যপাত হওয়ার আশংকা না হলে চুম্বন করাতে কোন দোষ নেই। নিরাপদ না হলে মাকরূহ্। স্পর্শ করার হুকুম সর্বক্ষেত্রে চুম্বন করার হুকুমের অনুরূপ (তাবয়ীন)। স্ত্রীর ওষ্ঠদ্বয় চোষণ করে চুমু খাওয়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ্। লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে সহবাস করা এবং স্ত্রীর গায়ে গা লাগানোর হুকুম যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে চুমু খাওয়ার হুকুমের মতই। কেউ কেউ বলেন, সহবাসের ভয় না হলেও মুবাশারাতে ফাহিশা মাকরূহ্। একথাই শুদ্ধ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। "মুবাশারাতে ফাহিশা" হল, উলঙ্গ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে জড়িয়ে স্বামীর লজ্জাস্থান দিয়ে স্ত্রীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করা। এরূপ করা মাকরূহ্। এতে কারো দ্বিমত নেই (মুহীত)। যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে অথবা অতিশয় বৃদ্ধ হলে পরস্পর আলিঙ্গন করাতে কোন দোষ নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। জুনুবী অবস্থায় ভোর হয়ে গেলে অথবা দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে রোযার কোন ক্ষতি নেই (মুহীত) সুরুখসী)।

৪. মাসআলা ঃ সাহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব। সাহরীর সময় হল রাতের শেষ অংশ। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, সাহরীর সময় হল রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বিলম্বে সাহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব (নিহায়া)। সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ্ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্-হাজ)। ইফতারের সময় হলে বিলম্ব না করে ইফতার করা উত্তম। সুতরাং নামাযের পূর্বে ইফতার করা মুস্তাহাব। ইফতারের সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়া সুন্নাত।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَصَوْمَ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি, তোমারই উপর ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি এবং তোমারই দেওয়া রিযিকের দ্বারা ইফতার করেছি। রমযান মাসের আগামীকালের রোযার নিয়্যাত করলাম। আমি আগে-পিছে যা গুনাহ্ করেছি, তা মাফ কর (মি'রাজুদ দিরায়া)। যে দিনের ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, এ দিনটি রমযানের দিন, না শা'বানের দিন। এদিনকে সন্দেহের দিন বলে। এ দিনে রমযানের নিয়্যাতে বা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যাতে রোযা রাখা মাকরূহ্ (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। মাকরূহ্ হওয়ার দিক থেকে দ্বিতীয়টি

pdf By Syed Mostafa Sahib

প্রথমটি থেকে কম গুরুতর (হিদায়া)। এরূপ নিয়্যাত করে রোযা রাখার পর যদি ঐ দিনটি রমযানের বলে প্রমাণিত হয়, তবে উভয় অবস্থাতেই রমযানের রোযা আদায় হবে। আর যদি ঐ দিনটি শাবানের দিন প্রমাণিত হয়, তবে প্রথম অবস্থায় তা নফল হয়ে যাবে। যদি ঐদিনে রোযা ভঙ্গ করে, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর দ্বিতীয় অবস্থায় যা নিয়্যাত করবে তাই আদায় হবে। এটিই সহীহ্ অভিমত (কাফী)। দ্বিতীয় অবস্থায় রোযার নিয়্যাত করার পর যদি রমযান বা শাবান কিছুই প্রমাণিত না হয়, তবে সে যা নিয়্যাত করবে তা আদায় হবে না এতে কারো দ্বিমত নেই (মুহীত)। সন্দেহের দিন নফল রোযার নিয়্যাতে রোযা রাখাতে শুদ্ধ মতে কোন দোষ নেই। নফলের নিয়্যাত করার পর যদি রমযান প্রমাণিত হয়, তবে রমযানের রোযা আদায় হবে। আর শাবান প্রমাণিত হলে, নফল রোযা আদায় হবে। নিয়্যাত করার পর যদি রোযা ভঙ্গ করা হয়, তবে কাযা করা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে নিজের উপর এই রোযা রাখাকে আবশ্যক ধরে শুরু করেছিল (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ সন্দেহের দিন অনির্দিষ্ট নিয়্যাতে রোযা রাখা মাকরূহ্। অনির্দিষ্ট নিয়্যাতে রোযা রাখার পর যদি ঐ দিন শাবানের দিন প্রমাণিত হয়, তবে তার রোযা নফল হবে। আর যদি রমযানের দিন প্রমাণিত হয়, তবে রমযানের রোযা আদায় হবে (মুহীত)। মূল নিয়্যাতেই যদি সন্দেহ হয়, যেমন নিয়্যাত করল যে, আগামীকাল রমযান হলে রোযা রাখবে আর শাবান হলে রোযা রাখবে না, এরূপ নিয়্যাতে রোযা হবে না। আর যদি নিয়্যাতের মান নির্ণয়ে সন্দেহ হয়, যেমন নিয়্যাত করল, আগামীকাল রমযান হলে রমযানের রোযা আর শাবান হলে অন্য ওয়াজিব রোযা রাখবে অথবা নিয়্যাত করল, আগামীকাল রমযান হলে রমযানের রোযা আর শাবান হলে নফল রোযা রাখবে, এরূপ নিয়্যাত করাও মাকরূহ্। এরূপ নিয়্যাত করার পর যদি রমযান প্রমাণিত হয়, তবে উভয় অবস্থাতেই রমযানের রোযা আদায় হবে। আর যদি শাবান প্রমাণিত হয়, তবে প্রথম তরীকার নিয়্যাতে ওয়াজিব রোযা আদায় হবে না। বরং তা নফল হয়ে যাবে। আর এ রোযা ভঙ্গ করলে কাযাও ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ সন্দেহের দিন হল, যদি ত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় চাঁদের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত না হয় এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (তাবয়ীন)। অথবা একজন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়ায় তার সাক্ষ্য গৃহীত হয়নি কিংবা দু'জন ফাসিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়ায় তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়নি। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে আর কেউ চাঁদ না দেখে, তবে ঐদিন সন্দেহের দিন বলে গণ্য হবে না (যাহিদী)। সন্দেহের দিন রোযা রাখা উত্তম, অথবা না রাখা উত্তম? এ ব্যাপারে ফকীহ্-গণের মতবিরোধ রয়েছে। তারা বলেন, যদি শাবান মাসটিতে কারো রোযা রাখার অভ্যাস থাকে অথবা পূর্ব হতে তার ঐ দিন রোযা রাখার অভ্যাস ছিল এরূপ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। কারো যদি শাবান মাসের শেষ তিন দিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকে, তবে তার জন্যও রোযা রাখা উত্তম। পূর্ব থেকে এরূপ অভ্যাস না থাকলে কোন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম হবে কিনা? এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। ফকীহ্গণের মতে খাস অর্থাৎ বিশিষ্ট লোকদের জন্য রোযা রাখা উত্তম (তাহযীব)। আর আম অর্থাৎ সাধারণ লোকদেরকে দুপুরের

pdf By Syed Mostofa Sakib

পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও সহবাস থেকে বিরত থাকার ফাতওয়া প্রদান করা হবে। কেননা, এ অবস্থায় রমযান মাস প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু দুপুরের পর চাঁদ দেখার আর কোন সম্ভাবনা নেই (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)। একথাই সহীহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। 'আম অর্থাৎ সাধারণ লোক, খাস অর্থাৎ বিশিষ্ট লোকের মাঝে পার্থক্য হল, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখার নিয়্যাত জানে, সে খাস লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আর নিয়ত না জানা ব্যক্তি আম লোকের অন্তর্ভুক্ত। সন্দেহের দিনের নিয়্যাতের পদ্ধতি হল, যে ব্যক্তির ঐ দিন রোযা রাখার অভ্যাস নেই, সে নফল রোযার নিয়্যাত করবে এবং অন্তরে এ ধারণা রাখবে না যে, আগামীকাল রযমান হলে তা রমযানের রোযা হবে (মিরাজুদ দিরায়া)। কোন ব্যক্তি সন্দেহের দিনে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত রোযার বিপরীত কোন কাজে লিপ্ত হল না। তারপর ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলল। পরে প্রমাণিত হল, এ দিন রমযানের দিন, আর এতে সে রোযার নিয়্যাত করে নিল। এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে ফাতাওয়ায় উল্লেখ আছে যে, তার রোযা জাইয হবে না (যহীরিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ দুই ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা মাকরূহ্। এতদ্-সত্ত্বেও এ দিনগুলোতে কেউ রোযা রাখলে আমাদের মাযহাব মতে ঐ ব্যক্তি রোযাদার বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এই দিনগুলোতে রোযা শুরু করে পরে ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়া-জিব হবে না (কানয)। এটি ইমামত্রয়ের যাহিরী রিওয়ায়েত। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর এক রিওয়ায়েত মতে কাযা করা ওয়াজিব (আন নাহ্রুল ফায়িক)। পৃথক পৃথকভাবে অথবা লাগাতার শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মাকরূহ্। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে শাওয়ালে লাগাতার ছয়টি রোযা রাখা মাকরূহ্। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে রাখলে মাকরূহ্ হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালের ফকীহ্গণের মতে তাতে কোন দোষ নেই (আল-বাহ্রুর রায়িক) সহীহ্ কথা হল, তাতে কোন দোষ নেই (মুহীত ঃ সুরূখসী)। প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে মাসে সর্বমোট ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব (যহীরিয়্যা)। সাওমে বেসাল মাকরূহ্। তা হল সারা বছর রোযা রাখা। নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও রোযা বর্জন না করা। নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদ দিয়ে পূর্ণ বছর রোযা রাখলে পসন্দনীয় মতে কোন দোষ নেই (খুলাসা)। রাত এবং দিনের আহার গ্রহণ না করে অনবরত কতেক দিন রোযা রাখা মাকরূহ্ (সিরাজ)। উত্তম হল, একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা বর্জন করা (খুলাসা)। শনিবার এবং রোববারের রোযার ব্যাপারে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এদিনগুলোর সম্মান উদ্দেশ্য না হলে, তাতে কোন দোষ নেই (যখীরা)। নায়রুজ ও মেহেরজান দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ্ যদি পূর্ব অভ্যাসের সাথে ঐ দিনগুলো মিলে না যায়। এদিনে রোযার গুরুত্বের ব্যাপারে কথা হল, যদি পূর্বে বিশেষ দিনে নফল রোযা রাখার অভ্যাস থাকে আর ঘটনাক্রমে অভ্যাসের সাথে এদিনের মিল হয়ে যায়, তবে ঐদিন রোযা রাখা উত্তম। নতুবা রোযা না রাখা উত্তম। কারণ, এতে ঐদিনের সম্মান করার সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর তা হল হারাম (যহীরিয়্যা)। এটাই পছন্দনীয় কথা (মুহীত ঃ সুরুখসী)

৮. মাসআলা ঃ রোযা রাখা অবস্থায় কথা না বলে চুপ থাকা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা মাকরূহ্। অবশ্য স্বামী অসুস্থ, রোযাদার,

হজ্জ অথবা উমরার ইহরামকারী হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে। মুনীব যে অবস্থায়ই থাকুক, তার অনুমতি ছাড়া গোলাম ও বাঁদীর রোযা রাখার অনুমতি নেই। মুদাব্বার পুরুষ ও মহিলা এবং উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুমতি ছাড়া যদি স্ত্রী নফল রোযা রাখে, তবে স্বামী তার রোযা ভাঙ্গাতে পারবে এবং স্বামী অনুমতি দেওয়ার পর অথবা বায়িন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী সে রোযার কাযা করবে। গোলাম ও বাঁদী যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া রোযা রাখে, তবে মুনীব তা ভাঙ্গাতে পারবে। মুনীব অনুমতি দেওয়ার পর অথবা আযাদ করে দেওয়ার পর তারা তা কাযা করবে। স্বামী যদি অসুস্থ হয়, রোযাদার হয় অথবা ইহরামকারী হয়, তবে স্ত্রীকে নফল রোযা রাখা থেকে মানা করার তার অধিকার নেই। স্বামী নিষেধ করলে স্ত্রীর রোযা রাখার অধিকার আছে। গোলাম ও বাঁদীর হুকুম এরূপ নয়। কারণ মুনীব সর্বাবস্থায় তাদেরকে নফল রোযা থেকে বারণ করতে পারে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। গোলামের নিজের কারণে যে সকল রোযা তার উপর ওয়াজিব হয়, যেমন নফল, তার হুকুমও অনুরূপ। যিহারের রোযার হুকুম পৃথক (খুলাসা)। মুসতাজির তথা মালিকের অনুমতি ছাড়া শ্রমিক নফল রোযা রাখতে পারবে না। যদি রোযা রাখায় তার কাজের ক্ষতি সাধিত হয়। যদি মালিকের কাজের কোন ক্ষতি না হয়, তবে তার অনুমতি ছাড়া রোযা রাখতে পারবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। ব্যক্তির কন্যা, মা ও তার বোন ঐ ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। রোযা রাখায় যদি মুসাফিরের কষ্ট হয়, তবে তার জন্য রোযা রাখা মাকরূহ্। যদি কষ্ট না হয় এবং তার সাথীগণ অথবা অধিকাংশ সাথী রোযা বর্জনকারী না হয়, তবে রোযা রাখা উত্তম। যদি তার সাথীগণ অথবা অধিকাংশ সাথী বেরোযা হয় আর খাওয়া খরচা তাদের মাঝে শরীকানা ভিত্তিতে হয়, তবে রোযা না রাখা উত্তম। (যহীরিয়্যা)। রোযাদার অবস্থায় যদি মুসাফিরের ভোর হয়। আর সে তার শহরে প্রবেশ করে অথবা অন্য শহরে প্রবেশ করে মুকীম হওয়ার নিয়্যাত করে, তবে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। রমযানের কাযা রোযা যার উপর ওয়াজিব, তার জন্য নফল রোযা রাখা মাকরূহ নয় (মি'রাজুদ দিরায়া)।

৯. মাসআলা ঃ তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের আইয়ামে বীযের রোযা মুস্তাহাব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সকল আলিমের মতে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ন্যায় শুধু জুমুআ বারে রোযা রাখাও মুস্তাহাব (আল-বাহরুর রায়িক)। প্রতি আশহুরুল হুরুমে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আশহুরুল হুরুম হল চার মাস, যথাক্রমে যিলকা'দা, যিলহাজ্জ, মুহাররম ও রজব। তিন মাস লাগাতার ও এক মাস পৃথক। যিলহাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা হলে হজ্জব্রত পালনকারীর জন্য 'আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ্ (আল-বাহরুর রায়িক)। তারবিয়ার দিনের (যিলহাজ্জ মাসের ৮ম তারিখ) হুকুমও অনুরূপ। কারণ, এ দিনের রোযায় হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি হজ্জের কার্যাবলী আদায় করা থেকে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মুস্তাহাব রোযা অনেক প্রকার

প্রথম হল মুহাররমের রোযা, দ্বিতীয় হল, রজব মাসের রোযা, তৃতীয় হল শাবান মাসের রোযা ও আশূরার রোযা। অধিকাংশ আলিম ও সাহাবীগণের মতে মুহাররমের দশ তারিখ হচ্ছে আশূরার দিন (যহীরিয়্যা)। সুন্নাত হল, 'আশূরার রোযার সাথে মুহাররমের নবম তারিখেও রোযা রাখা (ফাতহুল কাদীর)। শুধুমাত্র আশূরার রোযা রাখা মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখসী)। গ্রীষ্মের দিন বড় হওয়ায় এবং তাতে তাপ বেশী থাকার দরুন এই দিনগুলোতে রোযা রাখাও মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ রোযা ফাসিদ হওয়ার এবং না হওয়ার কারণসমূহ

১. মাসআলা ঃ যেসব কারণে রোযা ফাসিদ হয়, তা দুই ভাগে বিভক্ত। ১. যাতে কাযা ওয়াজিব হয় কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। রোযা রাখার কথা ভুলে গিয়ে যদি রোযাদার কোন কিছু খায় অথবা পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। এক্ষেত্রে ফরয ও নফলের মাঝে কোন তফাৎ নেই (হিদায়া)। রোযার কথা ভুলে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি খেতে লাগে আর তাকে কেউ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে যে, "তুমি তো রোযাদার", তবে সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে ঐ ব্যক্তির রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কেউ রোযাদারকে দেখতে পেল ভুলবশত খানা খাচ্ছে এরূপ অবস্থায় যদি রোযাদারকে দেখা যায় যে, সে রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করতে সক্ষম, তবে ফকীহ্গণের পছন্দকৃত মতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া মাকরূহ্। আর যদি মনে করা হয় যে, ঐ ব্যক্তি রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে পড়বে যেমন, সে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, তবে তাকে স্মরণ না করিয়ে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই (যহীরিয়্যা)। জবরদস্তি করার কারণে অথবা খাতা করে হঠাৎ কোন কিছু খেয়ে ফেললে কাযা করা ওয়াজিব, কাফ্ফারা ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খাতা করার অর্থ হল, যার রোযার কথা স্মরণ আছে কিন্তু রোযা ভাঙ্গার তার ইচ্ছা নেই, তা সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু খেয়ে ফেলল অথবা পান করল (আন্ নাহরুল ফায়িক)। আর ভুল করা হল, এর বিপরীত। (নিহায়া, আল-বাহরুর রায়িক)।

২. মাসআলা ঃ রোযাদার যদি রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে অথবা সহবাস করে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। এতে ফরয ও নফল রোযার মাঝে কোন তফাৎ নেই (হিদায়া)। কুলি করার সময় অথবা নাকে পানি দেওয়ার সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় যদি হঠাৎ পানি পেটে প্রবেশ করে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং কাযাও ওয়াজিব হবে। রোযার কথা ভুলে গেলে রোযা ফাসিদ হবে না (খুলাসা)। একথাই নির্ভরযোগ্য। কোন লোক যদি রোযাদারের প্রতি কোন জিনিস ছুঁড়ে মারে, এতে তার গলার ভেতর যদি জিনিসটি ঢুকে যায়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সে খাতাকারীর ন্যায়। অনুরূপ গোসল করার সময় যদি পানি গলায় প্রবেশ করে, তবে রোযা ফাসিদ হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩. মাসআলা ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যদি কোন কিছু পান করে, তবে তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। ঘুমন্ত ব্যক্তির হুকুম অবিকল ভুলকারীর মত নয়। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তি অথবা পাগল যদি যবেহ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে, তবে তার যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল নয়, কিন্তু ভুলে যাওয়া ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সাধারণত যে সব বস্তু খাওয়া হয় না বা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় না, তা যদি কেউ গিলে ফেলে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যেমন ঃ পাথর ও মাটি (তাবয়ীন)। নুড়ি পাথর খেজুরের মাটি, তুলা, ঘাস ও কাগজ গিলে ফেললে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)। অম্ল ফল জাতীয় কোন বস্তু যা এখনো পাকেনি এবং তা সিদ্ধ করা হয়নি এ জাতীয় কোন কিছু খেয়ে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কাঁচা আখরোট গিলে ফেললেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আন্ নাহরুল ফায়িক)। শুকনো আখরোট বা শুকনো বাদাম গিলে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। ডিম অথবা আনার ছিলকাসহ গিলে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)। তাজা পেস্তা আখরোটের সমপর্যায়ের শুকনো পেস্তা যদি চর্বণ করা হয় আর তার মাঝে সার থাকে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। চর্বণ ব্যতীত তা গিলে ফেললে কারো মতেই চর্বণকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। পেস্তার মাথা ফাটানো থাকলে অধিকাংশ ফকীহ্র মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খরবুজার বাকল যদি খেয়ে ফেলা হয় আর তা শুকনো থাকে অথবা এমন অবস্থায় থাকে যা দেখতে ঘৃণা হয়, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি এমন তাজা থাকে যা দেখতে ঘৃণা হয় না, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। চাউল বা বাজরা খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (যখীরা)। ডাল এবং মাষকলাই খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (যাহিদী)। মাথা ধৌত করা যায় এরূপ মাটি খেলে রোযা ফাসিদ হবে। এরূপ মাটি খাওয়া ঐ ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। দাঁতসমূহের ফাঁকে যা আটকে থাকে, তা যদি অল্প হয়, তবে তা খেয়ে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে না। বেশী হলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। বুট বা বুটের চেয়ে বড় হলে, তা হল বেশী আর বুটের চেয়ে কম হলে তা অল্প বলে গণ্য হবে। দাঁত থেকে বের করে হাতে নিয়ে খেয়ে ফেললে রোযা ফাসিদ হওয়াই বাঞ্ছনীয় (কাফী)। এ ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। ফকীহ্ (র) বলেন, অধিকতর শুদ্ধ হল, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)। দাঁত থেকে বের করে তিল গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে না। কারণ, এটা অল্প। অবশ্য বাইর থেকে নিয়ে গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে। এজন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। চর্বণ না করে গিলে ফেললে পসন্দনীয় মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (গিয়াছিয়া, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) একথাই সহীহ্ (মুহীত ঃ সুরুখসী)। তিল চর্বণ করে গলদেশে তার স্বাদ অনুভূত না হলে রোযা ফাসিদ হবে না। অবশ্য গলায় স্বাদ অনুভব হলে রোযা ফাসিদ হবে। এটিই উত্তম অভিমত। আর স্বল্প পরিমাণ বস্তু চর্বণ করার ক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি (ফাতহুল কাদীর)। গমের একটি দানা চর্বণ করলে রোযা ফাসিদ হবে না। তা মুখের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে অন্যের চর্বণকৃত একটি লুকমা গিলে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ওয়াজিয কুরদারী) সাহ্রী খাওয়ার পর একটি লুকমা মুখের ভিতর রয়ে গেল আর এ অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেল। তারপর তা গিলে ফেলল অথবা ভুলক্রমে খাওয়ার উদ্দেশ্যে

একখণ্ড রুটি মুখে নিয়ে তা চর্বণ করার সময় স্মরণ হল যে, সে রোযাদার। এ অবস্থায় রোযার কথা স্মরণ হওয়ার পরও সে তা গিলে ফেলল। এ ব্যাপারে অনেক ফকীহ্ বলেন, ঐ ব্যক্তি তা বের করার পূর্বে গিলে ফেললে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর তা বের করে যদি পুনঃ গিলে ফেলে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। একথাই সহীহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ অন্যের থুথু গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে। তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য বন্ধুর থুথু গিললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। হাত থেকে নিয়ে নিজের থুথু নিজে গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ওয়াজিয কুরদারী)। কথা বলার সময় নিজের থুথু অথবা অন্যের থুথুতে উভয় ঠোঁট ভিজে গেল, তারপর তা গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে না। কারণ, এ থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব (যাহিদী)। মুখের ভিতর থেকে লালা বের হয়ে যদি চিবুক পর্যন্ত গড়িয়ে যায় আর তা বন্ধ না হয়, তারপর তা মুখের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে গিলে ফেলে, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, তাতে বের হওয়া পূর্ণ হয়নি। থুথু বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে এ হুকুমের বিপরীত হবে (যহীরিয়্যা) হুজ্জত গ্রন্থে লিখিত আছে, এক ব্যক্তির রোগের কারণে মুখ থেকে পানি বের হয়ে আবার তা মুখে প্রবেশ করে গলার ভিতর চলে গেলে তাতে তার রোযা ফাসিদ হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কুলি করার পর মুখে কিছু আর্দ্রতা বাকী থাকলে এবং তা থুথুর সাথে গিলে ফেললে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। নাকের শ্লেষ্মা যদি নাক দিয়ে মাথায় চলে যায়, তারপর স্বেচ্ছায় শ্বাস টানার কারণে তা যদি গলায় প্রবেশ করে, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, তা থুথুর সমপর্যায়ের (মুহীত ঃ সুরুখসী)। রক্ত যদি খেয়ে ফেলে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে কাযা করা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, স্বভাবত তা ঘৃণিত (যহীরিয়্যা)। দাঁত থেকে যদি রক্ত বের হয় আর তা গলার ভিতর প্রবেশ করে, এতে যদি থুথুর অংশ বেশী হয়, তবে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি রক্তের অংশ বেশী হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রক্ত এবং থুথু যদি সমান সমান হয়, তবে ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন রোযাদার ব্যক্তি রেশমের কাজ করার সময় যদি রেশম মুখের ভিতর প্রবেশ করায় এবং তা হতে সবুজ, হলুদ অথবা লাল রং বের হয় আর তা থুথুর সাথে মিশে গিয়ে থুথু সবুজ, হলুদ অথবা লাল হয়ে যায়, এ অবস্থায় রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সে যদি তা গিলে ফেলে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। সার দুধ চুষার সময় যদি থুথু গলার ভিতর প্রবেশ করে, তবে রোযা ফাসিদ হবে না যতক্ষণ না, মূল দুধ গলার ভিতর প্রবেশ করবে (যহীরিয়্যা)। চিনি চুষার সময় যদি পানি গলার ভিতর পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যে সব বস্তু খাওয়া হয় না এবং তা থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় যেমন মশা, তা যদি রোযাদারের পেটে চলে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না (ঈযাহুল কিরামানী, মশা ধরে যদি খেয়ে ফেলে, তবে কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (শারহুত্তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ হাই তোলার সময় মুখ উপরের দিকে করার পর যদি ছাদ থেকে পানির ফোঁটা গলার ভিতর পতিত হয়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)। বৃষ্টি ও বরফ যদি গলায় প্রবেশ করে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। একথাই সহীহ্ (যহীরিয়্যা)। পেষণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করার সময় ধুলোবালি অথবা ঔষধের স্বাদ অথবা ধুয়া অথবা বাতাস কিংবা যানবাহন তীব্র বেগে চলার দরুন যে ধূলিকণা উড়ে, তা গলার ভিতর প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এক ফোঁটা বা দু' ফোঁটা পরিমাণ অশ্রু রোযাদারের মুখের ভিতর প্রবেশ করলে রোযা ফাসিদ হয় না। যদি অশ্রুর পরিমাণ বেশী হয়, যার ফলে মুখে লোনা ভাব অনুভূত হয়, এ জাতীয় পানি কিছুক্ষণ মুখে জমা থাকার পর তা গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। চেহারার ঘাম রোযাদারের মুখের ভিতর প্রবেশ করলেও অনুরূপ হুকুম হবে (খুলাসা)। তেলের কারণে শরীরে যে ঘাম হয় তা গলার ভিতর প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না (শারহুল মাজমা)। পানিতে গোসল করার সময় পানির শীতলতা পেটের ভিতর অনুভূত হলে রোযা ভঙ্গ হয় না (আন্ নাহরুল ফায়িক)। চোখের ভিতর সামান্য ঔষুধের ফোঁটা প্রবেশ করলে আমাদের মাযহাব মতে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও তার স্বাদ গলায় অনুভূত হয়। থুথু ফেলার সময় যদি থুথুর মাঝে সুরমার চিহ্ন ও তার রং দেখা যায়, তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে রোযা ফাসিদ হবে না (যখীরা)। একথাই সহীহ্ (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ স্বাভাবিক ভাবে অথবা ইচ্ছা করে মুখ ভরে অথবা মুখ ভরার কম পরিমাণ বমি করলে এবং তা নিজে নিজে ভিতরে ফিরে গেলে অথবা ইচ্ছা করে ভিতরে ফিরালে কিংবা বের করে ফেললে সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে রোযা ভঙ্গ হয় না। অবশ্য ইচ্ছা করে ফিরিয়ে নিলে এবং ইচ্ছা করে বমি করলে মুখ ভরার শর্তে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। খাদ্যজাত দ্রব্য বা পানীয় দ্রব্য কিংবা অম্লজাত দ্রব্য বমি করলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। বমি যদি কাশির হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন--যদি কাশির বমি মুখ ভরে হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর এ কথা তরফায়নের কথার চেয়ে তুলনামূলক উত্তম (ফাতহুল কাদীর)। ডুষ নিলে, নাকের ভিতর ঔষধ দিলে অথবা কানের ভিতর তেলের ফোঁটা দিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)। আর যদি চেষ্টা ছাড়া অমনিই তেল ঢুকে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত সুরুখসী)। কানের ভিতর পানির ফোঁটা দিলে রোযা ভঙ্গ হবে না হিদায়া)। একথাই সহীহ্ (মুহীত সুরুখসী)। লিঙ্গের ছিদ্রের ভিতর ফোঁটা দিলে আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না (মুহীত)। ফোঁটা পানির হোক কিংবা তেলের। এ মতানৈক্য তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পানি মূত্রথলির ভিতর পৌঁছে যায়। পানি যদি মূত্রথলিতে না পৌঁছে বরং এর বহির্ভাগে আটকে থাকে, তবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার রোযা ভঙ্গ হবে না (তাবয়ীন)। মহিলাদের শরমগাহে পানির ফোঁটা ঢাললে রোযা ফাসিদ হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। একথাই সহীহ্ (যহীরিয়্যা) যদি পেট বা মাথার ভিতর পর্যন্ত যখম থাকে এবং তাতে ঔষধ লাগানো হয়, তবে অধিকাংশ মাশায়িখের মতে যদি ঔষধ পেট এবং মস্তকের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ঔষধ ভিতরে পৌঁছে যাওয়াই মূল কথা। ঔষধ তরল হওয়া ও শুকনো হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই যদি অনুভূত হয় যে, শুকনো ঔষধের প্রভাব পেটের মধ্যে বা মস্তিষ্কে পৌঁছে গেছে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি অনুভূত হয় যে,

তরল ঔষধের প্রভাব, পেটের মধ্যে বা মস্তিষ্কে পৌঁছেনি, তবে রোযা ফাসিদ হবে না ('ইনায়া)। ঔষধের প্রভাব পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছেছে কিনা? তা অজানা থাকলে, যদি ঔষধ তরল হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ, সাধারণত এ জাতীয় ঔষধের প্রভাব পৌঁছেই থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে অজানা থাকায় সন্দেহের কারণে, রোযা ভঙ্গ হবে না। প্রভাব পৌঁছার কথা অজানা থাকা অবস্থায় যদি ঔষধ শুকনো হয়, তবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা ঃ বর্শা দ্বারা যদি আঘাত করা হয় অথবা কেউ যদি তীরবিদ্ধ হয় আর তা পেটের ভিতর থেকে যায়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। একাংশ যদি বাইরে থাকে, তবে রোযা ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। সূতা দিয়ে বাঁধা গোশত যদি কেউ গিলে ফেলে আর তা সাথে সাথে টেনে আনা হয়, তবে রোযা ফাসিদ হবে না। আর যদি রেখে দেওয়া হয়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (বাদাই')। এক পাশ হাতে রাখা অবস্থায় যদি লাকড়ী গিলে ফেলে এবং তারপর বের করে আনে, তবে রোযা ফাসিদ হবে না। লাকড়ী সবটুকু গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। যদি কোন পুরুষ নিজের আঙ্গুল গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করায় অথবা স্ত্রীলোক তার শরমগাহে আঙ্গুল প্রবেশ করায়, তবে রোযা ফাসিদ হবে না। এটাই পসন্দনীয় অভিমত। অবশ্য যদি আঙ্গুল পানি বা তেল দ্বারা ভিজা থাকে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। পানি বা তেল ভিতরে প্রবেশ করার কারণে (যহীরিয়্যা)। একথা তখনই প্রযোজ্য হবে যদি রোযার কথা স্মরণ থাকে। এটি একটি সতর্কবাণী যা স্মরণ রাখা ওয়াজিব। কারণ রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় সর্বক্ষেত্রেই রোযা ফাসিদ হয় আর স্মরণ না থাকলে ফাসিদ হয় না (যাহিদী)। রোযাদার অবস্থায় যদি কোন লোকের আলিশ বের হয়ে যায়, তবে তার জন্য উচিত হল ঐ স্থানটি তোয়ালে দ্বারা পরিষ্কার করার পর স্বীয় স্থান থেকে উঠা। যাতে পানি পেটের ভিতর প্রবেশ করে রোযা ফাসিদ করে না দেয়। এজন্য ফকীহ্গণ বলেন, রোযার অবস্থায় ইস্তিন্জার সময় শ্বাস গ্রহণ করবেন না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি কোন রোযাদার দীর্ঘ সময় ধরে পানি দ্বারা ইসতিনজা করার ফলে মলদ্বারে পানি পৌঁছে যায়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

৮. মাসআলা ঃ জোরপূর্বক যদি রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করা হয়, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এরই উপর ফাতওয়া। যদি পুরুষকে মহিলা জোরপূর্বক সহবাস করায়, তবে অনুরূপ হুকুম হবে (খুলাসা)। সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে যদি লিঙ্গ প্রবেশ করায়, তারপর সুবহে সাদিক হওয়ার ভয়ে লিঙ্গ বের করে এবং ভোর হওয়ার পর বীর্য নির্গত হয়, তবে কাযা ওয়াজিব হবে না। রোযার কথা ভুলে গিয়ে যদি সহবাস করা আরম্ভ করে অথবা সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে লিঙ্গ প্রবেশ করায় কিংবা রোযার কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তির যদি রোযার কথা মনে পড়ে এতে যদি সে সাথে সাথে লিঙ্গ বের করে নেয়, তবে সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে তার রোযা ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সুবহে সাদিক হওয়ার পর কিংবা রোযার কথা মনে পড়ার পর যদি পূর্বাবস্থায় বহাল থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির উপর যাহিরী রিওয়ায়েত মতে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (বাদাই')। কোন মহিলার

pdf By Syed Mostafa Sakib

চেহারার দিকে কিংবা শরমগাহের দিকে কামভাবের সাথে দৃষ্টিপাত করলে যদি বীর্য নির্গত হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। বারবার দৃষ্টিপাত করুক কিংবা একবার করুক। সহবাসের খেয়াল করায় যদি বীর্য নির্গত হয়, তবে অনুরূপ রোযা ভঙ্গ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করায় যদি বীর্য নির্গত হয়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। বাঁদী ও নাবালক ছেলেকে চুম্বন করলে কিংবা কোন মহিলা তার স্বামীকে চুম্বন করলে যদি ভেজা দেখে, তবে অনুরূপ হুকুম হবে। স্ত্রী যদি স্বাদ উপভোগ করে এবং ভেজা না দেখে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন (যাহিদী)। চতুষ্পদ প্রাণীকে চুম্বন করায় যদি বীর্য নির্গত হয়, তবে রোযা ফাসিদ হবে না (মুহীত)। স্পর্শ করা, গায়ে গা মিলানো এবং মুসাফাহা ও মুয়ানাকার হুকুম হল চুম্বন করার অনুরূপ (আল-বাহরুর রায়িক) মহিলাকে স্পর্শ করায় ও তার কাপড় দেখায় যদি বীর্য নির্গত হয় এ ক্ষেত্রে পুরুষ যদি স্ত্রীর ত্বকের উষ্ণতা উপভোগ করে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। ত্বকের উষ্ণতা উপভোগ না করলে ফাসিদ হবে না (মিরাজুদ দিরায়া)। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে স্পর্শ করে আর এতে স্বামীর বীর্য নির্গত হয়, তবে রোযা ফাসিদ হবে না। স্পর্শ করার জন্য যদি স্বামী স্ত্রীকে বাধ্য করে, তবে এতে ফকীহ্গণের মতবিরোধ রয়েছে (মুহীত)। চতুষ্পদ জন্তুর লজ্জাস্থান স্পর্শ করায় যদি বীর্য নির্গত হয়, তবে রোযা ফাসিদ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। চতুষ্পদ জন্তু অথবা মায়্যিতের সাথে যদি সহবাস করে কিংবা জীবিতের লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যস্থান দিয়ে সহবাস করলে যদি বীর্য নির্গত না হয়, তবে রোযা ফাসিদ হবে না। এসব অবস্থায় বীর্য নির্গত হলে কাযা করা ওয়াজিব। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। রোযাদার ব্যক্তি যদি লিঙ্গ হাত দ্বারা নাড়াচাড়া করে আর তাতে বীর্য নির্গত হয়, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। এটিই ফকীহ্গণের পছন্দসই কথা। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম তা-ই বলেছেন, (আল-বাহরুর রায়িক)। আর স্ত্রীর হাত দ্বারা লিঙ্গ নাড়াচাড়া করালে যদি বীর্য নির্গত হয়ে যায়, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। নিদ্রামগ্ন অথবা সাময়িক পাগল স্ত্রীর সাথে যদি সহবাস করা হয় এবং স্ত্রী সুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় যদি রোযার নিয়্যাত করে থাকে, তবে ইমামত্রয়ের মতে মহিলার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। দুই মহিলা যদি একে অপরের সাথে মন্দ কাজে লিপ্ত হয় আর তাদের বীর্য নির্গত হয়ে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বীর্য নির্গত হলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৯. মাসআলা ঃ দ্বিতীয়ত, যে যে অবস্থায় কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পায়খানা-পেশাবের কোন এক রাস্তা দিয়ে সহবাস করে, তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে বীর্য নির্গত হওয়ার কোন শর্ত নেই। (হিদায়া)। সহবাসে স্ত্রীলোক পুরুষের অনুগত থাকলে পুরুষের মত তার উপরও কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক সহবাস করা হলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। প্রথম দিকে জোরপূর্বক সহবাস করা হলে আর পরে সে তার বশীভূত হয়ে গেলে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। স্ত্রী কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে

বা পাগলকে সহবাসের সুযোগ দেওয়ার পর সে তার সাথে যিনা করলে এতে স্ত্রীর উপর ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (যাহিদী)। খাদ্যজাত বা ঔষধজাত জিনিস ইচ্ছাপূর্বক খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি তা খাদ্য বা ঔষধ সেবনের উদ্দেশ্যে পানাহার করা হয়। খাদ্য ও ঔষধ সেবনের উদ্দেশ্য পাওয়া না গেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হবে। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। রোযাদার যদি রুটি, খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, তেল ও দুধ খায় অথবা ঘন দুধ, মিশক, জাফরান, কর্পুর ও বিরাট আকৃতির গোশতের টুকরা ভক্ষণ করে, তবে আমাদের মাযহাব মতে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সিরকা, সুস্বাদু খাবার, হলুদ পানি, জাফরানের পানি, লুবিয়ার পানি[১], বাঙ্গির পানি, খিরার পানি, কর্পূরের পানি, আঙুরের পানি, ডালের পানি, বৃষ্টির পানি, বরফ ও কুয়াশার পানি ইচ্ছাপূর্বক পান করলে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। ঔষধ মাটি যেমন আরমিনী মাটি অথবা পোড়া মাটি যদি কেউ ভক্ষণ করে ফেলে অথবা ঘিয়ে ভাজা আটা কিংবা ছোট খরবুজা গিলে ফেললে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। পসন্দনীয় মাযহাব মতে রান্নাবিহীন গোশত অথবা রান্নাবিহীন চর্বি খেলেও উপরোল্লিখিত হুকুম হবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। পাকানো ময়দা যদি কেউ গিলে ফেলে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর পাকানো না হলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, পাকানো ময়দা সাধারণত খাওয়া যায় কিন্তু অপাকানোটি খাওয়া যায় না।

১০. মাসআলা ঃ উৎপন্ন শস্যের কাণ্ডসমূহ ভক্ষণ করলে জানদুসী (র) বলেন, "আমার মতে ঐ ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে"। কারণ, তাতে মিষ্টিভাব থাকে এবং তা থেকে স্বাদ ভাল করা যায় (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ গাছের পাতা খেলে দেখতে হবে ঐ পাতাটি খাওয়ার উপযোগী কিনা? যদি দেখা যায়, তা খাওয়ার উপযোগী, যেমন ঃ আঙুরের পাতা, তবে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি খাওয়ার উপযোগী না হয়, যেমন ঃ আঙুরের পাতা যা বড় হয়ে গেছে এরূপ পাতা খেলে কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)। সমস্ত উদ্ভিদজাত দ্রব্যের হুকুম অনুরূপই (তাবয়ীন)। আঙ্গুরের দানা চর্বণ করে ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়েই ওয়াজিব হবে। পূর্ণ আঙ্গুরের দানা যদি গিলে ফেলে আর তার সাথে আবরণ না থাকে, তবে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। আর এ বিষয়ে ফকীহ্গণ সকলেই একমত। যদি দানার সাথে আবরণ থাকে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে ঐ ব্যক্তির উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব। আবূ সুহায়ল (র) বলেন, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। একথাই সহীহ্ (যহীরিয়্যা)। কাঁচা বাদাম যদি গিলে ফেলে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। বাদাম অথবা পাকা বা কাঁচা আখরোট চর্বণ করে গিলে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (সিরাজুদদরায়া)। লবণ খাওয়ায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি কেবল লবণ খাওয়ায় অভ্যস্ত থাকে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পসন্দনীয় কথা হল লবণ খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। সদরুশ শহীদ (র) বলেন, একথাই সহীহ্ (শরহুন নিকায়া)।

১. মাশকলাই জাতীয় চারা যা রান্না করে খাওয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংশ্লিষ্ট মাসাইল

১. মাসআলা ঃ রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার ও সহবাস করার পর মনে করে যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে, তাই পরে সে ইচ্ছাপূর্বক কিছু খেয়ে নিল। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদিও সে জ্ঞাত থাকে যে ভুলক্রমে পানাহার বা সহবাস করলে রোযা ফাসিদ হয় না, তবু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। একথাই সহীহ্ (খুলাসা)। বমি হওয়ার কারণে মনে করল রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে, তাই পানাহার করল। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি অবগত থাকে যে, রোযা ভঙ্গ হয় নাই তা সত্ত্বেও পানাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)। স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে মনে করল যে, রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে, তাই পরে ইচ্ছা পূর্বক আহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। স্বপ্নদোষের হুকুম জানা থাকলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। পিচকারী লওয়ার কারণে মনে করল যে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে, পরে ইচ্ছাপূর্বক আহার করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অবশ্য রোযা ভঙ্গ হওয়ার ফাতওয়া যদি কোন ফকীহ্ দিয়ে থাকে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি তার কাছে রোযা ফাসিদ না হওয়ার হাদীছ পৌছে, তা সত্ত্বেও ফকীহের কথার উপর আস্থা স্থাপন করে খেয়ে ফেলে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। অবশ্য যদি সে হাদীছের মর্ম জানে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। চোখে সুরমা লাগানোর পর বা মোচে তেল দেওয়ার পর ইচ্ছা পূর্বক খেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি ঐ ব্যক্তি মূর্খ হয় আর তাকে রোযা ভঙ্গ হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া হয়, তবে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ দুপুরের পূর্বে মুসাফির যদি নিজ শহরে প্রবেশ করে এবং কোন কিছু না খায় আর রোযার নিয়্যাত করে, তারপর ইচ্ছাপূর্বক সহবাস করে, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। পাগল যদি দুপুরের পূর্বে সুস্থ হয়ে উঠে আর রোযার নিয়্যাত করে, তারপর সহবাস করে, তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। রোযার নিয়্যাত ছাড়াই ভোর হয়ে গেল, তারপর দুপুরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করল, পরে আবার খেয়ে ফেলল। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (খাশফুল কাবীর)। সুস্থ ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে ফেলল। তারপর এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, এ অসুস্থতার সাথে রোযা রাখা সম্ভব নয়। এতে আমাদের মাযহাব মতে কাফ্ফারা রহিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটিই বিশুদ্ধতম কথা (যহীরিয়্যা)। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের মূলনীতি হল, দিবসের শেষ দিকে যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তা যদি দিবসের প্রথম দিকে হত, তাহলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জাইয হত। এরূপ ব্যক্তির থেকে কাফ্ফারা রহিত হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মিসওয়াক করার পর মনে করল রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে, তই পরে ইচ্ছাপূর্বক খেয়ে ফেললে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। পরনিন্দা করার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাপূর্বক খেলে ঐ

pdf By Syed Mostofa Sakib

ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদিও কোন ফকীহ্ ফাতওয়া প্রদান করে অথবা হাদীছের অর্থের ব্যাখ্যা করে (বাদাই') অধিকাংশ আলিম এ অভিমতই পোষণ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মহিলা যদি ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তারপর ঐ দিন তার হায়েয আসে বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে ঐ রোযার কাযা করতে হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভাঙ্গার পর যদি ঐ দিন বেহুশ হয়ে পড়ে, তবে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। নিজকে নিজে যখমী করার পর যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, রোযা রাখা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে কেউ কেউ বলেন, কাফ্ফারা রহিত হবে না। এটিই সহীহ্ কথা (যহীরিয়্যা)। চতুষ্পদ জন্তু বা মৃত ব্যক্তির সাথে সহবাস করার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে কেউ ইচ্ছাপূর্বক খেয়ে ফেললে এ অবস্থায় এ ব্যক্তি আলিম হলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব আর মূর্খ হলে কাযা করা ওয়াজিব। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি নিজ বাহ্যদ্বারে আঙ্গুল ঢুকায় অথবা কোন সুতা গিলে ফেলে আর তা হাতছাড়া না হয়, তারপর ইচ্ছাপূর্বক কিছু ভক্ষণ করে, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। মহিলার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে যদি পরে ইচ্ছাপূর্বক আহার করে, তবে তা বমির হুকুমের অনুরূপ হবে (খুলাসা)। কীটযুক্ত মৃত বস্তু খেয়ে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কীটযুক্ত না হলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন রোযাদার ব্যক্তিকে রমযানের দিনের বেলা হত্যা করার জন্য উপস্থিত করা হল আর সে কোন লোকের কাছে পানি চেয়ে তা পান করে নিল। তারপর তাকে মাফ করে দেওয়া হল। এ ব্যক্তির ব্যাপারে শায়খ ইমাম যহীর উদ্দীন (র) বলেন, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। নিজ খুশিতে কেউ রমযানের দিনের বেলা তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, তারপর বাদশাহ তাকে সফরে বাধ্য করল, যাহিরী উসূল মতে তার উপর থেকে কাফ্ফারা রহিত হবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ যে সব ওযরের কারণে রোযা ভঙ্গ করা জাইয

১. মাসআলা ঃ যে সব ওযরের কারণে রোযা না রাখা জাইয এর মধ্যে একটি হল সফর। যে দিন সফর শুরু করা হয় ঐ দিন রোযা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে সফর ওযর হিসাবে গণ্য হয় না (গিয়াছিয়া)। দিনের বেলা যদি সফর শুরু করে, তবে ঐ দিন রোযাদারের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জাইয নয়। একান্ত যদি ভঙ্গ করে ফেলে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। সফরে যাওয়ার পূর্বে রোযা ভাঙ্গলে তারপর সফরে গেলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (মুহীত) সুরুখসী)। দিনের প্রথম দিকে ইচ্ছাপূর্বক আহার করার পর বাদশাহ সফরে বাধ্য করল। এতে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে কাফ্ফারা রহিত হবে না। খাওয়ার পর স্বেচ্ছায় সফর করলে কাফ্ফারা রহিত হবে না। এতে কারো মতনৈক্য নেই (খুলাসা)। রমযানে কেউ সফরে বের হওয়ার পর কোন কিছু ফেলে যাওয়ার কারণে পুনরায় বাড়ী ফিরে এলে কোন কিছু খেয়ে নিল। তারপর আবার সফরে রওয়ানা করল। এ ব্যক্তির ব্যাপারে কিয়াসের কথা হল তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কারণ, তার সফর মওকুফ হয়ে গিয়েছিল। ফকীহ্ বলেন, আমরা এ কথাকেই গ্রহণ করি (গিয়াছিয়া)।

রোযা না রাখার অপর একটি ওযর হল রোগব্যাধি। কোন রোগী ব্যক্তির যদি মৃত্যুর আশংকা হয় অথবা অঙ্গ বিশেষ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তবে ইজমা মতে সে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। রোগবৃদ্ধির অথবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশংকা হলে আমাদের মাযহাব মতে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। আর এতে কাযা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। রোগী তার জ্ঞান-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উক্ত আশংকার বিষয়টি নির্ণয় করবে। আর বিবেচনা শুধু ধারণা প্রসূত হলে চলবে না। বরং লক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা অথবা এমন মুসলমান ডাক্তারের মতামতের দ্বারা যে প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে না-- নিরূপিত হবে এবং এই মতামত তাদের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হবে (ফাতহুল কাদীর)। যদি সুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে অসুস্থ হওয়ার আশংকাবোধ করে, তবে তার হুকুমও রোগীর হুকুমের অনুরূপ (তাবয়ীন)। কারো পালাক্রমে জ্বর আসার দিনে জ্বর প্রকাশ হওয়ার পূর্বে জ্বর আসার সম্ভাবনার ভিত্তিতে আহার করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই (ফাতহুল কাদীর)। যার পরপর জ্বর আসে, সে জ্বর এসে দুর্বল করে দেওয়ার ভয়ে অভ্যাসের দিন জ্বর আসার পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলল, যাতে জ্বর আসল না। এ রূপ ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব।

২. মাসআলা ঃ মহিলাদের রোযা না রাখা জাইয হওয়ার অন্যতম ওযর হল হামেলা বা গর্ভবতী হওয়া এবং শিশুকে দুধ পান করানো। গর্ভবতী মহিলা এবং দুধ পানকারিণী মহিলার যদি নিজ প্রাণের অথবা সন্তানের জীবন নাশের আশংকা হয়, তবে সে রোযা ভাঙ্গতে পারবে এবং পরে সে শুধু কাযা করবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (খুলাসা)।

মহিলাদের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের উযর হল হায়েয ও নিফাসওয়ালী হওয়া। মহিলার যদি হায়েয-নিফাস আসে, তবে রোযা ছেড়ে দিবে (হিদায়া)। মহিলা হায়েয মনে করে যদি রোযা ভাঙ্গে, তারপর ঐ দিন হায়েয না আসে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে ঐ মহিলার উপর কাফ্-ফারা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। হায়েয থেকে রাতে পবিত্রতা অর্জন করলে দেখতে হবে যদি হায়েযের মুদ্দত দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী দিনে রোযা রাখবে। আর যদি দশ দিনের কম সময়ে বন্ধ হয়, তবে যদি রাতে গোসল করার সময়ের পরিমাণ থেকে আরো কিছু সময় বেশী পাওয়া যায়, তবেও পরবর্তী দিন রোযা রাখবে। গোসল থেকে ফারিগ হওয়ার সাথে সাথে যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তবে পরবর্তী দিন রোযা রাখবে না। কারণ, দশদিনের কম মুদ্দতের মাঝে গোসলের সময়টুকুও হায়েযের সময়ের অন্তর্ভুক্ত (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৩. মাসআলা ঃ রোযা না রাখা জাইয হওয়ার অন্যতম উযর হচ্ছে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। এ দু'টির কারণে যখন জীবন নাশের বা জ্ঞান যাওয়ার আশংকা হয়, যেমন কোন বাঁদী কাজ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ে আর রোযা রাখার কারণে তার জীবন-নাশের উপক্রম হয়ে যায়। অনুরূপ যে বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে গ্রীষ্মের দিনগুলোতে চাষাবাদে যায়। সে যদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বা হুশ-বুদ্ধি কমে যাওয়ার ভয় করে, তবে তাদের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জাইয হবে (ফাতহুল কাদীর)। রোযা না রাখা জাইয হওয়ার অপর একটি ওযর হল অধিক বার্ধক্য। মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখার সামর্থবান নয়, সে রোযা ছেড়ে দিবে এবং কাফ্ফারায় যে ভাবে মিসকীনকে খাওয়ানো হয়, সে ভাবে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে (হিদায়া)। বৃদ্ধা মহিলার হুকুমও অনুরূপ (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)। বৃদ্ধ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন ক্ষয় হতেই থাকে (আল বাহরুর রায়িক)।

৪. মাসআলা ঃ রোযার ফিদ্‌য়া রমযানের প্রথম দিন চাইলে একবারেই দিতে পারবে, নতুবা রমযানের শেষের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে দিতে পারবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। ফিদয়া দেওয়ার পর দাতা যদি রোযা রাখতে সক্ষম হয়ে উঠে, তবে ফিদয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে, যা সে আদায় করেছে এবং তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব হবে (নিহায়া)। যদি কসম বা হত্যার কাফ্ফারার রোযা হয় এবং অতি বৃদ্ধ হওয়ার দরুন সে তা রাখতে অক্ষম হয়, তবে রোযার পরিবর্তে মিসকীনকে আহার করানো তার জন্য জাইয হবে না। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল ঃ যে সকল রোযা কোন কিছুর বদলে ওয়াজিব হয় না, মূল রোযা হিসাবে ফরয হয়, সে সকল রোযা রাখার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে রোযার পরিবর্তে মিসকীনকে খাওয়ানো জাইয হয়। আর যে সকল রোযা কোন কিছুর পরিবর্তে ওয়াজিব হয়, মূল রোযা হিসাবে ফরয হয় না, তা আদায় করতে নিরাশ হয়ে পড়লে রোযা রাখার পরিবর্তে মিসকীনকে খাওয়ানো জাইয হয় না। যেমন ঃ কসমের কাফ্ফারা--তা অন্য জিনিসের বদলে ওয়াজিব হয়। সুতরাং তার পরিবর্তে মিসকীনকে খাওয়ালে তা আদায় হবে না। যিহারের কাফ্ফারা ও রমযানে রোযা ভাঙ্গার কাফ্ফারার ব্যাপারে কথা হল, যদি দরিদ্রতাবশত গোলাম আযাদ করতে অক্ষম হয় এবং বয়োবৃদ্ধতার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে এর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো জাইয আছে। কারণ, তা রোযার বিকল্প হিসাবে দলীল দ্বারা প্রমাণিত (শারহুত্তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ অসুস্থতার বা সফরের দরুন যদি রমযানের রোযা কাযা হয় আর অসুস্থতা এবং সফর যদি দীর্ঘায়িত হয়, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি মায়্যিত মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মিসকীন খাওয়ানোর জন্য ওসিয়ত করে, তবে ওসিয়ত সহীহ্ হবে। যদিও ওসিয়ত করা তার উপর ওয়াজিব ছিল না। তার পক্ষ থেকে তার এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে মিসকীন খাওয়াবে।

যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায় অথবা মুসাফির বাড়ী ফিরে আসে এবং কাযা আদায় করার সময় পায়, তবে যতটুকু সময় পেয়েছে, সে পরিমাণ কাযা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। সময় পাওয়া সত্ত্বেও যদি কাযা না করে আর মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তবে ফিদয়া দেওয়ার ওসিয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব (বাদাই')। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওলী ব্যক্তি প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব খাওয়ার জন্য দিবে (হিদায়া)। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত করে না যায় আর ওয়ারিছগণ নফল হিসেবে ফিদয়া দিয়ে দেয়, তবে তা জাইয হবে। ওসিয়ত ছাড়া ফিদয়া দেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ওলী তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবে না (তাবয়ীন)। অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির মুকীম হওয়ার পর যদি মারা যায়। তবে সুস্থ থাকা ও মুকীম হওয়ার সময় পরিমাণে কাযা করা ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে ফকীহ্গণের কারো কোন মতভেদ নেই। একথাই সহীহ্ (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। প্রথম রমযানের কাযা আদায় করার পূর্বে যদি দ্বিতীয় রমযান এসে যায়, তবে কাযার আগে চলতি রমযানের রোযা আদায় করবে (আল-নাহরুল ফায়িক)।

৬. মাসআলা ঃ রাফী (র) আমাদের ফকীহ্ আলিমগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিনা ওযরে নফল রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয় (কাফ)। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত ঃ সুরুখসী) যাহেরী রিওয়ায়েতও তাই (আন নাহরুল ফায়িক)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে দাওয়াত গ্রহণ করাও রোযা ভঙ্গ করা জাইয হওয়ার একটি ওযর। এটিই স্পষ্ট কথা (কাফী)। ফকীহ্গণ বলেন, মাযহাবের সহীহ্ কথা হল, দাওয়াতদাতা যদি কেবল উপস্থিতির উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং রোযা ভঙ্গ না করায় মনক্ষুণ্ন না হয়, তবে রোযা ভঙ্গ করবে না। আর যদি বুঝা যায় যে, রোযা ভঙ্গ না করলে দাওয়াতদাতা মনক্ষুণ্ন হবে, তবে রোযা ভঙ্গ করবে এবং পরে এর কাযা করবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম কথা হল, কাযা করার ব্যাপারে যদি নিজের উপর আস্থাশীল হয়, তবে মুসলমান ভাইকে কষ্ট না দেওয়ার লক্ষ্যে রোযা ভঙ্গ করবে। আর যদি কাযা করার ব্যাপারে নিজের উপর আস্থাশীল না হয়, তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও রোযা না ভাঙ্গায় মুসলমানের মনে কষ্ট হয়। এ সকল কথা প্রযোজ্য হবে দুপুরের পূর্বে ভঙ্গ করার ব্যাপারে। দুপুরের পরে রোযা ভঙ্গ করা যাবে না। অবশ্য যদি দুপুরের পরে রোযা ভঙ্গ না করায় মাতা-পিতার অবাধ্যতা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গতে পারবে (মুহীত)। দাওয়াতদাতা ও দাওয়াতগ্রহীতা উভয়ের জন্য দাওয়াত রোযা ভঙ্গ করার একটি ওযর। ওয়াজিব রোযা ভঙ্গ করার

জন্য দাওয়াত কোন ওযর হয় না (নিহায়া)। পাগল ব্যক্তি রমযান মাসের কোন অংশে সুস্থ হয়ে গেলে অতীতের রমযানের দিনগুলোর রোযার কাযা করা তার উপর অপরিহার্য হবে। রমযানের পূর্ণ মাস পাগল থাকলে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে কাযা করতে হয় না। রমযানের শেষ দিনের দুপুরের পর পাগল ব্যক্তি সুস্থ হলে তার উপর কাযা করা জরুরী নয়। এটাই সহীহ্ মতামত (কিফায়া ও নিহায়া)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি পূর্ণ রমযান বেহুশ থাকে, তবে সে এর কাযা করবে। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ সকলে একমত (মিরাজুদ্ দিরায়া)। সূর্যাস্তের পর কেউ বেহুশ বা পাগল হলে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত এ অবস্থা থাকলে যে রাতে বেহুশ বা পাগল হয়েছে, সে রাতের পর যে দিন আসবে ঐ দিনের রোযার কাযা করবে না। কেননা, যদি তার এ কথা নিশ্চিত জানা থাকে যে, সে রোযার নিয়্যাত করেছে, তবে তো এ কথা স্পষ্ট যে, তার রোযা হয়ে গিয়েছে। যদি জানা না থাকে, তবে রোযার নিয়্যাত করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক অবস্থার উপর আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি সে মুসাফির বা এমন ব্যক্তি হয় যার যার রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করার অভ্যাস আছে, তবে তার উপর উপরোক্ত দিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। কেননা, তার স্বাভাবিক অবস্থা নিয়্যাতের কথা প্রমাণ করে না (যাহিদী)। মুজাহিদ ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, রমযান মাসে সে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং রোযা রাখায় তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তবে তার জন্য রোযা না রাখা জাইয হবে (মহীত ঃ সুরুখসী)। তারপর যদি ঘটনাক্রমে যুদ্ধ না হয়, তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, যুদ্ধ করতে শক্তি অর্জনের জন্য পূর্বে পানাহার করা অপরিহার্য। রোগের বিষয়টি এমন নয় (যহীরিয়া)। কোন পেশাদার ব্যক্তি যদি নিজের খরচের জন্য টাকা-পয়সার মুখাপেক্ষী হয় আর তার যদি এ কথা জানা থাকে যে, সে যদি নিজ পেশায় মশগুল হয়, তবে তাকে এমন শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে যার ফলে তাকে রোযা ছাড়তে হবে তবে রুগ্ন হওয়ার পূর্বে রুগ্ন হওয়ার আশংকার ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য হারাম (কিন্য়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মানতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কতিপয় শর্ত ছাড়া মানত সহীহ্ হয় না। প্রথম শর্ত হল, যে কাজের মানত করবে এ জাতীয় কাজ শরীআতে ওয়াজিব না হতে হবে। সুতরাং রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার মানত সহীহ্ হবে না। দ্বিতীয় শর্ত হল, এমন কাজের মানত করতে হবে, যা শরীআতে মুখ্য। ওসীলা বা মাধ্যম নয়। সুতরাং উযূ এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতের মানত করা সহীহ্ হবে না। তৃতীয় শর্ত হল, এমন কাজের মানত করা, যা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনো ওয়াজিব নয়। সুতরাং যুহরের নামায বা অন্যান্য ফরয নামাযের মানত সহীহ্ হবে না (নিহায়া)। চতুর্থ শর্ত হল, মানতকৃত জিনিসটি স্বয়ং গুনাহের কাজ না হওয়া (আল-বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি বলে, لله على صوم يوم النحر অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম, কুরবানীর দিন আমার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব। একথা বললে ও এ ব্যক্তির ঐদিন রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে এবং পরে তা কাযা করে নিবে। এরূপ মানত সহীহ্ হয়। কারণ, তা স্বয়ং শরীআত সিদ্ধ, কিন্তু অন্য কারণে তাতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কারণটি হল, ঐদিন আল্লাহ্র দাওয়াত গ্রহণ করাকে বর্জন করা। ঐদিন রোযা রাখলেও মানত আদায় হয়ে যাবে (হিদায়া)। অন্য একটি শর্তও অতি প্রয়োজনীয়। তাহল, মানত আদায় করা অসম্ভব না হওয়া। তাই কেউ যদি গতকালের রোযার মানত করে, তবে তার মানত সহীহ্ হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি বলে, لله على ان اصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان অর্থাৎ 'আল্লাহ্র কসম! অমুক লোক যেদিন আসবে , সে দিন আমার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব।' সে খাওয়ার পর বা হায়েযওয়ালী হওয়ার পর অমুক লোকটি আসলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মানতকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর কথাই পসন্দনীয় (সিরাজিয়া)। অমুক লোকটি দুপুরের পরে আসলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মানতকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে অন্যান্য ইমামের কোন অভিমত নেই (খুলাসা)। যদি কেউ বলে, لله على ان اصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য অমুক লোক যেদিন আসবে, সেদিন আমার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব।' এতে যদি লোকটি রাতে আসে, তবে মানতকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি দিনে দুপুরের পূর্বে আসে আর মানতকারী কিছুই না খেয়ে থাকে, তবে সে ঐদিন রোযা রাখবে (মুহীত ঃ সুরুখসী) ঃ যদি কেউ বলে, لله على ان اصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য অমুক লোক সর্বদা যেদিন আসবে সেদিন আমার উপর রোযা রাখা ফরয। এতে ঐ লোকটি মানতকারীর খাওয়ার পর দিনে আসলে, ঐ দিনের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে না। আগামীতে প্রতিদিন অনুরূপ তার উপর রোযা ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল

ওয়াহ্হাজ ও মুহীত)। যদি নিজের উপর কেউ ওয়াজিব করে যে, অমুক ব্যক্তি যেদিন আসবে এবং অমুক ব্যক্তি যেদিন আরোগ্য লাভ করবে সেদিন সর্বদা রোযা রাখবে। এতে যদি অমুক ব্যক্তির আগমনের দিন অমুক ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে, তবে মানতকারীর উপর ঐ একই দিনের রোযা সর্বদা রাখা ওয়াজিব। এছাড়া তার উপর আর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, لله على ان اصوم يوما অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এক দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। এতে তার উপর এক দিনের রোযা লাযিম হবে। রোযা রাখার জন্য দিন নির্ধারণ করা তার নিজের দায়িত্বে। ইজমা মতে বিলম্বে তা আদায়যোগ্য। যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ তা'আলার নামে আমার উপর অর্ধ দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। এ রূপ মানত সহীহ্ হবে না।

যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর দু'দিনের বা তিন দিনের অথবা দশ দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। এতে তার উপর তা ওয়াজিব হবে এবং সে নিজে তা আদায় করার সময় নির্ধারণ করবে। ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করবে আর চাইলে লাগাতার আদায় করবে। অবশ্য যদি মানতের সময় লাগাতার আদায় করার নিয়্যাত করে, তবে লাগাতার আদায় করতে হবে। বিরতিহীন ভাবে আদায় করার নিয়্যাত করার পর যদি মধ্য ভাগে রোযা ভেঙ্গে ফেলে অথবা মহিলার হায়িয আসে, তবে প্রথম থেকে আবার রোযা রাখতে হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি পৃথক পৃথক ভাবে রোযা রাখার মানত করার পর বিরতিহীনভাবে একত্রে আদায় করে, তবে তা আদায় হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর লাগাতার দশ দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। এতে সে পনের দিন রোযা রাখল এবং মধ্যে একদিন রোযা ভাঙ্গল। পাঁচ দিন পরে রোযা ভেঙ্গেছে কি পনের দিন পরে ভেঙ্গেছে, তা ভুলে গেলে আরও পাঁচটি রোযা লাগাতার রাখবে। এতে দশটি রোযা লাগাতার করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। (যহীরিয়া)। যদি কেউ বলে لله على ان اصوم يوما অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য আমার উপর একদিন এবং একদিন রোযা রাখা ওয়াজিব। এতে তার উপর একদিন রোযা রাখা ওয়াজিব। অবশ্য এর দ্বারা যদি সে হামেশা রোযা রাখার নিয়্যাত করে, তবে তা ধর্তব্য হবে। যদি কেউ বলে لله على صوم অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব।' এতে তার উপর একদিনের রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে لله على صوم ايام অর্থাৎ 'আমার উপর আল্লাহ্র জন্য কতেক দিন রোযা রাখা ওয়াজিব।' এতে তার উপর তিন দিন রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি তিনের বেশীর নিয়্যাত করে, তবে যে পরিমাণ। নিয়্যাত করবে, সে পরিমাণ ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে صوم ايام كثيرة অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য আমি অধিক রোযার মানত করছি।' এতে যদি নিয়্যাতের মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা না থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দশ দিন রোযা রাখা মানতকারীর উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে সাত দিন রোযা রাখা ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, لله على صوم الايام অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর নির্দিষ্ট কতক দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব।' এতে যদি তার নিয়্যাতের সীমাবদ্ধতা না থাকে, তবে দশদিন রোযা রাখবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে সাত দিন রোযা রাখবে (সিরাজিয়া)। যদি কেউ বলে, لله على بضعة عشر صوماً অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর দশ এবং আরো কয়েকদিন রোযা রাখা ওয়াজিব।' তবে তাঁর উপর তের দিন রোযা রাখা ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর)। যদি কেউ বলে, لله على ان اصوم كذا اكذا يوماً অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এত এত দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। তবে তার উপর এগার দিন রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে, كذا وكذا এত এত দিন রোযা রাখব তবে একুশ দিন রোযা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি বলল, لله على صوم جمعة অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর জুমুআর রোযা ওয়াজিব।' এতে তার উপর সাতদিন রোযা রাখা জরুরী। অবশ্য সে যদি শুধু জুমুআর দিনের নিয়্যাত করে, তবে শুধু জুমুআর দিনের রোযা ওয়াজিব হবে। নিয়্যাতের নির্দিষ্টকরণ মানতকারীর উপর নির্ভরশীল (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কেউ বলে صوم الجمع অর্থাৎ 'জুমুআর দিনগুলোতে রোযা রাখবে', তবে তার উপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে জীবনের সকল জুমুআর দিনে রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে, এ মাসের সকল জুমুআর দিন রোযা রাখবে, তবে চলতি মাসের সকল জুমুআর দিন রোযা রাখা তার উপর ওয়াজিব হবে। শামসুল আইম্মা সুরুখসী (র) বলেন, একথাই সর্বাধিক সহীহ্ (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ওয়াজিব। তবে পরবর্তী একই বৃহস্পতিবারে তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আগত সকল বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি সেরূপ নিয়্যাত করে, তবে নিয়্যাত অনুযায়ী ওয়াজিব হবে। কেউ যদি বলে, لله على ان اصوم يوم السبت ثمانية ايام অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর শনিবার আট দিন রোযা রাখা ওয়াজিব।' এতে তার উপর দু' শনিবার রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি سبعة ايام বলে, তবে সাত শনিবার রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। কারণ, শনিবার সাত দিনের ভিতর বারবার আসে না। সুতরাং তার কথাকে সংখ্যার উপর দাঁড় করানো হবে। প্রথম কথাটি এর বিপরীত (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি মানত করে আগত প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখবে। তারপর এক বৃহস্পতিবার রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর এ একদিনের রোযার কাযা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। কাযা আদায়ে বিলম্ব করতে করতে যদি সে অতি বৃদ্ধ হয়ে যায় অথবা সারা জীবন রোযা রাখার মানত ছিল, এ জন্য পরবর্তীতে অক্ষম হয়ে যায় অথবা কঠোর শ্রমের মাধ্যমে জীবন উপকরণ সংগ্রহের কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে মানতকারী রোযা ভাঙ্গতে পারবে এবং পূর্ব বর্ণনা মত প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াবে। দরিদ্রতার কারণে এতে সামর্থবান না হলে আল্লাহ্র কাছে মাফ

চাইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। সময়ের প্রতিকূলতা যেমন গ্রীষ্মকাল হলে শীতকালের অপেক্ষা করে কাযা করবে (ফাতহুল কাদীর)। একথা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মানত চিরকালের জন্য না হবে (খুলাসা)।

৫. মাসআলা ঃ কারও ইচ্ছা ছিল, একথা বলার, لله على صوم يوم অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য আমার উপর একদিনের রোযা ওয়াজিব।' কিন্তু হঠাৎ يوم এর স্থলে অর্থাৎ 'এক মাস' এসে গেলে তার উপর এক মাস রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। কারণ, মানতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা উভয়ই সমান। যদি বলে, আমার উপর আল্লাহ্র জন্য এক মাস রোযা রাখা ওয়াজিব। এতে তার উপর ত্রিশ দিন রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। মাস নির্ধারণকরণ মানতকারীর দায়িত্বে। মানতের পরপরই আদায় করা জরুরী নয়। এজন্য আদায়ে বিলম্ব করলে গোনাহ্গার হবে না (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি বলে, لله على ان اصوم الشهر অর্থাৎ 'মাসটিতে আমার উপরআল্লাহ্র জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব।' এতে মানতকারীর উপর চলতি মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোযা রাখা ওয়াজিব। এর দ্বারা পূর্ণ এক মাসের নিয়্যাত করলে নিয়্যাত অনুযায়ী মানত ওয়াজিব হবে (মুহীত)। যদি বলে, আমার উপর আল্লাহ্র জন্য লাগাতার এক মাস রোযা রাখা ওয়াজিব, তবে লাগাতার রোযা রাখা জরুরী। লাগাতার রাখার কথা না বললে ইচ্ছামত রাখার অধিকার থাকবে। নির্দিষ্ট একমাস রোযা রাখার নিয়্যাত করার পর একদিন রোযা ভেঙ্গে ফেললে ভবিষ্যতে যে কোন একদিন কাযা করে নিবে। সারা মাস রোযা না রাখলে পৃথক পৃথক ভাবে বা লাগাতার কাযা করার ইখতিয়ার তার থাকবে (যাহিদী)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ বলল, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর শাওয়াল যিলকা'দা ও যিলহাজ্জ মাসের রোযা রাখা ওয়াজিব। তারপর মাসের প্রথম থেকে রোযা রাখতে শুরু করল। যিলকা'দা ও যিলহাজ্জ মাস ত্রিশ দিনের আর শাওয়াল মাস উনত্রিশ দিনের হলে মানতকারীর উপর আরো পাঁচ দিনের রোযা ওয়াজিব হবে। তাহল ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলো (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ বলল, আমার উপর আল্লাহ্র জন্য তিন মাস রোযা রাখা ওয়াজিব। তারপর সে রোযার জন্য শাওয়াল যিল কা'দা যিলহাজ্জ মাসত্রয়কে নির্ধারণ করল এ অবস্থায় যদি যীকা'দা ও যিলহাজ্জ মাস ত্রিশ দিনের হয় আর শাওয়াল মাস উনত্রিশ দিনের হয়, তবে মানতকারীর উপর আরো ছয় দিনের রোযা ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। কেউ বলল, আমার উপর আল্লাহ্র জন্য রমযান মাসের মত এক মাস রোযা ওয়াজিব। উপমা দ্বারা রমযান মাসের মত লাগাতার রোযা রাখার নিয়্যাত করলে, লাগাতার এক মাস রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। যদি সংখ্যার উপমার নিয়্যাত করে কিংবা কোন নিয়্যাতই না থাকে, তবে তার উপর ত্রিশ দিন রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। রোযাগুলো চাইলে পৃথক পৃথক ভাবে বা লাগাতার উভয় ভাবেই রাখতে পারবে (মুহীত)। "নাওয়াযিল" গ্রন্থে লিখিত আছে, "একথাই আমরা গ্রহণ করে থাকি" (তাতারখানিয়া)। উপমা দ্বারা রমযানের রোযার ওয়াজিবের সাথে তুলনা করার ইচ্ছা করলেও মানতকারী পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এ বছর রোযা রাখা ওয়াজিব। এতে সে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু পরে এদিনগুলোর কাযা করবে (হিদায়া)। এ হুকুম ঐ সময় ধরে নেওয়া হবে, যখন মানত ঈদুল ফিতরের পূর্বে করা হয়। শাওয়াল মাসে মানত করলে ঈদুল ফিত্র দিবসের কাযা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি তাশরীকের দিনগুলোর পরে মানত করা হয়, তবে দুই ঈদের ও তাশরীকের দিনসমূহের কাযা করা ওয়াজিব হবে না। (ফাতহুল কাদীর ঃ গায়তুল বায়ানের উদ্ধৃতি সম্বলিত)। মানতকারী যদি বলে, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এক বছর রোযা রাখা ওয়াজিব, কিন্তু বছর নির্দিষ্ট করল না। এতে সে চান্দ্র মাস হিসাবে এক বছর রোযা রেখে পরে পঁয়ত্রিশ দিনের কাযা আদায় করবে। ত্রিশ দিন রমযানের কারণে আর পাঁচদিন দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনসমূহের দরুন। মানতকারী যদি বলে, "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর লাগাতার এক বছর রোযা রাখা ওয়াজিব, তবে তা হবে অবিকল মানতকারীর কথা "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এ বছর রোযা রাখা ওয়াজিব " বাক্যের অনুরূপ। এ জন্য মানতকারীর উপর মাহে রমযানের কাযা করা অপরিহার্য নয়। কারণ, লাগাতার বছর রমযান থেকে পৃথক নয় (খুলাসা)। কোন মহিলা যদি নিজের উপর নির্দিষ্ট কোন বছরের রোযা ওয়াজিব করে, তবে হায়েযের দিনগুলোর কাযা করবে। কারণ, বছর অনেক সময় হায়েযের দিনসমূহ থেকে খালি থাকে। সুতরাং বছরের রোযা ওয়াজিব করা সহীহ্ আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা ঃ মানতকারী ব্যক্তি যদি دهرا বলে মানত করে, তবে ছয় মাস রোযা রাখতে হবে। الدهر বললে সারা জীবন রোযা রাখতে হবে (ফাতহুল কাদীর, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

রোযার মানতকে যদি কোন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করে শর্ত পাওয়ার আগেই আদায় করে ফেলে, তবে ইজমা মতে তা জাইয হবে না। মানত যদি কোন সময়ের সাথে সম্পর্কিত থাকে, আর সময় আসার পূর্বে তা আদায় করে, যেমন ঃ মানতকারী বলল, "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর রজব মাসের রোযা রাখা ওয়াজিব", তারপর সে রজব মাসের স্থলে রবিউল আউয়াল মাসে রোযা রাখল, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জাইয হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরও অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয হবে না (মুহীত)। যদি কেউ বলে, আমি আরোগ্যলাভ করলে এ পরিমাণ রোযা রাখব, এতে রোযা ওয়াজিব হবে না। যে পর্যন্ত সে না বলবে, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর ওয়াজিব। এটি হল কিয়াসের কথা। ইসতিহ্সান মতে রোযা ওয়াজিব হয়ে যাবে। মানত যদি কোন জিনিসের সাথে সম্পর্কিত না থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুসারে রোযা ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি তার উপর একমাস রোযা ওয়াজিব করে আর মাস পূর্ণ হওয়ার আগে সে মারা যায়, তবে তার উপর এক মাস রোযা রাখা অপরিহার্য। এজন্য তার উপর ওয়াজিব হল, এ ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাওয়া এবং তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের জন্য অর্ধ সা গম মিসকীনকে খাওয়ানো, মাস নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক। ই'তিকাফ পরিচ্ছেদে একথার সপক্ষে দলীল উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. মাসআলা ঃ রোগী ব্যক্তি যদি বলে "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এক মাস রোযা রাখা ওয়াজিব।" আর সে সুস্থ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি সে একদিনও সুস্থ হয়, তবে সারা মাসের রোযার ওসিয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সুস্থ থাকার পরিমাণে ওসিয়ত করা ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। মানতকারী যদি বলে, "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর মাসের প্রথম ও শেষ থেকে লাগাতার দু'দিন রোযা রাখা ওয়াজিব।" তবে তার উপর পনের ও ষোল তারিখের রোযা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ বলে, "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর রজব মাসে রোযা রাখা ওয়াজিব।" তারপর সে যিহারের কাফফারা স্বরূপ লাগাতার দু মাস রোযা রাখল, তন্মধ্যে এক মাস রজব হলেও যিহারের রোযা আদায় হবে এবং তার উপর রজবের কাযা ওয়াজিব হবে। একথাই অধিকতর সহীহ্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ এ পর্যায়ে প্রথমে আমাদেরকে ইতিকাফের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ফরয, শর্তাবলী, আদাবসমূহ, সৌন্দর্যাবলী, ফাসিদ হওয়ার কারণসমূহ ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

ইতিকাফের সংজ্ঞা হল, ইতিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করা (নিহায়া)।

ই'তিকাফ তিন প্রকার ঃ ১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ৩. মুস্তাহাব। ওয়াজিব ইতিকাফ হল, সরাসারি ইতিকাফের মানত করা অথবা কোন কাজ হওয়া না হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে মানত করা। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হল, রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা। মুস্তাহাব ইতিকাফ হল ঃ ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছাড়া বাকী সব ইতিকাফ।

ইতিকাফের শর্তাবলী ঃ প্রথম শর্ত হল, ইতিকাফের নিয়্যাত করা। তাই কেউ বিনা নিয়্যাতে ইতিকাফ করলে ইজমা মতে তা জাইয হবে না (মি'রাজুদ দিরায়া)।

দ্বিতীয় শর্ত হল, জামাআতের সাথে যে মসজিদে নামায আদায় করা হয়, সেরূপ মসজিদে ইতিকাফ করা। তাই যে মসজিদে আযান ও ইকামত দেওয়া হয়, সহীহ্ কওল মতে তাতে ইতিকাফ করা সহীহ্ আছে (খুলাসা)। সর্বোত্তম ইতিকাফ হল, মাসজিদুল হারামে ইতিকাফ করা। তারপর মসজিদে নববীতে, তারপর বায়তুল মাকদিসে, তারপর জামে মসজিদে, তারপর যে মসজিদে বেশী পরিমাণে মুসল্লীর সমাগম হয়, সেরূপ মসজিদে (তাবয়ীন)। মহিলাগণ ঘরের মস-জিদে ইতিকাফ করবে। যখন মহিলা তার ঘরের মসজিদে ইতিকাফের নিয়্যাত করবে, তখন ঐ স্থানটি তার জন্য পুরুষ লোকদের জামাআতে নামায পড়ার মসজিদের সমমানের হয়ে যাবে। এজন্য মহিলাগণ মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঐস্থান থেকে বের হতে পারবে না (শারহুল মাবসূত)। জামাআতের সাথে নামায পড়ার মসজিদে মহিলাগণ ইতিকাফ করলে মাকরূহের সাথে জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। তবে ঘরে ইতিকাফ করা উত্তম। মেয়েলোক মসজিদে ইতিকাফ করবার চাইলে বড় মসজিদের চেয়ে গ্রামের মসজিদে ইতিকাফ করা তাদের জন্য উত্তম। মহিলা, ঘরে ইতিকাফ করলে তার নামাযের স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে ইতিকাফ করবে (তাবয়ীন)। ঘরে মসজিদ না থাকলে একটি স্থানকে মসজিদের জন্য নির্ধারিত করে নেবে এবং সেখানে ইতিকাফ করবে (যাহিদী)।

আর এক শর্ত হল, ইতিকাফের সাথে রোযা রাখা। এক রিওয়ায়েত মতে তা ওয়াজিব ইতিকাফের জন্য শর্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যাহিরী রিওয়ায়েত মতে নফল ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। এ অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-ও পোষণ করেন। স্বল্পকালীন নফল ইতিকাফের জন্য যাহিরী রিওয়ায়েত মতে সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

এজন্য মসজিদে প্রবেশ করে বের হবার আগ পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়্যাত করলে, তা সহীহ্ হয় (তাবয়ীন)। বেরোযা অবস্থায় যদি রাতের বা দিনের ইতিকাফের মানত করে, তবে তা সহীহ্ হবে না। যদি বলে, "আল্লাহ্র জন্য আমার উপর এক মাস রোযা ছাড়া ইতিকাফ করা ওয়াজিব।" তবে তার রোযার সাথে ইতিকাফ করা ওয়াজিব (যহীরিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ ইতিকাফের শর্ত হল, রোযাদার হওয়া। ইতিকাফের কারণে রোযা নয়। এজন্য কেউ রমযানের ইতিকাফের নিয়্যাত করলে, তার মানত সহীহ্ হবে (যখীরা)। এতে যদি সে রমযানের রোযা রাখে এবং ইতিকাফ না করে, তবে তার উপর অন্য এক মাসে লাগাতার রোযার সাথে ইতিকাফের কাযা করা ওয়াজিব (মুহীত)। মানত করার পর লোকটি ইতিকাফ করল না, এমনিতে পরবর্তী রমযান এসে গেল। এতে সে ঐ রমযানে ইতিকাফ করলে পূর্বের মানত তার আদায় হবে না। কারণ, ইতিকাফ সময় মত আদায় না করায় রোযা তার যিম্মায় দেনা হয়ে নির্দিষ্ট ইবাদতে পরিণত হয়ে গেছে আর নির্দিষ্ট ইবাদত অন্য ইবাদতের সাথে আদায় হয় না। এজন্য কেউ অন্য এক মাসে ইতিকাফের মানত করার পর রমযানের ইতিকাফ করলে তার এ মানত আদায় হবে না। কেউ রোযা রাখল না, তারপর ইতিকাফের সাথে রমযান মাসের কাযা আদায় করলে ইতিকাফ আদায় হয়ে যাবে। কারণ, কাযা আদায়ের সমমানের (মুহীত ঃ সুরুখসী, খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ নফল রোযা অবস্থায় ভোর হয়ে যাওয়ার পর রোযাদার দিনের কোন অংশে বলল, আল্লাহ্র জন্য আমার উপর আজ ইতিকাফ করা ওয়াজিব। এতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস মতে ইতিকাফ ওয়াজিব হবে না। কারণ, ওয়াজিব ইতিকাফ ওয়াজিব রোযা ছাড়া সহীহ্ হয় না। এদিকে দিনের প্রথম প্রহরে নফল হিসাবে রোযার নিয়্যাত করা হয়েছিল, তাই পরে তাকে ওয়াজিব বানানো সম্ভব নয় মুহীত)।

ইতিকাফের অপর শর্ত হল, মুসলমান হওয়া, জ্ঞানবান থাকা এবং জানাবত, হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া। কারণ, কাফির ইবাদত করার যোগ্য নয়। পাগল নিয়্যাত করার যোগ্য নয়। জুনুবী হায়েয ও নিফাসওয়ালিগণের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। বালিগ হওয়া ইতিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং জ্ঞানবান বালকের জন্য ইতিকাফ করা সহীহ্। পুরুষ ও আযাদ হওয়া ইতিকাফের জন্য শর্ত নয়। এ কারণে মহিলার জন্য স্বামী থাকলে স্বামীর অনুমতিতে এবং গোলামের জন্য তার মুনীবের অনুমতিতে ইতিকাফ করা সহীহ্ (বাদাই')। স্বামী যদি স্ত্রীকে ইতিকাফ করার অনুমতি দান করে, তবে তার জন্য পরবর্তীতে স্ত্রীকে মানা করার অধিকার নেই। এতদসত্ত্বেও যদি স্বামী মানা করে, তবে তার মানা করা সহীহ্ হবে না। মুনীব গোলামকে অনুমতি দেওয়ার পর মানা করলে তার মানা করা সহীহ্ হবে।এজন্য মুনীব গুনাহ্গার হবে। মুকাতাব দাসের জন্য মুনীবের অনুমতি ছাড়া ইতিকাফ করার অধিকার আছে। মুনীব তাকে মানা করার অধিকার নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ মহিলা যদি ইতিকাফের মানত করে, তবে স্বামীর জন্য তাকে মানা করার অধিকার আছে। অনুরূপ গোলাম ও বাঁদী ইতিকাফের মানত করলে মুনীবের জন্য তাদেরকে মানা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করার অধিকার আছে (মুহীত)। গোলাম আযাদ হওয়ার পর এবং মহিলা বায়িন তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর মানতের কাযা করবে (ফাতহুল কাদীর)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, স্বামী যদি স্ত্রীকে এক মাস ইতিকাফ করার অনুমতি দেয়, এতে স্ত্রী লাগাতার এক মাস ইতিকাফ করার সংকল্প করলে, স্বামী তাকে পৃথক পৃথকভাবে ইতিকাফ করার আদেশ করতে পারবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্দিষ্ট কোন মাসে ইতিকাফ করার অনুমতি দেয়, আর স্ত্রী এ জন্য ঐ মাসে লাগাতার ইতিকাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে স্বামী তাকে তা থেকে মানা করতে পারবে না (মুহীত ঃ সুরুখাসী)

ইতিকাফের আদবসমূহ

মাসআলা ঃ নেকীর কথা ছাড়া কথাবার্তা না বলা, রমযানের দশ দিনকে ইতিকাফের জন্য অপরিহার্য করা, উত্তম মসজিদসমূহ যেমন, মাসজিদুল হারাম ও জামে মসজিদকে ইতিকাফের জন্য বেছে নেওয়া (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, হাদীছ পড়া, ইল্‌ম হাসিল করা, ইল্‌ম শিক্ষাদান করা, সীরাতুন নবী (সা)-এর আলোচনা করা, পুণ্যময়ী লোকদের জীবনালোচনা ও দীনের কথা লেখা (ফাতহুল কাদীর)। সে সকল কথাবার্তায় গুনাহ্ নেই, সেগুলো বলতে কোন দোষ নেই (শরহুত তাহাবী)।

ইতিকাফের সৌন্দর্যাবলী

মাসআলা ঃ ইতিকাফের সৌন্দর্যাবলী সুস্পষ্ট। কারণ, এতে ইতিকাফকারী তার সর্বস্ব আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি নৈকট্য লাভের নিমিত্তে বিলিয়ে দেয় এবং নিজকে দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততা থেকে দূরে রাখে। যা বান্দাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ থেকে বাধা প্রদান করে। ইতিকাফকারী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার সময়গুলোকে নামাযের মধ্যে মশগুল রাখে। কারণ, ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য হল জামাআতের সাথে নামায আদায় করার অপেক্ষা করা। স্বয়ং ইতিকাফকারীর তুলনা হল ঐসব আত্মার সাথে, যাঁরা আল্লাহ্‌র হুকুমের নাফরমানী করে না, যা তাঁদেরকে আদেশ করা হয়, তা তাঁরা পালন করে এবং সে সব লোকের সাথে, যাঁরা রাত দিন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। আরও একটি সৌন্দর্য হল, ইতিকাফকারীর পক্ষে রোযা থাকা শর্ত। রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মেহমান (নিহায়া)।

ইতিকাফ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

১. মাসআলা ঃ ইতিকাফ ভঙ্গ হওয়ার ওযরসমূহের মধ্যে একটি হল, মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া। বিনা ওযরে ইতিকাফকারী রাত বা দিনে মসজিদ থেকে বের হবে না। বিনা ওযরে অল্প সময়ের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেও ইমাম আবূ হানীফ (র)-এর মতে ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইচ্ছাপূর্বক বের হোক কিংবা ভুলক্রমে বের হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইতিকাফকারী মহিলা ঘরের মসজিদ থেকে থাকার ঘরে যেতে পারবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

মহিলা যদি মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে সে ঘরে ফিরে যেতে পারবে এবং ইতিকাফ বিনা করবে (তাবয়ীন)। পেশাব, পায়খানা ও জুমুআর নামাযের জন্য বের হওয়া ওযরের মধ্যে গণ্য। পেশাব, পায়খানার জন্য বের হওয়ার পর নিজের ঘর হয়ে মসজিদে ফিরে আসাতে কোন দোষ নেই। যেভাবে উযূ থেকে ফারিগ হওয়া যায়। ঘরে কিছু সময় অবস্থান করলে ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। তা অল্প সময় হলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ মসজিদ সংলগ্ন ইতিকাফকারীর কোন বন্ধুর বাড়ী থাকলে তা পেশাব, পায়খানার প্রয়োজন মিটানোর জন্য লাযিম করবে না। ইতিকাফকারীর দূরে ও পাশে দু'টি বাড়ী থাকলে কেউ কেউ বলেন, ইতিকাফকারীর দূরের বাড়ীতে পেশাব-পায়খানার জন্য গমন করা জাইয নয়। দূরবর্তী বাড়ীতে চলে গেলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মানবীয় প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হলে নম্র ভাবে হাঁটবে (নিহায়াম, 'ইনায়া)। খানাপিনা ও ঘুম ইতিকাফ স্থলে সম্পাদন করবে। কারণ, এসব প্রয়োজন মসজিদের অভ্যন্তরে করা সম্ভব। সুতরাং এগুলোর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই (হিদায়া)।

ইতিকাফ-স্থল জামে মসজিদের এত নিকটে যে, এখান হতে সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষা করলে খুতবা ও জুমুআ ফওত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, এরূপ হলে জুমুআর জন্য সূর্য হেলে যাওয়ার সময় বের হবে। খুতবা ও জুমুআ ফওত হওয়ার সম্ভাবনা হলে সূর্য হেলার অপেক্ষা করবে না। কিন্তু এমন সময় বের হবে যাতে জামে মসজিদে গিয়ে খুতবার আযানের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত পড়া যায় এবং জুমুআর নামায শেষে ইমামগণের মতানৈক্যের উপর নির্ভর করে চার রাকআত বা ছয় রাকআত সুন্নাতের সময় পরিমাণ অবস্থান করবে। জামে মসজিদে যদি একদিন এক রাত অবস্থান করে অথবা সেখানে ইতিকাফ পূর্ণ করে, তবে তার ইতিকাফ ফাসিদ হবে না, মাকরূহ্ হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন উযরে যদি মসজিদ থেকে বের হয় যেমন, মসজিদ ভেঙে যাওয়ায় অথবা বরদস্তিমূলক ভাবে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং ইতিকাফকারী সংগে সংগে অন্য মসজিদে প্রবেশ করে, তবে ইসতিহসান মতে তার ইতিকাফ ফাসিদ হবে না (বাদাই')। নিজের জানের এবং মালের ভয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেও অনুরূপ হুকুম (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ পেশাব-পায়খানার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পাওনাদার ইতিকাফকারীকে কিছু সময় আটকে রাখলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ফাসিদ হবে না। ইমাম সুরুখসী (র) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর কথা সাধারণ মুসলমানদের জন্য সহজতর (খুলাসা)। রোগীর সেবাযত্নের জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না (আল বাহ্রুর রায়িক)। জানাযার জন্য মসজিদ হতে বের হলে ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। অনুরূপ জানাযার নামাযের জন্য বের হলে যদিও জানাযার নামায তার জন্য নির্দিষ্ট থাকে অথবা ডুবে যাওয়া লোক কিংবা পুড়ে যাওয়া লোককে উদ্ধারের জন্য বা জিহাদের জন্য বের হয়, আর ঘটনাস্থলে জনসাধারণ উপস্থিত থাকে। সাক্ষ্যদানের জন্য বের হলেও অনুরূপ ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসুস্থতার কারণে কিছু সময়ের জন্য বের হলে অনুরূপ ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইতিকাফের মানত করার সময় অথবা ইতিকাফ লাযিম করার সময় রোগীর সেবা-যত্ন, জানাযার নামায, ইলমের মজলিসে উপস্থিতির শর্ত করলে ইতিকাফকারীর জন্য এসব কাজের জন্য বের হওয়া জাইয হবে (তাতারখানিয়া)। মিনারের উপর চড়লে মতৈক্যের ভিত্তিতে ইতিকাফ ফাসিদ হবে না। যদিও মিনারের দরজা মসজিদের বাইরে থাকে (বাদাই' মুয়াযযিন ও গায়রে মুয়াযযিন এ হুকুমের ক্ষেত্রে সমান। একথাই সহীহ্ (খুলাস, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ মাথা ধৌত করার উদ্দেশ্যে নিজ পরিবারের কারও দিকে মাথা বের করায় কোন দোষ নেই (তাতরখানিয়া)। এসব হুকুম হল ওয়াজিব ইতিকাফ সম্বন্ধে। নফল ইতিকাফে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে কারণে, অকারণে বের হওয়াতে কোন বাঁধা নেই। তুহফায়ে উল্লখ আছে, রোগীর সেবাযত্নে এবং জানাযায় উপস্থিত হতে কোন বাধা নেই (শারহুন নিকায়া, শায়খ আবুল মাকারিম কৃত)। ইতিকাফ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহের মাঝে আরো একটি হল সহবাস করা ও সহবাসের প্রতি যা আকৃষ্ট করে তা। এ জন্যই ইতিকাফকারীর জন্য সহবাস ও সহবাসের অনুষঙ্গিক কার্যাবলী হারাম। যেমন, মুবাশারা, চুম্বন করা, স্পর্শ করা, কোলাকুলি করা, যোনিদ্বার ছাড়া অন্যত্র সহবাস করা। এসব কাজ রাত-দিন উভয় সময় করলে একই হুকুম হবে। সহবাস ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাত-দিনের যে কোন সময় করলে ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। বীর্য নির্গত হোক বা না হোক। সহবাস ছাড়া অন্যান্য অনষঙ্গিক বিষয়ে বীর্য নির্গত হলে ইতিকাফ ফাসিদ হবে, অন্যথায় ফাসিদ হবে না (বাদাই')।

৫. মাসআলা ঃ সহবাসের ধ্যান করায় অথবা দৃষ্টিপাত করায় বীর্য নির্গত হলে ইতিকাফ ফাসিদ হবে না (তাবয়ীন)। স্বপ্নদোষ হলেও অনুরূপ ইতিকাফ ফাসিদ হবে না (ফাতহুল কাদীর)। স্বপ্নদোষ হওয়ার পর মসজিদকে ময়লা করা ব্যতীত মসজিদেই গোসল করবে। এতে কোন বাধা নেই। অন্যথায় মসজিদ থেকে বের হয়ে গোসল করবে এবং মসজিদে ফিরে আসবে। মসজিদের ভিতর কোন পাত্রে উযূ করা সম্ভব হলে উক্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ হবে (বাদাই' ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ইতিকাফ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে হল, বেহুশ হওয়া ও পাগল হওয়া। শুধু পাগল হওয়ায় ও বেহুশ হওয়ায় মতৈক্যের ভিত্তিতে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ না লাগাতার তা বন্ধ হবে। যদি কতক দিন বেহুশ থাকে অথবা কিছুটা পাগলামি ভাব আসে, তবে ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। এরূপ ব্যক্তির উপর পরবর্তীতে ভাল হওয়ার পর কাযা ওয়াজিব হবে। পাগলামি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে কতক বছর স্থায়ী থাকলে সুস্থ হওয়ার পর তার উপর কাযা করা ওয়াজিব (বাদাই') দিশাহারা হয়ে কতক বছর থাকার পর সুস্থ হয়ে উঠলে তার উপর কাযা করা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ইতিকাফের নিষিদ্ধ কার্যাবলী

১. মাসআলা ঃ নিম্নোক্ত কাজসমূহ ইতিকাফের অবস্থায় নিষিদ্ধ ঃ চুপচাপ থাকা। যে ব্যক্তি

একে ইবাদত মনে করবে তার জন্য তা হল মাকরূহ্ (তাবয়ীন)। আর যে ব্যক্তি চুপচাপ থাকাকে ছওয়াবের কাজ মনে না করে তার জন্য তা মাকরূহ্ নয় (আল- বাহরুর রায়িক)। তবে সুখের গুনাহ্সমূহ থেকে চুপ থাকা উত্তম ইবাদত (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। গালিগালাজ করলে, ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হলে ইতিকাফ ফাসিদ হয় না (খুলাসা)। ইতিকাফকারী ভুলবশত দিনের বেলা আহার করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, খাওয়া নিষিদ্ধ হল রোযার কারণে ইতিকাফের দরুন নয় (নিহায়া)। সার কথা হল, ইতিকাফের অবস্থায় যে যে কাজ নিষিদ্ধ, এগুলো ইতিকাফের জন্যই নিষিদ্ধ, রোযার কারণে নিষিদ্ধ নয়। ইতিকাফের অবস্থায় ইচ্ছাকৃত করুক বা অনিচ্ছায় করুক অথবা রাতে করল, কি দিনে করল, এর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। যেমন কেউ সহবাস করল অথবা মসজিদ হতে বের হয়ে গেল। রোযার নিষিদ্ধ কার্যাবলী যা রোযার কারণেই নিষিদ্ধ। এতে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, দিনে কিংবা রাতে পানাহার করার মধ্যে তারতম্য আছে (বাদাই')

২. মাসআলা ঃ ইতিকাফকারীর জন্য খাদ্যদ্রব্য ও নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেচাকেনা করায় কোন দোষ নেই। মসজিদকে বেচাকেনার কেন্দ্র বানানো মাকরূহ্ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, যখীরা)। এটিই সহীহ্ অভিমত। ইতিকাফকারীর জন্য বিয়ে করা ও স্ত্রীকে তালাকের পর রুজূ করা জাইয (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। ইতিকাফকারী কাপড় পরতে পারবে, খুশবো লাগাতে পারবে এবং মাথায় তেল দিতে পারবে (খুলাসা)। ইতিকাফকারী রাতে নেশাগ্রস্ত হলে, তার ইতিকাফ ফাসিদ হবে না। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে যা নিষিদ্ধ, সে তা খেয়েছে, ইতিকাফ নিষিদ্ধ জিনিস খায়নি। যেমন অন্যের মাল ভক্ষণ করলে ইতিকাফ ফাসিদ হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ ওয়াজিব ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে গেলে এর কাযা করা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট কোন মাসের ইতিকাফের মাঝে একদিন রোযা ভেঙ্গে ফেললে ঐ একদিনের কাযা করতে হবে। অনির্দিষ্ট কোন মাসের ইতিকাফ হলে আগামী দিনে তা আদায় করবে। নিজ কাজের দরুন বিনা উযরে ইতিকাফ ফাসিদ হোক , যেমন মসজিদ থেকে বের হওয়া, সহবাস করা এবং দিনের বেলা খাদ্য গ্রহণ করা বা নিজ কাজের দরুন ওযরের কারণে ইতিকাফ ফাসিদ হোক, যেমন অসুস্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া অথবা নিজ ক্রিয়াকলাপ ছাড়া অন্য কোন ওযরের কারণে ইতিকাফ ফাসিদ হোক, যেমন হায়েয আসা, পাগল হওয়া ও দীর্ঘ দিন বেহুশ থাকা ইত্যাদি অবস্থায় হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (ফতহুল কাদীর)।

প্রাসঙ্গিক কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ নিজের উপর ইতিকাফ ওয়াজিব করতে চাইলে উচিত হল, মুখে তা উচ্চারণ করা। অন্তর দিয়ে নিয়্যাত করলে ওয়াজিব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। শামসুল আইম্মা (র) তা উল্লেখ করেছেন। (নিহায়া, খুলাসা)। এখানে দু'টি মূলনীতি উল্লেখযোগ্য। একটি হল বহুবচন দ্বারা কয়েকদিনের অথবা দ্বিবচন দ্বারা দু'দিনের উল্লেখ করলে দিনের সাথে রাতও শামিল হবে অনুরূপ কয়েক রাতের উল্লেখ করলে রাতের মধ্যে দিনও গণ্য হবে (কাফী)। তিন বা তিনোর্ধ দিনের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা দু'দিনের কিংবা তিন রাত বা তিনোর্ধ রাতের অথবা দু'রাতের ইতিকাফ করার নিয়্যাত করলে রাতগুলোর সাথে দিনসমূহ এবং দিনগুলোর সাথে রাতসমূহের ইতিকাফ করাও অপরিহার্য হবে–যদি ইতিকাফকারীর নির্দিষ্ট নিয়ত না থাকে। যদি দিনসমূহ দ্বারা শুধু দিনগুলোতে ইতিকাফ করার নিয়্যাত করে অথবা রাতসমূহের দ্বারা শুধু রাতে ইতিকাফ করার নিয়্যাত করে, তবে নিয়্যাত সহীহ্ হবে এবং দিনসমূহের নিয়্যাতের ক্ষেত্রে দিনগুলোতে ইতিকাফ লাযিম হবে, রাতের ইতিকাফ ওয়াজিব হবে না। আর রাতগুলোতে তার উপর কিছুই লাযিম হবে না (বাদাই')। কেবলমাত্র একদিনের ইতিকাফের মানত করলে, তাতে রাত শামিল হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ দ্বিতীয় মূলনীতি হল, যে ইতিকাফ ওয়াজিব হওয়ার মাঝে রাত শামিল থাকে না তাতে পৃথক পৃথক ভাবে ইতিকাফ করা জাইয। আর যে ইতিকাফে রাত ও দিন উভয়ই শামিল থাকে, সেগুলোতে লাগাতার ইতিকাফ করা অপরিহার্য (বাদাই')। নির্দিষ্ট কোন মাসের অথবা অনির্দিষ্ট মাসের কিংবা ত্রিশ দিনের ইতিকাফের মানত করলে লাগাতার ভাবে তা আদায় করা অপরিহার্য। মাস নির্দিষ্ট না করলে যখন ইচ্ছা আদায় করতে পারবে (যহীরিয়্যা)। রাত ও দিন ইতিকাফের মধ্যে শামিল থাকলে রাত থেকেই ইতিকাফ শুরু করবে। কারণ, পরবর্তী দিনটি পূর্ববর্তী রাতের অধীন (কাফী)। কেউ যদি বলে, আল্লাহর জন্য আমার উপর দু'দিন ইতিকাফ করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে মানতকারী সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং ঐ রাত ও দিন ও পরবর্তী রাত ও দিন মসজিদে অবস্থান করবে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হবে। অনুরূপ বহু দিনের ইতিকাফের মানত করলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ ঈদের দিনের ইতিকাফের মানত করলে অন্য দিন তা কাযা করবে। মানতকারী যদি ইতিকাফের কসম করে, তবে তার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ঈদের দিন ইতিকাফ করে নিলে ইতিকাফ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু গোনাহ হবে (খুলাসা)। নিজের উপর ইতিকাফ ওয়াজিব করা ছাড়া যদি কোন লোক ইতিকাফ করে তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, এতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা)। যদি কোন বিশেষ দিন অথবা বিশেষ মাসের ইতিকাফের মানত করে আর তা ঐ দিন বা মাসের পূর্বে আদায় করে নেয় অথবা যদি মাসজিদুল হারামে ইতিকাফের মানত করে তারপর তা অন্য মসজিদে পালন করে, তবে তা জাইয হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। অতীতের কোন মাসের ইতিকাফের মানত করলে, মানত সহীহ্ হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)। কেউ এক মাসের ইতিকাফের মানত করার পর যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)

৪. মাসআলা ঃ কেউ এক মাসের ইতিকাফের মানত করার পর যদি মারা যায়, তবে প্রতিদিনের ইতিকাফের জন্য অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর কিংবা ময়দা মিসকীনকে আহার করার জন্য দিবে। যদি মৃত ব্যক্তি এর জন্য ওসিয়ত করে যায় (সিরাজিয়্যা)। মৃত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল এর জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া (বাদাই') মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত করে, আর

ওয়ারিছগণ মিসকীনকে আহার করানোর ব্যাপারে সম্মতি দান করে, তবে তা জাইয হবে। অসুস্থ অবস্থায় যদি এক মাসের ইতিকাফের মানত করে, আর সুস্থ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবে ওসিয়তকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। একদিন সুস্থ হওয়ার পর যদি মারা যায়, তবে তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে পূর্ণ মাসের বদলে ফিদয়া দিতে হবে (সিরাজিয়্যা)।

বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি পাঁচ শ' নববই সনের রমযানের এক মাস রোযা ভেঙ্গে ছিল। তারপর সে তার উপর ওয়াজিব থাকা রমযান মাসটির কাযার নিয়্যাতে এক মাস রোযা রাখল। কিন্তু তার ধারণা ছিল যে, মাসটি পাঁচ শ' একানববই সনের। তাসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার যিম্মা হতে কাযা আদায় হয়ে যাবে। পাঁচ শ' একানববই সনের রমযানের কাযার নিয়্যাতে কেউ এক মাস রোযা রাখল। আর সে মনে মনেও এরূপ খিয়াল করে যে একানববইতেই সে রোযা ভেঙ্গেছিল। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার এ কাযা সহীহ্ হবে না (যহীরিয়া, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ যদি দারুল হরবে কোন কাফির মুসলমান হয় আর রমযানের পর রোযা ওয়াজিব হওয়ার কথা সম্পর্কে অবগত হয়, তবে তার উপর কোন কাযা ওয়াজিব হবে না।

যদি রমযানের ভিতর অবগত হয়, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে ঐ ব্যক্তির এবং পাগলের হুকুম এ ব্যাপারে এক সমান (যাহিদী)। দারুল ইসলামে মুসলমান হলে তার উপর অতীত দিনগুলোর রোযার কাযা করা ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার কথা অবগত হোক বা না হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ দুপুরের পূর্বে মুসলমান হয়ে না খেয়ে নফল রোযা রাখলে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এতে তাঁর রোযা সহীহ্ হবে না। কারণ, দিনের প্রথম অংশে সে রোযার উপযুক্ত ছিল না আর পূর্ণ দিনে রোযা একটিই হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন বিভক্তি হয় না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৩. মাসআলা ঃ বালক যদি দুপুরের পূর্বে এবং কোন কিছু খাওয়ার পূর্বে বালিগ হয়ে যায় এবং সে নফল রোযার নিয়্যাত করে, তবে সহীহ্ রিওয়ায়েত মতে তাকে নফল রোযাদার হিসেবে গণ্য করা হবে (জাওহারাতুন নায়্যরা, আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ)। ইমাম রাযী (র) বলেন, বালক যদি রোযা রাখতে সক্ষম হয়, তবে তাকে রোযা রাখার হুকুম করা হবে। আবূ জা'ফর (র) বলখের ফকীহ্ মাশায়েখদের মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। বিশুদ্ধতম কথা হল, এ জাতীয় বালককে রোযা রাখার হুকুম করা হবে। আর তা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যদি রোযার কারণে তার শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়। শারীরিক ক্ষতি হলে তাকে হুকুম করা যাবে না। হুকুম করার পর যদি সে রোযা না রাখে, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হাফিস (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রোযার জন্য দশ বছরের ছেলেকে প্রহার করা যাবে কি? তিনি উত্তরে বলেছেন, ফকীহ্-গণ এ ব্যাপারে ভিন্নি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সহীহ্ কথা হল, তা নামাযের অনুরূপই

pdf By Syed Mostafa Sakib

(যাহিদী)। দিনের প্রথম ভাগে কোন ব্যক্তির এমন উযর ছিল, যা রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক ছিল ও যার কারণে রোযা না রাখা তার জন্য জাইয ছিল। এ জাতীয় ওযর যদি পরে দূর হয়ে যায় এবং এমন অবস্থা হয় যে, তা যদি দিনের প্রথম ভাগে থাকত, তবে তার উপর রোযা ওয়াজিব হত। যেমন নাবালক ছেলে দিনের কোন অংশে বালিগ হলে বা কাফির মুসলমান হলে অথবা পাগল সুস্থ হলে কিংবা হায়েযওয়ালী মহিলা পবিত্র হলে বা মুসাফির রোযা রাখার যোগ্যতার সাথে ঘরে ফিরলে। এরূপ ব্যক্তিগণের উপর দিনের বাকী অংশে রোযার কারণে যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

৪. মাসআলা ঃ রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ ও যোগ্যতা পাওয়া যাওয়ার পর যার উপর দিনের প্রথম ভাগে রোযা ফরয হয়েছিল, তারপর উক্ত ব্যক্তির উপর রোযা না রাখার কোন ওযর আপতিত হলে যেমন, ইচ্ছাপূর্বক সে রোযা ভেঙ্গে ফেললে বা সন্দেহের দিন রোযা বর্জন অবস্থায় ভোর হওয়ার পর রমযান প্রমাণিত হলে অথবা সুবহে সাদিক না হওয়ার ধারণায় সাহরী খাওয়ার পর সুবহে সাদিক প্রমাণিত হলে, এসব পরিস্থিতির সম্মুখীন লোকদের জন্য রোযাদারের ন্যায় থাকার উদ্দেশ্যে দিনের বাকী অংশে খানাপিনা ও সহবাস থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব (বাদাই')। অনুরূপ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যে সূর্য অস্ত গিয়েছে মনে করে খানা খেয়ে নেওয়ার পর সূর্য অস্ত না যাওয়া প্রমাণিত হয় এবং যে ঘটনাক্রমে ভুলবশত রোযা ভেঙ্গে ফেলে অথবা যাকে জবরদস্তিমূলক রোযা ভাঙ্গানো হয় (খুলাসা)। কেউ কেউ বলেন, এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য খানাপিনা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব-ওয়াজিব নয়। কিন্তু সহীহ কথা হল, বিরত থাকা ওয়াজিব (ফাতহুল কাদীর)। ফকীহগণের একথার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলা, অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের উপর রোযাদারের নমুনা অবলম্বন করা ওয়াজিব নয় (খুলাসা)। হায়েযওয়ালী চুপে চুপে খাবে কি প্রকাশে খাবে? এ প্রসঙ্গে কেউ বলেন, গোপনে খাবে, আবার কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্যেও খেতে পারবে। এক রিওয়ায়েত মতে মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিও প্রকাশ্যে আহার করতে পারবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ নফল রোযা রাখার পর তা ভেঙ্গে ফেললে পরে তা কাযা করে নেবে (হিদায়া)। নিজ ইচ্ছায় রোযা ফাসিদ করুক বা অনিচ্ছায় ফাসিদ করুক একই হুকুম, এমনকি মহিলা নফল রোযা রাখার পর যদি সে হায়েযওয়ালী হয়ে যায়, তবে দু'টি রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতম রিওয়ায়েত মতে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে (নিহায়া)। ধারণার বশীভূত হয়ে রোযা ফাসিদ করে ফেললে, এ রোযার ব্যাপারে আমাদের ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন কেউ তার উপর রোযা এবং নামায ওয়াজিব হওয়ার ধারণায় তা শুরু করেছিল, তারপর প্রমাণিত হল যে, তার উপর তা ফরয নয়। এতে সে ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভেঙ্গে দিলে আমাদের ইমামত্রয় বলেন, তার উপর এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু উত্তম হল, রোযার উপর বাকী দিন তার অতিবাহিত করা। অনুরূপ মতভেদ রয়েছে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেও, যে কাফ্ফারার রোযা শুরু করার পর মধ্যবর্তী সময়ে সচ্ছল হয়ে যাওয়া ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভেঙ্গে ফেলে (বাদাই')।

৬. মাসআলা ঃ কেউ সুবহে সাদিক হওয়ার পর কাযা রোযার নিয়্যাত করল। তারপর দেখা

গেল যে, এ রোযা কাযা স্বরূপ সহীহ্ হচ্ছে না। তাহলে এ রোযা নফল হিসাবে সহীহ্ হবে কি? এ সম্বন্ধে ইমাম নাসাফী (র) বলেন, সহীহ্ হবে। যদি সে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাযা ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। কেউ পুরা রমযান রোযা রাখার এবং না রাখার কোন কিছুই নিয়্যাত না করলে, তার উপর রোযার কাযা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। গায়রে রমযানের রোযা ফাসিদ হলে তার জন্য কোন কাফ্ফারা নেই (কানয)। রোযার কাফ্ফারা ও যিহারের কাফ্ফারা একই ধরনের। তা হল, মু'মিন বা কাফির একটি গোলাম আযাদ করা। এতে অক্ষম হলে দু'মাস লাগাতার রোযা রাখা। এতেও অক্ষম হলে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' খেজুর বা যব অথবা অর্ধ সা গম। কাফ্ফারার ব্যাপারে কাফ্ফারাদাতার অবস্থা তা আদায় করার সময় মূল্যায়ন হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সময় নয়। আদায় করার সময় যদি কাফ্ফারা আদায়কারী ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তবে তার জন্য রোযাই যথেষ্ট, যদিও ওয়াজিব হওয়ার সময় সে ধনী ছিল (খুলাসা)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি একই রমযানে কয়েক দিন কতক বার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর কাফ্ফারা আদায় না করে, তবে তার উপর একই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সহবাস করার পর যদি কাফ্ফারা আদায় করে তারপর আবার সহবাস করে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তার উপর দ্বিতীয় বার কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি একদিন রোযা ভঙ্গ করে একটি গোলাম আযাদ করে, তার পর দ্বিতীয় দিন রোযা ভঙ্গ করে আরো একটি গোলাম আযাদ করে, তারপর তৃতীয় দিন রোযা ভঙ্গ করে পুনরায় তৃতীয় আরো একটি গোলাম আযাদ করে। এই গোলাম তিনটি আযাদ করার পর প্রথম গোলামের কোন মালিক বের হয়ে গেলে কাফফারা স্বরূপ আযাদকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ দ্বিতীয় গোলামেরও কেউ মালিক হয়ে গেলে আযাদকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তৃতীয় গোলামের কোন মালিক বের হয়ে গেলে আযাদকারীর উপর একটি গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হবে। কারণ, আগে আদায় করায় পরেরটি কাফ্ফারা আদায় হবে না। প্রথম দিনের কাফফারা স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করার পর দ্বিতীয় দিনের জন্য আরো একটি গোলাম আযাদ করল। তারপর দেখা গেল দ্বিতীয়টির কোন মালিক বের হয়ে গেছে। এতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের জন্য একটি গোলাম আযাদ করা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। প্রথমটিরও মালিক বের হয়ে গেলে তার উপর একটি মাত্র কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। প্রথমটি ও তৃতীয়টির মালিক বের হয়ে গেলে একটি মাত্র গোলাম আযাদ করতে হবে তৃতীয় দিনের জন্য।

৮. মাসআলা ঃ দুই রমযানের ভিতর সহবাস করার পর প্রথম রমযানের কাফ্ফারা আদায় না করে থাকলে তার উপর যাহিরী রিওয়ায়েত মতে প্রত্যেক সহবাসের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (বাদাই')। বাদশাহ্র উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য হলে, যদি সে হালাল মালে ধনী হয় আর তার উপর কারো কোন দেনা না থাকে, তবে তাকে গোলাম আযাদ করার ফাতওয়া দেয়া হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। রমযান মাস বৃহস্পতিবারে শুরু হলে এবং আরাফাও বৃহস্পতিবারে হলে ঐ দিন হবে আরাফার দিন, ঈদুল আযহার দিন হবে না। ঐ দিন কুরবানী করলে তা জাইয হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। কেউ যদি আলী (রা)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ يوم نحركم يوم صومكم অর্থাৎ 'তোমাদের কুরবানীর দিন হল, তোমাদের রোযার দিন।' একথার উপর কেউ আস্থা স্থাপন করতে চাইলে, তার আস্থা স্থাপন জাইয নয়। কারণ আলী (রা)-এর একথার দ্বারা সম্ভব ঐ বছরটি উদ্দেশ্য ছিল, চিরকাল উদ্দেশ্য ছিল না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ উল্লেখ্য যে, জরুরী ফরয রোযাসমূহ তের প্রকার। তন্মধ্যে সাত ধরনের রোযা লাগাতার রাখা ওয়াজিব। আর তা হল ১. রমযানের রোযা, ২. কাফ্‌ফারায়ে কাতলের রোযা, ৩. কাফ্‌ফারায়ে যিহারের রোযা, ৪. কাফ্‌ফারায়ে কসমের রোযা, ৫. কাফ্‌ফারায়ে রমযানের রোযা, ৬. নির্দিষ্ট মানতের রোযা, ৭. নির্দিষ্ট কসমের রোযা।

ছয় ধরনের রোযা লাগাতার রাখা ওয়াজিব নয়। তা হল ১. রমযানের কাযা, ২. হজ্জে তামাত্তু'র রোযা, ৩. ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করার রোযা, ৪. ইহরাম অবস্থায় শিকারের বিনিময়ের রোযা, ৫. মুতলাক মানতের রোযা, ৬. কসমের রোযা। যেমন কেউ বলল, الله لاصومن شهرا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমি একমাস রোযা রাখব (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। রমযানের কাযা আদায় করাতে ইখতিয়ার থাকলেও লাগাতার আদায় করাটাই শীঘ্র দায়িত্বমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ স্মর্তব্য যে, লায়লাতুল কদ্‌র তালাশ করা মুস্তাহাব। লায়লাতুল কদর বছরের সেরা রজনী (মি'রাজুদ দিরায়া)। ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত যে, লায়লাতুল কদর হয়ে থাকে রমযান মাসে। তবে তা কোন্ রাতে তা জানা যায়নি। এ রাতটি আগ-পিছ হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও মুহাম্মদ (র)-এর মতও অনুরূপ। তবে তাঁদের মতে রাতটি নির্দিষ্ট। তা আগ-পিছ হয় না। মানজুমা ও তার ভাষ্য গ্রন্থসমূহে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে (ফাতহুল কাদীর ঃ ইতিকাফ পরিচ্ছেদ)। সুতরাং কেউ যদি তার গোলামকে বলে, "তুমি লায়লাতুল কদরে আযাদ" তার একথা যদি রমযান আসার পূর্বে বলে, তবে মাস শেষে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। যদি কথাটি রমযানের এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বলে, তবে ইমাম আবূ হনীফা (র)-এর মতে পরবর্তী বছরের রমযান অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত গোলামটি আযাদ হবে না। কারণ, হতে পারে লায়লতুল কদর অতীত মাসের প্রথম রাতে ছিল, নতুবা আগামী রমযানের শেষ রাতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা হতে একরাত অতীত হয়ে গেলে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। "মুলতাকাল বিহার" গ্রন্থে লিখিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কথা অগ্রগণ্য (মিরাজুদ দিরায়া)। একথার উপরই ফাতওয়া (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

১১. মাসআলা ঃ অনেক সাধারণ লোক হতে এরূপ মানত পরিলক্ষিত হয় যে, তারা কোন নেককার ব্যক্তির কবরে গমন করে এবং পর্দা উঠিয়ে বলে, "হে আমার অমুক সায়্যিদ! যদি আমার প্রয়োজনটি সম্পাদন করে দেন, তবে আমার পক্ষ থেকে আপনাকে এত পরিমাণ স্বর্ণ দান করব।" ইজমা মতে এসব মানত বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি এরূপ বলে, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য মানত করছি, যদি আমার রোগ আরোগ্য হয়ে যায় অথবা অন্য কোন কাজ হয়ে যায়, তবে আমি সায়্যিদা নাফীসা অথবা তার মত অন্য কোন লোকের দরগাহের ফকীরদেরকে খানা

খাওয়াবো বা সেখানকার মসজিদের জন্য চাটাই খরীদ করে দিব অথবা সেখানের আলোর জন্য তেল খরীদ করে দিব কিংবা সেখানকার খাদিমগণকে দিরহাম দিব এবং এ প্রকার জিনিসসমূহ যেগুলোতে ফকীরগণের উপকার হয় এবং আল্লাহ্‌র জন্য মানত উদ্দেশ্য হয় আর উদ্দিষ্ট শায়খের আলোচনা শুধু এজন্য আসে যে, তিনি হকদারগণের উপর মানতের মাল ব্যয় করার স্থল, তবে এরূপ মানত জাইয হবে। কিন্তু ফকীরগণ ছাড়া অন্যদেরকে তা দান করা জাইয নয়। আলিমগণ ও শায়খের খাদেমদের জন্য তা গ্রহণ করাও জাইয নয়। অবশ্য যদি তাদের কেউ ফকীর হয়, তাহলে সে গ্রহণ করতে পারবে। জেনে রাখবে মৃত ফকীর-দরবেশদের নৈকট্য হাসিল করার জন্য তাদের কবরে যে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়া হয়, তা ইজমা মতে হারাম। যদি না এ সব টাকা-পয়সা জীবিত লোকদের মধ্যে খরচ করা হয়। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আফসোস! এ ফিতনায় বহু লোক আক্রান্ত (আন্ নাহ্‌রুল ফায়িক, আল বাহ্‌রুর রায়িক)।

মুজাহিদ (র) বলেন, "রমযান এসেছে, রমযান চলে গেছে" বলা মাকরূহ। তিনি আরো বলেন, সম্ভবত রমযান আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্য থেকে একটি নাম। কিন্তু "রমযান মাস এসেছে" এরূপ বলা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, এরূপ বলাও মাকরূহ্ এজন্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) মুজাহিদ (র)-এর কথাকে রদ করেননি। বিশুদ্ধতম সিদ্ধান্ত হল, এরূপ বলা মাকরূহ্ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الْحَجِّ
অধ্যায় ঃ হজ্জ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ হজ্জ

[এই অধ্যায়ে সতরটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের সংজ্ঞা ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি

হজ্জের সংজ্ঞাও এর ফরযিয়্যাত, হজ্জের ওয়াক্ত, শর্ত, রুক্ন, ওয়াজিব, সুন্নাত, আদাব এবং নিষিদ্ধ কার্যসমূহের বর্ণনা

হজ্জের সংজ্ঞা ঃ নির্দিষ্ট কার্যসমূহ তথা হজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ করা এবং নির্ধারিত সময়ে আরাফাতে উকূফ করাকে শরীআতের পরিভাষায় হজ্জ বলা হয় (ফাতহুল কাদীর)।

১. মাসআলা ঃ হজ্জের ফরযিয়্যাত ঃ হজ্জ ফরয। এর ফরযিয়্যাত অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন দলীল দ্বারা প্রমাণিত[১]। কেউ যদি তা অস্বীকার করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয (মুহীত ঃ সুরুখসী)। ফরয হওয়া মাত্রই তা আদায় করা ফরয। এটাই বিশুদ্ধতম মত। যদি এ বছর হজ্জ আদায় করতে পারে তবে পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্ব করা জাইয নেই (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। যদি বিলম্ব করে পরবর্তী বছর তা আদায় করা হয়, তবে আদায় বলে গণ্য হবে (আল–বাহরুর রায়িক)। ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে ফরয হওয়া মাত্রই হজ্জ করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য বিলম্ব না করে সাথে সাথে আদায় করা উত্তম (খুলাসা)। ফকীহ্‌দের এ মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সুস্থ থাকার ধারণা প্রবল হয়। বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা রোগের কারণে মরে যাওয়ার ধারণা প্রবল হলে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত মতানুসারে এ ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপকতা আর থাকবে না। বরং বিলম্ব না করে ঐ বছরই হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব (আল–জাওহারাতুন নায়্যারা)। ফকীহ্‌দের মতভেদের ফলাফল এই যে, যারা বলে হজ্জ তৎক্ষণাৎ ওয়াজিব হয়, তাদের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার পর কেউ যদি তা আদায় না করে, তবে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ কোন ব্যক্তি যদি শেষ জীবনে হজ্জ করে নেয়, তবে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত মতে তার গুনাহ্ আর থাকবে না। যদি হজ্জ না করে মারা যায়। তবে সকলের মতে সে গুনাহ্গার হবে।

২. মাসআলা ঃ হজ্জের সময় নির্দিষ্ট কয়েক মাস। আর তা হল, শাওয়াল, যিলকাদা এবং যিলহাজ্জের দশ দিন। কেউ যদি হজ্জের মাস আসার পূর্বে হজ্জের কোন আমল যেমন তাওয়াফ বা সাঈ করে, তবে তা জাইয হবে না। অবশ্য হজ্জের মাসে করলে জাইয হবে (যহীরিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে ঃ

(১) হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার প্রথম শর্ত হল ঃ মুসলমান হওয়া। কোন ব্যক্তি কুফরী অবস্থায়

১. কুরআন মজীদের আয়াত, অসংখ্য হাদীছ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা হজ্জ ফরয হওয়া প্রমাণিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ পরিমাণ মালের মালিক হয়েছিল যে, মুসলমান হলে তার উপর হজ্জ ফরয হত। সে যদি পরে গরীব অবস্থায় মুসলমান হয়, তবে সাবেক মালদারীর কারণে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান অবস্থায় হজ্জ করতে সক্ষম হয় এবং হজ্জ না করে, এক্ষেত্রে সে যদি পরে গরীব হয়ে যায়, তাহলে ঋণের ন্যায় তার দায়িত্বে হজ্জ বাকী থেকে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। হজ্জ করার পর কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায়, অতঃপর পুনরায় মুসলমান হয়, তাহলে এ অবস্থায় সে হজ্জ করতে সক্ষম হলে তার উপর হজ্জ পুনরায় ওয়াজিব হবে (সিরাজিয়্যা)।

(২) হজ্জ ফরয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল ঃ জ্ঞানবান হওয়া। পাগলের উপর হজ্জ ফরয নয়। উন্মাদ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয কিনা এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

(৩) হজ্জ ফরয হওয়ার তৃতীয় শর্ত হল ঃ বালিগ হওয়া। না-বালিগের উপর হজ্জ ফরয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন বালক যদি বালিগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করে, তবে এতে তার ফরয হজ্জ আদায় হবে না। এ হজ্জ নফল হবে। যদি ইহ্রাম বাঁধার পর আরাফায় অবস্থানের আগে বালিগ হয় এবং সে যদি পূর্ববর্তী ইহরামের উপর বাকী থাকে, তবে এ হজ্জ নফল হবে। আর বালিগ হওয়ার পর যদি নতুন করে লাব্বাইকা পড়ে অথবা ইহরামকে নবায়ন করে নেয়, এরপর আরাফায় অবস্থান করে, তবে সকলের মতে ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (শরহুত তাহাবী)। অনুরূপভাবে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে পাগল যদি সুস্থ হয় অথবা কোন কাফির যদি মুসলমান হয়, তবে নতুনভাবে ইহরাম বাঁধবে (বাদাই')। যদি কোন বালক ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে চলে যায়, এরপর মক্কায় স্বপ্নদোষ হয়, এমতাবস্থায় সে যদি মক্কাতে ইহরাম বাঁধে, তবে তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করায় তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(৪) হজ্জ ফরয হওয়ার ৪র্থ শর্ত হল ঃ আযাদ হওয়া। গোলামের উপর হজ্জ ফরয নয়। গোলাম মুদাব্বার হোক অথবা উম্মে ওয়ালাদ অথবা মুকাতাব অথবা আংশিক আযাদ হোক অথবা হজ্জের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত হোক--সবই এক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মক্কাতে থাকলেও গোলামের উপর হজ্জ ফরয হবে না। কেননা, গোলাম অন্যের মালিকানাধীন ব্যক্তি। তার নিজস্ব কোন মালিকানা নেই (আল-বাহরুর রায়িক)। গোলাম যদি আযাদ হওয়ার পূর্বে মনিবের সাথে হজ্জ করে, তবে এতে ফরয হজ্জ আদায় হবে না। আযাদ হওয়ার পর পুনরায় হজ্জ করতে হবে। যদি পথে ইহরাম বাঁধার পূর্বে আযাদ হয়ে যায় এবং পরে ইহরাম বেঁধে হজ্জ করে, তবে ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। আযাদ হওয়ার পূর্বে যদি ইহরাম বাঁধে তারপর আযাদ হয়ে নতুনভাবে ইহরাম বেঁধে হজ্জ করে, তবে এতেও ফরয হজ্জ আদায় হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(৫) হজ্জ ফরয হওয়ার পঞ্চম শর্ত হল ঃ প্রয়োজনীয় রসদপত্র এবং যাতায়াতের জন্য সওয়ারী সংগ্রহের ব্যাপারে সামর্থবান হওয়া। তা মালিকানা হিসাবে হোক অথবা ভাড়া গ্রহণের মাধ্যমে হোক উভয় অবস্থাতেই হজ্জ ফরয হবে। কিন্তু ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত সওয়ারী সংগ্রহের ব্যাপারে সামর্থবান হলে অথবা শুধু ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে এ পরিমাণ মালের অধিকারী হলে

হজ্জ ফরয হবে না। তার উপর যাদের অনুগ্রহ রয়েছে, যেমন মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি তাদের পক্ষ হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হোক অথবা অন্য কোন বেগানা মানুষের পক্ষ হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হোক ,কোন অবস্থাতেই হজ্জ ফরয হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কেউ কাউকে হজ্জ করার জন্য টাকা-পয়সা দেয়, তবে তা গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। চাই অন্য কোন লোকে দান করুক অথবা নিজের মা-বাপে দান করুক (ফাতহুল কাদীর)। প্রয়োজনীয় রসদপত্র এবং যাতায়াতের জন্য সওয়ারী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার অর্থ হল, প্রয়োজনীয় খরচ বাদে অতিরিক্ত মালের মালিক হওয়া। অর্থাৎ থাকার ঘর-বাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদেম এবং ঘরের আসবাবপত্র ছাড়া এ পরিমাণ মালের মালিক হওয়া যা দ্বারা সওয়ার হয়ে মক্কায় আসা-যাওয়া করা সম্ভব। পায়ে হেঁটে নয়। এ সম্পদ ঋণমুক্ত হতে হবে। এমনিভাবে তা হজ্জ করে ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবারের ব্যয় ও বাড়ী-ঘর মেরামত করার প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা হতেও অতিরিক্ত হতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।। হাজী সাহেবের এবং পরিবারের ব্যয় বলতে এখানে মধ্যম ধরনের ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অপব্যয় এবং কৃপণতা উভয়ই পরিত্যাজ্য (তাবয়ীন)। পরিবার বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যাদের খোরপোশ তার উপর ওয়াজিব (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

যাহিরী রিওয়ায়েত মতে হজ্জকারী ব্যক্তির ফিরে আসার পরের খরচ এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয় (তাবয়ীন)। সওয়ারী বলে এমন সওয়ারী বুঝানো উদ্দেশ্য, যাদ্বারা মক্কা শরীফ আসা যাওয়া করা যায়। কেউ যদি এমন উষ্ট্রীর মালিক হয় যার উপর সওয়ার হয়ে হজ্জের সফর পুরা করা যায়, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। হজ্জকারী ব্যক্তি যদি বিত্তশালী হয় এবং সে যদি সওয়ারীর এক পার্শ্বের উপর সওয়ার হতে সক্ষম হয়, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। অন্যথায় হবে না। পালাক্রমে সওয়ার হতে সক্ষম ব্যক্তিকে সওয়ারী সংগ্রহে সক্ষম বলে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ দুই ব্যক্তি যদি পালাক্রমে সওয়ার হওয়ার জন্য এ মর্মে একটি উট ভাড়া করে যে, একজন প্রথম মনজিলে সওয়ার হবে আর অপর জন সওয়ার হবে দ্বিতীয় মনযিলে অথবা এক "ফরসখ"[১] করে পালা বন্টন করা হলে এতে সামর্থ প্রমাণিত হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি এ পরিমাণ মালদার হয় যে, সে কেরায়া করে এক মনযিল যেতে পারে, পরে আবার এক মনযিল তার পায়ে হেঁটে যেতে হয়, তবে সে বিত্তশালী বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইয়ানাবি কিতাবে উল্লেখ আছে যে, মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ যাদের বাড়ী হতে মক্কা শরীফ যেতে তিন দিনের চেয়েও কম সময় লাগে, তারা যদি হেঁটে যেতে সক্ষম হয় তবে সওয়ার হতে সক্ষম না হলেও তাদের উপর হজ্জ ফরয হবে। অবশ্য বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজেদের এবং পরিবারবর্গের খাদ্যের সংস্থান করে যাওয়া তাদের জন্য আবশ্যক (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।। কোন গরীব ব্যক্তি যদি পায়ে হেঁটে হজ্জ করে আসে এবং এরপর মালদার হয়, তবে তার উপর দ্বিতীয়বার হজ্জ ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

হজ্জ করতে পারে এ পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর কেউ যদি বিয়ে করার ইচ্ছা করে তবে সে প্রথমে হজ্জ করবে। বিয়ে করবে না। কেননা, এটা এমন একটি ফরয, যা আল্লাহ্ তাঁ

১. এক ফরসখ তিন মাইল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বান্দার উপর অপরিহার্য করে দিয়েছেন (তাবয়ীন)। যদি কারো বসবাসের ঘর, খিদমতের গোলাম, পরিধানের বস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকে, তবে সে সামর্থবান বলে গণ্য হবে না। তাজরীদ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কারো যদি এমন ঘর থাকে যেখানে সে বসবাস করে না, এমন এবং গোলাম থাকে যার থেকে সে খিদমত গ্রহণ করে না, তবে তার উপর ওয়াজিব হল এগুলো বিক্রি করে হজ্জ করা। কারো বসবাস করার ঘর বা এ জাতীয় কোন কিছু নেই কিন্তু এ পরিমাণ টাকা-পযসা আছে, যাদ্বারা সে হজ্জ করতে পারে অথবা এ টাকা-পয়সা দ্বারা বাসস্থান, খাদিম এবং খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে পারে, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। এ অবস্থায় এ টাকা-পয়সা যদি সে হজ্জ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যয় করে, তবে গুনাহ্গার হবে (খুলাসা)। যদি কারো নিকট অব্যবহৃত কাপড় থাকে এবং এ কাপড় বিক্রি করলে যদি সে হজ্জ করতে সক্ষম হয়, তবে এ কাপড় বিক্রি করে হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব।

যদি কারো এমন বড় ঘর থাকে, যার একাংশ তার থাকার জন্য যথেষ্ট, তবে হজ্জ করার জন্য অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা তার উপর অপরিহার্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কারো বসবাসের এমন বড় ঘর থাকে, যা বিক্রি করে ছোট একখানা ঘর করা যায় এবং অতিরিক্ত টাকা দিয়ে হজ্জও করা যায় এ ক্ষেত্রে বড় ঘরটি বিক্রি করে হজ্জ করা তার জন্য আবশ্যক নয় (মুহীত)। যদি করে তবে তা উত্তম হবে (ঈযাহ)। হজ্জের জন্য বসবাসের ঘর বিক্রি করে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করা কোন ইমামের নিকটই আবশ্যক নয় (আল-বাহ্রুর রায়িক)। যদি কোন ফকীহ্ তথা আলিমের নিকট ফিকাহ্-এর কিতাব থাকে এবং এগুলো পড়াশুনা করার তার দরকার থাকে তবে সে হজ্জ করার ব্যাপারে সামর্থবান বলে গণ্য হবে না। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি মূর্খ হয়, তবে সে সামর্থবান বলে বিবেচিত হবে এবং এগুলো বিক্রি করে হজ্জ করা তার জন্য আবশ্যক হবে। আর যদি কারো নিকট ডাক্তারী এবং জ্যোতিষী কোন পুস্তক থাকে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে হজ্জ আদায়ে সামর্থবান বলে গণ্য করা হবে। এগুলো তার প্রয়োজনীয় হোক অথবা না হোক--উভয় অবস্থাতেই তার উপর হজ্জ ফরয হবে (মুহীত)।

কোন কোন আলিমের মতে হজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে সে যদি এর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে সে যদি এ পরিমাণ মালদার হয় যে, হজ্জের খরচ বহন করতে পারে এবং ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের ও পরিবারের পূর্ণ ব্যয়ও নির্বাহ করতে সক্ষম হয় আর হজ্জ করাতে তার ব্যবসায়ের মূলধনেও কোন লোকসান হয় না, বরং মূলধন ঠিক থাকে, তবে হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব। নতুবা ওয়াজিব হবে না। আর সে যদি কারিগর হয় তবে হজ্জের যাবতীয় খরচ বাদে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের ও পরিবারের পূর্ণ খরচ আদায় করে যদি তার যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম বাকী থাকে, তবে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। হজ্জে গমনেচ্ছুক ব্যক্তি যদি এ পরিমাণ জমির মালিক হয় যে, এর থেকে সামান্য বিক্রি করলে তার আসা-যাওয়ার খরচ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত তার নিজের এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ হয়ে যায় আর বাকী যমীন এ পরিমাণ থেকে যায় যে, এর উৎপন্ন ফসল দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। তা না হলে হজ্জ ফরয হবে না। আর উক্ত ব্যক্তি যদি কৃষক হয় এবং এ পরিমাণ মালের

মালিক হয় যে, যাতায়াত খরচ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত তার নিজের এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি তথা গরু- বাছুর ইত্যাদি তার নিকট থেকে যায়, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। তা না হলে ফরয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(৬) **হজ্জ ফরয হওয়ার ৬ষ্ঠ শর্ত হল ঃ** হজ্জ ফরয হওয়ার ইল্ম থাকা। যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে থাকে, তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে দারুল ইসলামে থাকে। চাই সে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা জানুক অথবা না জানুক। এ ক্ষেত্রে জন্মগতভাবে মুসলমান হওয়া এবং পরে মুসলমান হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরে মুসলমান হয়েছে এরূপ ব্যক্তিকেও সে জানে বলে ধরে নেয়া হবে। যদি দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা যদিও তারা পর্দানশীন হয় অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দারুল হরবে অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে হজ্জের ফরয়িয়্যাত সম্পর্কে জানায়, তবে তার উপর হজ্জ ফযর হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে খবরদাতা ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ, বালিগ এবং আযাদ হওয়া শর্ত নয় (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

(৭) **হজ্জ ফরয হওয়ার আরেকটি শর্ত হল ঃ** শরীর সুস্থ থাকা। অতএব লেংড়া, পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং উভয় পা কাটা ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ফরয নয়। এরূপ লোক বিত্তশালী হলে এবং প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও সওয়ারী সংগ্রহে সক্ষম হলে অন্যের দ্বারা হজ্জ করানোও তাদের উপর ওয়াজিব নয়। এমনকি অসুস্থ অবস্থায় হজ্জ করার ব্যাপারে কাউকে ওসিয়ত করাও জরুরী নয়। অনুরূপভাবে যে বৃদ্ধ সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারে না, তার উপর এবং অসুস্থ ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ওয়াজিব নয় (ফাতহুল কাদীর)। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যাহিরী মাযহাব। এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। তাদের যাহিরী মতে উপরোক্ত ব্যক্তিদের উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। মা যূর অবস্থায় তারা যদি অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করায়, তবে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য ওযর খতম হয়ে গেলে পুনরায় হজ্জ করা তাদের উপর ওয়াজিব। "তুহ্ফা" নামক গ্রন্থে এ মতটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, গ্রন্থকার তার কিতাবে কেবল এমতটিই উল্লেখ করেছেন। উসায়জাবী (র)-এর মতও এই। আল্লামা ইব্ন হুমাম (র)। এ মতটিকে তৎপ্রণীত কিতাব ফাতহুল কাদীরে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন (আল-বাহ্রুর রায়িক)। বন্দী ব্যক্তি এবং বাদশাহ যাদেরকে হজ্জে যেতে বাধা দেন তাদের উপরও হজ্জ ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে অন্য কারো মাধ্যমে হজ্জ করিয়ে নেয়াও তাদের উপর ওয়াজিব নয় (আন্নাহ্রুল ফায়িক)। অন্ধ ব্যক্তি বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করে নিয়ে যাবার মত কোন লোক না থাকলে সশরীরে তার হজ্জে যাওয়া কোন ইমামের মতেই ওয়াজিব নয়। অবশ্য টাকা-পয়সা দিয়ে অন্য কাউকে তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো ওয়াজিব কিনা এ সম্বন্ধে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)। হতে এ সম্বন্ধে দুই ধরনের বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি প্রয়োজনীয় রসদপত্র এবং সওয়ারী সংগ্রহে সক্ষম হয় এবং সুস্থ থাকে এতদসত্ত্বেও হজ্জ না করে অতঃপর সে পঙ্গু বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে কাউকে টাকা-পয়সা

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়ে তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো অপরিহার্য। এতে কারো কোন মতভেদ নেই (মুহীত)। এসব লোক যদি কষ্ট করে নিজেরা হজ্জ করে নেয়, তাদের হজ্জ আদায় হয়ে যাবে । সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় হজ্জ করা তাদের আর দরকার হবে না (ফাতহুলকাদীর)।

(৮) হজ্জ ফরয হওয়ার অষ্টম শর্ত হল ঃ রাস্তা নিরাপদ হওয়া। আবুল লায়ছ (র)-এর মতে রাস্তা যদি সাধারণত নিরাপদ থাকে, তবে হজ্জ ওয়াজিব হবে। আর রাস্তা যদি নিরাপদ না থাকে, তবে হজ্জ ওয়াজিব হবে না। এটাই নির্ভরযোগ্য শর্ত (তাবয়ীন)। আল্লামা কিরমানী (র)। বলেন, সমুদ্রপথে যেস্থান থেকে হজ্জে যাত্রা করবে ঐ জায়গা হতে জাহাজে আরোহণ করা যদি নিরাপদ হয়, তবে হজ্জ ওয়াজিব হবে। তা না হলে হজ্জ ওয়াজিব হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত। সায়হুন, জায়হুন, ফুরাত এবং নীল এগুলো হল নদী। সমুদ্র নয় (ফাতহুল কাদীর)। দজলাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

(৯) হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার নবম শর্ত হল ঃ মক্কা যদি তিন দিনের দূরত্বের পথ হয়, তবে মহিলাদের সাথে কোন মাহ্‌রাম পুরুষ থাকা আবশ্যক। যুবতী এবং বৃদ্ধা উভয় প্রকার মহিলার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। যদি তিন দিনের কম দূরত্বের পথ হয়, তবে মহিলারা মাহ্‌রাম ব্যতীতও হজ্জ করতে পারবে (বাদাই')। মাহ্‌রাম হল স্বামী অথবা ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে আত্মীয়তা দুগ্ধ সম্পর্ক অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে চির দিনের জন্য বিবাহ-শাদী হারাম (খুলাসা)। মাহরাম আমানতদার এবং বালিগ হওয়া শর্ত। আযাদ হোক অথবা গোলাম, কাফির হোক অথবা মুসলমান এতে কোন ক্ষতি নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মাহ্‌রাম যদি অগ্নিপূজক হয় এবং তার ধারণায় কোন মহিলাকে বিবাহ করা জাইয হয়, তবে এর সাথে হজ্জের সফর করবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। বালিগের নিকটবর্তী বালক, বালিগের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। নিজের গোলাম কোন মহিলার জন্য মাহরাম হতে পারে না (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যে বালকের এখনো পর্যন্ত স্বপ্নদোষ হয়নি এবং যে পাগল সুস্থ হয় না তারা মাহ্‌রাম হতে পারবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। হজ্জযাত্রী মহিলা নিজের মাল হতে সাথী মাহ্‌রাম পুরুষের খরচ এবং ব্যয়ভার বহন করবে। যাতে সেও তার সাথে হজ্জ করতে পারে। মাহরাম পাওয়া গেলে মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয হবে। যদিও তার স্বামী অনুমতি না দেয়। নফল হজ্জ হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হজ্জের সফরে বের হতে পারবে না। মাহ্‌রাম না থাকলে হজ্জের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা কোন মহিলার উপর ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে রাস্তা নিরাপদ হওয়া, শরীর সুস্থ থাকা এবং মহিলার সাথে মাহ্‌রাম কোন পুরুষ থাকা হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, না এগুলো আদায় আবশ্যক হওয়ার শর্ত। কারো মতে এগুলো হজ্জ ওয়াজেব হওয়ার শর্ত। কিন্তু কোন কোন ফকীহ্-এর মতে এগুলো আদায় আবশ্যক হওয়ার শর্ত। বস্তুত দ্বিতীয় মতটিই সহীহ্। ইমামদের উপরোক্ত মতভেদের ফল এ দাঁড়াবে যে, কোন মহিলা যদি হজ্জ করার আগে মারা যায় তবে প্রথমোক্ত মতানুসারে ওসিয়ত করে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু শেষোক্ত মতানুসারে ওসিয়ত করে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক (নিহায়া)।

(১০) হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি শর্ত হল ঃ হজ্জযাত্রী মহিলা হলে ইদ্দতের মধ্যে না

থাকা তার জন্য আবশ্যক। এ ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক অথবা তালাকের কারণে, তালাক রজঈ হোক অথবা বায়িন--সব অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (শরহুত তাহ্‌বী)। অতএব, স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী ইদ্দত অথবা তালাকের ইদ্দতের অবস্থায় কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জাইয নেই। অনুরূপভাবে যদি পথিমধ্যে কোন শহরে অবস্থান কালে ইদ্দত কাল শুরু হয়ে যায় এবং সেখান হতে মক্কা শরীফ যদি তিন দিনের সফরের পথ হয়, তবে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ শহর হতে বের হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে বের হওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত করতে হয় এবং মহিলা যদি সফররত থাকে, তবে রজঈ তালাক হলে স্বামী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। এ অবস্থায় উত্তম হল, তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নেয়া। আর বায়িন তালাক হলে স্বামী বেগানা পুরুষের মতই গণ্য হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার যে সব শর্তের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন প্রয়োজনীয় রসদপত্র এবং সওয়ারী ইত্যাদি এগুলো আছে বলে তখন ধর্তব্য হবে যদি কারো নিকট তার শহরের লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা করার সময় তার নিকট এগুলো মওজুদ থাকে। সুতরাং কেউ যদি বছরের প্রথম দিকে হজ্জের মাসের আগে এবং শহরবাসী লোকদের মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার পূর্বে এসব রসদপত্র এবং সওয়ারীর মালিক হয়, তবে এ সব মালামাল সে যে কোন কাজে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে। টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ার পর শহরবাসী লোকেরা রওয়ানা করলে এ অবস্থায় তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য শহরবাসী লোকদের হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার সময় ঘনিয়ে আসলে এ টাকা-পয়সা হজ্জ ব্যতীত অন্য কাজে খরচ করা জাইয হবে না। যদি হজ্জ ছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করে, তবে গুনাহ্‌গার হবে এবং হজ্জ করা তার উপর ওয়াজিব থেকে যাবে (বাদাই')।

৪. মাসআলা ঃ হজ্জ আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্ত তিনটি ঃ (১) ইহরাম, (২) কা'বাগৃহ, ও (৩) হজ্জের সময় হওয়া (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৫. মাসআলা ঃ হজ্জের রুকন দুইটি ঃ (১) 'আরাফার ময়দানে অবস্থান করা (২) এবং তাওয়াফে যিয়ারত করা। অবশ্য তাওয়াফে যিয়ারত অপেক্ষা আরাফায় অবস্থান করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ (নিহায়া)। এমনকি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে কেউ যদি স্ত্রীর-সহবাস করে, তবে তার হজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্জ ফাসিদ হবে না (শরহে জামি' সগীর ঃ কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি (১) সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা। (২) মুযদালিফায় অবস্থান করা। (৩) কংকর নিক্ষেপ করা। (৪)। মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছাঁটা (৫)। বিদায়ী তাওয়াফ করা (শরহুত তাহাবী)।

৭. মাসআলা ঃ হজ্জের সুন্নাত হল নিম্নরূপ ঃ (১) তাওয়াফে কুদুম করা, এতে রমল করা অর্থাৎ বীরের ন্যায় হাঁটা, অথবা ফরয তাওয়াফে এরূপ করা, (২) সবুজ বাতির মধ্যখানে সাঈ করা, (৩) কুরবানীর তিন দিন রাতে মিনায় অবস্থান করা, (৪) সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা এবং (৫) সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে মিনায় রওয়ানা করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ফাতহুল কাদীর)। (৬) রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা এবং (৭) তিন জমরায় কংকর নিক্ষেপ করার মধ্যে তারতীব রক্ষা করা সুন্নাত (আল–বাহ্রুর রায়িক)।

৮. মাসআলা ঃ হজ্জের মুস্তাহাব হল, হজ্জে বের হওয়ার আগে নিজের সমুদয় করয পরিশোধ করা (যহীরিয়্যা)। এ সময় হজ্জের সফরের ব্যাপারে কোন জ্ঞানী লোকের সাথে পরামর্শ করা। হজ্জের ব্যাপারে পরামর্শ করা নয়। পরামর্শ করবে সফরের ব্যাপারে। কেননা, এতে মঙ্গল নিহিত আছে। ইস্তিখারা করবে। ইস্তিখারার সুন্নাত নিয়ম হল, সূরা ইখলাস দিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)। ইস্তিখারার যে দু'আ পড়েছেন, তা পড়বে। এরপর তাওবা করবে এবং নিয়্যাত খালিস করে নিবে। জুলুম করে কারো মাল আত্মসাৎ করে থাকলে তা মালিকের কাছে ফেরত দিবে এবং তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আরো কারো প্রতি অন্যায় করে থাকলে তার থেকেও অনুরূপভাবে ক্ষমা চেয়ে নিবে (ফাতহুল কাদীর)। ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি করে থাকলে তা পূর্ণ করে নিবে। এর জন্য অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে কখনো এরূপ করবে না বলে দৃঢ়সংকল্প করবে (আল–বাহ্রুর রায়িক)। রিয়া, অহংকার ও তাকাব্বুরী ত্যাগ করবে। এ কারণেই সওয়ারীর উপর আরোহণ করাকে কোন কোন আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। কিন্তু কারো কারো মতে উপরোক্ত মন্দ স্বভাবের কাজগুলো ত্যাগ করার পর সওয়ারীর উপর আরোহণ করলে মাকরূহ্ হবে না। হালাল উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে। কেননা, হারাম মালের হজ্জ কবূল হয় না। অবশ্য ফরয আদায় হয়ে যায়। যদিও তা ডাকাতির মাল হয় (ফাতহুল কাদীর)।

যদি কোন ব্যক্তি হজ্জে যেতে ইচ্ছা করে এবং তার হালাল মালের মধ্যে যদি সন্দেহযুক্ত মাল থাকে, তবে ঋণ নিয়ে হজ্জ করবে এবং নিজের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হজ্জের সফরে নেক্কার সঙ্গী তালাশ করবে যে কোন কিছু ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দিবে, অস্থির হলে তাকে সান্ত্বনা দিবে, এবং অক্ষম হলে সাহায্য করবে। আত্মীয় সফর সঙ্গীর চেয়ে অনাত্মীয় সফরসঙ্গী উত্তম। এতে আত্মীয়তা ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই (ফাতহুল কাদীর)। "ইয়ানাবী" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি দিয়ে যাবে। পাক–পবিত্র অবস্থায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। পথে পরহিযগারী অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্র যিকির বেশী বেশী করবে। ক্রোধ ত্যাগ করবে। লোকের কথায় অধিক ধৈর্য ধারণ করবে। অযথা কথাবার্তা ত্যাগ করে শান্তভাবে থাকবে (তাতারখানিয়্যা)। ভাড়া করা সওয়ারী হলে এর উপর যে পরিমাণ বোঝা উঠানো সম্ভব ঐ পরিমাণ বোঝা উঠাবে। এর চেয়ে বেশী বোঝা উঠাবে না (ফাতহুল কাদীর)। সওয়ারীর উপর এর ক্ষমতার অধিক বোঝা উঠানো থেকে পরহিয করবে। অনুরূপভাবে একে প্রয়োজনীয় খাদ্য হতে কম দিবে না। নিজস্ব সওয়ারী হলেও এরূপ করবে না। হজ্জের সফরে ব্যবসা–বাণিজ্য না করা উত্তম। যদি ব্যবসা করে, তবে ছওয়াব কম হবে না (আল–বাহ্রুর রায়িক)। সফরের সামান খরীদ করার সময় বেশী দর–কষাকষি করবে না। পথ খরচের মধ্যে কারো সাথে শরীক হবে না। সফর সঙ্গীদের এক একজন এক এক দিন খানা খাওয়ানো উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর অনুসরণে বাড়ী হতে বৃহস্পতিবার দিন বের হওয়া মুস্তাহাব। তা না হলে মাসের প্রথম সোমবার দিনের অগ্রভাগে রওয়ানা করবে। সফরের পূর্বে

পরিবারের লোকজন এবং ভাই–বন্ধুদের থেকে বিদায় নিবে, তাদের নিকট ক্ষমা চাইবে এবং তাদেরকে দু'আ করতে বলবে। এ কাজের উদ্দেশ্যে সে উপরোক্ত লোকদের নিকট যাবে আর হজ্জের সফর শেষে বাড়ী ফেরার পর তারা তার নিকট আসবে (ফাতহুল কাদীর)।

দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের ন্যায় এ সফরে বের হবে। বাড়ী হতে বের হওয়ার আগে দুই রাকআত নামায আদায় করে নিবে। এমনিভাবে বাড়ীতে ফেরার পরও দুই রাকআত নামায আদায় করবে। নামাযান্তে বের হওয়ার সময় পড়বে ঃ

اللّٰهم بك انتشرت واليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللّٰهم انت ثقبى وانت رجائى اللّٰهم اكفنى ماهمنى ومالا اهتم به وما انت اعلم به منى عز جارك ولا اله غيرك اللّٰهم زودنى التقوى واغفرلى ذنوبى ووجهنى الى الخير اينما توجهت اللّٰهم انى اعوذبك من وعثاء السفر وكأبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر فى الاهل والمال –

ঘর হতে বের হওয়ার পর পড়বে ঃ

بسم الله ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم توكلت على الله اللّٰهم وفقنى لماتحب وترضى واحفظنى من الشيطان الرجيم –

এরপর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস একবার করে পড়বে (যহীরিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ সওয়ার হয়ে হজ্জ করা উত্তম। এর উপরই ফাতওয়া (সিরাজিয়া)। নাওয়াযিল এবং মুখতার গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে যে, কাছের পথ হলে পায়ে হেঁটে হজ্জ করা উত্তম আর দূরের পথ হলে সওয়ার হয়ে হজ্জ করা উত্তম (তাতারখানিয়্যা)। গাধার উপর সওয়ার হয়ে হজ্জ করা মাকরূহ্। উটের উপর সওয়ার হয়ে হজ্জ করা উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

মাসআলা ঃ সওয়ারীর উপর আরোহণ করার সময় বলবে ঃ

بسم الله والحمد لله الذى هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى جعلنى فى خير امة اخرجت للناس سبحان الذى سخرلنا هذا وماكنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ولاحمد لله رب العلمين (যহীরিয়্যা)।

হাজীদের জন্য উত্তম হল, প্রথমে হজ্জের কাজ সমাধা করবে, পরে মদীনা শরীফ যাবে। কুব্রা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ফরয হজ্জ না হলে প্রথমে যেটাই ইচ্ছা করতে পারবে। ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে যদি প্রথমে মদীনা শরীফ যায়, তবে তাও জাইয আছে (তাতারখানিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ হজ্জের কোন রুকনের বদলী নেই। কোন রুক্ন ছুটে গেলে দম তথা কুরবানী করেও এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। যখন আদায় করবে, তখন আদায় হয়ে যাবে। ওয়াজিব ছুটে গেলে এর বদলী দেওয়া জাইয। সুন্নাত এবং মুস্তাহাব ছুটে গেলে তাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু গুনাহ্ হবে (শরহুত তাহাবী)।

১১. মাসআলা ঃ হজ্জের মধ্যে যে সব কাজ নিষিদ্ধ ঃ তা দুই প্রকার। (১) কিছু কাজ এমন রয়েছে, যা নিজের সাথে সম্পর্কিত। তা ছয়টি-(১) স্ত্রী-সহবাস, (২) মাথা কামানো (৩) নখ কাটা, (৪) সুগন্ধি ব্যবহার করা (৫) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা (৬) এবং সেলাই করা কাপড় পরিধান করা।

১২. মাসআলা ঃ (২) এমন কাজ, যা অন্যের সাথে সম্পর্কিত তা হচ্ছে, হরমের ভেতরে ও বাইরে শিকারী জানোয়ার ধাওয়া করা এবং হরমের কোন গাছ কাটা (আল-জামিউস সগীর, কাযীখান, তুহ্ফা ও নিহায়া)।

আনুষঙ্গিক আরো কতিপয় মাসাইল

মাসআলা ঃ হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে মা-বাপের কোন একজন নারাজ থাকলে এবং তারা সন্তানের খিদমত ও সেবার মুখাপেক্ষী হলে সন্তানের জন্য হজ্জে গমন করা মাকরূহ্। কিন্তু খিদমতের মুখাপেক্ষী না হলে এ অবস্থায় সন্তানের হজ্জে গমন করাতে কোন গুনাহ্ হবে না। যদি মা-বাপ না থাকে, তবে দাদা-দাদীর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "সিয়ারে কবীর" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি বাবা মরে যাওয়ার আশংকা না থাকে, তবে হজ্জে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে যদি কারো স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং যাদের খোরপোশ তার দায়িত্বে, তারা যদি হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে নারাজ থাকে এবং তাদের ক্ষতির কোন আশংকা না থাকে, তবে হজ্জে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। আর যাদের খোরপোশ তার দায়িত্বে নয়, এরূপ লোকেরা হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে নারাজ থাকলে এবং গেলে ক্ষতির আশংকা থাকলে এ অবস্থায়ও হজ্জে যাওয়াতে কোন দোষ নেই (মুহীত)।

মাসআলা ঃ শায়খ আবুল লায়ছ (র)-এর ''ফাতাওয়া'' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, দাড়িহীন-খুবসুরত বালক হজ্জে যেতে ইচ্ছা করলে তার পিতা তাকে দাড়ি উঠা পর্যন্ত বারণ করতে পারবে। "মুলতাকাত" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ফরয হজ্জ আদায় করা মা-পাপের হুকুম পালন করার চেয়ে উত্তম। কিন্তু নফল হজ্জের চেয়ে মা-বাপের হুকুম পালন করা উত্তম। "কুরবা" কিতাবে আছে, সফর যদি বিপদসংকুল হয়, যেমন সামুদ্রিক ভ্রমণ, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জে যাওয়া উচিত নয় (তাতারখানিয়্যা)। যার করয আছে, তার জন্য জিহাদ এবং হজ্জ করতে যাওয়া মাকরূহ্। যদিও তার নিকট এ পরিমাণ মাল না থাকে যার দ্বারা সে করয পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু করয দাতারা অনুমতি দিলে যেতে পারবে। কেউ যদি করযের জামিন হয় এবং ঋণদাতা ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে হয়, তবে করযদাতা এবং জামিন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে

না। আর জামিন যদি ঋণদাতা ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া হয়, তবে করয তাগাদাকারী ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে না। কিন্তু জামিনের অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মীকাতের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ মীকাত-যা ইহ্রাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না, তা পাঁচটি। (১) মদীনা-বাসীদের জন্য যুলহুলায়ফা, (২) ইরাকবাসীদের জন্য যাতে ইরক, (৩) সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, (৪) নজদবাসীদের জন্য কার্ন এবং (৫) ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম।[১] মীকাত নির্ধারণ করাতে ফায়দা হচ্ছে এই যে, মীকাতে ইহ্রাম না বেঁধে আরো অগ্রসর হয়ে বিলম্বে ইহ্রাম বাঁধা নিষেধ (হিদায়া)। মীকাতে পৌঁছার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জাইয আছে। ইহ্রামের অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ এরূপ কাজে পতিত হওয়ার আশংকা না থাকলে মীকাতের আগে ইহ্রাম বাঁধাই উত্তম। তা না হলে মীকাতে পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম (আল-জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। মীকাতের বিষয়ে যেসব স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐ দেশবাসী এবং যারা এ স্থান হয়ে মক্কা শরীফ গমন করবে, তাদের সকলের জন্যই এ স্থান মীকাত হিসাবে গণ্য হবে (তাবয়ীন)। কেউ যদি নিজ মীকাত ইহ্রাম ছাড়া অতিক্রম করে অন্য মীকাতে গিয়ে ইহ্রাম বাঁধে, তবে তাও জাইয হবে। উত্তম হচ্ছে নিজ নিজ মীকাতে ইহ্রাম বাঁধা (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। এ হুকুম ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা মদীনাবাসীদের জন্য নিজ মীকাত হতে ইহ্রাম বাঁধাতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ভিন্নপথ ধরে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, যে পথে সাধারণত মানুষ যায় না, তবে সে মীকাত সোজা পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি সমুদ্র পথে সফর করে, তবে মীকাত বরাবর পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধবে। ইহ্রাম ছাড়া এ স্থান অতিক্রম করা জাইয নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। জলপথ বা স্থলপথে কেউ যদি দুই মীকাতের মধ্যপথ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে, তবে এতদুভয়ের যে কোন একটির বরাবর পৌঁছার পর ইহ্রাম বাঁধবে। অবশ্য যে মীকাত তুলনামূলকভাবে কিছুটা দূরে এর সোজা পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম (তাবয়ীন)। যদি রাস্তা এমন হয় যে, মীকাত সামনে পড়ে না, তবে মক্কা থেকে দুই মনজিল দূরে থাকা অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

৩. মাসআলা ঃ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের অভ্যন্তরে অথবা মীকাত ও হরমের মধ্যস্থলে হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে তাদের মীকাত হল হিল-যা মীকাত ও হরমের মাঝে অবস্থিত। তারা যদি হরমের সীমানায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত ইহ্রাম বাঁধতে বিলম্ব করে অর্থাৎ হরমের সীমানার কাছাকাছি পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধে তবু জাইয হবে (মুহীত)। মক্কাবাসী লোকেরা হজ্জের ইহ্রাম

১. বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান উপমহাদেশবাসীর মীকাত হল এটি। আজকাল প্লেনের সফরে প্লেনে উঠার পূর্বে নিজ গৃহ হতে অথবা হাজীক্যাম্প হতে ইহ্রাম বেঁধে নিবে। কারণ জেদ্দায় অবতরণের পূর্বেই ইয়ালামলাম এসে যায়। প্লেনের মধ্যে ঠিকভাবে ইহ্রাম বাধা যায় না। সামুদ্রিক জাহাজে হলে জাহাজে ইহ্রাম বাধতে অসুবিধা হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁধবে হরমে এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধবে 'হিল'–এ যেয়ে (কাফী)। অতএব উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি "হিল" নামক স্থানে পৌছে উমরার ইহ্রাম বাঁধবে এবং সে যে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে, এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই (মুহীত)। অবশ্য "তানঈম" নামক স্থান হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম (হিদায়া)। মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জাইয নেই। তারা হজ্জ বা উমরা আদায়ের ইচ্ছা করুক অথবা না করুক তাতে কোন পার্থক্য নেই। বিনা ইহ্রামে প্রবেশ করলে তাদের যিম্মায় হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। মীকাতের অভ্যন্তরে যেমন "বোস্তানী এলাকায়" বসবাসকারী লোকেরা প্রয়োজনে ইহ্রাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করলে ইহ্রাম ছাড়া প্রবেশ করলে হজ্জ বা উমরা আদায় হবে না (কাফী)। মক্কাবাসী লোকেরা লাকড়ি বা ঘাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে "হিল" নামক স্থানে যায়, তবে ইহ্রাম ছাড়াও মক্কায় প্রবেশ করা তাদের জন্য জাইয আছে। অনুরূপভাবে মীকাতের বাইরে বসবাসকারী কেউ যদি বোস্তানের বাশিন্দা হয়ে যায়, তবে তার জন্যও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্রামের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইহ্রামের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে। এগুলোর কোনটা রুক্ন এবং কোনটা শর্তের পর্যায়ের। রুক্ন ঐ কাজ, যা হজ্জের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রুক্ন দুই প্রকার ঃ (১) প্রথমটি কথা জাতীয়। অর্থাৎ لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك [১] বলা। তাল্বিয়া একবার পাঠ করা শর্ত। বেশী পাঠ করা সুন্নাত। তালবিয়া তরক করলে গুনাহ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। তালবিয়ার পরিবর্তে সুবহানাল্লাহ্, আল্হামদু লিল্লাহ্, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ আকবর অথবা অন্য কোন যিকির করলে এবং এর দ্বারা ইহ্রামের নিয়্যাত করলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে ইহ্রাম সহীহ্ হবে। চাই সে উত্তম রূপে তালবিয়া পাঠ করতে সক্ষম হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে কেউ যদি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় তালবিয়া পড়ে, তবে তাতেও ইহ্রাম সহীহ্ হবে। চাই সে উত্তমরূপে আরবী পড়তে সক্ষম হোক বা না হোক (শরহুত্ তাহাবী)। অবশ্য তালবিয়া আরবীতে পাঠ করা উত্তম। কেউ যদি শুধু اللهم। বলে, অতিরিক্ত কিছু না বলে, তবে এ সম্পর্কে ফকীহ্দের দ্বিমত রয়েছে। যারা বলেন, এতটুকু বলার দ্বারা নামায আরম্ভ করা সহীহ্ হবে, তাদের মতে ইহ্রাম সহীহ্ হবে। আর যারা বলেন, এর দ্বারা নামায শুরু করা সহীহ্ হয় না, তাদের মতে ইহ্রাম সহীহ্ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ (২) আর দ্বিতীয়টি কর্ম জাতীয়। তা হল, বাদানা অর্থাৎ কুরবানীর উট, অথবা গাভীর গলায় কিলাদা বেঁধে তা সহ হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে ইহ্রাম সহীহ্ হয়ে

১. দু'আটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরা দু'আটি এরূপ ঃ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك – ان الحمد والنعمة لك والملك – لاشريك لك

যাবে। তালবিয়া না পড়লেও কোন অসুবিধা হবে না। এ কুরবানী নফল হোক অথবা মান্নতের অথবা কোন কিছুর কাফ্ফারা হিসাবে হোক সব অবস্থায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর জানোয়ারের সাথে না গিয়ে কারো মাধমে তা পাঠায় এব নিজে পরে রওয়ানা করে, তবে এ জানোয়ার অন্যান্য কুরবানীর পশুর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রেরণকারী ব্যক্তি মুহ্রিম সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য এ যদি তামাত্তু বা কিরান হজ্জের কুরবানী হয়, তবে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার পরই উক্ত ব্যক্তি মুহ্রিম হিসাবে গণ্য হবে। যদিও তা অন্যান্য পশুর সাথে গিয়ে মিলিত না হয় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। অন্যের মাধ্যমে কুরবানীর জানোয়ার প্রেরণ করে পরক্ষণেই রওয়ানা করে কেউ যদি জানোয়ারটি রাস্তায় পেয়ে যায় এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যায় অথবা শুধু রাস্তায় জানোয়ারটি পেয়ে যায়, তবে আমলের সাথে তার নিয়্যাত সমন্বিত হয়ে গেল। তাই সেও ঐ ব্যক্তির ন্যায় মুহ্রিম হিসাবে গণ্য হবে যে প্রথমেই জানোয়ার সহ রওয়ানা করেছে (হিদায়া)। যদি কয়েকজন মিলিত হয়ে একটি উট অথবা একটি গরুর মধ্যে শরীক হয় ও সকলেই বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং সাথীদের অনুমতিক্রমে একজন কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধে, তবে সকলেই মুহ্রিম হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সাথীদের অনুমতি ছাড়া একজনে জানোয়ারের গলায় কিলাদা বাঁধলে সে একই মুহ্রিম হিসাবে গণ্য হবে। অন্যদের ইহ্রাম সহীহ্ হবে না।

৩. মাসআলা ঃ কিলাদা বাঁধার নিয়ম হল, বাদানা তথা উট বা গরুর গলায় জুতা বা চামড়ার টুকরা অথবা গাছের ছাল বেঁধে দেওয়া (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি কেউ উটের গলায় কাপড় বাঁধে অথবা বকরীর গলায় কিলাদা বাঁধে এবং এর দ্বারা ইহ্রামের নিয়্যাত করে ও পরে কুরবানীর পশু নিয়ে রওয়ানা করে, তাহলে সে মুহ্রিম হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি উটের চুটের পার্শ্বে ইশ্'আর করে এবং এর দ্বারা ইহ্রামের নিয়ত করে, তবে কোন ইমামের মতেই সে মুহ্রিম হবে না (মুযমারাত)। বাদানার গায়ে ঝুল পরিয়ে পরে তা সাদাকা করে দেওয়া মুস্তাহাব। কিলাদা বাধা ঝুল পরানোর চেয়ে উত্তম (ফাতহুল কাদীর)। বুদ্ন মানে উট এবং গরু (হিদায়া)। ইশ্'আর মানে কুরবানীর পশুর চুটের বাম পার্শ্বে ক্ষত করা যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে এরূপ করা মাকরূহ্। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে এরূপ করা উত্তম (মুযমারাত)।। "তাজলীল" মানে বাদানার গায়ে ঝুল (ঢিলা পোশাক)। পরিয়ে দেওয়া (শরহুত তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ ইহ্রামের শর্ত হল, নিয়্যাত করা। অতএব, ইহ্রামের নিয়্যাত ব্যতিরেকে শুধু তালবিয়া পাঠ করার দ্বারা ইহ্রাম সহীহ্ হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। অনুরূপভাবে শুধু নিয়্যাতের দ্বারাও ইহ্রাম সহীহ্ হবে না। যদি তালবিয়া বা অনুরূপ কোন যিকির আদায় না করে অথবা কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে না নিয়ে যায় বা বাদানার গলায় কিলাদা না বাঁধে (মুযমারাত)। ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করলে গোসল করবে বা উযূ করবে। অবশ্য গোসল করা উত্তম। এ গোসলের উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। তাই ঋতুবতী মহিলাকেও গোসল করার হুকুম দেওয়া হবে (হিদায়া)। নিফাসওয়ালী মহিলা এবং বালকের জন্য ও গোসল করা মুস্তাহাব। মোটকথা, হল,

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগল ও নাভির নীচের পশম পরিষ্কার করা এবং যে সব পুরুষের মাথা কামানোর অভ্যাস আছে অথবা যে মাথা কামানোর ইচ্ছা করবে, তার জন্য মাথা কামানো মুস্তাহাব। মাথা না কামালে তা চিরনি করে নিবে। খিত্‌মী, উশনান বা সাবান দিয়ে শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করবে। স্ত্রী বা দাসী যদি সাথে থাকে এবং কোন বাধা না থাকে, তবে তাদের সাথে (ইহ্‌রামের পূর্বে)। সহবাস করবে। কেননা, এরূপ করা সুন্নাত (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

৫. মাসআলা ঃ সেলাই করা কাপড় এবং মোযা শরীর থেকে খসিয়ে সেলাইবিহীন একটি লুঙ্গি এবং একটি চাদর পরিধান করবে। নতুন হোক বা ধৌত করা। অবশ্য নতুন কাপড় পরিধান করা উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি শুধু এক কাপড়ে সতর ঢাকে, তবে জাইয আছে (ইখ্‌-তিয়ারু শরহিল মুখ্‌তার)। লুঙ্গি নাভি হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত থাকবে এবং চাদর কাঁধি, পিঠ ও সীনার উপর ছড়িয়ে দিয়ে তা নাভির সাথে বেঁধে রাখবে। যদি চাদরের উভয় কিনারা লুঙ্গির ভেতর ঢুকিয়ে রাখে, তবে এতে কোন দোষ নেই। যদি লুঙ্গির উভয় কিনারা কাটা বা সুঁই দ্বারা আটকিয়ে রাখে অথবা দড়ি দিয়ে নিজের শরীরের সাথে বেঁধে রাখে, তবে তা ভাল নয়। কিন্তু এতে তার যিম্মায় কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। চাদর ডান হাতের নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দিবে। ডান কাঁধ খোলা রাখবে (খাযানাতুল মুফ্‌তিয়্যীন)। এরপর শরীরে যে কোন তৈল মালিশ করবে। সুগন্ধিযুক্ত হোক বা সুগন্ধিহীন তাতে কোন পার্থক্য নেই। ইহ্‌রামের পরও যদি সুগন্ধি বাকী থাকে। কিন্তু এর মূল (চিহ্ন) বাকী না থাকে, তবে এরূপ সুগন্ধিযুক্ত তৈল ব্যবহার করা জাইয। এর বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। শরীরী সুগন্ধি যার ইহ্‌রামের পরও বাকী থাকে, তা ব্যবহার করা আমাদের ইমামদের যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে মাকরূহ্‌ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটা সহীহ্‌ মত (মুহীত)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এক রিওয়ায়েত অনুসারে কোন ইমামের মতেই কাপড়ে ঐ সুগন্ধি ব্যবহার করা জাইয নেই, যার عين ইহ্‌রামের পরও বাকী থাকে, ফকীহ্‌গণ বলেন, আমাদের নিকট এ মতটিই গ্রহণযোগ্য (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

৬. মাসআলা ঃ এরপর যে কোন সূরা দিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ন্যায় প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম (মুহীত)। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম সূরা কাফিরূন এরপর ... ربنا لا تزغ قلوبنا এবং সূরা ইখলাসের পর ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا আয়াত দুটো তিলাওয়াত করে থাকেন (খাযানাতুল মুফ্‌তিয়্যীন)। এ দুই রাকআত নামায মাকরূহ্‌ ওয়াক্তে আদায় করবে না। শুধু ফরয নামায পড়ে ইহ্‌রাম বাঁধলেও তা জাইয হবে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। নামায থেকে ফারিগ হওয়ার পর আল্লাহ্‌র নিকট আসানীর দু'আ করবে। এরপর নিম্নলিখিত দু'আ পড়বে, اللّٰهم انى اريد الحج فيسره لى وتقبله منى হে আল্লাহ্‌! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি, আপনি আমার জন্য তা আসান করে দিন এবং আমার এ হজ্জকে কবুল করে নিন (মুহীত)। নামাযের পর অথবা সওয়ার

হওয়ার পর তালবিয়া পাঠ করবে। আমাদের ইমামদের মতে নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করা উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

তালবিয়া এভাবে বলবে ঃ

لبيك اللّٰهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

ان النعمة শব্দের الف অক্ষরটি যবর এবং যের উভয় হরকতের সাথে পড়া জাইয। অবশ্য যের দিয়ে পড়া উত্তম। ইমাম কারখী (র)। বলেন, উল্লিখিত দু'আ পুরাপরি ভাবে পড়বে। এর থেকে কোন শব্দ কমাবে না (মুহীত)। শব্দ কিছু বাড়িয়ে পড়া উত্তম। তখন এভাবে বলবে ঃ

لبيك اله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء اليك (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

দু'আর শব্দসমূহ কমিয়ে বলা মাকরূহ্‌। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। তালবিয়া শেষ করে নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করবে। এরপর যে কোন দু'আ পাঠ করবে। অনুচ্চস্বরে দুরূদ পাঠ করবে (ফাতহুল কাদীর)। নামাযের পর যত বেশী সম্ভব তালবিয়া পাঠ করবে (মুহীত)। এটা যাহিরী রিওয়ায়েত। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, ফরয নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করবে। কাযা এবং নফল নামাযের পর নয় (শরহুত তাহাবী)। যখনই কোন আরোহী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হবে, উঁচুস্থানে আরোহণ করবে বা নীচে অবতরণ করবে, তখনই তালবিয়া পাঠ করবে। অনুরূপভাবে সাহ্‌রীর সময় এবং ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার সময় বেশী বেশী করে তালবিয়া পাঠ করবে (মুহীত)। এমনিভাবে সওয়ারী অতিক্রমকালে এবং সওয়ারীর উপর আরোহণ ও অবতরণ কালেও বেশী পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে (তাবয়ীন)। সব অবস্থায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে এমন উচ্চস্বরে বলবে না যাতে কষ্ট হয় (ফাতহুল কাদীর)।

আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ তালবিয়া পাঠ করার সময় যদি হজ্জে কিরান বা ইফ্‌রাদের নিয়্যাত করে, তবে যা নিয়্যাত করবে, তাই হবে। যদিও ইহ্‌রামের মধ্যে উচ্চারণ করে কোনটার কথা না বলে (ঈযাহ্‌)। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ হজ্জের ইচ্ছায় সফরে বের হয় এবং ইহ্‌রাম বাঁধার সময় নিয়্যাতের কথা মনে না থাকে, তবে তা হজ্জের ইহ্‌রাম বলে গণ্য হবে। তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হল যে, কেউ যদি সফরে বের হয় এবং তার দিলের মধ্যে কোন কিছুর নিয়্যাত না থাকে, এরপর যদি নিয়ত ছাড়াই ইহ্‌রাম বাঁধে তবে তার হুকুম কি? উত্তরে তিনি বললেন, বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ না করা পর্যন্ত যা ইচ্ছা[1] সে নিয়্যাত করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে

১. অর্থাৎ হজ্জ বা উমরার নিয়্যাত। অনুরূপ হজ্জের তিন প্রকারের যে কোন একটির নিয়্যাত করতে পারবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযীখান)। এক চক্কর ঘুরার পর এ তাওয়াফ উমরার তাওয়াফ হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। অনুরূপভাবে ইহ্রামের পর তাওয়াফ না করা অবস্থায় কেউ যদি স্ত্রী-সহবাস করে অথবা পথে আটকা পড়ে যায়, তবে এ ইহ্রাম উমরার ইহ্রাম হিসাবে গণ্য হবে। এর কারণ উল্লেখ করে ফকীহ্গণ বলেন, এ ব্যক্তির উপর তো কাযা ওয়াজিব। তবে যা সহজসাধ্য এবং নিশ্চিত, তা ওয়াজিব করাই উত্তম। আর তা হল উমরা। এ কারণে আমরা বলি, এ ধরনের ব্যক্তির উপর উমরার কাযা ওয়াজিব হবে। হজ্জের কাযা নয় (ঈযাহ)।

২. মাসআলা ঃ যার উপর হজ্জ করা ফরয এরূপ কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে এবং ফরয বা নফল এরূপ কোন কিছুরই নিয়্যাত না করে, তবে এ হজ্জ ফরয হজ্জ হিসাবেই গণ্য হবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি মীকাতে অথবা মীকাত ছাড়া অন্য স্থানে একত্রে দুই হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দুই হজ্জ তার উপর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে মীকাত বা অন্য কোন স্থানে কেউ যদি দুই উমরার ইহ্রাম বাঁধে, তবে দুই উমরা তার উপর ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি হজ্জ বা উমরা কোন কিছুরই নিয়্যাত না করে ইহ্রাম বাঁধে, এরপর পুনরায় হজ্জের নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধে, তবে প্রথমটি উমরার ইহ্রাম বলে গণ্য হবে। যদি দ্বিতীয় বার ইহ্রাম বাঁধার সময় উমরার নিয়্যাত করে থাকে, তবে প্রথমটি হজ্জের ইহ্রাম বলে গণ্য হবে। আর যদি দ্বিতীয় ইহ্রামের সময়ও হজ্জ বা উমরা কোন কিছুর নিয়্যাত না করে, তবে উক্ত ব্যক্তি "কারিন"[1] হিসাবে গণ্য হবে।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি হজ্জের তালবিয়া পড়ে এবং উমরার নিয়্যাত করে অথবা উমরার তালবিয়া পড়ে হজ্জের নিয়্যাত করে, তবে তার ইহ্রাম নিয়্যাত অনুসারে ধর্তব্য হবে। কেউ হজ্জের তালবিয়া পড়ে উমরা এবং হজ্জ উভয়ের নিয়্যাত করলে, সে "কারিন" বলে বিবেচিত হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। কেউ যদি ইহ্রাম বাঁধার পর কিসের ইহ্রাম বেঁধেছে তা ভুলে যায় তবে তার উপর হজ্জ এবং উমরা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কেউ যদি হজ্জ এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর উভয়ের কথাই ভুলে যায়, তবে قياس خفى[2] এর দাবী অনুসারে হজ্জ এবং উমরা আদায় করাই তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং এ হজ্জ "কিরান" হিসাবে গণ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলে তা এই বছরের ইহ্রাম হিসাবেই গণ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। মান্নত এবং নফল হজ্জের নিয়্যাত করে থাকলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা নফল হজ্জের ইহ্রাম হিসাবে গণ্য হবে। আর ফরয ও নফল হজ্জের নিয়্যাত করে থাকলে তাও নফল হিসাবেই গণ্য হবে। বিশুদ্ধতম রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও এ মত পোষণ করেন (ফাতহুল কাদীর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মুহ্রিমের করণীয় কাজসমূহ

১. মাসআলা ঃ ইহ্রাম বাঁধার পর আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজসমূহ[3] তথা স্ত্রী-সহবাস,

১. একই ইহ্রামে (মাঝে ভঙ্গ না করে)। হজ্জ ও উমরা আদায়কারী।

২. সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে।

৩. নিষিদ্ধ কাজ বলতে কোনটা শুধু ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যেমন স্ত্রী-সহবাস আর কোনটি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহ্রাম অবস্থায় নিষেধের কঠোরতা প্রকাশ পায় যেমন ঃ গোনাহের কাজ, ঝগড়া-ঝাটি করা।

নাফরমানী, অবাধ্যতা এবং সাথীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে বেঁচে থাকবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন শিকারী জানোয়ার হত্যা করবে না (হিদায়া)। শিকারী জানোয়ারের পেছনে ধাওয়া করবে না, এর দিকে ইশারা করবে না, কাউকে পথ বাতলিয়ে দিবে না এবং তা ধরার জন্য কাউকে সাহায্যও করবে না। সেলাই করা কোন কাপড় ব্যবহার করবে না, যেমন জামা, কাবা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি এবং মোযা ব্যবহার করবে না। কিন্তু মোযা পায়ের পাতার উপরের উঁচু হাড়ের নীচ পর্যন্ত হলে তা পরিধান করা জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আলিমদের মতে الكعب। অর্থ গিরা নয়। বরং পায়ের উপরি ভাগের মধ্যস্থলের ঐ জোড়া, যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয় (তাবয়ীন)। মাথা, মুখমণ্ডল, মুখ, চিবুক এবং গাণ্ডদেশ ঢাকবে না। যদি নাকের উপর হাত রাখে, তবে তাতে কোন দোষ নেই (আল-বাহরুর রায়িক)। মুহ্রিম যেমনিভাবে মোযা পরিধান করবে না, অনুরূপভাবে সে "জাওয়াবায়ন"[1] ও ব্যবহার করবে না (মুহীত)। সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করা মুহরিমের জন্য তখনই নিষিদ্ধ হবে যদি তা সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম-রীতি অনুসারে পরিধান করা হয়। যদি এর উল্টা করা হয়, তবে তা হারাম হবে না। সুতরাং কেউ যদি জামা বা পায়জামা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে অথবা কাবা কাঁধের উপর রেখে কাঁধের সাথে তা আটকিয়ে রাখে, হাত না ঢুকায়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ মুহ্রিম ব্যক্তির গায়ে থলি অথবা পটকা ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। থলিতে নিজের টাকা থাক বা অন্য কারো টাকা থাক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে পটকা রেশমের রশি দ্বারা অথবা ফিতা দ্বারা বাঁধাতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (বাদাই' সানাই' ও আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। চাদর গুণ্ডি বা কাঁটা দ্বারা আটকাবে না। কেননা, এরূপ করলে সেলাই করার ন্যায় হয়ে যাবে। খায এবং কাত্তান কাপড় যদি সেলাই করা না হয় তবে তা পরিধান করা মাকরূহ্ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কুসুমী, জাফরানী বা অন্য কোন রঙ্গে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করবে না। কিন্তু রঙ্গীন কাপড় যদি এমনভাবে ধৌত করা হয় যে, এর থেকে কোনরূপ ঘ্রাণ আমোদিত হয় না, তবে তা পরিধান করা জাইয। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ইহ্রামের অবস্থায় মাথা মুণ্ডাবে না এবং শরীরের কোন পশম উঠাবে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষুর, কাঁচি, দাঁত ইত্যাদি দ্বারা পশম উৎপাটন করা সবই এক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। দাড়িও ছাঁটবে না (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। নখ কাটবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। হাত দ্বারা কোন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না। সুগন্ধি শরীরে মাখার নিয়্যাত না থাকলেও এরূপ করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শরীরে তৈল মাখবে না (হিদায়া)। ইহ্রামের অবস্থায় মেহদীর খেযাব ব্যবহার করাও জাইয নেই। কেননা, এতেও এক প্রকার সুগন্ধি রয়েছে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যে সুরমাতে সুগন্ধি নেই, তা ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই।

৩. মাসআলা ঃ ইহ্রামের অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করবে না এবং কামোদ্দীপনার সাথে তাকে স্পর্শও করবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কিতমী দ্বারা মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে না। মাথা চুলকাবে না। আর যদি চুলকানোর প্রয়োজন হয়, তবে খুব আস্তে চুলকাবে। কেননা, এতে চুল

১. চামড়ার মোযার উপরে অতিরিক্ত জুতা সদৃশ মোযা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। উকুন মারা নিষিদ্ধ। মাথায় যদি চুল না থাকে অথবা ফোড়া-পাঁচড়া থাকে, তবে জোরে চুলকালে কোন ক্ষতি নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ইহ্রামের অবস্থায় ঘর বা উটের হাওদার ছায়ার নীচে দাঁড়ালে কোন ক্ষতি নেই (কাফী)। তাঁবুর ছায়ার নীচে আসাতেও কোন দোষ নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে কেউ যদি কা'বার পর্দার নীচে আসে এবং পর্দা তাকে আবৃত করে ফেলে কিন্তু মাথা ও মুখে না লাগে, তবে এতে কোন দোষ নেই। পর্দা যদি মাথা ও মুখমণ্ডলের সাথে লেগে যায় তবে মাক্রূহ হবে। কেননা, এ অবস্থায় মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে যাবে, যা মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ (মুহীত)। ইহ্রামের অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, ভাঙ্গা হাড়ে পট্টি বাঁধা এবং খতনা করলে কোন দোষ নেই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ইয্খির ব্যতীত হরমের কোন গাছ কাটবে না এমনিভাবে হালাল অবস্থায়ও হরমের কোন গাছ কাটবে না (শরহুত তাহ্বী)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ আদায় করার নিয়মাবলী

১. মাসআলা ঃ মক্কায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলার জনও গোসল করা মুস্তাহাব। "সানিয়্যাতুল উলয়া"-এর রাস্তায় মক্কা প্রবেশ করবে। একে কাদা বলা হয়। এটি মক্কার উঁচু অঞ্চলের একটি উঁচু পথ। হজ্জের সময় রাত্রে বা দিনে যে সময় ইচ্ছা মক্কা প্রবেশ করতে পারবে।এতে কোন দোষ নেই। উমরার ক্ষেত্রেও এই হুকুম (তাবয়ীন)। দিনে প্রবেশ করা মুস্তাহাব (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। মক্কায় প্রবেশ করে আসবাবপত্র রেখে প্রথমে মসজিদে যাবে (আল-জাওহ্রাতুন নায়্যারা)। তালবিয়া পড়তে পড়তে "বাবে বনী শায়বা" দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে এর মুবারক স্থানের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। চলার পথে কোন ব্যক্তি বাধা হলে বা কারো সাথে ধাক্কা লাগলে তার সাথে বিনয়ের আচরণ করবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)। খালি পায়ে মস-জিদে প্রবেশ করবে। কিন্তু ক্ষতির আশংকা থাকলে কোন কিছু ব্যবহার করতে পারবে (আল-ইখতিয়ার)। ডান পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে ঃ

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم افتحلى ابواب رحمتك وادخلنى فيها اللهم انى اسئلك فى مقامى هذا ان تصلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك وان ترحمنى تقبل عثرتى وتغفر ذنوبى وتضع عنى وزرى (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ কা'বাঘর দেখা মাত্রই لا اله الا الله এবং الله اكبر পড়বে। এরপর ঃ

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيما ونشريفا ومهابة وزدمن تعظيمه وتشريفه

ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة দু'আটি পড়বে। (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।।

এ ছাড়াও যা ইচ্ছা দু'আ করবে (তাবয়ীন)। তারপর হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করবে। অন্য কোন জায়গা হতে তাওয়াফ আরম্ভ করবে না। যদি লোকজন নামাযে[১] থাকে তবে তাদের সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। হাজরে আসওয়াদ সোজা পৌঁছে এর দিকে মুখ করে উভয় হাত উত্তোলন করে নামাযের তাকবীরের ন্যায় তাকবীর বলবে। এরপর উভয় হাত ছেড়ে দিবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। চুম্বন করার নিয়ম হয়, উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের উপর রেখে চুম্বন করবে। কাউকে কষ্ট দেয়া ছাড়া চুম্বন করা সম্ভব হলে চুম্বন করবে এবং এ সময় ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفرلى ذنوبى وطهرلى قلبى واشرح لى صدرى ويسرلى امرى وعافنى فيمن عافيت – দু'আটি পাঠ করবে (মুহীত)।

কাউকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে লাঠি বা এজাতীয় কোন কিছু দ্বারা পাথর স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করবে (কাফী)। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে উভয় হাত এমন ভাবে উঠাবে যেমন হাতের তালু হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকে। এরপর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আলহামদু লিল্লাহ্ বলবে এবং নবী (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। (ফাতহুল কাদীর)। হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয় (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। দু'আর সময় যেভাবে হাতের তালু আকাশের দিকে ফিরিয়ে রাখা হয়-এ সময় এমন করবে না (নিহায়া)। পরে এ দু'আটি পড়বে ঃ

الله اكبر الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ودفاء بعهدك واتباعا انبيك وسنة نبيك اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ এরপর নিজের ডান দিক--যেদিকে কা'বাঘরের দরওয়াজা, সেদিক থেকে তাওয়াফ শুরু করবে এবং সাতবার ঘুরবে। এর পূর্বে ইযতিবা করে নিবে অর্থাৎ চাদর ডান হাতের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রাখবে। হাজরে আসওয়াদের যে কোণা রুকনে ইয়ামানীর সাথে সংশ্লিষ্ট এ দিক থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা সমীচীন। যেন তাওয়াফের প্রারম্ভে সমস্ত শরীর গোটা হাজরে আস্ওয়াদ পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। এরূপ করলে ঐ সমস্ত ফকীহ্র সাথেও কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না, যারা বলেন, তাওয়াফের প্রারম্ভে গোটা হাজরে আসওয়াদ অতিক্রম করা

---

১. ফরয নামাযের জামাআত হলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শর্ত। এর ব্যাখ্যা হল, তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে এমন ভাবে দাঁড়াবে যেন গোটা হাজরে আসওয়াদ তাওয়াফকারী ব্যক্তির ডান দিকে থাকে। এরপর এদিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করবে। হজরে আসওয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পর কিঞ্চিৎ ঘুরে নিজের বাম পার্শ্ব কা'বার দিকে ফিরিয়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাওয়াফ শুরু করার অবস্থায় এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)। বাম দিক দিয়ে তাওয়াফ শুরু করা জাইয। তবে ভাল নয় (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ ইয্‌তিবা বলা হয় চাদরের এক কোণ বাম কাঁধের উপর রেখে চাদরটি ডান কাঁধের নীচ দিয়ে নিয়ে এর অপর পার্শ্বও বাম কাঁধের উপর রাখা। ইযতিবার অবস্থায় ডান কাঁধ খালি থাকবে –এবং বাম কাঁধ চাদরের উভয় পার্শ্ব দ্বারা আবৃত থাকবে (তাবয়ীন)।

হাজরে আস্‌ওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজরে আস্‌ওয়াদে এসে তাওয়াফ শেষ করবে (কাফী)। অধিকাংশ ফকীহ্‌-এর মতে হাজরে আস্‌ওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা সুন্নাত। কেউ যদি হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু না করে অন্য স্থান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করে তবে তা জাইয হবে, কিন্তু মাকরূহ্‌ হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। হাতীমে কা'বার বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে। কেউ যদি কা'বা এবং হাতীমের মধ্যখানে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে তাতে প্রবেশ করে তাওয়াফ করে তবে জাইয হবে না (হিদায়া)। পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে। পুনরায় তাওয়াফ করতে গিয়ে যদি শুধু হাতীমের তাওয়াফ করা হয়, তবু জাইয হবে। (ইখ্‌তিয়ারু শরহিল মুখতার)। তাওয়াফ করে যখনই হাজরে আসওয়াদের সামনে আসবে, তখনই কাউকে কষ্ট দেওয়া ব্যতিরেকে হাজরে আসওয়াফে চুম্বন করা সম্ভব হলে তাতে চুম্বন করবে। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ''আল্লাহু আকবর" এবং "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। হাজরে আসওয়াদের উপর চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করবে (হিদায়া)। যদি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করে তাওয়াফ আরম্ভ করে এবং চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করে, তবে মাঝে চুম্বন করতে বা পারলেও তাওয়াফ জাইয হবে। কিন্তু হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলে তাওয়াফ হবে কিন্তু অন্যায় হবে (শরহুত তাহাবী)

৫. মাসআলা ঃ যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে রুক্‌নে ইয়ামনীতে চুম্বন করা উত্তম (কাফী)। যদি চুম্বন না করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। রুক্‌নে 'ইরাকী এবং রুক্‌নে শামীতে চুম্বন করবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অর্থাৎ গা হেলিয়ে দুলিয়ে বাহাদুরের ন্যায় চলবে। আর বাকী চক্করগুলোতে স্বাভাবিকভাবে চলবে (কাফী)। যে তাওয়াফের পর সাঈ আছে এর মধ্যে রমল করবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। রমল মানে উভয় কাঁধ হেলিয়ে রণসারিতে স্বীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শনকারী সিপাহীর ন্যায় দ্রুত চলা। রমল হাজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করে হাজরে আসওয়াদে গিয়েই শেষ করতে হবে (মুহীত)। মানুষের প্রচণ্ড ভীরের কারণে রমল করা সম্ভব না হলে স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর রমল করে চলবার সুযোগ হলে রমল করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। প্রথম চক্করে রমল করতে না পারলে পরবর্তী দুই চক্করে রমল করবে। আর যদি প্রথম তিন চক্করে রমলের কথা ভুলে যায়, তবে অবশিষ্ট চক্করে আর রমল করবে না। কেউ

যদি সাত চক্করের প্রত্যেকটিতে রমল করে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করার ইচ্ছা থাকলে তাওয়াফে কুদুমে রমল করবে না (তাবয়ীন)।

তাওয়াফে কুদূমের অপর নাম "তাওয়াফে তাহিয়্যাত" ও "তওয়াফে লিকা"। মক্কাবাসীদের উপর তাওয়াফে কুদূমের বিধান নেই (কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ (কোন মুহরিম ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফাতে চলে যায় এবং সেখানে অবস্থান করে, তবে তাওয়াফে কুদুম তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (হিদায়া)। তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমে আসবে এবং সেখানে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। যদি ভীড়ের কারণে মাকামে ইবরাহীমে এ দুই রাকআত নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে মসজিদুল হারামের যেখানে জায়গা পাবে, সেখানেই তা আদায় করে নিবে (যহীরিয়্যা)। যদি মাস্‌জিদুল হারামের বাইরে পড়ে, তবু জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের নিকট এ দুই রাকআত নামায ওয়াজিব। প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়বে। তাওয়াফের দুই রাকআত নামাযের পরিবর্তে ফরয নামায পড়ার দ্বারা তাওয়াফের এ ওয়াজিব দুই রাকআত নামায আদায় হবে না (যাহিদী)। নামাযের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রয়োজনীয় বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। তাওয়াফের দুই রাকআত নামায এমন সময় আদায় করবে, যখন নফল নামায পড়াই জাইয (শরহুত তাহাবী)।

৭. মাসআলা ঃ তাওয়াফের দু'রাকআত নামায আদায় করার পর সাফা যাওয়ার পূর্বে যমযম কূপের নিকট এসে পেট ভরে পানি পান করা মুস্তাহাব। পান করার পর পানি অবশিষ্ট থাকলে তা কূপের ভেতর ফেলে দিবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اللهم انى اسئلك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء

এরপর সাফা যাওয়ার পূর্বে মুলতাযামে আসবে (ফাতহুল কাদীর)। এরপর সাফা–মারওয়ায় সাঈ করার ইচ্ছা থাকলে পুনরায় হাজরে আসওয়াদের নিকট আসবে এবং তাতে চুম্বন করবে (তাবয়ীন)। যদি সম্ভব হয়। কিন্তু সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে "আল্লাহু আকবর" ও লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলবে। যদি এ তাওয়াফের পর সাফা–মারওয়ায় সাঈ করার ইচ্ছা না থাকে, তবে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায আদায়ের পর পুনরায় হাজরে আসওয়াদের নিকট যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার সাঈ আছে, সে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায আদায়ের পর হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার বিধান রয়েছে। আর যে তাওয়াফের পর সাঈ নেই, সে তাওয়াফের পর হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার বিধানও নেই (যহীরিয়্যা)। এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। বাবে সাফা দিয়ে বের হওয়া উত্তম। একে বাবে বনী মাখযুমও বলা হয়। আমাদের নিকট এ কাজ সুন্নাত নয়। অন্যদিক দিয়ে বের হওয়াও জাইয আছে (আল্‌ জাওহারাতুন নায়্যারা)। বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হবে। (তাবয়ীন)। প্রথমে সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে এবং এর উপর আরোহণ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাফা–মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে আরোহণ করা সুন্নাত। আরোহণ না করা মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এ পরিমাণ আরোহণ করবে যেন বায়তুল্লাহ্ দেখা যায় (হিদায়া)। এরপর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে উভয় হাত উত্তোলন করে তিনবার তাকবীর বলবে। (যহীরিয়্যা)। তারপর লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্ হামদু লিল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে নবী করীম (সা)–এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। শেষে নিজের যা যা প্রয়োজন এর বিষয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করবে। দু'আর সময় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৮. মাসআলা ঃ এরপর মারওয়ার দিকে যাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। "বাতনে ওয়াদী" পর্যন্ত এভাবে চলবে। সবুজ বাতির নিকট পৌছার পর মৃদু দৌড়িয়ে চলবে। সবুজ বাতি অতিক্রম করার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। মারওয়ার নিকট পৌছে মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে, তার বড়ত্ব বর্ণনা করবে, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে এবং নবী করীম (সা)–এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। সাফার ন্যায় মারওয়াতেও করবে। এভাবে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত বার দৌড়াবে। সাফা হতে আরম্ভ করবে এবং মারওয়াতে খতম করবে। সাফা–মারওয়ার প্রতি চক্করে "বাতনে ওয়াদীতে" পৌছার পর মৃদু দৌড়াবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত এক চক্কর। এটা পসন্দনীয় মত (সিরাজিয়্যা)। এ মতটি সহীহ্ (শরহুত তাহাবী)।। কেউ যদি উল্টাভাবে সাফা–মারওয়ার সাঈ করে অর্থাৎ মারওয়া হতে আরম্ভ করে সাফাতে গিয়ে শেষ করে, তবে আমাদের ইমামদের কারো কারো মতে এ সাঈ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মাকরূহ্ হবে। কিন্তু সহীহ্ মতে প্রথম সাঈটি গ্রহণযোগ্য হবে না (যখীরা)। সাঈর জন্য শর্ত হল, তা তাওয়াফের পর হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি সাঈর পর তাওয়াফ করে এবং সে তখনও মক্কায় থাকে, তাহলে পুনরায় সাঈ করতে হবে। হালাল হওয়ার পর সাঈ করলে ফকীহ্দের সর্বসম্মত মত অনুসারে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে হজ্জের মাসসমূহ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সাঈ করা জাইয আছে। হায়েয ও জানাবাতের অবস্থায়ও সাঈ করা জাইয (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, হজ্জের আহকামের মধ্যে যে সব ইবাদত মসজিদের বাইরে আদায় করা হয়, এর জন্য তাহারাত শর্ত নয়। যেমন সাঈ, আরাফা ও মুযদালিফায় উকূফ করা, কংকর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। আর যে সব ইবাদত মসজিদে আদায় করা হয় এর জন্য তাহারাত শর্ত। তাওয়াফ মস-জিদে আদায় করা হয় তাই এর জন্য তাহারাত্ শর্ত (শরহুত্ তাহাবী)।

৯. মাসআলা ঃ তওয়াফে কুদূম করার পর মুফরিদের জন্য উত্তম হল, এ সময় সাঈ না করে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর সাঈ করা। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে কেউ যদি আট তারিখ বা এর পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে মিনায় আসার পূর্বে তাওয়াফ ও সাঈ করে নেওয়া তার জন্য উত্তম। কিন্তু আট তারিখ দ্বিপ্রহরের পর ইহ্‌রাম বাঁধলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। তাওয়াফ বা সাঈর অবস্থায় যদি নামাযের ইকামত আরম্ভ হয়, তবে তাওয়াফ বা সাঈ তরক করে জামাআতে শরীক হবে। নামায শেষ করার পর যে পরিমাণ তাওয়া বা সাঈ থাকে, তা সমাপ্ত করবে। জানাযার নামায আরম্ভ হলে সাঈ ছেড়ে দিয়ে জানাযায় শরী

হবে। এরপর যে পরিমাণ সাঈ বাকী থাকে, তা আদায় করবে (ফাতহুল কাদীর)। তাওয়াফ ও সাঈর অবস্থায় বেচা–কেনার কথা[1] বলা মাকরূহ্ (তাতারখানিয়্যা)। সাঈ শেষ করে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। এরপর ইহ্‌রাম অবস্থায় আট তারিখ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে। ইহ্‌রামের অবস্থায় যে যে কাজ নিষিদ্ধ এর কোন একটিও এ সময় তার জন্য জাইয নয়। মক্কায় অবস্থানকালে যখনই সম্ভব হবে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে। প্রত্যেক তাওয়াফে সাতবার কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ সব তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে না (মুহীত)। প্রত্যেক তাওয়াফের পর দু' রাকআত নামায এমন সময় আদায় করবে যখন নফল নামায আদায় করা জাইয (শরহুত তাহাবী)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে এক তাওয়াফের পর দু' রাকআত নামায আদায় না করে দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করা মাকরূহ্। এ ক্ষেত্রে–জোড় বে–জোড় ধর্তব্য নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। পরদেশী লোকদের জন্য নফল নামাযের তুলনায় নফল তাওয়াফ উত্তম। কিন্তু মক্কাবাসী লোকদের জন্য নফল নামায উত্তম (শরহুত্ তাহাবী ও আল্ বাহ্রুর রাইক)। তাওয়াফের সময় কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে যিকির করা উত্তম (সিরাজিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ আট তারিখের পূর্বে ইমাম সাহেব (হজ্জের করণীয় কার্যসমূহ, যথা) মিনায় যাওয়া, আরাফায় নামায পড়া, উকূফ করা এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তন করার বিধি–বিধান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাজীদের সামনে খুতবা দিবেন। হজ্জের মধ্যে তিন বার খুতবা দিতে হয়। এর প্রথমটি হবে আট তারিখের পূর্বে। দ্বিতীয়টি হবে আরাফার দিন আরাফার ময়দানে। আর তৃতীয় খুতবাটি হবে জিলহাজ্জ মাসের একাদশ তারিখে মিনার ময়দানে। দুই খুতবার মাঝে এক দিনের ব্যবধান থাকবে (হিদায়া)। খুতবা একটিই হবে। তাই আরাফার খুতবা ব্যতীত অন্য দুই খুতবার মাঝে বসবে না। আরাফার দিন দুই খুতবা হবে এবং এর মাঝখানে বসতে হবে। আরাফার দিন ছাড়া অন্য দুই দিনের খুতবা দ্বিপ্রহরের পর যুহ্‌র বাদ দিবে। আর আরাফার দিন দ্বিপ্রহরের পর যুহরের পূর্বে খুতবা দিবে (তাবয়ীন)। আট তারিখ ফজর এবং সূর্যোদয়ের পর সকলের সাথে মিনাতে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই সহীহ্ মত। সূর্যোদয়ের আগে যাওয়াও জাইয। তবে পরে যাওয়াই উত্তম (বাদাই')। এ সময় হাজী সাহেব মক্কা, মসজিদে হারামে বা অন্য যে কোন স্থানেই থাকুক কোন অবস্থাতেই তালবিয়া ছাড়বে না। মক্কা হতে বের হওয়ার সময় তালবিয়া পড়বে, দু'আ করবে এবং লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পাঠ করবে (তাবয়ীন)। মিনায় রাত্রি যাপন করবে এবং আরাফার দিন ফজরের নামায অন্ধকার[2] থাকতেই এখানে আদায় করবে। এরপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। কেউ যদি আট তারিখ মক্কায় যুহরের নামায আদায় করে মিনায় আসে এবং এখানে রাত্রি যাপন করে, তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মিনায় রাত্রি যাপন না করে কেউ যদি মক্কায় রাত্রি যাপন করে এবং আরাফার দিন তথায়ই ফজরের নামায আদায় করে, এরপর মিনা হয়ে আরাফায় যায়, তবে জাইয হবে। কিন্তু

---

১. অপ্রয়োজনীয় ও পার্থিব কথাবার্তা।

২. এ কথাটি অধিকাংশ হানাফী ফকীহ্দের মতের খেলাফ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরূপ করা অন্যায়। কেননা, এরূপ করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাতের খেলাফ। আট তারিখ যদি শুক্রবার হয় তবে দ্বিপ্রহরের পূর্বে মিনার উদ্দেশে বের হওয়া জাইয আছে। কেননা, এ সময় তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হয়নি। অবশ্য দ্বিপ্রহরের পর জুমুআ না পড়ে বের হওয়া জাইয হবে না। কারণ, এ সময় তার উপর জুমুআ ওয়াজিব (তাবয়ীন)।

১১. মাসআলা ঃ আরাফায় পৌছার পর যে কোন স্থানে ইচ্ছা অবতরণ করবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। জাবালে রহমতের নিকটে অবতরণ করা উত্তম (তাবয়ীন)। রাস্তায় নামবে না। এতে যাত্রীদের কষ্ট হবে (মুহীত)। দ্বিপ্রহরের পর ইচ্ছা করলে গোসল করবে। এ সময় ইমাম মিম্বরে আরোহণ করবে এবং এ অবস্থায় মুআয্যিন আযান দিবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এটা যাহিরী মাযহাব এবং ইটাই সহীহ্ কথা (আল-বাহ্রুর রায়িক)। আযানের পর দাঁড়িয়ে ইমাম জুমুআর ন্যায় দুই খুতবা পাঠ করবেন এবং এর মাঝে বসবেন (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। বসে খুতবা পড়াও জাইয আছে। তবে দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। আদৌ খুতবা না পড়া অথবা দ্বিপ্রহরের পূর্বে খুতবা দেওয়া জাইয। কিন্তু উচিত নয় (আল-জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। ইমাম এ খুতবায় লোকদেরকে আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা, দশ তারিখে কংকর মারা, কুরবানী করা, হলক করা, তাওয়াফে যিয়ারত করা এক কথায় কুরবানীর দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত হজ্জের যাবতীয় হুকুম-আহকামের তালীম দিবেন (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল দিহায়া)। খুতবার পর ইমাম মিম্বর হতে অবতরণ করে যুহর ও আসরের নামায যুহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করবেন। এ নামাযে কিরাআত জোরে পড়বেন না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। এই দুই নামাযের মধ্যে যুহরের সুন্নাত ব্যতীত কোন নফ্ল পড়বে না। এ দুই নামাযের মধ্যে কেউ যদি সন্নাত পড়ে, তবে মাকরূহ্ হবে এবং যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এরূপ করলে পুনরায় আসরের আযান দিতে হবে (কাফী)। অনুরূপভাবে এ দুই নামাযের মধ্যে যদি কেউ অন্য কোন কাজ করে যেমন পানাহার করল, তবু এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২. মাসআলা ঃ উভয় নামায একত্রে আদায় করা অর্থাৎ যুহরের নামায যুহরের ওয়াক্তে এবং আসরের নামাযও যুহরের ওয়াক্তে আদায় করা সহীহ্ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে।

১. জাইয ওয়াক্তে যুহর আদায় করার পর আসরের নামায আদায় করা (বাদাই')। সুতরাং কেউ যদি দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে ধারণায় দ্বিপ্রহরের আগেই যুহর পড়ে এবং এরপর আসর পড়ে তবে, قياس خفى সূক্ষ্মদৃষ্টিতে খুতবা এবং উভয় নামাযই তাকে দুহরাতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২. ওয়াক্ত হওয়া। তা হল, আরাফার দিন।

৩. নির্দিষ্ট স্থান হওয়া। অর্থাৎ আরাফার ময়দান হওয়া।

৪. হজ্জের ইহ্রাম অবস্থায় হওয়া। অর্থাৎ উভয় নামায একত্রে আদায় করা জাইয হওয়ার চতুর্থ শর্ত হল, উক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই হজ্জের ইহ্রাম বাধা অবস্থায় হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি যুহর আদায়ের সময় উমরার ইহ্রাম বাধে এবং আসর আদায়ের সময় হজ্জের ইহ্রাম বাধে তবে তার জন্য এ দুই নামায একত্রে আদায় করা জাইয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক বর্ণনা মতে হজ্জের এ ইহ্রাম দ্বিপ্রহরের পূর্বে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহলেই ওয়াক্তের পূর্বে ইহ্রাম

পাওয়া গেছে বলে বিবেচিত হবে। অন্য বর্ণনা মতে নামাযের আগে ইহ্রাম বাধাই যথেষ্ট। কেননা, নামাযই তো উদ্দেশ্য। (হিদায়া)। এটাই সহীহ মত। (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৫. পঞ্চম শর্ত হল, জামাআত। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জামাআত শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি নিজ তাঁবুতে একা যুহরের নামায আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আসরের নামায সে ওয়াক্ত মত আদায় করবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে একা নামায আদায়কারীও উভয় নামায একত্রে আদায় করতে পারবে (হিদায়া)। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতটি সহীহ্ (যাদ)।। যদি কোন নামাযই ইমামের সাথে পড়তে না পারে বা এক ওয়াক্ত পড়তে পারে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আসরের নামায আসরের ওয়াক্তে আদায় করবে। আসরের নামায এগিয়ে নিয়ে যুহরের ওয়াক্তে আদায় করা জাইয হবে না (শরহুত তাহাবী)। যুহরের পূর্ণ নামায ইমামের সাথে জামাআতে আদায় করা শর্ত নয় (আল-বাহ্রুর রায়িক)। যদি উভয় নামাযের এক এক রাকআত করে পাওয়া যায় অথবা কিছু অংশ পাওয়া যায়, তবু ইমামগণের মতে যুহর এবং আসর একত্রে আদায় করা জাইয হবে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। মুক্তাদীগণ সকলেই যদি ইমামকে রেখে পালিয়ে চলে যায়, তবে ইমামের জন্য যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা জাইয হবে। এ মাসআলাটি এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সামান্য ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ নামায আরম্ভ করার পর মুসল্লীগণ যদি এরূপ করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে উভয় নামায একত্রে আদায় করা জাইয। আর যদি নামায আরম্ভ করার পূর্বে এরূপ করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও দুই নামায একত্রে আদায় করা জাইয হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না। আর কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ইমামের মতেই উভয় নামায একত্রে আদায় করা জাইয আছে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি যুহরের নামাযে ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে অন্য কাউকে খলীফা নির্বাচন করে, তবে খলীফাও উভয় নামায একত্রে আদায় করবে। খলীফা আসরের নামায শেষ করার পর প্রথম ইমাম যদি উযূ করে আসে, তবে সে আসরের ওয়াক্তে আসরের নামায আদায় করবে। দুই নামায একত্রে আদায় করা তার জন্য জাইয হবে না (তাবয়ীন)। খুতবার পর ইমামের উযূ ভঙ্গ হওয়ায় ইমাম যদি এমন ব্যক্তিকে নামায পড়ানোর জন্য হুকুম করে, যে খুতবার সময় উপস্থিত ছিল না, তবু তার জন্য দুই নামায একত্রে আদায় করা জাইয হবে। ইমাম যদি কাউকে হুকুম না করে এমতাবস্থায় কেউ যদি নিজে ইমাম হয়ে মুসল্লীদের নিয়ে দুই নামায একত্রে আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না। কেননা, তাঁর মতে দুই নামায একত্রে আদায় করা জাইয হওয়ার জন্য ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি থাকা শর্ত। পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায় ইমামত গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি রাজ্যের কোন প্রশাসক হন, যেমন বিচারপতি এবং তার মধ্যে শর্ত পাওয়া যায়, তবে সকলের মতে তার নামায জাইয হবে।

৬. ইমাম রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তাঁর নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি হওয়া আবশ্যক। এটা ইমাম আবূ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হানীফা (র)-এর মতে শর্ত (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা) কেউ যদি যুহরের নামায রাষ্ট্র প্রধান ছাড়া অন্য কারো সাথে আদায় করে এবং আসরের নামায রাষ্ট্র প্রধানের সাথে আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আসরের নামায জাইয হবে না। এটাই শুদ্ধ মত (বাদাই')। রাষ্ট্র প্রধান বা খলীফার ইনতিকালের পর তার প্রতিনিধি এবং যার মধ্যে শর্ত পাওয়া যাবে এরূপ ব্যক্তিও এ দুই নামায একত্রে আদায় করতে পারবেন। যদি বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি বা শর্ত বিদ্যমান আছে এমন কোন লোক না থাকে, তবে মুসল্লীগণ প্রত্যেকে উভয় নামায নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করবে (তাবয়ীন)। ইমাম আসরের নামায শেষ করে "মাওকাফে" যাবেন (মুহীত)। "বাতনে উরনা"[১] ব্যতীত গোটা আরাফাই মাওকাফ অর্থাৎ অবস্থান-স্থল (কানয)। তাই যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করবে। কোন বাধা নেই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ উকূফ সহীহ্ হওয়ার শর্ত দু'টি। ১. আরাফার ময়দানে হওয়া। ২. আরাফার দিন হওয়া। কিয়াম উকূফের জন্য শর্ত নয় এবং তা ওয়াজিবও নয়। সুতরাং বসে বসে উকূফ করাও জাইয আছে। এমনিভাবে নিয়্যাত করাও উকূফের জন্য শর্ত নয় (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। অবশ্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উকূফ করা উত্তম (মুহীত)। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। আরাফায় অবস্থানের দিন গোসল করা, দুই খুতবা দেওয়া, দুই নামায তথা যুহর ও আসর একত্রে আদায় করা, নামাযের পর বিলম্ব না করে মাওকাফে অবস্থান করা, রোযা না রাখা, উযূ অবস্থায় থাকা, সওয়ারীর উপর অবস্থান করা, ইমামের কাছাকাছি উকূফ করা, একনিষ্ঠভাবে উকূফ করা এবং যে সব কর্মকাণ্ড দু'আয় একাগ্রতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়, এর থেকে মুক্ত হওয়া সুন্নাত। ধাক্কাধাক্কি না হয় তাই চলার পথে উকূফ করবে না। কাল পাথর-যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবস্থান করেছিলেন, সেস্থানে অবস্থান করবে। যদি সেখানে অবস্থান করা সম্ভব না হয়, তবে যথাসম্ভব এর নিকটে অবস্থান করবে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। ঋতুবতী মহিলা, জুনুবী ব্যক্তি এবং যে দুই নামায একত্রে আদায় করেনি তাদের জন্যও আরাফায় অবস্থান করা জাইয। এ কারণে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

দু'আর সময় উভয় হাত ছড়িয়ে উপরের দিকে উত্তোলন করে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করবে। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ডাকার সময় তার দিকে হাত-মুখ ফিরিয়ে আহবান করে থাকে (বাদাই')। আল্লাহ্‌র প্রশংসা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করা এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করার পর দু'আ শুরু করবে। এতে লোকদেরকে হজ্জের হুকুম-আহকাম শিখাবে। কাকুতি-মিনতির সাথে কেঁদে কেঁদে দু'আ করবে। আরাফায় অবস্থানকালে কিছুক্ষণ পরপর তালবিয়া পাঠ করবে (কাফী)। নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য এবং মু'মিন নর-নারী সকলের জন্য বেশী বেশী ইসতিগ্‌ফার করবে (যহীরিয়্যা)। বিনয়, ইখলাস ও খুশু-খুযূর সাথে তালবিয়া, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও তাসবীহ পাঠে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনায় নিয়োজিত থাকবে। রাসূল (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং নিজের প্রয়োজনীয় দু'আ ও মুনাজাত করতে থাকবে। এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত করতে থাকবে (মুযমারাত)। আমাদের ইমামদের মতে

১. আরাফার ময়দানের একটি স্থান।

আরাফাতে নির্দিষ্ট কোন দু'আ পাঠ করা আবশ্যক নয়। মানুষ সেখানে নিজের ইচ্ছামত দু'আ করবে (বাদাই')। তবে অধিকাংশ সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

لا اله الا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيئ قدير لا نعبدالا اياه ولانعرف ربا سواه اللّٰهم اجعل فى قلبى نورا وفى سمعى نور اوفى بصرى نوراً اللّٰهم اشرح لى صدرى ويسرلى امرى اللّٰهم هذا مقام المستجير العائر من النار اجرى من النار بعضوك واد خلفى الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين اللّٰهم ان هديتنى للاسلام فلاتنزعه عنى ولا قنر عنى عنه حتى تقبضى وانا عليه (মুহীত)।

অনুচ্চস্বরে চুপে চুপে দু'আ করা সুন্নাত (আল-জাওহারাতুল নায়্যারা)।

১৪. মাসআলা ঃ আরাফায় অবস্থানের সময় হল, আরাফার দিন দ্বিপ্রহরের পর হতে পরের দিনের ফজর পর্যন্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সময়ের মধ্যে আরাফায় অবস্থান করবে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, ঘুমন্ত অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায়, সুস্থ মস্তিষ্কে হোক অথবা পাগল ও বেহুশ অবস্থায়, স্বেচ্ছায় অবস্থান করুক বা অবস্থান না করে এর উপর দিয়ে অতিক্রম করে থাকে[১] সর্বাবস্থায় সে হজ্জ পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে। "তার হজ্জ হয়নি" এ হুকুম তার উপর আরোপিত হবে না (শরহুত্ তাহাবী)। এ সময় ছাড়া অন্য সময় আরাফাতে অবস্থান করলে হজ্জ হবে না। বস্তুত যিলহজ্জের চাঁদের ব্যাপারে যদি মানুষের সন্দেহ হয় এবং যিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশ দিন ধরা হয় এবং এ অনুসারে হজ্জের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার পর যদি জানা যায় যে, যে দিন আরাফাতে অবস্থান করা হয়েছে, সে দিনটি কুরবানীর দিন ছিল, তবে قياس خفى সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুসারে হজ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু قياس جلى বা সাধারণ যুক্তিতে আট তারিখে আরাফায় অবস্থান করলে যেমন হজ্জ হয় না অনুরূপভাবে এ অবস্থায়ও হজ্জ আদায় হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কুরবানীর প্রথম দিন অর্থাৎ দশ তারিখ ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেউ আরাফায় পৌছতে না পারে, তবে সে আর হজ্জ পেল না। হজ্জের কর্মকাণ্ড যা সে করেছে এগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ইহ্‌রাম উমরার ইহ্‌রামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। উমরা করে এর থেকে হালাল হতে হবে। পরবর্তী বছর এর কাযা করা ফরয হবে (শরহুত্ তাহাবী)। রাত আগে আসে এবং দিন পরে আসে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। অর্থাৎ রাত্র নামনের দিনের সাথে ধরা হয়, গত দিনের সাথে নয়। কিন্তু হজ্জের রাত্র গত দিনের সাথে ধরা হয় পরের দিনের সাথে নয়। আরাফার রাত্র আট তারিখের দিনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং এ রাতে আরাফায় অবস্থান করা হাজীদের জন্য

১. পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে সর্বাবস্থায় উকূফ হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাইয নেই, যেমন আট তারিখে অবস্থান করা জাইয নেই। কুরবানীর প্রথম দিনের রাত্র আরাফা দিবসের সাথে ধর্তব্য হবে। তাই এ রাতে আরাফায় অবস্থান করা জাইয যেমন আরাফার দিন আরাফায় অবস্থান করা জাইয। এমনিভাবে এ রাতে কুরবানী করা জাইয নেই, যেমনিভাবে আরাফার দিন কুরবানী করা জাইয নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১৫. মাসআলা ঃ সূর্যাস্তের পর ইমাম লোকজন নিয়ে ঐ অবস্থাতেই মুযদালিফার উদ্দেশে রওয়ানা করবে (হিদায়া)। উত্তম হল, স্বাভাবিক অবস্থায় হাঁটা। জায়গা খালি পেলে দ্রুত হাঁটবে (তাবয়ীন)। ইমামের সাথে সাথে চলবে। তার আগে যাবে না। কিন্তু সূর্যাস্তের পর ইমাম যদি বিলম্ব করে, তবে লোকেরা তার আগেই এসে যাবে। কেননা, সময় হয়ে গেছে (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। রাস্তায় বারবার আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্-হাম্দু লিল্লাহ্ ও তালবিয়া পাঠ করবে এবং আল্লাহ্র দরবারে বেশী বেশী করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে (তাবয়ীন)। ভীড়ের ভয়ে সূর্যাস্তের আগে রওয়ানা করলে কোন ক্ষতি নেই যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা অতিক্রম না করে (মুহীত)। উত্তম হল অবস্থান স্থলে দাঁড়িয়ে থাকা। তাহলে সময়ের পূর্বে ইফাযা অর্থাৎ আরাফা হতে মুযদালিফার উদ্দেশে যাত্রা করা হবে না এবং সুন্নাতের বরখেলাফও হবে না (তাবয়ীন)। ভীড়ের কারণে সূর্যাস্তের পর এবং ইমামের রওয়ানা হওয়ার পরও কেউ যদি আরাফার ময়দানে সামান্য সময় বিলম্ব করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই (হিদায়া)।

১৬. মাসআলা ঃ সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় পৌছার আগেই কেউ যদি মাগরিবের নামায পড়ে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মুযদালিফায় পৌছে এ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে ঈশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মুযদালিফায় পৌছার পূর্বে কেউ যদি রাস্তায় ঈশার নামায পড়ে নেয়, তবে এ নামায পুনরায় পড়তে হবে। অবশ্য মুযদালিফায় পৌছে উভয় নামায পুনরায় আদায় করার পূর্বে যদি ফজরের নামায পড়ে নেয়, তবে সমস্ত ইমামের মতে ঐ দুই নামায সহীহ্ হয়ে যাবে (শরহুত্ তাহাবী)। যদি মুযদালিফায় পৌছার পূর্বে ফজর উদিত হওয়ার আশংকা হয় এবং এ জন্য রাস্তায় মাগরিব ও ঈশা আদায় করে নেয়, তবে জাইয আছে (তাবয়ীন)। যদি মুযদালিফায় পৌছে মাগরিবের পূর্বে ঈশার নামায আদায় করা হয়, তবে মাগরিব পড়ে পুনরায় ঈশা আদায় করতে হবে। যদি ঈশার নামায পুনরায় আদায় না করা হয় এবং ফজর উদিত হয়ে যায়, তাহলে আদায়কৃত ঈশা সহীহ্ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। পায়ে হেঁটে মুযদালিফায় গমন করা মুস্তাহাব (তাবয়ীন)। মুযদালিফায় পৌছে যেখানে ইচ্ছা অবতরণ করবে। রাস্তায় অবতরণ করবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। "জাবালে কুযাহ" কুযাহ পাহাড়ের নিকট অবতরণ করা উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ ঈশার নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর মুযদালিফায় আযান ও ইকামত দিবে। ইমাম মুক্তাদীদের নিয়ে ঈশার ওয়াক্তে মাগরিবের নামায আদায় করবে। এরপর আমাদের ইমামত্রয়ের মতে পূর্বোক্ত আযান ও ইকামতেই ঈশার নামায আদায় করবে (বাদাই')। এ দুই নামাযের মাঝে কোন নফল বা সুন্নাত নামায পড়বে না। যদি কেউ নফল পড়ে অথবা অন্য কোন কাজে মশগুল হয়, তবে পুনরায় ইকামত দিতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মাগরিব ও ঈশা একত্রে আদায় করার জন্য জামাআত শর্ত নয় (কাফী)। কেউ যদি মাগরিব ও ঈশার নামায একা আদায় করে, তবু জাইয আছে। কিন্তু আরাফার ময়দানে যুহর ও আসরের নামায ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জামাআত ছাড়া একা আদায় করা জাইয নেই। উত্তম হল, মুযদালিফায়ও ইমামের সাথে জামাআতে নামায আদায় করা (ঈযাহ্)। মাহবুবী (র) বলেন ঃ মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে আদায় করার জন্য খুতবা, বাদশাহ, জামাআত এবং ইহ্রাম কিছুই শর্ত নয় (কিফায়া)। ঈশার নামাযের পর সেখানেই অবস্থান করবে (মুহীত)। এ রাত্রে না ঘুমিয়ে নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দু'আ এবং রোনাজারিতে মশগুল থাকবে (তাবয়ীন)। কেউ যদি মুযদালিফায় রাত্রি যাপন না করে বরং ফজর উদিত হওয়ার পর শুধু এর উপর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে যায়, তবে (তার উকূফ হয়ে যাবে এবং) তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সুন্নাত তরক করার কারণে সে গুনাহ্গার হবে (বাদাই')।

১৮. মাসআলা ঃ ফজর উদিত হওয়ার পর ইমাম লোকদের নিয়ে অন্ধকার অবস্থায় (অর্থাৎ ফজর হওয়া মাত্রই) ফজরের নামায আদায় করবে এবং উকূফ করবে। অন্যান্য লোকেরাও তাঁর সাথে উকূফ করবে (কুদূরী)। লোকেরা ইমামের পেছনে অথবা যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কুযাহ পর্বতের উপর ইমামের পেছনে অবস্থান করাই উত্তম (শরহুত তাহাবী)। উকূফের সময় হাম্দ-ছানা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর ও তালবিয়া পাঠ করবে এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে (যাদ)।। এরপর উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে নিজের মন-বাসনা পূরণের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করবে (মুহীত)। "বাতনে মুহাস্সার" ছাড়া সমস্ত মুযদালিফাতেই অবস্থান করা জাইয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পায়ে হেঁটে গমনকারী ব্যক্তি "বাতনে মুহাস্সারে" পৌছে আরো দ্রুত চলবে। আর সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় থাকলে এক তীর পরিমাণ জায়গা সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এ কথাটি আল্লামা কিরমানী বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর ইজমা হয়েছে (গায়াতুস সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)।

১৯. মাসআলা ঃ মুযদালিফায় অবস্থানের সময় হল, ফজর উদিত হওয়ার পর হতে প্রভাত আলোকিত হওয়া পর্যন্ত। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুযদালিফায় অবস্থানের সময় শেষ হয়ে যায়। এ সময়ের ভিতর কেউ যদি মুযদালিফায় অবস্থান করে অথবা রাস্তা অতিক্রম করে যায়, তবে আরাফায় অবস্থানের ন্যায় এখানকার অবস্থানও সহীহ হয়ে যাবে। অবশ্য এ সময়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান করলে অবস্থান জাইয হবে না (তাবয়ীন)। কেউ যদি ফজর উদিত হওয়ার আগেই মুযদালিফার সীমানা অতিক্রম করে চলে যায়, তবে তার উপর দম বা কুরবানী ওয়াজিব হবে। কারণ, সে মুযদালিফার অবস্থান তরক করেছে। কিন্তু শরীআত স্বীকৃত কোন কারণে, অর্থাৎ অসুস্থতা, দুর্বলতা অথবা ভীড়ের কারণে কেউ যদি সেখান থেকে রাত্রেই রওয়ানা করে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। প্রভাত পরিষ্কার হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বে লোকজন সহ সেখান থেকে রওয়ানা করে মিনায় আসবে (যাদ)। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রভাত পরিষ্কার হওয়ার অর্থ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হল, প্রভাত এমনভাবে আলোকিত হওয়া যে, সূর্যোদয় হতে মাত্র এতটুকু সময় বাকী যে সময়ের মধ্যে শুধু কেবল দু'রাকআত নামায আদায় করা যায় (মুহীত)। সূর্যোদয়ের পর অথবা মানুষের ফজরের নামায পড়ার আগে রওয়ানা করা অন্যায়। কিন্তু এরূপ করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (বাদাই')। এরপর দ্বিপ্রহরের পূর্বে জমরায়ে আকাবায় আসবে এবং বাতনে ওয়াদী থেকে সাতটি নুড়িপাথর নিয়ে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে[১] নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবে। এ দিন অন্য কোন স্থানে পাথর মারবে না এবং কংকর মারার স্থানে অবস্থানও করবে না (শরহুত তাহাবী)। তাকবীরের পরিবর্তে তাসবীহ্ ও তাহলীল পড়লেও জাইয হবে। গুনাহ হবে না বাদাই')।

২০. মাসআলা ঃ সহীহ্ মতে প্রথমবার কংকর মারতেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। এ ক্ষেত্রে মুফরিদ, মুতামাত্তি' এবং কারিন সবই সমান (আল-বাহ্রুর রায়িক)। উমরা আদায়কারী ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করেই তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। যার হজ্জ ফওত হয়ে গেছে, সে উমরা করে হালাল হয়ে অর্থাৎ তাওয়াফ শুরু করে তালবিয়া বন্ধ করবে। উক্ত ব্যক্তি যদি কারিন হয়, তবে দ্বিতীয় তাওয়াফ শুরু করে তালবিয়া বন্ধ করবে। হজ্জ আদায় করতে গিয়ে যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে কুরবানী করার পর তালবিয়া বন্ধ করবে। হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি জমরায়ে আকাবাতে কংকর মারার পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে, তবে সেও তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। আর কেউ যদি কংকর মারা, মাথা কামান এবং যবাহ করার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সেও তালবিয়া বন্ধ করে দিবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২১. মাসআলা ঃ এরপর মিনায় ফিরে আসবে। সাথে যদি কুরবানীর পশু থাকে তবে তা যবাহ্ করবে। আর যদি পশু না থাকে, তবে মুফরিদের জন্য কোন ক্ষতি নেই। আর যদি উক্ত ব্যক্তি কারিন বা মুতামাত্তি' হয়, তবে কুরবানী করা আবশ্যক। এরপর সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলবে অথবা ছেঁটে ফেলবে। কামানোই উত্তম (শরহুত্ তাহাবী)। এ হুকুম ঐ হাজীদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যারা বাধার কারণে হজ্জ মুলতবী করেনি। যারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হজ্জ মুলতবী করেছে, তাদের জন্য মাথা কামানো আবশ্যক নয় (আন্ নাহ্রুল ফায়িক)। ওযর না থাকা অবস্থায় মাথা মুণ্ডান অথবা চুল ছাঁটার মধ্যে ইখতিয়ার বলবৎ থাকবে। কিন্তু মাথা মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে কোন ওযর থাকলে মাথা না কামিয়ে চুল ছেঁটে নিবে। আর ছাঁটার ব্যাপারে ওযর থাকলে চুল কামিয়ে ফেলবে। যেমন কেউ কোন আঠাল বস্তু দ্বারা মাথা জড়িয়ে নিয়েছে। ফলে, কাঁচি তাতে কাজই করছে না। এমতাবস্থায় ঐ আঠাল বস্তু খসাতে আরম্ভ করলে কামানো এবং কাটা-ছাঁটা ছাড়াই চুল পড়ে যায়। অথচ কামানো এবং ছাঁটা ছাড়া মাথার চুল উঠানো মুহ্রিমের জন্য জাইয নেই। সুতরাং এ অবস্থায় চুল কামিয়ে ফেলবে (আল-বাহ্রুর রাইক)। ছাঁটার নিয়ম হল, পুরুষ এবং মহিলা স্বীয় মাথার এক-চতুর্থাংশ চুল অর্থাৎ এক অঙ্গুলি পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে (তাবয়ীন)। বাদাই' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ফকীহ্দের মতে, এক অঙ্গুলি থেকে কিছু বেশী কাটবে। কেননা, সমস্ত চুলের মাথা

১. আজকাল উপর-নীচ নেই। মক্কা মুকাররমাকে বামে রেখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরমুখী হয়ে কংকর নিক্ষেপ করবে এবং কংকর সব কয়দিনের মুযদালিফা হতে সংগ্রহ করা উত্তম।

সাধারণত সমান হয় না। তাই এক অঙ্গুলির পরিমাণ থেকে কিছুটা বেশী কাটা ওয়াজিব। যাতে এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটা যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ বাকী না থাকে (গায়াতুস্ সুরু-জীলি শরহিল্ হিদায়া)। নবী (সা)-এর অনুসরণ করে মাথার সম্পূর্ণ চুল কামিয়ে ফেলা উত্তম (কাফী)। কুরবানীর দিন তথা যিলহাজ্জের দশ, একাদশ এবং দ্বাদশ তারিখের যে কোন দিন মাথা কামানো জাইয। তবে প্রথম দিন কামানো উত্তম (গায়াতুস সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। আগে কামিয়ে ফেলার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে যদি মাথায় [illegible] চুল না থাকে, তবে [illegible] এর বর্ণনা মতে মাথার উপর ক্ষুর টেনে নিবে। কেননা, [illegible]থায় চুল থাকলে দু'টি কাজ করা আবশ্যক হত। ১. মাথার উপর দিয়ে ক্ষুর টেনে নেওয়া। ২. চুল কামিয়ে ফেলা। এতদুভয়ের মধ্যে যে কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব নয় তা রহিত হয়ে যাবে। আর যে কাজটি সম্ভব তা আবশ্যক থাকবে। অবশ্য এরূপ খালি মাথার উপর দিয়ে ক্ষুর টেনে নেওয়া ওয়াজিব না মুস্তাহাব, এ ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে ওয়াজিব (মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মাথায় ফোড়া উঠার কারণে মাথার উপর ক্ষুর ব্যবহার করা যদি সম্ভব না হয় এবং চুল যদি কাটার উপযুক্তও না হয়, তবে হলককারী ব্যক্তির ন্যায় এ ব্যক্তিও হালাল হয়ে যাবে। কেননা, মাথা কামানো এবং ছাঁটা উভয়ই যেহেতু তার জন্য অসম্ভব, তাই এতদুভয়ের কোনটাই তার উপর আর ওয়াজিব থাকবে না। এরূপ ব্যক্তির জন্য উত্তম হল, কুরবানীর শেষ দিন হালাল হওয়া। যদি তা না করে প্রথম দিনই হালাল হয়ে যায়, তবে এতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। মাথায় কোন যখম নেই এমন কোন ব্যক্তি যদি জনমানবহীন কোন জঙ্গলে চলে যায়, যেখানে ক্ষুর নেই এবং মাথা কামিয়ে দেওয়ার মত কোন ব্যক্তিও নেই এহেন অবস্থায় মাথা কামানো বা চুল ছাঁটা ব্যতীত তার কোন গত্যন্তর নেই। কেননা, এ অবস্থা শরীআতের দৃষ্টিতে ওযর নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ঔষধ জাতীয় কোন পদার্থের দ্বারা মাথা কামানোও জাইয (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মুণ্ডনকারী ব্যক্তির ডান দিক হতে মুণ্ডনের কাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে, তার ডান দিক থেকে নয়, বরং তার বাম দিক থেকে মুণ্ডানো আরম্ভ করতে হবে (ফাতহুল কাদীর)। চুল মাটিতে দাফন করে রাখা এবং মাথা মুণ্ডানোর সময়ও মুণ্ডানোর তাকবীর করে দুআ করা মুস্তাহাব। চুল নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তবে মলমূত্রের উপর এবং হাম্মামখানায় চুল ফেলা মাকরূহ্ (আল-বাহরুর রায়িক)।

২৩. মাসআলা ঃ মাথা কামানোর পর নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা এবং নাভির নীচের পশম কামিয়ে ফেলা মুস্তাহাব (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। দাড়ি ছাঁটবে না। যদি ছাঁটে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। মাথা ছাঁটা বা কামানোর পর যে সমস্ত কাজ হাজী ব্যক্তির উপর ইহ্রামের কারণে হারাম ছিল, তা হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী-সহবাস করা জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা ইত্যাদি যা স্ত্রী-সহবাসের সাথে সম্পর্কিত, তাও তার জন্য হালাল হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আমাদের ইমামদের মতে এ অবস্থায় যোনিদ্বারের বাইরে সহবাস করাও জাইয হবে না (হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ যদি হলক না করে তাওয়াফে যিয়ারত করে তবে হলক না করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার জন্য হালাল হবে না (তাবয়ীন)। এরপর সম্ভব হলে এ দিনই তওয়াফে যিয়ারত করবে। সম্ভব না হলে দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিনও করতে পারবে। কিন্তু এরপর আর পারবে না। হাতীমের বাইরে তাওয়াফ করবে এবং কা'বার চতুষ্পার্শ্ব সাতবার প্রদক্ষিণ করবে। তাওয়াফের পর দু রাকআত নামায আদায় করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তাওয়াফের পূর্বে স্ত্রী- সহবাস হালাল ছিল না। কিন্তু তাওয়াফের চার চক্কর ঘুরার পর স্ত্রী-সহবাসও তার জন্য হালাল হয়ে গেছে। কেননা, এতটুকু হচ্ছে হজ্জের রুকন। আর অবশিষ্টগুলো হল ওয়াজিব-কুরবানীর দ্বারা তা পুরা হয়ে যায়। এটা সহীহ্ মত (তাবয়ীন)। আদৌ তাওয়াফ না করলে স্ত্রী-সহবাস কখনো বৈধ হবে না। যদিও এ অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। উযূহীন অবস্থায় অথবা জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলেও ইহ্রাম থেকে বের হওয়া যাবে এবং এরপর হতে স্ত্রী-সহবাসও বৈধ হবে। সুতরাং এভাবে তাওয়াফ করার পর স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্জ ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কা'বাঘরের বাম দিক থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করে এবং এভাবে সাতবার কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করে, তবে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে এ তাওয়াফ গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু মক্কায় থাকা অবস্থায় এ তাওয়াফ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি এ পরিমাণ সতর খুলে তাওয়াফ করে, যে অবস্থায় নামায সহীহ্ হয় না, তবু তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কেউ যদি নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করে, তবে এ তাওয়াফ এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করা একই সমান। আর যদি সতর ঢাকা যায় পরিমাণ কাপড় পাক হয় এবং অবশিষ্ট কাপড় নাপাক হয়, তবু তাওয়াফ জাইয হবে এবং উক্ত ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা)। ওয়াজিব তাওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে না করে হাতীমের ভেতর দিয়ে করলে মক্কায় অবস্থান করা অবস্থায় পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় আদায় করতে হবে। যেন তাওয়াফের কাজ সবটুকুই তারতীব মত হয়। যদি পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় আদায় না করে শুধু হাতীমের তাওয়াফ করে, আমাদের মাযহাবে তাও জাইয আছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত, তাওয়াফে রুকন এবং তাওয়াফে ইয়াওমুন নাহ্র বলা হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হজ্জাত কিতাবে আছে, একে তাওয়াফে ওয়াজিবও বলে (তাতার খানিয়্যা)। তাওয়াফে কুদূমের পর সাফা-মারওয়ার সাঈ করে থাকলে এ তাওয়াফে রমল করবে না এবং সাঈও করবে না। আর সাঈ না করে থাকলে রমল করবে এবং সাঈও করবে (কাফী)। তাওয়াফে রুকনের পর রমল ও সাঈ করা উত্তম। যেন এগুলো সুন্নাতের সাথে আদায় না হয়ে ফরয তাওয়াফের সাথে আদায় হয় (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

২৫. মাসআলা ঃ এরপর মিনায় ফিরে আসবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলোতে জমরায় কংকর নিক্ষেপ করার লক্ষ্যে এখানেই অবস্থান করবে। মক্কায় বা রাস্তায় রাত্রি যাপন করবে না (গায়াতুস্ সুরুজী লিশরহিল হিদায়া)। মিনার দিনগুলোতে অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করা মাকরূহ্ (শরহুত তাহবী)। ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করলে আমাদের মাযহাবে কোন কিছু ওয়াজিব

হবে না (হিদায়া)। চাই তারা পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি হোক বা অন্য কোন মানুষ হোক (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আমাদের মাযহাবে কুরবানীর দিন কোন খুতবা নেই (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। কুরবানীর দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পর তিন জমরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জমরা থেকে রমী আরম্ভ করবে। এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলবে। এরপর এর নিকটবর্তী জমরা তথা জমরায়ে উসতায় অনুরূপভাবে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। তারপর জমরায়ে আকাবার নিকটে এসে "বাতনে ওয়াদী" থেকে তাকবীর বলে বলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। জমরায়ে আকাবার কাছে অবস্থান করবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় জমরার নিকটে যেখানে লোকেরা অবস্থান করে, সেখানে অবস্থান করবে (কাফী)। মানুষের অবস্থান করার স্থান হল, উপরের দিকের ভূমি (মুহীত)। যে রমীর পর রমী আছে, সে রমীর পর অবস্থান করবে। আর যে রমীর পর রমী নেই, সে রমীর পর অবস্থান করবে না। কেননা, ইবাদত শেষ হয়ে গেছে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যেখানে অবস্থান করবে, সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করবে (তাবয়ীন)। আল্লাহ্র হাম্দ-ছানা করবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আল্লাহ আকবর বলবে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পড়বে এবং নিজের প্রয়োজনীয় দু'আ প্রার্থনা করবে। দু'আর সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে এবং হাতের তালু আসমানের দিকে রাখবে যেমন অন্যান্য সময় করা হয়ে থাকে। হাজীদের উচিত, অবস্থানের এ সব স্থানে দু'আ করার সময় মু'মিন নর-নারী সকলের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা (কাফী)। কুরবানীর তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পর তিন জমরায় অনুরূপভাবে কংকর নিক্ষেপ করবে। ইচ্ছা করলে এ দিন মিনা থেকে চলে আসতে পারবে। এরূপ করলে চতুর্থ দিন আর রমী করতে হবে না। ইচ্ছা করলে এ রাত্রও সেখানে অবস্থান করতে পারবে। সুতরাং কেউ যদি ঐদিন ফজর পর্যন্ত সেখানে থাকে, তবে দ্বিপ্রহরের পর কংকর না মেরে সেখান থেকে বের হওয়া জাইয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

রমীর মাসাইল

রমী তথা কংকর নিক্ষেপ করার ব্যাপারে অনেক কথা আছে।

১. মাসআলা ঃ প্রথম বিষয় হল রমীর সময় সম্পর্কিত আলোচনা। কংকর নিক্ষেপ করার সময় তিনটি। কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন। কুরবানীর প্রথম দিন রমী করারও প্রথম দিন। কুরবানীর প্রথম দিন কংকর নিক্ষেপ করা তিন প্রকার। ১. মাকরূহ, ২. মাসনূন, ৩. মুবাহ্। এ দিন ফজর উদিত হওয়ার পর হতে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা মাকরূহ্। সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা সুন্নাত। আর দ্বিপ্রহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা মুবাহ্। রাত্রে কংকর মারা মাকরূহ্ (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে রমী করলে তা কারো মতেই সহীহ্ হবে না (আল-বাহ্রুর রায়িক)। কুরবানীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন রমী করার সময় হল, দ্বিপ্রহরের পর

pdf By Syed Mostafa Sakib

হতে পরের দিন সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং এ দু'দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে রমী করা জাইয নেই। দ্বিপ্রহরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা সুন্নাত এবং সূর্যাস্তের পর হতে পরের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রমী করা মাকরূহ (যাহিরী রিওয়ায়েত)। চতুর্থ দিন রমী করার সময় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অবশ্য এ দিন দ্বিপ্রহরের আগে রমী করা মাকরূহ এবং দ্বিপ্রহরের পর রমী করা সুন্নাত (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ রমী সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হল মাটি জাতীয় পদার্থের দ্বারা রমী করা জাইয। এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, তা মূল্যবান ধাতু না হয়ে নিম্নজাতীয় সাধারণ ধাতু হতে হবে। সুতরাং ফিরোজা এবং ইয়াকূত পাথর দ্বারা রমী জাইয হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ, নিহায়া, 'ইনায়া ও মি'রাজুদ্ দিরায়া)। পাথর, শক্ত মাটি, কাদা মাটি, গেরুয়া বর্ণের মাটি, চুনা মাটি, গন্ধক, পাহাড়ী লবণ, সুরমা এবং মুষ্টিভর্তি বালু দ্বারা রমী করা জাইয। লাকড়ী, আম্বর এবং সোনা-রূপা দ্বারা রমী করা জাইয নেই (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ তৃতীয় কথা হল, যে বস্তু দ্বারা রমী করা হবে এর পরিমাণ কিরূপ হবে? এ সম্বন্ধে আমাদের কথা হল, যে বস্তু দ্বারা রমী করা হবে, তা নুড়ি পাথরের ন্যায় ছোট হওয়া আবশ্যক (মুহীত)। বস্তুত এর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। অবশ্য কলাই বা মটরের সমতুল্য পাথর দ্বারা রমী করা উত্তম। এর চেয়ে বড় বা এর চেয়ে ছোট পাথর দ্বারা রমী করাও জাইয আছে (ইখ্তিয়ারু শরহিল মুখ্তার)। কিন্তু এতে মুস্তাহাব আদায় হবে না (তাতারখানিয়্যা)।।

৪. মাসআলা ঃ চতুর্থ মাসআলা হল নিক্ষেপিত পাথরের গুণাগণ সম্বন্ধে। আমাদের ইমামদের মতে যে পাথর দ্বারা রমী করা হবে, তা ধুয়ে নেয়া উচিত (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। পাথরে নাপাকী লেগে আছে এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনেও এরূপ পাথর দ্বারা রমী করলে রমী আদায় হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে (ফাতহুল কাদীর)। রমীর পাথর মুযদালিফা অথবা রাস্তা হতে সংগ্রহ করে নেওয়া মুস্তাহাব। জমরার নিকট হতে কুড়িয়ে নেয়া পাথর দ্বারা রমী করবে না। এরূপ পাথর দিয়ে রমী করলে জাইয হবে। কিন্তু অন্যায় হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। একটি পাথর সংগ্রহ করে একে ভেঙ্গে ছোট ছোট করে সত্তর টুকরা বানানো যেমন, আজকাল মানুষ করে থাকে, এরূপ করা মাকরূহ (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ পঞ্চম মাসআলা হল কেমন করে রমী করতে হবে এর বিবরণ সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, নুড়ি পাথর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ধরে পরে তা নিক্ষেপ করবে (মুহীত)। আল-ওয়ালুজিয়্যা কিতাবে আছে যে, এ মতটি বিশুদ্ধতম (তাতারখানিয়্যা)। ফকীহ্গণ বলেন, কংকর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি এবং যে স্থানে তা পতিত হবে এতদুভয়ের মধ্যে পাঁচ হাত বা এর চেয়ে বেশী দূরত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। "আসল" নামক কিতাবে আছে, জমরার কাছে দাঁড়িয়ে তাতে পাথর রেখে দিলে রমী আদায় হবে না। কিন্তু পাথর ঢেলে ফেললে রমী আদায় হবে। তবে সুন্নাত তরীকার খেলাফ হওয়ার কারণে অন্যায় হবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ ৬ষ্ঠ মাসআলা হল পাথর নিক্ষেপকারী ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে। যে রমীর পর রমী আছে, সে ক্ষেত্রে উত্তম হল, পায়ে হেঁটে রমী করা। তা না হলে সওয়ার হয়ে রমী করা উত্তম (মুতূন)।

৭. মাসআলা ঃ সপ্তম হল রমীর স্থান সম্পর্কিত মাসআলা। আমাদের নিকট তিন জমরাতে রমী করতে হবে। প্রথম হল মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জমরা। এরপর হল, এর নিকটবর্তী জমরা অর্থাৎ "জমরায়ে উসতা"। এরপর "জমরাতুল আকাবা" (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ অষ্টম কথা হল কোথা থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে। আমাদের মতে "বাতনে ওয়াদী" নীচুভূমির দিক থেকে উঁচু ভূমির দিকে পাথর নিক্ষেপ করবে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ডান দিকে পাথর নিক্ষেপ করবে (শরহুত্ তাহাবী)। কেউ যদি উপরের দিক থেকে নিক্ষেপ করে, তবু জাইয হবে। কিন্তু ওযর না থাকা অবস্থায় নীচু ভূমির দিক থেকে নিক্ষেপ করাই সুন্নাত (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। জমরায়ে আকাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে পাথর নিক্ষেপ করবে। মিনা ডান দিকে এবং কা'বা বাম দিকে থাকবে। এমনভাবে দাঁড়াবে যেন কংকর পতিত হওয়ার স্থান দেখা যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ নবম মাসআলা কংকর কোথায় পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, কংকর জমরায় অথবা জমরার নিকটবর্তী স্থানে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর থেকে দূরে পতিত হলে রমী আদায় হবে না (মুহীত)। কংকর নিক্ষেপ করার পর তা যদি কোন মানুষের পিঠে অথবা উটের পিঠের হাওদায় পড়ে এবং সেখানেই রয়ে যায়, তবে পুনরায় রমী করতে হবে। আর যদি উক্ত কংকর সে বছরই মানুষের পিঠ অথবা উটের পিঠের হাওদা থেকে নীচে পড়ে যায়, তবে রমী আদায় হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ দশ নম্বর মাসআলা হচ্ছে কংকরের সংখ্যা সম্বন্ধে। আমাদের ইমামগণের মতে প্রতি জমরায় সাতটি করে কংকর মারতে হবে। "ইয়ানবী" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ডান হাতে কংকর নিক্ষেপ করবে (তাতারখানিয়্যা)। কোন জমরায় সাতটি নুড়ি পাথর একত্রে নিক্ষেপ করলে একটি নিক্ষেপ করেছে বলে ধর্তব্য হবে। তাই তার উপর ওয়াজিব হবে পৃথকভাবে আরো ছয়টি পাথর নিক্ষেপ করা। সাতটির বেশী নিক্ষেপ করলে কোন ক্ষতি নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবে। অর্থাৎ নিম্নের দু'আটি পড়বে। بسم الله والله اكبر رغما للشياطين وحزبه এরপর পড়বে اللهم اجعل حجى مبرور او سعيى مشكورا وذنبى معفورا (মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ প্রথম দিন শুধু জমরায়ে আকাবাতে কংকর মারবে। অন্যগুলোতে মারবে না। এর পরের দিনগুলোতে সব ক'টি জমরাতেই কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে জমরায়ে উলায়, এরপর জমরায়ে উসতায়, এরপর জমরায়ে আকাবায় কংকর মারবে (মুহীত)। কেউ যদি দ্বিতীয় দিন প্রথমে জমরায়ে আকাবাতে রমী করে, এরপর জমরায়ে উসতায়, এরপর মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী স্থানে তথা জমরায়ে উলায় রমী করে তবে জমরায়ে উসতা এবং জমরায়ে আকাবায় পুনরায় রমী করা উত্তম (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কোন ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় দিন জমরায়ে উসতা এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

জমরায়ে আকাবায় রমী করে এবং জমরায়ে উলায় রমী না করে, তবে পরবর্তী সময়ে জমরায়ে উলায় রমী করার সময় জমরায়ে উসতা এবং জমরায়ে আকাবায় রমী করে নেয়া উত্তম। তাহলে তারতীব ঠিক থাকবে। তা না করে শুধু জমরায়ে উলায় রমী করাও আমাদের মাযহাবে জাইয (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি সব কটি জমরাতে তিনটি করে পাথর নিক্ষেপ করে, তবে জমরায়ে উলায় আরো চারটি পাথর নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট দুই জমরায় পুনরায় সাতটি করে কংকর মারবে। আর যদি প্রত্যেক জমরায় চারটি করে পাথর মারা হয়, তবে আরো তিনটি করে মেরে সাতটি পুরা করবে। অবশ্য প্রত্যেক জমরায় পুনরায় সাতটি করে নিক্ষেপ করা উত্তম। "মানাসিকুল হাসান" কিতাবে আছে, কেউ যদি জমরায়ে উলায় একটি কংকর মারে, এরপর জমরায়ে উসতায় একটি এরপর জমরায়ে আকাবায় একটি, তারপর পুনরায় ফিরে এসে এক এক জমরায় একটি করে কংকর মারে। এমনি করে যদি প্রত্যেক জমরায় সাতটি করে কংকর মারে, তবে জমরায়ে উলার রমী পূর্ণ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। তাই এখানে আর কংকর মারতে হবে না। জমরায়ে উসতায় চারটি মারা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। অতএব এখানে আরো তিনটি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। আর জমরায়ে আকাবায় একটি নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এখানে আরো ছয়টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে (মুহীত)। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, সব ক'টি জমরায় কংকর নিক্ষেপ করার পর কারো হাতে যদি চারটি পাথর অবশিষ্ট থেকে যায় এবং একথা তার জানা না থাকে যে, এগুলো কোন জমরার অবশিষ্ট পাথর? তবে একথা ধরে নিবে যে, প্রথম জমরায় এ পরিমাণ পাথর নিক্ষেপ করা বাকী রয়ে গেছে। তাই এগুলো প্রথম জমরায় নিক্ষেপ করবে এবং জমরায়ে উসতা ও জমরায়ে আকাবায় পুনরায় নতুন করে কংকর নিক্ষেপ করবে। হাতে যদি তিনটি পাথর বাকী থেকে যায়, তবে এক এক জমরায় এক একটি পাথর নিক্ষেপ করবে। এমনিভাবে এক বা দু'টি পাথর রয়ে গেলেও এক এক জমরায় এক একটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। আসবাবপত্র আগে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে কংকর মারার জন্য নিজে মিনায় অবস্থান করা মাকরূহ্ (হিদায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ কংকর মারার পর "বাতনে "মুহাস্সাব" তথা "আবতাহ" নামক স্থানে যাবে এবং সেখানে কিছুক্ষণ সময় অবস্থান করবে। আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধতম মতানুসারে এখানে অবস্থান করা সুন্নাত। কেউ যদি তা তরক করে, তবে সে সুন্নাত তরককারী বলে বিবেচিত হবে। এরপর মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফে সদর করবে অর্থাৎ কা'বার চতুর্পার্শ্বে সাতবার প্রদক্ষিণ করবে। এ তাওয়াফে রমল করবে না (কাফী)। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে সদর, তাওয়াফে বিদা, তাওয়াফে ইফাযা, বায়তুল্লাহ্র আখিরী তাওয়াফ এবং তাওয়াফে ওয়াজিব বলা হয় (তাবয়ীন)। এ তাওয়াফের ওয়াক্ত দুই প্রকার। ১. জাইয ওয়াক্ত ২. মুস্তাহাব ওয়াক্ত। ১. জাইয ওয়াক্ত তাওয়াফে যিয়ারতের পর হতে আরম্ভ হয়। শর্ত হল, সফরের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি তাওয়াফে সদর করার পর মক্কায় দীর্ঘ দিন অবস্থান করে, এমনকি এক বছর অবস্থান করে এবং ইকামতের নিয়্যাত না করে এবং মক্কায় বাড়ীঘর না বানায়, তবে তার তাওয়াফ জাইয হবে। এর শেষ ওয়াক্তের কোন সীমা নেই। যতদিন মক্কায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এর ওয়াক্ত

থাকবে। সুতরাং কেউ যদি এক বছর মক্কায় অবস্থান করে এবং ইকামতের নিয়্যাত না করে, তবু তার তাওয়াফ জাইয হবে এবং তা কাযা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং আদায় হিসাবেই গণ্য হবে। ২. তাওয়াফে সদরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত হল, যখন সফরের নিয়্যাত করবে, তখন তাওয়াফ করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি তাওয়াফ করার পর ঈশা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে পুনরায় তাওয়াফ করা উত্তম। যেন বায়তুল্লাহ্ হতে বিদায় গ্রহণ করা তার আখিরী কাজ হয় (আল-বাহ্রুর রায়িক)। কুরবানীর দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাওয়াফ করলে ফকীহ্দের মতে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (বাদাই')। মক্কা হতে বের হওয়ার ইরাদা করার পর তাওয়াফে সদর হাজীদের উপর ওয়াজিব হয়। উমরাকারীদের উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে মক্কাবাসী, মীকাতে এবং মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী লোকদের উপরও তাওয়াফে সদর ওয়াজিব নয় (ঈযাহ্)। হায়িয ও নিফাসওয়ালী মহিলা এবং যার হজ্জ ফওত হয়ে গিয়েছে, তার উপরও তাওয়াফে সদর ওয়াজিব নয় (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কূফাবাসী কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের কর্মকাণ্ড শেষ করে মক্কা শরীফে বাড়ী তৈরী করে নেয়, তবে তার উপরও তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হবে না। কেননা, এ তাওয়াফ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে তা মক্কায় বসবাসকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে নফরে আওয়াল শেষ হওয়ার আগে মক্কায় বসবাস করার সংকল্প করে নিয়েছে। নফরে আওয়াল কুরবানীর দিনের পর আরো দু'দিন পর্যন্ত বাকী থাকে। আর নফরে আওয়ালের পর মক্কায় বসবাস করার সংকল্প করলে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হবে। বসবাসের কারণে তাওয়াফে সদর বাতিল হবে না (শরহুল জামিইস্ সগীর ঃ সদরুশ্ শহীদ হুসামুদ্দীন (র.)। কূফাবাসী কোন ব্যক্তি হজ্জ করার পর মক্কা হতে বের হলে তার উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হবে না। কেননা, মক্কায় বাড়ীঘর তৈরী করার পর সে মক্কাবাসীদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে। তাই মক্কাবাসীদের হুকুম তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মক্কাবাসীদের উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার উপরও ওয়াজিব হবে না। ঋতুবতী মহিলা মক্কা হতে বের হওয়ার পূর্বে ঋতুস্রাব হতে পাক হয়ে গেলে তার উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হবে। শহরের আবাদী থেকে যে পরিমাণ দূরে গেলে সফরের হুকুম আপতিত হয়, কোন মহিলা মক্কা হতে এ পরিমাণ দূরে যাওয়ার পর যদি স্রাব বন্ধ হয়, তবে ফিরে এসে তাওয়াফে সদর করা তার উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে স্রাব বন্ধ হওয়ার পর কোন মহিলা যদি গোসল না করে থাকে এবং এক ওয়াক্ত নামাযের সময়ও তার অতিবাহিত না হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি মক্কা হতে বের হয়ে চলে যায়, তবে পুনরায় ফিরে এসে তাওয়াফে সদর করা তার উপরও ওয়াজিব নয়। হায়েয অবস্থায় মক্কা হতে বের হয়ে গোসল করে মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলে তার উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। তাওয়াফে সদর না করে কেউ যদি মক্কা হতে বেরিয়ে আসে, তবে মীকাত অতিক্রম না করে থাকলে ফিরে গিয়ে তাওয়াফে সদর করবে। মীকাত অতিক্রম করার পর এ কথা স্মরণ হলে আর ফিরে আসতে হবে না। যদি ফিরে আসে, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উমরার নিয়্যাতে ফিরে আসবে। প্রথমে উমরার তাওয়াফ করবে এবং উমরা শেষ করে তাওয়াফে সদর করবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)।

১৪. মাসআলা ঃ ইমাম কারখী (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওয়াফে সদর সম্পন্ন করে মাকামে ইবরাহীমে আসবে এবং সেখানে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। এরপর যমযমের কাছে এসে পানি পান করবে (যহীরিয়্যা)। যমযমের পানি পান করার নিয়ম হল, যমযমের নিকট পৌঁছে নিজ হাতে পানি উঠাবে। এরপর কিবলামুখী হয়ে কয়েক শ্বাসে পানি পান করবে। প্রত্যেক শ্বাসে খানায়ে কা'বার দিকে চোখ উত্তোলন করে তাকাবে। নিজের মুখে, মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি মাখবে। সম্ভব হলে শরীরের উপর পানি ঢেলে দিবে। মুস্তাহাব তরীকা হল, কা'বাগৃহের নিকটে এসে প্রথমে এর চৌকাঠে চুম্বন করবে। এরপর খালি পায়ে কাবাগৃহে প্রবেশ করবে। অতঃপর বের হয়ে মুলতাযামের নিকট আসবে (তাবয়ীন)। হাজরে আসওয়াদ হতে দরজা পর্যন্ত জায়গা হল মুলতাযাম। এর উপর নিজের বক্ষ ও মুখ লাগিয়ে ডান হাত দরজার চৌকাঠের দিকে উঠিয়ে এ ভাবে দু'আ করবে ঃ

السائل ببابك يسألك من فضلك ومغفرتك ويرجوا رحمتك (যহীরিয়্যা)।

মুলতাযামকে এভাবে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কান্নাকাটি করবে (কাফী)। যদি সম্ভব হয় এবং নিকটে হয়, তবে কা'বার গিলাফ ধরবে। ধরতে না পারলে উভয় হাত মাথার উপর খাড়া করে রেখে মাথা দেয়ালের সাথে লাগাবে (আল্ বাহরুর রায়িক)। সম্ভব হলে নিজের গাল কা'বার দেয়ালের সাথে লাগাবে (কাফী)। এ সময় আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্ হামদু লিল্লাহ বলবে এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি দুরূদ শরীফ পড়বে। নিজের মন-বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এরপর তাকবীর বলে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করবে। কা'বা গৃহে প্রবেশ করা সম্ভব হলে খুবই ভাল। প্রবেশ না করতে পারলেও কোন অসুবিধা নেই (মুহীত ঃ সুরুখসী)। তারপর কা'বার দিকে মুখ করে কেঁদে কেঁদে পেছনের দিকে চলে আসবে এবং কা'বা হতে বিচ্ছেদের কারণে মনে মনে আফ্সোস করবে। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে মসজিদ হতে বের হবে (কাফী)। যখন মক্কা হতে বের হবে, তখন মক্কার নীচু ভূমির নীচু রাস্তা দিয়ে বের হবে (ফাতহুল কাদীর)।

১৫. মাসআলা ঃ এ সব মাসআলার ক্ষেত্রে মহিলাদের হুকুমও পুরুষের মতই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইহ্রামের অবস্থায় তারা নিজেদের মাথা খোলা রাখবে না। মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। যদি মুখমণ্ডলের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয় এবং কোন কিছুর সাহায্যে তা চেহারা থেকে সরিয়ে রাখতে পারে, তবে জাইয আছে। মহিলাগণ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে না হিদায়া)। অর্থাৎ এমন আওয়াজ করে পড়বে, যা অন্যে শুনতে পায় না কিন্তু নিজে শুনতে পায়। এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে (তাবয়ীন)। তারা রমল করবে না এবং দুই সুবজ বাতির মাঝখানে দৌড়িয়ে চলবে না। তারা মাথা না মুণ্ডিয়ে ছেঁটে নিবে (হিদায়া)। মহিলাগণ সেলাই করা পোশাক যেমন জামা, কামীস, ওড়না, মোযা এবং হাত-মোযা ব্যবহার করতে পারবে। গোলাপী, জাফরানী ও কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে পারবে না। কিন্তু ধৌত করে নিলে পারবে কিফায়া)।

মুহ্রিমা মহিলা যদি সেলাই করা রেশমী অথবা অন্য কোন কাপড় পরিধান করে এবং অলংকার ব্যবহার করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে মহিলাগণ তাতে চুম্বন করবে না। কিন্তু খালি থাকলে চুম্বন করবে (হিদায়া)। হুজ্জত কিতাবে আছে, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা মহিলাদের জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু যদি নির্জন থাকে, তবে আরোহণ করবে (তাতারখানিয়্যা)। উপরোক্ত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে নপুংসক লোকেরাও মহিলাদের মতই। এতেই সতর্কতা বেশী (তাবয়ীন)।

বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বেহুশ হয়ে যায় এবং তার সাথী যদি তার পক্ষ হতে ইহ্রাম বাঁধে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয হবে না। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে এ মর্মে হুকুম করে যে, আমি যদি বেহুশ হয়ে যাই অথবা ঘুমিয়ে পড়ি, তবে তুমি আমার পক্ষ হতে ইহ্রাম বেঁধে নিবে, এ নির্দেশ মত যাকে হুকুম করা হয়েছে, সে যদি ইহ্রাম বাঁধে, তবে সমস্ত ইমামের মতে এ ইহ্রাম সহীহ্ হবে। সুতরাং আদেশকারী হুশ ফিরে পেয়ে অথবা ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে যদি হজ্জের কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পন্ন করে, তবে তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (হিদায়া)। বেহুশ ব্যক্তির পক্ষ হতে ইহ্রাম বাঁধার অবস্থায় প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির জন্য সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক নয় (আল-বাহরুর রায়িক)। অবশ্য ফকীহ্দের এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, যদি বেহুশ ব্যক্তি হজ্জের কর্মকাণ্ড আদায় করা পর্যন্ত বেহুশ অবস্থায় থাকে, তবে তাকে সাথে নিয়ে সমস্ত জায়গায় হাযির হওয়া এবং সাঈ ও উকূফ করানো আবশ্যক নাকি তার সাথীই তার পক্ষ থেকে সব কাজ সম্পন্ন করবে? ফকীদের এক জামাআত প্রথম মতটিকে পসন্দ করেছেন। পক্ষান্তরে অপর এক জামাআত ফকীহ্ দ্বিতীয় মতটিকে পসন্দ করেছেন। মাবসূত কিতাবে শেষোক্ত মতটিকে বিশুদ্ধতম মত বলে অভিহিত করা হয়েছে (ফাতহুল কাদীর)। যে ব্যক্তি তার সাথী নয়, সে যদি তার পক্ষ হতে ইহ্রাম বাঁধে, তাওয়াফ করে এবং রমী করে, তবে এ ক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

২. মাসআলা ঃ "মুন্তাকা" কিতাবে আছে, ঈসা ইবন আবান ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধার পর কেউ যদি জ্ঞানহীন হয়ে যায়, অতঃপর তার সঙ্গীরা যদি তাকে সাথে নিয়ে হজ্জের কর্মকাণ্ড আদায় করে এবং তাকে উকূফের স্থানসমূহে উকূফ করায়, এ অবস্থায় যদি কয়েক বছর কেটে যায়, এরপর সে সুস্থ হয়, তবে তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় মক্কা আসে এবং তার জ্ঞান ঠিক থাকে, এরপর কিছু সময়ের জন্য সে বেহুশ হয়ে পড়ে, এ সময় তার সঙ্গীরা তাকে উঠিয়ে তাওয়াফ করায়। তাওয়াফ সম্পন্ন হওয়ার পর অথবা কয়েক চক্কর ঘুরার পর তার আবার হুশ ফিরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসে। পুরা দিন বেহুশ অবস্থায় তার অতিবাহিত হয়নি, তাহলে তার এ তাওয়াফ জাইয হবে (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম ইসতীজাবী (র) বলেন, কেউ যদি কাউকে মাথায় বা কাঁধে করে তাওয়াফ করায়, তবে বহনকারী এবং যাকে বহন করা হয়েছে উভয়ের তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বহনকারী উভয়ের তাওয়াফের নিয়্যাত করুক অথবা না করুক অথবা বহনকারীর তাওয়াফ 'উমরার জন্য হোক এবং যাকে বহন করা হয়েছে তার তাওয়াফ হজ্জের জন্য হোক অথবা এর বিপরীত হোক–সব অবস্থায় হুকুম একই হবে। বহনকারী ব্যক্তি যদি মুহরিম না হয়, তবে যাকে বহন করা হয়েছে, সে যে বিষয়ের ইহ্‌রাম বেঁধেছে তাওয়াফ সে মুতাবিকই হবে (আল–বাহ্‌রুর রায়িক ও শরহুত তাহাবী)। অসুস্থ ব্যক্তি, যে তাওয়াফ করতে সক্ষম নয়, তার ঘুমন্ত অবস্থায় সাথীরা যদি তাকে তাওয়াফ করায়, তাহলে সে যদি সাথীদেরকে এ কাজের হুকুম না করে থাকে, তবে তাওয়াফ জাইয হবে না। আর যদি হুকুম করে ঘুমিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি তাকে নিয়ে সাথীরা তাওয়াফে প্রবেশ করে অথবা তাওয়াফের দিকে মুখ ফিরাতেই সে ঘুমিয়ে যায় আর এ অবস্থায় সাথীরা তাকে নিয়ে তাওয়াফ করায়, তবে এ তাওয়াফ জাইয হবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ অসুস্থ ব্যক্তি যে রমী করতে সক্ষম নয় হাতে নুড়ি পাথর রাখার পর সে নিজেই তা নিক্ষেপ করবে অথবা তার হুকুমে অন্য কেউ তার পক্ষ হতে নিক্ষেপ করে দিবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)। কেউ যদি তার নিকটবর্তী কোন ব্যক্তিকে বলে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার জন্য একজন লোক ঠিক কর, যে বহন করে আমাকে তাওয়াফ করিয়ে দিবে। একথা বলে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে যাকে হুকুম করা হয়েছিল, সেও সাথে সাথে তা তামীল করেনি। বরং অন্য কাজে মশগুল হয়ে পড়েছে। অবশেষে অনেক পরে একদল মানুষ ঠিক করলে তারা এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বহন করে তাওয়াফ করিয়ে দেয়, হাসান (র) বলেন, নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে তাওয়াফ করালে তাওয়াফ জাইয হত। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর সে ঘুমিয়ে পড়লে তারা এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে উঠিয়ে যেহেতু তাওয়াফ করিয়েছে, তাই এ তাওয়াফ জাইয হবে না। কিন্তু শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে। তা মাফ হবে না (মুহীত)। কতিপয় পুরুষকে পারিশ্রমিক দেওয়ার পর তারা তাওয়াফের নিয়ত করে একজন মহিলাকে বহন করে তাওয়াফ করিয়ে দিল। এতে তাদের তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে এবং তারা পারিশ্রমিকও পেয়ে যাবে। এমনিভাবে মহিলার তাওয়াফও আদায় হয়ে যাবে। যদি বহনকারী লোকেরা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তালাশ করার নিয়্যাত করে, আর যাকে বহন করা হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান হয় এবং সে যদি তাওয়াফের নিয়ত করে তবে যাকে উঠানো হয়েছে তার তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বহনকারীদের তাওয়াফ আদায় হবে না। কিন্তু সে যদি বেহুশ অবস্থায় থাকে, তবে তার তাওয়াফও আদায় হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ তাওয়াফে ওয়াজিব আদায়কালীন সময়ে যে তাওয়াফ আদায় করা হবে, তা

তাওয়াফে ওয়াজিব হিসাবেই গণ্য হবে। নফলের নিয়ত করুক অথবা অন্য কিছুর নিয়ত করুক, তাতে কোন ফরক নেই। হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তি যদি নফল তাওয়াফ করে, তবে তা তাওয়াফে কুদূম হিসাবে গণ্য হবে। উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে তা উমরার তাওয়াফ হিসাবে গণ্য হবে। কারিন হলে তার প্রথম তাওয়াফ উমরার জন্য হবে এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ হজ্জের জন্য হবে। অনুরূপভাবে তাওয়াফে যিয়ারতের সময় কেউ যদি তাওয়াফ করে, তবে এর নিয়্যাত না করলেও তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারত হিসাবে গণ্য হবে। তাওয়াফের নিয়্যাত অবশ্যই করতে হবে। শুধু প্রদক্ষিণ করা কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। অতএব যদি কেউ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির তালাশে অথবা শত্রু হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের তাওয়াফ করে, তবে তার এ তাওয়াফ গ্রহণযোগ্য হবে না। আরাফার উকূফ এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, নিয়্যাত ছাড়াও আরাফার অবস্থান সহীহ্‌ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ বালক যদি নিজে ইহ্‌রাম বাঁধে অথবা অন্য কেউ যদি তার পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে এ ইহ্‌রাম সহীহ্‌ হবে (তাবয়ীন)। "আসল" নামক কিতাবে আছে যে, না–বালিগ সন্তানকে যদি তার পিতা হজ্জ করায়, তবে তার পক্ষ হতে হজ্জের হুকুম–আহকাম আদায় করবে এবং জমরাতে পাথর নিক্ষেপ করবে। এ হুকুম ঐ বালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে হজ্জের কর্মকাণ্ড আদায় করার কথা কিছুই বুঝে না (মুহীত)। জমরাতে কংকর মারা এবং মুযদালিফায় অবস্থান করা তরক করলেও তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। বালক যদি জ্ঞানবান হয় এবং হজ্জের কর্মকাণ্ডসমূহ বুঝে, তবে সে নিজেই হজ্জের হুকুম–আহকাম আদায় করবে। যেমন বালিগ লোকেরা করে থাকে। যদি সে কোন কাজ ছেড়ে দেয় যেমন রমী ইত্যাদি, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। পিতা নাবালিগ সন্তানের পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তার থেকে যদি এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যা ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। যে ব্যক্তি বালকের পক্ষ হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে, তার জন্য উচিত হবে বালকের পোশাক এবং কাপড় খুলে তাকে দু'টি কাপড় তথা একটি লুঙ্গি এবং একটি চাদর পরিয়ে দেওয়া এবং মুহরিম ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সব কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকে এর থেকে বিরত রাখা। এরপরও যদি সে কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না এবং তার ওলীর উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এ ধরনের কোন বালক যদি হজ্জের নিয়্যাত করার পর তা ফাসিদ করে দেয়, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কোন বালক যদি হরমের সীমানায় কোন কিছু শিকার করে, তবু তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (শরহুত তাহাবী)। কেউ যদি নিজের পরিবার এবং ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে হজ্জে যায়, তবে ছোট বালক–বালিকার পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধবে যে আত্মীয়তার দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং যদি পিতা এবং ভাই সাথে থাকে, তবে পিতা ইহ্‌রাম বাঁধবে–– ভাই নয় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ উমরার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ ইহ্রামের সাথে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করাকে শরীআতের পরিভাষায় উমরা বলে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। আমাদের মাযহাবে উমরা করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। বছরে একাধিকবার উমরা করা জাইয। সারা বছরই উমরা করা যায়। কিন্তু "কারিন ব্যতীত অন্যদের জন্য বছরে পাঁচ দিন উমরা করা মাকরূহ্। এ পাঁচ দিন হল, আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের বিধান সুস্পষ্ট। তাই যা উল্লেখ করা হয়েছে, এতদসত্ত্বেও কেউ যদি এ দিনগুলোতে উমরা করে, তবে তার উমরা সহীহ্ হবে এবং ইহ্রাম ঠিক বিবেচিত হবে (হিদায়া)। মুনতাকা কিতাবে আছে, আমালীতে বিশ্র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে,[১] কোন ব্যক্তি যদি যিলহজ্জের প্রথম দশকে ইহ্রাম বাঁধার পর আইয়ামে তাশরীকের সময় মক্কা আসে, তবে আমার মতে আইয়ামে তাশরীক অতিবাহিত হওয়ার পর তাওয়াফ করা উত্তম। ইহ্রাম ভঙ্গ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। এ সময়েও যদি তাওয়াফ করে নেয়, তবে জাইয হবে এবং তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।। আইয়ামে তাশরীকের সময় কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধলে তাকে ইহ্রাম ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হবে। যদি ইহ্রাম না ছাড়ে এবং তাওয়াফও না করে আর এভাবে আইয়ামে তাশরীক অতিবাহিত হয়ে যায় এবং এরপর সে তাওয়াফ করে, তবে তাওয়াফ জাইয হবে এবং কোন কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ উমরার রুক্ন হল তাওয়াফ করা। উমরার ওয়াজিব হল, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা এবং মাথা-মুণ্ডানো অথবা চুল ছাঁটা (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। হজ্জের মধ্যে যা শর্ত উমরার মধ্যেও শর্ত তাই। তবে হজ্জের জন্য সময় নির্ধারিত কিন্তু উমরার জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই। যখন ইচ্ছা সারা বছরই উমরা আদায় করা যায় (বাদাই')। হজ্জের মধ্যে সাঈ করা পর্যন্ত যত কাজ সুন্নাত ও মুস্তাহাব উমরার মধ্যেও ঐ সমস্ত কাজ সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

৩. মাসআলা ঃ যে সব কাজে 'উমরা ফাসিদ হয়ে যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

সাত তাওয়াফের অধিকাংশ তাওয়াফ করার পূর্বে স্ত্রী-সহবাসে উমরা ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)। শুধু উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি হজ্জের মাসে হোক অথবা হজ্জের মাস ছাড়া অন্য সময় হোক, মীকাত থেকে অথবা মীকাতের পূর্ববর্তী স্থান থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধবে। ইহ্রাম বাঁধার সময় মনে মনে নিয়্যাত করার সাথে তালবিয়া পাঠ করার সময় মুখেও উমরার কথা উচ্চারণ করবে। বলবে ঃ لبيك بالعمرة মুখে উচ্চারণ না করে শুধু মনে মনে নিয়্যাত করাও জাইয। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করা উত্তম (মুহীত)। হজ্জের ইহ্রামের অবস্থায় যে সব

১. সম্ভবত মাসআলাটি ঐ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য হবে, যে ইতোপূর্বে হজ্জ করে নিয়েছে।

কাজ নিষিদ্ধ উমরার ইহ্রামের সময়ও সে সব কাজ নিষিদ্ধ।উমরার ইহ্রাম, তাওয়াফ এবং সাঈর অবস্থায় তাই যা হজ্জের ইহ্রাম, তাওয়াফ এবং সাঈর মধ্যে করা হয়। তাওয়াফ সাঈ করে মাথা কামানোর পর উমরার ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। সহীহ্ রিওয়ায়েত অনুসারে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার পর তালবিয়া বন্ধ করে দিবে (যহীরিয়্যা)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ কিরান এবং তামাত্তুর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কারিন ঐ হাজীকে বলে, যে মীকাত থেকে অথবা এর পূর্ববর্তী স্থান থেকে হজ্জের মাসে কিংবা এর পূর্বের কোন মাসে হজ্জ এবং উমরার জন্য একত্রে ইহ্রাম বাঁধে (মি'রাজুদ্ দিরায়া)। হজ্জ এবং উমরার জন্য একত্রে ইহ্রাম বাঁধুক অথবা প্রথমে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে পরে এর সাথে মিলিয়ে উমরার ইহ্রাম বাঁধা হোক অথবা প্রথমে উমরার ইহ্রাম বেঁধে পরে এর সাথে মিলিয়ে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর এর সাথে মিলিয়ে উমরার ইহ্রাম বাঁধলে অনুচিত হবে (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি কিরান হজ্জ করার ইচ্ছা করে, তবে ইহ্রাম বাঁধার জন্য মুফরিদের ন্যায় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। প্রথমে উযূ বা গোসল করে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। সালাম ফিরানোর পর বলবে ঃ اللهم انى اريد الحج والعمرة এরপর তালবিয়া পাঠ করবে অর্থাৎ এ দু'আ পড়বে ঃ لبيك بعمرة وحجة معا (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তালবিয়া পড়ার সময় মনে মনে নিয়্যাত করার সাথে মুখেও হজ্জ এবং উমরার কথা উচ্চারণ করবে। মুখে উচ্চারণ না করে শুধু মনে মনে নিয়্যাত করলেও জাইয হবে। অবশ্য মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এভাবে তালবিয়া পাঠ করলে হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহ্রামই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। তারপর হজ্জের মাসে অথবা এর পূর্বে উমরা আদায় করে নিবে এবং এ বছর হজ্জও আদায় করবে (মুহীত)। কারিন প্রথমে উমরার কাজ সম্পন্ন করবে এরপর হজ্জের কাজ সম্পন্ন করবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

"কারিন" তাওয়াফে কুদূম করবে। অর্থাৎ সাতবার কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করবে। এরপর সাঈ করবে (হিদায়া)। কেউ যদি হজ্জ এবং উমরার জন্য একত্রে দুই তাওয়াফ করে, মধ্যখানে সাঈ না করে, এরপর দুইবার সাঈ করে, তবু জাইয হবে। কিন্তু অন্যায় হবে (তাবয়ীন)। যদি কারিন উমরার জন্য তিনবার বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করে, এরপর সাঈ করে অতঃপর হজ্জের জন্য অনুরূপ তাওয়াফ করে, তারপর আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে হজ্জের জন্য যে তাওয়াফ করেছে, তা উমরার তাওয়াফ হিসাবে গণ্য হবে এবং এ তাওয়াফ পুরা করার জন্য আরেক বার বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করবে। তারপর হজ্জ এবং উমরার জন্য পুনরায় দুইবার সাঈ করবে। হজ্জের সাঈ ওয়াজিব এবং উমরার সাঈ মুস্তাহাব। এরূপ করলে সে কারিন হিসাবেই গণ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কারিন যদি প্রথমে হজ্জের জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করে এবং পরে উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করে, তবে প্রথম তাওয়াফ ও সাঈ উমরার জন্য হবে এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ ও সাঈ হজ্জের জন্য হবে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। কারিন যদি উমরা এবং হজ্জের জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাওয়াফ করে এবং সাঈ করে শুধু হজ্জের জন্য, তবে এ সাঈ উমরার জন্য হবে (মুহীত)। হজ্জ এবং উমরার মধ্যে মাথা মুণ্ডাবে না (হিদায়া)। কুরবানীর দিন জমরায়ে আকাবায় রমী করার পর হজ্জে কিরানের কুরবানীর পশু যবাহ করবে। এ কুরবানী মানাসিকে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের মাযহাবে কারিন কুরবানীর পশু যবাহ্ করার পর ইহ্‌রাম থেকে হালাল হবে না। বরং মাথা মুণ্ডানোর পর ইহ্‌রাম থেকে হালাল হবে (হিদায়া)। কারিন যদি পশু সাথে নিয়ে যায়, তবে উত্তম। পশু যবাহ্ করার পর সে মাথা মুণ্ডাবে অথবা চুল ছেঁটে নিবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ মুতামাত্তি' ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে হজ্জের মাসসমূহে উমরার কাজ সম্পন্ন করে নেয় অথবা হজ্জের মাসসমূহে উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ করে নেয়, পরে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং নিজ বাড়ীতে এসে পরিবার–পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার আগে ঐ বছরই হজ্জ সম্পন্ন করে নেয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। চাই সে প্রথম ইহ্‌রাম হতে হালাল হোক অথবা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। হজ্জের মাসসমূহে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা তামাত্তুর জন্য শর্ত নয়। বরং শর্ত হল হজ্জের মাসসমূহে উমরার কাজ সম্পন্ন করা অথবা উমরার তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর এ সময় আদায় করা। অতএব, কেউ যদি রমযান মাসে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ তিন বার প্রদক্ষিণ করে, অতঃপর শাওয়াল আসার পর আরো চারবার বায়তুল্লাহ্‌ প্রদক্ষিণ করে, তারপর এ বছরই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে সে মুতামাত্তি' হবে (ফাতহুল কাদির)। তামাত্তুকারী ব্যক্তি যদি হজ্জের মাস আসার আগে উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করে নেয় এবং এ বছরই হজ্জ করে, তবে সে মুতামাত্তি' হবে না। বরং সে উমরা ও হজ্জ পৃথক পৃথকভাবে আদায় করল। কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব নয় (যহীরিয়্যা)। যে বছর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে, সে বছরই হজ্জ করা তামাত্তুর জন্য শর্ত নয়। বরং শর্ত হল, যে বছর উমরার কাজ সম্পন্ন করবে, সে বছরই হজ্জের কাজ সম্পন্ন করবে। সুতরাং কেউ যদি রমযান মাসে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে এবং পরবর্তী বছর শাওয়াল মাস পর্যন্ত এ ইহ্‌রাম বাকী রাখে এবং এ সময় উমরার তাওয়াফ করে তারপর এ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবু সে মুতামাত্তি' হবে (আল–বাহ্‌রুর রাইক)। উপরে উল্লিখিত الماء صحيح "ই্‌ল্‌মামে সহীহ্‌" অর্থ নিজ বাড়ীতে পরিবার–পরিজনের নিকট ফিরে আসা এবং পুনরায় মক্কা গমন তার উপর ওয়াজিব না হওয়া (মুহীত)। যে মুতামাত্তি' নিজের সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে যায়নি তার থেকে "ইলমামে সহীহ" হতে পারে। কিন্তু যে নিজের কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে হজ্জ করতে এসেছে, তার ইল্‌মাম সহীহ্‌ হবে না এবং এতে তার হজ্জে তামাত্তু' বাতিলও হবে না (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩. মাসআলা ঃ হজ্জের মাসে উমরা করে হালাল হওয়ার পর নিজ বাড়ীতে ফিরে আসার পর ঐ বছরই কেউ যদি হজ্জ আদায় করে, তবে সে মুতামাত্তি' হবে না। হজ্জের মাসে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে তিনবার বায়তুল্লাহ্‌ প্রদক্ষিণ করার পর কেউ যদি ইহ্‌রাম ছেড়ে দিয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে, অতঃপর পুনরায় মক্কা গমন করে উমরার অবশিষ্ট তাওয়াফসমূহ আদায় করে, তারপর হালাল হয়ে যায়। এরপর এ বছরই আবার হজ্জ করে, তবে সেও মুতামাত্তি' হিসাবে গণ্য হবে।

আর যদি পূর্বে চারবার বায়তুল্লাহ্‌ প্রদক্ষিণ করে থাকে এরপর দেশে ফিরে আসে অতঃপর পূর্বের ন্যায় করে, তবে সে মুতামাত্তি' হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। কেউ যদি হজ্জের মাসে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে হালাল না হয়েই বাড়ী চলে আসে এবং স্বীয় পরিবার–পরিজনের সাথে সাক্ষাত করে। এরপর পুনরায় এসে উমরার অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে এবং এ বছরই হজ্জের কাজও সমাধা করে, তবে ইমামদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে সে মুতামাত্তি' বলে গণ্য হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তাওয়াফের তিন চক্কর অথবা কম আদায় করে ইহ্‌রাম অবস্থায় বাড়ী আসে। কিন্তু যদি উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ অথবা পূর্ণ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর হালাল না হয়ে ইহ্‌রাম অবস্থায় বাড়ী আসে এবং এরপর পুনরায় মক্কা শরীফ গিয়ে অবশিষ্ট তাওয়াফ সমাধা করে এবং এ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)–এর মতে উক্ত ব্যক্তি মুতামঅত্তি' হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে মুতামাত্তি' হবে না (যহীরিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ মুতামাত্তি' দুই প্রকার। (১) ঐ মুতামাত্তি' যার সাথে হাদী আছে। (২) ঐ মুতামাত্তি' যার সাথে হাদী নেই। যে মুতামাত্তি'র সাথে হাদী নেই, সে মীকাত থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফ প্রবেশ করবে এবং উমরার তাওয়াফ–সাঈ করে মাথা কামিয়ে বা চুল ছোট করে উমরার ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। উমরা এবং হজ্জে তামাত্তুর জন্য মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি নিজের বাড়ী অথবা অন্য কোন স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধে, তবু জাইয হবে এবং হজ্জে তামাত্তু' আদায় হবে। অনুরূপভাবে উমরা সম্পন্ন করার পর তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা আবশ্যক নয়। বরং ইচ্ছা করলে হালাল হতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা পর্যন্ত মুহরিম অবস্থায়ও থাকতে পারবে (তাবয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ তাওয়াফ আরম্ভ করে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করতেই তালবিয়া বলা বন্ধ করবে (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এরপর ইহ্‌রাম ছেড়ে দিয়ে হালাল অবস্থায় মক্কা শরীফ অবস্থান করবে (হিদায়া)। মক্কায় থাকা কোন শর্ত নয়। বরং ঐ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা থাকলে হজ্জের ইহ্‌রাম পর্যন্ত সময় হালাল অবস্থায় মক্কা শরীফ থাকবে। যদি ইহ্‌রামের সাথে থাকে, তবে জাইয আছে (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এরপর যিলহাজ্জ মাসের আট তারিখে মসজিদের নিকট হতে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। হরমের সীমানা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা শর্ত। মসজিদে হারাম হতে ইহ্‌রাম বাঁধা শর্ত নয় (হিদায়া)। অবশ্য মসজিদে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। হরম বা মক্কার বাইরের অন্যান্য স্থানের তুলনায় মক্কায় ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম (ফাতহুল কাদীর)। আট তারিখে ইহ্‌রাম বাঁধা আবশ্যক নয়। আরাফার দিন ইহ্‌রাম বাঁধাও জাইয আছে (আল–জাওহারাতুন নায়্যারা)। এমনিভাবে আট তারিখের পূর্বেও ইহ্‌রাম বাঁধা জাইয আছে। বরং আট তারিখের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম (তাবয়ীন)। যত শীঘ্র ইহ্‌রাম বাঁধবে ততই ভাল (আল–জাওহারাতুন নায়্যারা)। ইহ্‌রামের পর তামাত্তু আদায়কারী হাজী, মুফরিদের ন্যায় হজ্জের কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পন্ন করবে। কিন্তু মুতামাত্তি' ব্যক্তি তাওয়াফে তাহিয়্যাহ্‌ করবে না। তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করবে এবং এরপর সাঈ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু মুতামাত্তি' যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে তাওয়াফে কুদূম এবং সাঈ করে নেয়, তবে তাওয়াফে যিয়ারতে আর রমল করতে হবে না। তাওয়াফে কুদূমে রমল করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং এরপর সাঈও করতে হবে না (নিহায়া ও ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ হজ্জে তামাত্তু' আদায়কারীর উপর দমে শোকর ওয়াজিব। কেননা,, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হজ্জ এবং উমরা একত্রে আদায় করার তাওফীক দান করেছেন (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। কুরবানী না করা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না। তামাত্তুকারী যদি গরীব মানুষ হয়, কুরবানী করতে সক্ষম না হয়, তবে হজ্জের দিনসমূহে তিনটি রোযা রাখবে। উমরার ইহ্‌রামের পর আরাফার দিন পর্যন্ত এ রোযা তিনটি রাখা জাইয আছে। এর আগে এবং পরে রাখা জাইয নেই। উত্তম হল, সাত, আট এবং নয় তারিখে রাখা। আরাফার দিন হবে এ রোযার শেষ দিন (যহীরিয়্যা)। কাফ্‌ফারার রোযার ন্যায় এ রোযার মধ্যেও রাত্রে নিয়্যাত করা জরুরী। এ রোযা একাধারে রাখাও জাইয এবং পৃথকভাবে রাখাও জাইয (আল–জাওহারাতুন নায়্যারা)। রোযা শেষ করার পর মাথা মুণ্ডানোর সময় আসলে মাথা মুণ্ডাবে অথবা চুল ছোট করে নিবে। এরপর আইয়ামে তাশরীক চলে যাওয়ার পর বাকী সাতটি রোযা রাখবে (যহীরিয়্যা)। হজ্জের কাজ সমাপ্ত করে মক্কায় থেকেই যদি এই রোযা রাখে, তবু আমাদের মাযহাবে জাইয হবে (কুদূরী)।। ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে যে প্রথমে তিনটি রোযা রাখেনি, তার উপর বাকী সাতটি ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

৬. মাসআলা ঃ এই তিন রোযা সম্পন্ন করার আগে অথবা রোযা তিনটি রাখার পর মাথা মুণ্ডানোর আগে কিংবা হালাল হওয়ার পূর্বে কুরবানীর দিনসমূহ বাকী থাকতে কেউ যদি দমে শোকর আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কুরবানী ছাড়া সে হালাল হতে পারবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি মাথা মুণ্ডন করা এবং হালাল হওয়ার পর অবশিষ্ট সাতটি রোযা রাখার আগে দমে শোকর আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে তার রোযা বাতিল হবে না। বরং রোযা সহীহ্ হবে এবং কুরবানী করার আর দরকার হবে না। তিন দিন রোযা রাখার পর এখনো হালাল হয়নি এমনি করে কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর দমে শোকর আদায় করতে সক্ষম হলে রোযা শেষ করবে এবং কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যদি তিন দিনের রোযা না রেখে থাকে, তবে এরপর আর রোযা রাখবে না। বরং দমে শোকর আদায় করবে।

৭. মাসআলা ঃ দমে শোকর আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তি যদি ইহ্‌রাম ছেড়ে হালাল হয়ে যায়, তবে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। (১) একটি হল দমে তামাত্তু' (২) আর অপরটি কুরবানী না করে ইহ্‌রাম ছেড়ে দেয়ার কারণে। রোযা না রাখার কারণে দম ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা)। কুরবানী করতে অক্ষম হয়ে বা মরে যাওয়ার আশংকায় কুরবানীর ব্যাপারে ওসিয়ত করে গেলে কুরবানীর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া আদায় করা জাইয হবে না। কুরবানীই করতে হবে (তাতারখানিয়্যা)। দমে শোকর সঙ্গে থাকা অবস্থায়ও কেউ যদি রোযা রাখে, তবে দেখতে হবে

যে, এ পশু যদি কুরবানীর দিন পর্যন্ত তার নিকট থাকে, তবে রোযা জাইয হবে না। কিন্তু তা যদি এর পূর্বে মারা যায় বা খোয়া যায়, তবে রোযা জাইয হবে (তাবয়ীন)।

৮. মাসআলা ঃ হাদী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কারিনের হুকুমও তামাত্তু' আদায়কারীর ন্যায়। অর্থাৎ যদি কুরবানী করতে সক্ষম হয়, তবে কুরবানী ওয়াজিব হবে। আর যদি কুরবানী করতে সক্ষম না হয়, তবে রোযা রাখবে (যহীরিয়্যা)। তামাত্তু' আদায়কারী যদি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যেতে চায়, তবে প্রথমে ইহ্‌রাম বাঁধবে, পরে কুরবানী পশু নিয়ে চলবে (কুদূরী)। কুরবানীর পশু সাথে না নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পশু সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। তামাত্তুর নিয়্যাতে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে উমরা আদায় করার পর কারো যদি নিয়্যাত পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তামাত্তু না করার নিয়ত করে, তবে বিষয়টি তার ইখতিয়ারভুক্ত থাকবে এবং আনীত পশু যা ইচ্ছা করতে পারবে (গায়াতুস সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)।

৯. মাসআলা ঃ আফাকী[১] লোকদের জন্য তামাত্তু ও ইফরাদের তুলনায় কিরান উত্তম। কিন্তু ইফ্‌রাদের তুলনায় তামাত্তু উত্তম। যাহিরী রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত আছে (মুহীত)। মক্কাবাসী লোকদের জন্য তামাত্তু এবং কিরান হজ্জ জাইয নেই। তারা হজ্জে ইফরাদ আদায় করবে (হিদায়া)। অনুরূপভাবে মীকাতে এবং মীকাতের অভ্যন্তরে যারা বসবাস করে, তারাও মক্কাবাসী লোকদের ন্যায় শুধু হজ্জে ইফরাদ পালন করবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ মক্কাবাসী কোন লোক যদি কূফা যায় এবং সেখান থেকে এসে কিরান করে, তবে তার কিরান হজ্জ সহীহ হবে। যদি কূফা গিয়ে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা করে পরে হজ্জ আদায় করে, তবে এরূপ ব্যক্তি মুতামাত্তি' হিসাবে গণ্য হবে না। যদি মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি কূফা গিয়ে তথা থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসে, তবু সে মুতামাত্তি' হবে না। কুরবানীর পশু সাথে আনা সত্ত্বেও তার ইলমাম সহীহ্ হবে। অর্থাৎ তার বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন "বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন হিসাবেই" গণ্য হবে। কিন্তু কূফার অধিবাসী লোকদের হুকুম এর থেকে ভিন্ন (মুহীত)। কেউ যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে মক্কায় অবস্থান করে, এরপর পুনরায় উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায় করে ঐ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে সে মুতামাত্তি' হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি উমরা সমাপ্ত করে হজ্জের মাসের পূর্বে মীকাতের বাইরে চলে যায় এবং সেখান থেকে তখন উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায় করে পরে ঐ বছরই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে সে মুতামাত্তি' হবে। যদি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে মীকাতের বাইরে যায়, তবে মুতামাত্তি' হবে না। কিন্তু যদি মীকাতের বাইরে গিয়ে নিজ পরিবার–পরিজনের নিকট যায় এরপর উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায় করে এ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে এ অবস্থায় সে মুতামাত্তি' হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে হজ্জের মাসের আগে মীকাত অতিক্রম করুক বা পরে অতিক্রম করুক উভয় অবস্থাতেই সে মুতামাত্তি' হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

১. অর্থাৎ যে সব লোকের বাসস্থান মীকাতের সীমার বাইরে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১. মাসআলা ঃ কূফাবাসী কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের মাসসমূহে উমরা আদায় করে মক্কা বা বসরা অবস্থান করে, এরপর এ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে সে 'মুতামাত্তি' হিসাবে গণ্য হবে (মুতূন)। যদিও এরূপ কোন ব্যক্তি হজ্জের মাসে উমরা করে তা ফাসিদ করে দেয় এবং এ অবস্থায়ই উমরা পূর্ণ করে, এরপর এ বছরই আবার হজ্জ আদায় করে, তবে সে মুতামাত্তি' হবে না। যদি মীকাতে না গিয়ে ফাসিদ উমরার কাযা করে এবং এ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে কোন ইমামের মতেই সে মুতামাত্তি' হবে না। যদি মীকাতে যাওয়ার পর ফাসিদ উমরার কাযা করে, তবে মুতামাত্তি' হবে। উমরা ফাসিদ করার পর যে জনপদবাসীদের জন্য তামাত্তু' ও কিরান করা জাইয, সে জনপদে এসে কেউ যদি ফাসিদ উমরার কাযা করে এবং এ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে মুতামাত্তি' হবে না। অবশ্য যদি নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে গিয়ে থাকে এবং সেখান থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে ফিরে আসে তবে মুতামাত্তি' হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি হজ্জের মাসে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে তা ফাসিদ করে দেয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে উমরা করে ফাসিদ করে দেয় এবং এ অবস্থায় তা পুরা করে, এরপর মীকাতের বাইরে না গিয়ে হজ্জের মাসে ঐ ফাসিদ উমরার কাযা করে আর ঐ বছরই হজ্জ আদায় করে নেয়, তবে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত মতে সে মুতামাত্তি' হবে। এ ধরনের কোন ব্যক্তি যদি নিজ পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য এমন কোন স্থানে গমন করে, যেখানকার লোকদের জন্য তামাত্তু ও কিরান জাইয আছে, তারপর ফিরে এসে হজ্জের মাসসমূহে ফাসিদ উমরার কাযা করে এবং ঐ বছরই হজ্জ আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে যদি শাওয়ালের চাঁদ মীকাতের বাইরে বসে দেখে থাকে এবং হজ্জের মাস যখন আসে তখন তার জন্য হজ্জে মাতাত্তু যদি জাইয থেকে থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি ফিরে এসে হজ্জের মাসে উমরা আদায় করে, এরপর এ বছরই হজ্জও আদায় করে, তবে সে মুতামাত্তি' গণ্য হবে। আর যদি শাওয়ালের চাঁদ মীকাতের অভ্যন্তরে বসে দেখে থাকে এবং হজ্জের মাস আগমন কালে যদি তার জন্য হজ্জে তামাত্তু জাইয না থাকে, তবে তামাত্তু তার জন্য জাইয হবে না। অবশ্য নিজ পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে পুনরায় এসে উমরা করে ঐ বছরই হজ্জ আদায় করলে হজ্জে তামাত্তু সহীহ্ হবে। পক্ষান্তরে সাহিবায়নের মতে শাওয়ালের চাঁদ মীকাতের বাইরে দেখুক বা মীকাতের অভ্যন্তরে দেখুক উভয় অবস্থাতেই সে মুতামাত্তি' হবে (শরহুত্ তাহাবী)। হজ্জের মাসসমূহে উমরা করে ঐ বছরই হজ্জ আদায় করে কেউ যদি এতদুভয়ের কোন একটি ফাসিদ করে দেয়, ফাসিদকৃত আমলের অবশিষ্ট কার্যাদি চালিয়ে যাবে। তার উপর দমে শোকর ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)। এ অবস্থায়ও তামাত্তুর নিয়্যাতে সে যদি হজ্জে তামাত্তু আদায় করে এবং কুরবানী করে, তবে এতে দমে শোকর আদায় হবে না (কানয)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ জিনায়াতের বিবরণ

[এই পরিচ্ছেদে পাচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সুগন্ধি ও তৈল ব্যবহার করা

১. মাসআলা ঃ "তীব" অর্থাৎ সুগন্ধি এমন বস্তুকে বলা হয়, যার ঘ্রাণ সুমিষ্ট ও মনমুগ্ধকর। একেই জ্ঞানী লোকেরা সুগন্ধি বলে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আমাদের ইমামগণ বলেন, যে সব বস্তু শরীরে লাগান হয়, তা তিন প্রকার। (১) সুগন্ধি, যা ঘ্রাণ হাসিল করার জন্যই প্রস্তুত করা হয়। যেমন মিশ্‌ক, আম্বর, কর্পূর ইত্যাদি। ইহ্‌রামের অবস্থায় এগুলো যেভাবেই ব্যবহার করা হোক, এতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। এমনকি এ সবের দ্বারা তৈরীকৃত ঔষধ যদি চোখ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়, ফকীহ্‌দের মতে তাতেও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। (২) এমন বস্তু, যা সুগন্ধি নয় এবং যার দ্বারা সুগন্ধি বানানোও যায় না, যেমন চর্বি, এগুলো ভক্ষণ করলে, শরীরে মালিশ করলে অথবা পায়ের ফাটা অংশে এর দ্বারা প্রলেপ দিলে কোন অবস্থাতেই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। (৩) এমন বস্তু যা হালে সুগন্ধি নয়। কিন্তু সুগন্ধির মূল উপকরণ হিসাবে পরিচিত। লোকেরা এগুলোকে সুগন্ধি হিসাবেও ব্যবহার করে আবার ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার করে। যেমন যায়তুন এবং তিলের তৈল। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারের দৃষ্টিভংগি বিচার্য হবে। যদি শরীরে তৈল ব্যবহার করার ন্যায় ব্যবহার করা হয়, তবে তা সুগন্ধি হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি পানাহার বা পায়ের ফাটা অংশে প্রলেপ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে তা সুগন্ধি হিসাবে গণ্য হবে না (বাদাই' উস সানাই')। শরীর, চাদর এবং বিছানায় সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ তারতম্য নেই (ফাতহুল কাদীর)। সুগন্ধি যদি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সামান্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে সাদাকা ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ বেশী ও কমের মাপকাঠি কি? এ নিয়ে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ শরীরের বড় বড় অঙ্গ দ্বারা বিষয়টি নির্ণয় করেছেন। যেমন উরু বা পায়ের নলা ইত্যাদি। অর্থাৎ এগুলোর কোন একটির সমান পরিমাণ হলে বেশী হবে। নতুবা কম হবে। আবার কেউ কেউ বড় অঙ্গের এক-চতুর্থাংশের দ্বারা বিষয়টি বিচার করেছেন। অর্থাৎ এ পরিমাণ সুগন্ধি ব্যবহার করলে তা বেশী হবে। আর এর চেয়ে কম হলে কম বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ জা'ফর (র) বলেন, মানুষ যাকে অধিক মনে করে তা অধিক হিসাবে গণ্য হবে। যেমন দুই অঞ্জলি গোলাপজল এবং এক অঞ্জলি গালিয়া (এক প্রকার সুগন্ধি) ও মিশ্‌ক। আর মানুষ যাকে কম মনে করে, তা কম হিসাবেই বিবেচিত হবে। বিশুদ্ধ মত হল, সুগন্ধির ঘ্রাণ যদি মৃদু এবং হালকা হয় তবে শরীরের অঙ্গ হিসাবে তা বিচার করা হবে। অর্থাৎ এ জাতীয় খোশবু কেউ যদি একটি পূর্ণ অঙ্গে ব্যবহার করে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এর চেয়ে কম হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষান্তরে ঘ্রাণ যদি খুব বেশী হয়, তবে সুগন্ধির বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অঙ্গ ধর্তব্য হবে না। সুতরাং এ জাতীয় খোশবু কোন অঙ্গের এক-চতুর্থাংশে মাখলে দম ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী ও তাবয়ীন)। শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কাপড় এবং বিছানায় সুগন্ধি ব্যবহার করলে সর্বাবস্থায় কম-বেশী হিসাবেই হুকুমের মধ্যে তারতম্য হবে। মানুষ যাকে কম-বেশী মনে করে, তাই কম-বেশী বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি এমন কোন প্রচলন না থাকে, তবে বিষয়টি ব্যবহারকারীর রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হবে (আন্নাহরুল ফায়িক)। সুগন্ধি লাগানোর কারণে দম বা সাদাকা ওয়াজিব হয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা উভয়ই সমান। এমনিভাবে ভুলে, সজ্ঞানে এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে কোন ভাবেই লাগানো হোক, সব অবস্থায়ই উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (বাদাই')।

৩. মাসআলা ঃ সুগন্ধি সর্বাঙ্গে ব্যবহার করলেও একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, অঙ্গ একাধিক হলেও সুগন্ধি তো একই। সুতরাং একটি দম ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিসংগত কথা (তাবয়ীন)। কেউ যদি প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৃথক পৃথক স্থানে বসে সুগন্ধি লাগায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে এক একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রথম অঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে থাকলে দ্বিতীয় অঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর প্রথমটির কাফ্ফারা আদায় না করে থাকলে একটি দমই যথেষ্ট হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ মাথায় হালকা মেহেদী ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি জড়া করা মেহেদী লাগায়, তবে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি সুগন্ধি লাগানোর কারণে আর অপরটি মাথা আবৃত করার কারণে (কাফী)। মাথায় যদি ওয়াসামা দিয়ে খিযাব লাগান হয়, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কানপট্টিতে ব্যথার কারণে প্রতিষেধক হিসাবে মাথায় যদি ওয়াসামা খিযাব লাগান হয়, তবে যেহেতু মাথা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তাই এ অবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এটা সহীহ্ মত (হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ ইহ্রামের অবস্থায় মাথা এবং দাড়ি খিতমী দ্বারা ধৌত করবে না। যদি ধৌত করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে। কোন মুহ্রিম ব্যক্তি যদি সুগন্ধিযুক্ত উশনান দ্বারা গোসল করে, তবে দর্শক একে কি বলে, বিষয়টি এ হিসাবেই মূল্যায়ন করা হবে। দর্শক যদি একে উশনান বলে, তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি সুগন্ধি বলে, তবে দম ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সুগন্ধি স্পর্শ করার পর তা যদি এক অঙ্গ পরিমাণ শরীরে লাগে, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে করুক বা অনিচ্ছায় করুক দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এর চেয়ে কম অঙ্গে লাগে, তবে সাদাকা ওয়াজিব হবে। সুগন্ধি স্পর্শ করার পর তা যদি শরীরে না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি চোখে সুগন্ধিযুক্ত সুরমা একবার বা দুইবার ব্যবহার করে তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। যদি বহুবার লাগায়, তবে দম ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ শরীরের বিভিন্ন স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করলে, এগুলোকে একত্রিত করার পর এক অঙ্গ পরিমাণ হলে দম ওয়াজিব হবে। যদি এক অঙ্গ পরিমাণ না হয়, তবে সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি এক ক্ষত স্থানে সুগন্ধিযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করে, এরপর আরেকটি স্থান ক্ষত হয় এবং তাতেও অনুরূপ ঔষধ ব্যবহার করে প্রথমটি ভাল না হওয়া পর্যন্ত তার উপর কাফ্ফারা একটিই ওয়াজিব হবে (আল-বাহ্রুর রাইক)। সুগন্ধিযুক্ত কোন বস্তু যদি খানার সাথে মিলিয়ে পাকান হয় এবং তা যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে এ খাদ্য থেকে সুঘ্রাণ আসুক বা না আসুক তা আহার করলে মুহ্রিম ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (বাদাই')। আর যদি খাদ্য বস্তুর সাথে পাকানো ছাড়া কোন খোশবু জাতীয় বস্তু মিশানো হয় এবং খাদ্যের তুলনায় সুগন্ধি খুবই কম এবং হালকা হয়, তবে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অবশ্য সুগন্ধি বেশী পরিমাণে বিচ্ছুরিত হলে মাকরূহ্ হবে। খাদ্যের তুলনায় সুগন্ধি বেশী হলে এবং এ জাতীয় খাদ্য আহার করলে জাযা[১] ওয়াজিব হবে।

৭. মাসআলা ঃ পানীয় বস্তুর সাথে সুগন্ধি মিশানো হলে এবং সুগন্ধি বেশী হলে, এ পানি যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি পান করে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সুগন্ধি বেশী না হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কয়েকবার পান করলে দম ওয়াজিব হবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)ঐ খাদ্যের সাথে না মিশিয়ে শুধু সুগন্ধি কেউ যদি খায় বা পান করে এবং পরিমাণে তা যদি বেশী হয়, তা হলে দম ওয়াজিব হবে (বাদাই')। সুগন্ধি ছড়ানো কোন ঘরে যদি মুহ্রিম ব্যক্তি প্রবেশ করে এবং সুগন্ধি তার কাপড়ে লেগে যায়, এমতাবস্থায়ও তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, এ খোশবু দ্বারা সে স্বয়ং উপকৃত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেনি। (কাপড়ে এসে লেগে গেছে, যা তার ইচ্ছার বাইরে ছিল। কিন্তু কাপড়ের চারদিকে সুগন্ধি ধুনি দেয়ার পর কাপড় থেকে যদি সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, তবে সুগন্ধি বেশী হলে দম ওয়াজিব হবে। যদি কম হয়, তা হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে স্বেচ্ছায় এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছে। যদি সুগন্ধি কাপড়ে না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি শরীরে তৈল মালিশ করে এবং তা যদি সুগন্ধিযুক্ত হয়, যেমন বনশ্নার তৈল এবং অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত তৈল, তাহলে পূর্ণ এক অঙ্গে তা মালিশ করে থাকলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তৈল যদি সুগন্ধিযুক্ত না হয়, যেমন যায়তুন এবং তিলের তৈল--এ জাতীয় তৈল ব্যবহার করলেও ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে (বাদাই')। শরীরে এবং কাপড়ে সুগন্ধি লাগালে যেহেতু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, তাই তা দূর করাও ওয়াজিব। যদি কাফ্ফারা আদায় করার পর তা সাফ করা না হয়, তবে দ্বিতীয় বার দম ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। তবে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য হল, সুগন্ধি যদি শরীর বা কাপড়ে বাকী থাকে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

৯. মাসআলা ঃ ফুল, সুগন্ধি এবং খোশবুদার ফলের ঘ্রাণ নেওয়াতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এরূপ করা মাকরূহ্ (গায়াতুস্ সুরুজী ফী শরহিল হিদায়া)। কেউ যদি মিশ্ক, আম্বর বা

১. অর্থাৎ, কাফ্ফারা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কর্পূর কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রাখে, তবে ফিদ্‌য়া দিতে হবে। "উধ" রাখলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। ঘ্রাণ আসলেও ওয়াজিব হবে না। আতরের দোকান অথবা যে স্থানে সুগন্ধির ধোঁয়া দেয়া হচ্ছে এমন স্থানে বসাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য সুগন্ধি হাসিলের জন্য বসা মাকরূহ। জাফরান মিশ্রিত হালুয়া খাওয়াতে কোন দোষ নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ইহ্‌রামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধি যদি ইহ্‌রামের পর শরীরের অন্য কোন অংশে ছড়িয়ে যায়, তবে ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে এতে কিছুই ওয়াজিব হবে না (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পোশাকের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি সেলাই করা কোন কাপড় সাধারণ নিয়ম অনুসারে রাত্র পর্যন্ত পূর্ণ এক দিন পরিধান করে থাকে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এর চেয়ে কম সময় ব্যবহার করলে সদকা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। ভুলে, সজ্ঞানে, জেনে-নাজেনে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যে কোন ভাবেই ব্যবহার করুক না কেন, সব অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। কাবা যদি কাঁধের উপর ফেলে রাখে এবং এর আস্তিনে হাত না ঢুকায়, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে তায়ালাসান[১] যদি বুতাম লাগানো ব্যতিরেকে ব্যবহার করা হয়, তাতেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কাবা এবং তায়ালাসান চাদর একদিন পর্যন্ত বুতাম লাগিয়ে ব্যবহার করে, তবে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু চাদর বা লুঙ্গি যদি রশি দ্বারা বেঁধে একদিন পর্যন্ত ব্যবহার করে, তবে তা মাকরূহ্ হবে। এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম যদি সেলাই করা কাপড় একাধারে কয়েক দিন পরিধান করে, রাত্রে এবং দিনে কখনো তা না খুলে, তবে ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত মতে এ অবস্থায় একটি দমই যথেষ্ট হবে। দম আদায় করার পর যদি ঐ পোশাক পুনরায় পূর্ণ এক দিন ব্যবহার করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে আরেকটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, কাপড় না খুলে এক নাগাড়ে তা ব্যবহার করা দ্বিতীয় বার পরিধান করার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই বলা হয় যে, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা অবস্থায় কেউ যদি ইহ্‌রাম বাঁধে এবং এ অবস্থায় পূর্ণ একদিন অতিবাহিত হয়, তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি উক্ত কাপড় খুলে ফেলার পর তা ব্যবহার না করার সংকল্প করে এবং পরে আবার তা পরিধান করে, তাহলে প্রথম কাফ্‌ফারা আদায় করে থাকলে ইমামগণের মতে পুনরায় কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি প্রথম কাফ্‌ফারা আদায় না করে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দুই কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।যদি উক্ত কাপড় ব্যবহার করে এবং রাত্রে খুলে রাখে কিন্তু ব্যবহার না করার নিয়্যাতে নয়, তবে এ অবস্থায়ও একটি দম ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারেও ইজমা সংঘটিত হয়েছে (শরহুত্ তাহাবী)। কেউ যদি দিনের কিছু সময় জামা, কখনো পায়জামা কখনো টুপি আবার কখনো মোযা ব্যবহার করে, তবে এ অবস্থায়ও কাফ্‌ফারা একটিই ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

১. এক ধরনের বড় চাদর, যা ব্যবহার করতে বোতাম লাগানো হয়।

৩. মাসআলা ঃ কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি পূর্ণ একদিন মাথা অথবা চেহারা ঢেকে রাখে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যদি এর চেয়ে কম সময় এরূপ করে, তবে সাদাকা ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। পূর্ণ এক রাত্র এভাবে ঢেকে রাখলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। ইচ্ছায়, ভুলে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় এরূপ করলেও এ হুকুম হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মাথার চার ভাগের এক ভাগ বা ততোধিক অঙ্গ পূর্ণ একদিন আবৃত করে রাখলেও দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম আবৃত করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। এটাই প্রসিদ্ধ মত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ মাথা আবৃত করলে দম ওয়াজিব হবে। তা না করলে দম ওয়াজিব হবে না। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি সহীহ্ (মুহীত)। বিনা উযরে মাথা অথবা চেহারায় পট্টি বাঁধা মাকরূহ্। পূর্ণ একদিন এভাবে রাখলে সাদাকা ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। যদি শরীরের অন্য কোন স্থানে পট্টি বাঁধে এবং পরিমাণে তা বেশীও হয়, তবু কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বিনা ওযরে এরূপ করা মাকরূহ্ (ফাতহুল কাদীর)। যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তি মাথায় এমন কোন বস্তু উঠায়, যা দ্বারা সচরাচর মাথা আবৃত করা হয় না, যেমন তশতরী, বরতন, গম মাপার পাল্লা ইত্যাদি, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি এমন বস্তু উঠায় যাদ্বারা মাথা আবৃত করা যায়, যেমন কাপড় ইত্যাদি, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি অপর কোন মুহ্‌রিম অথবা ইহ্‌রাম ছাড়া ব্যক্তিকে সেলাই করা কাপড় পরিধান করায় অথবা খোশবু লাগিয়ে দেয়, তবে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়্যা)। অনন্যোপায়ে মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি এ ধরনের একটি কাপড় পরিধান করার জন্য বাধ্য থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি দু'টি কাপড় পরিধান করে, তবে দেখতে হবে যে, সে যদি এ কাপড় দুটো প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহার করে তাহলে একটি কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। এ কাফ্‌ফারাকে যরুরতের কাফ্‌ফারা বলা হয়। যেমন একজনের একটি জামার যরুরত ছিল কিন্তু সে দু'টি জামা অথবা একটি জামা এবং একটি জুব্বা পরিধান করল অথবা কারো একটি টুপি, ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে একটি টুপি এবং একটি পাগড়ী পরিধান করল, এমতাবস্থায় একটি কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হবে। আর কাপড় দু'টি যদি দুই জায়গায় ব্যবহার করে অর্থাৎ একটি প্রয়োজনীয় স্থানে আর অপরটি অপ্রয়োজনীয় স্থানে যেমন এক জনের একটি পাগড়ী বা একটি টুপি ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় সে যদি এর সাথে জামা বা অন্য কিছু পরিধান করে, তবে তার উপর দু'টি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। একটি হল, বাধ্য হয়ে ব্যবহার করার কাফ্‌ফারা। আর অপরটি হল, ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করার কাফ্‌ফারা। আবশ্যকতার প্রেক্ষিতে কাপড় পরিধান করার পর তা যদি আর না থাকে, এমতাবস্থায় ঐ কাপড় যদি আরো এক বা দু' দিন একাধরে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আবশ্যকতা শেষ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বাকী থাকে। একটি কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হবে। যদি ঐ আবশ্যকতা নিঃশেষ হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, তবে দুই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। একটি আবশ্যকতার কাফ্‌ফারা আর অপরটি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করার কাফ্‌ফারা (বাদাই')।

৫. মাসআলা ঃ এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল এই যে, যরুরতের স্থানে অধিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাপড় ব্যবহার করা নতুন অপরাধ হিসাবে ধর্তব্য হয় না। বরং সবগুলোকেই যরুরতের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর যরুরতের স্থানের বাইরে অধিক কাপড় ব্যবহার করা হলে তা নতুন অপরাধ হিসাবে ধর্তব্য হয় (মুহীত ও যখীরা)। অসুস্থ হওয়ার কারণে অথবা জ্বরের কারণে মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে যদি কখনো সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করতে হয়, আবার কখনো তা হয় না, এমতাবস্থায় এ ওযর শেষ না হওয়া পর্যন্ত একই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যদি এই জ্বর খতম হয়ে দ্বিতীয় বার আবার জ্বর আসে অথবা এক রোগ শেষ হয়ে আরেক রোগ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর দু'টি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। মুহরিম ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হওয়ায় তার পোশাক পরিধান করার যরুরত দেখা দিল, তাই সে পোশাক পরিধান করল, পরে শত্রু চলে গেলে সেও পোশাক খুলে ফেলল, পুনরায় শত্রু আসল অথবা শত্রু তার স্থান ত্যাগ করেনি, বরং দিনে যুদ্ধ করত-আর রাত্রে বিশ্রাম করত, এমতাবস্থায় শত্রু স্থায়ী ভাবে প্রস্থান না করা পর্যন্ত মুহ্‌রিমের কাফ্‌ফারা একটিই ওয়াজিব হবে। মোদ্দা কথা হল, এখানে বারবার কাপড় পরিধান করার বিষয়টি বিচার্য ব্যাপার নয়, বরং কারণ যেহেতু একটিই; তাই এখানে এটিই ধর্তব্য বিষয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুণ্ডন ও নখ কাটার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডন করলে দম ওয়াজিব হবে। এ ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া জাইয হবে না (শরহুত্ তাহাবী)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে হরম এবং হরমের বাইরের এলাকা উভয়ই সমান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে হরমের বাইরে মাথা মুণ্ডালে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ মাথা মুণ্ডন করলে দম ওয়াজিব হবে। আর এক-চতুর্থাংশের কম মুণ্ডন করলে সাদাকা ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। কেউ যদি এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক দাড়ি কামায়, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম কামালে সাদাকা ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। সমস্ত গর্দান মুণ্ডালে দম ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। যদি নাভির নীচের চুল মুণ্ডানো হয় বা বগলের পশম মুণ্ডানো কিংবা উপড়িয়ে ফেলা হয় অথবা দুই বগলের কোন একটির ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। কোন এক বগলের অধিকাংশ পশম কামিয়ে ফেললে সাদাকা ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। শিঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যে ঐ জায়গার পশম কামিয়ে ফেললে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি গোঁফ কাটে, তবে দেখতে হবে যে, কর্তিত গোঁফ তার দাড়ির এক-চতুর্থাংশের তুলনায় কতটুকু, সে হিসাবেই তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কর্তিতগোঁফ যদি দাড়ির এক-চতুর্থাংশের চার ভাগের এক ভাগ হয়, তবে এক বকরীর যে মূল্য হবে, সে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ তার উপর ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। যদি পূর্ণ এক অঙ্গের পশম মুণ্ডন করে, তবে দম ওয়াজিব হবে। যদি কিছু মুণ্ডায়, তবে সাদাকা ওয়াজিব হবে। অঙ্গ বলে রান, পায়ের নলা এবং বগলকে বুঝানো হয়েছে। মাথা এবং দাড়ি নয় (মুহীত)। মাথা, নাক অথবা দাড়ির কোন

চুল উৎপাটন করলে প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে এক মুষ্টি খাদ্য দিতে হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। টাক মাথা ব্যক্তি--যার চুল মাথার এক-চতুর্থাংশের চেয়েও কম, সে যদি তার চুল মুণ্ডায়, তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। চুল যদি চতুর্থাংশের সমান হয়, তবে দম দিতে হবে (গায়াতুস সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। কোন মুহরিম ব্যক্তি রুটি পাকাচ্ছে এমতাবস্থায় আগুন লেগে তার কিছু পশম পুড়ে যায়, তাহলে সাদাকা দিতে হবে। দাড়ি বা চুল চুলকানোর পর যদি মুহ্‌রিমের পশম পড়ে যায়, তবে সাদাকা ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি মাথা, দাড়ি, বগল এবং সমস্ত শরীরের চুল এক স্থানে বসে কামিয়ে ফেলে তবে দম একটিই ওয়াজিব হবে। যদি এগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুণ্ডানো হয়, তবে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানিফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত।

৩. মাসআলা ঃ মাথা মুণ্ডানোর পর দম আদায় করে ঐখানে বসা থাকা অবস্থায়ই কেউ যদি আবার দাড়ি কামায়, তবে এর জন্য তাকে পুনরায় দম দিতে হবে। কেউ যদি মাথার এক-চতুর্থাংশ এক মজলিসে কামায় এবং আরেক মজলিসে অপর চতুর্থাংশ কামায়, এভাবে চার মজলিসে পূর্ণ মাথা কামিয়ে নেয়, তবে প্রথম কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত দম একটিই ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ সকলেই একমত (ফাতহুল কাদীর)। কোন মুহরিম ব্যক্তি যদি অন্য কোন মুহ্‌রিম অথবা ইহ্‌রাম ছাড়া ব্যক্তির মাথা মুণ্ডায় এবং এ কাজ সে তাদের অনুমতিতে করুক অথবা অনুমতি ছাড়া করুক উভয় অবস্থাতেই মুণ্ডনকারী মুহ্‌রিমের উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে যার মাথা মুণ্ডন করা হয়েছে, সে এতে সন্তুষ্ট থাকুক বা চাপের মুখে করুক, উভয় অবস্থাতেই একই হুকুম হবে (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। কোন হালাল ব্যক্তি যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তির মাথা কামায়, তবে এ কাজ মুহ্‌রিমের অনুমতিতে হোক অথবা অনুমতি ছাড়া হোক উভয় অবস্থাতেই কাফ্‌ফারা মুহ্‌রিমের উপরই ওয়াজিব হবে। এ কাফ্‌ফারার বিষয়ে মুহ্‌রিম মুণ্ডনকারী থেকে কোন সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অবশ্য ইহ্‌রামহীন এ মুণ্ডনকারীর উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি ইহ্‌রাম ছাড়া কোন ব্যক্তির গোঁফ অথবা নখ কেটে দেয়, তবে কিছু খাদ্য বিতরণ করে দিবে (হিদায়া)।

৪. মাসআলা ঃ মাথা মুণ্ডাতে কেউ যদি বিলম্ব করে এবং এমনিভাবে কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার উপরও দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কারিন এবং মুতামাত্তি' যদি দমে শোকর আদায় করতে বিলম্ব করে এবং এতে কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তাদেরকেও আরেকটি দম আদায় করতে হবে (মুহীত)। কারিন যদি দমে শোকর যবাহ্ করার আগে মাথা মুণ্ডায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। যবাহ্-এর আগে মাথা মুণ্ডানোর কারণে একটি এবং অপরটি হল দমে কিরান (তাবয়ীন)। মুহ্‌রিমের জন্য নখ কাটা জাইয নেই। অতএব, কোন মুহ্‌রিম যদি বিনা প্রয়োজনে এক হাত এবং এক পায়ের নখ কাটে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি এক মজলিসে বসে উভয় পা এবং হাতের নখসমূহ কাটে, তবে একটি দমই যথেষ্ট হবে। যদি হাত অথবা এক পায়ের তিন নখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাটে, তবে সাদাকা দিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নখের পরিবর্তে অর্ধ সা' তথা এক সের সাড়ে বার ছটাক গম সাদাকা করবে। যদি মোট সাদাকার মূল্য এক দম (কুরবানী)-এর সমান হয়, তবে কিছু কমিয়ে দিবে। এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলের সব ক'টি নখ কাটার পর কাফ্ফারা আদায় না করে থাকলে একই মজলিসে বসা অবস্থায় অপর হাতের সব ক'টি নখ কেটে নিলে একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি দুই মজলিসে কাটে, তবে দু'টি দম ওয়াজিব হবে।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলের সব ক'টি নখ এক মজলিসে কাটে এবং এরপর মাথার এক-চতুর্থাংশের চুল কামায় ও শরীরের কোন এক অঙ্গে সুগন্ধি লাগায়, তবে শেষোক্ত কাজগুলো একই মজলিসে করুক বা বিভিন্ন মজলিসে করুক, তার উপর প্রত্যেকটি কাজের পরিবর্তে এক একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি দুই হাত এবং দুই পায়ের অঙ্গুলিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পাঁচটির নখ কাটা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রতিটি নখের পরিবর্তে অর্ধ সা' সাদাকা করতে হবে। অনুরূপভাবে চারটি কাটলেও সাদাকা ওয়াজিব হবে। দুই হাত এবং দুই পায়ের ষোল আঙ্গুলের নখ কাটা হলে প্রত্যেক আঙ্গুলের পরিবর্তে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম সাদাকা করতে হবে। তবে যদি মোট সাদাকার মূল্য দমের সমান হয়ে যায়, তাহলে কিছু কমিয়ে দিবে (শরহুত্ তাহাবী)। মুহ্‌রিমের নখ ভেঙ্গে লটকে থাকলে তা উঠিয়ে ফেলাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (কাফী)। পশম উৎপাটন করা, কাটার অথবা ক্ষুর দ্বারা পরিষ্কার করা এবং দাঁত দিয়ে উপড়িয়ে ফেলা সবই মুণ্ডনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি যে কাজ স্বেচ্ছায় করলে তার উপর দম ওয়াজিব হয়, যেমন সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, মাথা মুণ্ডানো, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নখ কাটা ইত্যাদি, এরূপ কোন কাজ যদি ওযরবশত বা প্রয়োজনের বশীভূত হয়ে করে, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারার বিভিন্ন ধরন রয়েছে-যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে (শরহুত্ তাহাবী)। কাফ্ফারা হচ্ছে কুরবানী করা, সাদাকা করা অথবা রোযা রাখা। যদি কুরবানী করে, তবে হরমের এলাকার মধ্যে করতে হবে (মুহীত)। যদি হরমের এলাকার বাইরে যবাহ্ করে, তাহলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কিন্তু এ অবস্থায়ও যদি সমস্ত গোশত ছয়জন মিসকীনের মধ্যে এভাবে বন্টন করে দেয়া হয় যে, প্রত্যেক মিসকীন অর্ধ সা' মূল্যের গোশ্ত পায়, তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে (শরহুত্ তাহাবী)। রোযা রাখলে তিন দিন রোযা রাখবে। যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারবে (মুহীত)। একাধারেও রাখতে পারবে এবং পৃথক পৃথকভাবেও রাখতে পারবে (শরহুত্ তাহাবী)। সাদাকা দিলে তিন সা' তথা সাড়ে দশ সের গম ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা' করে অর্থাৎ এক সের সাড়ে বার ছটাক করে বন্টন করে দিবে। মক্কার মিসকীনদেরকে সাদাকা করা উত্তম। মক্কা ছাড়া বাইরের মিসকীনদেরকে দেওয়াও জাইয আছে (মুহীত)। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অন্যকে এ সাদাকার মালিক বানিয়ে দেয়া অথবা অন্যের জন্য মুবাহ্ করে

দেওয়া উভয়ই জাইয। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মালিক করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু এতে জাইয নেই (বাদাঅা', যহীরিয়্যা ও শরহুত্ তাহাবী)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী-সহবাসের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যোনিদ্বারে সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করার দ্বারা হজ্জ ও উমরা ফাসিদ হয় না। এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। অনুরূপভাবে কেউ যদি কামোদ্দীপনাসহ কোন মহিলার সাথে আলিঙ্গন করে অথবা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌনাচার করে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। বীর্যপাত হলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু এতে হজ্জ ও উমরা ফাসিদ হবে না (শরহুত্ তাহাবী)। কোন মহিলার যোনিদ্বারের প্রতি তাকানোর ফলে বীর্যপাত ঘটলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না, যেমন দুশ্চিন্তা করার ফলে মনী নির্গত হলে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না (হিদায়া)। অনুরূপভাবে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলে অথবা বারবার তাকালেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (গায়াতুস সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। স্বপ্নদোষ হলে গোসল ব্যতীত আর কিছু ওয়াজিব হবে না। হস্তমৈথুন করার ফলে বীর্যপাত ঘটলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দম ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি আরাফায় উকূফ করার পূর্বে স্ত্রী-সঙ্গম করে এবং উভয়ই ইহরামের অবস্থায় থাকে, তবে উভয়ের জননেন্দ্রিয় পরস্পর মিলিত হলে এবং লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনিদ্বারে প্রবেশ করলে উভয়ের হজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে। অবশ্য ঐ ফাসিদ হজ্জ তাদের শেষ পর্যন্ত করে যেতে হবে। পরে পৃথক পৃথকভাবে দম আদায় করা উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে বকরীও যথেষ্ট হবে। পরবর্তী বছর এ হজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু উমরার কাযা আদায় করতে হবে না (শরহুত্ তাহাবী)। এ ক্ষেত্রে ভুলে, স্বেচ্ছায়, জোর-পূর্বকভাবে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় সহবাসকরা সবই সমান। বালক এবং পাগলের সহবাসও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (শরহুত্ তাহাবী)।

২. মাসআলা ঃ যে বয়সের বালক সহবাস করতে সক্ষম স্বামী এমন বয়সে পদার্পণ করলে স্ত্রীর হজ্জ ফাসিদ হবে। স্বামীর হজ্জ ফাসিদ হবে না। অবশ্য স্ত্রী যদি কম বয়স্কা বালিকা হয় বা পাগলিনী হয়, তবে হুকুম উল্টো হবে (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি আরাফায় উকূফ করার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করে, এরপর পুনরায় স্ত্রী-সহবাস করে, তবে যদি উভয় সম্ভোগ একই মজলিসে করে, তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি দুই মজলিসে করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রত্যেকের উপর দুইটি করে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি ইহ্-রাম ভঙ্গ করে পর-পর স্ত্রী-সহবাস করে, তবে এক মজলিসে করুক বা একাধিক মজলিসে করুক, একটি কুরবানীই ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। আরাফায় উকূফ করার পর স্ত্রী-সহবাস করলে ভুলে করুক বা ইচ্ছাকৃতভাবে করুক হজ্জ ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ অবস্থায় প্রত্যেকের উপর একটি উট বা গরু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি বারবার সহবাস করে, তবে মজলিসে এক হলে একটি বাদানা (উট বা গরু) ব্যতীত অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি দুই মজলিস হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রথম বারের পরিবর্তে একটি উষ্ট্রী এবং দ্বিতীয় বারের পরিবর্তে একটি বকরী ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। যদি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে দ্বিতীয় বার স্ত্রী-সহবাস করে, তবে দ্বিতীয় বারের স্ত্রী-সম্ভোগের কারণে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ মাথা মুণ্ডানোর পর স্ত্রী-সহবাসের কারণে বকরী ওয়াজিব হবে (কাফী)। পুরোপুরি তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর অথবা এর অধিকাংশ চক্কর প্রদক্ষিণ করার পর সহবাস করলে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। তাওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর আদায় করার পর স্ত্রী-সহবাস করলে একটি বাদানা (জানোয়ার) ওয়াজিব হবে। তবে হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে (শরহুত্ তাহাবী)। মাথা না মুণ্ডিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর মাথা মুণ্ডানোর আগে স্ত্রী-সহবাস করলে একটি বকরী ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। উমরা আদায়ের অবস্থায় তাওয়াফের চার চক্কর প্রদক্ষিণ করার পূর্বে সহবাস করলে উমরা ফাসিদ হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তা শেষ পর্যন্ত করে যেতে হবে এবং পরে কাযা করতে হবে। আর উক্ত ব্যক্তির উপর একটি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি চার চক্কর বা ততোধিক বার প্রদক্ষিণ করার পর স্ত্রী-সহবাস করে, তবে উমরা ফাসিদ হবে না। কিন্তু একটি বকরী ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। যদি উমরাকারী ব্যক্তি দুই মজলিসের মধ্যখানে কয়েক বার সহবাস করে, তবে দ্বিতীয় মজলিসের পরিবর্তে একটি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সাঈ করার পর স্ত্রী-সহবাস করলেও অনুরূপভাবে বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে (ঈযাহ্)। মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি পরে করে, তবে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (শরহুত্ তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ কারিন যদি উমরার তাওয়াফ করার আগে স্ত্রী-সহবাস করে, তবে তার উমরা এবং হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তী বছর উভয়ের কাযা আদায় করতে হবে। আর এ বছর এ ফাসিদ হজ্জ এবং উমরা শেষ পর্যন্ত করে যেতে হবে। অবশ্য তাকে আর দমে শোকর আদায় করতে হবে না (মুহীত)। কিন্তু দু'টি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। উমরার তাওয়াফ আদায় করার পর আরাফায় উকূফ করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে। উমরা ফাসিদ হবে না। দু'টি দম কুরবানী করতে হবে এবং আগামী বছর হজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু দমে শোকর আদায় করতে হবে না। উমরার চার চক্কর প্রদক্ষিণ করার পর স্ত্রী- সহবাস করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আরাফায় অবস্থান করার পর স্ত্রী-সহবাস করলে উমরা এবং হজ্জ কিছুই ফাসিদ হবে না। অবশ্য হজ্জের পরিবর্তে একটি উট এবং উমরার পরিবর্তে একটি বকরী কুরবানী ওয়াজিব হবে। কিরানের জন্যও কুরবানী করতে হবে (মুহীত)। তাওয়াফে যিয়ারতের পর অথবা তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর প্রদক্ষিণ করার পর স্ত্রী-সহবাস করলে কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু চুল ছাঁটা বা মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে দু'টি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। কেননা, তার উভয় ইহ্‌রামই বাকী রয়ে গেছে। যদি এরূপ ব্যক্তি পুনরায় স্ত্রী-সহবাস করে এবং একই মজলিসে করে, তবে পূর্বে যা বলা হয়েছে তাই ওয়াজিব হবে। আর যদি এ কাজ ভিন্ন মজলিসে হয়ে থাকে, তবে আরো দু'টি কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ মুতামাত্তি' যদি কুরবানীর পশু সাথে না এনে থাকে, তবে তার হুকুম ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী এবং শুধু উমরা আদায়কারীর ন্যায় হবে। আর তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী যদি কুরবানীর পশু সাথে এনে থাকে, তবে তার এবং কারিনের হুকুম কোন কোন ক্ষেত্রে একই। আর তা হল এই যে, মুতামাত্তি' যদি উমরার তাওয়াফ আদায় করার আগে অথবা আরাফায় উকূফ করার আগে স্ত্রী-সহবাস করে, তবে দমে তামাত্তু' তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য যদি আরাফায় উকূফ করার পর স্ত্রী- সহবাস করে, তবে দু'টি দম তার উপর ওয়াজিব হবে (মুহীত)। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সমান। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রীকে শয়ন অবস্থায় অথবা জোরপূর্বক ভাবে সহবাস করে অথবা কোন বালক বা পাগল যদি তার সাথে সহবাস করে, তবু উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ, সাঈ, রমল এবং রমীর বিবরণ

১. মাসআলা ঃ উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। আর যদি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করে, তবে বাদানা (উট) ওয়াজিব হবে। তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর এভাবে জুনুবী বা উযূহীন অবস্থায় করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এরূপ করলে উত্তম হল, মক্কায় থাকা অবস্থায় পুনরায় তাওয়াফ আদায় করে নেওয়া। তবে কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। বিশুদ্ধতম মতে উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফ করলে তা পুনরায় করা মুস্তাহাব এবং জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। উযূহীন অবস্থায় করার পর তা পুনরায় আদায় করলে দম ওয়াজিব হবে না। যদিও তা কুরবানীর দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুনঃ আদায় করে। জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করার পর যদি তা কুরবানীর দিনসমূহের মধ্যে পুনরায় আদায় করে তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর পুনঃ আদায় করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিলম্বে আদায় করার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে (কাফী)। কিন্তু বাদানা উট ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করার পর নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে এসে গেলে পুনরায় ফিরে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। পুনরায় ফিরে গেলে নতুন ইহ্‌রাম বেঁধে ফিরে যেতে হবে। যদি না গিয়ে বাদানা পাঠিয়ে দেয়, তবু জাইয হবে। কিন্তু ফিরে যাওয়া উত্তম। যদি উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফ করে নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে ফিরে আসে, তারপর পুনরায় গিয়ে তাওয়াফ করে, তবু জাইয হবে। কিন্তু না গিয়ে বকরী পাঠিয়ে দেওয়া উত্তম (তাবয়ীন)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের তিন বা এর চেয়ে কম চক্কর প্রদক্ষিণ করা ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় সে যদি নিজ পরিবারবর্গের নিকট চলে আসে এবং পুনরায় না গিয়ে বকরী পাঠিয়ে দেয়, তবু জাইয আছে (হিদায়া)। উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারতের কম সংখ্যক বার প্রদক্ষিণ করে কেউ যদি নিজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসে, তাহলে অবশিষ্ট প্রতিটি চক্করের পরিবর্তে এক সের সাড়ে বার ছটাক পরিমাণ গম সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি মোট সাদাকার মূল্য কুরবানীর মূল্যের সমান হয়ে যায়, তাহলে এর থেকে কিছু কমাবে। যদি তাওয়াফের কম সংখ্যক বার জুনুবী অবস্থায় আদায় করে বাড়ীতে চলে আসে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। তবে বকরী দিলেও যথেষ্ট হবে। যদি তখনো পর্যন্ত মক্কায় থাকে এবং পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ পুনরায় আদায় করে নেয়, তবে যে কুরবানী ওয়াজিব হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ তাওয়াফ যদি কুরবানীর দিনসমূহে পুনরায় আদায় করে, তাহলে কুরবানী বাতিল হবে। আর যদি এরপর আদায় করে, তবে এক এক চক্করের পরিবর্তে এক সের সাড়ে বার ছটাক করে গম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)।

৩. মাসআলা ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের অবস্থায় যদি কাপড়ে এক দিরহামের চেয়ে অধিক পরিমাণ নাপাকী লেগে থাকে, তাহলেও তাওয়াফ জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। তবে কোন কিছু তার উপর ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। কেউ যদি তাওয়াফে বিদা উযূহীন অবস্থায় আদায় করে, তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। যদি তাওয়াফে সদরের কম সংখ্যক চক্কর এ অবস্থায় আদায় করে, তবে সর্বমতে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। অবশ্য পুনরায় এ তাওয়াফ উযূর অবস্থায় আদায় করলে এ সদকা বাতিল হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফে সদর জানাবাতের অবস্থায় করে থাকে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যদি নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে চলে আসে, তবে বকরী দিলেও যথেষ্ট হবে। যদি মক্কায় থাকে এবং ঐ তাওয়াফ পুনরায় আদায় করে, তবে কুরবানীর আর দরকার হবে না। আর বিলম্বের কারণেও তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি অর্ধেকের কম জানাবাতের অবস্থায় আদায় করে নিজ পরিবারবর্গের নিকট চলে আসে, তবে অবশিষ্ট এক এক চক্করের পরিবর্তে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম সাদাকা করতে হবে। যদি তখন মক্কায় থাকে এবং পুনরায় তাওয়াফ আদায় করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সাদাকা বাতিল হয়ে যাবে (শরহুত্ তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ তাওয়াফে বিদা অথবা এর অধিকাংশ চক্কর কেউ যদি বর্জন করে, তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে। কিন্তু তিন চক্কর বর্জন করলে তিনজন মিসকীনকে আহার করাতে হবে। এক একজনকে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম প্রদান করবে (কাফী)। জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়। এরূপ কেউ যদি পবিত্র অবস্থায় আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন তাওয়াফে বিদা আদায় করে, তবে এ তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। তার তাওয়াফে যিয়ারত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বিদায় তাওয়াফ রয়ে যাবে। এ কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে কারো মতভেদ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্বে আদায় করার কারণে আরেকটি দম তার উপর ওয়াজিব হবে (মুহীত)। কেউ যদি উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে এবং আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যায়ে উযূর সাথে তাওয়াফে বিদা আদায় করে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত এবং জানাবাতের অবস্থায় বিদায় তাওয়াফ আদায় করলে ইমামগণের মতে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি তাওয়াফে যিয়ারতের আর দ্বিতীয়টি বিদায় তাওয়াফের জন্য। যদি কোন ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারত এবং তাওয়াফে বিদা ছেড়ে দেয়, তবে স্ত্রী-সহবাস সর্বদার জন্য[1] তার উপর হারাম থাকবে। তাই তার উপর ওয়াজিব হল, পুনরায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত এবং তাওয়াফে বিদা আদায় করা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্বে আদায় করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু বিদায় তাওয়াফ বিলম্বে আদায় করার কারণে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, এর জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই।

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ শুধু তাওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দেয় এবং তাওয়াফে বিদা ঠিকমত আদায় করে, তবে বিদায় তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। অবশ্য তাওয়াফে বিদা ছেড়ে দেওয়ায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেউ যদি তাওয়াফে যিয়ারত অর্ধেকের বেশী ছেড়ে দেয়, যেমন তিন চক্কর প্রদক্ষিণ করল এবং বিদায় তাওয়াফ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে, তবে বিদায় তাওয়াফের চার চক্কর তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্বে আদায় করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে এবং অপরাপর সমস্ত ইমামের মতে বিদায় তাওয়াফের চার চক্কর ছেড়ে দেয়ার কারণেও তার উপর আরেকটি দম ওয়াজিব হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর ছেড়ে দিলে বিলম্বের কারণে এক সদকা এবং তিন চক্কর ছাড়ার কারণে আরেক সাদাকা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ তাওয়াফে যিয়ারত এবং বিদায় তাওয়াফ অর্থাৎ উভয় তাওয়াফের চার চক্কর করে ছেড়ে দেয়, তবে যে কটি চক্কর আদায় করা হয়েছে, তা তাওয়াফে যিয়ারতের অংশ বল গণ্য হবে। অর্থাৎ এ ছয়টি চক্কর। পরিশেষে তাওয়াফে যিয়ারতের এক চক্কর ছেড়ে দেওয়ায় একটি দম এবং বিদায় তাওয়াফ পূর্ণাঙ্গভাবে ছেড়ে দেওয়ায় আরেকটি দম তার উপর ওয়াজিব হবে।

৬. মাসআলা ঃ যদি উভয় তাওয়াফের চার চক্কর করে আদায় করে থাকে, তবে তাওয়াফে যিয়ারতের যা বাকী আছে তা বিদায় তাওয়াফ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিলম্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার কারণে সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর বিদায় তাওয়াফের অসম্পূর্ণতার কারণে আরেকটি সাদাকাও ওয়াজিব হবে। কেউ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর আদায় করে কিন্তু বিদায় তাওয়াফ মোটেই আদায় না করে, তবে আমাদের মাযহাবে তার হজ্জ হয়ে যাবে। তার উপর দু'টি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। একটি তাওয়াফে যিয়ারতে ত্রুটির কারণে আর অপরটি বিদায় তাওয়াফ ছেড়ে দেয়ার কারণে। এ দু'টি বকরী পরবর্তী বছর পাঠিয়ে দিবে এবং মিনাতে এগুলো যবাহ্ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম আদায় করে, তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি জানাবাতের অবস্থায় আদায় করে, তাহলে একটি বকরী কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। "গায়াতুল বয়ান" কিতাবে উল্লেখ আছে

১. অর্থাৎ হজ্জপরবর্তী বাকী জীবনে, কাজেই মক্কায় ফিরে যেয়ে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় না করা পর্যন্ত সে শরীআতের বিধানে এ বৈধ কাজ করতে পারবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, হাজী যদি উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফ করে এবং এরপর সাঈ ও রমল করে, তবে জাইয আছে। উত্তম হল তাওয়াফে যিয়ারতের পর পুনরায় সাঈ ও রমল করা। যদি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করে এরপর সাঈ ও রমল করে, তবে এ সাঈ ও রমল ধর্তব্য হবে না। বরং তাওয়াফে যিয়ারতের পর পুনরায় সাঈ করা ওয়াজিব হবে এবং এতে রমলও করতে হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। বিনা উযূতে অথবা জানাবাতের অবস্থায় উমরার তাওয়াফ আদায় করলে যতক্ষণ মক্কা মুকাররমায় থাকবে পুনরায় তাওয়াফ করে নিবে। যদি নিজ পরিবারবর্গের নিকট চলে আসে এবং তাওয়াফ পুনরায় আদায় না করে, তবে উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফ করে থাকলে একটি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। আর যদি জানাবাতের অবস্থায় করে থাকে, তবে "ইসতিহসান" অনুসারে একটি বকরী যথেষ্ট হবে (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি উমরার তাওয়াফ ও সাঈ উযূহীন অবস্থায় আদায় করে, তবে যতদিন মক্কায় থাকবে এ সময়ের ভেতর উভয়ই পুনরায় আদায় করে নিবে। পুনঃ আদায় করলে তার উপর আর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি পুনঃ আদায় করার আগেই সে নিজ পরিবারবর্গের নিকট চলে আসে, তবে উযূহীন অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু হজ্জের রুক্ন আদায় করে যেহেতু সে হালাল হয়েছে, এ কারণে পুনরায় ফিরে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না এবং এভাবে সাঈ করাতেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। পুনরায় শুধু তাওয়াফ করলে, সাঈ না করলে সহীহ্ মতে তখনও এ হুকুম হবে (হিদায়া)।

৯. মাসআলা ঃ সতর খোলা অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে মক্কায় থাকা অবস্থায় তা আবার আদায় করবে। পুনঃ আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে (ইখতিয়ারু শরহিল্ মুখতার)। সাফা-মারওয়ার সাঈ তরক করলে দম ওয়াজিব হবে এবং হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে (কুদূরী)। জানাবাত অথবা হায়িয-নিফাস অবস্থায় সাঈ করলে সাঈ সহীহ্ হবে। হালাল হওয়ার পর স্ত্রী-সহবাস করে সাঈ করলেও তা সহীহ্ হবে। অনুরূপভাবে হজ্জের মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সাঈ করলে তাও সহীহ্ হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি ওযরবশত সওয়ারীর উপর আরোহণ করে অথবা অন্য কিছুর উপর উঠে তাওয়াফ এবং সাঈ করে, তবে জাইয আছে। এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি বিনা ওযরে এরূপ করে, তবে মক্কায় থাকা অবস্থায় এগুলো পুনরায় আদায় করে নিবে। আর যদি এ অবস্থায় নিজ পরিবারবর্গের নিকট চলে আসে, তবে আমাদের মাযহাবে কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি আরাফা হতে ইমামের পূর্বে সূর্যাস্তের আগে রওয়ানা করলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সূর্যাস্তের পর রওয়ানা করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এ অবস্থায় যদি সূর্যাস্তের আগে পুনরায় আরাফা ফিরে আসে, তবে সহীহ্ মতে আর দম আদায় করতে হবে না। যদি সূর্যাস্তের পর ফিরে আসে, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে দম বাতিল হবে না। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রওয়ানা করা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওয়ানা করা, যেমন উট চলতে আরম্ভ করে দিল, উভয়ই সমান (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি মুযদালিফায় উকূফ না করে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে (হিদায়া) কেউ যদি জমরাত্রয়ে কংকর না মারে অথবা শুধু একটিতে কংকর

মারে অথবা কুরবানীর প্রথম দিন জমরাতুল আকাবায় কংকর মারে, তবে তার উপর একটি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি অর্ধেকের কম কংকর মারা ছেড়ে দেয়, তবে এক এক কংকরের পরিবর্তে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম সদকা করতে হবে। কিন্তু সাদাকার মোট মূল্য যদি বকরীর মূল্যের সমান হয়ে যায়, তাহলে কিছু কম আদায় করবে (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। হজ্জের কোন আমল যথাস্থান থেকে বিলম্বিত হলে বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যেমন কোন ব্যক্তি হরমের এলাকা হতে বের হয়ে পরে নিজের মাথা মুণ্ডন করল। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ মুণ্ডন হজ্জের জন্য হোক বা উমরার জন্য উভয়ই সমান। কারিন এবং মুতামাত্তি' যদি যবাহর আগে মাথা মুণ্ডন করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। সাহিবায়নের মতে একটি দম ওয়াজিব হবে (আল্ বাহরুর রায়িক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম পরিচ্ছেদ ঃ শিকার করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ শিকার صيد মানে ঐ সমস্ত পশু যা জন্মগতভাবে বন্য। এ ধরনের পশু দুই প্রকার ঃ (১) স্থলজ প্রাণী অর্থাৎ এমন পশু যার জন্ম ডাঙ্গায়। (২) জলজ প্রাণী অর্থাৎ এমন প্রাণী যার জন্ম পানিতে। কেননা, আসল তো হল জন্ম। বসবাস তো এর পরবর্তী বিষয়। সুতরাং জন্মই ধর্তব্য বিষয়, বসবাস নয়। এবং এর কারণে হুকুমের মধ্যেও কোন পরিবর্তন থাকবে না। স্থলজ শিকার মুহ্‌রিমের জন্য হারাম। জলজ শিকার মুহ্‌রিমের জন্য হারাম নয় (তাবয়ীন)। মুহ্‌রিম যদি কোন শিকারী জানোয়ার হত্যা করে, তবে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে (মুতূন)। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় এবং ভুলে শিকার করা সবই সমান। এমনিভাবে প্রথম বার শিকার করুক বা দ্বিতীয়বার করুক এতেও কোন পার্থক্য নেই (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এ ক্ষেত্রে প্রথমবার হজ্জ আদায়কারী এবং পুরাতন আদায়কারী উভয়ই সমান (তাবয়ীন)। কারো মালিকানাধীন জানোয়ার হোক অথবা মালিকানামুক্ত মুবাহ্ জানোয়ার হোক সবই সমান (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ জাযা মানে শিকারী জানোয়ারের মূল্য যা দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ঐ সময় এবং ঐ স্থানে বসে নির্ধারণ করবে যে স্থানে শিকার করা হয়েছে। কেননা, স্থান ও কালের ব্যবধানে মূল্যও বেশ-কম হয়ে থাকে। যদি এমন জঙ্গলে শিকার করা হয়, যেখানে বেচাকেনা হয় না, তবে নিকটের কোন স্থান যেখানে বেচাকেনা হয়, সেখানকার মূল্য ধর্তব্য হবে (তাবয়ীন)। মূল্য নির্ধারণ করানোর পর হত্যাকারীর ইখতিয়ার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে এর মূল্য দ্বারা পশু ক্রয় করে তা যবাহ্ করবে। যদি এই দ্বারা পশু ক্রয় করা সম্ভব হয়। অথবা এর দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে গম হলে প্রত্যেক মিসকীনকে এক সের সাড়ে বার ছটাক করে বন্টন করে দিবে। আর যদি যব বা খেজুর হয়, তবে সাড়ে তিন সের করে এক এক জন মিসকীনকে বন্টন করে দিবে। অথবা রোযা রাখবে (কাফী)। যদি রোযা রাখে, তবে হত্যাকৃত পশুর মূল্য খাদ্যের দ্বারা মূল্যায়ন করবে এবং অর্ধ সা' খাদ্যের পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখবে। অবশেষে অর্ধ সা' এর কম খাদ্য রয়ে গেলে হত্যাকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর পরিবর্তে এক দিন রোযা রাখতে পারবে। ইচ্ছা করলে তা ক্রয় করে সাদাকাও করে দিতে পারবে (ঈযাহ)। এক মিসকীনের কম পরিমাণ খাদ্য ওয়াজিব হলে তা মিসকীনকেও দিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে এর পরিবর্তে এক দিন রোযা রাখতে পারবে (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ যবাহ্ করতে চাইলে হরমের এলাকায় যবাহ্ করতে হবে। পরে এ গোশ্‌ত ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। যদি খাদ্য দিতে চায়, তবে যেখানে ইচ্ছা দিতে পারবে। রোযার বিষয়টিও অনুরূপই (তাবয়ীন)। হাদীর জানোয়ার যদি হরমের এলাকার বাইরে যবাহ্ করা হয়, তবে তা আদায় হবে না। কিন্তু যদি প্রত্যেক ফকীরকে এ পরিমাণ গোশ্‌ত প্রদান করে যার

মূল্য এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের মূল্যের সমান, তবে "খাদ্যের সাদাকা" আদায় হয়ে যাবে। মূল্য যদি এর থেকে কম হয়, তবে তা পূর্ণ করে দিবে। হাদী হরমের এলাকায় যবাহ্ করার পর এর গোশত যদি চুরি হয়ে যায়, তবে এর পরিবর্তে অপর একটি কুরবানী করা ওয়াজিব হবে না। আর যদি হরম এলাকার বাইরে যবাহ্ করা হয়ে থাকে, তাহলে এর পরিবর্তে আরেকটি কুরবানী করতে হবে (মুহীত)। হাদী যবাহ্ করার ইরাদা করে হাদী খরীদ করার পর কিছু মূল্য অবশিষ্ট রয়ে গেলে দেখতে হবে এর দ্বারা আরেকটি হাদী খরীদ করা যায় কিনা? যদি খরীদ না করা যায়, তাহলে এ অবশিষ্টাংশের ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে, এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের পরিবর্তে ইচ্ছা করলে এক দিন করে রোযা রাখবে এবং ইচ্ছা করলে তা সাদাকাও করে দিতে পারবে। সাদাকা করলে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' করে গম প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে এ-ও করা যায় যে, কিছু সাদাকা করে দিল আর বাকী অংশের পরিবর্তে বিধিমত রোযা রাখল। যদি জাযার মূল্য দুই হাদীর মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও হত্যাকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। হয়তো উভয়টি যবাহ্ করবে অথবা এর বিনিময়ে সাদাকা করবে অথবা উভয়টির পরিবর্তে রোযা রাখবে অথবা একটি যবাহ্ করে অপরটির কাফ্‌ফারা আদায় করবে। যে কোন ধরনের কাফ্‌ফারা আদায় করতে পারবে। অথবা একটি যবাহ্ করার পর অপরটির বিনিময়ে কিছু রোযা রাখবে এবং কিছু সাদাকা করে দিবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি হরমের এলাকার বাইরে শিকারী জন্তু হত্যা করলে তার উপর যা ওয়াজিব হবে হরমের এলাকার ভেতরে করলেও তার উপর তাই ওয়াজিব হবে। হরমের এলাকায় হত্যা করার কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (নিহায়া)। মুহ্‌রিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি হরমের এলাকায় কোন শিকারী পশু হত্যা করে, তবে তার ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে, যা মুহ্‌রিমের জন্য প্রযোজ্য। তবে রোযা রাখা জাইয হবে না। কারিন যদি শিকার করে তবে তার উপর দু'টি জাযা ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। যে জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া জাইয নয় এমন ধরনের কোন পশু শিকার করলেও জাযা ওয়াজিব হবে। যেমন হিংস্র প্রাণী ইত্যাদি। অবশ্য তা বকরীর মূল্যের চেয়ে অধিক হতে পারবে না। কোন হিংস্র প্রাণী মুহ্‌রিম ব্যক্তির উপর আক্রমণ করার পর সে যদি তা মেরে ফেলে, তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে শিকারী পশু হামলা করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি কোন শিকারী বাজ মারে, তাহলে অনুরূপ শিকারী বাজের উচিত মূল্য এর মালিককে পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র নিকট তার উপর ওয়াজিব হবে বিনা শিকারী বাজের মূল্য। মালিকানাধীন কোন জন্তু যা পোষ মানানো হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন জন্তু হত্যা করলে মালিককে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর মূল্য দিয়ে দিবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রশিক্ষণ ছাড়া জন্তুর মূল্য ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। অনুরূপভাবে ইহ্‌রাম ছাড়া কোন ব্যক্তি যদি মালিকানাধীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন জন্তু হত্যা করে, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

৫. মাসআলা ঃ যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন শিকারকে যখম করে এবং এতে যদি পশুটি মরে

pdf By Syed Mostofa Sakib

যায়, তাহলে এর মূল্য জরিমানা দিতে হবে। যদি ভাল হয়ে যায় এবং শরীরে কোন রূপ চিহ্ন না থাকে, তবে জরিমানা দিতে হবে না। আর যদি শরীরে ক্ষতের চিহ্ন থাকে, তাহলে ক্ষতি পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। যখমের পর উক্ত পশুটি মরে গেছে না ভাল হয়েছে এ কথা যদি জানা না যায়, তবে (সূক্ষ্মদৃষ্টি) অনুসারে পূর্ণ মূল্য আদায় করতে হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যখম করার পর যদি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এ কথা জানা যায় যে, অন্য কোন কারণে এর মৃত্যু হয়েছে, তবে যখমের দরুন যে জরিমানা ওয়াজিব হয়, তা আদায় করতে হবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। কেউ যদি কোন শিকারকে যখম করে অথবা এর পশম উপড়িয়ে ফেলে অথবা কোন অঙ্গ কেটে ফেলে, তবে যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে এ পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে। কেউ যদি পাখীর ডানা ভেঙ্গে ফেলে অথবা কোন জানোয়ারের পা কেটে ফেলে এবং এতে যদি প্রতিরোধ ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়, তাহলে এর পূর্ণ মূল্য জরিমানা দিতে হবে (হিদায়া)। মুহ্রিম যদি কোন শিকারের ডিম ভেঙ্গে ফেলে এবং ভেতরে যদি পচা হয়, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি ভাল থাকে তাহলে আমাদের মাযহাবে এর মূল্য আদায় করতে হবে (নিহায়া)। অনুরূপভাবে মুহ্রিম যদি কোন শিকারের ডিম ভুনা করে তবু উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত ও মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৬. মাসআলা ঃ মুহ্রিম ব্যক্তি কোন শিকারী পশু যখম করার পর যদি এর কাফ্ফারা আদায় করে এবং এরপর যদি একে হত্যা করে, তাহলে দ্বিতীয় বার এর কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। যদি যখম করার পর কাফ্ফারা আদায় না করে থাকে এবং পরে একে হত্যা করে ফেলে, তাহলে হত্যার কারণে কাফ্ফারা দিতে হবে এবং যখমের কারণে জরিমানা আদায় করতে হবে (মুহীত)। যখম করার কারণে কোন পশু যদি মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে যায়, এরপর একে যদি হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীর উপর আরেকটি জাযা ওয়াজিব হবে কিনা এ বিষয়ে ওয়াজীয গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জাযা আদায় করার আগে যদি এরূপ করে থাকে, তবে দ্বিতীয়বার জাযা ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মুহ্রিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি হরমের এলাকার কোন শিকারী জন্তু যখম করে এবং এরপর যদি পশমের কারণে বা শরীরের কারণে এর মূল্য বেড়ে যায়, পরে এ পশু যদি উক্ত যখমের কারণে মারা যায়, তবে যখমের কারণে এর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এ ক্ষতির জরিমানা এবং মারা যাওয়ার দিন এর যা মূল্য ছিল তা আদায় করতে হবে। যদি যখম করার পর পশমের কারণে এর মূল্য হ্রাস পায়, তবে যখমের দিন এর যা মূল্য ছিল ঐ পরিমাণ মূল্য হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে। জাযা আদায় করার পর যদি হরমের এলাকায় পশমের কারণে অথবা শরীরের কারণে এর মূল্য বেড়ে যায়, অতঃপর উক্ত যখমের কারণে যদি ঐ পশুটি মারা যায়, তাহলে এ অতিরিক্ত মূল্যের জরিমানা আদায় করতে হবে। যেমন কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে এ হুকুম প্রযোজ্য ছিল।

৭. মাসআলা ঃ মুহ্রিম ব্যক্তি হরমের এলাকার বাইরে কোন শিকারী জন্তু যখম করার পর যদি ইহ্রাম থেকে মুক্ত হয়, অতঃপর পশম বা শরীরের কারণে যদি এর মূল্য বেড়ে যায়, তবে যখমের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে এর এবং মারা যাওয়ার দিন এর যা মূল্য ছিল এ দুই ধরনের ক্ষতিপূরণ হত্যাকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। যদি মূল্য বাড়ার আগে সে কাফ্ফারা আদায়

করে থাকে, তবে অতিরিক্ত মূল্যের জরিমানা পরিশোধ করতে হবে না। আর তখনো যদি উক্ত ব্যক্তি ইহ্রামের অবস্থায় থাকে, তাহলে কাফ্ফারা আদায় করার পরও অতিরিক্ত মূল্যের জরিমানা তাকে আদায় করতে হবে। শিকার যদি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সে এর কাফ্ফারা আদায় করে দিয়ে থাকে, এরপর যদি উক্ত জন্তু মারা যায়, তাহলে মারা যাওয়ার দিন এর যা মূল্য ছিল, তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

৮. মাসআলা ঃ মুহ্রিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি হরমের এলাকার কোন শিকারী জন্তু যখম করে কিন্তু একেবারে শেষ না করে থাকে, এমতাবস্থায় অপর কোন হালাল ব্যক্তি এসে একে যদি পুনরায় যখম করে তবে, কোন নিখুঁত প্রাণীকে যখম করলে যা ক্ষতি হয় ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রথম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। আর ক্ষত-বিক্ষত কোন প্রাণীকে পুনরায় যখম করাতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। এরপর এর মূল্য হতে যে পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে, তা সমান সমান ভাগাভাগি করে উভয়ই পরিশোধ করে দিবে। যদি প্রথম ব্যক্তি এর হাত বা পা এমনভাবে কেটে ফেলে যে এর বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি এর অবশিষ্ট হাত বা পা কেটে ফেলে, তাহলে প্রথম ব্যক্তি এর পূর্ণ মূল্য আদায় করবে। জানোয়ারটি তার আঘাতে মরুক বা না মরুক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর কাটার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে দ্বিতীয় ব্যক্তি এর ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। পশুটি যদি মরে যায়, তবে আঘাতের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে এ মূল্যের অর্ধেক দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। যদি উভয় ব্যক্তির আঘাত করার মধ্যবর্তী সময়ে এর মূল্য বেড়ে যায়, তাহলে প্রথম ব্যক্তির আঘাতের কারণে এর যা ক্ষতি হয়েছে এ ক্ষতিপূরণসহ মারা যাওয়ার দিনের বর্ধিত মূল্য তাকে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাতের কারণে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বর্ধিত মূল্য হিসাবে তা তাকে পরিশোধ করতে হবে। সাথে সাথে মারা যাওয়ার দিন উক্ত পশুর যে মূল্য ছিল ঐ মূল্যের অর্ধেক তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি আঘাতকৃত উক্ত পশুটিকে হত্যা করে ফেলে অথবা এর চোখ ফুটা করে দেয়, তবে আঘাতের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে এ মূল্যের পুরাটাই তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে। যদি প্রথম ব্যক্তি কোন পশুকে এমনভাবে আঘাত করে যে, এতে এর মরার কোন আশংকা ছিল না, কিন্তু পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে যদি এর হাত বা পা কেটে দেয় এবং এতে ঐ পশু যদি মারা যায় তাহলে প্রথম ব্যক্তির আঘাতে একটি নিখুঁত সুস্থ জানোয়ারের যা ক্ষতি হয়েছে ঐ ক্ষতিপূরণ এবং আহত পশুর যে মূল্য হয় ঐ মূল্যের অর্ধেক জরিমানা তাকে আদায় করতে হবে। আর প্রথম ব্যক্তির আঘাতের পর এর যে মূল্য হবে এ পরিমাণ মূল্য আদায় করা দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। পশুটি মরুক বা না মরুক এতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। অনুরূপভাবে আঘাতকারী উভয় ব্যক্তিই যদি মুহ্রিম হয়, তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু জরিমানা উভয়ের উপরই পুরোপুরি ওয়াজিব হবে (কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ দুই মুহ্রিম ব্যক্তি যদি হরমের এলাকায় অথবা এর বাইরে কোন শিকারী জন্তু হত্যা করে, তবে উভয়ের উপরই পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে দশজন মুহ্রিম ব্যক্তি যদি যৌথভাবে কোন জন্তু হত্যা করে, তবে প্রত্যেকের উপর পূর্ণ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরহুত্ তাহাবী)। যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তির সাথে কোন বালক বা কাফির শরীক থাকে, তাহলে বালক এবং কাফিরের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। মুহ্‌রিমের উপরই পূর্ণ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যদি দুই হালাল ব্যক্তি হরমের কোন জন্তু একই প্রহারে মেরে ফেলে, তবে অর্ধেক মূল্য প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি একদল লোকে আঘাত করে হত্যা করে, তাহলে মূল্য নির্ধারণ করে সমহারে প্রত্যেকেই তা পরিশোধ করবে। একজনে আঘাত করার পর যদি অপরজন আঘাত করে, তবে আঘাতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। এরপর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পর এর যা মূল্য হবে ঐ মূল্যের অর্ধেক হারে উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। হালাল ব্যক্তির সাথে কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি শরীক হয়ে কোন পশু প্রহার করে এবং হত্যা করে, তবে মুহ্‌রিমের উপর পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে এবং দুই আঘাতে আহত অবস্থায় এর যে মূল্য হবে এ মূল্যের অর্ধেক পরিমাণ হালাল ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। মুহ্‌রিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি হরমের এলাকায় কোন শিকার ধরে, এরপর অপর এক ইহ্‌রামহীন ব্যক্তি এসে যদি একে হত্যা করে, তবে প্রত্যেকের উপর পূর্ণ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অবশ্য যে পশুটি ধরেছে সে হত্যাকারী থেকে তার দেয়া জরিমানা উসূল করে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা : যদি কোন হালাল ব্যক্তি কারিনের সাথে একত্রিত হয়ে হরমের এলাকায় কোন শিকার হত্যা করে, তবে হালাল ব্যক্তির উপর অর্ধেক কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে এবং কারিন ব্যক্তির উপর দুই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যদি হালাল, মুফরিদ এবং কারিন একত্রিত হয়ে কোন শিকার হরমের এলাকায় হত্যা করে, তবে হালাল ব্যক্তির উপর এক-তৃতীয়াংশ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। মুফ্‌রিদের উপর এক পূর্ণ কাফ্‌ফারা এবং কারিনের উপর দুই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অপরাপর অন্যান্য আরো বহু ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে (শরুহুত্ তাহাবী)। বিনা ইহ্‌রামের কোন ব্যক্তি যদি শিকারের উপর প্রথম আক্রমণ করে এরপর মুফ্‌রিদ এবং এরপর কারিন আক্রমণ করে এবং এতে যদি উক্ত জন্তুটি মারা যায়, তাহলে একটি নিখুঁত জানোয়ারের প্রথম ব্যক্তির আক্রমণে যা ক্ষতি হয়েছে সে এ ক্ষতিপূরণসহ তিনটি যখমের অবস্থায় এর যে মূল্য সাব্যস্ত হবে ঐ মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করবে। প্রথম ব্যক্তির আঘাতের পর মুহ্‌রিমের আঘাতে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, সে এ ক্ষতিপূরণসহ তিনটি যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে পূর্ণ মূল্যই দিয়ে দিবে। প্রথম দু'টি আঘাতের পর কারিনের আঘাতে যে ক্ষতি হয়েছে সে ঐ ক্ষতিপূরণ সহ আঘাতের অবস্থায় উক্ত জানোয়ারের যা মূল্য সাব্যস্ত হবে এ মূল্যের দুটি কাফ্‌ফারা আদায় করবে।

যদি প্রথম ব্যক্তি উক্ত জানোয়ারের হাত বা পা কেটে দেয় অথবা এর কোন একটি ডানা ভেঙ্গে দেয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখ ফুটা করে দেয়, তবে অক্ষত অবস্থায় এর যা মূল্য ছিল প্রথম ব্যক্তির উপর ঐ পরিমাণ মূল্য ওয়াজিব হবে। আর একটি যখমের এর যা মূল্য সাব্যস্ত হবে এ পরিমাণ মূল্য দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে এবং দুই যখমের অবস্থায় এর যে মূল্য সাব্যস্ত হবে, সে মূল্য অনুপাতে দ্বিগুণ কাফ্‌ফারা কারিনের উপর ওয়াজিব হবে (গায়াতুস সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)।

১১. মাসআলা : উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি শিকার জন্তুকে এমনভাবে আঘাত করে যে, এতে এর মরবার কোন আশংকা নেই, অতঃপর সে যদি এর সাথে হজ্জের ইহ্‌রাম যোগ করে পুনরায় উক্ত জানোয়ারের উপর আক্রমণ করে এবং যদি ঐ জানোয়ারটি মারা যায়, তবে উমরার জন্য অক্ষত অবস্থায় এর যা মূল্য ছিল ঐ পরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে এবং এক যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে ঐ পরিমাণ মূল্য হজ্জের জন্য আদায় করতে হবে। যদি উমরা থেকে ফারিগ হয়ে পুনরায় হজ্জ এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে এরপর শিকার জন্তুকে পুনরায় আঘাত করে এবং ঐ জানোয়ারটি যদি মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য ছিল উমরার জন্য ঐ পরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে এবং প্রথম যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য সাব্যস্ত হবে, সে মূল্য অনুপাতে দ্বিগুণ জরিমানা তার উপর কিরানের কারণে ওয়াজিব হবে। যদি প্রথম আঘাতটি মারাত্মক হয়, যেমন পশুটির একটি হাত কেটে দিয়েছে, তবে প্রথম আঘাতের কারণে নিখুঁত অবস্থায় এর যা মূল্য ছিল ঐ পরিমাণ মূল্য ওয়াজিব হবে এবং প্রথম আঘাতের অবস্থায় এর যা মূল্য সাব্যস্ত হবে, সে অনুসারে দ্বিগুণ জরিমানা কিরানের কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয়বার আঘাত করেও যদি পুনরায় হাত কেটে দেওয়া হয়, তবে উভয় আঘাতের কারণে সমান সমান জরিমানা ওয়াজিব হবে (মুহীত : সুরুখ্‌সী)।

১২. মাসআলা : শুধু উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে এমন কোন ব্যক্তি যদি কোন শিকারী জন্তুকে আঘাত করে এরপর কোন হালাল ব্যক্তিও যদি এর উপর আঘাত করে, অতঃপর উমরা আদায়কারী যদি হজ্জের ইহ্‌রামও এর সাথে যোগ করে নেয়, এরপর পুনরায় আক্রমণ করে এবং এতে ঐ জন্তুটি যদি মারা যায়, তবে হালাল ব্যক্তির আঘাতের পর এর যা মূল্য হবে ঐ পরিমাণ মূল্য উমরার কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে এবং দুই আঘাতের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে এ পরিমাণ মূল্য হজ্জের কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে। প্রথম যখমের পর হালাল ব্যক্তির দ্বিতীয় বার যখম করার কারণে যা ক্ষতি হয়েছে এ ক্ষতিপূরণসহ তিনটি যখমের অবস্থায় এর মূল্য যা সাব্যস্ত হবে এ মূল্যের অর্ধেক হালাল ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। প্রথম বার যখম করার পর উমরা পালনকারী যদি উমরার ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যায়, এরপর হালাল ব্যক্তি যদি এর উপর আক্রমণ করে, অতঃপর সে যদি হজ্জে কিরানের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং পুনরায় আক্রমণ করে এবং তা মরে যায়, তাহলে পরবর্তী দু'টি যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে এ পরিমাণ মূল্য উমরার কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে এবং প্রথম দুটি যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য সাব্যস্ত হবে এ মূল্য অনুসারে দ্বিগুণ কাফ্‌ফারা হজ্জে কিরানের কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে। হালাল ব্যক্তির হুকুম আগের থেকে ভিন্নতর নয়। যখম যদি মারাত্মক হয় যেমন হাত, পা কেটে দেওয়া অথবা উভয় চোখ ফোড়া করে দেওয়া, তাহলে সুস্থ অবস্থায় এর যা মূল্য ছিল অনুরূপ মূল্য উমরার কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে এবং প্রথম দুই যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য সাব্যস্ত হবে, সে অনুসারে দ্বিগুণ কাফ্‌ফারা কিরানের কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে। আর প্রথম যখমের অবস্থায় হালাল ব্যক্তির পুনরায় যখম করাতে যা ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতিপূরণসহ তিনটি যখমের অবস্থায় এর যা মূল্য হবে ঐ মূল্যের অর্ধেক হালাল ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ একাধিক পশু হত্যা করলে একাধিক কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু এ হত্যার দ্বারা ইহ্রাম হতে হালাল হওয়া অথবা ইহ্রাম ভঙ্গ করার ইচ্ছা করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। ("আস্ল") হালাল হওয়া বা ইহ্রাম ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কোন মুহ্রিম যদি একাধিক শিকার করে, তবে এ সব শিকারের কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে ইহ্রাম হতে বের হওয়ার ইচ্ছায় এরূপ করেছে, ইহ্রামের মধ্যে গুনাহ্ করার উদ্দেশ্যে এরূপ করেনি। তবে হালাল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

১৪. মাসআলা ঃ হত্যার কারণ সৃষ্টি করে কেউ যদি কোন পশু হত্যা করে, তবে উক্ত কারণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সে যদি শরীআতের সীমা লংঘন করে তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। নতুবা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং কেউ যদি জাল পাতে এবং এতে আটকা পড়ে কোন জানোয়ার মারা যায় অথবা পানির জন্য গর্ত খনন করে এবং এতে পড়ে কোন জীব মারা যায়, তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি শিকারের কাজে অন্য কোন মুহ্রিমকে অথবা হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করে, তাহলে এর পূর্ণ মূল্যের জরিমানা তার উপর ওয়াজিব হবে (বাদাই')। মুহ্রিমের জন্য যেমনিভাবে শিকার করা হারাম, অনুরূপভাবে শিকারের প্রতি পথ প্রদর্শন করাও হারাম। শিকারের কারণে যেমনিভাবে জাযা ওয়াজিব হয়, অনুরূপভাবে পথ প্রদর্শনের কারণেও জাযা ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ যে পথ প্রদর্শনে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় তা হল এই যে, যাকে শিকারের ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা হবে, সে এর আগে এ ব্যাপারে জ্ঞাত না থাকতে হবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সত্যবাদী বলে মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে যাকে পথ প্রদর্শন করা হল সে যদি সংবাদদাতাকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং অন্য ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলে জানে, তাহলে যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আরেকটি শর্ত হল, যাকে শিকারের ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা হবে, সে শিকারকে হত্যা করা পর্যন্ত পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তির ইহ্রামের উপর কায়েম থাকতে হবে। মুহ্রিম ব্যক্তি হালাল হয়ে যাওয়ার পর সে যদি শিকার হত্যা করে, তাহলে পথ প্রদর্শনকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এ কারণে সে গুনাহ্গার হবে। অন্য একটি শর্ত হল, যাকে শিকারের সন্ধান বলে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ঐ স্থানেই শিকারী জন্তুটি শিকার করে হত্যা করা আবশ্যক। অন্য স্থানে নয়। সুতরাং বাতলানোর পর পশুটি যদি ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় এবং এরপর সে যদি তাকে ধরে হত্যা করে, তাহলে বাতলানেওয়ালা পথ প্রদর্শনকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি অন্য মুহ্রিমকে পথ প্রদর্শন করে, তাহলে প্রত্যেকের উপর পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে। যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তিকে শিকারের সন্ধান বলে দেয় এবং সে উক্ত শিকারকে ধরে হত্যা করে ফেলে, তাহলে সন্ধানদাতা পথ প্রদর্শনকারীর উপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু হালাল ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না

(মুহীত)। কোন হালাল ব্যক্তি যদি মুহ্রিম বা হালাল ব্যক্তিকে হারমের এলাকার কোন শিকারের সন্ধান বলে দেয়, তবে পথ প্রদর্শনকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হত্যাকারীর উপর জাযা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। কেউ যদি কোন শিকারী জন্তুর প্রতি ইশারা করে এবং যাকে ইশারা করে দেখানো হয়েছে, সে যদি পূর্ব থেকে ঐ জানোয়ার সম্পর্কে জানে এবং দেখে, তাহলে ইশারাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে এরূপ করা মাকরূহ্ (বাদাই')। যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি অপর কোন মুহ্রিম ব্যক্তিকে শিকার হত্যা করার জন্য হুকুম করে এবং এ বিষয়ে তাকে পথ প্রদর্শন করে, অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা হত্যা করার জন্য হুকুম করে এবং সে উক্ত জানোয়ারটি হত্যা করে, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পূর্ণ একটি জাযা ওয়াজিব হবে।

১৭. মাসআলা ঃ যদি মুহ্রিম ব্যক্তি অপর কোন মুহ্রিম ব্যক্তিকে শিকারের খবর দেয় কিন্তু যাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে যদি শিকারী জন্তু দেখতে না পায়, অতঃপর দ্বিতীয় আরেক মুহ্রিম ব্যক্তি তাকে শিকারের খবর দেয় এমতাবস্থায় সে যদি প্রথম খবরদাতা ব্যক্তিকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কিছুই মনে না করে বরং পরে নিজেই শিকার তালাশ করে তাকে হত্যা করে, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি কোন মুহ্রিম ব্যক্তিকে এ মর্মে সংবাদ দিয়ে পাঠায় যে, অমুক মুহ্রিমকে যেয়ে বল যে, অমুক বলছে, অমুক স্থানে একটি শিকারী জন্তু আছে। অতঃপর সে যদি যেয়ে উক্ত জন্তুটি শিকার করে নেয়, তাহলে প্রেরণকারী, প্রেরিত এবং হত্যাকারী এই তিনজনের উপরই ঐ জন্তুর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি শেষোক্ত ব্যক্তি (যার কাছে সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছে) প্রথম থেকেই ঐ জানোয়ার সম্বন্ধে খবর রাখে এবং জানে, তবে হত্যাকারীর উপরই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। অন্য দুইজনের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি মুহ্রিম ব্যক্তি কোন শিকারের দিকে ইশারা করে কাউকে বলে যে, ঐ পশুটিকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে এসো। ইশারাকারী ব্যক্তির সামনে কেবল একটি পশু ছিল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি গিয়ে উক্ত পশুটি শিকার করে এর সাথে আরেকটিও শিকার করল। তাহলে ইশারাকারী ব্যক্তি যে পশুটির দিকে ইশারা করেছে, তার উপর এর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয়টির কাফ্ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে না।

১৮. মাসআলা ঃ মুহ্রিম ব্যক্তি যদি শিকারী পশু এমন জায়গায় দেখতে পায়, যেখান থেকে তা তীর-কামান ছাড়া শিকার করা সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় অপর মুহ্রিম ব্যক্তি যদি তাকে তীর-কামান হস্তান্তর করে এবং সে এর দ্বারা তা শিকার করে, তাহলে প্রত্যেকের উপর একটি করে জাযা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। মুহ্রিম ব্যক্তি থেকে ছুরি ধার নিয়ে কেউ যদি কোন শিকারী জন্তু হত্যা করে, তবে মুহ্রিম ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ্ হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি উক্ত ব্যক্তি মুহ্রিম ব্যক্তির দেওয়া ছুরি ছাড়াও পশুটি যবাহ্ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে সে যদি তার দেওয়া ছুরি ছাড়া পশুটি যবাহ্ করতে সক্ষম না হয়, তবে তার উপর এর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ কয়েকজন মুহ্রিম মক্কা শরীফের কোন এক ঘরে অবস্থান করতো। ঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘরে বাস করেছিল কতগুলো চড়ুই এবং কবুতর। সেখান থেকে মিনায় যাওয়ার প্রাক্কালে তাদের তিনজন একজনকে বলল, দরজাটি বন্ধ করে দাও। এ কথা শুনে সে দরজাটি বন্ধ করে দিল। অতঃপর মিনা থেকে এসে তারা দেখল যে, কতগুলো পাখি পিপাসার্ত অবস্থায় মরে আছে। এমতাবস্থায় সকলের উপরই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (গায়াতুস সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)। মুহ্‌রিম ব্যক্তির হাতে কোন শিকার ধরা পড়লে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত। শিকারী পশু তার হাতে থাকুক বা পিঞ্জিরায় থাকুক অথবা বাড়ীতে থাকুক সব অবস্থায়ই এই হুকুম হবে। মুহ্‌রিম যদি শিকারী পশু ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, শিকারী শিকারের মালিক হয়নি। যদি তার হাতে থাকা অবস্থায় অন্য কেউ হত্যা করে ফেলে, তাহলে উভয়ের উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আমাদের ইমামত্রয়ের মতে এ অবস্থায় শিকারী ব্যক্তি হত্যাকারীর নিকট থেকে প্রদত্ত জরিমানার অংশ উসূল করে নিবে।

২০. মাসআলা ঃ হালাল অবস্থায় শিকার করে পরে ইহ্‌রাম বাঁধলে এবং পশু মুহ্‌রিমের হাতে থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে। যদি না ছাড়ে ঐ শিকার তার হাতে মারা যায়, তাহলে জরিমানা হিসাবে এর মূল্য আদায় করতে হবে (বাদাই')। ছেড়ে দেওয়ার পর ঐ পশু শিকারীর মালিকানা হতে বের হয়ে যায় না। কাজেই তার ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য কেউ যদি উক্ত পশু পুনরায় শিকার করে, তাহলে ইহ্‌রাম হতে মুক্ত হওয়ার পর সে তা ফেরত নিতে পারবে (শরহুল মাজমা ঃ ইবনুল মালিক)। মুহ্‌রিমের হাতে শিকারী পশু আছে এমতাবস্থায় অন্য কোন মানুষ যদি তার হাত থেকে নিয়ে তা ছেড়ে দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর ওয়াজিব হবে এর মূল্য মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে জরিমানা হিসাবে প্রদান করা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি ঐ শিকার তার খাঁচায় অথবা তার বাড়ীতে থাকে, তবে আমাদের নিকট তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয় (বাদাই')।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি শিকার সাথে নিয়ে হরমে প্রবেশ করে এবং শিকার যদি প্রকৃতপক্ষে তার হাতে থাকে, তাহলে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি তা প্রকৃতপক্ষে তার হাতে না থাকে বাসায় বা খাঁচায় থাকে তবে শিকারী পশু ছাড়া তার উপর ওয়াজিব নয় (কিফায়)। খাঁচায় পাখি আছে, এ খাঁচা হাতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি ইহ্‌রাম বাঁধে অথবা কারো খাঁচায় পাখি আছে এ অবস্থায় সে যদি ইহ্‌রাম বাঁধে এবং এ পাখি নিয়ে হরমে প্রবেশ না করে, তাহলে আমাদের মাযহাবে এ পাখি ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয় (শরহুত্ তাহাবী)। কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি বাজপাখি সাথে নিয়ে হরমে প্রবেশ করে এবং সেখানে তা ছেড়ে দেয়। অতঃপর এ বাজ যদি হরমের কোন কবুতরের উপর হামলা করে একে মেরে ফেলে, তবে মুহ্‌রিমের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

২২. মাসআলা ঃ কোন হালাল ব্যক্তি যদি অপর কোন হালাল ব্যক্তি থেকে শিকারকৃত পশু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, অতঃপর সে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং ঐ পাখি তার হাতে থাকে তাহলে এ পাখি ছেড়ে দেওয়া এবং মালিকের নিকট এর মূল্য আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর ছিনতাইকারী যদি মালিকের নিকট তা ফেরত দেয়, তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে

না। কিন্তু সে গুনাহ্‌গার হবে এবং তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)। যদি শিকারকৃত পশু সাথে নিয়ে হরমে প্রবেশ করার পর তা বিক্রি করে দেয়া হয় এবং উক্ত পশু যদি খরীদ্দারের হাতে থাকে, তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয় নাকচ করে দিতে হবে। আর পশু যদি খরীদ্দারের হাতে না থাকে, তাহলে এর মূল্য আদায় করতে হবে। যেমন মুহ্‌রিম কর্তৃক শিকারকৃত পশু বিক্রি করলে করতে হয়। হরমের এলাকায় বিক্রি করুক অথবা হরমের এলাকা থেকে বের হয়ে অন্যত্র বিক্রি করুক তাতে হুকুমের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

২৩. মাসআলা ঃ হরমের এলাকায় দুই হালাল ব্যক্তি যদি পরস্পর বেচা-কিনা করে এবং শিকার হরমের এলাকার বাইরে "হিল"-এর মধ্যে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জাইয হবে না। অনুরূপভাবে কোন হালাল ব্যক্তি যদি হরমের কোন শিকার জন্তুকে যবাহ্ করে, তবে সে এর মূল্য সাদাকা করে দিবে। রোযা রাখলে যথেষ্ট হবে না। এর কাফ্‌ফারা হিসাবে কুরবানী করা জাইয হবে কিনা, এ বিষয়ে ফকীহ্‌-দের মতভেদ রয়েছে। কারো মতে যথেষ্ট হবে না। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে যথেষ্ট হবে (তাবয়ীন)।

২৪. মাসআলা ঃ হালাল ব্যক্তি যদি হরমের এলাকায় কোন শিকারকৃত পশু যবাহ্ করে, তবে তা খাওয়া জাইয নেই। মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি হিল বা হরমের এলাকায় কোন শিকারকৃত পশু যবাহ্ করে তবে তা মরা পশু হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণে মুহ্‌রিমের উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (সিরাজিয়্যা)। মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি তীর নিক্ষেপ করে অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা বাজপাখী ছেড়ে দিয়ে কোন পশু শিকার করে এবং তাকে হত্যা করে, তবে তা খাওয়া জাইয হবে না। এ শিকারের কারণে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি কোন শিকারী জন্তু নিজে যবাহ্ করে এর থেকে কিছু আহার করে, তবে যদি কাফ্‌ফারা আদায় করার আগে এভাবে আহার করে তাহলে যা আহার করেছে এর জরিমানা কাফ্‌ফারার মধ্যে শামিল হয়ে যাবে এবং একটি কাফ্‌ফারাই তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি কাফ্‌ফারা আদায় করার পর আহার করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে পরিমাণ খেয়েছে এ পরিমাণের মূল্য আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর তাওবা ও ইস্‌তিগফার ছাড়া আর কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি এ জানোয়ারের গোশ্‌ত অন্য কোন মুহ্‌রিম বা হালাল ব্যক্তি খায়, তাহলে সমস্ত আলিমদের মতে তাদের উপর কেবল তাওবা ও ইস্‌তিগফার করাই ওয়াজিব হবে (শরহুত্ তাহাবী)। কোন হালাল ব্যক্তি যদি পশু শিকার করে নিজেই তা যবাহ্ করে এবং মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি শিকারের ব্যাপারে তাকে কোনরূপ পথ প্রদর্শন না করে, যবাহ্ করতে না বলে এবং শিকার করতেও না বলে, তাহলে এরূপ শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য জাইয (হিদায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন শিকারী পাখীর ডিম ভেঙ্গে এর কাফ্‌ফারা আদায় করার পর তা ভুনা করে খেলে তার উপর পুনরায় কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (গায়াতুস সুরূজী)। কেউ যদি এমন শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, যার কিছু অংশ হরমের ভেতর আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছু অংশ হরমের বাইরে থাকে, তবে পায়ের দ্বারা তা বিবেচিত হবে (মুহীত)। যদি পা হরমের ভেতরে থাকে এবং মাথা হরমের বাইরে থাকে, তবে উক্ত জানোয়ারটি হরমের ভেতরে আছে বলে গণ্য হবে। আর যদি পা হরমের এলাকার বাইরে থাকে এবং মাথা হরমের মধ্যে থাকে, তবে একে হরমের বাইরের বলে গণ্য করা হবে। যদি পায়ের কিছু অংশ হরমের ভেতরে এবং কিছু অংশ হরমের বাইরে থাকে, তাহলে সতর্কতাবশত একেও হরমের ভেতরে বলে গণ্য করা হবে। জানোয়ারটি দাঁড়ানো থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি জানোয়ারটি শয়ন অবস্থায় থাকে, তবে মাথা ধর্তব্য হবে। পা নয়। সুতরাং এ অবস্থায় মাথা যদি হরমের ভেতরে থাকে এবং পা হরমের বাইরে থাকে, তবে একে হরমের ভেতরে বলে ধরতে হবে। আর যদি মাথা হরমের বাইরে থাকে এবং পা হরমের ভেতরে থাকে, তবে একে হরমের বাইরের বলে গণ্য করা হবে। শিকার যদি এমন গাছের উপর থাকে, যার গোড়া হরমের মধ্যে এবং ডাল বাইরে এমতাবস্থায় শিকার ডালে থাকলে শিকার যে স্থানে থাকবে ঐ স্থানটি ধর্তব্য হবে। গাছের স্থান ধর্তব্য হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি তীর নিক্ষেপকারী এবং শিকার এতদুভয়ের কোন একটি হরমের মধ্যে থাকে, তবে তীর নিক্ষেপকারীর উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যদি উভয় হরমের বাইরে থাকে এবং তীর হরমের ভেতর দিয়ে যায় না এবং সে মুহ্‌রিমও নয়, তবে উক্ত ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাজপাখী বা কুকুর যদি শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়, তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। ওয়াল ওয়াজিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি হরমের বাইরে থেকে হরমের বাইরের কোন শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং শিকার যখম হয়ে হরমের মধ্যে যায় এবং সেখানে মারা যায়, তাহলে শিকারী ব্যক্তির উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। এরূপ শিকার খাওয়া মাকরূহ্‌ (তাতারখানিয়্যা)।

২৭. মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হরমের বাইরে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে, অতঃপর শিকারী কুকুর যদি এর পেছনে ধাওয়া করে এবং একে হরমের ভেতর পাকড়াও করে, তাহলে প্রেরণকারী ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এ পশু খাওয়া জাইয হবে না। যদি কোন হালাল ব্যক্তি হরমের বাইরের কোন শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং ধাওয়া খেয়ে উক্ত পশু যদি হরমের ভেতর প্রবেশ করে এবং সেখানে তীরবিদ্ধ হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। খানিয়া গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি হরমের এলাকায় নেকড়ের পেছনে কুকুর ছাড়ে এবং এ কুকুর যদি কোন পশু শিকার করে নেয় অথবা নেকড়ে ধরার জন্য জাল পাতার পর এ জালে যদি কোন পশু আটকে যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ কারো তাড়া খেয়ে কোন পশু যদি কূপে পতিত হয় অথবা কোন কিছুর সাথে গিয়ে ধাক্কা খায়, তাহলে তাড়াকারী ব্যক্তির উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন জন্তুর উপর আরোহণ করে অথবা কোন সওয়ারী হাঁকিয়ে বা টেনে নিয়ে যায়, এমতাবস্থায় উক্ত সওয়ারী যদি তার হাত, পা বা মুখ দিয়ে কোন পশু মেরে ফেলে, তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (মি'রাজুদ দিরায়া)। যদি কোন ব্যক্তি হরমের এলাকার কোন হরিণী হরমের বাইরে তাড়িয়ে দেয়, অতঃপর তা বাচ্চা প্রসব করে এবং পরে মা ও বাচ্চারা মরে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর এসবগুলোর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। হালাল ব্যক্তি যদি হরমের এলাকা থেকে কোন হরিণী বাইরে নিয়ে যায়, তবে তার উপর ওয়াজিব হল উক্ত হরিণীটি ছেড়ে দেয়া এবং এ হরিণী হরমে না পৌঁছা পর্যন্ত সে এর জামিন থাকবে। হরমে পৌঁছার আগে যদি এর বাচ্চা হয় কিংবা শরীর বা পশমে অতিরিক্ত কিছু গজিয়ে উঠে এবং কাফ্‌ফারা আদায় করার আগে তা যদি মারা যায়, তাহলে উপরোক্ত বিষয়সমূহের কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি কাফ্‌ফারা আদায় করার পর মারা যায়, তাহলে আসলের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। অতিরিক্ত বিষয়ের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। এমন কোন হরিণী কেউ যদি বিক্রি করে ফেলে এবং খরীদ্দারের হাতে যাওয়ার পর এর যদি বাচ্চা হয় কিংবা এর শরীরে বা পশমে কোন কিছু অতিরিক্ত গজিয়ে উঠে। অতঃপর মা ও বাচ্চা সবই মরে যায় এবং বিক্রেতা যদি এর কাফ্‌ফারা আদায় না করে থাকে, তাহলে সমস্তের কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি পূর্বে এর কাফ্‌ফারা আদায় করে থাকে এবং এরপর বাচ্চা প্রসবিত হয় বা অতিরিক্ত কিছু গজিয়ে উঠে, তবে আসলের কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। বাচ্চা এবং অতিরিক্ত অংশের কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে না (...সুরূজী)।

২৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি উকুন মারে, তবে এক অঞ্জলি বা এ পরিমাণ সাদাকা দিবে। শরীর, মাথা বা কাপড় থেকে উকুন ধরে মারলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মাটি থেকে উকুন ধরে মারলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। চাই উকুন মারুক বা মাটিতে আছাড় দিক উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। দুই বা তিনটি উকুন মারলে এক অঞ্জলি পরিমাণ খাদ্য সাদাকা দিবে। বেশী দিলে অর্ধ সা' পর্যন্ত দিতে পারবে। উকুন নিজে মারাও জাইয নেই। এমনিভাবে মারার জন্য অন্যের নিকট হস্তান্তর করারও জাইয নেই। এরূপ করলে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে উকুন মারার জন্য কাউকে ইশারা করা অথবা কাপড়ে উকুন থাকলে তা রৌদ্রে ছড়িয়ে দেয়া কিংবা পানিতে ধৌত করা কিছুই জাইয নেই। কাপড় রৌদ্রে ছড়িয়ে দেয়ার ফলে উকুন যদি মারা যায় এবং তা যদি অনেক হয়, তাহলে এক সের সাড়ে বার ছটাক খাদ্য সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। শুকানোর উদ্দেশ্যে কাপড় রৌদ্রে দেয়ায় এতে যদি কোন উকুন মরে যায়, কিন্তু মারার নিয়্যাত না থাকে, তবে কোন কিছু তার উপর ওয়াজিব হবে না। যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তির নিকট উকুন মারার উদ্দেশ্যে নিজের কাপড় হস্তান্তর করে, তবে আদেশকারী ব্যক্তির উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি কাউকে উকুন দেখিয়ে দেয় এবং যাকে দেখানো হয়েছে সে যদি তা মেরে ফেলে, তাহলে হত্যাকারীর উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

৩০. মাসআলা ঃ পাগল কুকুর, নেকড়ে, চিল এবং নাপাকী ভক্ষণকারী কাক হত্যা করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যে কাক শস্য দানা খায় তা শিকারী পশু হিসাবে ধর্তব্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, বল্লা, বিষাক্ত পিঁপড়া, কাকড়া, মাছি, মশা, আটালি, রক্তচোষা এবং কচ্ছপ মারলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। মাটির পোকা-মাকড় মারলেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যেমন কাঁটাযুক্ত শরীর বিশিষ্ট প্রাণী এবং গোবরের কীট ইত্যাদি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। গুই, গিরগিট এবং ঝিঙ্গারের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। হিংস্র এবং শিয়াল যা সাধারণত প্রথমে কষ্ট দেয় না মারাও জাইয। এতে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না (গায়াতুস সুরুজী)। স্থলভাগের কোন শিকার মারাই মুহ্‌রিমের জন্য জাইয নেই। কিন্তু স্থলভাগের যে সব জানোয়ার লোকদেরকে কষ্ট দেয় তা মারা জাইয আছে (আল্ জামিউস সগীর ঃ কাযীখান)। বকরী, গাভী, উট, মুরগী এবং গৃহপালিত হাঁস যবাহ্ করা মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য জাইয আছে (কান্‌য)।

৩১. মাসআলা ঃ হরম এলাকার বৃক্ষ চার প্রকার। তিন প্রকার বৃক্ষ এমন, যা কাটা জাইয এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়াও জাইয। এতে কোন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না। প্রথম হল, যে সমস্ত গাছ মানুষ বপন করে এবং যা বপন করা জাতীয় গাছ। দ্বিতীয় হল, ঐ গাছ যা মানুষ বপন করে কিন্তু আসলে তা মানুষের বপন করা জাতীয় গাছ নয়। তৃতীয় হল, ঐ গাছ যা নিজে নিজে হয় কিন্তু আদতে তা মানুষের বপন জাতীয় গাছ। চতুর্থ প্রকার হল, ঐ গাছ যা কাটা জাইয নেই এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়াও জাইয নেই। সুতরাং কেউ যদি এ জাতীয় গাছ কর্তন করে, তবে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যে গাছ নিজে নিজে হয় এবং মানুষের বপন জাতীয় নয় এমন গাছ কারো মালিকানাধীন হোক বা না হোক একই হুকুম। সুতরাং কারো মালিকানাধীন ভূমিতে যদি বাবুল গাছ জন্মে এবং কেউ যদি তা কাটে, তাহলে তার উপর এর দ্বিগুণ মূল্য ওয়াজিব হবে। মালিককেও এর মূল্য আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র হিসাবে আরেক গুণ মূল্য সাদাকা করাও তার উপর ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ যদি হরমের এলাকার তরুতাজা বর্ধনশীল কোন গাছ কাটে এবং কর্তনকারী যদি শরীআতের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ[১] হয়, তাহলে এর মূল্য দ্বারা খাদ্য খরীদ করতে পারলে তা করবে এবং মিসকীনদের মধ্যে তা বন্টন করবে। প্রত্যেক মিসকীনকে এক সের বা বার ছটাক করে গম প্রদান করবে। যে কোন স্থানে ইচ্ছা তা বন্টন করতে পারবে। ইচ্ছা করলে মূল্য দ্বারা কুরবানীর পশু খরীদ করে তা হরমের এলাকায় যবাহ্ করে দিবে। তবে এ ক্ষেত্রে রোযা রাখা জাইয হবে না। কর্তনকারী মুহ্‌রিম হোক বা হালাল হোক অথবা কারিন হোক সব অবস্থাতেই একই হুকুম হবে। মূল্য আদায় করার পর ঐ গাছ দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ্ হবে। বিক্রি করা জাইয আছে কিন্তু মূল্য সদকা করে দিবে। হরমের যে সব গাছ শুকিয়ে গেছে, তা কর্তন করে এর দ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোন দোষ নেই (শরহ্‌ত্ তাহাবী)। যদি গাছ কাটা হয় তবে গাছের মূল্য ধর্তব্য হবে। গাছের ডালা নয়। যদি গাছের গোড়া হরমের মধ্যে থাকে এবং ডালা হরমের বাইরে থাকে তবে তা হরমের গাছ বলে গণ্য হবে। আর যদি মূলের কিছু অংশ

১. যার উপর শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য, পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু প্রভৃতি নয়।

হরমের মধ্যে আর কিছু অংশ হরমের বাইরে থাকে তবে শতর্কতাবশত এও হরমের গাছ বলে ধর্তব্য হবে।

৩৩. মাসআলা ঃ হরমের গাছের পাতা ছিঁড়তে পারবে। এতে জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যদি এতে গাছের কোন ক্ষতি না হয় (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। হরমের কোন গাছ উৎপাটন করার পর যদি এর কাফ্‌ফারা আদায় করা হয় এবং পরে যথাস্থানে তা রোপণ করা হয়, এরপর তা সজীব হওয়ার পর পুনরায় যদি উৎপাটন করা হয়, তাহলে পুনরায় তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, কাফ্‌ফারা আদায় করে সে ঐ গাছের মালিক হয়ে গেছে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)। যদি দুই মুহ্‌রিম ব্যক্তি অথবা দুই হালাল ব্যক্তি অথবা এক মুহ্‌রিম এবং এক হালাল ব্যক্তি যৌথভাবে হরমের কোন গাছ কাটে, তবে উভয়ের উপর একই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (গায়াতুস সুরুজী)। হরমের তাজা ঘাস কেটে আনলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু শুকনো ঘাস আনলে কিছুই ওয়াজিব হবে না (শরহ্‌ত্ তাহাবী)। হরমের ঘাসে কোন পশু চরাবে না এবং তা কাটবে না। ইযখির[১] ঘাস কাটলে কোন ক্ষতি নেই। হরমের ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করাতে কোন ক্ষতি নেই (কাফী)।

১. বাঁশ বা গোলপাতা জাতীয় এক প্রকার ঘাস, যা মক্কা মুকাররমায় জন্মাতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা

১. মাসআলা ঃ কোন আফাকী[১] ব্যক্তি ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কা শরীফ প্রবেশ করলে এবং তার হজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা না থাকলে মক্কা শরীফে প্রবেশ করার কারণে তার উপর হজ্জ বা উমরা করা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় সে যদি মীকাতে না গিয়ে হজ্জ বা উমরা করার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে মীকাতের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার দরুন তার উপর দম ওয়াজিব হবে। মীকাতে ফিরে এসে ইহ্‌রাম বাঁধলে এখানে দুই রকমের নিয়ম হতে পারে। তার উপর যে হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হয়েছিল, সে যদি ঐ হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যদি ফরয হজ্জ এবং যে উমরা তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল এর ইহ্‌রাম বাঁধে এবং ঐ বছরই তা আদায় করে, তবে মক্কা শরীফ বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করাতে তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা আদায় হয়ে যাবে (মুহীত)। অনুরূপ হজ্জের মানত করার পর ঐ বছরই যদি তা আদায় করে, তবে এ হজ্জও আদায় হয়ে যাবে (নিহায়া)। যদি বছর পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে বিনা ইহ্‌রামে মক্কা শরীফ প্রবেশ করার কারণে হাজী সাহেবের উপর যা করণীয় ওয়াজিব হয়েছিল, তা আদায় হবে না (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে কেউ যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করে চলে যায় তবে দুই পদ্ধতির কোন একটি অবশ্যই সে অবলম্বন করে থাকবে। হয়তো সে মীকাতের ভিতরে ইহ্‌রাম বাঁধবে অথবা মীকাতে ফিরে এসে ইহ্‌রাম বাঁধবে। যদি মীকাতের ভিতরে ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে চিন্তা করে দেখবে, যদি পুনরায় মীকাতে এসে ইহ্‌রাম বাঁধলে হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে মীকাতে আসবে না। ঐ ইহ্‌রাম দ্বারাই হজ্জের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে নিবে। অবশ্য এ ত্রুটির কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকলে মীকাতে প্রত্যাবর্তন করবে। এ ক্ষেত্রে হয়তো সে হালাল অবস্থায় মীকাতে আসবে অথবা মুহ্‌রিম অবস্থায় আসবে। যদি হালাল অবস্থায় আসে এবং মীকাতে এসে ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে এ অবস্থায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। যদি মুহ্‌রিম অবস্থায় মীকাতে ফিরে আসে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তালবিয়া পাঠ করলে তার উপর থেকে কুরবানী রহিত হয়ে যাবে। আর তালবিয়া পাঠ না করলে কুরবানী রহিত হবে না। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই কুরবানী রহিত হয়ে যাবে।

---

১. মীকাতের সীমার বাইরে অবস্থানকারী, এরূপ ব্যক্তি যদি মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সে ইহ্‌রাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করতে পারবে না অর্থাৎ করলে গোনাহ্‌গার হবে। মক্কা মুকাররমায় সে যে কোন নিয়্যাতে প্রবেশ করুক, হজ্জ, উমরা বা জাগতিক কার্য যথা ঃ চাকরী লাভ, ব্যবসা করা, আত্মীয়- স্বজনের সাথে সাক্ষাত। কাজেই এরূপ ব্যক্তির মক্কায় প্রবেশের জন্য হজ্জের সময় হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রাম অন্য সময়ে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে তা সম্পন্ন করতে হবে।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার পর নিকটবর্তী অন্য কোন মীকাত থেকে পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে জাইয আছে। এ অবস্থায় তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করে এবং বনী আমির-এর বাগানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা না করে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

৪. মাসআলা ঃ কূফাবাসী কোন ব্যক্তি যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অবিক্রম করে এবং পরে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, এরপর পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে এর কয়েক ধরন হতে পারে। প্রথমে সে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে এবং এরপর হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছে কিংবা প্রথমে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছে এরপর হরম থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে অথবা হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম একত্রে বেঁধেছে অর্থাৎ কিরান হজ্জের নিয়্যাত করেছে। উপরোক্ত অবস্থাসমূহে তার উপর এক কুরবানী ওয়াজিব হবে। যদি কেউ হরম এলাকা থেকে প্রথমে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং পরে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে তার উপর দু'টি কুরবানী ওয়াজিব হবে। একটি কুরবানী ওয়াজিব হবে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম না বাঁধার কারণে। আর অপরটি ওয়াজিব হবে হিল থেকে 'উমরার ইহ্‌রাম না বাঁধার কারণে।

৫. মাসআলা ঃ বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে তা ভঙ্গ করলে অথবা কোন কারণবশত হজ্জ ফওত হওয়ার পর তা কাযা করলে বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর যে দম ওয়াজিব হয়েছিল, তা রহিত হয়ে যাবে। ক্রীতদাস বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার পর মনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে ইহ্‌রাম বাঁধলে আযাদ হওয়ার পর বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কোন কাফির মক্কা শরীফ প্রবেশ করার পর মুসলমান হলে এবং এ অবস্থায় ইহ্‌রাম বাঁধলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কোন না-বালিগ বালক বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার পর বালিগ হলে এবং এ অবস্থায় ইহ্‌রাম বাঁধলে তার উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্‌সী)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা ইহ্‌রামে কয়েক বার মীকাত অতিক্রম করে, তবে প্রত্যেক বারের মুকাবিলায় তার উপর একটি হজ্জ অথবা একটি উমরা ওয়াজিব হবে। এরূপ কয়েক বার বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার পর শেষবার যদি মীকাতে এসে ফরয হজ্জ বা অন্য কোন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে তবে শেষ বার বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এর আগে বিনা ইহ্‌রামে যেসব যাতায়াত করেছে, সেগুলোর কারণে যে হজ্জ বাউমরা ওয়াজিব হয়েছে, তা রহিত হবে না। কেননা, শেষ বারের পূর্বে যতবার যাতায়াত করেছে, তা তার দায়িত্বে ফরয হয়ে গিয়েছে। নির্ধারিত নিয়ত করে আদায় না করা পর্যন্ত তা আদায় হবে না (শরহত্ তাহাবী)।

৭. মাসআলা ঃ মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের উদ্দেশ্যে হরম থেকে বের হয় এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, এরপর সে যদি হরমে না এসেই আরাফায় অবস্থান করে, তবে তার উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি বকরী কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার পর সে যদি হজ্জের কর্মকাণ্ড আরম্ভ করার আগে পুনরায় হরমে চলে আসে তবে তালবিয়া পড়তে পড়তে আসলে কুরবানী তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য তালবিয়া পড়া ছাড়া হরমের ভেতর প্রবেশ করলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার থেকে কুরবানী রহিত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও কুরবানী রহিত হয়ে যাবে (তাতারখানিয়্যা)। মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রয়োজনে হিল এলাকায় যায় এবং তথায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এরপর আরাফায় অবস্থান করে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি উমরার কাজ সমাপ্ত করে হরমের এলাকা থেকে বের হয়ে হিল এলাকা থেকে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং এরপর আরাফায় অবস্থান করে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। অবশ্য এ অবস্থায় সে যদি ইহ্‌রামের অবস্থায় হরমে ফিরে আসে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কুরবানী তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে যদি ইহ্‌রামের অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে করতে হরমে ফিরে আসে, তবে তার থেকে কুরবানী রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি হরমে ফিরে এসে পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে ইমামত্রয়ের মতে এ অবস্থায় তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (গায়াতুস সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ এক ইহ্‌রামের সাথে আরেক ইহ্‌রাম যোগ করা

১. মাসআলা ঃ এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, একত্রে দুই হজ্জ এবং দুই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা বিদ'আত। কিন্তু কেউ যদি এভাবে একত্রে দুই হজ্জ বা দুই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ই তার উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে একটি ওয়াজিব হবে। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দু'টির যে কোন একটি ভঙ্গ করে দেওয়া আবশ্যক। এরূপ অবস্থায় প্রথমটি অর্থাৎ হজ্জ ঐ বছর আদায় করবে এবং দ্বিতীয়টি পরের বছর কাযা করবে। দুই উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে প্রথমটি আদায় করার পর ঐ বছরই দ্বিতীয়টিও আদায় করবে। কেননা, এক বছরের মধ্যে একাধিক উমরা করা জাইয। কিন্তু এক বছরের মধ্যে একাদিক হজ্জ করা জাইয নয়।[১]

২. মাসআলা ঃ হজ্জের কর্মকাণ্ডের উপর উমরার কর্মকাণ্ডের বিনা করা বিদ'আত। কিন্তু 'উমরার ইহ্‌রামের উপর হজ্জের ইহ্‌রামের বিনা করা বিদ'আত নয়। সুতরাং কেউ যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর এক চক্কর তাওয়াফ আদায় করে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে এ ক্ষেত্রে সে উমরা ছেড়ে দিবে (মুহীত)। উমরা ভঙ্গ করার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে এবং পরে এ উমরার কাযা করতে হবে (নিহায়া)। হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তাওয়াফ শুরু করার আগেই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলে উমরা ভঙ্গ করবে না (মুহীত)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি যদি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে এক চক্কর তাওয়াফ আদায় করে পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে সে হজ্জ ছেড়ে দিবে। অবশ্য হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে এবং পরে হজ্জ ও উমরা আদায় করাও তার জন্য আবশ্যক হবে (হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এ অবস্থায় সে যদি উমরার কোন কাজই আদায় না করে থাকে, তবে ফকীহ্‌দের সর্বসম্মত মতে উমরা ছেড়ে দিবে (কাফী)। উমরার চার চক্কর আদায় করার পর কেউ যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে সে হজ্জের ইহ্‌রাম ছেড়ে দিবে। এতে কারো মতবিরোধ নেই। যেটাই ভঙ্গ করবে এর কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। অবশ্য উমরার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলে শুধু উমরার কাযা ওয়াজিব হবে। আর হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলে হজ্জের কাযা এবং উমরা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি ইহ্‌রাম ভঙ্গ না করে হজ্জ এবং উমরা উভয়টাই আদায় করে, তবে জাইয হবে। কিন্তু হজ্জ এবং উমরা একত্র করণের কারণে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)।

---

১. জাইয নয় আবার কিসের? অবকাশই নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ কূফাবাসী কোন ব্যক্তি যদি প্রথমে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এরপর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে উভয়টিই তার উপর ওয়াজিব হবে এবং সে "কারিন" হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু এরূপ করাতে সে গুনাহগার হবে। এহেন অবস্থায় কেউ যদি আরাফায় অবস্থান করে এবং উমরার কর্মকাণ্ড আদায় না করে, তবে তার উমরার ইহ্‌রাম ভঙ্গ হয়ে যাবে। শুধু আরাফার দিকে রওয়ানা করলেই তার উমরার ইহ্‌রাম ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ না সে আরাফায় অবস্থান শুরু করবে। কেউ যদি হজ্জের তাওয়াফে তাহিয়্যাত তথা তাওয়াফে কুদূম আদায় করার পর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে উভয়টিই তার উপর ওয়াজিব হবে এবং আদায় করলে উভয়টিই আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য হজ্জ এবং উমরার ইহ্‌রাম একত্রিত করার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। এ কুরবানী কাফ্‌ফারার কুরবানী। এ কুরবানী হজ্জের কুরবানী নয়। এ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, উমরার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে দেওয়া (কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে ঐ হজ্জ সমাপন করার পর কেউ যদি দশই যিলহাজ্জের দশ তারিখে পুনরায় আরেক হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে দ্বিতীয়টিও তার উপর ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে প্রথম হজ্জের মাথা মুণ্ডালে তাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি উভয় হজ্জের মধ্যে মাথা মুণ্ডিয়ে না থাকে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় হজ্জের পরে মাথা মুণ্ডন করুক অথবা না করুক উভয় অবস্থাতে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি যদি উমরার যাবতীয় কাজ শেষ করে মাথা মুণ্ডানোর আগে আরেক উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে ওয়াক্তের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। এ কুরবানী কাফ্‌ফারার কুরবানী (হিদায়া)।

৬. মাসআলা ঃ হজ্জকারী ব্যক্তি যদি যিলহাজ্জের দশ তারিখে অথবা আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে এ উমরা তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে। অবশ্য এ অবস্থায় উক্ত উমরা ভঙ্গ করে দেওয়া ওয়াজিব। ভঙ্গ করার পর এর জন্য কুরবানী দিতে হবে এবং এর পরিবর্তে একটি উমরা কাযা করতে হবে। আর উক্ত অবস্থায় উমরা আদায় করে নিলে তা জাইয হবে। কিন্তু একটি কাফ্‌ফারার কুরবানী ওয়াজিব হবে। যদি হজ্জের জন্য মাথা মুণ্ডানোর পর উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে উমরা ভঙ্গ করবে না ("আস্‌ল")। কিন্তু মাশায়িখে কিরামের মতে উমরা ভঙ্গ করে দিবে। হজ্জ ফওত হওয়ার পর কেউ যদি উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে উমরা ভঙ্গ করে দিবে। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে তাও ভঙ্গ করে দিবে। ভঙ্গ করার দরুন তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। উমরা ভঙ্গ করলে উমরার কাযা ওয়াজিব হবে। আর হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলে হজ্জ এবং উমরা দুটিরই কাযা ওয়াজিব হবে (কাফী)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্‌সারের বিবরণ

শরীআতের পরিভাষায় "মুহ্‌সার" ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তা যে কোন কারণেই হতে পারে। শত্রুর কারণে হোক কিংবা রোগের কারণে, আটকা পড়ার কারণে হোক বা হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে, অথবা শরীরে ফোঁড়া উঠার কারণে হোক বা এমন কোন কারণে হোক যা কৃত ইহ্‌রাম পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এ বাঁধা প্রকৃত বাঁধা হতে পারে বা শরীআত স্বীকৃত অন্য কোন বাধাও হতে পারে। আমাদের ইমামগণ এ মতামতই ব্যক্ত করেছেন (বাদাই')। আমাদের ইমামদের মতে যে রোগের কারণে "ইহ্‌সার" প্রমাণিত হয় তা হল, চলাফেরা করতে অথবা সওয়ার হতে অক্ষম হয়ে যাওয়া। কারো অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে বর্তমানে চলাফেরা করতে পারে কিন্তু চলাফেরা করলে বা সওয়ার হলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা আছে, তবে তার জন্যও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। শত্রুর মধ্যে মুসলমান, কাফির এবং হিংস্র প্রাণী সবই শামিল আছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১. মাসআলা ঃ যদি কারো পথ খরচ চুরি হয়ে যায় অথবা সওয়ারী মরে যায় এবং সে পায়ে হেঁটে মক্কা শরীফ যেতে সক্ষম না হয়, তবে সে মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে। অবশ্য পায়ে হেঁটে যেতে সক্ষম হলে সে আর মুহ্‌সার হিসাবে গণ্য হবে না। স্বামীহীন কোন মহিলা যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তার সাথের মাহ্‌রাম ব্যক্তি যদি মারা যায় অথবা কোন মহিলা যদি ইহ্‌রাম বাঁধে এবং যদি তার সাথে কোন মাহ্‌রাম না থাকে বরং তার স্বামী তার সঙ্গে থাকে, এমতাবস্থায় ঐ স্বামী যদি মারা যায়, তবে উক্ত মহিলাও মুহ্‌সার হিসাবে গণ্য হবে (বাদাই')।

২. মাসআলা ঃ হজ্জযাত্রী কোন মহিলার মাহ্‌রাম যদি রাস্তায় মারা যায় এবং ঐ স্থান হতে মক্কা শরীফ যদি তিন দিনের বা এর চেয়ে বেশী দিনের পথ হয়, তবে সে মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যদি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, এমতাবস্থায় স্বামী যদি তাকে হজ্জে যেতে বাঁধা প্রদান করে, তবে উক্ত মহিলা মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে দাস-দাসী যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে মনিব তাদেরকে ইহ্‌রাম ছাড়তে বাধ্য করতে পারবে। এ অবস্থায় তারা মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। যদি কোন মহিলা ফরয হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তার সাথে তার স্বামী বা কোন মাহ্‌রাম না থাকে, তবে সে মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে। যদি কোন মহিলার স্বামী ও মাহ্‌রাম বর্তমান থাকে এবং শহর বা এলাকাবাসীর হজ্জে রওয়ানা করার সময় হজ্জে যাওয়ার মত তার পূর্ণ ক্ষমতাও (দৈহিক ও আর্থিক) থাকে, তবে ঐ মহিলা মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে না। যদি কোন মহিলার স্বামী থাকে, মাহ্‌রাম না থাকে, এমতাবস্থায় স্বামী যদি তাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করে, তবে সে মুহ্‌সার বলে গণ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বামী তার স্ত্রীর ইহ্রাম ভঙ্গ করাতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর ইহ্রাম ভঙ্গ করাতে পারবে। অধিকাংশ আলিমের মতে, হজ্জের ন্যায় উমরার মধ্যেও ইহসার হতে পারে এবং তা শরীআত স্বীকৃত।

ইহ্সারের হুকুম

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারী ব্যক্তি যদি পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে কারো মাধ্যমে হাদী তথা কুরবানী করার জন্য একটি পশু পাঠিয়ে দিবে। অথবা এর মূল্য পাঠিয়ে দিবে। এ মূল্য দ্বারা কুরবানীর পশু খরীদ করে তার পক্ষ হতে তা যবাহ্ করে দিবে। যবাহ না করা পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি ইহ্রাম হতে মুক্ত হতে পারবে না। অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না। এটাই অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতামত। "বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানী করা ছাড়া ইহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত" ইহ্রাম বাঁধার সময় সংযুক্ত করা হোক বা না হোক, তার হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। যার মাধ্যমে হাদীর পশু পাঠাবে, তার থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া মুহসার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে, সে এ পশুটি তার পক্ষ হতে অমুক দিন অমুক তারিখে যবাহ্ করবে। যবাহ্-এর পর মুহসার তার ইহ্রাম হতে মুক্ত হতে পারবে। এর আগে ইহ্রাম হতে মুক্ত হতে পারবে না। অতএব হাদী কুরবানী করার পূর্বে মুহসার ব্যক্তি যদি ইহ্রামের পরিপন্থী কোন কাজ করে, তবে মুহ্রিমের উপর যা ওয়াজিব হবে, তার উপরও তাই ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মুহ্সার ব্যক্তির ইহ্রাম থেকে বের হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন করা শর্ত নয়। যদি মুণ্ডায়, তবে ভাল (বাদাই')।

১. মাসআলা ঃ মুহ্সার ব্যক্তি যদি হাদী প্রেরণ করতে সক্ষম না হয় এবং এর মূল্য দিতেও যদি সক্ষম না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবে সিয়াম সাধনা করে ইহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া তার জন্য বৈধ নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কুরবানীর পশু যবাহ্ করার প্রতিশ্রুতি দিলে মুহ্সার ব্যক্তি যদি এই ধারণায় হালাল হয়ে যায় যে, হয়তো পশু যবাহ্ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর জানা গেল যে, পশু তখনো যবাহ্ হয়নি, এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি মুহ্সারই থেকে যাবে এবং সময়ের আগে হালাল হওয়ার কারণে তার উপর একটি দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে। যদি প্রতিশ্রুত দিনের আগে হাদীর জানোয়ার যবাহ্ করা হয়ে যায়, তবে استحسان ১ এর আলোকে তা জাইয হবে (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ মুহ্সার ব্যক্তি হাদী কুরবানী করে হালাল হয়ে যাওয়ার পর দেখতে হবে যে, সে কিসের ইহ্রাম বেঁধেছিল। যদি ইফ্রাদ হজ্জ আদায় করার ইহ্রাম বেঁধে থাকে, তাহলে পরবর্তী বছর তার উপর একটি হজ্জ এবং একটি উমরা ওয়াজিব হবে। যদি সে উমরার ইহ্রাম বেঁধে থাকে, তাহলে শুধু উমরার কাযা করবে। হজ্জে কিরানের ইহ্রাম বেঁধে থাকলে দু'টি কুরবানীর পর ইহ্রাম থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং পরবর্তী বছর দুই উমরা ও এক হজ্জ তার উপর ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

---

১. সূক্ষ্মদৃষ্টিতে।

৩. মাসআলা ঃ ইফ্রাদ হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি দু'টি হাদী প্রেরণ করে, তবে প্রথমটি যবাহ্ করার পর সে হালাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টি নফল বলে গণ্য হবে। কারিন হলে উভয়টি যবাহ্ না করা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারবে না (বাদাই')। যদি কারিন হজ্জের ইহ্রাম হতে বের হওয়ার জন্য একটি কুরবানী পাঠায় এবং উমরার ইহ্রাম ঐভাবে বাকী রাখে, তবে সে কোন ইহ্রাম হতেই মুক্ত হতে পারবে না (তাবয়ীন)। কারিন ব্যক্তি রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি দু'টি হাদী প্রেরণ করে এবং এ কথা নির্দিষ্ট না করে যে, এটি হজ্জের জন্য আর এটি উমরার জন্য, তবে এতে কোন ক্ষতি হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। "কিরান হজ্জ" আদায়কারী ব্যক্তি যদি হজ্জ এবং উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর আরাফায় অবস্থান করার পূর্বে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তবে সে কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্জের পরিবর্তে তার উপর একটি হজ্জ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে। কিন্তু উমরার পরিবর্তে উমরা করা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য হরমের এলাকার বাইরে চুল কাটার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

৪. মাসআলা ঃ মুহ্সার ব্যক্তি যদি ঐ বছরই হজ্জ সম্পন্ন করে নেয়, তবে তার উপর উমরা ওয়াজিব হবে না (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। যদি কেউ হজ্জ বা উমরার নিয়ত না করে ইহ্রাম বাঁধে এবং রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সে কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবে এবং استحسان এর আলোকে তার উপর শুধুমাত্র একটি উমরা ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টভাবে হজ্জ বা উমরার নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধার পর তা ভুলে যায়, এরপর সে যদি মুহ্সার হয়ে যায়, তাহলে পশু কুরবানী করে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর একটি হজ্জ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে (বাদাই')।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই হজ্জ বা দুই উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর মুহ্সার হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে সে দু'টি কুরবানী আদায় করে হালাল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে একটি কুরবানীই যথেষ্ট হবে (গায়াতুস্ সুরুজী লি শরহিল হিদায়া)। কেউ যদি দুই উমরার ইহ্রাম বেঁধে তা আদায় করার নিমিত্তে মক্কা শরীফের উদ্দেশে রওয়ানা করে এবং এ অবস্থায় সে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে এক উমরার পরিবর্তে তার উপর এক কুরবানী ওয়াজিব হবে। আর যদি রওয়ানা না করা অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দু'টি কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উক্ত ব্যক্তির উপর দু'টি উমরা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এক উমরা ওয়াজিব হবে।

৬. মাসআলা ঃ হাদী প্রেরণের পর মুহ্সার ব্যক্তির উযর শেষ হয়ে গেলে তার যদি নিশ্চিত ধারণা হয় যে, সে হাদী এবং হজ্জ উভয়টিই পাবে, তাহলে তৎক্ষণাৎ হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা করা তার জন্য অপরিহার্য। আর যদি হাদী এবং হজ্জ কোনটাই পাবে না বলে তার নিশ্চিত ধারণা হয়, তবে রওয়ানা করবে না। যদি একটি পাবে বলে নিশ্চিত ধারণা হয়, তবে তা দুই ধরনের হতে পারে। যদি হাদী পাবে কিন্তু হজ্জ পাবে না বলে ধারণা হয়, তাহলে এ অবস্থায়ও হজ্জের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা আবশ্যক নয়। আর হজ্জ পাবে কিন্তু হাদী পাবে না বলে ধারণা হলে قياس-এর দাবী অনুসারে এ অবস্থায় রওয়ানা করা আবশ্যক। কিন্তু استحسان-এর দাবী মতে এ অবস্থায় রওয়ানা তার জন্য আবশ্যক হবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)। যদি মুহ্সার ব্যক্তি হাদী পেয়ে যায়, তাহলে সে উক্ত পশুটি যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যথা নিয়মে ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার পর তার ওযর যদি খতম হয়ে যায় এবং এরপর সে যদি ঐ বছরই হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ আদায় করে, তাহলে কাযার নিয়্যত করা তার জন্য অপরিহার্য হবে না এবং উমরা করাও তার উপর ওয়াজিব হবে না (গায়াতুস্ সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)। কেউ হজ্জ বা উমরার নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধার পর পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হাদী প্রেরণ করল। এ অবস্থায় যদি তার উক্ত বাঁধা দূরীভূত হয়ে যায় এবং নতুনভাবে আরেক বাঁধা সৃষ্টি হয়, তবে সে যদি এ কথা মনে করে যে, হাদী পাওয়া যাবে, এখনো তা যবাহ্ করা হয়নি এবং এ কথা নিয়্যাতও করে যে, এটি পরবর্তী ইহ্সারের হাদী, তাহলে এ নিয়্যাত সহীহ্ হবে এবং উক্ত ব্যক্তি ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। আর সে যদি এ কথার নিয়্যাত না করে এবং এ অবস্থায় প্রেরিত পশুটি যবাহ্ হয়ে যায়, তাহলে এতে সে ইহ্রাম হতে মুক্ত হতে পারবে না (মুহীত ঃ সুরুখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি আরাফায় অবস্থানের পর পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সে মুহ্সার হিসাবে গণ্য হবে না। মক্কায় আটকা পড়ে তাওয়াফ ও উকূফ করতে সক্ষম না হলে মুহ্সার হিসাবে গণ্য হবে (তাবয়ীন)। ইমাম জাস্সাস (র) বলেন, এটা সহীহ্ (বাদাই')। কেউ যদি তাওয়াফ বা উকূফ এতদুভয়ের কোন একটি আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে সে মুহ্সার বলে গণ্য হবে না। কেননা,, যে আরাফায় অবস্থান করতে সক্ষম, তার হজ্জ ফওত হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করতে সক্ষম, সে তো এর দ্বারাই ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে (তাবয়ীন)। কোন ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থান করার পর বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এ অবস্থায় যদি আইয়ামে তাশরীক অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে মুযদালিফায় অবস্থান না করার কারণে একটি কুরবানী এবং রমী বর্জন করার কারণে একটি কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হবে। অতঃপর সে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিলম্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার কারণে একটি কুরবানী এবং বিলম্বে মাথা মুণ্ডানোর কারণে আরেকটি কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মাথা মুণ্ডানো এবং তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্বে আদায় করার কারণে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। ইহ্সারের কারণে যে কুরবানী ওয়াজিব হয় আমাদের মাযহাবে তা হরমের এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ্ করা জাইয নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের আগে এবং পরেও এ কুরবানী করা জাইয আছে। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দশ তারিখের আগে কুরবানী করা জাইয নেই। উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হলে হরমের মধ্যে যে কোন সময় তা কুরবানী করা জাইয আছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফওত হয়ে যাওয়ার বিবরণ

যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছে, তার হজ্জ যদি ফওত হয়ে যায়, তাহলে সে তাওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর এর কাযা করবে। কিন্তু এতে তার উপর কোন কুরবানী ওয়াজিব হবে না। ফরয, নফল, মানত, সহীহ্ এবং গায়র সহীহ্ সর্বপ্রকার হজ্জের ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে পরে ফাসিদ হোক অথবা ফাসিদ অবস্থায়ই হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা হোক, যেমন কেউ স্ত্রী-সহবাসের অবস্থায় হজ্জের ইহ্রাম বাঁধল এবং এ অবস্থায় আরাফার উকূফ তার ফওত হয়ে গেলে অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের ফজর উদিত হয়ে গেল, তাহলে তার হজ্জ ফওত হয়ে গেছে বলে ধর্তব্য হবে, এতদুভয় অবস্থার মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই (হিদায়া)।

১. মাসআলা ঃ যদি "কিরান হজ্জ আদায়কারী" ব্যক্তির হজ্জ ফওত হয়ে যায়, তাহলে সে প্রথমে উমরার তাওয়াফ এবং সাঈ করবে। এরপর হজ্জ ফওত হয়ে যাওয়ার কারণে পুনরায় তাওয়াফ-সাঈ এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে নিবে। এ অবস্থায় "দমে কিরান" তার উপর ওয়াজিব হবে না। হালাল হওয়ার নিয়্যাতে তাওয়াফ আরম্ভ করতেই তালবিয়া বন্ধ করে দিবে (বাদাই')। তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু সাথে এনে থাকে, এমতাবস্থায় হজ্জ ফওত হয়ে গেলে তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে এবং সাথে আনা পশুটি যে কোন কাজে ইচ্ছা লাগাতে পারবে (মুহীত)। যার হজ্জ ফওত হয়ে যাবে, সে তাওয়াফ করে হজ্জের ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। তবে এ তাওয়াফ হজ্জের ইহ্রামের কারণে ওয়াজিব হবে, না উমরার ইহ্রামের কারণে ওয়াজিব হয়--এ বিষয়ে আমাদের ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হজ্জের ইহ্রামের কারণে ঐ তাওয়াফ ওয়াজিব হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ঐ তাওয়াফ উমরার ইহ্রামের কারণে ওয়াজিব হয়। তাই হজ্জের ইহ্রাম উমরার ইহ্রাম দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে (বাদাই')। এই মতভেদের ফলাফল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে, যে এ অবস্থায় আরেক হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নিয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ইহ্রাম ভঙ্গ করে দিবে যাতে দুই হজ্জের ইহ্রাম একত্রিত না হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ ইহ্রাম ভঙ্গ করবে না। বরং এ অবস্থায় যা যা করণীয় তা করে যাবে (মুহীত)। যার হজ্জ ফওত হয়ে যাবে, তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ বদলী হজ্জের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ এ ক্ষেত্রে বুনিয়াদী কথা হল, নিজ আমলের সওয়াব অন্যকে দিয়ে দেওয়া জাইয। নামায, রোযা, সাদাকা, হজ্জ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার এবং নবী-রাসূল, শহীদ, ওলী-আল্লাহ্ ও নেক্কার বান্দাদের কবর যিয়ারত, মৃত ব্যক্তিকে দাফন-কাফন করা ইত্যাদি সব আমলের ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (গায়াতুস্ সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ ইবাদত তিন প্রকার। (১) মালী ইবাদত--যেমন যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতর। (২) বদনী বা দৈহিক ইবাদত যেমন নামায ও রোযা। (৩) মালী ও বদনী সমন্বিত ইবাদত--যেমন হজ্জ। প্রথম প্রকার ইবাদতে সক্ষম ও অক্ষম উভয় অবস্থাতে নিয়াবত বা প্রতিনিধিত্ব জাইয। দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব করা আদৌ জাইয নেই। তৃতীয় প্রকার ইবাদতে অক্ষমতার অবস্থায় প্রতিনিধিত্ব জাইয (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ হজ্জের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জাইয হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। (১) প্রথম শর্ত হল, যার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে তার হজ্জ আদায়ে অক্ষম হওয়া। অথচ হজ্জের জন্য যে পরিমাণ টাকা-পয়সার দরকার ঐ পরিমাণ টাকা-পয়সা তার আছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি নিজে হজ্জ আদায় করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তার শরীর সুস্থ থাকে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকে অথবা নিজে ফকীর কিন্তু শরীর সুস্থ, তাহলে তার পক্ষ হতে অন্য কারো বদলী হজ্জ আদায় করা জাইয হবে না। (২) দ্বিতীয় শর্ত হল, হজ্জ করানোর সময় হতে মরণ পর্যন্ত এ অক্ষমতা বাকী থাকতে হবে (বাদাই')। সুতরাং অসুস্থ অবস্থায় বদলী হজ্জ করানোর পর উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে এ হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি পরে সুস্থ ও সক্ষম হয়, তবে ঐ হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোন কয়েদী যদি নিজের পক্ষ হতে হজ্জ করায় এবং পরে সে মুক্ত হয়ে যায়, তবে তার হজ্জও বাতিল হয়ে যাবে (তাবয়ীন)। যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি কারো দ্বারা বদলী হজ্জ করায় এবং পরে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে এ হজ্জ সহীহ্ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। ফরয হজ্জের বদলী আদায়ের ক্ষেত্রে যার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে, তার অক্ষম হওয়া শর্ত। কিন্তু নফল হজ্জের ক্ষেত্রে এরূপ শর্ত নেই (কান্য)। নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিধিত্ব জাইয আছে। কেননা,, নফলের ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। (৩) তৃতীয় শর্ত হল, যার বদলী হজ্জ আদায় করা হবে, তার নির্দেশ থাকা আবশ্যক। যার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে তার নির্দেশ ছাড়া বদলী হজ্জ জাইয হবে না। কিন্তু ওয়ারিছ তার মূরিছ (যার নিকট হতে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে)-এর অনুমতি ছাড়া বদলী হজ্জ আদায় করলে মূরিছের হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। (৪) চতুর্থ শর্ত হল, ইহ্রাম বাঁধার সময় ঐ

ব্যক্তির হজ্জের নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধা যার তরফ হতে ইহ্রাম বাঁধা হচ্ছে। উত্তম হল এ ভাবে নিয়ত করা, لبيك عن فلان আমি অমুকের পক্ষ হতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম। (৫) পঞ্চম শর্ত হল, যার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে, তার মাল দ্বারা বদলী হজ্জ আদায় করা। যদি হাজী ব্যক্তি নিজের মাল দ্বারা হজ্জ করে তবে বদলী হজ্জ আদায় হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার মাল দ্বারা হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে মারা যায় এবং পরে তার ওয়ারিছগণ তাদের নিজেদের মাল দ্বারা কাউকে বদলী হজ্জ করায়, তাহলেও এ হজ্জ আদায় হবে না[১]। (বাদাই') মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করার জন্য এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে টাকা-পয়সা প্রদান করল। অতঃপর হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জের কাজে নিজের পক্ষ হতেও কিছু টাকা ব্যয় করল। এরূপ অবস্থায় দেখতে হবে যে, যে পরিমাণ মাল তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা যদি হজ্জের জন্য যথেষ্ট হয়, তাতে কোন ক্ষতি হবে না এবং এতে নির্দেশদাতার বিরোধিতাও হবে না। অবশ্য সে নিজের তরফ থেকে যে পরিমাণ ব্যয় করেছে। استحسان এর আলোকে এ পরিমাণ মাল মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে উসূল করে নিতে পারবে। অবশ্য এরূপ উসূল করে নেওয়াকে قياس সমর্থন করে না। যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে এ পরিমাণ টাকা-পয়সা প্রদান করা হয়, যা হজ্জের জন্য যথেষ্ট নয়, তবে দেখতে হবে যে, হজ্জের কাজে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এর মধ্যে মৃত ব্যক্তির টাকার পরিমাণ বেশী হলে মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির টাকার পরিমাণ বেশী হয়, তবে মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হবে না। এটা استحسان এর কথা। কিন্তু قياس এর দৃষ্টিতে কোন অবস্থাতেই মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হবে না (মুহীত ঃ সুরুখসী)। (৬) ষষ্ঠ শর্ত হল, সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হজ্জ আদায় করা। সুতরাং কাউকে বদলী হজ্জ আদায় করার হুকুম করা হলে সে যদি পায়ে হেঁটে হজ্জ করে, তবে এ হজ্জের খরচের দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে এবং পরে তার পক্ষ হতে সওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে (বাদাই')।

৪. মাসআলা ঃ সহীহ্ মতে যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করাবে হজ্জ তার পক্ষ হতেই আদায় হবে। কাজেই এ হজ্জের দ্বারা হজ্জকারী ব্যক্তির ফরয হজ্জ আদায় হবে না (তাবয়ীন)। কেউ যদি কারো দ্বারা বদলী হজ্জ করাতে চায়, তবে উত্তম হল, এমন ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা, যে নিজের ফরয হজ্জ আগে আদায় করেছে। অবশ্য যে ব্যক্তি আগে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেনি এমন ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্জ করালে আমাদের মাযহাবে তাও জাইয হবে। এ অবস্থায় আদেশদাতার হজ্জই আদায় হবে (মুহীত)। "কিরমানী" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়ম-প্রণালী এবং হজ্জের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধে আলিম এরূপ কোন ব্যক্তিকে বদলী হজ্জ আদায়ের জন্য মনোনীত করা উত্তম। এমনি ভাবে উক্ত ব্যক্তি আযাদ, আকেল-বালিগ হওয়াও উত্তম (গায়াতুস সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)। কোন মহিলাকে দিয়ে বদলী হজ্জ করালে অথবা দাস-দাসী যদি মনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে বদলী হজ্জ আদায় করে, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে (মুহীতঃ সুরুখসী)।

১. ওসিয়তকারীর পক্ষ হতে এ হজ্জ গণ্য হবে না, হজ্জ অবশ্য হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে বদলী হজ্জ আদায়ের জন্য মনোনীত করে এবং সে তাদের উভয়ের পক্ষ হতে এক হজ্জের ইহ্‌রাম বাধে, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতে এ-ই হজ্জ আদায় হবে। কিন্তু আদেশদাতা ঐ দুই ব্যক্তির হজ্জ আদায় হবে না। যে খরচ ঐ দুই ব্যক্তি থেকে সে নিয়েছে, তা ফেরত দিতে হবে এবং এ হজ্জ তাদের কোন একজনকে দিয়ে দেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কিন্তু মাতা-পিতার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ আদায় করার পর তা তাদের কোন এক জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া জাইয আছে। দুই জনের পক্ষ হতে বদলী হজ্জ আদায় করার জন্য আদিষ্ট হয়ে কেউ যদি অনির্দিষ্টভাবে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং অনির্দিষ্টভাবে এক জনের পক্ষ হতে তা আদায় করার নিয়্যাত করে এবং এ ভাবে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ সম্পন্ন করে, তাহলে এতে আদেশদাতার বিরোধিতা হবে। কিন্তু ইহ্‌রামের পর হজ্জের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার পূর্বে কোন এক জনের কথা নির্দিষ্ট করে নিলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এতেও আদেশদাতার বিরোধিতা হবে। তাই এ হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতেই আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ হজ্জ ঐ ব্যক্তির হজ্জ বলেই গণ্য হবে, যার নাম সে নির্দিষ্ট করেছে। কিন্তু নিম্নের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কেউ যদি হজ্জ বা উমরার বিষয়টি নির্দিষ্ট না করে ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে পরবর্তী সময়ে এর কোন একটির কথা নির্দিষ্ট করে নেওয়া তার জন্য জাইয আছে (শরহুল মাজমা)। বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি ইহ্‌রামের সময় যার পক্ষ হতে হজ্জ করছে তার নাম সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন ভাবেই উল্লেখ না করে, তবে এর বিধান কি হবে এ সম্বন্ধে কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এ বিষয়ে ইমামদের সুস্পষ্ট কোন মতামত নেই। আমাদের মতে এ অবস্থায় কোন একজনের কথা নির্দিষ্ট করে নেওয়া দুরুস্ত আছে। এতে আদেশদাতার বিরোধিতা হবে না (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে শুধু হজ্জ বা শুধু উমরা করার আদেশ করে, এমতাবস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি কিরান হজ্জ আদায় করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে বিরুদ্ধাচরণকারী বলে গণ্য হবে এবং তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে استحسان এর দৃষ্টিতে এ হজ্জ আদেশদাতার পক্ষ হতেই আদায় হবে। এহুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতার পক্ষ হতে কিরান হজ্জের নিয়ত করে। কিন্তু আদিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজের অথবা অপর কোন ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ বা 'উমরার নিয়ত করে, তাহলে সে বিরুদ্ধাচরণকারী বলে বিবেচিত হবে এবং তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেউ যদি কাউকে শুধু হজ্জ করার জন্য হুকুম করে ঐ অবস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি প্রথমে 'উমরা আদায় করে, অতঃপর মক্কা শরীফ হতে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে, তাহলে সমস্ত ইমামের মতে সে বিরুদ্ধাচরণকারী বলে বিবেচিত হবে (মুহীত)। খানিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এ হজ্জ দ্বারা হজ্জকারীর ফরয হজ্জ আদায় হবে না (তাতারখানিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাউকে উমরা করার জন্য হুকুম করে, এ অবস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি প্রথমে 'উমরা আদায় করে এবং পরে নিজের জন্য হজ্জ আদায় করে, তাহলে বিরুদ্ধাচরণকারী বলে গণ্য হবে না। কিন্তু প্রথমে হজ্জ করে পরে উমরা আদায় করলে ফকীহ্‌দের মতে সে বিরুদ্ধাচরণকারী বলে গণ্য হবে (মুহীত)। যদি কাউকে এক ব্যক্তি হজ্জ করার জন্য এবং অপর ব্যক্তি উমরা করার জন্য হুকুম করে এবং তারা যদি উভয় কাজ একত্রে আদায় করার জন্য হুকুম না করে থাকে, এমতাবস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করে, তাহলে উভয়ের মাল ফেরত দিয়ে দিতে হবে। আর তারা যদি একত্রে আদায় করার জন্য হুকুম করে থাকে, তবে হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করা জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

৮. মাসআলা ঃ বদলী হজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি আসা-যাওয়ার যাবতীয় খরচ আদেশদাতার মাল থেকে নির্বাহ করবে (সিরাজিয়্যা)। কেউ যদি কাউকে বদলী হজ্জ আদায়ের জন্য এভাবে নির্দিষ্ট করে যে, সে হজ্জ আদায়ের পর মক্কা শরীফ রয়ে যাবে, তবু হজ্জ আদায় হবে। অবশ্য উত্তম হল, হজ্জ সম্পাদন করে পুনরায় ঐ স্থানে ফিরে আসা। বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি হজ্জ শেষে মক্কায় পনের বা ততোধিক দিন অবস্থান করার নিয়ত করে, তবে এ সময়ের খরচ নিজের মাল থেকে নির্বাহ করতে হবে। আদেশকারী ব্যক্তির মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করলে এর ভর্তুকি আদায় করতে হবে। যদি ইমামতের নিয়ত করা ব্যতীত এমনিই কয়েক দিন মক্কায় অবস্থান করে, তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মত হল, হজ্জের পর অন্যান্য লোকেরা সাধারণত যত দিন সেখানে অবস্থান করে থাকে, সে যদি ঐ পরিমাণ সময় অবস্থান করে, তাহলে সে যার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ আদায় করছে তার মাল থেকেই ব্যয় নির্বাহ করবে। কিন্তু উক্ত সময় হতে অতিরিক্ত সময় অবস্থান করলে নিজের মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। আগেকার যমানায় এ হুকুম প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে কাফেলা ছাড়া একা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মক্কা হতে রওয়ানা করা সম্ভব নয়। কাজেই কাফেলার অপেক্ষায় যত দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে, ততদিন পর্যন্ত যার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করছে তার মাল থেকেই ব্যয় নির্বাহ করবে। এমনিভাবে বাগদাদে যতদিন অবস্থান করবে, ততদিনের ব্যয়ও যার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ আদায় করছে, তার মাল থেকেই নির্বাহ করবে। হজ্জের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়ার দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাফেলার আসা-যাওয়ার জন্য যতদিন সময় লাগবে, তাই স্টাণ্ডারস সময় হিসাবে গণ্য হবে।

৯. মাসআলা ঃ হজ্জের কর্মকাণ্ড থেকে ফারিগ হওয়ার পর মক্কা শরীফে পনের বা ততোধিক দিন অবস্থানের নিয়্যাত করলে আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করার আর অধিকার থাকে না। কিন্তু সে যদি এর পরই বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে, তাহলে এ অবস্থায় সে আদেশদাতার মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে কিনা? এ সম্বন্ধে ইমাম কুদূরী "শরহে মুখতাসারুত তাহাবী" তে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ অবস্থায় বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি আদেশদাতার মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। এটাই যাহিরী রিওয়ায়েত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ অবস্থায় সে আদেশদাতার মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে না। এ মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কেউ মক্কা শরীফে বাড়ীঘর না বানায়। কিন্তু মক্কা শরীফে বাড়ীঘর বানালে এবং এরপর বাড়ীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে সে আর আদেশদাতার মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেনা। এতে কারো দ্বিমত নেই (বাদাই')।

১০. মাসআলা ঃ বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি হজ্জের দিনসমূহ আসার আগেই বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে যায়, তবে বাগদাদ বা কূফা পৌছা পর্যন্ত সে আদেশদাতার মাল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে। সেখানে পৌছে যতদিন অবস্থান করবে এ সময়ের ব্যয় নিজের মাল থেকে নির্বাহ করবে। এরপর হজ্জের মাস আসলে যখন এখান থেকে পুনরায় রওয়ানা করবে, তখন আদেশদাতা মৃত ব্যক্তির মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করবে। যাতে মৃত ব্যক্তির মাল থেকে পথ খরচ নির্বাহ করার শর্তটি পুরা হয়ে যায়। (মুহীতঃ সুরুখসী)। বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি নিজের কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার হজ্জ ফওত হয়ে যায়, তাহলে তাকে এ মালের জরিমানা আদায় করতে হবে। যদি সে পরবর্তী বছর নিজের মাল দ্বারা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করে, তবে জাইয হবে। যদি আসমানী মুসীবতের কারণে বা উটের উপর থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে হজ্জ ফওত হয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে অতীতে যে টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে না। অবশ্য প্রত্যাবর্তন করার সময় নিজের মাল থেকে পথ খরচ আদায় করতে হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি দূরবর্তী কোন রাস্তায় যাত্রা করে যা ব্যয়বহুল, তবে হজ্জযাত্রীরা যদি ঐ পথেও যাতায়াত করে, তাহলে এরূপ রাস্তায় যাওয়া তার জন্য জাইয হবে (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ হজ্জের জন্য ওসিয়ত করার মাসাইল

১. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সে যদি হজ্জ না করে মারা যায় এবং এ ব্যাপারে কাউকে ওসিয়তও না করে যায়, তবে সে গুনাহ্গার হবে[১]। এতে কারো দ্বিমত নেই। যদি কোন ওয়ারিছ তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে চায়, তবে করতে পারবে। এতে আশা করা যায়, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তার পক্ষ হতে তা কবূল করে নিবেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজ্জের ওসিয়ত করে মারা গেলেই হজ্জ যিম্মা থেকে রহিত হবে না। যখন কেউ তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবে, তখন বৈধতার সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলে আমাদের নিকট এ হজ্জ আদায় হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ (১) ওসিয়তকারী মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জকারীর হজ্জ আদায়ের নিয়্যাত করা। (২) ওসিয়তকারী ব্যক্তির মাল দ্বারা হজ্জের পূর্ণ ব্যয় বা অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ করা। অন্য কেউ অনুগ্রহপূর্বক হজ্জের যাবতীয় খরচ প্রদান করলে এতে ওসিয়তের হজ্জ আদায় হবে না। (৩) সওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করা। পায়ে হেঁটে নয়। (৪) মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ সম্পাদন করা। ওসিয়ত করার সময় এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ করানোর ওসিয়ত করুক বা সাধারণ ভাবে তার পক্ষ হতে হজ্জ করানোর ওসিয়ত করুক এতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (বাদাই')।

২. মাসআলা ঃ "কোন্ স্থান থেকে হজ্জ করতে যাবে" ওসিয়তের সময় যদি তা উল্লেখ না করা হয়, তাহলে আমাদের ইমামদের মতে ওসিয়তকারীর বাড়ী থেকেই যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা তার বাড়ী থেকে হজ্জ করা সম্ভব হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সম্পদের এক- তৃতীয়াংশের দ্বারা তার বাড়ী থেকে হজ্জ করা সম্ভব না হলে যেখান থেকে সম্ভব সেখান থেকেই হজ্জ করাবে (মুহীত)। যদি তার বাড়ী না থাকে, তবে যে স্থানে মৃতুবরণ করেছে, সে স্থান থেকে হজ্জ করাবে (শরহুত্ তাহাবী)। যদি তার কয়েকটি বাড়ী থাকে, তবে যে বাড়ী মক্কা শরীফের বেশী নিকটে ফকীহ্দের মতে সেখান থেকে হজ্জ করাবে। দূরবর্তী বাড়ী থেকে নয় (তাতারখানিয়া)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ শহর ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে যায়, তবে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা ঐ স্থান থেকেই হজ্জ করাবে, যে স্থানের কথা সে বর্ণনা করেছে। এ স্থানটি মক্কা শরীফের নিকটে হোক বা দূরে হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যাতায়াতের ব্যয় ভার নির্বাহ করার পর হজ্জকারী ব্যক্তির হাতে যদি কিছু টাকা-পয়সা রয়ে যায়, তাহলে এ গুলো মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের নিকট ফেরত দিতে হবে। এ অবশিষ্ট টাকা থেকে কিছু নেওয়া তার জন্য জাইয নেই (বাদাই')।

---

১. অর্থাৎ ফরয তরকের মহাপাপ হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা তার বাড়ী থেকে হজ্জ করানো সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও ওসী অর্থাৎ যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে, সে যদি অন্য স্থান হতে হজ্জ করায়, তাহলে ওসী এ টাকার ভর্তুকি প্রদান করবে। এ হজ্জ তার হজ্জ হিসাবে গণ্য হবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে পুনরায় হজ্জ করাতে হবে। কিন্তু যে স্থান থেকে হজ্জ করানো হয়েছে, তা যদি মৃত ব্যক্তির বাড়ীর এমন নিকটবর্তী হয় রাত্রির আগেই সেখানে পৌছে আবার ফিরে আসা যায়, তাহলে ওসীর উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে সে যদি কারো দ্বারা কোন স্থান থেকে হজ্জ করায় এবং হজ্জের পর মৃত ব্যক্তির এক–তৃতীয়াংশ মাল থেকে কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট রয়ে যায় আর এ কথা জানা যায় যে, এ পরিমাণ টাকা –পয়সা দ্বারা আরো দূরবর্তী স্থান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব ছিল, তবে ওসীকে এ মালের দায়–দায়িত্ব বহন করতে হবে। পরে এ পরিমাণ মাল দ্বারা যে স্থান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব ঐ স্থান থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য হজ্জ করাবে। কিন্তু রসদপত্র এবং লেবাস–পোশাক থেকে যা রয়ে গেছে, তা যদি একেবারেই সামান্য হয়, তাহলে যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে, সে ওসিয়তকারীর বিরুদ্ধাচরণকারী বলে গণ্য হবে না। এ অবস্থায় অবশিষ্ট টাকা –পয়সা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের নিকট ফেরত দিতে হবে (যহীরিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ শহর থেকে সফর করে অন্য এমন কোন শহরে যায়, যা মক্কা শরীফের খুবই নিকটে, এ অবস্থায় সে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ সফর করে থাকে, তবে সমস্ত ইমামের মতে তার নিজ শহর থেকে হজ্জ করাতে হবে। আর হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে রাস্তায় মারা গেলে এবং হজ্জ করানোর জন্য ওসিয়ত করে গেলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)–এর মতে যেখানে পৌছেছে, সেখান থেকে হজ্জ করাতে হবে (বাদাই')। "যাদ" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতটি সহীহ্ (মুযমারাত)। কেউ যদি হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়ে কোন স্থানে এমন দীর্ঘ সময় অবস্থান করে যে, হজ্জের মওসুম শেষ হয়ে যায় এবং আরেক বছর চলে আসে। এমতাবস্থায় সে যদি রাস্তায় মারা যায় এবং তার পক্ষ হতে হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে যায়, তবে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে তার নিজ শহর থেকে হজ্জ করাতে হবে (গায়াতুস সুরূজী লি শরহিল হিদায়া)।

৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ওসিয়ত করে গেল যে, আমার পক্ষ হতে হজ্জ করাবে। এক ব্যক্তি উক্ত ওসিয়ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হজ্জে রওয়ানা করল। অতঃপর সে রাস্তায় মারা গেল। এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে ওসিয়তকারী মৃত ব্যক্তির এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা তার বাড়ী থেকে অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করাবে (তাবয়ীন)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার বাড়ী থেকে এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ করানো সম্ভব হয়। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে استحسان এর দৃষ্টিতে সে যেখানে পৌছে মারা গেছে, সেখান থেকে কারো দ্বারা হজ্জ করাবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। কোন ব্যক্তি নিজের হজ্জের জন্য ওসিয়ত করল। অতঃপর যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে, সে একজনকে তার পক্ষ হতে হজ্জ করার জন্য নির্ধারণ করল। এ অবস্থায়

হজ্জের যাবতীয় খরচ হজ্জকারী ব্যক্তির সফরে বের হওয়ার পূর্বে অথবা সফরে বের হওয়ার পর রাস্তায় অথবা ওসীর নিকট থেকে যদি ধ্বংস বা চুরি হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর মতে মৃত ব্যক্তির অবশিষ্ট এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা পুনরায় তাকে হজ্জ করাবে (তামারতাশী ও তাতারখানিয়া)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কয়েক হজ্জের ওসিয়ত করে এবং তার নিকট এক হজ্জ আদায় করার টাকা মওজুদ থাকে, অতিরিক্ত হজ্জ আদায় করার টাকা বিদ্যমান না থাকে, তবে তার পক্ষ হতে একই হজ্জ করাতে হবে। বাকীগুলো ওয়ারিছদের হাওয়ালা করে দিবে (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহল হিদায়া)। কেউ যদি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক–তৃতীয়াংশ দ্বারা হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে এবং তা এ পরিমাণ মাল হয় যে, এর দ্বারা কয়েক হজ্জ আদায় করা যায়, তাহলে সে যদি এ কথা বলে থাকে যে, আমার এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা আমার পক্ষ হতে একটি হজ্জ করাবে অথবা বলল যে, احجوا عنى ثبلث مالى حجة তবে তার পক্ষ হতে একটি হজ্জ করাতে হবে। আর যদি বলে, احجوا عنى ثبلث مالى "আমার এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা আমার পক্ষ হতে হজ্জ করাবে"। তবে তার মালের দ্বারা যতটি হজ্জ করানো যায় করাবে। যাতে এক–তৃতীয়াংশ মালের কিছুই আর অবশিষ্ট না থাকে। একাধিক হজ্জ করানোর ক্ষেত্রে ওসী অর্থাৎ যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে সে স্বাধীন। ইচ্ছা করলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে একই বছর কয়েক হজ্জ করাতে পারবে। আর যদি ইচ্ছা করে, তবে এক ব্যক্তি দ্বারা এক বছর এক একটি করে হজ্জ করাবে। তবে প্রথমটি উত্তম। মৃত ব্যক্তির এক– তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা একাধিক হজ্জ করানোর পর কিছু টাকা যদি ওসীর হাতে অবশিষ্ট থেকে যায় এবং এ টাকা দ্বারা যদি তার নিজ বাড়ী হতে হজ্জ করানো সম্ভব না হয় বরং নিকটবর্তী মীকাত অথবা মক্কা শরীফ থেকে বা অনুরূপ কোন স্থান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব হয়, তবে ঐ স্থান থেকেই কারো দ্বারা হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করবে। অবশিষ্ট টাকা ওয়ারিছদের নিকট ফেরত দিবে না (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি এ ভাবে ওসিয়ত করে যে, তার এক–তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা যেন প্রত্যেক বছর একটি করে হজ্জ করানো হয়, তবে এর বিধান কি হবে, তা "আসল" গ্রন্থে উল্লেখ নেই। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ বিষয়টিও দ্বিতীয়টির মত। অর্থাৎ ওসী তার পক্ষ হতে প্রতিবছর একটি করে হজ্জ করাবে। যদি কোন মৃত ব্যক্তি ওসীকে এ কথা ওসিয়ত করে যায় যে, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হজ্জ করবে, তাকে এ মাল প্রদান করবে। এ অবস্থায় এ মাল দ্বারা নিজে হজ্জ করা ওসীর জাইয নেই। যদি মৃত ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে যায়, অতিরিক্ত কিছু না বলে, তবে ওসী নিজে তার মাল দ্বারা তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে। ওসী যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ হয় অথবা ওয়ারিছকে যদি হজ্জ করার জন্য মাল দিয়ে দেয়, তবে ওয়ারিছগণ সকলে অনুমতি দিলে এবং তারা সকলে বালিগ হলে জাইয হবে। আর যদি তারা অনুমতি না দেয়, তবে জাইয হবে না। কেউ যদি তার নিজের মাল দ্বারা হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে এ অবস্থায় কোন ওয়ারিছ বা অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তি যদি দয়া পরবশ হয়ে হজ্জের জন্য তাদের মাল প্রদান করে, তবে জাইয হবে না। কোন মৃত ব্যক্তি হজ্জের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাপারে ওসিয়ত করার পর তার কোন ওয়ারিছ যদি নিজের মাল প্রদান করে কারো দ্বারা হজ্জ সম্পাদন করায় এবং ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তির মাল থেকে আমি আমার পাওনা উসূল করে নিব, তাহলে জাইয আছে এবং মৃত ব্যক্তির মাল থেকে তার পাওনা উসূল করে নেওয়াও তার জন্য বৈধ হবে। যাকাত এবং কাফ্ফারার ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কোন অপরিচিত ব্যক্তি এরূপ করলে তা জাইয হবে না। কোন মৃত ব্যক্তি হজ্জের ব্যাপারে ওসিয়ত করার পর তার কোন ওয়ারিছ যদি নিজের টাকা-পয়সা ব্যয় করে কারো দ্বারা হজ্জ সম্পাদন করায় এবং এ টাকা ফেরত নেওয়ার যদি তার খেয়াল না থাকে, তবু মৃত ব্যক্তির ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন মৃত ব্যক্তি এভাবে ওসিয়ত করে যে, তার পক্ষ হতে যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, হজ্জ করার পর যদি তার নিকট কিছু টাকা-পয়সা অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে তা তারই, এভাবে ওসিয়ত করা জাইয আছে এবং ওসিয়ত অনুসারে উক্ত ব্যক্তি অবশিষ্ট টাকা ভোগ করতে পারবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেউ যদি এ মর্মে ওসিয়ত করে যে, তার পক্ষ হতে যেন একশত দিরহাম দ্বারা হজ্জ করানো হয়, তবে একশত দিরহাম দ্বারা যেখান থেকে হজ্জ করানো যায় হজ্জ করাবে। যদি তার এক- তৃতীয়াংশ মাল একশত দিরহাম পরিমাণ না হয়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা যেখান থেকে হজ্জ করানো যায় হজ্জ করাবে। কিন্তু ওসিয়ত বাতিল হবে না। এমনি ভাবে কেউ যদি নির্দিষ্ট একশত দিরহাম দ্বারা হজ্জ করানোর জন্য ওসিয়ত করে এ অবস্থায় যদি এর থেকে এক বা একাধিক দিরহাম হারানো যায়, তাহলে অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা হজ্জ করাতে হবে। এ অবস্থায়ও ওসিয়ত বাতিল হবে না (শরহুত তাহাবী)।

১০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিছদেরকে এভাবে ওসিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম এবং ফকীর-মিসকীনদেরকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করবে আর এক হাজার দিয়ে আমার ফরয হজ্জ করাবে। এ অবস্থায় তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল যদি দুই হাজার দিরহাম পরিমাণ হয়, তাহলে এই মাল তিন ভাগ করবে। যদি হজ্জের খরচ কম হয়, তবে মিসকীনদের অংশ হতে পূর্ণ করে দিবে। আর যদি বেশী হয়, তবে তা মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে। কেউ যদি হজ্জের জন্য ওসিয়ত করে এবং হাজার দিরহাম নির্দিষ্ট করে দেয় যা বর্তমানে চালু নেই, তবে তা বদলিয়ে নিবে। ইচ্ছা করলে এর সমমূল্যের দীনারও প্রদান করতে পারবে। মৃত ব্যক্তি যাকে ওসিয়ত করেছে, সে যদি কাউকে হজ্জ করার জন্য বলে দেয় এবং প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সাও দিয়ে দেয়, এতদসত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ বছর হজ্জে না যায়-পরের বছর যায়, তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে এবং তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না (মুহীতঃ সুরুখসী)।

১১. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানের পর মারা যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। যদি না মরে, তবে এ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত না করে বাড়ী ফিরে আসলে তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য অপরিহার্য হবে ইহরাম ছাড়া নিজ খরচে পুনরায় মক্কা শরীফ গিয়ে বাকী কাজসমূহ সমাধা

করা (যখীরা)। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করে হজ্জ ফাসিদ করে দেয়, তবে যে পরিমাণ টাকা-পয়সা তার হাতে নগদ আছে, তা ফেরত দিয়ে দিবে এবং পথে যা খরচ করেছে এর ভর্তুকি প্রদান করবে। আর পরবর্তী বছর নিজের টাকায় হজ্জ এবং উমরা আদায় করে দিবে। যদি আরাফায় অবস্থানের পর স্ত্রী-সহবাস করে, তবে হজ্জ ফাসিদ হবে না এবং কোনরূপ জরিমানাও তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কেউ ওসিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবে। এ অবস্থায় যার সম্বন্ধে ওসিয়ত করা হয়েছে, সে যদি মারা যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার পরিবর্তে অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করাবে। কিন্তু যদি এরূপ ওসিয়ত করে যে, আমার পক্ষ হতে অমুক হজ্জ করবে। সে ছাড়া অন্য কেউ হজ্জ করতে পারবে না, তবে তার পরিবর্তে অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করানো জাইয হবে না। যাকে হজ্জ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে এরূপ কোন ব্যক্তি যদি রাস্তায় মারা যায় এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে সে যদি অন্য কারো নিকট হজ্জের যাবতীয় খরচ দিয়ে দেয় মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য, তবে এরূপ করা তার জন্য জাইয হবে না। কিন্তু আদেশদাতা ব্যক্তির পক্ষ হতে এরূপ করার অনুমতি থাকলে তা জাইয হবে। যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে এরূপ ব্যক্তির জন্য সমীচীন হল, হজ্জের ব্যাপারে আদিষ্ট ব্যক্তিকে এভাবে অনুমতি প্রদান করা যে, রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সে যেন অন্য কারো দ্বারা এ হজ্জ সম্পাদন করিয়ে নেয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে সমস্ত টাকা-পয়সা খরচ করে ফেলে, তবে তার প্রত্যাবর্তনের জন্য পুনরায় টাকা-পয়সা প্রেরণ করা ওসীর উপর ওয়াজিব নয়। ওসী যদি হজ্জকারী ব্যক্তিকে এ কথা বলে দেয় যে, তোমার টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেলে ঋণ নিয়ে নিবে। আমি তা পরিশোধ করে দিব। এরূপ বলা জাইয আছে (মুহীত)। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যদি মীকাত বা মীকাতের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধে এবং তার সমুদয় মাল যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, এহেন অবস্থায় সে যদি নিজস্ব টাকা খরচ করে হজ্জের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে বাড়ী আসে, তবে ওসী থেকে ঐ টাকা উসূল করে নেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কিন্তু কাযীর হুকুমে এরূপ ব্যয় করে থাকলে নিতে পারবে (গায়াতুস্ সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)। যদি খরচের টাকা মক্কা শরীফ অথবা এর নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থানকালে ধ্বংস হয়ে যায় এ অবস্থায় আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের থেকে মাল খরচ করলে এ পরিমাণ টাকা-পয়সা সে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে উসূল করে নিতে পারবে (তাতারখানিয়া)।

১৪. মাসআলা ঃ হজ্জের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি যদি মজুরী দিয়ে কোন খাদিম নিয়োগ করে, তবে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি এমন বয়সের হয় যে, তার মত মানুষ নিজের কাজ নিজেই করতে পারে, তাহলে এই খাদিমের মজুরী তার নিজের মাল থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি তার মত বয়সের মানুষ নিজের কাজ নিজে করতে না পারে, তবে খাদিমের মজুরী মৃত ব্যক্তির মাল থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রদান করা হবে। হজ্জ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য জাইয আছে হাম্মামখানায় প্রবেশ করা এবং সেখানকার রক্ষণাবেক্ষণকারীদেরকে অন্যান্য হাজীদের ন্যায় কিছু প্রদান করা।

১৫. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায়ে আদিষ্ট ব্যক্তিকে টাকা-পয়সা প্রদান করার পর ওসী ইচ্ছা করলে তার নিকট থেকে তা ফেরত নিতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। টাকা-পয়সা ফেরত লওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি যদি বাড়ী যাওয়ার পথ খরচ চায়, তবে দেখতে হবে তার খিয়ানতের কারণে টাকা-পয়সা ফেরত নেওয়া হয়ে থাকলে সে নিজের খরচে বাড়ী যাবে। কিন্তু তার আকল দূর্বল হওয়ার কারণে বা হজ্জের মাসাইল না জানার কারণে টাকা-পয়সা ফেরত নেওয়া হয়ে থাকলে বাড়ী যাওয়ার পথ খরচ মৃত ব্যক্তির মাল থেকে বহন করতে হবে। আর যদি কোন প্রকার খিয়ানত বা অপবাদ না থাকা সত্ত্বেও এভাবে তার থেকে টাকা-পয়সা ফেরত নেওয়া হয়, তবে বাড়ী যাওয়ার খরচ ওসীর মাল থেকে প্রদান করতে হবে (মুহীত)। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায়ে আদিষ্ট ব্যক্তি প্রথমে হজ্জ করার পর যদি নিজের জন্য উমরা করে, তবে এ জন্য তাকে কোনরূপ জরিমানা আদায় করতে হবে না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সে উমরা আদায়ের কাজে মশগুল থাকবে, ততদিন পর্যন্ত নিজের খরচ নিজেই বহন করবে। উমরা আদায়ের পর মৃত ব্যক্তির মাল থেকে সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করবে (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ হাদী-র বিবরণ

এ পরিচ্ছেদে হাদী সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. মাসআলা ঃ হাদী-র পরিচয়। যে সব পশু কুরবানী করার উদ্দেশ্যে হরমে প্রেরণ করা হয়, এগুলোকে শরীআতে হাদী বলা হয় (তাবয়ীন)। কোন পশুকে পরিষ্কার ভাষায় হাদী বলে ঘোষণা করলে কিংবা হাদী বলে নিয়্যাত করলে অথবা মক্কা শরীফের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলে তা হাদী হিসাবে গণ্য হবে। ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিতে নিয়্যাত না করলেও তা হাদী বলে বিবেচিত হবে (আল-বাহ্‌রুর-রায়িক)। তিন প্রকার পশু হাদীর অন্তর্ভুক্ত। যথা উট, গরু ও ছাগল (হিদায়া)। আমাদের মাযহাবে এগুলোর মধ্যে সব চেয়ে উত্তম হাদী হল উট এরপর গরু এবং এরপর ছাগল (ফাতহুল কাদীর)। শুধু উট এবং গরুকে বাদানা বলা হয় (মুহীত ঃ সুরুখসী)।

২. মাসআলা ঃ যে যে পশু হাদী হিসাবে জাইয এবং যে যে পশু হাদী হিসাবে জাইয নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, যে সব পশু কুরবানী করা জাইয হাদী হিসাবেও জাইয। সব ক্ষেত্রেই বকরী হাদী হিসাবে জাইয। কিন্তু জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে কিংবা আরাফাতে অবস্থানের পর স্ত্রী-সহবাস করলে এই দুই ক্ষেত্রে বকরী হাদী হিসাবে জাইয নেই (হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ হাদী প্রেরণের ক্ষেত্রে যে যে কাজ সুন্নাত এবং যে সব কাজ মাকরূহ্। হাদীর গলায় কিলাদা[১] বাঁধা সুন্নত (মুহীত ঃ সুরুখসী)। নফল হজ্জ এবং তামাত্তু' ও কিরান হজ্জের হাদী-র গলায় কিলাদা বাঁধা বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে মানতের কারণে যে হাদী ওয়াজিব হয় এর গলায়ও কিলাদা বাঁধা হবে। কিন্তু ইহ্‌সার এবং জিনায়েতের হাদী-র গলায় মালা পরান হবে না। এতদসত্ত্বেও ইহসার এবং জিনায়েতের হাদী-র গলায় মালা পরালে জাইয আছে। এতে কোন ক্ষতি হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আমাদের মাযহাবে বকরীর গলায় মালা পরান সুন্নাত নয় (হিদায়া)।

৪. মাসআলা ঃ হাদী-র পশুর সাথে কিরূপ ব্যবহার জাইয এবং কিরূপ ব্যবহার জাইয নেই। এ সম্বন্ধে ফকীহ্‌গণ বলেন, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হাদী-র জানোয়ারের উপর সওয়ার হবে না। অনুরূপভাবে এর উপর কোন বোঝাও উঠাবে না। কেননা, হাদী-র তাযীম করা ওয়াজিব। কিন্তু বোঝা উঠালে বা সওয়ার হলে হাদী-র প্রতি অপমান করা হয়। সুতরাং হাদী-র উপর সওয়ার হওয়া বা এর উপর বোঝা উঠানো সবই হারাম (মুহীত ঃ সুরুখসী)। হাদী-র উপর সওয়ার হলে বা বোঝা উঠালে যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতির সমপরিমাণ জরিমানা আদায়

---

১. চামড়ার শিকল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা ওয়াজিব হবে। জরিমানার এ সব টাকা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। ধনীদেরকে দেওয়া জাইয হবে না (আল-বাহ্রুর রায়িক)। হাদী-র পশুর মধ্যে দুধেল উষ্ট্রী বা গাভী থাকলে তা দোহন করবে না। এর স্তনে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে। এতে দুধ বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। যবাহ্-এর সময় নিকটে হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি অনেক পরে যবাহ্ করা হবে বলে নিশ্চিত ধারণা থাকে এবং দুধ দোহন না করলে পশুর ক্ষতি হয়, তাহলে দোহন করবে। এবং তা সাদাকা করে দিবে। আর যদি এ দুধ নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তাহলে এ পরিমাণ দুধ বা এর মূল্য সাদাকা করে দিবে (কাফী)। অনুরূপভাবে এ দুধ যদি কোন ধনী ব্যক্তিকে প্রদান করে, তবে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)।

৫. মাসআলা ঃ যদি হাদী-র পশুর কোন বাচ্চা পয়দা হয়, তবে তা সাদাকা করে দিবে অথবা হাদী-র সাথে একেও যবাহ্ করবে। আর যদি বিক্রি করে, তবে মূল্য সাদাকা করে দিবে (তাবয়ীন)। যদি বাচ্চা মেরে ফেলে, তাহলে এর মূল্যের ভর্তুকি দিতে হবে। যদি এ মূল্য দ্বারা হাদী ক্রয় করে তা সাদাকা করে, তাহলে এটা উত্তম হবে (আল-বাহ্রুর রায়িক)। কেউ যদি হাদী সাথে নিয়ে যায় এবং রাস্তায় তা মারা যায়, তবে নফল হাদী হলে এর পরিবর্তে আরেকটি দিতে হবে না। আর ওয়াজিব হাদী হলে এর পরিবর্তে আরেকটি হাদী যবাহ্ করতে হবে। হাদী-র পশু যদি পথিমধ্যে অনেক দোষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবু এর পরিবর্তে আরেকটি প্রেরণ করতে হবে। আর দোষ যুক্ত-পশুটি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে (কাফী)। বিত্তশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি বিত্তহীন হয়, তাহলে এই দোষযুক্তটি যবাহ্ করাই জাইয হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ হাদী-র উট যদি রাস্তায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে তা নফল হাদী হয়ে থাকলে একে নহর করবে এবং এর চপ্পল রক্ত রঙ্গীন করে চুটের এক পার্শ্বে মারবে। এ পশুর গোশত দাতা নিজে ভক্ষণ করবে না এবং কোন ধনী ব্যক্তিকেও হাদিয়া দিতে পারবে না। বরং তা সম্পূর্ণরূপে সাদাকা করে দিবে। বস্তুত হাদী-র জানোয়ারকে হিংস্র পশুর জন্য রাস্তায় ফেলে না রেখে এরূপ করাই উত্তম। আর যদি তা ওয়াজিব হাদী হয়ে থাকে, তবে এর পরিবর্তে আরেকটি হাদী ক্রয় করবে এবং এটাকে যা ইচ্ছা করতে পারবে (কাফী)। নফল হাদী হরমে পৌঁছার পর কুরবানীর দিনের আগে যদি তা মারা যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে এর মধ্যে যদি এমন দোষ পরিলক্ষিত হয় যে এ অবস্থায় এর দ্বারা আদায় হতে পারে না, তাহলে যবাহ্ করে এর গোশত সাদাকা করে দিবে। নিজে খেতে পারবে না। আর যদি ত্রুটি সামান্য হয় অর্থাৎ এ অবস্থায়ও যদি এর দ্বারা ওয়াজিব আদায় করা জাইয হয়, তবে যবাহ্ করে এর গোশত সাদাকা করে দিবে এবং নিজেও তা খেতে পারবে।। কিন্তু তামাত্তু' হজ্জের হাদী-র হুকুম এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তামাত্তু' হজ্জের হাদী যদি কুরবানীর দিনের আগে হরম শরীফের মধ্যে হালাকের উপক্রম হয়ে যায়, অতঃপর তা যবাহ্ করা হয়, তাহলে এতে হাদীর কুরবানী আদায় হবে না।

৭. মাসআলা ঃ কারো হাদী-র জানোয়ার চুরি হয়ে যাওয়ার পর এর পরিবর্তে আরেকটি খরীদ করে তার গলায় মালা পরিয়ে হরমের দিকে রওয়ানা করানোর পর যদি প্রথমটি পাওয়া যায়,

এ ক্ষেত্রে উভয়টি যবাহ্ করা উত্তম। যদি প্রথমটি যবাহ্ করে পরেরটি বিক্রি করে দেয়, তবে জাইয আছে। আর দ্বিতীয়টি যবাহ্ করে প্রথমটি বিক্রি করে দিলে দ্বিতীয়টির মূল্য প্রথমটির সমপরিমাণ বা এর চেয়ে অধিক হলে উক্ত ব্যক্তির কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কম হয়, তাহলে যে পরিমাণ কম হবে এ পরিমাণ সাদাকা দিতে হবে (মুহীত)। সহীহ্ মতে নফল হাদী কুরবানীর দিনের আগে যবাহ্ করা জাইয আছে (কাফী)। অবশ্য কুরবানীর দিন যবাহ্ করা উত্তম (তাবয়ীন)। তামাত্তু' এবং কিরান হজ্জের হাদী কুরবানীর দিন[1] ব্যতীত অন্য কোন দিনে যবাহ্ করা জাইয নেই (হিদায়া)। সুতরাং এরূপ হাদী কেউ যদি কুরবানীর দিনের আগে যবাহ্ করে, তবে কোন ইমামের মতেই তা জাইয হবে না। আর যদি কুরবানীর দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যবাহ্ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে ওয়াজিব তরককারী বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে তার উপর একটি দম তথা কুরবানী ওয়াজিব হবে। (আল-বাহ্রুর রায়িক)। এ ছাড়া অন্যান্য যত হাদী আছে, তা যে কোন সময় যবাহ্ করা জাইয। হরম ছাড়া অন্য কোন স্থানে হাদী-র পশু যবাহ্ করা জাইয নেই (হিদায়া)।

৮. মাসআলা ঃ এ সব পশুর গোশত হরম এবং হরমের বাইরের এলাকার মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া জাইয। অবশ্য হরমের এলাকার মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উত্তম। কিন্তু হরমের বাইরের এলাকার লোকেরা যদি বেশী অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদেরকে দান করা উত্তম (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)। যে পশুর গোশত কুরবানীদাতার জন্য খাওয়া জাইয ঐ পশুর পূর্ণ গোশত দান করা ওয়াজিব নয়। বরং এ জাতীয় পশুর এক-তৃতীয়াংশ গোশত সাদাকা করা মুস্তাহাব। আর যে পশুর গোশত কুরবানীদাতার খাওয়া জাইয নেই এর গোশত পুরাটাই সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। এরূপ কোন পশু যদি যবাহ্র পর হালাক হয়ে যায়, তবে জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যে পশুর গোশত পুরাটাই সদকা করা ওয়াজিব এরূপ কোন পশু কেউ যদি নিজে হালাক করে ফেলে, তবে এর মূল্য জরিমানা স্বরূপ আদায় করতে হবে এবং তা সাদাকা করে দিতে হবে। আর যে পশুর গোশত সাদাকা করা ওয়াজিব নয় তা নিজে হালাক করে ফেললে এতে কোনরূপ জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কুরবানীদাতার জন্য যে সব হাদী-র গোশত খাওয়া জাইয এবং যে সব হাদী-র গোশত খাওয়া জাইয নেই, সব রকমের হাদী-র গোশতই বিক্রি করা বৈধ। অবশ্য বিক্রির পর সমস্ত টাকা সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৯. মাসআলা ঃ হাদী কুরবানীকারী ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হল, নফল হাদী হরমে পৌঁছার পর এর গোশত থেকে কিছু আহার করা। তামাত্তু' এবং কিরান হজ্জের হাদী-র হুকুমও অনুরূপই (তাবয়ীন)। এই গোশত থেকে ধনী ব্যক্তিদেরও আহার করানো জাইয। এছাড়া যত প্রকার হাদী আছে সেগুলোর গোশত খাওয়া জাইয নেই। যেমন কাফ্ফারা, মানত ও ইহসানের হাদী এবং নফল হাদী যা হরমে গিয়ে পৌঁছেনি (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। হাদী-র পশু আরাফার ময়দানে নিয়ে যাওয়া ওয়াজিব নয়। অবশ্য তামাত্তু' এবং কিরানের হাদী আরাফাতে নিয়ে যাওয়া ভাল।

১০. মাসআলা ঃ উটকে নহর করা এবং গরু, বকরী ইত্যাদি যবাহ্ করা উত্তম। খাড়া

১. ১০ অথবা ১১, ১২ই যিলহজ্জ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থায় উট নহর করবে। শোয়া অবস্থায় নহর করাও জাইয। অবশ্য প্রথমটি উত্তম। গরু বা বকরী দাঁড় করিয়ে যবাহ্ করবে না। বরং শোয়ান অবস্থায় যবাহ্ করবে। জমহুর ফকীহ্দের মতে কিবলামুখী করে যবাহ্ করা মুস্তাহাব। নিজে ভালভাবে যবাহ্ করতে পারলে নিজের পশু নিজে কুরবানী করাই উত্তম (তাবয়ীন)। কুরবানীর পশুর লাগাম, রশি ইত্যাদি সদকা করে দিবে। কসাইর মজুরী এর দ্বারা পরিশোধ করবে না (কান্য)। অধিকাংশ আলিমের মতে কসাইকে মজুরী হিসাবে গোশত প্রদান না করে সাদাকা হিসাবে প্রদান করা জাইয। অবশ্য মজুরী হিসাবে গোশত প্রদান করলে দাতাকে এর জরিমানা আদায় করতে হবে (গায়াতুস সুরুজী ঃ শরহুল হিদায়া)।

১১. মাসআলা ঃ হাদী মানত করার বর্ণনা। যদি কেউ বলে, "আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর একটি হাদী ওয়াজিব", তবে তিন প্রকার হাদী-র যেটির নিয়্যাত করবে, তাই তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি কোন বিশেষ পশুর নিয়্যাত না করে, তবে আমাদের মাযহাব মতে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে। আর কেউ যদি বলে "আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর একটি উট ওয়াজিব", তবে দুই প্রকারের কোন প্রকার নির্দিষ্ট করে থাকলে তাই ওয়াজিব। যদি নির্দিষ্টভাবে কোন প্রকারের নিয়্যাত না করে থাকে, তবে উভয় প্রকারের যেটি ইচ্ছা আদায় করতে পারবে (মুহীত)। মানত করে নিজের উপর বাদানা ওয়াজিব করলে তা যেখানে ইচ্ছা কুরবানী করতে পারবে। কিন্তু মানতের সময় মক্কা শরীফ যবাহ্ করার নিয়্যাত করে থাকলে এ পশু মক্কা শরীফ ছাড়া অন্য কোন স্থানে যবাহ্ করা জাইয হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বাদানা মক্কা শরীফেই যবাহ্ করতে হবে। "জাযূর" মানত করলে উট যবাহ্ করতে হবে (বাদাই')। হাদী মানত করলে উট যবাহ্ করতে হবে (বাদাই')। হাদী মানত করলে তা হরমে যবাহ্ করতে হবে। আর জাযূর মানত করলে তা হরমের বাইরেও যবাহ্ করা জাইয হবে (শরহ মাজমা'ইল বাহ্রায়ন)। কেউ যদি বলে "আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে একটি বকরী হাদী করব" এ ক্ষেত্রে উট হাদী করলে তাও জাইয হবে। মানতের মধ্যে যে পশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অনুরূপ কিংবা তার থেকে উত্তম বা তার মূল্য আদায় করলেও মানত আদায় হয়ে যাবে (মাবসূত ঃ ইমাম সুরুখসী)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের মানত সম্বন্ধে বর্ণনা

১. মাসআলা ঃ কোন বান্দার মধ্যে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর হজ্জ ওয়াজিব করেন। একে ইসলামী হজ্জ বলা হয়। অনুরূপ ভাবে বান্দার পক্ষ হতে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেলেও আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর হজ্জ ওয়াজিব করেন। যেমন কেউ বলল, "আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার যিম্মায় একটি হজ্জ ওয়াজিব" অথবা বলল, "আমার উপর একটি হজ্জ ওয়াজিব, তবে হজ্জের মানত সহীহ্ হবে এবং তার উপর একটি হজ্জ ওয়াজিব হবে। মানতের মধ্যে কোন শর্ত আরোপ করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতেই এরূপ হুকুম হবে। শর্ত আরোপ করলে এভাবে বলবে, আমি যদি এরূপ করি তাহলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। এভাবে মানত করলে শর্ত পাওয়া গেলে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বর্ণনা মতে কাফ্ফারা আদায় করে মানত থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না (বাদাই')।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ শর্তের সাথে হজ্জের মানত করে এরপর পুনরায় আরেকটি শর্ত আরোপ করে, এ ক্ষেত্রে শর্ত দুটো পাওয়া গেলে উক্ত ব্যক্তির উপর একটি হজ্জ ওয়াজিব হবে। এই হুকুম ঐ সময়ই প্রযোজ্য হবে যদি সে দ্বিতীয় মানতের সময় বলে, আমার উপর ঐ হজ্জই ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে, "আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর ইহ্রাম ওয়াজিব অথবা আমার উপর হজ্জের ইহ্রাম ওয়াজিব", তবে তার উপর হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হবে। এতদুভয়ের থেকে যেটা ইচ্ছা সে আদায় করতে পারবে। অনুরূপ কেউ যদি এমন শব্দ বলে যাতে ইহ্রাম ওয়াজিব হয়, যেমন বলল, "আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার দায়িত্ব বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত অথবা কা'বা পর্যন্ত অথবা মক্কা শরীফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া ওয়াজিব", তবে এরূপ বলা জাইয আছে এবং তার উপর হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হবে (বাদাই')। এটা ইসতিহ্সানেরও দাবী (মুহীত ঃ সুরুখসী)। যদি সে হজ্জ বা উমরার কোন একটি নির্দিষ্ট করে, তাহলে পায়ে হেঁটে হজ্জ বা উমরা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। পায়ে হেঁটে হজ্জ বা উমরা করতে গিয়ে সে কোথেকে হাঁটা আরম্ভ করবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ করবে এ বিষয়ে মাসআলা হল, হজ্জের ক্ষেত্রে তাওয়াফে যিয়ারতের পর এবং উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফ-সাঈর পর হাঁটা বন্ধ করবে। বস্তুত কোন্ জায়গা থেকে পায়ে হাঁটা আরম্ভ করবে এ বিষয়ে মাশায়িখে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যেখানে ইহ্রাম বাঁধবে সেখান থেকেই পায়ে হাঁটা আরম্ভ করবে। কারো কারো মতে বাড়ী থেকেই হেঁটে রওয়ানা করবে (মুহীত)। এটাই সহীহ্ মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি সওয়ার হয়ে রওয়ানা করে, তবে তার উপর দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ পথ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সওয়ার হয়ে গেলেও এ হুকুম হবে। আর যদি সামান্য কিছু দূর পর্যন্ত সওয়ার হয়ে যায়, তাহলে এ পথ পূর্ণ পথের তুলনায় যে পরিমাণ হবে কুরবানীর সেই পরিমাণ অংশ সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। "আসল" কিতাবে আছে, এরূপ মানতকারী ব্যক্তির বিষয়টি তার ইখতিয়ারাধীন থাকবে। সে পায়ে হেঁটে বা সওয়ার হয়ে যে কোন ভাবে ইচ্ছা যেতে পারবে। কিন্তু ফকীহ্গণ বলেন, প্রথমটি সহীহ্ (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, "আল্লাহ্র ওয়াস্তে পায়ে হেঁটে হরম শরীফ পর্যন্ত অথবা আল-মাসজিদুল হারাম পর্যন্ত যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব", তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এ মানত সহীহ্ হবে না এবং তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার মানত সহীহ্ হবে এবং তার উপর হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে "আমার উপর সাফা-মারওয়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া ওয়াজিব", তাহলে কোন ইমামের মতেই তার এ মানত সহীহ্ হবে না। কেউ যদি বলে, "আমার উপর বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাওয়া, বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বের হওয়া, বায়তুল্লাহ্র সফর করা অথবা বায়তুল্লাহ্ আসা ওয়াজিব", তাহলে কোন ইমামের মতেই এ মানত সহীহ্ হবে না। কেউ যদি বলে, এ বকরীটি বায়তুল্লাহ্, কা'বা, মক্কা, হরম, আল-মাসজিদুল হারাম অথবা সাফা-মারওয়ার উদ্দেশ্যে হাদী তবে "বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব" বললে যে হুকুম এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে (বাদাই')। কেউ যদি বলে দুইবার "আমার উপর ইসলামী হজ্জ ওয়াজিব", তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর এ বছরই দু'টি হজ্জ ওয়াজিব, তবে তার উপর দুই হজ্জ ওয়াজিব হবে। কেউ যদি বলে, "এ বছরই আমার উপর দশটি হজ্জ ওয়াজিব", তবে দশ বছরে দশ হজ্জ তার উপর ওয়াজেব হবে। অনুরূপভাবে একশত হজ্জের মানত করলেও তা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি বলে আমার উপর আল্লাহ্র ওয়াস্তে অর্ধ হজ্জ ওয়াজিব", তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর পূর্ণ হজ্জ ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি লাব্বাইকা বলে ইহ্রাম বাঁধার সময় এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, আমি এ হজ্জের মানত করলাম, তবে তাওয়াফে যিয়ারত করব না এবং আরাফায়ও অবস্থান করব না" এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ হজ্জ তার উপর ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর ত্রিশটি হজ্জ ওয়াজিব এবং ঐ বছরই যদি ত্রিশজন দ্বারা হজ্জ করায়, তবে হজ্জের সময় আসার আগেই সে মরে গিয়ে থাকলে সমস্ত হজ্জই আদায় হয়ে যাবে। আর যদি হজ্জের সময় সে জীবিত থাকে এবং হজ্জ করতে সক্ষম থাকে, তবে তার একটি হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। এমনি ভাবে যখন এক এক বছর আসবে, তখন একটি করে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত)। যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি এভাবে মানত করে যে, যদি আল্লাহ্ আমাকে এই রোগ হতে মুক্ত করেন, তবে আমার উপর এক হজ্জ ওয়াজিব হবে। এভাবে মানত করার পর সুস্থতা লাভ করলে তার উপর একটি হজ্জ ওয়াজিব হবে। যদি আল্লাহ্র ওয়াস্তে না বলে তবু হজ্জ ওয়াজিব হবে। কেননা, হজ্জ তো আল্লাহ্র জন্যই হয়ে থাকে। যদি বলে আমি

সুস্থ হলে আমার উপর এক হজ্জ ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় ভাল হওয়ার পর সে যদি হজ্জ সম্পাদন করে, তাহলে এতে ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। যদি সে ফরয হজ্জ ছাড়া অন্য কোন হজ্জের নিয়্যাত করে, তবে তার নিয়্যাত সহীহ্ হবে (খুলাসা)।

আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা ঃ যদি আরাফার অধিবাসী কোন একদিন আরাফায় অবস্থান করে এবং একদল লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা একদিন পূর্বে আরাফায় উকূফ (অবস্থান) করেছে অর্থাৎ আটই যিলহাজ্জ তারা আরাফায় অবস্থান করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং পুনঃ অবস্থান করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা আরাফা দিবসের পর অর্থাৎ দশ তারিখে আরাফায় অবস্থান করেছে- তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তাদের হজ্জ জাইয হয়ে যাবে। এটা ইস্তিহ্সানের দাবী। যদি আট তারিখে কতিপয় লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আজ "আরাফার দিন", তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম যদি সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক নিয়ে দিনের বেলা আরাফায় অবস্থান করতে সক্ষম হয়, তাহলে কিয়াস এবং ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি দিনের শেষ ভাগের দিকেও অবস্থান না করে, তবে তাদের হজ্জ ফওত হয়ে যাবে। যদি লোকদেরকে নিয়ে দিনের বেলা অবস্থান করা সম্ভব না হয়, রাতের বেলা অবস্থান করা সম্ভব হয়, তবে ইসতিহ্সানের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যদি তারা অবস্থান না করে, তাহলে তাদের হজ্জ ফওত হয়ে যাবে। যদি অধিকাংশ লোক নিয়ে রাতের বেলায়ও আরাফায় অবস্থান করা সম্ভব না হয়, তবে এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইস্তিহ্সানের দৃষ্টিতে তাদেরকে পরের দিন আরাফায় অবস্থান করার আদেশ দেওয়া হবে। এ অবস্থায় অন্যান্য লোকদের যে হুকুম সাক্ষীদের জন্যও হুকুম তাই। অতএব, তারা যদি নিজেদের রায় অনুসারে আমল করে এবং অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফায় অবস্থান না করে তাহলে তাদের হজ্জ আদায় হবে না (তাবয়ীন)। এই অবস্থায় উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করা তাদের উপর ওয়াজিব।

২. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যদাতাগণ যদি এমন সময় সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের সাক্ষ্য মতে দিনের বেলা আরাফায় অবস্থান করা সম্ভব, তবে এ ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এমন সময় সাক্ষ্য দেয় যে, এ কথা শুনার পর দিনের বেলা আরাফায় অবস্থান করা আর সম্ভব নয় বরং রাতে অবস্থান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তাদের সাক্ষ্যের দরুন দিনের অবস্থান রাত্রে যেয়ে পড়ছে। তাই এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত কোন বিষয়ই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে (মুহীত)। মোটকথা হল, যদি সাক্ষ্য গ্রহণ করলে সকলের হজ্জই ফওত হয়ে যায়, তবে ইমাম এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। যদিও সাক্ষী অনেক থাকে। যদি সাক্ষ্য গ্রহণ করলে কতকের হজ্জ ফওত হয়ে যায় আর কতকে হজ্জ পায়, তবে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা ফরয হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তার সাথে যদি তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মাহরাম থাকে, তবে সে এ হজ্জ সম্পন্ন করবে (শরহুত তাহাবী)। যদি সাথে স্বামী থাকে এবং স্বামী তাকে হজ্জের অনুমতি দিয়ে থাকে, এ অবস্থায় উক্ত মহিলা যদি হজ্জের মাস আসার পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে স্বামী হালাল হওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে। অবশ্য হজ্জের মাস আসার পর ইহ্‌রাম বাঁধলে স্বামী তার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে না। যদি এমন দূরের বাশিন্দা হয় যে, সেখানকার লোকেরা হজ্জের মাসের আগেই হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে থাকে, এ অবস্থায় কোন মহিলা যদি শহরবাসী লোকদের রওয়ানা হওয়ার সময় নিজেও রওয়ানা করে, তাহলে স্বামী তার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে না। কিন্তু এ সময়ের পূর্বে রওয়ানা করে থাকলে স্বামী তার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে। অবশ্য যদি সামান্য কয়েকদিন পূর্বে ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে না (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কোন মহিলা যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তবে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে এবং হাদী ব্যতীত তাকে ইহ্‌রাম হতে মুক্ত করাতে পারবে। শুধু স্বামীর মুখের কথার ভিত্তিতে কোন মহিলা ইহ্‌রাম হতে মুক্ত হতে পারবে না। বরং তার সাথে এমন কোন কাজ করতে হবে, যা ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন নখ বা চুল কেটে দেওয়া, খোশবু লাগিয়ে দেওয়া, চুম্বন করা অথবা মুআনাকা করা ইত্যাদি। এগুলোর কোন একটি করলে সে ইহ্‌রাম হতে মুক্ত হতে পারবে। এ অবস্থায় মহিলার উপর ইহ্‌সারের হাদী এবং এক হজ্জ ও এক উমরা ওয়াজিব হবে। অতঃপর এ বছরই যদি তার স্বামী ইহ্‌রাম বাঁধার অনুমতি প্রদান করে এবং সে ইহ্‌রাম বাঁধে এ অবস্থায় উক্ত মহিলা কাযার নিয়্যাত করুক বা না করুক, তা কাযা হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং সেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। তার উপর উমরা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু প্রথম ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার কারণে তার উপর দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে। যদি বছর পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নিয়্যাত ছাড়া ঐ হজ্জ তার থেকে রহিত হবে না। এ ক্ষেত্রে তার উপর এক হজ্জ, এক উমরা এবং এক কুরবানী ওয়াজিব হবে (শরহুত তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন মহিলা নফল হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর যদি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়, তবে আমাদের মাযহাবে স্বামী তার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতে পারবে। কিন্তু ফরয হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে এবং মহিলার সাথে অন্য কোন মাহ্‌রাম থাকলে স্বামী তার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে না। অবশ্য মাহ্‌রাম সাথে না থাকলে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে (আল্‌বাহ্‌রুর রায়িক)। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে তার ইহ্‌রামের অবস্থায় না জেনে তার সাথে সহবাস করে, তবে এতে সে হালালকারী হবে না। কিন্তু তার হজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর জেনে-শুনে এরূপ করলে সে হালালকারী হিসাবে গণ্য হবে। স্বামী তার স্ত্রীর ইহ্‌রাম ভঙ্গ করানোর এক বছর পর যদি তাকে হজ্জ করার অনুমতি প্রদান করে, তবে স্ত্রীর উপর হজ্জ ও উমরা ওয়াজিব হবে। স্বামী স্ত্রীর ইহ্‌রাম ভঙ্গ করানোর পর স্ত্রী যদি আবারও ইহ্‌রাম বাঁধে এবং সে যদি আবারও ইহ্‌রাম ভঙ্গ করায়, এভাবে কয়েক বার করার পর ঐ বছরই যদি সে হজ্জ সম্পন্ন করে, তাহলে এক হজ্জই যথেষ্ট

হবে। যদি সে বছর হজ্জ না করে, তবে এক এক বার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার কারণে তার উপর একটি করে উমরা ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ গোলাম ও বাঁদী যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া ইহ্‌রাম বাঁধে, তবে সে তাদেরকে বাধা দিতে পারবে এবং হাদী ছাড়াই তাদের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে। অবশ্য আযাদ হওয়ার পর তাদের উপর ইহ্‌সারের হাদী এবং হজ্জ ও উমরার কাযা ওয়াজিব হবে। মনিব গোলাম বা বাঁদীকে হজ্জ করার অনুমতি দেওয়ার পর তারা যদি রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে মনিব তাদের পক্ষ হতে হাদী প্রেরণ করতে পারবে। অতঃপর তা হরমে যবাহ্ করার পর তারা ইহ্‌রাম হতে মুক্ত হবে (শরহুত তাহাবী)। গোলাম বা বাঁদীকে হজ্জ করার অনুমতি দেওয়ার পরও মনিব তাদের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। মনিব যদি গোলামের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে চায়, তাহলে তার সাথে এমন কাজ করবে যা ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন নখ বা চুল কেটে দেওয়া, অথবা খোশবু ইত্যাদি লাগিয়ে দেওয়া। শুধু মুখ দিয়ে বললে হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। মনিবের অনুমতিতে গোলাম বা বাঁদী ইহ্‌রাম বাঁধার পর মনিব যদি তাদেরকে বিক্রি করে দেয়, তবে জাইয আছে। আমাদের মাযহাবে এ অবস্থায় ক্রেতা তাদেরকে হজ্জ থেকে বাধা দিতে পারবে এবং ইহ্‌রাম ভঙ্গ করাতে পারবে (শরহুত তাহাবী)।

৭. মাসআলা ঃ ইস্‌বীজাবী (র) বলেন, হজ্জ তথা কোন ইবাদত বা পাপের কাজে ইজারা করা জাইয নেই। অতএব কেউ যদি হজ্জের জন্য কাউকে ভাড়া করে পারিশ্রমিক প্রদান করে এবং উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করে, তবে এ হজ্জ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পানাহার, যাতায়াত এবং প্রয়োজনীয় খরচের জন্য যা দরকার হবে, তা গ্রহণ করতে পারবে। এতে অপব্যয় বা কার্পণ্য কোনটাই করবে না। যদি স্বাভাবিক খরচের পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা ওয়ারিছদের নিকট ফেরত দিবে। নিজে রাখা জাইয হবে না। কিন্তু যদি ওয়ারিছগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে এ মালের মালিক বানিয়ে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা জাইয হবে (শরহুত তাহাবী)।

৮. মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি রাস্তা থেকে ফেরত এসে বলে আমি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি এবং আসতে সমস্ত মাল খরচ করে ফেলেছি, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। তাকে এ মালের জরিমানা আদায় করতে হবে। তবে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যদি প্রকাশ্য কোন প্রমাণ থাকে, তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। হজ্জের ব্যাপারে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি বলে, আমি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে, করেছি এবং ওয়ারিছ বা ওসী যদি এ কথা অস্বীকার করে, তবে কসমের সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট যদি মৃত ব্যক্তির পাওনা থাকে এবং মৃত ব্যক্তি তাকে এ কথা বলে থাকে যে, এ মালের পরিবর্তে তুমি আমার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর, একথার প্রেক্ষিতে সে যদি তার ইন্তিকালের পর তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি হজ্জ করার পর এ বিষয়ে সাক্ষী রাখবে (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ হরমের পাথর ও মাটি হরমের বাইরে নেওয়াতে আমাদের মাযহাবে কোন দোষ নেই। এমনি ভাবে হিল অঞ্চলের মাটি হরমে ঢুকালে এতেও কোন ক্ষতি নেই। যমযমের পানি বাইরে নেওয়া জাইয। এ বিষয়ে ফকীহ্গণ সকলেই একমত। কা'বার গিলাফ কেটে তা বাড়ীতে আনা জাইয নেই। ছিঁড়ে পড়ে থাকলে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। অবশ্য খরীদ করে আনাতে কোন দোষ নেই (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)। হরমের হারাক বা অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা মিসওয়াক তৈরী করা জাইয নেই। কা'বার সুগন্ধি তাবাররুক বা অন্য কোন নিয়্যাত আনা জাইয নেই। কেউ আনলে তা ফেরত দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। কেউ যদি বরকত হাসিলের ইচ্ছা করে, তবে সে সুগন্ধি খরীদ করে তা কা'বার সাথে লাগিয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

পরিশিষ্ট

রওযা শরীফের যিয়ারত

১. মাসআলা ঃ আমাদের মাশায়িখদের মতে নবী করীম (সা)-এর রওযা শরীফের যিয়ারত করা সর্বোত্তম মুস্তাহাব। "মানাসিকুল ফারসী এবং শরহুল মুখতারে" উল্লেখ আছে যে, যার ক্ষমতা আছে, তার জন্য যিয়ারত করা ওয়াজিবের কাছাকাছি। ফরয হজ্জ হলে উত্তম হল, প্রথমে হজ্জ করা পরে রওযা শরীফের যিয়ারত করা। আর নফল হজ্জের ক্ষেত্রে হজ্জকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে হজ্জ এবং যিয়ারতের যে কোন একটা আগে করতে পারবে। যখন রওযা শরীফের যিয়ারত করার ইরাদা করবে, তখন মসজিদে নববীর যিয়ারত করার নিয়্যাতও সাথে করে নিবে। কেননা, এটি ঐ তিন মসজিদের একটি, যার উদ্দেশ্যে ইসলামী শরীআতে সফর করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হাদীছ শরীফে আছে ঃ

لا تشد الرحال الا لثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى –

'আল-মাসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আকসা। এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করবে না।

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা করবে, তখন রাস্তায় নবী করীম (সা)-এর প্রতি বেশী করে দুরূদ শরীফ পড়বে (ফাতহুল কাদীর)। যাত্রাকালে মক্কা ও মদীনার পথে যত মসজিদ আছে, এ গুলোতে নামায আদায় করবে। আল্লামা কিরমানীর মতে পথে অবস্থিত মসজিদের সংখ্যা বিশটি (মানাসিকুল হজ্জ)। যখন মদীনার গাছপালা নজরে আসবে, তখন বেশী বেশী করে দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)। মদীনার প্রাচীরসমূহ নজরে আসলে দুরূদের সাথে সাথে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে।

اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لى من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب –

সম্ভব হলে মদীনা শরীফে প্রবেশ করার আগে বা পরে গোসল করে নিবে এবং শরীরে সুগন্ধি মাখবে এবং উত্তম পোশাক পরিধান করবে। বিনয়ের সাথে শান্তভাবে প্রবেশ করবে (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। কোন কোন মানুষের অভ্যাস আছে, মদীনার নিকটে পৌছতেই সওয়ারী থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবতরণ করে পায়ে হেঁটে মদীনায় প্রবেশ করে। এরূপ করা ভাল। এতে মদীনার প্রতি বেশী আদব এবং অধিক সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে। এটা খুবই উত্তম (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ মদীনায় প্রবেশের সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে।

اللّهم رب السموات وما اظللن ورب الارضين وما اقللن ورب الرياح ومازرين اسئلك خير هده البلدة وخير اهلها وخير ما فيها اعوذبك من شرها وشرما فيها وشر اهلها اللّهم هذا حرم رسولك فاجعل دخولى فيه وقاية لى من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب – (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

অতঃপর সুন্নাত তরীকায় মসজিদে প্রবেশ করবে। প্রথমে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে (ফাতহুল কাদীর)। এ সময় নিম্নের দুআটি পাঠ করবে ঃ

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد اللّهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك اللّهم اجعلنى اليوم من اوجه ماتوجه اليك واقرب من تقرب اليك وانجح من دعاك وابتغى مرضاتك – (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

বাবে জিব্‌রাঈল অথবা অন্য যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ অতঃপর মিম্বরের পার্শ্বে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে মিম্বরের খাম্বা ডান কাঁধের সামনে থাকে[১]। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ স্থানেই দাঁড়াতেন। আর এ জায়গাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর কবর এবং মিম্বরের মাঝখানে অবস্থিত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যে তোমাকে এখানে দাঁড়ানোর তাওফীক দিয়েছেন এর জন্য সিজদায়ে শোকর আদায় করবে এবং খুব দু'আ করবে। অতঃপর এখান থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর রওযা শরীফের দিকে যাবে এবং তাঁর মাথার নিকট পৌছে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তিন বা চার হাত দূরে দাঁড়াবে। এর চেয়ে বেশী নিকটে যাবে না। দেয়ালের উপর হাত রাখবে না। এতে রওযা শরীফের আযমত ও মহানত্ব প্রকাশ পায় সবচেয়ে বেশী। এ সময় নামাযে দাঁড়ানোর ন্যায় দাঁড়াবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শূরতের কথা খিয়াল করবে যে, তিনি তাঁর কবরে শুয়ে আছেন এবং আমার কথাবার্তা শুনছেন (ইখ্‌তিয়ারু শরহিল মুখতার)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর প্রতি দুরূদও পাঠ করবে।

---

১. জনাবে রাসূলে আকরাম (সা)–এর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী কয়েক কাতার (চিহ্নিত আছে) পরিমাণ হল রওযাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতের টুকরা– জান্নাতের পুষ্পোদ্যান। এখানে যত ভীড় হোক, অবশ্যই কম পক্ষে দু' রাকআত নামায পড়বে ও দু'আ করবে। প্রতিদিন একাধিক ওয়াক্তে করা উচিত অনুরূপ যিয়ারত।

السلام عليك يانبى الله ورحمة الله وبركاته اشهد انك رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت فى امر الله حتى قبضى رُوحك حميدا محمودا فجزاك الله عن صغيرنا وكبيرنا خير الجزاء وصلّى عليك افضل الصلاة وازكاها واتم التحية وانماها اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين واسقنا من كأسه وارزقنا من شفاعته واجعلنا من رفقاءه يوم القيامة اللّهم لا تجعل هذا اخر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا العود اليه ياذ الجلال والاكرام – (মুহীত)।

অধিক উচ্চ বা অধিক নীচ সরে সালাম পাঠ করবে না। বরং মধ্যম ধরনের আওয়াযে দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে (গায়াতুস সুরূজী ঃ শরহুল হিদায়া)। নবীজীর রওযা শরীফে সালাম পৌছানোর জন্য কেউ বলে থাকলে তা এভাবে পৌছাবে ঃ

السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك الى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين –

তারপর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পিঠ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর মুবারক চেহারার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে এবং যত ইচ্ছা দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর সেখান থেকে এক হাত পরিমাণ সরে হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)–এর মাথা সোজা এসে দাঁড়াবে এবং বলবেঃ

السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك ياصاحب رسول الله فى الغار السلام عليك يا رفيقه فى الاسفار السلام عليك يا امينه على لاسرار جزاك الله عنا افضل ما جزى اماما عن امة نبيه ولقد خلقته باحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت اهل الردة والبدع ومهدت الاسلام ووصلت الارحام ولم تزل قائلا للحق ناصرا لاهله حتى اتاك اليقين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللّهم امتنا على حبه ولاتخيب سعينا فى زيارته برحمتك ياكريم

এরপর এখান থেকে হযরত উমার (র)–এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবে এবং নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يامظهر الاسلام السلام

pdf By Syed Mostafa Sakib

عليك يا مكسر الاصنام جزاك الله عنا افضل الجزاء ورضى الله عمن استخلفك فقد نصرت الاسلام والمسلمين حيا وميتا فكفلت الايتام ووصلت الارحام وقوى بك الاسلام وكنت للمسلمين اما ما مرضيا وهاويا مهديا جمعت شملهم واغنيت فقيرهم وجبرت كسيرهم فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته -

এরপর আধাহাত পরিমাণ সরে এসে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

السلام عليك يا ضجيعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام فى الدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جدا كما الله احسن جزاء جئنا كما نتوسل بكما الى رسول الله يشفع لنا ويسأل ربنا ان يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا فى زمرته -

এরপর নিজের জন্য, মাতাপিতার জন্য, যারা দু'আর জন্য দরখাস্ত করেছে, তাদের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। অতঃপর পূর্বের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শির মুবারকের নিকট দাঁড়িয়ে এ দু'আ পাঠ করবে ঃ

اللّهم انك قلت وقولك الحق ولو انهم اذظلموا انفسهم جاؤك الاية وقد جئناك شامعين فولك طائعين امرك مستشفقين بنبيك اليك ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الاية ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة الاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العلمين -

উপরোক্ত দু'আতে ইচ্ছা করলে আরো বাড়াতে ও কমাতে পারবে। এমনকি এছাড়া মনে যে কোন দু'আ আসবে, তাও করতে পারবে।

৪. মাসআলা ঃ দু'আ শেষে "উস্‌তুওয়ানায়ে আবু লুবাবা"র নিকট আসবে। এ স্তম্ভের সাথেই হযরত আবূ লুবাবা (রা) নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওবা কবুল হয়েছে বলে আয়াত নাযিল করেছেন। এটি কবর এবং মিম্বরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এখানে দুই রাকআত নামায আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করবে এবং কায়মনোবাক্যে দু'আ করবে। তারপর রওযা শরীফে আসবে। হযরতের রওযা শরীফ হাউযের

ন্যায় চতুর্ভুজ। বর্তমানে ইমাম সাহেবগণ এখানেই নামায আদায় করেন।[১] এখানে যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে। নামাযান্তে দু'আ করবে এবং যত বেশী সম্ভব তাসবীহ্, ছানা এবং ইসতিগফার করবে। তারপর মিম্বরের নিকট আসবে এবং আনার সদৃশ গম্বুযের উপর হাত রাখবে, যেভাবে হাত রাখতেন খুতবা দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)। এরূপ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরকত হাসিল করা। এ সময় খুব দুরূদ পড়বে, কায়মনোবাক্যে দু'আ করবে এবং আল্লাহ্‌র রহমতের উসিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধ থেকে পানাহ্ চাইবে। তারপর উসতুওয়ানায়ে হান্নানার কাছে আসবে। মিম্বর তৈরী করার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেজুরের এই কাণ্ডের উপর হেলান দিয়ে ভাষণ দিতেন। কিন্তু মিম্বর তৈরী হওয়ার পর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলে তাঁর বিরহের কারণে কাণ্ডটি ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর থেকে অবতরণ করেন এবং তাকে বগলের সাথে মিলিয়ে ধরেন। এতে তার কান্না বন্ধ হয়। খেজুরের এই কাণ্ডটিই হল উসতুওয়ানায়ে হান্নানা। মদীনায় যতদিন থাকবে রাত্র জাগরণ করতে চেষ্টা করবে এবং মিম্বর ও কবরের মাঝামাঝি স্থানে আস্তে-জোরে যেভাবে সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত, যিকির এবং দু'আ করতে থাকবে (ইখ্‌তিয়ারু শরহিল মুখতার)। মদীনায় অবস্থানকালে বেশী বেশী করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ নবী করীম (সা)-এর কবর যিয়ারত করার পর জান্নাতুল বাকীতে যাওয়া মুস্তাহাব। সেখানকার মাযারসমূহ যিয়ারত করবে। বিশেষভাবে সায়্যিদুশ্ শোহাদা হযরত হামযা (রা)-এর কবর যিয়ারত করবে।[২] জান্নাতুল বাকীতে হযরত আব্বাস (রা)-এর কুববা যিয়ারত করবে। সেখানে হযরত হাসান ইবন আলী (রা), যায়নুল আবেদীন (রা) এবং তাঁর সন্তান মুহাম্মদ বাকের এবং তার পুত্র জা'ফর সাদিকের কবর রয়েছে। সেখানে রয়েছে হযরত উছমান (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা)-এর কুব্বা।[৩] নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী, তাঁর ফুফু হযরত সাফিয়্যা (রা) এবং বহু সাহাবা ও তাবিঈনের কবরও সেখানে আছে। এরপর জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত মসজিদে ফাতিমায় নামায আদায় করবে। যারা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বৃহস্পতিবার তাদের মাযার যিয়ারতে যাওয়া মুস্তাহাব। সেখানে পৌঁছে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

سلام عليك بما صبروتم فنعم عقبى الدار سلام عليك دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون -

---

১. এ গ্রন্থ সংকলনের সময় আজকাল মুওয়াযাহা শরীফে ইমাম সাহেব দাঁড়ান। আজকাল সাউদী সরকারের পুলিশ বাহিনী এসব করতে বাধা দেয়। তাদের মাঝে বিদআতের ব্যাপারে ভীতি রয়েছে। সিজ্দা, মাথা ঠেকানো ইত্যাদি পরিত্যাগ করে এসব করলে কেন শিরক-বিদআত হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

২. হযরত হামযা (রা)-এর কবর তো উহুদে।

৩. বর্তমানে সাউদী সরকার সব কুববা ভেঙে সমান করে দিয়েছে। প্রথম দিকে ভিতরে ঢুকতে দিত, পরে আহলে বায়তের কবরে ইরানীদের বাড়াবাড়ির কারণে প্রাচীরের ভিতরেই ঢুকতে দেয় না, বাইরে দাঁড়িয়ে যিয়ারত করতে হয়। এখানে যারা আছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত উছমান (রা), মা আইশা (রা), ফাতিমা (রা) প্রভৃতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাস পাঠ করবে। শনিবার দিন কুবার মসজিদে গমন করা মুস্তাহাব। নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কুবার মসজিদে পৌঁছে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

ياصريخ المستصرخين وياغياث المستغيثن يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على محمد واله واكشف كربى وحزنى كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه فى هذا المقام ياحنان يامنان يا كثير المعروف يادائم الاحسان يا ارحم الراحمين

(ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)

এ সব স্থানে কোন দু'আ নির্দিষ্ট নেই। যে কোন দু'আ-ইচ্ছা হয় করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মদীনায় অবস্থানকালে সমস্ত নামায মসজিদে নববীতে আদায় করা মুস্তাহাব। যখন নিজের দেশে ফিরার ইচ্ছা করবে, তখন মুস্তাহাব হল, মসজিদে নববীতে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করা এবং দু'আ করা। এরপর পুনরায় হুযূর (সা)-এর কবরে গিয়ে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৯৩১২(উ)-৩,২৫০

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী
pdf By Syed Mostafa Sakib
প্রথম খণ্ড
সম্পাদক
বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী
১
প্রথম খণ্ড
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী
pdf By Syed Mostafa Sakib
প্রথম খণ্ড
সম্পাদক
বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)